মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৭শ বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩৩১—শ্রাবণ ১৩৩২)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ।
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী" প্রেস হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৩৩২

মানসী ও মর্ম্মবাণী

ষাণ্মাসিক সূচী

(ফাল্গুন ১৩৩১—শ্রাবণ ১৩৩২)

বিষয় সূচী

[illegible]—
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩১৩

অন্নপূর্ণার আসন—
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী রত্নপভা সরস্বতী ৪১৩

অভিভাষণ—
মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ২২০

অমিতাভ (সচিত্র)—
অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ২০৯

অমৃতের অভিসন্ধি—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল ৪২১

অরণ্য-তটিনী (কবিতা)—
শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৪৬৭

আত্মচেষ্টা—স্বামী শ্রীনারায়ণ ভারতী ১১৮

আর্টের অনুশাসন—
রায় বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ ১০৭

আলেয়ার ব্যথা (কবিতা)—
৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৪১৩

আহ্বান সঙ্গীত—
শ্রীমতী মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা ৮৯

ইতিহাস (অভিভাষণ)—
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ ডি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার ৩২৯

উপোসী (কবিতা)—
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৪২১

ঔরঙ্গজীবের ফার্ম্মাণ—
শ্রীহরিচরণ বসু ৫৩৬

কালের লিপি (কবিতা)—
৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১২১

কিশোরী (গল্প)—
শ্রীমতী অমিয়া দেবী ১৬৫

কৈলাস পর্ব্বত ও মানসরোবর দর্শন—
শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় এম্-এ বি-এল্ ৩৭৮

গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা (সচিত্র)—
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ ৭২

গ্রন্থ সমালোচনা— ১০৪, ২০৬, ৩১২, ৪১৫

চল্লিশে (কবিতা)—
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪৪

চালুক্যরাজ পুলকেশী ও পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু—
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার ১০৪

চিত্ত-বিয়োগে—মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ৫৯৪

চিত্তরঞ্জন (কবিতা)—
শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১০

চিত্তরঞ্জন (কবিতা)—
শ্রীগিরিজাকুমার বসু ৫৮৯

জয়-পরাজয় (সচিত্র)—
অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ৪৮১
জলধর বন্দনা (কবিতা)—
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৪
জীবন তরণী (চিত্রময়)— ২৬৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (সচিত্র)—
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ ৩৬৯, ৪৬৪
ডাকাতি দমন (সচিত্র)—
কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় ১৫০, ২৬৯, ৩৪৮
তর্পণ (গল্প)—
শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা ৪০
ত্রিবেণী প্রবন্ধের প্রতিবাদ — ১০৪
দেশবন্ধুর চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধ —
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ ৫৮৬
দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণে (কবিতা)—
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬০২
দেশবন্ধুর বৈশিষ্ট্য—
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল ৬০৩
নগবালা (উপন্যাস)—
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৮৯, ১১৬, ২৩৭, ৩২৩, ৫২৪
নবীনের অভিভাষণ—
শ্রীমতী প্রিয়বালা গুপ্তা ৩৩৮
নরেন্দ্রের সহানুভূতি (গল্প)—
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩১৬
নিবেদন—
রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন ৪৮
নিবেদন—
রায় বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ ২৫৮
নীরব বীণা—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল এম-এ, বি-এল ১৭১
পথের ডাক (কবিতা)—
রায় বাহাদুর শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল, ৬০৩
পদ্মা (বড় গল্প)—
শ্রীমতী নীহারনলিনী দত্ত ৩০, ১৩৬, ২৭৪,
পরলোকে চিত্তরঞ্জন—
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ ৬৮৩
পাগলী (গল্প)—শ্রীপঞ্চানন দত্ত ৩৪৪
পুরীর স্মৃতি (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী রত্নপ্রভা সরস্বতী ৫৫
পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র—
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ ১৪৫
প্রকৃতির খেয়াল (সচিত্র)—
শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য ১৮৪
প্রজা মনিব (গল্প)
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার দেবশর্ম্মা ৪৭৫, ৫৬১
প্রাচীন মিশরে নারীর স্থান—
অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ ২০২
প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ—২৫, ১২৯, ২৪৭, ৩৬১, ৪৪১, ৫৫১
ফাগুন গোধূলি (কবিতা)—
মৌলভি বন্দে আলি ১৬
ফুল ফাগুনে (কবিতা)—
শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী ১২
বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত একটি শুভ্র প্রস্তর-লিপি
রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম-এ ১১৩
বঙ্কবিহারী (কবিতা)—
শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ বি-এল ৬[illegible]
বঙ্গ সাহিত্যে মোসলমান—
শ্রীমতী নুরন্নেছা খাতুন ৪১১
বর্ত্তমান যুগের মথুরা (সচিত্র)—
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত ৩৮৩, ৪৫৭
বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি—
শ্রীমতী মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা ২৯১
বসন্তের বাণী (কবিতা)
রায় বাহাদুর শ্রীরমণীমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল ১
বাদল দোলা (কবিতা)—
মৌলভি বন্দে আলি ৪৪৩
বারমাস (কবিতা)—
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত ৪০
বাঁশী বাজল না (গান)—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ ১০৩
বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোরের কথা—
হাবিলদার শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল ১৭৩, ৪৯৫
বেদান্ত দর্শন—
শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম্-এ ১৯২, ৪৩২, ৫৩৯
বাসুদেব—
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-আর-এ-এস ২৭
বৈষ্ণব কবিগণ—জয়দেব—
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ ৪৭২

বিদুষীর বিপদ (গল্প)
শ্রীমতী মায়া দেবী ৫৪২
বৃথা গর্ব্ব (কবিতা)—
শ্রীপরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত ২১৯
ভাষা ও ভাষা-বিজ্ঞান—
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ ৪৫১, ৫৬৯
মধুসূদনের বীরাঙ্গনা—
রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি ১৭
মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা"—
রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি ২৪৩
মনের দাগ (গল্প)—
শ্রীমতী প্রমীলা সেন ৩৫৬
মর্ম্মবাণী (কবিতা)—
শ্রীরাজেন্দু দত্ত ২৮৬
মাকড়সার জাল (কবিতা)
শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ১১২
মাদুলী মহিমা (গল্প)—
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৭
মায়ের রূপ (কবিতা)—
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ২৯৬
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা— ২৯৭, ৩৯৭, ৫০১, ৬১১
মিথ্যাবরণ (কবিতা)—
শ্রীকালিদাস রায় বি-এ ১২৭
মুক্তি (কবিতা)—
শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৬০
মুসলমান যুগের মথুরা (সচিত্র)—
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত ১৫৭, ২১২
মূক প্রণয়ী ও তাহার চিকিৎসক—
৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮৭
যক্ষ বা লামার দেশ (সচিত্র)—
শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার এম এ, বিদ্যারত্ন ২
যাত্রা সাহিত্য—
স্বামী শ্রীনারায়ণ ভারতী ৫৫৮
"রক্ত করবী"—
অধ্যাপক শ্রীশরৎকুমার সেন এম-এ ১৯৭
রাজগৃহ—
শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী ৫৩১
রাজনীতি—
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এ-মআর-এ-এস ৫২১
রাণী অম্বালিকা (গল্প)—
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার এট-ল-৯৬
লোকশিক্ষার উপায়
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ ২৫৫
শান্তি নিকেতন ব্রতী বালক সম্মিলন—
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ ৪২৮
শিল্পী (বৌদ্ধ গল্প—)
শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী বি-এল ৭
শিশু (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৫৪১
শুকতারা (চিত্র)—
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ ২৯৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি (কবিতা)
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ৫৯২
শ্রাবণ সন্ধ্যায় (কবিতা)
শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৫৫০
শ্রীপঞ্চমীর পঞ্চম (নক্সা)—শ্রীমতী হেমমালা বসু ৪৩৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—
শ্রীম— ৪১৭
শ্রুতি-স্মৃতি—
মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ১৩
সতী (গল্প)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বি-এ, বার-এট-ল, ৩০৫
সামাজিক নব সমস্যা
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ ৮৩, ১২১, ২৮২
সাহিত্য সমাচার ২০৮, ৩১২
সুখ (কবিতা)
৺অমলা দেবী ১৯৬
সুখ ও দুঃখ (কবিতা)
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ ৪১৫
সুস্বাগতম্ (কবিতা)
শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ ২৬৪
সেনানায়কের নায়িকা (কবিতা)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ১১৫
সোমনাথ (কবিতা)
শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ১৯২
স্মৃতির তর্পণ
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ৫৯০
স্বাগতম্ অভিভাষণ
শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫

হরিমোহন ঠাকুর (সচিত্র)
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ — ৭৫

হেমচন্দ্র অস্তাচলে (কবিতা)
৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী — ৭৪

লেখক-সূচী

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন বি-এ
- গ্রন্থ সমালোচনা — ২০৬

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত—
- বার মাস (কবিতা) — ৪০

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—
- চল্লিশে (কবিতা) — ১৯৪

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী—
- ফুল ফাগুনে (কবিতা) — ১২

৺অমলা দেবী—
- সুখ (কবিতা) — ১৯৬

শ্রীমতী অমিয়া দেবী—
- কিশোরী (গল্প) — ১৬

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—
- অগ্নি — ৩,১৩

শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
- বৈজ্ঞানিক খেলনা (সচিত্র) — ১৮২

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়—
- শিশু (কবিতা) — ৫৪১

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—
- চিত্তরঞ্জন (কবিতা) — ৬১০

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—
- শ্রদ্ধাঞ্জলি (কবিতা) — ৫৯২

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ—
- মিথ্যা বরণ (কবিতা) — ১২৭

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় এম-এ বি-এল্—
- কৈলাস পর্ব্বত ও মানসরোবর দর্শন (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) — ৩৭৮

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ—
- সেনানায়কের নায়িকা (কবিতা) — ১৫৫

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, এম-এ—
- বেদান্ত দর্শন — ১৯২, ৪৩২, ৫৬৯

শ্রীগিরিজাকুমার বসু—চিত্তরঞ্জন (কবিতা) — ৫৮৩

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী রত্নপ্রভা, স্বরস্বতী—
- পুরীর স্মৃতি (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) — ৫৫
- অন্নপূর্ণার আসন — ৪১৩

৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—
- হেমচন্দ্র অস্তাচলে (কবিতা) — ৭৪

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্—
- দেশবন্ধুর বৈশিষ্ট্য — ৬০৩

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়—
- শ্রুতি-স্মৃতি — ১৩
- অভিভাষণ — ২২০
- চিত্ত বিয়োগে — ৬৯৪

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী বি-এল্—
- শিল্পী (বৌদ্ধ গল্প) — ৭

রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন—নিবেদন — ৪৮

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—
- কালের লিপি (কবিতা) — ১২১
- আলেয়ার ব্যথা (কবিতা) — ৪১৩

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—
- মূক প্রণয়ী ও তাহার চিকিৎসক (গল্প) — ২৮৭

"ডাক্তার"—
- গ্রন্থ সমালোচনা — ২০৬

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী—
- রাজগৃহ — ৫৩১

রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, এম-বি—
- মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" — ১৭
- গ্রন্থ-সমালোচনা — ২০৬
- মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা" — ২৪৩

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ, বি-এল্—
- অমৃতের অভিসন্ধি — ৪২১

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার এম-এ, বিদ্যারত্ন—
- যক্ষ বা শামার দেশ (সচিত্র) — ২

স্বামী শ্রীনারায়ণ ভারতী—
- আত্মচেষ্টা — ১৬৮
- যাত্রা-সাহিত্য — ৫৫৮

শ্রীমতী নীহারনলিনী দত্ত—
- পথ্যা (বড় গল্প) — ৩০, ১৩৬, ২৭৪

শ্রীমতী নূরন্নেছা খাতুন—
- বঙ্গ-সাহিত্যে মোসলমান — ৪১১

শ্রীপঞ্চানন দত্ত—
পাগলী (গল্প) ৩৪৪
শ্রীপরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত—বৃথা গর্ব্ব (কবিতা) ২১৯
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত—
মুসলমান যুগের মথুরা (সচিত্র) ১৭৭, ২১২
বর্ত্তমান যুগের মথুরা (ঐ) ৩৮৩, ৪৫৭
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল এম এ, বি-এল
নীরব বীণা (গল্প) ১৭১
হাবিলদার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বি-এ—
বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা ১০৩, ৪৯৫
শ্রী প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল—
অরণ্য-তটিনী (কবিতা) ৪৬৭
শ্রাবণ-সন্ধ্যায় (ঐ) ৫৩০
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-ল—
রাণী অম্বালিকা (গল্প) ৯৬
সতী (ঐ) ৩০৫
শ্রী প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক—
মায়ের রূপ (কবিতা) ২৯৬
শ্রীমতী প্রমীলা সেন—
মনের দাগ (গল্প) ৩৫৬
শ্রীমতী প্রিয়বালা গুপ্তা—
নবীনের অভিভাষণ ৩৩৮
মৌলভি বন্দে আলি—
ফাগুন-গোধূলি (কবিতা) ১৬
বাদল-দোলা (ঐ) ৪৫৩
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—
জলধর বন্দনা (কবিতা) ৫৪
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ—
ভাষা ও ভাষা বিজ্ঞান ৪৫১, ৫৬১
অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ—
প্রাচীন মিশরে নারীর স্থান
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-আর-এ—
বাসুদেব
রাজনীতি ৫২১
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ—
সুখ ও দুঃখ (কবিতা) ৪১৫
শ্রীম—
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪১৭
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—
নগবালা (উপন্যাস) ৮৯, ১১৬, ২৩৭, ৩৯৩, ৫২৪
নরেন্দ্রের সহানুভূতি (গল্প) ৩১৬
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ—
গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা (সচিত্র) ৭২
হরিমোহন ঠাকুর (ঐ) ৭৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (ঐ) ৩৬৯, ৪৮৪
শ্রীমতী মায়া দেবী—বিদুষীর বিপদ (গল্প) ৫৪২
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ—শুকতারা (চিত্র) ২৯৪
শ্রীমতী মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা—
আহ্বান সঙ্গীত (কবিতা) ৮৯
বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ২৯১
কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়...
"ত্রিবেণী" প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর ১০৪
ডাকাতি দমন (সচিত্র) ১৫০, ২১৯, ৩৪৮
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—
মাকড়সার জাল (কবিতা) ১১২
উপোসী (ঐ) ৪২১
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ—
পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র ১৪৫
রায় বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ—
আর্টের অনুশাসন ২০৭
শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ—
সামাজিক নবা সমস্যা ৮৩, ১২১, ২৮২
পরলোকে চিত্তরঞ্জন ৫৭৭
অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এফ আর-এইচ-এস, এস-আর-এ-এস—
অমিতাভ (সচিত্র) ২০৯
জয়-পরাজয় (ঐ) ৪৮১
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার দেবশর্ম্মা—
প্রজা-মনিব (গল্প) ৪৭৫, ৫৬৪
রায় বাহাদুর শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল—
বসন্তের বাণী (কবিতা) ১
পথের ডাক (ঐ) ৬০৩
২৮৫
অধ্যাপক শ্রী[illegible]শচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ ডি, পি-আর-এস—
চালুক্যরাজ পুলকেশি ও পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু ১০৫
ইতিহাস (অভিভাষণ) ৩২৯
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ—
প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস) ৮৫, ১২৯, ২৪৭, ৩৬১, ৪৪৪, ৫৫১

শ্রীরাধেন্দু দত্ত—
মর্ম্মবাণী (কবিতা) ২৮৬
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—
গ্রন্থ-সমালোচনা ৪১৫
শ্রীশরৎকুমার সেন এম-এ—
"রক্ত করবী" ১৯৭
শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ—
সুস্বাগতম্ (কবিতা) ২৬৪
শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্—
সোমনাথ (কবিতা) ১৯২
বৰ্ববিহাগ (ঐ) ৬২০
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এ—
লোক শিক্ষার উপায় ২২৫
শান্তি-নিকেতনে ব্রতীবালক সম্মিলন ৪২৮
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধ ৫৮৬
শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—
মুক্তি (কবিতা) ৩৪০
শ্রীসন্তোষচন্দ্র গুপ্ত—
স্বাগতম্ (অভিভাষণ) ১৮১
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ—
স্মৃতির তর্পণ ৫৮০
শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা—
তর্পণ (গল্প) ৪০
শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য—
প্রকৃতির খেয়াল (সচিত্র) ১৮৪
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ,
বাঁশী বাজল না (কবিতা) ১০৩
বৈষ্ণব কবিগণ—জয়দে[illegible] ৪৭২
রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম-এ—
বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরলিপি ১১৩
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
মাদুলি মহিমা (গল্প) ৪৬৭
শ্রীহরিচরণ দত্ত—
তরঙ্গজীবের কাহাণ ৫৩৬
শ্রীমতী হেমমালা বসু—
শ্রীপঞ্চমীর পঞ্চম (নক্সা) ৪৩৫

চিত্র (পূর্ণপৃষ্ঠা)

অমিতাভ (বহুবর্ণ) ২০৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে
কলহান্তরিতা (ত্রিবর্ণ)
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র ৩১২ " "
কামারুলজমান ও বেদৌরা (ত্রিবর্ণ)—
এডমণ্ড ডিউলাক ১৬ " "
চিত্তরঞ্জন (দ্বিবর্ণ) ৫৮৪ " "
চিরনিদ্রায় চিত্তরঞ্জন ৬০৮ " "
জলাধিনী রেবেকা
ডবলিউ, হিলটন্ আর-এ ৩৬১ " "
[illegible] ([illegible]-এর্ণ মুক্তার) ৩৭৮
জীবন-তরণী ২৬৫
১ যাত্রা আরম্ভ ঐ
২ শৈশবে
৩ বাল্যজীবন—বিদ্যাশিক্ষা [illegible]৬
৪ যৌবনে—প্রেমলীলা ঐ
৫ মধ্য বয়স—শক্তি ও ক্ষমতা ২৬৭
৬ প্রৌঢ়ে—জ্ঞানাধিকার ঐ
৭ বার্দ্ধক্যে—ভগবচ্চিন্তা ২৬৮
৮ "শেষের দিন"—যাত্রা শেষ ঐ
দর্শন-মুগ্ধা (ত্রিবর্ণ)
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ২৬৪ " "
নিষ্পাপ বয়স
স্যর যশুয়া রেণল্ডস্ ৪৫৬ " "
ভীনস মন্দিরে সাইকী (ত্রিবর্ণ)
স্যর ই, জে, পয়ণ্টার
পি-আর-এ ৪১৬ " "
ভিখারিণী জননী—
এইচ, উইক্স এ-আর-এ ৬৯ " "
অনালম্যাকাইড মজুমদার্গণ—
ডবলিউ, এটি আর-এ ১২০ " "
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব (ত্রিবর্ণ)
শ্রীবিভূতিভূষণ রায় মুখপত্র
মায়ের দুলাল (ত্রিবর্ণ)—
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র ১০৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে
মুদ্রা পরীক্ষা (ত্রিবর্ণ)—
জে. এফ লিউইস আর-এ [illegible] "

অমিতাভ।

Bengal Art Press, 41, Shikdar Bagan

অধ্যাপক সমদ্দারের সৌজন্যে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী
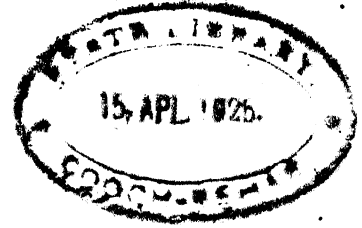
১৭শ বর্ষ। ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩২ | ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা

অমিতাভ

রাজধানী কপিলাবস্তু আজ আনন্দ সাগরে মগ্ন। দক্ষিণায়ন উৎসব উপলক্ষ্যে নগরের স্ত্রী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সুসজ্জিত হইয়া আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত। সকলেরই এক কথা—আজ জাতীয় মহোৎসব। গৃহদ্বার পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন, পুষ্পমালা পতাকা সুশোভিত হইয়া নূতন শ্রী ধরিয়াছে। সকলেরই মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে। দলে দলে নাগরিকবর্গ রাজপথে মিলিত হইয়া আলিঙ্গনানন্দ উপভোগ করিতেছে। রাজপথের নূতন শোভা—কুসুমদাম শোভিত তোরণ নয়নানন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। গৃহাভ্যন্তরস্থ পুরস্ত্রীগণ একে অন্যের গৃহে গমন করিয়া দর্শন ও কথোপকথন-সুখ উপভোগ করিতেছেন। আজ আর কেহ যেন নিরানন্দ নাই, সকলেই প্রফুল্ল। মনে হইতেছে কপিলাবস্তুতে আজ আর ধনী দরিদ্রে, রাজপুরুষ প্রজায়, কোন প্রভেদ নাই। এ উৎসবে শত্রু মিত্র সব এক একভাবে অনুপ্রাণিত।

কিন্তু এহেন আনন্দের দিনে, এই মহোৎসব উপলক্ষ্যে, নগরের সকলে এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও, রাজা রাণীর প্রাণে সুখ নাই। প্রাসাদ সুসজ্জিত হইলেও, প্রাসাদের প্রধান দুই জনের মনে এতটুকু আনন্দ নাই, এতটুকু শান্তিও নাই। দুই জনে নিরানন্দে নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া রহিয়াছেন। সকল প্রজা—স্ত্রী, পুরুষ আনন্দোৎসবে মগ্ন; কিন্তু উৎসবে যোগদান করেন নাই রাজা ও রাণী—নরপতি শুদ্ধোদন ও রাজমহিষী মায়া। তাঁহারা মনে করিতেছেন, পৃথিবীতে আনন্দ নাই, শান্তি নাই—আছে কেবল দুঃখ। তাই দুই জনেই চক্ষুর জলে নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন।

কেন? কিসের এই দুঃখ? কি জন্য, আজ এই জাতীয় মহোৎসবের দিনে তাঁহারা নিরানন্দ? যাঁহাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রজা আজ দক্ষিণায়ন উপলক্ষ্যে আনন্দোৎফুল্ল, তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা কেন? রাজমহিষী মায়া জননী হইতে পারেন নাই—তিনি অপুত্রবতী। তাই রাজারাণীর মনে বিন্দুমাত্রও আনন্দ নাই। রাজা স্বর্গারোহণ করিলে কে এই কপিলাবস্তুর অধিপতি হইবেন? "জনক জননীর" নিরানন্দ অন্তঃকরণে কে আনন্দ উৎস প্রবাহিত করিবে? তাই রাজা রাণী এদিনেও দুঃখিত। চিরন্তন প্রথানুসারে

রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত হইয়াছে কিন্তু রাজপ্রাসাদের অধিকারী ও অধিকারিণীর চিত্তে একটুও শান্তি নাই। উভয়েই তদ্‌গত চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন—কিসে, কি প্রকারে তাঁহাদের এই দুঃখের অবসান হয়।

ভক্তের ভগবানও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভক্তের করুণ ক্রন্দন, কাতর প্রার্থনা তাঁহারও নিকট পৌছিয়াছিল। তাই বোধিসত্ত্ব তুষিত নামক স্বর্গের ধর্ম্মোচ্চয় মহাপ্রাসাদে সুখাসীন হইয়া স্বকীয় ভবিষ্যৎ জন্মের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর এই দুইটী প্রাণীর কথাই মনে করিতেছিলেন। তিনি চারটী বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। কোন্ কালে জন্মগ্রহণ করিবেন? কোন্ দ্বীপেই বা তিনি জন্ম লইবেন? কোন্ দেশ তিনি অলঙ্কৃত করিবেন? কোন্ কুলই বা তিনি পবিত্র করিবেন? কল্পের প্রারম্ভে বা অন্তিমে ত তিনি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না! জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—পৃথিবী এই সকল মহাপাতকে আক্রান্ত না হইলে তিনি কি জন্য স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ধরাধামে আসিবেন? তৎপরে, তিনি কোন্ দ্বীপেই বা শুভাগমন করিবেন? প্রত্যন্ত দ্বীপে অথবা যথায় তথায় তাঁহার জন্মগ্রহণ শোভনীয় হইবে না। পরন্তু, তিনি সকল জনপদে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। প্রত্যন্ত জনপদের প্রজাবর্গ সাধারণতঃ জড়স্বভাব বিশিষ্ট, অন্ধে, মূক ও বধির হয়; এই সকল জনপদঃ পরিত্যজ্য। তাই তিনি মধ্যম জনপদেই জন্মিতে পারেন। অপিচ
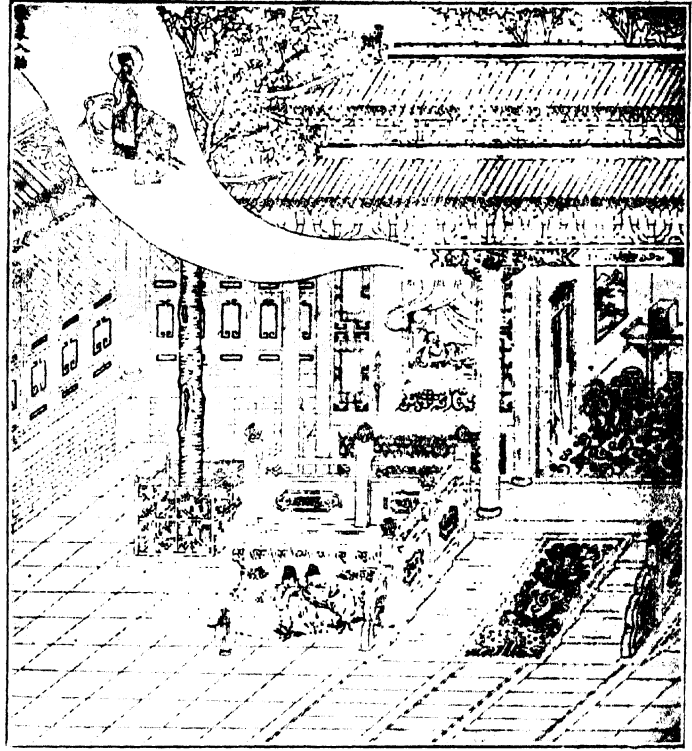
মায়া দেবীর স্বপ্ন

তিনি হীন কুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। হয় ব্রাহ্মণ নতুবা ক্ষত্রিয় কুলেই জন্মগ্রহণ তাঁহার পরিশোভনীয়। যখন পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য থাকে, তখন তিনি ব্রাহ্মণ কুলেই আসিতে পারেন; এবং, যখন ক্ষত্রিয় কুলের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তখন তাঁহার পক্ষে সেই কুলে জন্মই প্রশস্ত।

সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া বোধিসত্ত্ব স্থির নিশ্চয় হইলেন। তিনি জম্বুদ্বীপে, মগধ দেশে কপিলাবস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের সহধর্ম্মিণী মায়াদেবীর উদরেই জন্মগ্রহণ করিবেন। রাজা শুদ্ধোদনের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহারা চক্র, হস্তী, অশ্ব, স্ত্রী, মণি, গৃহপতি ও পরিণায়ক এই সপ্তরত্ন দ্বারা সমন্বিত। এরূপ স্থান, প্রদেশ, কুল আর ছিল না; এবং জন্মগ্রহণের তৎকালের ন্যায় আর শুভ সময়ও ছিল না।
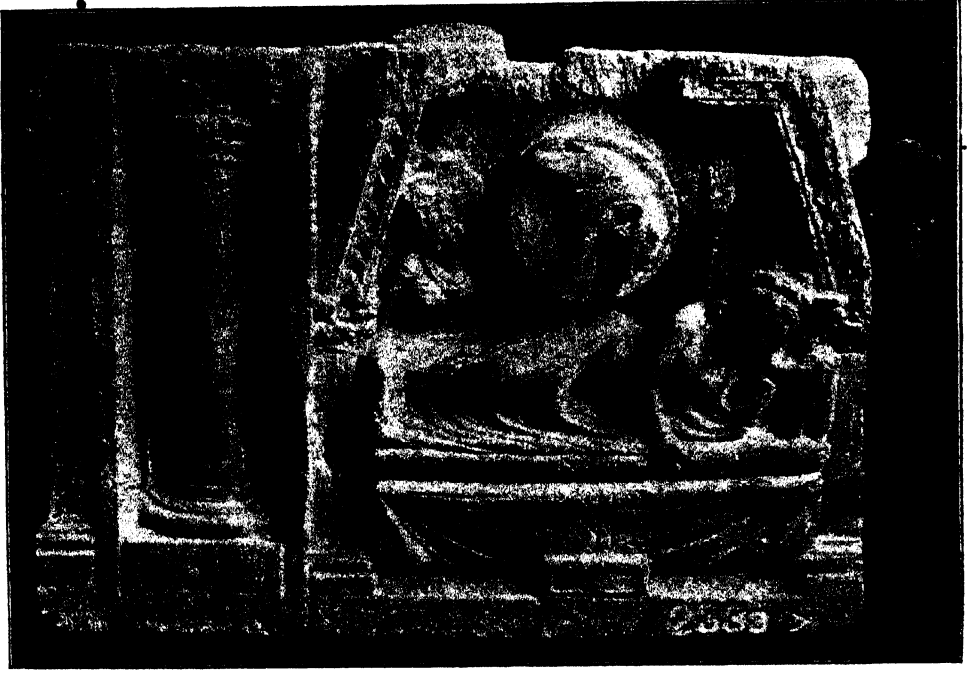
বুদ্ধদেবের জন্ম

শুভ বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিকে রাজ্ঞী মায়া দেবী সুপ্তাবস্থায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। হিম রজত নিভ, চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষাও জ্যোতির্বিশিষ্ট, ষড়্‌দণ্ড শোভিত এক হস্তী তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া, তাঁহার কুক্ষির দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

অদ্ভুত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের হেতু কি? এরূপ স্বপ্নের প্রয়োজনীয়তা কি? ইহার তাৎপর্য্যই বা কি? রাজ্ঞী রাজাকে নিবেদন করিলেন। বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ জ্যোতিবীবর্গ রাজসভায় সমবেত হইয়া স্বপ্নের ফলাফল বিচার করিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে, রাজ্ঞীর গর্ভে এক অসামান্য ক্ষণজন্মা পুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। জন্ম হইলে, তিনি যদি গৃহে থাকেন তবে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। কিন্তু, যদি তিনি সংসার বন্ধন ছিন্ন করেন, তবে তিনি সর্ব্বলোকানুকম্পী বুদ্ধরূপে জগতের পাপান্ধকার দূর করিবেন। এহেন মহাপুরুষের জন্মে পৃথিবী দিব্যালোকে উদ্‌ভাসিত হইবে।

রাজা রাণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ পত্র পুষ্প পতাকায় সুশোভিত হইল। রাজ্যে সকলেই সুখী হইল—রাজপুত্র আসিতেছেন; তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন; কপিলাবস্ত পৃথিবীর রাজধানী হইবে।

সময় পূর্ণ হইল। রাজমহিষী মায়া প্রসবের জন্য শুভ মুহূর্ত্তে পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লুম্বিনী নামক প্রমোদোদ্যানে তিনি বিশ্রামার্থ অপেক্ষা করিবার জন্য শালতরুমূলে দণ্ডায়মানা হইলেন। লুম্বিনী কপিলাবস্তু হইতে মাত্র পাঁচ ক্রোশ।

শুভমুহূর্ত্ত আসিল। রাজ্ঞী আশ্রয়ার্থ শালতরুর শাখা ধারণ করিবামাত্র তাঁহার কুক্ষি ভেদ করিয়া নবকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। অমিতাভের শুভাগমনে, কি দৃষ্ট,

নিজ পুস্তকাগারে অধ্যাপক সমাদ্দার

কি অদৃষ্ট, কি দূরবাসী, কি নিকটবাসী, কি ভূত কালের, কি ভবিষ্যৎ কালের যে কোন প্রাণী হউক না কেন সুখী হইবে।

যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া যিনি সংস্ররশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন লোকের শোক সন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাহার উপমা নাই, সেই অমিতাভ বুদ্ধকে বন্দনা করি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মুসলমান যুগের মথুরা

২

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের উপাস্য ও প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিগুলি 'অখিলরসামৃত মূর্ত্তি', ভাগবতের 'শ্রাণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্' জয়দেবের 'শৃঙ্গারঃ ··· মূর্ত্তিমান্'। কেবল হস্তেধৃত মুরলী বাজাইয়া নৃত্য করিতেছেন। ইঁহাদের দেব মূর্ত্তির হস্তে সেই জন্য কোন ঐশ্বর্য্য ভাব প্রকাশক অসুর বধের চিহ্ন অস্ত্রশস্ত্রাদি নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীতে অসুর বধের বা রৌদ্র, বীর, ভয়ানক রসের একটাও বর্ণনা নাই। কেবল মাত্র শৃঙ্গার হাস্য করুণা রসেরই পদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সে পদগুলিতে

কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড হইতে মথুরায় দূতী প্রেরণ পর্য্যন্ত মধুর আদিরসের বৃন্দাবন লীলাই বর্ণিত। তাহাতে মথুরা, দ্বারকা, বা কুরু-ক্ষেত্রের লীলার কোন সম্পর্ক নাই।

ইঁহাদের মতে দুই জন কৃষ্ণ। একজন 'বাসুদেব কৃষ্ণ', অন্য জন 'গোপেন্দ্র নন্দন'। জীব গোস্বামী রচিত কৃষ্ণসন্দর্ভে ও কৃষ্ণদাস কবি-রাজ গোস্বামী রচিত চরিতামৃতে ইহার আভাস দেওয়া আছে। সে আখ্যানটী এইরূপ—যে রাত্রে কংসের কারাগারে দৈবকী একটী চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রসব করেন, সেই রাত্রে গোকুলে যশোদা একটী দ্বিভুজ পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব কংসভয়ে নিজ চতুর্ভুজ পুত্রটীকে লইয়া যমুনা পার হইয়া গোকুলে গেলেন। তথায় যশোদার সূতিকাগারে একটী কন্যা ও পুত্র ছিল, বসুদেব নিজ পুত্রটীকে তথায় শয়ন করাইবা মাত্র দুইটী পুত্র একাঙ্গ হইয়া গেল ও চারি হস্তের পরিবর্ত্তে দ্বিহস্তই রহিল; বসুদেব, কন্যা যোগ-মায়াকে লইয়া কারাগারে ফিরিয়া আইসেন। পরে বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত হইলে কংসাদেশে অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে রথে করিয়া যখন লইয়া যান তখন বাসুদেব চতুর্ভুজ কৃষ্ণ প্রকট ভাবে তাঁহার সহিত মথুরায় গিয়াছিলেন। আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ চিরদিনের জন্য অপ্রকট ভাবে বৃন্দাবনে রহিয়া গিয়াছেন। এই জন্য চরিতামৃতে একটী শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই —'যদুবংশোদ্ভব কৃষ্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যান না।' গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সেই জন্য ঐশ্বর্য্য ভাবাপন্ন যদুবংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণেরই সেবা করিয়া থাকেন। তখন কেবল টিলার উপর ঝোপড়া বাঁধিয়া কৃষ্ণ মূর্ত্তিগুলির উপাসনা চলিত। তাঁহাদের সহিত কোন রাধা মূর্ত্তি ছিল না।*

মহারাজ মানসিংহ

* সহাজয়া দিগের সময়ে রচিত আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

বৃন্দাবনে কিরূপে রাধামূর্ত্তি গুলি আসিল এখন ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ হইতে তাহা বলিব। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবের ১৫৪০ খৃঃ পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম দেব (বড়ঃজানা) ১৫৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজত্ব-কালে তাঁহার আদেশে পুরীধাম হইতে গোবিন্দ দেব ও মদন-গোপালের জন্য দুইটী রাধা মূর্ত্তি বৃন্দাবনে পাঠান হইয়াছিল। গোস্বামীরা সেই দুইটী মূর্ত্তিকেই রাধা ও ললিতা নামে মদনমোহনের দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে অপর একটী নারী মূর্ত্তি আসিলে রাধা নামে তাঁহাকে গোবিন্দ দেবের বাম পার্শ্বে বসান হইয়াছিল। আমরা গোস্বামী দিগের জীবন চরিত ও ঠাকুরগুলির স্থাপনের বিবরণ "বৃন্দাবন কথা" গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে সারিলাম।

ইঁহাদের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিকুঞ্জ মধ্যে বসিয়াছেন; ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি আট জন নিত্য সখী তাঁহাদিগকে মাল্য, চন্দন, তাম্বুল চামরাদি লইয়া পরিচর্য্যা ও সেবা করিতেছেন।

সওয়াই জয়সিংহ ২য়

রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা আপনাদিগকে সেই আটজন সখীর সখী ভাবিয়া আপনাদিগকে রূপমঞ্জরী ও গুণমঞ্জরী সখী নামে অভিহিত করিতেন। আরতি কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া অতি দীনভাবে ভিক্ষালব্ধ অন্নে ঠাকুরের ভোগ দিয়া সেবা করিতেন।

হইতে রাধা নামটী লইয়া জয়দেব গোস্বামী তাঁহার গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডের ১৫ অধ্যায় হইতে তাঁহার প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোক ও ২৮ অধ্যায় হইতে বসন্তে রাসলীলা ও বিহার বর্ণনা। ঐ পুরাণের মতে গোলোকের রাধা রাসের সময়ে আবির্ভূতা হইয়াধাবিতা হইয়াছিলেন। সেই জন্য রাসের 'রা' ও ধাবনের 'ধা' এই দুইটি অক্ষর লইয়া রাধা নাম হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাধাকৃষ্ণ পূজা, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সেই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম সখীভাব হইয়াছিল। *

যে সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এইরূপ ভাবে ঠাকুরগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভজন সাধন করিতেছিলেন, সেই সময় বারাণসী নিবাসী বল্লভ ভট্ট তাঁহার দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিট্ঠলনাথ, হিতহরিবংশ, হরিদাস স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, স্থানেশ্বরী জগন্নাথ এবং অন্ধ সুরদাস নামে কয়েকজন উত্তর পশ্চিম নিবাসী বৈষ্ণব আসিয়া, বাঁকেবিহারী, রাধাবল্লভজী, যুগল কিশোরজী নামে কয়েকটী বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতে অতি দীনভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন। তাঁহাদের ঠাকুরের সঙ্গে রাধা মূর্ত্তি নাই। তাঁহারা সকলেই কৌপীন পরিতেন ও বৃক্ষতলে বা সামান্য কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন। সামান্য মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য অন্নে অতি কষ্টে আপনাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন আকবর বাদশাহ রাজকীয় বজরা আরোহণে যমুনাবক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে মানসিংহ রায়সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু সেনাপতিও ছিলেন। বাদশাহ হরিদাস স্বামীর সুললিত স্তোত্র-গীতি শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে অবতরণ করেন ও সন্ন্যাসীদিগের বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা ও দীনাবস্থা দেখিয়া প্রীতচিত্তে সেখানকার হিন্দু রাজাদিগকে বৃন্দাবনধামে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়া যান, ও বৃন্দাবনের ফকিরাবাদ নাম রাখেন।

বৃন্দাবনের মধ্যভাগ

সন্ন্যাসীদিগের অনুরোধে বাদশাহ তিনবার তিনখানি জীবহিংসা নিবারণের ফর্ম্মাণ দিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—জায়গীরদার কেরোরী ও মুৎসুদ্দিদিগের উপর আদেশ যে তাঁহার সৈনিকেরা, উষ্ট্রচালক ও হস্তিপালক প্রভৃতি রাজানুচরেরা বৃন্দাবনে যাইয়া বৃক্ষাদি ছেদন করে, বানর ও ময়ূরদিগকে ধরে ও হত্যা করে, ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করা হয়। এই আদেশের পর যদি কেহ এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহা যেন উপরিউক্ত কর্ম্মচারীরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখেন। (১৯১৩ খৃঃ নভেম্বর মাসের "হিন্দু রিভিউ" পত্রিকা দেখুন)

উদার হৃদয় বাদশাহের এইরূপ আদেশ পাইয়া হিন্দু রাজা ও সেনাপতিরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া অনতিবিলম্বে বৃন্দাবনধামে শিল্পকলা বিভূষিত পাষাণ রচিত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দেবসেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মানসিংহ গোবিন্দদেবের, কৃষ্ণদাস কর্পূর মদনমোহনের, বাঙ্গালী রাজা গুণানন্দ চৈতন্য দেবের,

* বরাহ পুরাণে এইরূপ সখিভাবের কোন কথা পাই নাই। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে এই সখিভাবের যে সকল কথা পাইয়াছি তাহা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মথুরা প্রবন্ধে দিয়াছি দেখিবেন। এই সখীভাব সহজিয়া মতের পরবর্ত্তী কালে এই দুই পুরাণে রচিত বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়।

জলের দৈব মাহাত্ম্য না বুঝুন, ইহার ঐহিক পবিত্রতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কোথাও অভিযান কালে পানের জন্য হস্তিপৃষ্ঠে মশক ভরিয়া গঙ্গাজল সঙ্গে লইতেন।

মসির নামক তাঁহার সময়ের ইতিহাসে লেখা আছে "বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী লাগাইয়া অতি স্বল্প কালের মধ্যেই এই ভ্রান্তি সঙ্কুল স্থানটী (মথুরা বা কেশব মন্দির) একেবারে ধ্বংস করা হইয়াছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং এই বর্ত্তমান মঙ্গলময় বাদশাহের রাজত্ব কালে পৌত্তলিক কাফের দিগের অনেকগুলি বিবর অবাধে বিনষ্ট করা হইয়াছিল। মুসলমান দিগের প্রভাব ও ইসলাম ধর্ম্মের শক্তি দেখিয়া গর্ব্বিত রাজগণের অন্তরে প্রধূমিত বহ্নি জ্বলিতে থাকিলেও, তাঁহারা প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় নীরব রহিয়া গেলেন। বহুমূল্য রত্নমাণিক্য শোভিত ছোট বড় দেবমূর্ত্তিগুলি আগ্রায় আনীত হইল। এবং মুসলমানেরা সেই গুলিকে পদদলিত করিবে বলিয়া নবাব কুদসিয়া বেগমের মসজিদের সোপানতলে প্রোথিত করা হইল।" আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, কতগুলি অখ্যাতনামা মূর্ত্তিকে তাঁহারা লইয়া গিয়াছিলেন। পূজারীরা পূর্ব্ব হইতে হিন্দুরাজগণের গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইয়া প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি গুলিকে গুপ্তভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপে প্রতিমা ভঙ্গ ও মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও তাঁহাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। মহামতি আকবর হিন্দুদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া যে সমৃদ্ধ মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। শিখ, রাজপুত, মহারাষ্ট্র সকলেই তাঁহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। ১৭০৭ খৃঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীরা গৃহ বিবাদে হীনবল হইয়া পড়েন।

আকবরের সময় হইতে শাজাহানের সময় পর্য্যন্ত, ভক্তগণের চেষ্টায় যে সকল দেবমূর্ত্তি স্থাপিত, এবং হিন্দু-রাজা দিগের অজস্র ব্যয়ে যে সমস্ত মন্দিরাদি বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সমস্তই আওরঙ্গজেবের উৎপীড়নে লোপ পাইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের পর তিন জন উত্তরাধিকারী,—বাহাদুর শাহ, জাহান্দীর শাহ ও ফারোকসিয়ার গৃহ বিবাদে অল্পকাল মধ্যেই জীবন লীলা শেষ করিলেন। ইহাদের পর মহম্মদ শাহ ১৭১৯-১৭৪৮ খৃ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সেনাপতি জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা সওয়াই জয়সিংহ ২য় ১৭২১ হইতে ১৭২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মথুরা মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই জয়সিংহ ২য়ের সময়ে ও তাঁহার অনুরোধে মহম্মদ শাহ বৃন্দাবন ও মথুরা প্রভৃতি স্থানে পুনরায় গোবিন্দ, গোপীনাথ, কেশবজী প্রভৃতি প্রতিনিধি (নূতন) বিগ্রহ গুলি স্থাপিত করিবার অনুমতি দেন। জয়সিংহ বৃন্দাবনে কয়েকটী পাষাণ রচিত মন্দির ও ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জয়সিংহ মথুরার কেল্লাটী মেরামত করাইয়া তন্মধ্যে একটী মান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বৃন্দাবনের দক্ষিণে ও মথুরার উত্তরে শিবির করিয়া থাকিত বলিয়া, সে স্থানকে আজিও জয়সিংহপুর বলা হয়। এই সময়ে জাঠেরা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। বদন সিংহ নামে একজন জাঠ সর্দ্দার তাঁহার ভ্রাতা চুরামনিকে বিতাড়িত করিয়া ভরতপুরের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মথুরা প্রদেশে আধিপত্য লাভ করেন। বদন সিংহের পুত্র সুরয মল বড়ই প্রতাপ-শালী যোদ্ধা ছিলেন। বদন সিংহ, সুরয মল ও তাঁহার ভ্রাতারা এবং ঐ বংশের রাণীরা পর্য্যন্ত বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানে অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জাঠ দিগের সময় পুনরায় হিন্দুরা দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে (১৭৩৭ খৃঃ) আমেদ শাহ দুরাণি কান্দাহার হইতে আসিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করেন। তাঁহার সেনাপতি সর্দ্দার জাহান খাঁ জাঠ দিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের কিছুই করিতে না পারিয়া তিনি মথুরা সহরের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা অধিবাসীকে হত্যা

করিয়া গেলেন। মথুরা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণ অনেক উপদ্রব করে দেখিয়া, কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ধনী অধিবাসী নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা প্রভৃতি দূর দেশে যাইয়া অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে বাস করিত। ১৭৬৮ খৃঃ শাহ আলম বাদশাদের উজীর নজফ খাঁর লোলুপ দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল ও সেই অট্টালিকাদি অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহার পর কিছুকাল মথুরা প্রদেশ সিন্ধিয়া ও তৎ পরে মহারাষ্ট্রদিগের অধীন হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃন্দাবনের চীরঘাটের উপর অহল্যা বাই একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর ১৮০৩ সালে ভরতপুরের রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া মথুরা মণ্ডল ইংরাজগণ দখলে আনেন।

১৮০৪-১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত মথুরা মণ্ডলে কোন গোলযোগ ঘটে নাই, লোক বেশ শান্তিতেই ছিল। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ১৮৫৭ সালে ৩০শে মে তারিখে যখন তথাকার ট্রেজারী হইতে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা গোশকটে করিয়া আগ্রায় পাঠান হইতেছিল তখন রক্ষী সিপাহীগণের মধ্যে হইতে একজন "হুঁসিয়ার সিপাহী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ একটী বন্দুকের গুলি আসিয়া অধিনায়ক লেপ্টনান্টকে চিরতরে ধরাশায়ী করিল। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীগণ কর্ত্তৃক সমস্ত ধন ভাণ্ডারই লুণ্ঠিত হইল। তার পর তাহারা দুইদিন ধরিয়া মথুরার আদালত গৃহ ও সরকারী দলিল পত্রাদি পোড়াইয়া দিল এবং জেলখানার কয়েদী দিগকে খালাস করিয়া দিয়া দিল্লীর দিকে চলিল। এই সময় হইতে মথুরার প্রধান ধনী শেঠ বংশীয় লছমিচাঁদ ও অপর কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া দেশবাসীদিগকে ও ইংরাজ দিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। কালেক্টর থর্ণহিল সাহেব মথুরায় আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন ; পরে আগ্রায় চলিয়া যান। ইহার পর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে বিদ্রোহীরা পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া এক সপ্তাহ কাল মথুরা নগরবাসীদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বৃন্দাবনের দিকেও অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু হীরা সিং নামে তাহাদের দলপতি এইটী দেবতাদিগের পবিত্র স্থান বলিয়া তাহাদিগকে ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়া রাখেন। ইহার পর অক্টোবর মাসে থর্ণহিল সাহেব আগ্রা হইতে সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্রোহী দিগকে একেবারে দমন করিয়া দিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং যাইয়া তথায় দরবার করেন এবং লছমী চাঁদ শেঠ এবং হাতরসের রাজা গোবিন্দ সিং প্রভৃতি যাঁহারা ইংরাজের সপক্ষতা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে যথোপোযুক্ত উপাধি, উপঢৌকন ও জায়গীর প্রভৃতি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

বৃথা গর্ব্ব

অভ্রভেদী বৃক্ষ কহে মাটীরে ডাকিয়া—
"পদতলে তুই মোর থাকিস্ পড়িয়া ;
নাহি তোর উচ্চ আশা, হীন তুই অতি,
উচ্চ আমি, তাই মোর উচ্চ দিকে গতি।"

হাসিয়া তখন মাটী বৃক্ষে ডাকি কয়—
"নীচ আমি, সত্য কথা, নাহিক সংশয়।
কিন্তু তবু, উচ্চগতি! রস টানি কার?
ভেবে কি দেখেছ বাছা, কভু একবার?"

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

অভিভাষণ *

সমাগত-প্রায় জীবন-সন্ধ্যায় নিজ আবাস গৃহের নিভৃত নেপথ্যে নীরবে বসিয়া যখন দিনাতিপাত করিতেছি, তখন একদিন অকস্মাৎ বিক্রমপুরের বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর নিকট হইতে আহ্বান আসিল—সেন, শূর ও পাল নরপালগণের কীর্ত্তিকলিত যে বিক্রমপুর, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত যে বিক্রমপুর, মহম্মদী বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার বঙ্গ বিজয়ের শতাধিক বর্ষ পর পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার প্রবল প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর বিশ্বরূপ ও কেশবের যে বিক্রমপুর, শত-সমর-বিজয়ী মানসিংহের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধস্পর্দ্ধী, দিল্লীশ্বরের তন্দ্রাভঙ্গকারী চাঁদ কেদারের যে বিক্রমপুর, বঙ্গবাসীর পক্ষে তীর্থসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র যে বিক্রমপুর, সেই বিক্রমপুর হইতে আহ্বান আসিল—আমাকে বিক্রমপুরবাসীর অনুষ্ঠিত বাণী-পূজার পৌরোহিত্য করিতে যাইতে হইবে। বিক্রমপুরবাসীর আহ্বানই যথেষ্ট, তদুপরি, আজ সমগ্র দেশের চিত্ত-রঞ্জন, চিত্তরঞ্জনের সস্নেহ আহ্বান আমার 'না' বলিবার পথ অবরুদ্ধ করিল ; তাহার উপরে বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু রমাপ্রসাদের প্রাহ্ন সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন নির্ব্বিশেষের নিয়ত আক্রমণ আমাকে গৃহে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

যে কার্য্যে আহূত হইয়াছি, জানি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ; যে উপযোগিতা থাকিলে তরুণেন্দু-কান্তিমতী, সিতসরোজ-সমাসীনা, বীণাবাদনপরা বাগ্দেবতার অর্চনায় কোন প্রকার ভার গ্রহণ করা যায়, তাদৃশ উপযোগিতা আমার কিছুই নাই ; যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এ ভার ন্যস্ত হইলে আপনাদের অভিপ্রেত কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারিত সন্দেহ নাই। যে পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, প্রফুল্লচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও আশুতোষ প্রভৃতি ভুবন-বিশ্রুত-কীর্ত্তি মনীষিবৃন্দ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত উচ্চপদ আমাকে গ্রহণ করিতে বলা আমার পক্ষে কি বিড়ম্বনা তাহা আমিই জানি, কিন্তু তথাপি আসিয়াছি কেন? আসিয়াছি—বিক্রমপুরবাসীর আদেশ অমান্য করিতে পারি নাই, চিত্তরঞ্জন ও রমাপ্রসাদের ন্যায় বান্ধবজনের স্নেহের আহ্বান আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তদুপরি গয়া গঙ্গা, বারাণসী বৃন্দাবন, অযোধ্যা পুষ্কর, সেতুবন্ধ কন্যাকুমারীর ন্যায় বঙ্গবাসীর নিকট পরম পুণ্যতীর্থ সদৃশ বিক্রমপুর দেখিবার এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারি নাই। আপনাদিগের অনুষ্ঠিত বাণী-পূজা আপনারাই নিষ্পন্ন করিবেন ; বারি আহরণ, মন্দির মার্জ্জন, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি দেবী পূজার সমগ্র আয়োজন আপনারাই করিবেন, "নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্" বলিয়া আমাকে ডাকিয়াছেন মাত্র—তদুপরি সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখায় সকল-গুণ-সম্পন্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সকল কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে—আমি কেবল এই মহা মহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ-কণিকা লাভ করিব এই ভরসায় আসিয়াছি। আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে স্খলন পতন ত্রুটি বিচ্যুতি যথেষ্টই থাকিবে। তবে যে অহৈতুকী প্রীতিবশে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই প্রীতিবশেই আমার কৃত এবং অকৃত কর্ম্মের দোষের জন্য আমি মার্জ্জনা পাইব সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। অযোগ্যের উপরে যাঁহারা গুরুভার অর্পণ করেন, দায়ীত্ব তাঁহাদেরই,—অকিঞ্চনের সে ভরসাও কম ভরসা নহে।

ইতিহাস-বিশ্রুত বিক্রমপুরের সর্ব্ববিধ গৌরবের কাহিনী একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না ; সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র নরপাল পাল-ভূপালগণের সময় হইতে এই বিক্রমপুর গৌরবান্বিত। এই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ভারতে এবং

* ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর মূল সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

ভারতের বাহিরে যশের যে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এই বিক্রমপুরকেই চিরধন্য করিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধযুগের ধর্ম্ম ও বিদ্যাপীঠ জগতে অদ্বিতীয় 'বিক্রমশীলা'—সেই বিক্রমশীলায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এই বিক্রমপুরেরই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। জ্ঞানময় শ্রীজ্ঞানকে যখন চিরতুষারাবৃত তিব্বত দেশে মহা সমারোহে লইয়া যায়, তখন যে সমাদর যে সম্মানের সহিত তাঁহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হয় তাহা শুনিয়াছি নাকি কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী মহারাজার ভাগ্যেও ঘটে নাই, এবং আজও পর্য্যন্ত শ্রীজ্ঞানের নামোচ্চারণ মাত্র তিব্বতের অধিবাসিবৃন্দ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত দীপঙ্করের উদ্দেশে যোড়করে হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি অবনত মস্তকে উর্দ্ধে প্রেরণ করিয়া থাকে। এ গৌরব, সমগ্র গৌড় বঙ্গের কিংবা ভারতের হইলেও বিক্রমপুরেরই নিজস্ব সামগ্রী।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়ের গৌরবময় সিংহাসনে সমাধিষ্ঠিত,যখন বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্ন পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়া লক্ষ্মণের রাজ-সভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, শরণ, গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ রূপে বিরাজিত, তদানীন্তন ও তৎপরবর্ত্তী কালের একাধিক তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই বিক্রমপুরে লক্ষ্মণের জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ের রাজগৌরব এ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত না থাকিলে জয়স্কন্ধাবার স্থাপনের সার্থকতা থাকে না। এই জয়স্কন্ধাবার হইতেই মহারাজ-চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণসেন বিভিন্ন গোত্রীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করিয়া ব্রাহ্মণত্বের ও পাণ্ডিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেব, ভোজ বর্ম্মা হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনও এই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে সম্পাদিত। এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, লক্ষ্মণাবতীর মহা গৌরবান্বিত রাজছত্রের ছায়াতলে বিক্রমপুরের গৌরব এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, কালের সর্ব্বধ্বংসী স্থূল হস্তাবক্ষেপও বিক্রমপুরের সে প্রাচীন গরিমা আজও একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। আবার কৌমারে কলিঙ্গবিজয় গর্ব্বী, সত্যব্রত শান্তনু নন্দনের ন্যায় শর-ক্ষেপপটু, মহাবল পরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী নরপাল লক্ষ্মণের অবসানে মোসলেম বীর মহম্মদী বক্তিয়ার যখন উদ্দণ্ড-পুরের বিহারস্থিত গ্রন্থরাশি ভস্মে পরিণত করিয়াছিল, লক্ষ্মণাবতীর সিংহদ্বার যখন স্বল্পায়াসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তখন লক্ষ্মণের বংশধর বিশ্বরূপ, কেশব প্রভৃতি বীরাগ্রগণ্য মহাপুরুষগণ স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া যে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন উহা এই বিক্রমপুরেরই পুণ্যময় পবিত্র ভূমি। শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে বিহার ও বঙ্গের বহু জনপদ মোস্‌লেমের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার নিম্নে মস্তক অবনত করিয়াছে, কিন্তু শীতলাক্ষ্যা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও পদ্মা পরিবেষ্টিত এই বিক্রমপুর তাহার গর্ব্বিত মস্তক অবনমিত করে নাই; চতুর্দ্দিকে বিপুলকায় যে সকল নদ-নদী এই পুণ্যভূমিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের উত্তাল তরঙ্গ ও উন্নত স্রোতোবেগ উল্লঙ্ঘন করিয়া যবন সৈন্য ইহার সীমান্তেও উপস্থিত হইতে পারে নাই।

আবার সে আর একদিন ছিল, যে দিনে বঙ্গের জমীদার বারভৌমিকগণ তাঁহাদের বিপুল বলদৃপ্ত হস্তে শাণিত অসির মণিময় মুষ্টি ধারণ করিতেন, সে দিনে এই শ্রীপুর বিক্রমপুরের চাঁদ কেদার দিল্লীর মোগল সম্রাটের মুকুটমণি আকবর ও জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। "নহ্যমূলাজনশ্রুতিঃ" এই সংস্কৃত প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। যদিও জনপ্রবাদের সহিত অনেক পত্র-পুষ্প-পল্লব সংযোজিত হয় বটে, তথাপি অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। চাঁদ কেদারের বিষয়ে অনেক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, বংশপরম্পরায় সেই সকল গল্প অনেক শাখা-পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সত্য পাওয়া যায় না এ কথা বলিতে হইলে অতি বড় দুঃসাহসের প্রয়োজন। কিম্বদন্তী বলিয়া থাকে যে, যখন মহারাজ মানসিংহ বাদশাহ কর্ত্তৃক কেদারের বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হন,

তখন কেদার "তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ" বলিয়া মানসিংহের গর্ব্বিত বচনের উত্তর দিয়াছিলেন; জনশ্রুতি আরও বলিয়া থাকে যে, মানসিংহ ও কেদারের দ্বৈরথ সমরে বঙ্গবীর কেদারের অসির আঘাতে রাজপুত-কেশরী রাজা মানের হস্তধৃত তরবারি স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়; ইচ্ছা করিলে কেদার তন্মুহূর্ত্তে মানের জীবলীলার অবসান করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বীরোচিত প্রথানুসারে বঙ্গের কেদার রাজপুত-বীরকে পুনরায় অসি লইবার অবসর দিবার জন্য দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এ সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসে ইহার স্থান না হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতির মূল অনুসন্ধান করিলে অন্ততঃ এটুকু সত্য বাহির হইবে যে, দিল্লীশ্বর আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রোষরক্ত লোচনের ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া, কিংবা কাবুল কান্দাহারের বিদ্রোহদমনকারী, হলদিঘাটের সমরবিজয়ী রাজা মানের অসি-ফলকের দীপ্তি দেখিয়া বিক্রমপুরস্থিত শ্রীপুর-নিবাসী বাঙ্গালী বীর কেদার ভীত হইয়া দন্তে তৃণ করে নাই বা গলদেশে কুঠার বাঁধিয়া রাজপুত বীর মানের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ বাঙ্গলার বীরত্বাভিমানকে পদ্মার স্রোতে ভাসাইয়া দেয় নাই।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় বসিয়া বাণী-নিকুঞ্জের কলকণ্ঠ পিক ভক্তশিরোমণি জয়দেব, যখন "মেঘৈ র্মেদুর" বলিয়া সজল-জলদ গম্ভীর কণ্ঠে শ্লোকাবৃত্তি করিতেন, কিংবা কোমল মলয় সমীরান্দোলিত, কোকিলকূজিত লবঙ্গ-লতিকার কুঞ্জকুটীরে রাধামাধবের মিলন-সঙ্গীত মধুর স্বরে গান করিতেন, পবন দেবকে দূত কল্পনা করিয়া অশরীর প্রেমবেদনা মানবের নিকট নিবেদন করাইবার জন্য ধোয়ী কবি যখন তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী অমর লেখনী ধারণ করিতেন, কিংবা প্রশস্তিকার উমাপতি যখন প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের উচ্চ চূড়াকে দিনদেবতার মধ্যাহ্ন বিশ্রামের স্থান রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রণত বিন্ধ্যকে তাহার তুঙ্গশির ঊর্দ্ধে তুলিতে বলিয়াছিলেন, তখন বঙ্গের কি এক আনন্দময় গৌরবের দিনই গিয়াছে! বিলয় অভ্যুদয়, উত্থান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম—লক্ষ্মণের রাজসিংহাসন-ছায়াতলে যে সাহিত্য-তরু জন্মলাভ করিয়া পত্র-পুষ্প-কিশলয়ে শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল, বঙ্গের সংস্কৃত কাব্যের গৌরবের উহাই বোধ হয় শেষ দিন। তাহার পরে ন্যায় দর্শনাদির চর্চ্চায় বঙ্গ গৌরবান্বিত হইয়াছে, কিন্তু কাব্য রচনায় সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার যশোলাভ তাহার পরে বোধ করি আর হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষা সাধারণের ভাষা নহে, সমাজের স্তর-বিশেষের কতিপয় ব্যক্তি যাহার অনুশীলনে আনন্দলাভ করিত, সে ভাষা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না, সেই জন্য একদিন শিব সিংহের সিংহাসনতলে বসিয়া বিদ্যাপতি এক সুপ্রভাতে কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন "গেলি কামিনী গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি" অমনি শ্রোতৃবর্গ আনন্দে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

যে ভাষা জন্মমুহূর্ত্ত হইতে নিয়ত কর্ণরন্ধ্রে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা শুনিতে শুনিতে শিশু তাহার কোমল জিহ্বায় তাহারই প্রতিধ্বনি করিবার জন্য পিঞ্জরস্থ বিহঙ্গের ন্যায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে, মাতৃকণ্ঠে যে ভাষা অকারণে অসীম স্নেহবেগে অর্থহীন সমাদর-বাণী রূপে নিয়ত উচ্ছলিত হইয়া শিশুর কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে থাকে, জাতীয় সাহিত্যের ভাষা, প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার একমাত্র ভাষা উহাই—ইহা প্রমাণ করিতে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিগণের সমুদ্রতুল্য পদাবলী ও গীতিকাব্য প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য পুরাণেতিহাস, এমন কি দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিও যেমন কবিতা-বহুল, জয়দেবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্যও তেমনি কবিতা-বহুল, সমসাময়িক গদ্য সাহিত্য একরূপ নাই বলিলেও হয়। বঙ্গে মুসলমান অধিকার কালে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা হইয়াছে, গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি কল্পে প্রয়াস হইয়াছে এবং

তাহাতে একেবারে ফল ফলে নাই এ কথা বলা যায় না। তাহার পরে যে বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্য সৃজনের চেষ্টা তাহা প্রয়োজন উপলক্ষে। নবাগত ইংরাজ রাজপুরুষ দিগকে কাজ চালাইবার মত বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদিগের উপরে ভার পড়িল বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিবার। যাঁহারা সে ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। সে দিনে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ বঙ্গ সরস্বতীর চরণারবিন্দে সভক্তি দৃষ্টিপাত করিতেন না, বরং কৃপা-পাত্রীজ্ঞানে মুষ্টিভিক্ষা দানের জন্য অবহেলার কর প্রসারণ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে সংস্কৃত সরস্বতীর মণিময় মন্দিরের স্বর্ণ প্রাঙ্গণে বসিয়া মহোৎসবের কণিকামাত্র প্রসাদ পাইলেই বঙ্গসারস্বতলক্ষ্মী ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবেন। সেই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের সুরম্য হর্ম্যাপ্রাঙ্গণে বঙ্গসরস্বতীর পর্ণকুটীর প্রস্তুত হইল এবং বহুল সমাস-খচিত স্থূল অবগুণ্ঠনে সরলা বঙ্গবাণীর আবক্ষ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। বাঙ্গলায় গ্রন্থরচনা তাঁহাদের পক্ষে অগৌরবের কথা, সেই জন্য তাঁহারা কায়ক্লেশে কেবলমাত্র সংস্কৃতের বিভক্তিগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া সমাসবহুল শব্দ গাঁথিয়া বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিতেন। ফলে হইল, যাঁহাদের শিক্ষার জন্য গ্রন্থ, তাঁহারা কিছুই শিখিলেন না, এবং সে সকল গ্রন্থ পাঠে বাঙ্গালীর হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের সমাসবহুল সংস্কৃতপ্রায় গদ্য, অপরদিকে কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতির ফিরিঙ্গী বাঙ্গলা। গদ্য সৃষ্টির চেষ্টায় সৃজিত হইল 'গদ'; যদি গদ শব্দের অর্থ পীড়া হয় তাহা হইলে যথার্থই পীড়া-দায়ক হইয়াই বাঙ্গলার এই গদ্যসাহিত্য প্রথম দেখা দিল।

তাহার কিছুকাল পরে এই বাঙ্গালা দেশের সহিত যখন ইংরাজি সাহিত্যের পরিচয় হইল, যখন ইউরোপীয় কাব্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের সহিত বঙ্গদেশ পরিচিত হইল, ক্ষণজন্মা রামমোহন, বিদ্যাসাগর যখন গদ্যের সেই গলিপথ প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ চেষ্টাকে নিয়োজিত করিলেন, তখন বঙ্গীয় জনের আশা আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াই চলিল, তখন গদার নাচাড়ী আর আমাদিগকে নাচাইতে পারিল না, তখন "গুলে বকাউলী"র তরজমায় আর আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল না। তখন, কি চাই তাহা জানি না, কিন্তু যাহা পাইয়াছি বা পাইতেছি তাহাতে তৃপ্তি হয় না —এমন দিনে, কারণাধীনে মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী আসিয়া দেখা দিল। তখন একদিকে কৃষ্ণগৃহীতমানসা ব্রজাঙ্গনার প্রাণের বেদনা এবং বীরাঙ্গনার প্রিয় সম্মিলনের একান্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে মেঘনাদের রণতূর্য্যের গভীর নাদ।

বাঙ্গলার হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত হইল বটে, কিন্তু তখনও শূন্য রহিয়াছে, তখনও প্রার্থিত কাম্যবস্তু পাই নাই, তখনও চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষায় বঙ্গবাসীর হৃদয়-সমুদ্র অন্তরে অন্তরে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয়ে উদ্বেলিত হইয়া কূল ছাপাইয়া সৈকতভূমি প্লাবিত করে নাই, এমন দিনে বঙ্গের বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কোটালের বান যেমন কূল পরিপ্লাবিত করিয়া প্রধাবিত হয়, তেমনি বঙ্গের নরনারী, আবাল বৃদ্ধবনিতা, আশা আকাঙ্ক্ষায় আনন্দে উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিল। মন্দার-সাহায্যে মহাসিন্ধু মন্থনের পর যেমন একদিন ধন্বন্তরির হস্তে সুধাভাণ্ড দেখিয়া সুরলোকে আনন্দ কোলাহল উঠিয়াছিল, তেমনি বঙ্কিমের কল্পনাসাগর-মথিতা 'কুন্দ', 'কপালিনী', 'আয়েষা' ও 'তিলোত্তমা'কে দেখিয়া সাহিত্যরসপিপাসু বঙ্গীয় জনের মধ্যে আনন্দকলরোল উঠিয়া পড়িল—সকলে অধীর হইয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, ব্যাকুল হইয়া "বঙ্গদর্শনের" পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-বিমুক্ত ইউরোপীয় স্বাধীন জাতিসমূহের সাহিত্য দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞানের আস্বাদ লাভ করিয়া সে দিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু স্বগৃহের দৈন্য অন্তরকে পীড়া দান করিত। অক্ষমের, আশাহীনের যে বেদনা, সেই বেদনায় আমরা নিয়ত পীড়িত হইতেছিলাম। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার বিমল রশ্মিপাতে

অন্ধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল, নিজের গৃহকোণের উপেক্ষিতা সারস্বতলক্ষ্মীর অনুপম রূপলাবণ্যময়ী অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিল, সে দিনের তাহার আনন্দকে সে কি হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে? সে জানিত তাহার দীনা, পরমুখাপেক্ষিণী বঙ্গবাণী চিরদিন পরের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা পাইবার আশায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়াইবে; অকস্মাৎ দেখিতে পাইল তাহা সত্য নহে, আমাদের চির উপেক্ষিতা বঙ্গবাণী ভিখারিণী নহেন, তাঁহার মূর্ত্তি বরাভয়দাত্রী রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি, তাঁহার সারস্বত নিকুঞ্জে মন্দার, পারিজাত ও হরিচন্দনের অপরূপ কুসুম-নিচয় প্রস্ফুটিত হইতে পারে, তাঁহার মানস সরোবরের সুবিমল সলিলে সহস্রারবিন্দ বিকশিত হইয়া দিগ্‌ দিগন্ত আমোদিত করিতে পারে। এতদিন বঙ্গবাসী কুরুক্ষেত্রের মহাসমরশায়ী পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় শরশয্যায় পড়িয়া দারুণ পিপাসায় নিরতিশয় কাতর ছিল, অর্জ্জুনের বাহুবল নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে পাতালস্থা ভোগবতী ধারা যেমন পিতামহের তৃষিত কণ্ঠে নিপতিত হইয়া তাঁহার তৃষ্ণা বিদূরিত করিয়াছিল, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার বলে সমানীত সাহিত্যমন্দাকিনীর সুবিমল রসধারা তৃষাতুর বঙ্গবাসীর চিরতৃষ্ণা নিবারণ করিল। বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিল যে অন্যপথে নানাদিক হইতে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের সম্মুখ-গতিকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতে পারে, কিন্তু এই সাহিত্যের পথেই তাহাদিগকে নিরাময় মুক্তিলাভ করিতে হইবে, এই সাহিত্যের পথেই অগ্রসর হইয়া একদিন তাহারা জগতের সভ্য সমাজে ঈপ্সিত বরণীয় আসন লাভ করিতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও বোধ করি সে আশা ছিল, সেই জন্য তাঁহার কথাসাহিত্যের মধ্যে পুরাণেতিহাস, ধর্ম্ম কর্ম্ম কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বলে, বীর্য্যে, শৌর্য্যে, ভাস্কর্য্যে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের কোথায় কি গৌরব ছিল তাহা সে দিনে যতদূর জানিবার উপায় ছিল, সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করতঃ তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং যে সাহিত্যের তিনি জন্মদাতা তাহাকে একদিন জগতের সাহিত্য সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে হইবে জানিয়া তাহাকে তিনি নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্যদানে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন এবং জগৎ সভায় বসিবার উপযোগী যে সকল মণিময় আভরণ প্রয়োজন তাহাও যোগাইয়াছেন,—অঙ্গদ, কুণ্ডল, কেয়ূর বলয় কিছুরই অভাব রাখিয়া যান নাই।

জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে হইলে, সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, তাহারই সহায়তায় জগতের সুসভ্য বরেণ্য জাতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে হইলে সাহিত্যের উপকরণরাজি স্বদেশ হইতেই আহরণ করিতে হইবে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি অ র রাজকুমারকে মান্দারণে আনিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শশি শেখরের দৌহিত্রী তিলোত্তমার সহিত চারি চক্ষুর মিলন করিয়া দিয়াছেন; নিতান্তই বাঙ্গালী হরবল্লভের পুত্রবধূ নিরন্ন প্রফুল্লকে রাণী সাজাইয়া গুম্ফশ্মশ্রুহীন ভবানী পাঠক এবং চোগোপ্পাধারী রঙ্গরাজের উপর হুকুম চালাইবার অধিকার দিয়াছেন, পুণ্যতোয় অজয়তীরে জীবানন্দ ভবানন্দকে অগ্নি উদ্গিরণকারী ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন, দ্বাদশ ভৌমিকের একতম, বঙ্গবীর সীতারামের সমর নৈপুণ্য বঙ্গবাসীর চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

জাতির দুঃখ দুর্দ্দিনে, ঘটনাচক্রে, চতুর্দ্দিক হইতে ঘাত প্রতিঘাতে মানবের অন্তর বাহিরের সমস্ত শক্তি যখন প্রতিহত, সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তখন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকারে সমস্ত ঢাকিয়া যায়। সে সময়ে সাহিত্য গঠন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া আত্মশক্তি বিকাশ করতঃ সর্ব্ববিধ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়, আবার কোন কারণে সেই অন্ধকারের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেলে আশা আকাঙ্ক্ষার নবোদিত অরুণ রশ্মিরেখার দর্শন লাভ হয়। যখন মুসলমান শক্তি-সবিতা অস্তমিত প্রায়, ইংরাজ রাজশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বঙ্গবাসীর সমস্ত শক্তি প্রতিপদে ক্ষুব্ধ, সংহত, সঙ্কুচিত হইতেছিল, রজনীর অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় তখন বাঙ্গালাদেশ মূক

মূক ও নীরব। উন্নতিশীল স্বাধীন দেশের নব নব ভাবসমৃদ্ধির সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইল, আনন্দে আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, প্রথম অরুণোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বঙ্গ-সরস্বতীর সাহিত্য-বনবৈতালিক মধুকণ্ঠপিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরলহরী পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল এবং বঙ্গসারস্বত নিকুঞ্জের কলবিহঙ্গের দল সমুদিত উষার রক্তিমরাগ দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের আনন্দ কাকলীর মধু সঙ্গীতে বঙ্গের দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করিয়া দিল।

যে বঙ্গসাহিত্য জগৎ সাহিত্য সভায় একদিন চক্রবর্ত্তীর আসন গ্রহণ করিবে, যে সাহিত্যের আনন্দময় মঙ্গলালোক একদিন কেবল বঙ্গ নহে, ভারত নহে, ভূলোকের সর্ব্বত্র আলোকোদ্ভাসিত করিবে, যে সাহিত্যের মহতী শক্তি একদিন বঙ্গবাসীর সকল দৈন্য দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিয়া তাহাকে শৌর্য্যে বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে জগতের বরেণ্য করিয়া তুলিবে, সেই সাহিত্যের ধাত্রীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে তাহার শৈশব ও কৈশোর পার করিয়া দিয়া যৌবনের প্রথম সীমারেখায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন।

সমাগতপ্রায় যৌবনের ওজোদীপ্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে যখন লাবণ্যবিস্তার করিবার উদ্যম করিতেছে, সেই বয়ঃসন্ধির মুহূর্ত্তে তাহার অভিভাবকের গুরুকর্ত্তব্যভার পড়িল, আজ যিনি জগদ্‌বরেণ্য ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহারই উপরে। তিনি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্য-নিকুঞ্জে বসন্ত সমাগমের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, সেই সারস্বতকুঞ্জের প্রত্যেক ব্রততী বল্লরী যাহাতে নিরুপম কুসুম সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে তৎপ্রতি তাঁহার চিরজাগ্রত দৃষ্টিকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিশোর সাহিত্যের সমাগতপ্রায় যৌবনের আনন্দ সংবাদ দিয়াই তাঁহার কার্য্য সমাধা হয় নাই, তাঁহার মানস-খনিসঞ্জাত মহার্ঘ রত্নরাজিখচিত কিরীট, কুণ্ডল, কণ্ঠহার প্রভৃতি রাজসম্ভ্রমোচিত অমূল্য অলঙ্কারে তাহার সর্ব্বাবয়ব ভূষিত করিয়া তাহাকে বিশ্বসাহিত্য সভায় সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার যাদুকরী কল্পনাকে দেশ দেশান্তরের সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া স্বীয় সাহিত্যের রাজবেশ প্রস্তুত করিতে হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন অপরের নিকট ঋণদ্বারা প্রাপ্ত ভূষণ দৈন্যেরই পরিচায়ক, তাহাতে আত্মশক্তির বিকাশ হইবে না এবং তাহা না হইলে সর্ব্বপ্রকার মানসিক বন্ধন মোচন হইবে না, সাহিত্যের শক্তিপ্রভাবে বঙ্গবাসী মুক্তির আনন্দ পাইবে না, তাই তিনি বাঙ্গলার ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেখান হইতেই উপাদান আহরণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন; বাঙ্গলার ঘনচ্ছায়া সমন্বিত পল্লীভবনে সুস্নিগ্ধ চূতনিকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসিয়া পরভৃত কেমন করিয়া তাহার মধু-কণ্ঠের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়, নিদাঘের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে কাষায়বাস পরিহিত তাপসের ন্যায় বৈশাখের তাম্রমূর্ত্তি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কি সৌন্দর্য্য উপস্থিত করে, হেমন্তের রৌদ্র, পীত, হিরণ্য অঞ্চলাচ্ছাদিতা উদাসিনী বসুন্ধরার অপরাহ্ণ ছবি আমাদের অন্তরকে কেমন করিয়া ঔদাস্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, তৎসমুদয়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুহকী কল্পনা প্রভাবে আমাদের নয়নসম্মুখে ধরিয়াছেন।

সুরসভাতলে নৃত্যপরায়ণা উর্ব্বশীর নৃত্যচ্ছন্দের তালে তালে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ কেমন করিয়া উচ্ছ্বসিত হয়, মলয় সম্পৃক্ত মন্দমারুতের মৃদুহিল্লোলে হরিৎ শস্যক্ষেত্রের শীর্ষ কেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে, সান্ধ্যসমীর স্পর্শে স্বচ্ছতোয়া "গুস্তার" বারিরাশি অপ্সরীর কেশদামের ন্যায় কেমন করিয়া কুঞ্চিত হয়, কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কল্পনা প্রভাবে সে সমুদয়ও আমরা যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাই।

যে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান কান্তি পুষ্টি ও শ্রীসৌন্দর্য্য লইয়া আমরা বিশ্ব-সাহিত্য সভায় গর্ব্ব করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি মনে করি, বাঙ্গলার সে [illegible] সাহিত্য কতকাল হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন। সমস্ত পদার্থই যেমন বিবর্ত্তন নীতির বলে ক্রম

বিকাশ লাভ করে; সাহিত্যেও তাহা না হইবার কথা নহে। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে মনে হয় যে আমাদের বাঙ্গালা [illegible] সাহিত্য বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্তরে স্তরে উঠিয়া আজ এই শ্রীসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াছে। ইহার প্রথম স্তরকে শূন্য পুরাণের স্তর বলা যাইতে পারে, কারণ শুনিতে পাই যে শূন্য পুরাণ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। তাহার পরে কিছু সময় গিয়াছে কিনা এবং আর কিছু রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। পরে শ্রীরূপ গোস্বামীর "কারিকা," কৃষ্ণদাসের "রাগ মণিমালা", ক্রমে ক্রমে "বৃন্দাবন লীলা," "শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা" প্রভৃতি রচিত হয়। সে সময়ে বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, উহা লালিত্যহীন, নীরস সাহিত্য ছিল। তৎপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার ইংরাজগণ বঙ্গভাষার অঙ্গ পরিপুষ্টির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন—কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরাজগণ যে বাঙ্গলা ভাষা প্রস্তুত করিলেন তাহা হইল খৃষ্টানী বাঙ্গলা। সে ভাষা বঙ্গবাসীর নিকট আদর পাইল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয়গণ যাহা রচনা করিলেন তাহা হইল পণ্ডিতী বাঙ্গলা, সে ভাষাও পণ্ডিত মহাশয়গণের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ দিগের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল, পাঠক সাধারণ তাহার সমাদর করিল না। পণ্ডিতী বাঙ্গলায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য এবং খৃষ্টানী বাঙ্গলা উর্দ্দু বহুল হইয়া বঙ্গবাসীর নিকট উহা প্রায় অপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের আট বৎসর মাত্র পরে "বেটো" সাহেবের "প্রশ্নোত্তরমালা" বোধ করি বঙ্গে ইংরেজাধিকারের পর প্রথম বাঙ্গলা গ্রন্থ। পণ্ডিত মহাশয়গণ যাহা রচনা করিলেন সেগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ "হিতোপদেশ," "পুরুষ পরীক্ষা," "প্রবোধ চন্দ্রিকা" প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে; মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতির গদ্য সাহিত্য, সুধী সমাজে সুপরিচিত।

ইহাকে যদি বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের প্রথম স্তর বলা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় স্তর যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহনের যুগে। যদিও এই যুগকে অনুবাদের যুগ এক হিসাবে বলা যাইতে পারে, তথাপি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গবাসী মুক্তির যে প্রথম রবিরশ্মি-রেখা দেখিতে পাইয়াছিল, রামমোহনই সে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যে আশা আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য বাঙ্গালী আজ সাহিত্যকেই আশ্রয় করিয়াছে, এই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যই সে আশার প্রদীপ প্রথম প্রজ্জ্বালিত করে। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই খৃষ্টানী বাঙ্গালার জন্ম, এই শতাব্দীতেই পণ্ডিতী বাঙ্গালার অভ্যুদয়, এই শতাব্দীতেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, আবার এই শতাব্দীতেই "বঙ্গীয় সাহিত্য সভা" পত্রিকার জন্ম হয়। আজ আমরা প্রতিদিন, আমাদের বাঙ্গালা দেশে অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা সাগরের জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতিদিন জন্মিতে ও কালের সর্ব্বগ্রাসী গর্ভে বিলীন হইতে দেখিতেছি, কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতেই ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়লাভ হয়, এই সকল কারণে এই উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গসাহিত্য-ইতিহাসে এক বরণীয় যুগ।

যে মহাপুরুষ শিশুশিক্ষার জন্য "বর্ণ পরিচয়" হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়ের বহু গ্রন্থ রচনা করতঃ বঙ্গবাসীকে শব্দশক্তির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের যুগই বঙ্গ সাহিত্যের তৃতীয় স্তরের যুগ বলা যাইতে পারে, এই যুগে ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার, ভূদেব প্রমুখ মনস্বিগণ কেবল যে বঙ্গবাসীর সম্মুখে এক শক্তিময়ী ভাষার মূর্ত্তিকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, বঙ্গবাসীর চিন্তাস্রোতকে নানাপথে পরিচালিত করিয়া এক মহৎ ও বৃহৎ বাঙ্গালী জাতি গঠন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন।

যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি ভাষার বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল অংশেই পতিত হইয়াছে। তিনি রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী লইয়া যেমন "সীতার বনবাস," "শকুন্তলা" প্রভৃতি সে কালের উপাদেয় গ্রন্থনিচয় রচনা

য়া গিয়াছেন, তেমনি বিরাম, বিস্ময়, প্রশ্ন প্রভৃতি চিহ্নের প্রবর্ত্তনও বাঙ্গলায় তিনিই করিয়া গিয়াছেন, করি তৎপূর্ব্বে সংস্কৃতের অনুকরণে পয়ারাদি ছন্দের পরে ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ ব্যতীত গদ্য রচনায় কোন ব্যবহার ছিল না, অন্ততঃ ছিল বলিয়া আমার নাই।

যে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই মনে করিত যে বার মত কিছু লিখিতে হইলে, তাহা ইংরাজীতে তে হইবে, সেই যুগে, যে যুগে শিক্ষিত বঙ্গবাসী র অন্ধকার মাতৃ-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকল সৌভাগ্যের জন্য সাগর পারের দিকেই তাহার গ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিত, সেই যুগে বাঙ্গালীর মের আবির্ভাব হইল। সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত, বঙ্গের গুরু দেখাইয়াছিলেন যে বঙ্গবাণীর হস্তস্থিত বীণা, নন্দে হাসে, বেদনায় কাঁদে, সে বীণার তন্ত্রীতে , দ্বেষ, হিংসা ফুটিয়া উঠে, তাহার তন্ত্রীর ঝঙ্কারে , ঘৃণা, সঙ্কোচ, অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি সমস্তই মূর্ত্তি গ্রহ করে। বঙ্কিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব তে জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল বাঙ্গালার গদ্য ন্ পথ অবলম্বন করিবে; বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অনু- করিবে, না "টেকচাঁদি" ছাঁদে উহাকে গঠিত করিতে বে? ইহার মীমাংসা তখনও হয় নাই, বিদ্বজ্জন সমাজে জটিল প্রশ্ন লইয়া বাদ-বিসম্বাদ তখনও চলিতেছে, সময়ে এক শুভ-মুহূর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক তিভালোকে বঙ্গবাসী বঙ্গবাণীর এক অভূতপূর্ব্ব মহিম- ত মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ রতীর বরাভয়দাত্রী কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখাইলেন , কিন্তু তাঁহার সময়ের সে জটিল প্রশ্নের আজিও ন্ত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ জটিল স্যার মীমাংসা করিতে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না; াহার ফলে দাঁড়াইয়াছে যে বঙ্গ সাহিত্যে দুইটি পৃথক চনা-রীতি এক সঙ্গে চলিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে পরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ "বীরবল" যে রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত রিয়াছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে অধুনা যে রীতির কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়, বঙ্গের অনেক যশস্বী সাহিত্যিক সেই রীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেছেন; আবার অন্য একশ্রেণীর ক্ষমতাশালী লেখক কথ্য ও লেখ্য ভাষাকে পৃথক রাখিয়া প্রতিদিন বঙ্গ-বাণীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন; ইহার কোন পথ অবলম্বন করিলে, সাহিত্য লোক-মনোমোহিনী ও শক্তি-শালিনী হইবে, কিসে সাহিত্যের মর্য্যাদা সম্যক রক্ষিত ও দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমার মনে হয় তাহার একমাত্র বিচারক কাল, কালই ইহার মীমাংসা করিতে সমর্থ এবং হয়ত কালই তাহা করিবে। তবে এই সমবেত বিদ্বজ্জনসঙ্ঘের সম্মুখে সভয়ে, সসঙ্কোচে আমি এই মাত্র নিবেদন করিতে চাহি যে, বাঙ্গলার সাহিত্য স্থান বিশেষ বা স্থান বিশেষের কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের জন্য নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গের সামগ্রী; কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে থাকিলে সকল স্থানের, সকল লোকের পক্ষে তাহা বোধ্য হইবে কিনা ইহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা, কলিকাতার কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত বলিয়া এক দাবী উপস্থিত করা যাইতে পারিলেও, উহা বিচারসহ কি না তাহাও আপনাদের এই সম্মিলনের বিবেচনার অধীনে আনা উচিত কি অনুচিত সে কথার মীমাংসা আপনারাই করিবেন।

ধর্ম্ম যেমন জাতিকে এক সূত্রে বন্ধন করে, সাহিত্য দ্বারাও সেই কার্য্য সাধিত হয়। সেই কারণে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষমতা, ধর্ম্মের ক্ষমতা অপেক্ষা কম নহে। সাহিত্যই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতির একমাত্র মহামিলন-ক্ষেত্র। এক অখণ্ড, দুশ্ছেদ্য বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর আছে কিনা আমি জানি না। তাই মনে হয় লেখ্য ভাষা, কথ্য ভাষা হইতে পৃথক না হইলে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠিত করিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিবে। নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির ভাষার গতি কিরূপ হইবে, তাহার সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত, বর্দ্ধিত, মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া বাঙ্গালীর কাম্য ফল তাহাকে দান

করিবে, সাহিত্যের শক্তি সহায়ে বিশ্বের সকলের সহিত বাঙ্গালী একাসনে কেমন করিয়া বসিতে পারিবে, সে বিচারের ভার আপনাদের উপরে, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল সাহিত্য-সম্মিলন; আশা করি এই সমবেত সজ্জন মণ্ডলীর সুপরামর্শে বঙ্গ-সাহিত্য তাহার উপযুক্ত রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে—যে সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া এক বাঙ্গালী আর এক বাঙ্গালীকে ভাই বলিয়া ডাকিবে, যে সাহিত্য সমাজ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বৈষম্য বিদূরিত করিয়া দিয়া এক জ্যোতিষ্ময় ঐক্য সূত্রে হৃদয়ের সহিত হৃদয়কে গাঁথিয়া দিবে, যে সাহিত্য সমগ্র বঙ্গবাসীকে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক সাধনার পথে ধাবিত করিবে, যে সাহিত্য বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের চিত্র চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া ধরিবে, ভবিষ্যতে যে সাহিত্য বঙ্গবাসীকে সর্ব্ব-প্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে তাহার সমস্ত যুগযুগান্ত-ব্যাপী চেষ্টা, প্রয়াস ও উদ্যমকে ধন্য, সার্থক ও কৃতকৃতার্থ করিয়া দিবে।

বঙ্গগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও জয়দেবের সমালোচনা সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাঙ্গলা সাহিত্যের আর যত কিছু দুঃখই থাকুক, গীতি-কাব্যের অভাব নাই। অন্যান্য কবিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক বৈষ্ণব কবিদিগের গীতি কাব্যই সমুদ্র বিশেষ। জগতের সমস্ত ব্যাপারই পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপরে নির্ভর করে, সাহিত্যও তাহাই করিয়া থাকে। আর্য্যগণ যখন এ দেশে আসিয়া নব নব স্থান অধিকার করিতে ব্যস্ত, পূর্ব্বনিবাসিগণকে পরাজিত, বিধ্বস্ত করিয়া স্বাধিকার স্থাপনে একাগ্রচিত্ত, সে সময়ে তাঁহাদের বাহু বলদৃপ্ত, অন্তর তেজঃপরিপূর্ণ, সেকালের সাহিত্য রামায়ণ। যখন আরব্ধ কার্য্য শেষ হইল, দেশ অধিকৃত হইল, সকলে যাহা জয় করিয়াছে কে তাহা ভোগ করিবে ইহারই মীমাংসা যখন একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইল, ধনধান্যপরিপূরিতা বসুন্ধরা যখন করায়ত্ত হইল, আর্য্য প্রকৃতি তখন ভোগাভিলাষী হইয়া উঠিল, অন্য শত্রুর অভাবে গৃহবিবাদ তখন আরম্ভ হইল, সে কালে জন্মিল মহাভারত; তাহার পরে কারণান্তরে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ভোগ এবং ত্যাগ যখন একত্রে বসবাস আরম্ভ করিল, তখন পুরাণ আসিয়া দর্শন দিল। তাহার পরে আর্য্যগণ এমন এক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে শৌর্য্যবীর্য্যসমন্বিত আর্য্য প্রকৃতি কোমল ভাবাপন্ন হইতে লাগিল, তাঁহাদের স্বাভাবিক তেজ বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্ত্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল; এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ; সে কাব্য প্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিত্র একালের চিত্র নহে, সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর চিত্র বটে। আজও হয়ত বাঙ্গালী গৃহসুখ-পরায়ণ, নিশ্চেষ্ট ও অলস হইতে পারে, কিন্তু আজ বঙ্গবাসীর অন্তরে তাহাদের সাহিত্য নানা আশা আকাঙ্ক্ষার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। এমন জনও হয়ত আজি বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতে পারে, যাঁহার কণ্ঠে স্বয়ং শ্রী আসিয়া জয়মাল্য পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু তিনি দেশের সাহিত্যের প্রভাবে দেশ-মাতৃকার অন্নপূর্ণারূপিণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারই পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। একালের কবিতায় বঙ্গবাণীর সেই মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে যাঁহার হস্তস্থিত অগ্নিবীণা অনল বর্ষণ করে; রবীন্দ্রনাথ সেই কবিকুলের সম্রাট। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, নিত্য নূতন রচনায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালীর কাব্যজগৎকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা সকলে সম্ভবে না; বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের তৃণ-বংশবিনির্ম্মিত কঙ্কালবৎ "কাঠামো"র উপরে দশপ্রহরণ-ধারিণী, সর্ব্বাভরণভূষিতা, শক্তিময়ী, দুর্গতিহরা, দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বাঙ্গলার পদ্য-সাহিত্যের রচনারীতি আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনব ছন্দের মাধুর্য্যময় নবীন ঝঙ্কারে কেবল বঙ্গদেশ বা

ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ, মোহিত ও স্পন্দহীন করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পয়ার, সেই লঘু বা দীর্ঘ ত্রিপদী, সেই সব, কিন্তু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, সারদার আনন্দদুলাল রবির ইন্দ্রজাল প্রভাবে তাহাদের প্রাচীনা মূর্ত্তি কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া অভিনব পরিচ্ছদে সর্ব্বাবয়ব আবৃত করিয়া তাহারা নবযৌবনসম্পন্না নবীনা যুবতী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, বঙ্গবাসী আর তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। মধুসূদন ইংরাজী 'সনেট'কে বাঙ্গলা কবিতায় স্থান দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার চতুর্দ্দশপদী মূর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে কখনও দ্বাদশী কখনও ষোড়শী কখনও বা অষ্টাদশীরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের মন মুগ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালার এই নবযুগের অসামান্য শক্তিসম্পন্ন বিদ্যাপতিকে ঘিরিয়া তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী যে সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার মূল বীজমন্ত্র বাজিয়া উঠিয়াছে সেই গানে, যে গান শুধু বাঙ্গালায় নহে, সমগ্র ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি" বলিয়া রণ্‌ রণ্‌, ঝণ্‌ ঝণ্‌, রবে বাজিয়া উঠিয়াছে।

পুরাকালের সে খৃষ্টানী ভাষা আর নাই, আর সে পণ্ডিত মহাশয়গণের সমাসবহুল সংস্কৃতভাষা আদর পায় না, "হুতুমি" ভাষার দিনও এখন চলিয়া গিয়াছে, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের গদ্যসাহিত্য এখন যে মূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহা লীলাময়ী ও তেজোময়ী, সে ভাষা এখন বাঙ্গালীর প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া কহিতে পারে এবং পরকেও সে কথা শুনিবার জন্য অবহিত করিতে পারে। আর সে চৌদ্দ অক্ষরের কায়ক্লেশের মিল নাই, সে বৈচিত্র্যহীন, জীবনহীন কবিতার ছন্দ এখন প্রাণের স্পন্দনে নৃত্যশীল। কোথাও গম্ভীর, কোথাও ললিত-ভঙ্গে লীলায়িত গতিতে ধাবমান হয়, কোথাও অগ্নি বিকীরণ করে, কোথাও পাষাণ গলাইয়া তাহারই সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়।

সত্যই এখন স্থিরচিত্তে ভাবিবার সময় আসিয়াছে আমরা কি চাই, আমাদের প্রার্থিত কাম্যপদার্থ কি? চাই জাতি-সংগঠন, চাই জাতীয় জীবন। যে পরমবস্তু দান করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাহিত্য পূজা পাইতেছে আমরাও তাহাই চাই। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন,—বড় দুঃখে, বড় ব্যথায় গাহিয়াছেন "আবার তোরা মানুষ হ।" আমরা বঙ্গসাহিত্যকে এমনি ভাবে গঠন করিতে চাহি যেন মানুষ হইতে পারি, আমরা যেন হাটের হট্টরোলের মধ্যে দেবীর সাধনায় নিযুক্ত না হই, আমরা যেন ডাকের গহনায় ভুলিয়া মাণিক না হারাইয়া ফেলি—আমরা যেন উষর ভূমির কণ্টক গুল্মে ঘিরিয়া অমৃতফলপ্রদ শিশু কল্পবৃক্ষটিকে বিশুষ্ক হইতে না দিই। বাঙ্গালার সমবেত সাহিত্যিক সজ্জনগণের নিকট আমার জরাগ্রস্ত জীবনাপরাহ্ণের চরম নিবেদন এই যে, আপনাদের পুণ্যে পবিত্র হইয়া যেন আমরা সর্ব্বকায়মনে বাঙ্গালী হইতে পারি; আপনারা যে বিরাট বঙ্গসাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এখনও তাহার গঠন বিষয়ে সকল মন প্রাণ দিয়া সচেষ্ট রহিয়াছেন, যাহার শাখা প্রশাখা নানা জ্ঞান বিজ্ঞানের কুসুমরাশিতে সুশোভিত হইয়াছে ও হইবে, সেই মহা-মহীরুহের ছায়াতলে থাকিয়া আমরা যেন স্বপ্নে জাগরণে একমাত্র বর প্রার্থনা করি যে—হে দেবতা, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বাঙ্গালী হই এবং বাঙ্গালীই থাকি।

আজ আমার বাঙ্গালার আশুতোষের—ভারতের আশুতোষের—সারগর্ভ সেই পরম বাণী বারম্বার মনে আসিতেছে, যাহা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত তরুণ যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষতম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যেন সর্ব্বদা স্মরণ করেন যে, মাতৃ-ভাষার মধ্য দিয়াই তাঁহারা দেশের সকল জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন, এবং বিদেশের উপাদেয় জ্ঞান সম্পদ যাহা তাঁহারা আহরণ করিতেছেন তাহা মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই দেশবাসীর মধ্যে প্রচারিত করিতে পারিবেন;

আহার ও পরিচ্ছদের ক্ষুদ্র মোহে মুগ্ধ হইয়া যেন ভুলিয়া না যান যে তাঁহারা বাঙ্গালী, সর্ব্বকালে, সকল অবস্থাতে ও সর্ব্বত্র মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহারা বাঙ্গালী, ধর্ম্মে কর্ম্মে, অশনে বসনে, দেহে মনে প্রাণে তাঁহারা বাঙ্গালী।

আমাদের কথা-সাহিত্যের গতি দেখিলে মনে হয় যে আমরা ক্রমে ক্রমে যেন এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। প্রতীচীর সামাজিক আদর্শ আমাদের কথা-সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছে কি না সে কথার বিচার আপনারা করিবেন। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে ক্রমে বিলাতী সমাজের চিত্র যেন আমাদের কথাসাহিত্যের অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রাচী ও প্রতীচীর সম্মিলন বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সম্মিলন ঘটাইতে যদি প্রাচীর আদর্শকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে হয়, বহু যুগ যুগান্তের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া প্রাচ্য সমাজের উৎকৃষ্টাংশ যাহা আজও জীবিত আছে তাহাকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়, তবে সে সম্মিলন সুখের হইবে কি কি দুঃখের হইবে, তাহাতে আমাদের সমাজ ও সাহিত্য লাভবান হইবে কি না, সে কথার মীমাংসাও আপনাদেরই কর্ত্তব্য। পশ্চিমের সূর্য্যাস্ত সময়ের বর্ণ-বৈচিত্র্যকে প্রাচী দিগ্‌বিভাগে আনিতে গিয়া পূর্ব্বের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ধ্বান্ত-বিধ্বংসী অরুণলেখার মঙ্গলালোকের বিলোপ সাধন করা কর্ত্তব্য কি না ইহা ধীরচিত্তে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের প্রাণ সেইখানে স্পন্দিত হইতেছে যেখানে ম্যালেরিয়ার মহামারী জীবধ্বংসে নিযুক্ত থাকিয়া শ্মশানের চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না, বাঙ্গালার সম্পদ সেইখানে যেখানে চণ্ডীমণ্ডপের অলিন্দে বসিয়া হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি রুষ্ট বিষধরের ন্যায় নিয়ত গর্জ্জন করিতেছে, বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব সেই জীর্ণ গৃহ-কোণের অন্ধকারে, যেখানে নারী তাহার ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল-দ্বারা মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ বর্ত্তিকাটুকু আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, যেন বাহিরের বাতাহত হইয়া উহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইতে না পারে।

বঙ্গবাণীর সাধকবর্গকে সাহিত্যের তরণী সেই দিকে পরিচালিত করিতে হইবে; গল্পে গানে নাটকে উপন্যাসে, বাঙ্গালা বাঙ্গালী ও বঙ্গসমাজকে চিত্রিত করিতে হইবে। কেবল চামচ সংযোগে চায় পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্ রব, পর্দ্দাহীন হাওয়া গাড়ীতে ফর্দ্দা হাওয়ায় গৃহলক্ষ্মীগণের সান্ধ্যবায়ু-সেবন, স্ত্রী পুরুষের একত্র সান্ধ্যসম্মিলন উপলক্ষে পিয়ানো সংযোগে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত-সুধাবর্ষণের চিত্র অঙ্কিত করিলে চলিবে না। এ সকলেরও হয়ত বা প্রয়োজন আছে; কিন্তু ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত আমাদিকে স্মরণ করিতে হইবে যে, আমরা পূর্ব্বদেশবাসী, পশ্চিমের সার গ্রহণ করিয়া আমরা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইব, কিন্তু পূর্ব্বকে একেবারে বিস্মৃত হইব না, বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত করিবার মোহে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলে চলিবে না।

সমাজ যেমন সাহিত্যের বুকে দাগ দেয়, সাহিত্যও তেমনি সমাজকে চিহ্নিত করিতে ছাড়ে না। কেবল তাহাই নহে। সমাজ যেখানে শক্তিহীন, সাহিত্য সেখানে প্রবল—সমাজ যেখানে মূক, সাহিত্য সেখানে কলকণ্ঠ—সমাজ যেখানে নিদ্রিত, সাহিত্যের পাঞ্চজন্য সেখানে বজ্ররবে নিদ্রিত সমাজের সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে জাগ্রত ও সচেতন করিয়া তুলে।

আমাদের বৃদ্ধ সমাজ নিয়ত উদ্যত খড়্গ হইয়া আমাদিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতে চাহিতেছে না। সে বুঝিতে চাহে না যে কালের গতির সহিত সমপাদবিক্ষেপে চলিতে না পারিলে আমরা ভগ্নচক্ররথের ন্যায় চিরকাল পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াই থাকিব, অথচ আমাদের যেখানে যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিলেও আমরা কিম্ভূত কিমাকার হইব তাহাও জানি না। তাই নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া, সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারা এমন সাহিত্য গঠন করুন যাহাতে আমাদের পুরাতনের জীর্ণ সংস্কার হইয়া তাহা নবরূপ ধারণ করিতে পারে—ইষ্টকালয়ের মধ্যে যে বটবৃক্ষ তাহার মূল প্রোথিত করিয়া দিয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা না

পারিতে পারে—ধ্বংসকারী বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করিতে হইবে, কিন্তু মন্দির ভাঙ্গিবে না। আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয়-জীবন গঠিত করিতে চাই, নব-জীবনের আনন্দে আমরা প্রফুল্ল হইতে চাই, দেশবাসী পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বঙ্গবাণীর চরণকমলে আত্মনিবেদন করিতে চাই। আমরা সুন্দর হইতে চাই, কিন্তু ঋণ-লব্ধ বসন ভূষণে নহে, আমরা পুষ্ট হইতে চাই দেশ-জাত ঘৃত ও দুগ্ধে, বিদেশের পেটেন্ট ঔষধে বা টিনের খাদ্যে নহে।

আজ যেখানে আসিয়া আমরা দণ্ডায়মান হইয়াছি ইহা নবযুগের প্রারম্ভ, অপগতপ্রায় শর্ব্বরীর শেষ অন্ধকারটুকু এখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই, অম্বরপদে সমাগত অরুণের রক্তরাগ ঈষৎ দেখা দিয়াছে মাত্র। এই নবীন যুগের সন্ধি-সময়ে আমরা নবীন কর্ম্ম-শক্তি চাই, বহ্নির মত তেজশালী দীপ্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আমরা চাই, সমস্ত সাহিত্য সেই তেজে পূর্ণ হইলে তবেই আমাদের সাহিত্য-সাধনা সফল হইবে।

আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবীর কথা উঠিয়াছে, তাহাকে মানিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেমন তাহাকে মানিতে হইবে তেমনি তাহাকে সংযতও করিতে হইবে। সমাজে যাহার বাস নহে, সে যাহা ইচ্ছা দাবী করুক তাহাতে জগতের ইষ্টানিষ্ট নাই। কিন্তু সমাজের কি নর কি নারী যিনিই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিবেন, তাঁহাকে মূল্য দিতে হইবে। নিজের স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে সংযত করিলে, তবে সেই স্বাতন্ত্র্যের সম্মান সমাজের নিকট হইতে পাইবার ও লইবার সামর্থ্য হইবে; নিজের স্বার্থকে কতকাংশে সংযত করিলে, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলে আমার দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিব; সে সময়ে যদি দেখি সমাজ আমার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যতাস্ত্র হইয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রহরণ ধারণ করিবার শক্তিলাভ করিব; সেই শক্তি সাহিত্যের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চাই, সাহিত্যের দ্বারাই তাহাকে পরিচালিত করিতে চাই, সাহিত্যের বরেই তাহার প্রাণ শক্তিকে উদ্দীপিত করিতে চাই।

আজ কাল শুনিতে পাই বঙ্গ-সাহিত্যে "আর্টের" প্রতিপত্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই আর্ট কি বর্ত্তমানের আমদানি, না প্রাচীন কালেও ছিল? যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমার প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সময়ে আর্ট ছিল কি না সে কথার বিচার ও মীমাংসা সম্মিলনের সুধীবর্গ করিবেন, আমি সে কথার কোনরূপ উত্তর দিবার উপযুক্ত নহি; যতটুকু সংস্কৃত বা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত গীতি-কাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে যে, আর্ট যেখানে সুন্দর সেখানে কবির লেখনী অমৃতনিস্যন্দিনী হইয়া অবারিত মুক্ত প্রবাহে ঝর ঝর করিয়া রসধারা ঢালিয়া দিয়াছে; কারণাধীনে রামায়ণে মহাভারতে কিংবা তাদৃশ অপর কোন গ্রন্থে যেখানে অসুন্দর আর্টের ছবি অঙ্কিত করিতে হইয়াছে, সেখানে কবি বহু সন্তর্পণে নানাবিধ কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন, ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছেন। এ কালে চিত্রে ও রচনায় আর্ট এরূপ ভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে যে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, মানুষ ও সমাজের জন্য আর্টের সৃষ্টি হইয়াছে, না আর্টের জন্য মানুষ ও সমাজ? আজ আর্টের দাবী এমন ভাবে দাঁড়াইয়াছে যে এখনই উহা বাঙ্গলার সাহিত্যিক দিগকে দুই-শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে এবং বাঙ্গলায় গভীর মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমি কবি নহি, আমি সাহিত্যিক নহি, কিন্তু কবিতায় যে মাধুর্য্য রহিয়াছে তাহা আমি ভালবাসি; কাব্যের সৌন্দর্য্যের নিকট আমার হৃদয় নিয়তই অবনত হইয়া পড়ে। আমি সেই সুন্দরকে চাই, যিনি ক্ষণিকের আনন্দপুলক দিয়াই অন্তর্হিত হন না, যিনি মধুর প্রলেপ-যুক্ত হলাহল বটিকায় আমাকে প্রলুব্ধ করেন না; আমি সেই সুন্দরকে চাই যিনি সত্য এবং শিব, আমি তাঁহাকেই চাই যিনি দীপ্তিমান অথচ শান্ত, যাঁহার মঙ্গলময় উজ্জ্বলালোকে আমাদিগের দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, কিন্তু তাপ

আমাদিগকে দগ্ধ করে না। এখন শুনিতেছি কবিগণ কেবল রস সঞ্চারই করিবেন, লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ করিবেন না; গুরুমহাশয়গণের ন্যায় বেত্রপাণি হইয়া লোককে শিক্ষা দিবার ভার তাঁহাদের উপরে নাই। কথাটা শুনিলে একটু ভীত হইতে হয়, ইহারও মীমাংসা যাঁহারা বর্দ্ধমান বঙ্গ-সাহিত্যের অভিভাবক তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। যে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার যতটুকু জানি, তাহাতে মনে হয় যে, সে সাহিত্যের মূল-মন্ত্র এই যে কবিরাই প্রধান লোকশিক্ষক।

উত্তরচরিতের সমালোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া ছিলেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতি-জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতিব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না, তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য। * * * কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎকার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্যপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে, সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক।" কবি পরদারাপহারী রাবণ বা পরস্বাপহারী দুর্য্যোধনকে অঙ্কিত করিলেন, তাহার পার্শ্বেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামচন্দ্র ও ধর্ম্মের অবতার যুধিষ্ঠিরের চিত্রও আমাদের নয়ন সম্মুখে ধরিলেন; মূর্ত্তিমতী পতি-দেবতা সীতা ও স্বৈরিণী সূর্পণখার চিত্রদ্বয়ও একত্রে আমরা দেখিতে পাইলাম। কবি বেত্রপাণি হইয়া গুরুমহাশয়ের ন্যায় আমাদিগকে বলিলেন না যে একের অনুকরণ কর, অপরের করিও না; কিন্তু চিত্রগুলি এমন ভাবেই অঙ্কিত হইল যে আমাদের চিত্ত স্বতঃই রাম যুধিষ্ঠির সীতার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়িল, রাবণ সূর্পণখার কথায় সমস্ত অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উত্তরচরিতের সমালোচনা উপলক্ষ্যে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে পঞ্চাশৎবর্ষও অতিবাহিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই কালের মধ্যে তাঁহার গঠিত বঙ্গসাহিত্য অনেক বেশী দূর অগ্রসর হইয়া বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও সাহিত্যিকগণের চিন্তার ধারাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার সময়কে সন্নিকটে আনিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ থাকিলে, সে কারণ আমার জানা নাই। তাঁহার সৃষ্ট কুন্দ, কপালিনী, সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, শান্তি ও দেবীরাণী যদি একালের আর্টের শক্তিকে স্বীকার না করিয়া চিরসৌন্দর্য্যময়ী রূপে আজিও বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তবে কাজ কি একটা বৈদেশিক আদর্শের রূপ-মন্ত্রকে জপ করিয়া?

সংসারে সকলেই অনেক জিনিস দেখি, অনেক কথা শুনিতে পাই, কিন্তু সকল কথা, সকল পদার্থ কি কাব্য নাটক উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে, না স্থান পাইবার যোগ্য? যোগ্য নয় বলিয়াই সকল জিনিস সাহিত্যে স্থান লাভ করে নাই। স্থান না দিলে বস্তুতন্ত্রতার অভাব হইবে বলিয়া এক বাধা উপস্থিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে চাহি—"যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি, তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না—কেন না তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন ও অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনামধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টি চাতুর্য্যের

শংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা হিরে দেখিতেছি তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম—তাহাতে মার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া মোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা তে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আমোদ অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া ণ্য হয়।"

"কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই কটি কত কালের কে জানে, কিন্তু কথাটি খাঁটি সত্য। কেবলমাত্র ভারতের ধীমানদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য , জগতের সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে রে, বিশেষতঃ বর্ত্তমানের দিনে। অশন বসনের স্থান জন্য আজ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে গুপেষণকারী শ্রম করিতে হয়, তাহার পরে নিতান্ত তিকগ্রস্ত ভিন্ন কেহ বেদান্ত বা তদনুরূপ কোন শাস্ত্র-লায় মনকে অভিনিবিষ্ট করিতে পারে না। সেই জন্য লকেই প্রায় উপন্যাস বা ছোট গল্পের সহায়তা অব-ন-করিয়া আনন্দলাভের প্রয়াস পাইতে হয় এবং বিশ্ব-হিত্যের মন্দিরে গল্পের ও উপন্যাসের এই কারণেই ধিক সমাদর হইয়াছে। যদি আর্টের খাতিরে সেই ন্যাস বা গল্প এরূপ হয় যে পিতাপুত্রে একসঙ্গে পাঠ অসম্ভব হইয়া উঠে, কিংবা পতি পত্নীও একত্রে পাঠ আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তবে সে আর্ট ত্যে প্রবেশ লাভ করিলে বা সাহিত্যের একটি প্রধান স্থান হইলে তাহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না তাহাও সুধীজনের বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

ভারতের নাট্যবিধাতা ভরত, অভিনয় কৌশলের কালে বলিয়া গিয়াছেন।

"* * * তথা লজ্জাকরং তু যৎ।
এবম্বিধং ভবেৎ যৎ যৎ তত্তৎ রঙ্গে ন কারয়েৎ।"

কেন এই নিষেধবাক্যের প্রয়োজন হইয়াছিল পরবর্ত্তী াসনে তাহার উত্তর আছে;—

পিতৃ পুত্র স্নুষা শ্বশ্রূ দৃশ্যং যস্মাত্তু নাটকম্।
তস্মাদেতানি সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ।

মানুষের জীবন-যাত্রার সহিত কাব্য নাটকাদির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কবি যে চিরসুন্দরের মন্দির রচনা করিতেছেন তাহাদের পাদপীঠের শিলা যদি শ্লথবিন্যস্ত হয়, তবে সে মন্দির কতক্ষণ তাহার উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে পারিবে? সে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে তাহা পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, পতি পত্নী সকলকেই একত্রে সমাহিত চিত্তে শুনিতে হইবে; সে মন্ত্রের প্রাণ যদি নীতির ও রুচির হোমবারি স্পর্শে পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উহা সমাজকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যায়, আর্টের সহস্র দোহাই দিলেও তাহার রক্ষা দুষ্কর। কেবলমাত্র আর্ট নহে, সুন্দর নহে, যাহা সত্য শিব ও সুন্দর তাহাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ইংরাজ উইলসন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের জয়গান করিয়া বলিয়াছেন যে, পরকীয় প্রেম ভারতবর্ষের হিন্দু নাটকের প্রাণবস্তু নহে, ক্ষণিক আনন্দপ্রদ অসুন্দর বস্তু, প্রাচীন ভারতের কাব্যনাটকে প্রধান স্থান কোন দিনই পায় নাই; এবং ভারতীয়দিগের নাট্যশাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইলে প্রতীচীর বহু ক্ষমতাশালী কবি ও নাট্যকারের উৎসাহ ও উদ্যম মন্দীভূত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।

দেশের ইতিহাসে জ্ঞান না জন্মিলে, দেশের প্রাচীন কথা না শুনিলে, পূর্ব্ব পিতামহগণের গৌরবময় কীর্ত্তির কথা না জানিতে পারিলে, আমরা কি ছিলাম, কাল-বশে আজ কি হইয়াছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। একদিন ছিল যখন বিদেশীর নিকট হইতে দেশের সম্বন্ধে তিরস্কার বা পুরস্কার যাহাই লাভ করিয়াছি তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতঃ হর্ষামর্ষ যাহাই হউক সে সমস্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছি; তাহার পরে এক সুপ্রভাতে দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র তপস্বিসঙ্ঘ দেশের বিলুপ্ত-প্রায় পুরাতন গৌরবের অখণ্ডনীয় প্রমাণ সংগ্রহের জন্য স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে বাহির হইয়া দেশের অরণ্য-কান্তারে, ভূগর্ভে ভূধরে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং যোগিজনোচিত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার

বলে যে কঠোর তপোলভ্য ফলকে লাভ করা যায়, তাহারই সন্ধানে গিরিপ্রস্থ, সাগর-সৈকত, বিজন অরণ্য ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর কোন স্থানই তাঁহাদের অগম্য রাখেন নাই। এই বিপুল শ্রমসাধ্য ব্যাপারের ফল তাম্রে, শিলায় ও ইষ্টকে আজ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—আজ কেহ বলিতে পারিবে না যে ভারতবাসী কেবল মিথ্যা পৌরাণিক উপকথা ও কাহিনীর বলে তাহাদের পূর্ব্ব গৌরবের অসত্য গাথা গাহিয়া থাকে। পুরাণের কাহিনী আজ কঠিন শিলায় ও কঠিনতর তাম্রে প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত। আজ বঙ্গের "ধীমান," "বিটপাল" উপন্যাসের কল্পিত ভাস্কর নহে, এবং তাহাদের শ্রীমূর্ত্তিগুলি পুরাণকারের অবিমিশ্র অনৃত কল্পনা নহে।

যে কয়টি তাপস তাঁহাদের জীবনব্যাপী তপস্যায় দেশের পূর্ব্ব গৌরব জগতের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান করিয়াছেন তাঁহারা আজ তাঁহাদের প্রাপ্য যথাযোগ্য পুরস্কার না পাইলেও উত্তরপুরুষ তাঁহাদের এই বিপুল শ্রমের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র তাপস দলের সংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি দেশের সাহিত্যিকবৃন্দের দৃষ্টি আমি সবিনয়ে আকর্ষণ করিতে চাহি। আরও একটি কথা আমার সময়ে সময়ে মনে হয়—বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু দেশে প্রচলিত বহুকালের জনশ্রুতি, কিংবদন্তী ও জনপ্রবাদ গুলিও একেবারে পরিহার্য্য নহে। উহাদের মূলে সত্যের অস্তিত্ব না থাকিলে উহাদের জন্মই হইত কিনা সন্দেহ, হইলেও তাহাদের পরমায়ু এত দীর্ঘ হইত না। জনপ্রবাদরূপ বৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখায় যে সকল বৃক্ষাদনী ও রাস্না জন্মে তাহা অপসারিত করিয়া মনঃসংযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার মূলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবারই কথা। যুগ যুগান্ত পরে অবস্থান্তরের মধ্যে যাহাকে আজ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কোন কালেই তাহার সম্ভাবনা ছিল না এমন কথা জোর করিয়া বলাও কঠিন। তাই বলি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, দেশের গৌরবময় দিনের সুখপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থেরও প্রয়োজন হয়ত আছে, এবং সে দিকে আমাদের একটু দৃষ্টিপাতও যেন প্রয়োজন।

সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় নাই, দিন তারিখ সাল লিখিবার অভ্যাস আমাদের পূর্ব্বগত্গণের ছিল না, সেইজন্য আজ দেশের ইতিহাস রচনা কঠিন হইয়াছে বলিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে অবহিত হইতেছি কি না জানি না; বর্ত্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাদের সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত সমূহ বর্ত্তমানে দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা হইতে এবং যেখানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই আজ দিনে দিনে সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে, পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে কেহ যদি আজিকার দিনের ইতিবৃত্ত লিখিবার প্রয়াস করেন, তাঁহার পক্ষে সে কার্য্য কি কঠিন হইবে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। বর্ত্তমানেই পূর্ব্বপ্রকাশিত অনেক পুস্তক অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে, অনেক সাময়িক পত্রের নাম পর্য্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, বহু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ আজ চাহিলে তাহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইবে; কত জনশ্রুতি কিংবদন্তি ইতিপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহাদের দেহাত্যয়ের পরে অনেক জনপ্রবাদ চিরদিনের জন্য বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া আজ আমরা সচেষ্ট না হইলে ইতিহাসের অনেক মাল মশলা আমরা চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলিব সন্দেহ নাই।

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল; বেদের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী স্ত্রী ঋষিরও অভাব নাই। গৃহ্যসূত্রগুলি হইতে আমরা স্ত্রীশিক্ষার বহুকথা জানিতে পারি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজ শুনিতে হইতেছে ভারতীয় নারীগণের শিক্ষার দিকে ভারতীয় পুরুষের দৃষ্টি

একেবারেই পতিত হয় না। বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমূহে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশের বহু ব্রাহ্মণকন্যা কেবল কাব্য ব্যকরণ নহে, দর্শন প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রের শিক্ষাও বালক বিদ্যার্থিগণের সহিত সমভাবে পাইতেন। পিতৃগৃহে এবং পরিণয়ান্তে পণ্ডিত স্বামিগৃহে তাঁহারা পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতিকে বিদ্যালোচনায় বহু সহায়তা দান করিতেন।

জাতীয় ভাবকে অব্যাহত রাখিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষাদান সকল দেশেই প্রয়োজন, ভারতে সে প্রয়োজন আজ ততোধিক। আমাদের ভবিষ্য জননীগণকে এমনভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহায়তা করিতে পারেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত যেমন আবশ্যক, শিশুশিক্ষার প্রতি মনঃসংযোগও তেমনি প্রয়োজনীয়। শিশু হইতেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সমুদ্ভূত হইবে। আজ যে শিশু, আগামী কল্য সেই জনক, সুতরাং তাহাদের শিক্ষার দিকে, বর্ত্তমানে যাঁহারা পিতা তাঁহাদের সযত্ন-দৃষ্টিপাত একান্তই আবশ্যক। শিশুপাঠ্য অনেক গ্রন্থ আজ প্রচারিত হইতেছে, সে সকল গ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও অসদ্ভাব নাই, কিন্তু আমার মনে হয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ভাণ্ডার আজও আশানুরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। এমন গ্রন্থ আজ রচিত হইতে হইবে যদ্দারা আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার গৌরবের কথা শিশুহৃদয়ে এখন হইতেই মুদ্রিত হইয়া যাইতে পারে, আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহগণের শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ছবির রেখাপাত বালক-হৃদয়-ফলকে এখন হইতেই আরম্ভ হইতে পারে।

কিছু দিন হইতে বঙ্গ-ভারতীর মন্দিরদ্বারে কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিককে পূজোপকরণ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে, ইহা আমাদের সাহিত্যের পুষ্টিপক্ষে অতীব শুভ লক্ষণ। আরও আনন্দের কথা যে, সেই সকল সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে আমরা দুই চারিজন মহিলারও সন্দর্শন লাভ করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীরামপুর-নিবাসিনী শ্রীমতী নূরন্নেছা খাতুন এই সম্মিলনে তাঁহার রচিত একটি নিবন্ধ পাঠাইয়াছেন, সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে তাহা অবশ্যই পঠিত হইবে। কৃপা পূর্ব্বক তিনি তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধের একখণ্ড আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য কথাটি পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তিনি কহিয়াছেন, "যদিও আমাদের বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ আরব, বাগদাদ বা পারস্য হইতে পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই বঙ্গের ফল জল, আকাশ বাতাস, ওষধি বনস্পতি প্রভৃতির সহিত যুগযুগান্ত ধরিয়া আমরা পরিচিত। এই বঙ্গের বাণীই আমাদের জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দিন পর্য্যন্ত নিয়ত কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। সর্ব্ব-প্রকারে আমরা বঙ্গমাতারই পুত্র কন্যা; কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ে এমন জন অনেক আছেন, যাঁহারা এ পরম সত্যকে অস্বীকার করেন। পঞ্চনদ তীরবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই পাঞ্জাবী; বিহারের সকলেই বিহারী, কিন্তু বঙ্গ-জননীর সন্তান যাঁহারা তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্মান্তরের জন্যই বাঙ্গালী নহেন, ইহার ন্যায় আশ্চর্য্য-জনক অযৌক্তিক কথা আর আছে কি না তাহা জানি না।"

আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের জননী জায়া দুহিতা-গণের মনে বঙ্গজননী ও বঙ্গবাণীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি যদি এমনই ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে, তবে তাহা অচিরে কি মঙ্গল ও কল্যাণকে যে আমাদের করায়ত্ত করিয়া দিবে, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গ-বাণীর অভ্রভেদী মণি-মন্দির তাহার তুঙ্গশির ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে এবং মন্দিরচূড়াস্থ কেতনের চীনাংশুক-শোভা দেশ-দেশান্তরবাসী বিস্মিত-নেত্রে দেখিতে থাকিবে। যে মহীয়সী মোসলেম মহিলার মনে এই মহান্ সত্য স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি বঙ্গদেশবাসী সমাজ-ধর্ম্ম

নির্ব্বিশেষে সকলেরই নমস্য এবং যে হৃদয়ের বলে তিনি এই পরম ও চরম সত্যবাণী উচ্চারণ করিবার সৎ সাহস লাভ করিয়াছেন তাহার নিকটে সকলেরই মস্তক গভীর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে; আর যে সকল মোসলেম মহিলা পূজার অর্ঘ্য লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই এই সমবেত সাহিত্যিক সজ্জন-বৃন্দের নিকট হইতে সাদর অভিনন্দন পাইবার যোগ্য পাত্রী।

আজ যেখানে সাম্বৎসরিক বাণীপূজার মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্বেতশতদলোপরি সমর্পিত চরণা বীণা রঞ্জিত-করা বাগ্দেবতার আরাধনার্থ বঙ্গের সজ্জন-সঙ্ঘের হৃদয় শতদল যেখানে আজ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আদিশূর বল্লালাদির লীলা নিকেতন সেই বিক্রমপুরের শ্রীসম্পদ, গৌরব গরিমা, জ্ঞান বিদ্যা, শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী, প্রাচীন কাহিনী; যুগে যুগে ইহার গৌরব, নানাভাবে বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে আদিশূরের স্থান থাকুক বা নাই থাকুক, তথাপি সমাজে স্বীকৃত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন-কারী আদিশূরের গৌরবে বিক্রমপুর গৌরবান্বিত, কৌলিন্যের প্রচলন কর্ত্তা বল্লালের গৌরবে বিক্রমপুর গৌরবান্বিত, বঙ্গের শেষ একচ্ছত্র নরপতি লক্ষ্মণের গৌরবে এই ভূমি গৌরবান্বিত, বিশ্বরূপ, কেশব ও চাঁদ কেদারের অসির দীপ্তালোকের কথা বিক্রমপুরবাসী আজও বিস্মৃত হয় নাই—এ সকল বহু পূর্ব্বের কথা। বর্ত্তমানে জ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চাতেও বিক্রমপুর কেবল বঙ্গে বা ভারতে নহে, সমগ্র ধরণীতলে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র যাঁহার কীর্ত্তিচন্দ্রমার বিমল রশ্মিপাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের মুখ বহুকাল পরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার জন্ম এই বিক্রমপুরে; ধ্যানাবস্থিত তদগতচিত্ত হইয়া যিনি জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীর চরণ-কমলে মন প্রাণ সমর্পণ করতঃ পরম সত্যের চরমবাণী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় উদাত্তস্বরে জগতের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানী প্রবর ঋষি জগদীশের পুণ্যস্পর্শে এই ভূমি চিরগৌরবান্বিত হইয়াছে। যাঁহার কবি-প্রতিভার হেমরশ্মি-সম্পাতে একদিন প্রাচী প্রতীচী উদ্ভাসিত হইয়াছে, যাঁহার দেশ মাতৃকার চরণে আত্ম-নিবেদনের দৃপ্তে আজ জগৎ বিমুগ্ধ ও ভারতবাসী ধন্য, সেই ফুল্লসরোজগৌরবা সরোজিনীর অপূর্ব্ব গৌরবে এই বিক্রমপুর গৌরবান্বিত। কালীমোহন, দুর্গামোহন, গুরু-প্রসাদ, অঘোরনাথ, নিশিকান্ত, লালমোহন, মনোমোহন, কালীপ্রসন্ন, রজনীনাথ, চন্দ্রমাধব প্রভৃতি কত মনীষিবৃন্দ এই ভূমিতে জন্মলাভ করতঃ দেশ দেশান্তরে তাঁহাদের কীর্ত্তিভাতি বিকীরিত করিয়া এই ভূমিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে বিক্রমপুরের পুত্রকন্যাগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমস্ত বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, সেই পবিত্র ভূমির অধিবাসিবৃন্দের অনুষ্ঠিত এই বাণী-আরাধনাব্রত পূর্ণাঙ্গ হইয়া সুন্দর রূপে সুসম্পন্ন হউক, এই সমাগত সুধীবৃন্দের কায়মনোবাক্যের চেষ্টায় বঙ্গ-সরস্বতীর সিন্দূর-চন্দনাঙ্কিত পাদপীঠ চিরন্তন হইয়া বঙ্গবাসীর সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এই সাহিত্যের সুগম পথে সার্থকতা দান করুক, ইহাই শ্বেত-সরোজ-সমাসীনা বীণাপাণির চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার সহ নিবেদন করিতেছি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

নগবালা

(উপন্যাস)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নগবালার গহনার সদ্ব্যবহার।

তাহার পর আর একটি দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর সেই পরম স্মরণীয় দিন সমাগত হইল। আজ ৩০শে শ্রাবণ বা ১৫ই আগষ্ট। আজ শুভদিনে রামপ্রাণ বাবু শ্বশ্রূমাতাকে আনিবার জন্য প্রত্যূষে পাথরকোণায় রওনা হইলেন; আজ শুভ সন্ধ্যাকালে জ্যোতিঃপ্রকাশের "প্রেম-বিবাহের" এনগেজমেণ্ট (বাগ্‌দান) উপলক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী-দের বাটীতে ভোজ হইবে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ আজ মধ্যাহ্নভোজন কালে মাতাকে বলিয়া রাখিল যে, আজ রাত্রে সে বাটীতে আহার করিবে না; এক বন্ধু তাহাকে আহ্বান করিয়াছে।

কিন্তু প্রণয়িনীর অভিলষিত অঙ্গুরীয় কৈ? এই ভাবনা তাহার মনে উদিত হইলেই সে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইত, মদের দোকানে গিয়া কিঞ্চিত আনন্দদায়ক পানীয় পান করিয়া বুঝিতে পারিত যে, সেই দিনের মত তাহার স্থায় শিক্ষিত যুবকের ধন্যবাদ পাইবার প্রলোভনে, বিধাতা অতি অবশ্য তাহাকে উপযুক্ত সময়ে প্রেয়সীর উপযুক্ত আংটী আনিয়া দিবেন।

ধন্যবাদ পাইবার প্রলোভনে কি না জানি না, কিন্তু— তোমরা বিশ্বাস কর—বিধাতা, আংটী না হউক, আংটী ক্রয়ের উপযুক্ত অর্থ যথাসময়ে জ্যোতিঃপ্রকাশকে সরবরাহ করিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, তাহা সেই অজ্ঞেয় বিধাতাই অবগত আছেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে বেলা দ্বিপ্রহর হইতেই ভোজের জন্য রন্ধনের আয়োজন হইতেছিল। সেই আয়োজনে যোগদান করিবার জন্য শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীর অভিলাষানুযায়ী জ্যোতিঃপ্রকাশ আহারাদির পরই জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে গিয়াছিল। বেলা দুইটার পর, মাতাঠাকুরাণী তাহাকে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্যোতির আংটী দুটো কিনেছ?"

মাতাঠাকুরাণীর প্রশ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ কিছু বিচলিত হইয়া, রচনা করিয়া, একটা মিথ্যা উত্তর দিল; এবং তখনকার মত নিষ্কৃতিলাভ করিল। বলিল, "স্যাক্‌রা বেলা তিনটের সময় দেবে বলেছে। এইবার যাই দেখিগে কতদূর এগিয়েছে।"

মাতাঠাকুরাণী আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। সাতটার সময় সকল লোক আসবে, তার একটু আগে পেলেই হবে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, সে কোনও স্বর্ণবণিকের বিপণিতে গেল না; কারণ সে জানিত যে, পার্থিব কোনও স্যাক্‌রার দোকানে সেই প্রিয়তমার অঙ্গুরীয়দ্বয় প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয় নাই। সে রাস্তায় রাস্তায় কেবল ধন্যবাদপ্রাপ্তি-লোলুপ বিধাতা পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু অঙ্গুরীয় উপহার হস্তে কোথাও উক্ত ছলনাময় মহাপুরুষের সন্ধান পাইল না। এইরূপে বিধাতাপুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা তিনটা বাজিল। আর বিধাতা পুরুষের অপেক্ষায় থাকিলে ত প্রেয়সীর লজ্জানিবারণ করা চলিবে না! কি কষ্ট; কি অনুতাপ!—এই কষ্ট, এই অনুতাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে আবার চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে বুদ্ধিমান জ্যোতিঃপ্রকাশের গণিতানুশীলন-পুষ্ট মস্তিষ্কে একটা নূতন বুদ্ধি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। আচ্ছা, তাহার ঘড়ী চেন ও আংটী কোনও পোদ্দারের দোকানে বন্ধক রাখিয়া কি তিন শত টাকা পাওয়া

যাইবে না? তিনশত টাকা পাইলেই ত সে আপাতত আংটীর মহাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। সে নিজের ঘড়ী চেন ও আংটী লইবার জন্য ছুটিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ সেখানে কি দেখিল? দেখিল, তাহার পদশব্দ বাটীর মধ্যে শ্রুত হইবামাত্র, বংশীরব শুনিয়া যেমন কুরঙ্গিনীগণ তাহাদের উদ্দাম চাঞ্চল্য ভুলিয়া বনমধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, এবং দু'টি নয়নে বিস্ময় পূরিয়া চাহিয়া থাকে, তেমনই কপাটের অন্তরালে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দু'টি প্রস্ফুটিত ইন্দীবরের মত দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নগবালা তাহার দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই আগ্রহময় দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইবামাত্র, তাহা হইতে ছিন্নস্কন্ধ খর্জ্জুর বৃক্ষের মিষ্ট রসের ন্যায়, আনন্দ ধারা নির্গত হইল। সে বুঝিল, তাহাদের বাটীতে নগবালা আসিয়াছে; কিন্তু সে বুঝিল না, তাহার সেই নাবালিকা পত্নী এমন মধুর এমন কমনীয় দৃষ্টি কোথা হইতে পাইল? সেই দৃষ্টি মহা প্রলোভনের ন্যায়, তাহার নবপ্রেম পথের একটা বিঘ্ন হইয়া না দাঁড়ায়, তজ্জন্য সে সেই কমনীয় দৃষ্টির পূত আকর্ষণ শক্তি হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার জন্য ছুটিয়া উপরে উঠিল। কিন্তু আকর্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিল না।

মাতা নবাগতা বধূমাতাকে বলিলেন, "বৌমা, জ্যোতি উপরে গেছে; তুমিও যাও; ওর কি দরকার আছে, দেখ।"

সুতরাং শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আজ্ঞা অনুযায়ী 'আকর্ষণ' জ্যোতিঃপ্রকাশের পশ্চাতে উপরে উঠিতে বাধ্য হইল। সেখানে নগবালা স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনার সিন্দুর বিভূষিত ললাটে পরিলিপ্ত করিল; এবং আনত আননে স্বামীকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ? তুমি আমাকে আনতে যাওনি কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ ভাবিল, এই পদ্মপলাশাক্ষী আবার এমন সঙ্গীতের মত কথা কহিতে শিখিল কোথা হইতে? দেবী বীণাপাণির বীণাধ্বনির ন্যায়, সেই সঙ্গীতময় বাক্য শুনিয়া, একবার তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিল। সে আত্মহারা হইয়া একটা মহাপাপ করিয়া ফেলিল; সে রামবাগানের নবপ্রণয়িণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া একবার পতিগত প্রাণা ধর্ম্মপত্নীকে আপন বক্ষে ধারণ করিল, তাহার মধুর অধরের মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করিল! যে সুরাপানের তীব্র আস্বাদ পাইয়াছে, সে কি অপক্ক নারিকেলাম্বুর স্নিগ্ধস্বাদ একবার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না?

আহা! সেই আদরেই যেন নগবালা গলিয়া গেল; সাধ্বীসতী যেন আপনার প্রাপ্য স্বর্গ আপনার করতলগত করিল। সে স্মিতমুখে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "একটু বসবে না?"

পতঙ্গ পদ্মে বসিল না; সে তখন যে বহ্নি দেখিয়াছিল, তাহার দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ-পতঙ্গ, বহ্নিপতনোন্মুখ পতঙ্গেরই মত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, আমার একটুও অবকাশ নেই। তা নইলে কি তোমায় আনতে যাইনে? শুধু একবার ছুটে তোমায় দেখতে এলাম। তোমার চেহারা বেশ দেখতে হয়েছে কিন্তু।"

স্বামিপূজার ফুলটি স্বামীর মনোমত হইয়াছে, শুনিয়া নগবালা কতটা আহ্লাদিত হইল, তাহা, কেহ যদি কখন নগবালা হইতে পারে—তেমনই সুন্দরী, তেমনই মেধাবিনী, তেমনই সুশিক্ষিতা, তেমনই সাধ্বী, তেমনই স্বামিগতপ্রাণা হইতে পারে—তবেই সেই বুঝিতে পারিবে। নগবালা কিছু বলিল না। কেবল তাহার হৃদয়ানন্দ মৃদু হাস্যরেখায় তাহার সুধাময় অধরপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসিটুকু যে কতটা মধুর, কতটা প্রেমময়, কতটা পবিত্র তাহা মহাপাপিষ্ঠ জ্যোতিঃপ্রকাশও বুঝিল।

কিন্তু বিকট পাপ কখন মধুর পবিত্রতার সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারে না। তাই জ্যোতিঃপ্রকাশ আপাততঃ নগবালার সান্নিধ্য ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। আমরাও তাহাই মনে করি। সে যদি একবার বসিয়া একবার সেই নিকলুষ প্রেমের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে

পারিত, তাহা হইলে সে আর জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত পাপ মিলন জন্যও উঠিতে পারিত না; তাহার দশা তখন মুদিতা নলিনীর বক্ষোমধ্যে আবদ্ধ মধুমক্ষিকার মত হইত। আহা! তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময়ীর কি হইত? সে কি একমাত্র কৃষ্ণকমলের অর্থহীন প্রেমে পরিতৃপ্তা থাকিতে পারিত?

যথার্থ প্রেমের মহা আকর্ষণ মহাপাপী ব্যতীত আর আর কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না; জ্যোতিঃপ্রকাশ মহাপাপী, অথবা বিধাতা তাহার অদৃষ্টে ততটা সুখের বিধান করেন নাই, তাই সে শীঘ্র নগবালাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; সে আপন ঘড়ী চেন ইত্যাদি লইবার জন্য, তক্তপোষের তলা হইতে আপন পেটক বাহির করিতে গেল। দেখিল সেই পেটকের উপর আর একটি ক্ষুদ্র পেটক, ছিটের ঢাকনির দ্বারা গাত্রাবরণ করিয়া, শান্ত শিষ্টের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। কিছু বিস্মিত হইয়া, সে তাহা বাহির করিয়া আনিয়া, মৃদু হাস্যময়ী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? এটা কার বাক্স?"

নগবালা মৃদুস্বরে কহিল, "ওটা আমার গহনার বাক্স।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি? তোমার গহনা হ'ল কোথা থেকে? তোমার গহনার দাম ত আমরা বিয়ের সময় সব নগদ নিয়েছিলাম।"

নগবালা পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে কহিল, "যে গহনাগুলো, দাদা আমাকে বিয়ের পর এই কয় বৎসরে গড়িয়ে দিয়েছেন, তাই ওই বাক্সে আছে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ এইবার বিধাতার হাত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। ভাবিল, তাহারই জন্য বিধাতা এই অলঙ্কার গুলা তাহার পত্নীর হাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে স্ত্রীর সে সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছে, ভাবিল, তাহার নিকট হইতে ওগুলি চাহিয়া লইলে সে বোকা কিছুই বুঝিবে না; তাহাকে সবগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রদান করিবে। কিন্তু এই সামান্য পুণ্যটুকুও বালিকার অদৃষ্টে ছিল না। পত্নীর নিকট চাহিয়া লওয়া, সে অপমানজনক মনে করিল। সে ভাবিল, এই বোকা পত্নীকে ঠকাইয়া এই অলঙ্কার গুলা হস্তগত করিতে হইবে। অতএব সে বলিল, "কিন্তু বাক্সটা অমন করে ওখানে ফেলে রাখা ভাল নয়; ওটা এখনই একটা ব্যাঙ্কে রেখে আসা দরকার। তুমি জান না, আজকাল বাবার এত হাত টান হ'য়েছে যে, ঘুণাক্ষরে যদি গহনার কথা টের পান, তাহ'লে তখনই তা' সমস্ত আত্মসাৎ করবেন।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে নগবালার সেই প্রফুল্ল মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল। সে বলিল, "ছি, ছি! তুমি অমন কথা মুখে এনো না। তুমি বাক্সটা ভাল যায়গায় রাখতে চাচ্ছ, রাখো। কিন্তু বাবার নামে অমন কথা আর কখনও বোলো না। ও কথা আমার শুনতেও নেই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পত্নীবাক্যের কোনও প্রত্যুত্তর করিয়া সময় নষ্ট করিল না। তাহার নিকট হইতে বাক্সের চাবি চাহিয়া লইয়া, সত্বর বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। অলঙ্কার কয়েকখানি বাহির করিয়া, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিল; এবং সরলা ধর্ম্মপত্নীকে উহা প্রদান করিয়া কহিল, "এই ফর্দ্দটা ঐ বাক্সে রেখে দিও। যখন গহনা আনবার দরকার হবে, তখন ঐ ফর্দ্দ দেখে গহনাগুলা মিলিয়ে নিও।"

নগবালা কহিল, "বাক্সটা নিয়ে যাও না কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য চাবি-বন্ধ বাক্সটা বাড়ীতে রাখিতে চায়; তাহা দেখিয়া গহনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও সন্দিহান হইবেন না। কিন্তু এই গূঢ় মর্ম্মকথা, বুদ্ধিহীনা পত্নীর কাছে প্রকাশ করা সে বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিল না। সে নগবালাকে কেবল বলিল, "সর্ব্বনাশ! এই কলকাতার রাস্তায় কোনও লোক গহনার বাক্স হাতে নিয়ে বেরুলে, তার কি রক্ষা আছে? তখনই গণ্ডা গণ্ডা গুণ্ডা তার পেছু লাগবে, আর তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে, তার হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নেবে। তার চেয়ে আমি এই কাগজটায় মুড়ে পকেটে করে ওগুলো নিয়ে যাব।"

নগবালা স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীত হইয়া আর কোন কথা বলিল না।

জ্যোতিঃপ্রকাশ সেইরূপে গহনাগুলি পকেটে লইয়া, শঙ্কিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, বেলা সার্দ্ধ তিন ঘটিকার মধ্যে বহুবাজারে আসিল; এবং আরও অর্দ্ধঘণ্টার ভিতর দরদস্তুর করিয়া সে গুলি পাঁচ শত ত্রিশ টাকায় বিক্রয় করিল। অতঃপর সে পার্কষ্ট্রীট এক জহরীর দোকানে যাইয়া পছন্দ করিয়া দুইটী অঙ্গুরীয় একশত নব্বই টাকায় ক্রয় করিল। হায়! জ্ঞানহীন মহাপাপিষ্ঠ বুঝিল না যে, সে ধর্ম্মপত্নীর অলঙ্কারের অর্থ বিনিময়ে নব প্রণয়িনীর জন্য অঙ্গুরীয় কেনে নাই, পুণ্যের বিনিময়ে মহাপাপ ক্রয় করিয়াছে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাগ্‌দান

যথাকালে পুনরায় বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, উত্তম রূপে মুখ হাত ধুইয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ নূতন বর সাজিবার জন্য, সজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইল। আজ তাহার সজ্জা অতি মনোহর হইয়াছিল; আজ সে যাহার সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছিল, সেই পতিপ্রাণা নগবালা, আপন সুকোমল হস্তে, প্রিয়তমকে বরবেশে সাজাইয়া দিল। তেমন সুন্দরবেশে সে স্বামীকে আর কখনও দেখে নাই; তাই সে আজ মুগ্ধ নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। মুগ্ধা পদ্মপলাশাক্ষীর সেই আগ্রহময় দৃষ্টি, জ্যোতিঃপ্রকাশকে পত্নীর দিকে আর একবার আকৃষ্ট করিয়াছিল; আবার সেই আকর্ষণ সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই; আবার মহা প্রলোভনে পড়িয়া, পাপী এক পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ফেলিল;—নগবালার হসিত রক্তাধরে চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। তাহার পর, পাপী মহা কষ্টে আরও পুণ্যের প্রলোভন সম্বরণ করিল; সত্বর পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, আবার পাপের নরককুণ্ডে ডুবিতে গেল।

জ্যোতির্ম্ময়ীদিগের বাটীতে পৌঁছিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীকে এক অভিনব সজ্জায় ভূষিতা দেখিল। সেই দিন সে এক হস্তবিহীন, সুন্দর, রক্তবর্ণ-রেশম-রচিত আঙরাখায় আপনার সুগোল বাহুদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া, নিজ পরিপুষ্ট বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল, এবং রক্তাভ পীতবর্ণের একখানি ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া যথার্থই অগ্নিশিখারূপিণী হইয়াছিল।—আজ এই জ্যোতিঃপ্রকাশ-পতঙ্গ, রূপের এই অগ্নি-শিখায় ক্ষুদ্র খদ্যোতের ন্যায়, পড়িয়া মরিতে আসিয়াছে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ, কৃষ্ণকমলদ্বারা নীত হইয়া, কুসুম-পল্লবাদির দ্বারা সুসজ্জিত, বিচিত্র চিত্রাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত, আলোকোজ্জ্বল এক কক্ষে প্রবেশ করিলে, শুভ্রবেশ-ধারিণী গজগামিনী মাতাঠাকুরাণী, সখীগণ সহ জ্যোতির্ম্ময়ীকে সেই কক্ষে লইয়া আসিলেন; এবং বর এবং কন্যাকে, তাহাদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট, পুষ্পমাল্য-পরিশোভিত এক বিচিত্র মখমল-মণ্ডিত আসনে উপবেশন করাইলেন। যুবতী সহচরী সকল, আপনাদিগের অলঙ্কারের আলোক দীপালোক উজ্জ্বলতর করিয়া, কলানিধি পরিবেষ্টনকারিণী নক্ষত্রমালার ন্যায়, বিবাহার্থীদের আসনের চারিপার্শ্বে বিচিত্র আসন সকল অধিকার করিল। যুবতীদিগের মধ্যে কেহ রসিকা, সে রসকথা কহিল; কেহ রঙ্গিণী, সে রঙ্গ কথা কহিল; কেহ রচয়িত্রী, সে আপনার রচিত সময়োচিত কবিতা পাঠ করিল; কেহ গায়িকা, সে সুকণ্ঠা না হইলেও গান গাইল; এবং আপন সুকণ্ঠের প্রশংসা লাভ করিয়া, তাহা সত্য মনে করিয়া সুখিনী হইল।

অতঃপর, জনৈকা সুন্দরীর অনুরোধে, জ্যোতিঃ-প্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর অলক্ত-রঞ্জিত বরাভয়প্রদ চারু করতল আপন আগ্রহময় করতল মধ্যে গ্রহণ করিল; এবং পুনঃ অনুরোধে, মহা আদরে, রঞ্জিত চম্পক কলির মত, প্রণয়িনীর বাম অনামিকা ধরিয়া, তাহাতে দেয় অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিল। ইহা অনুষ্ঠিত হইবা মাত্র, যুবতীগণের কুসুম-কোমল করপল্লবের করতালিতে কক্ষটি, বন্দুকধ্বনি নিনাদিত সমরক্ষেত্রের ন্যায়, নিনাদিত হইয়া উঠিল। কেহ আমাদের সেই পুরাতন হুলুধ্বনি করিতে

পারিল না? বিংশ শতাব্দীর বিদুষীরা হুলুধ্বনি করিতে লজ্জা করে না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী স্বয়ং এই অসভ্যোচিত কার্য্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহার আদেশে একজন দাসী, দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনবার শঙ্খধ্বনি করিল।

ত্রিতলের ছাদে প্রশস্ত আহার স্থান বিরচিত হইয়াছিল, এবং তাহা উজ্জ্বল আলোকমালা দ্বারা পরিশোভিত করা হইয়াছিল। রাত্র ঠিক আট ঘটিকার সময়, পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতা ঠাকুরাণীর সাদর আহ্বানে সকলে ছাদে উঠিল। নিমন্ত্রিতগণের ভিতর প্রায় সকলেই কামিনী; পুরুষের মধ্যে কেবল জ্যোতিঃপ্রকাশ ও কৃষ্ণকমল। কৃষ্ণকমলকে মদ্যপায়ী বলিয়া, মাতা ঠাকুরাণী বিলক্ষণ অবগত ছিলেন; এবং এরূপ উৎসব ক্ষেত্রে সে যে মদ্যপান করিয়া একটা কেলেঙ্কারী করিবে, তাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, নিমন্ত্রণ না করিলেও কৃষ্ণকমল নিশ্চয় আসিবে, এবং অকুণ্ঠ চিত্তে আহার করিবে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকমলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা সত্য কথা বলিব। এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণকমল মদ্যপান করিয়া আসে নাই। সে কেবল, আভীর সুন্দরীগণের ন্যায় যুবতীগণের মধ্যে, বংশীহীন বংশীধরের ন্যায় আপনার কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া শান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে ছাদে উঠিয়া সে সকলের সহিত আহার করিতে বসিল।

কৃষ্ণকমল, জ্যোতিঃপ্রকাশ, এবং রমণীগণ সকলেই একস্থানে আহার করিতে বসিল। ইহাতে পুরুষ সমক্ষে লজ্জাশীলা মন্দোদরীগণ কিছু কম আহার করিলেন না; বরং কেহ কেহ দামোদরকে পরাজিত করিলেন।

আহারাদির পর কিছুক্ষণ গল্প করিয়া, এবং জ্যোতির্ময়ীকে কিছু কিছু উপহার দিয়া, রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় যুবতীরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। জ্যাতির্ম্ময়ীও তাহাদের সহিত গল্প করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় মাতাকে বলিয়া গেল, "আমি কোথাও যাব না, মা। এই আমাদের দরজার কাছে, হাওয়ায় মাথাটা দিয়ে দাঁড়িয়ে, এই এদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কয়ে, এখনই ফিরে এসে শোব। তুমি আমার জন্যে মিছামিছি দেরী করো না। তুমি সমস্তদিন মেহন্নত করেছ, এখন একটু শোওগে যাও।"

মাতা স্নেহময়ী ও বাধ্যা কন্যার সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত স্থূল দেহ কষ্টে বহন করিয়া, আপনার শয়ন কক্ষে আগমন করিলেন; এবং তথায় একটি আলমারী খুলিয়া, তাহার এক গোপন প্রদেশ হইতে একটি বোতল বাহির করিলেন। বোতলে নিদ্রাকর, ক্লান্তিনিবারক ঔষধ ছিল। তিনি ঐ ঔষধ একটি স্ফটিকপাত্রে আবশ্যকমত ঢালিয়া ধীরে ধীরে পান করিলেন; এবং শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অচিরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণকমল জ্যোতিঃপ্রকাশকে সঙ্গে লইয়া আগেই রাস্তায় বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সেই রাত্রে রাস্তায় অধিকক্ষণ ভ্রমণের কোনও কারণ না থাকায় কৃষ্ণকমল জ্যোতিঃপ্রকাশের করমর্দ্দন পূর্ব্বক গুড্‌নাইট বলিয়া অল্পকাল মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিল; এবং অল্পকাল মধ্যে গলিপথে অন্তর্দ্ধান হইল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ রাস্তায় একাকী রহিয়া গেল। এখন সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? সে কি আপন উৎসবহীন, নিরানন্দ অন্ধকারময় গৃহে ফিরিয়া যাইবে? যাইয়া নগবালার দ্বারা অধিকৃত আপন মলিন দুঃখময় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে? জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপিণী সেই উজ্জ্বল রত্নমালাকে বক্ষে আজ ধারণ করিতে পারিবে না বলিয়া কি, সে গৃহস্থিতা সহজপ্রাপ্য, স্নিগ্ধ ও কোমল চম্পক মালাও ফেলিয়া দিবে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দোটানা।

মন্ত্রশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন আশীবিষ যেমন, হেটমুণ্ডে মন্ত্রোচ্চারকের দিকে অগ্রসর হয়, নগবালার প্রেম-প্রভাবে জ্যোতিঃপ্রকাশের অনিচ্ছুক চরণ তেমনই বাটীর দিকে

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং অল্পকাল মধ্যে সে বাটীর রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

নগবালা, বহু বিরহের পর প্রাপ্ত স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায়, পথ চাহিয়া জানালায় বসিয়া ছিল। সে স্বামীকে দ্বারদেশে প্রত্যাগত দেখিয়া, ছুটিয়া নিম্নে নামিয়া আসিল; এবং রুদ্ধ বহির্দ্বার অনর্গলিত করিয়া দিল। এইরূপ করিবার জন্য তাহার শ্বশ্রূমাতা তাহাকে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপত্নী নগবালা দীপবাহিকা হইয়া অগ্রগামিনী হইলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার নব-যৌবনপূর্ণ অনিন্দ্য অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উপরে উঠিতে লাগিল; তখন তাহার চরণ স্বেচ্ছায় উপরে উঠিতেছিল।

নগবালা শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের খেতে এত দেরী হল কেন? সেই ছ'টায় তুমি নেমতন্ন খেতে গেছ, আর খেয়ে এলে প্রায় এগারটার সময়। বল না, এত দেরী হ'ল কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ এই কথা শুনিয়া, অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল ইহা ত প্রেম কথা নয়, সুশিক্ষিতা যুবতীর সঙ্গীতোচ্ছ্বাসও নয়—এই সামান্য কথাগুলি, তাহার কর্ণে এমন মধুময় বোধ হইল কেন? মনে হইল, এই পল্লীকন্যার সামান্য কথাগুলিতে যেন পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সমস্ত সঙ্গীত মিশান রহিয়াছে।

কিন্তু পুরাতন সহজলভ্য সামগ্রী পাইয়া মানুষ কখনও অধিকক্ষণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। নূতনকে লাভ করিবার দুর্দ্দম ইচ্ছা দুর্ব্বল মানুষ সহজে দমন করিতে পারে না; সে নিত্য নূতন উত্তেজনাপূর্ণ দুর্ল্লভ সামগ্রী চায়। জ্যোতিঃপ্রকাশ আবার জ্যোতির্ম্ময়ীর ন্যায়, নূতন ও উজ্জ্বল রত্ন লাভের জন্য অস্থির হইল; তাহাকে পাইবার জন্য সে অর্থব্যয় করিয়াছিল, পাপ করিয়াছিল; সে এখন কি সেই সহজলভ্য পুষ্পমালা পাইয়া অধিকক্ষণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? সে বিনিদ্র নয়নে অগ্নিরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ীর অভিনব পরিচ্ছদাবৃত রূপ এবং তাহার 'অগাধ' প্রেমের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ যখন জ্যোতির্ম্ময়ীর চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় জ্যোতির্ম্ময়ীও কি শয্যায় শুইয়া জাগরিতা থাকিয়া, তেমনই জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রেম চিন্তা করিতেছিল? এস, আমরা তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

সে সখীগণের সহিত গল্প করিতে করিতে বাটীর সম্মুখে রাস্তায় বাহির হইয়া, আলেয়ার আলোকের মত নৈশ অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল, তাহা আপন আপন শকটে আরোহণ করিতে করিতে সখীগণ কেহই বুঝিতে পারিল না। কেহ মনে করিল, সে বাটীর মধ্যে আবার প্রবেশ করিয়াছে; কেহ মনে করিল, সে কোনও সখীর সহিত তাহার শকটমধ্যে আরোহণ করিয়া, তাহাকে তাহাদের বাটীতে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছে। ফলতঃ তাহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

এইরূপে অদৃশ্য হইবার পর, আমরা জ্যোতির্ম্ময়ীকে সহসা এক নিকটবর্ত্তী গলিপথে আবির্ভূতা দেখিলাম। সেখানে সে কৃষ্ণকমলের সহিত মিলিত হইয়া এক ত্রিতল বাটীর দ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল—উৎসব ভোজনের গোলমালের মধ্যে তাহারা এই মিলনের কথা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

সেই ত্রিতল বাটীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল; তাহা নানা জাতীয় বিভিন্ন লোককে পৃথক পৃথক ভাড়া বিলি ছিল। নিম্নতলের অন্ধকারময় নিকৃষ্ট কক্ষগুলি, নিম্ন শ্রেণীর পরিচারক ও পরিচারিকাগণ দখল করিত; দ্বিতল ও ত্রিতলের কক্ষগুলিতে গুণ্ডা, লম্পট ও রূপোপজীবিনীগণ বাস করিত; কৃষ্ণকমল সম্প্রতি ত্রিতলের একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সে বাটির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিল, "চল, মাই ডিয়ার, উপরে গিয়ে আমার 'নেষ্ট'-এ একটু 'রেষ্ট' নেবে এস।"

জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বেও সেই বাটীতে দুই একবার সুযোগ মত আসিয়াছিল। সে বলিল, "চল, যাই। না গেলে ত তুমি ছাড়বে না। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। মাকে বলে এসেছি, আমি দরজার বাইরে

হাওয়ায় একটু থাকবো। মা যদি জানত যে, তুমি এত কাছেই ঘর ভাড়া নিয়েছ, তাহলে আমাকে দরজার বার হতে দিত না।"

কৃষ্ণকমল বলিল, সেই "ওল্ড ক্যাটকে ইগ্‌নোরেন্সে থাকতে দাও।" ইহার পর সে দীর্ঘ সোপান পথ অতিক্রম করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া, ত্রিতলে আরোহণ করিল; এবং চাবি খুলিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। সুইচ টিপিয়া বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিল।

ঘণ্টাখানেক পরে, জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহে ফিরিবার জন্য উঠিল। উপস্থিতা এবং অনুপস্থিতা সখীগণের নিকট হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী যে সকল উপহার পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়েক খানি চিত্রিত ও সুগন্ধ আচ্ছাদন আবৃত পত্রিকা ছিল। এই আচ্ছাদন মধ্যে কেহ দশ টাকার কেহ কেহ কুড়ি টাকার নোট উপহার দিয়াছিল। এই অর্থ প্রাপ্তির সংবাদ সে তাহার মাতাকে জানিতে দেয় নাই। আসিবার সময়, কৃষ্ণকমলের প্রীতির জন্য, এই অর্থ হইতে দশ টাকার দশখানি নোট সে বসন মধ্যে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বিদায়কালে সেগুলি সে কৃষ্ণকমলের হাতে দিল।

কৃষ্ণকমল অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নোটগুলি গ্রহণ করিয়া, তাহা সত্বর আপনার পকেট মধ্যে রাখিল; এবং বলিল, "ভেরি থট্‌ফুল অফ ইউ মাইডিয়ার! কিন্তু বিয়ের দিন, তোমার ওল্ড মাদার এর কাছ থেকে আমাকে থাউজান্‌ড্‌ রুপিজ্‌ আদায় করে দিতে হবে, তোমার মনে আছে ত?"

জ্যোতির্ম্ময়ী সংক্ষেপে বলিল, 'আছে।' তাহার পর, কৃষ্ণকমলের সাহায্যে শীঘ্র নিয়ে নামিয়া রাস্তায় বাহির হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা"

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে দেবেন্দ্র রমণী সম্বন্ধে একস্থলে আছে,—

"—— —— ——বিরহবিধুরা,
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে।"

এইখানে পদাঙ্কদূতের * পদাঙ্ক সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়;—

"গোপী ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম॥"

পদাঙ্কদূতের এই "বিরহবিধুরা" "ভ্রান্তিদূতী সহায়া" "উন্মত্তেব গোপী"ই হইল ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বীজ এবং এই বীজ কবির মনঃক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল সম্ভবতঃ তিলোত্তমাসম্ভব রচনার পূর্ব্বেই। মধুসূদন তিলোত্তমা রচনা শেষ করিয়া, জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও বিদ্যাপতির "পদাবলী" আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন তাঁহার বন্ধুবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন—"মধু, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনাতে পার?" মধুসূদন যাহা লিখিবেন বলিয়া সংকল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ ভূদেবের মুখ হইতে ঠিক তাহারই ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি অধিকতর আগ্রহে তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্র হস্তে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রজাঙ্গনা নামক এই গীতিকাব্য খানি রচনা করিলেন। এই সময়ে একদিন তাঁহার পরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক কবির মুখে পাণ্ডুলিপির কিছু

* পদাঙ্কদূতম্—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম ইহার রচয়িতা। ইহার আদি নিবাস শান্তিপুরে ছিল। পরে ইনি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। ১৬৪৫ শকাব্দে এই কাব্যখানি রচিত হয়।

কিছু আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, উদার স্বভাব মধুসূদন তৎক্ষণাৎ এই কাব্যের স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়া ছাপিবার জন্য পাণ্ডুলিপি খানি ঐ ভদ্রলোকের হস্তে প্রদান করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে মধুসূদনের লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রজাঙ্গনা রচনা শেষ করিয়া এবং ছাপিতে দিয়া, পরে মেঘনাদবধ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।—

"I enclose the opening invocation of my মেঘনাদ। You must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old রাধা and her বিরহ।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মধুসূদন মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা "এক সঙ্গে রচনা" করেন নাই। *

এই গীতিকাব্য খানি মধুসূদনের প্রথম গীতিকাব্য; এবং দুঃখের বিষয় যে, উহাই তাঁহার শেষ গীতিকাব্য—ইচ্ছা থাকিলেও মনশ্চাঞ্চল্যে তিনি আর গীতিকাব্য লিখিতে পারেন নাই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে যিনি বঙ্গ সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং পরে মেঘনাদবধ কাব্যে ঐ ছন্দের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিলেন, তাঁহারই লেখনী হইতে, ঐ দুই খানি কাব্য রচনার মধ্যে, সুমধুর মিত্রাক্ষরের এই গীতিকাব্য খানি রচিত হইতে দেখিয়া তাৎকালিক সাহিত্যসমাজ বাস্তবিকই চমকিত হইয়াছিলেন। শুধু চমকিত নহে;—বহু দিনের পরে এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্য খানিতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মজ্জাগত রসের আস্বাদন পাইয়া তাঁহারা মুগ্ধও হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমাশ্রুতে সিক্ত এই বাঙ্গালা দেশে রাধা ভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। বৈষ্ণব যুগের পরে বহুকাল ধরিয়া আর কোন কবি রাধা ভাবের এমন করুণ চিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরেন নাই। মধুসূদনের নিকট হইতে এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত দান—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা মাধুর্য্যে মহান্।

মধুসূদন বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনা কালে দেখিয়াছেন যে, তাহাতে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার উন্মাদাবস্থা পরোক্ষ ভাবে সখীদের মুখে বর্ণিত হইলেও, সাক্ষাৎ ভাবে উন্মাদিনী রাধিকার চিত্র কোথাও নাই। তাই তিনি পদাঙ্কদূতের বিরহবিধুরা, ভ্রান্তিদূতী সহায়া, "উন্মত্তা" গোপীকে উপাদেয় উপাদান বস্তু স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, আগাগোড়া রাধিকার ভূমিকায় এই গীতিকাব্য খানি রচনা করিয়াছেন। কবি এই কাব্যে উদ্‌ভ্রান্তা রাধিকাকে ব্রজের পূর্ব্ব স্মৃতির যত কিছু স্থান সেই সব স্থানে ঘুরাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই রাধিকার পূর্ব্ব স্মৃতির hallucination, এবং কৃষ্ণসেবিত সকল স্থলেই রাধিকার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি।

প্রথমেই, "বংশীধ্বনি"—(ইহা কি বন্ধুবর ভূদেবের অনুরোধ স্মরণে?)—ব্রজে কৃষ্ণ নাই, তথাপি রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত কর্ণে বংশীধ্বনি হইতেছে;—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে বাঁশরী রে" ইত্যাদি।

এই ঘোর বিরহের দিনে সখীর ফুল তুলিবার বা ফুলমালা গাঁথিবার কথাই নয়, তখন উদ্‌ভ্রান্ত রাধিকা তাঁহার ভ্রান্ত দৃষ্টিতে পূর্ব্বস্মৃতির ফুলরাশি দেখিয়া সখীকে অনুযোগ করিতেছেন;—

"কেন এত ফুল, তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ডালা?"—ইত্যাদি *

---

* "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত" লেখক মহাশয়ের উক্তি—"মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা এক সঙ্গে রচনা" ভ্রান্তি মূলক। ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছিল—এমন কি, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম ভাগ (পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পরে, উহার দ্বিতীয় ভাগের শেষ সর্গ যখন ছাপা হইতেছিল, এমন সময়ে ব্রজাঙ্গনা মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বাহির হয়। (ঐ জীবন চরিত্তের ৩য় সংস্করণে ৪৩ পৃঃ দেখ)। বোধ হয়, এই জন্যই ব্রজাঙ্গনা রচনার কাল সম্বন্ধে কবির জীবন-চরিতকার মহাশয়ের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।—লেখক।

* বহুকাল পূর্ব্বে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) তখন আমি কলিকাতায় বি-এ শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে ব্রজাঙ্গনার এই কবিতাটী স্থলে-স্থলে দু'একটী কথা সংযোগ-বিয়োগ করিয়া, খাম্বাজ একতালায় গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। গোলদীঘির

কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখিয়া ধরণীর প্রতি উন্মাদিনীর রাগ !—

"মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেন পরিবে ধরণী ?"

গোধূলি-কালে গোকুলের গাভীকুল গোষ্ঠে ফিরিতেছে, অথচ "রাখাল-চূড়ামণি" নাই দেখিয়া পাগলিনীর বিষাদ ;—

"আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !"

কৃষ্ণ যে গোকুলেই নাই, রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে এ কথা স্মরণই হইতেছে না।

ব্রজে বসন্তের সুষমা দেখিয়া উন্মত্তা রাধিকার মনে কি চমৎকার কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি ! —

"আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।"

মধুর বসন্তে কুঞ্জে-কুঞ্জে কতই শোভা ! সেখানে হয়ত কৃষ্ণ থাকিতে পারেন :—

"কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে।"

নিকুঞ্জময় কুসুম প্রস্ফুটিত, সৌরভে দিক্‌সকল আমোদিত, পিককুল-কাকলী ও ভ্রমর-গুঞ্জনে বনভূমি মুখরিত। রাধিকা ভাবিতেছেন,—

"পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী,
ধূপরূপে পরিমল আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গম কলকল, মঙ্গলধ্বনি।"

আর ভাবিতেছেন যে, এ সময়ে নিকুঞ্জে নিশ্চয়ই নিকুঞ্জবিহারী বিরাজ করিতেছেন। তাই তিনি সখীকে বলিতেছেন ;—

"চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি।
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে,
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।" ইত্যাদি

এবং পূজা-শেষে —

"চির-প্রেম বর মাগি ল'ব ওগো ললনে !"

এইখানে উন্মাদিনী রাধিকার মানসিক শ্যামপূজার শেষ হইল বটে, কিন্তু চিরবিরহী মানবের চিরন্তন কামনার করুণধ্বনি পাঠকের হৃদয়ে রণিত হইয়া উঠিল।

এই কাব্যে ব্রজের কৃষ্ণবিরহ যেন বিরহোন্মাদিনী রাধিকার মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রজের চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে,—কোথাও কৃষ্ণ আছেন ভাবিয়া, কোথাও কৃষ্ণ আসিতে পারেন ভাবিয়া, কোথাও বা কৃষ্ণ থাকিতেন ভাবিয়া ;—সকল স্থলেই উন্মাদিনীর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—কোথাও গমনে, কোথাও স্মরণে, কোথাও বা অন্বেষণে !

কাব্যখানির ভাষাও বেশ বিষয়োপযোগী ও গীতি-কবিতারই উপযুক্ত। ছন্দও স্বাধীন মিত্রাক্ষর —বাঁধাবাঁধি পয়ার, ত্রিপদী, বা চতুষ্পদী নহে ;—ভাষা ও ছন্দ যেন ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে। উপমা-রূপকাদি অলঙ্কার সংস্কৃতের আদর্শে। মধুসূদনের এই গীতিকাব্য খানিতে, কি আদর্শে, কি ভাবে বা ভঙ্গিতে, কোন অংশেই পাশ্চাত্য প্রভাবের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। মধুসূদন এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিতে বাঙ্গালীর প্রাণ দিয়া বাঙ্গালীর মজ্জাগত রাধাভাবের একটা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

মধুসূদন রাধা-ভাবের রসমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে। কিন্তু তাঁহাদের রাধিকার ভোগ-লালসার প্রাচুর্য্য দেখিয়া, তিনি ভোগ-লালসার অতীত দিব্যোন্মাদের যে অনাবিল রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা—বৈষ্ণবাদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। মধুসূদনের প্রাণে বৈষ্ণব-ভাব থাকিলেও, তিনি সাধক-বৈষ্ণব ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত। শুধু কাব্য-প্রতিভা-বলে কাব্যাংশে সাধক-কবির কতখানি

খাদে বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়া গান করিতাম। উহার আরম্ভ এইরূপ -

"কেন এত ফুল, তুলিলি স্বজনি, —
(যতন করিয়ে) ভরিয়ে ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, (কহ লো, স্বজনি,)
পরে কি রজনী, তারার মালা ?"—ইত্যাদি

গানটী অতি শীঘ্র মুখে মুখে প্রচারিত হয় এবং বহুকাল পর্য্যন্ত উহা বড়ই লোক-প্রিয় ছিল। এখন আর ঐ গানটী কাহারও মুখে শুনিতে পাই না, তাই এখানে কথাটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

সমকক্ষ হইতে পারা যায়, এই ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি তাহার চমৎকার নিদর্শন। তবে, চণ্ডীদাসের সহিত মধুসূদনের তুলনাই হইতে পারে না, ব্রজাঙ্গনা-প্রসঙ্গে নব্য-বৈষ্ণবপন্থী কেহ কেহ একথা ভাবিয়া দেখেন না। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবাবিষ্ট (আধুনিক ভাষায় "মিষ্টিক") কবি। কিন্তু মধুসূদন, জয়দেব-বিদ্যাপতি-প্রমুখ বৈষ্ণবদিগের ন্যায় প্রধানতঃ বস্তুতন্ত্রের—রূপরসাদির কবি। চণ্ডীদাস রূপরসাদি স্পর্শ করেন না, এমন নয়; কিন্তু রূপ-রসাদির মধ্যে তিনি অবস্থান করেন না। রূপ-রসাদি স্পর্শ মাত্র করিয়া তিনি অতীন্দ্রিয় ভাব-রাজ্যে উঠিয়া যহেন। তাঁহার যতকিছু ভাব-লীলা, কবিত্ব-সৌন্দর্য্য, সে সবই ভাব-জগতে। মধুসূদন এই শ্রেণীর কবি নহেন। জয়দেব বিদ্যাপতির ন্যায়, রূপরসাদির রাজ্যই তাঁহার কবিত্ব-ক্ষেত্র এবং তাঁহার যাহা কিছু কবিতা-মাধুরী, তাহা রূপ-রসাদির ক্ষেত্রেই মুপরিত। যদি কোন বৈষ্ণব কবির সহিত মধুসূদনের তুলনাই করিতে হয়, তবে বিদ্যাপতির সঙ্গেই তুলনা করা চলে এবং সে তুলনায় মধুসূদনকে কোন অংশেই হীন বলা চলে না। বরং জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতির অনেক স্থলে যে ভোগলালসার আধিক্য লক্ষিত হয়, মধুসূদনের এই দিব্যোন্মাদিনী রাধিকায় বিষয়-গুণে তাহার অসম্ভাব। বৈষ্ণব তত্ত্বে রাধিকার এই দিব্যোন্মাদ, তন্ময়তার চরম পরিণতির পরিচায়ক। তাই উহা রাধাভাবের একটি উচ্চ তর বলিয়া পরিগণিত। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় রাধিকার আদর্শ এই এই স্তরের। তাঁহার এক পত্র হইতে ইহার একটু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। পত্রখানিতে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক রসিকতার ভঙ্গিতে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন,—

"—Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the begining, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours."

বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে মাধুর্য্য ভাবাত্মক লীলারস পরিস্ফুটনের একটা গুহ্য (Esotric) দিক্ ও ভাব আছে—যাহা সাধক বৈষ্ণব ভিন্ন অপরের অধিগম্য নহে। মধুসূদন কবি হইলেও "বৈষ্ণব" কবি ছিলেন না; আর তাঁহার প্রাণে বৈষ্ণব ভাব থাকিলেও তিনি সাধক বৈষ্ণব ছিলেন না। কাযেই তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যিকের চক্ষে পদাবলী সাহিত্যের বাহ্য (Exoteric) দিক্‌টা দেখিয়াই উহার স্থল বিশেষকে কুৎসিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরে বঙ্কিম চন্দ্রও ঠিক ঐ কারণেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে "মদন মহোৎসব" নাম দিয়া উহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক মধুসূদন পদাবলী-সাহিত্য হইতেই রাধা ভাবের একটা উচ্চতর স্তরের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি উহাতে ভোগ লালসার প্রাচুর্য্য বর্জিত হইয়াছিলেন। তাই, তিনি বৈষ্ণব পরোক্ত তন্ময়তার পরিচায়ক দিব্যোন্মাদ অবস্থা অবলম্বনে মহাভাবময়ীর তন্ময় ভাবের অনাবিল একটা রসমূর্ত্তি যতখানি তাঁহার কবিত্ব শক্তিতে সম্ভব, তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাধক এ কাব্যে প্রাণের পরিচয় পাইতে পারেন কি, না—বলিতে পারি না;—কারণ, সাধকের অনুভূতি আমার নাই। তবে, সাহিত্যিক অনুভূতিতে এই কাব্যখানি যে বেশ প্রাণময় ও রসাল, তাহা এই

* শুধু বৈষ্ণব-সাধনায় নহে, সকল ধর্ম্মের সাধনাক্ষেত্রই একটা গুহ্যদিক্ ও ভাব আছে। বৈষ্ণব-সাধকের কাছে পদাবলী-সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্য ও কবিত্ব নহে, উহা তাঁহার সাধনার (Emotional realisation এর) সহায়। শ্রীচৈতন্য, রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ সাধকের সহিত নিভৃতে জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর রস পরমানন্দে আস্বাদন ও উপভোগ করিতেন। সুতরাং এরূপ সাহিত্যের কেবলমাত্র বাহ্যদিক্ দেখিয়া ও বাহ্যভাব লইয়া নিন্দা করা সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে সমীচীন নহে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি, তাহার নিগূঢ় সাধনাই বা কিরূপ এবং সেই সাধনায় পদাবলী-সাহিত্যই বা কতটা সহায়—এ সব গোড়ার কথা আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কাব্যখানির প্রতি পাঠক সমাজের সুদীর্ঘ কালব্যাপী সমাদরই প্রকৃষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। এই ব্রজাঙ্গনা কাব্যে নবযুগের ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়া উন্মাদিনী রাধার বৈষ্ণব প্রেমের যে নির্ম্মল রসচিত্র আমরা পাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্য-সৌধে তাহা চিরোজ্জ্বল ভাবে বিরাজমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের প্রারম্ভে বৈষ্ণব-সাহিত্যের মাধুর্য্য ভাবাত্মক এই গীতিকাব্যখানি যদি নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে আদর্শ রাধাভাবের উন্মেষ কল্পে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়া থাকে ;—যদি পাশ্চাত্যমুখ নব্য বাঙ্গালীকে তাহার নিজস্ব ধন বৈষ্ণবাদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্য খানি রচনা করিয়া মধুসূদন ধন্য হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মেদিয়ায় আসিয়া গোবিন্দলাল শুনিল, তাহার মাসী গ্রামের অন্যান্য লোকের সহিত শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এইবার গোবিন্দলাল দেখিল, পৃথিবীতে তার আপনার বলিতে কেহই নাই। গোবিন্দলাল অত্যন্ত নিরাশ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে তাহার শূন্য গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, প্রাঙ্গনে এক হাঁটু ঘাস গজাইয়াছে, ঘরের চাল খসিয়া পড়িতেছে। প্রতিবেশীরা কোন কোন দরজা ও জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল মাথায় হাত দিয়া সেই পরিত্যক্ত গৃহের অপরিচ্ছন্ন দাওয়ায় বসিয়া পড়িল।

গোবিন্দলালকে দেখিয়া প্রথমে একটী বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "যে গেছে তার জন্যে আর শোক করে কি হবে বল? তার সময় হয়েছিল, চলে গেছে। তীর্থের পথে জগবন্ধুকে স্মরতে করতে করতে নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে। আহা কেঁদে কেঁদে তোমার চোখ দুটি রাঙা হয়েছে দেখছি। মুখে সে যাই বলুক, অন্তরে অন্তরে তোমায় বড় ভালবাসত। তোমার মাথার অসুখ কি এখনো আছে বাবা?"

গোবিন্দলাল প্রতিবেশিনীর কথার কোন উত্তর দিল না। বৃদ্ধা মনে করিল, গোবিন্দলাল এখনো পাগলই আছে—কথা মিথ্যা নয়।

ক্রমে আরও দুই তিন জন প্রতিবেশী আসিল। তাহারা বলিল, "আহা, বুড়ী যখন শ্রীক্ষেত্রে যায় তখন বার বার কেবল তোমার কথাই বলেছিল। তা, তুমি এখন যোগ্য হয়েছ, পয়সা উপার্জ্জন করতে শিখেছ, তোমার আর ভাবনা কি? দু'দিন বিশ্রাম কর, মাথা স্থির হোক, তারপর নূতন করে সংসার পাত। আমরা আছি তোমার ভয় কি?"

গোবিন্দলাল ইহাদের কথার উত্তরে শুধু বলিল, "আচ্ছা দেখি" এবং সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

প্রতিবেশীরা অবাক্ হইল। এখন তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিল যে, গোবিন্দলাল পাগল। গোবিন্দের মাসীর মৃত্যুসংবাদ যেদিন গ্রামে জানা গিয়াছিল তাহার কয়েকদিন পরেই একজন চতুর প্রতিবেশী রটনা করিয়া দিল যে, গোবিন্দলাল পাগল হইয়াছে। পাগলের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই সে তখন কয়েকটি জানালা ও কবাট খুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। লইবার আর কিছু ছিল না। সে এখন বলিয়া বেড়াইতে লাগল—"দেখলে, আমার কথা

ঠিক কি না। আগে কামড়াতে আসত,—এখন তবুও অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে।"

আরও কয়েকদিন চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল কি করিল, কোথায় গেল, কেহই তাহা জানিল না এবং জানিবার জন্য কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না। গোবিন্দলাল এই সময়ের মধ্যে নানা স্থানে টাকার চেষ্টা করিল। তাহার পিতা যখন জীবিত ছিলেন তখন যাহারা কত আত্মীয় দেখাইত—আপন আপন পুত্র বা ভ্রাতা যাহাতে কিছু বিত্তলাভ করিতে পারে সে জন্য তাহার পিতাকে কতমতে তোষামোদ করিত—কেহ বা তাহার পিতার নিকট অর্থ লইয়া আর প্রত্যর্পণ করে নাই, কেহ বা শেষে জমীদারের দুর্দ্দান্ত নায়েব কৃষ্ণকান্তের সাহায্যে নানা কৌশলে তাহার পিতার ভূসম্পত্তি গ্রাস করিয়া তাহাকেই পথে বসাইয়াছে, এখন তাহারা গোবিন্দলালের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা কহিতেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল যে পাগল হইয়াছে একথা বহুদিন পূর্ব্বেই গ্রামে রটিয়াছিল। অর্থসংগ্রহের এই প্রাণপণ চেষ্টা এখন গোবিন্দলালের উন্মত্ততার অন্যতম লক্ষণ বলিয়া অতি সহজেই প্রচারিত হইয়া গেল। এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে অনেকে পূর্ব্বঋণ স্বীকার করিল না, এবং যাহাদের সহিত যত বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহারাই এখন গোবিন্দলালকে তত বেশী পর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা গোবিন্দলাল এবং তাহার পিতার সহিত কোনরূপ আত্মীয়তা থাকা স্বীকার করিবারই আবশ্যকতা দেখিল না। যাহারা এতটা পারিল না, তাহারা দুই তিন বর্ষের পুরাতন সিপাহী বিদ্রোহের কথা তুলিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "বাপু হে, কাল ভাল নয়। নইলে তোমাকে কিছু টাকা ধার দিব সে আর একটা বেশী কথা কি? তোমার বাপের কত খেয়েছি। তুমি ত জান না, সিপাহীরা ক্ষেপে উঠে কি অনর্থ বাধিয়েছে,—কোম্পানীর মুলুকে একটা তোলপাড় লাগিয়েছে, যার কাছে যা পাচ্ছে কেড়ে নিচ্ছে। আর তোমার দরকারই বা এমন কি? অসময়ে কি এত টাকা কাছে রাখতে হয়? মাথা ঠাণ্ডা হোক, শরীর সেরে উঠুক, দেখা যাবে।"

সকলের মুখেই যখন গোবিন্দলাল শুনিতে লাগিল সে পাগল, তখন গোবিন্দলাল ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আমি পাগল? নহিলে গ্রাম সুদ্ধ লোকে এমন বলে কেন?

একালের যেমন চৌকিদার, দফাদার, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি আছে, সেকালে তেমনি এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের নাম ঘাটোয়াল। প্রজার প্রাণ সম্পত্তি রক্ষার ভার ঘাটোয়ালের উপর ন্যস্ত থাকিত। সে চোর ধরিত, দস্যু তাড়াইত, ঘাট বসাইয়া গ্রামের প্রবেশ পথ রক্ষা করিত, আবশ্যক হইলে লাঠির ভয় দেখাইয়া পঞ্চক বা খাজনা আদায় করিত। কতকগুলি ঘাটোয়ালের উপর একজন সাদিয়াল এবং কতকগুলি সাদিয়ালের উপর একজন করিয়া সর্দ্দার থাকিবার ব্যবস্থা সেকালে বর্ত্তমান ছিল। ইহারাই গ্রামের সুখ দুঃখের বিপদসম্পদের, তর্ক বিচারের, বিবাদ সালিষের সকল সংবাদ রাখিত এবং পথ, ঘাট, সেতু রক্ষা করিত। এ ব্যবস্থায় যে বাঙ্গালার গ্রামে শান্তি রক্ষার বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত তাহা নহে। তবে কখনো কখনো সর্দ্দার বা সাদিয়াল বা ঘাটোয়াল নিজেরাই সুবিধা পাইলে লুণ্ঠন বা অত্যাচার করিতে ছাড়িত না। পঞ্চক আদায় করিয়া নিজেরাই তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহারা যে কখনো কখনো ব্যস্ত থাকিত না, তাহা বলা চলে না। পঞ্চকের টাকা এইরূপে লইবার জন্য মেঝিয়ার সর্দ্দার দুইবার সর্দ্দারি হারাইতে বসিয়া ছিল।

মেঝিয়ার সর্দ্দার মেঝিয়াতেই থাকিত। তাহার যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল। লোকে যেমন ব্যাঘ্র ভল্লুককে ভয় করে, সর্দ্দারকেও তেমনি করিত। গোবিন্দলাল জানিত তাহার পিতার সহিত সর্দ্দারের বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তাহার জন্যই সে শেষবার পঞ্চকের টাকা আত্মসাৎ করিয়াও ত্রাণ পাইয়াছিল।

গোবিন্দলাল বড় আশা করিয়াই সর্দ্দারের শরণাপন্ন হইল। সর্দ্দারও তাহার অপরিচিত নহে। সে কতদিন বিনা পারিশ্রমিকে সর্দ্দারের রাশি রাশি কাগজ লিখিয়া দিয়াছে।

গোবিন্দলাল যখন সর্দ্দারের নিকট নিজের বাসভূমি বিক্রয় করিতে চাহিল তখন সর্দ্দার হাসিয়া বলিল, "ও যে

আমার গোয়ালের যোগ্যও নয়। কতই আর দাম হবে, বড় জোর দু'পাঁচ টাকা।"

গোবিন্দ বলিল, "বাড়ীখানাও নিন, আর আমি লিখে দিচ্ছি, যতদিন বাঁচব মাসে মাসে আপনার টাকা শোধ করবই, সুদের পরিবর্ত্তে আজীবন দাস হয়ে থাকব।"

সর্দ্দার মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ছোটলোক কি না, তার উপর আবার মাথা খারাপ। দিন রাত্রি টাকার স্বপ্ন দেখছো। সংসারের ত খবর রাখ না! ওসব দলিল কি আর একালে চলে? নবাবী আমলে চলত। তুমি ত পাগল, তোমার দলিলের আর দামই বা কি?"

গোবিন্দলাল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কে বলে আমি পাগল? আমি পাগল নই।"

সর্দ্দার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "পাগল কি আর জানে যে সে পাগল? একটা নয় দুটো নয় আটশ টাকা কে তোমায় বিশ্বাস করে'দেবে বল? ভগবান্ যাকে কাঙাল করেছেন তাকে কাঙালই থাকতে হয়। দরিদ্রের অত টাকার প্রয়োজন কি? আমারও এখন বড় টানা-টানি। এই সবে নূতন ঘোড়া কিনেছি, গাড়ী এনেছি। তা তুমি যদি এতই অভাবে পড়ে থাক, আমার সেরেস্তায় লেখাপড়া কর, কিছু কিছু পাবে।"

গোবিন্দলাল সবিনয়ে বলিল, "আমি ত বলেছি, আটশ টাকা চাই, তার কমে আমার হবে না।"

"এই আবার পাগলামি আরম্ভ করলে দেখছি! আটশ টাকা কত তা জান?"—বলিয়া সর্দ্দার হাসিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিল, "আপনি ত আমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানেন। আমার বাবার মত ভাল লোক—"

বাধা দিয়া কঠোর কণ্ঠে সর্দ্দার বলিল, "তোমার বাবা ভাল লোক বলেই কি তোমার চোর হতে নেই? তোমার বাবা বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তুমি যে পাগল হয়েছ।"

গোবিন্দলাল আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার হৃদয়শোণিত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

সর্দ্দার বলিল, "যাও এখান থেকে, এ পাগলামির জায়গা নয়। খেতে নেই এক মুঠো—আটশ টাকার স্বপ্ন দেখেন—"

গোবিন্দলাল বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কঠোর কণ্ঠে বলিল, "সর্দ্দার মশায়, গরীবেরও মান ইজ্জৎ আছে। আমার বাবার চেষ্টাতে আজও আপনি—"

সর্দ্দার, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ভাবিল, পাগলের ত স্পর্দ্ধা খুব! আমার সাক্ষাতে তহবিল তস্রুপের কথা মুখে আনে। অতিশয় পরুষ কণ্ঠে সর্দ্দার বলিল, "বটে! ছোট মুখে বড় লম্বা লম্বা কথা দেখছি ত! দিন তনু রক্ষা যার তার আবার মান! কাঙালের আবার ইজ্জৎ! কে আছিস, দে পাগলা বেটাকে বের করে।"

আদেশ মাত্রেই একজন নগদী আসিয়া গোবিন্দ-লালের হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। পথে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—ভয়ে নহে, রোষে এবং ক্ষোভে।

যখন শেষ বেলা ডুবিয়া গেল, গোবিন্দলাল তখন বুঝিল—যাহার অর্থ নাই তাহার কিছুই নাই। কাঙাল যে, সে ভালবাসিবার অধিকারী নহে—ভালবাসা পাইবার আশা তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দয়া কোন সদ্বৃত্তি তাহার থাকিতে নাই। সে যেন মূর্ত্তিমান পাপ, ভীষণ মহাব্যাধি। সে জগতের অস্পৃশ্য, সে মড়ক। সত্যসন্ধ হইলেও সে মিথ্যাবাদী, মানী হইলেও ধরণীর ধূলি অপেক্ষাও হীন, শূর হইলেও দুর্ব্বল, সজ্ঞানে সে পাগল। এই পত্রে পুষ্পে ফলে জলে পূর্ণ বসুন্ধরা তাহার জন্য নহে। জীবন সম্বল সে এখানে মাথা লুকাইবার স্থানের ভিখারী—জীবনান্তে শ্মশানভূমিও তাহাকে কোলে আশ্রয় দেয় না। নদীবক্ষই হয় তাহার শেষ শয়ন।

গোবিন্দলাল মাতালের মত টলিতে টলিতে দরিদ্রের সেই শেষ শীতল শয়ন লাভ করিবার জন্য ভরা ভাদ্রের খরস্রোত দামোদরের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং টাকার থলিটা বেগে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া যখন উন্মত্তবৎ নদীগর্ভে নামিল—তখন শুনিতে পাইল পশ্চাতে কে যেন তীব্রকণ্ঠে কহিল, "যাও কোথায় আহাম্মুক! শুনছ না বান ডাকছে—হুরপা বান—এখনই ডুবে মরবে যে!"

উত্তরে গোবিন্দলাল কি যে বলিল, তাহা আগন্তুক

"কি আর বলব সাদিয়াল মশায়! যাদের উপর বড় বেশী ভরসা করেছিলাম তারা আমায় চিন্‌তেই পারলে না।"

"সে আর একটা নূতন কি? অমন অবস্থায় কেউ কাকে চেনে না। তুমি হলেও চিন্‌তে না।"

রামরতনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দলাল বলিতে লাগিল, "তাদের চোখে আমি পাগল। দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে দুশো টাকার বেশী জুটলো না—তাও এখন নদীগর্ভে। এই দেখুন, আমার হাত দুখানা দেখুন। এগারো মাস পাথর কেটে কেটে কি হয়েছে দেখুন।"

গোবিন্দলাল তাহার ক্ষত বিক্ষত ছিন্ন কর দুইটী বিস্তৃত করিয়া রামরতনের সম্মুখে ধরিল। রামরতন উহা দেখিল না, দুই হস্তে সরাইয়া দিয়া সহানুভূতিহীন কণ্ঠে বলিল, "ও সব হয়েই থাকে! তুমি নিতান্ত গাধা, তাই পাথর খুঁড়ে হীরা লাভ করতে গিয়েছিলে। অযোগ্যের ঘরে কি লক্ষ্মী আসে? টাকা ত ছড়ানো আছে—"

মহুয়া তখন গোবিন্দলালের মস্তিষ্কে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিল। সে এবার নিজেই সুরাপাত্র তুলিয়া লইয়া পান করিতে করিতে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "এ কথা ত আপনি আগেও একবার বলেছিলেন। টাকা যদি ছড়ানোই থাকবে, তবে আমি পেলাম কৈ? আমি কি পরিশ্রম করতে ত্রুটি করেছি—চেষ্টা করতেও কি কিছু বাকী রেখেছি?"

রামরতন বলিল, "তুমি এখনই বলছিলে না, যে তোমার বন্ধু বান্ধব নেই?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ, কোথাও নেই।"

"আমি তোমার বিপদের দিনের বন্ধু, যেমন করে পারি তোমার উপকার করবই।"

ব্যগ্র হইয়া গোবিন্দলাল বলিল, "তবে বন্ধু দয়া করে আমায় হাজার টাকা কর্জ্জ দিন। আমি শপথ কচ্ছি নিশ্চয় শোধ করব।"

বিদ্রূপের স্বরে রামরতন কহিল, "কর্জ্জ। কি চমৎকার শাস্ত্রই গড়ে গেছেন ঋষিরা। ঘৃত খাবার সাধ আছে—অথচ সাধ্য যখন নেই—ঋণ করে খাও। কেন বাপু, ঋণ করব কেন? সুধবে কে? যার ঘরে আবশ্যকের অতিরিক্ত ঘৃত আছে, সে একাই কেন তা ভোগ করবে বলতে পার?"

গোবিন্দলাল রামরতনের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রামরতন বলিতে লাগিল, "আমার কথা শোন, আজই হাজার টাকা পাবে।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গোবিন্দলাল বলিল, "আজই?"

"আজই, এই রাত্রেই।"

গোবিন্দলালের কপোল দেশের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল—নাসাপুট বিস্তৃত হইল। সে তাহার চিক্কণ কুঞ্চিত অংস পর্য্যন্ত বিলম্বিত কেশ বেগে মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া কহিল, "কেমন করে?"

"আজ কি তিথি জান?"

"না।"

"আজ অমাবস্যা। দেখছ না—নদীতে বান ডেকেছে। অন্ধকারে দামোদরের তীর ঢেকেছে—জল ঢেকেছে, গাছ পাথর সব ঢেকেছে।"

গোবিন্দলাল চাহিয়া দেখিল, সত্যই চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারে প্রস্তর-প্রহত দামোদরের তরঙ্গ কূলে কূলে ধ্বনি করিতেছে।

রামরতন তীব্র দৃষ্টিতে গোবিন্দলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "সদ্দারের কাছ থেকে পঞ্চকের টাকা আর কতকগুলো তসরের কাপড় নিয়ে আজ রাত্রেই একজন ঘাটোয়াল বাঁকুড়া যাবে। ঝড় হোক, জল হোক, তাকে যেতেই হবে। সাহেবের তাগাদা বড় কড়া, কাল সেখানে টাকা চা-ই চাই। বাঁকুড়ার পথে কাণা নদীর সেতু আছে জান? বেশী নয়, এখান থেকে দু ক্রোশ দূরে। সেখানে আধ ক্রোশের ভিতর লোকালয় নেই বড় নির্জ্জন স্থান। এই লাঠি ধর, যাও সেখানে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। একখানা এক্কায় ঘাটোয়াল একলা আছে। যেই ঝন্ ঝন্ করে এক্কাখানা সেতুর

উপর উঠবে, অমনি মারবে ঘোড়ার মুখে এক ঘা—তার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘাটোয়ালের মাথায়। দেখো যেন ভুল না হয়। সেতুটা বড় জীর্ণ, অত্যন্ত অল্প পরিসর—দু পাশের বেড়া পর্য্যন্ত নাই। আর বুঝলে, এক্কার ঘোড়াটা নূতন, খুব ছটফটে, তোমার লাঠিতেই ঘাটোয়ালের হয়ে যাবে। যে টুকু বাকী থাকবে—তার জন্যে ভাবনা নেই। আঘাত পেলেই ঘোড়া লাফিয়ে উঠে গাড়ী নিয়ে একেবারে সাত আট হাত নীচে। সেখানে পাথরের যে সব চাঙ্গড় আছে—বাস্ আর দেখতে হবে না।"

গোবিন্দলাল নির্ব্বাক হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রামরতনের পরামর্শ শুনিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বনাশ।"

"সর্ব্বনাশ কি? ভয় হচ্চে? ফাঁড়িদারে ধরবে? লোভ না করলেই আর ভয় নেই। ঘাটোয়ালের সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা থাকবে—কতকগুলি দামী দামী কাপড়ও থাকবে। শুধু একটা তোড়া নিলেই তোমার কায হয়ে যাবে। কাল যখন ফাঁড়ী থেকে লোক আসবে তদন্ত করতে, তখন দেখবে যে টাকাও আছে, গাড়ীও আছে, অমন মূল্যবান তসর গরদ তাও আছে। তারা মনে করবে—সেতু থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়েই ঘাটোয়াল মরেছে। গুণে দেখলে একটা তোড়া কম পড়বে বটে, তা পড়ুক। আজ ছমাস হল মহাদেও ঘাটোয়াল এসেছে—সর্দ্দারের বড় প্রিয়পাত্র সে—বলতে গেলে পোষ্যপুত্র। তার হাত দিয়েই যে পঞ্চকের টাকা যায় একথা সকলেই জানে। ফাঁড়িদার সর্দ্দারের কথা বিশ্বাসই করবে না—নিশ্চয় ভাববে, সর্দ্দার পাঁচ হাজারের চালান দেয় নাই।"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ রামরতনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "টাকা যেন নিলাম। পথের কাঙ্গাল আমি, লোক যখন জিজ্ঞাসা করবে এত টাকা কোথায় পেলে, তখন?"

মৃদু হাস্য করিয়া রামরতন বলিল, "তখন বলবে সাদিয়াল রামরতন আমার বন্ধু, সে ধার দিয়েছে।"

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ নীরব রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি এক একবার উজ্জ্বল হইতে লাগিল—এক একবার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। আর একপাত্র সরবৎ পান করিয়া রামরতন কহিল, "কৈ? চুপ করে রইলে যে? এখনো ভয় হচ্চে ফাঁড়িদার ধরবে? বলেছি ত যদি হুঁসিয়ার হও তবে তার বাবার সাধ্য নেই যে তোমায় ধরে।"

গোবিন্দলাল ধীরকণ্ঠে বলিল, "না সে ভয় নেই, কিন্তু এও কি সম্ভব? নরহত্যা?—দস্যুতা—"

রামরতন তীব্রস্বরে বলিল, "এ যদি সম্ভব না হয়, তবে তোমার সরযূ লাভও সম্ভব নয়। সংসারের লোকে যাদের নিষ্পাপ নিকলঙ্ক মনে করে, যদি সেই দলে যেতে চাও, তবে গেরুয়া ধর, সোজা বলে চলে যাও। তা হলে আর সরযূর প্রেম, সরযূর সৌন্দর্য্য—এ সব মনেই স্থান দিও না। আর যদি সংসারে থেকে মজা লুটতে চাও, তাহলে যা বলেছি তাই কর। ফাঁসি কাঠ বলে' ভয় হচ্ছে? খাও, আর একটু সরবৎ খাও, এখনি মনস্থির হয়ে যাবে। সময় কিন্তু যায়। সরযূকে যদি চাও, তবে এখনই—এই মুহূর্ত্তেই তাকে পাবার আয়োজন কর—নতুবা জেনো—এ জীবনে আর ঘটবে না।"

গোবিন্দলাল আবার সরবৎ পান করিল, এবং নিঃশেষিত পাত্রটী অপেক্ষাকৃত বেগে ভূমিতে রাখিয়া কহিল, "দু'দণ্ড আগে যে ডুবে মরতে প্রস্তুত ছিল—ফাঁসী কাঠকে সে ভয় করে না। ফাঁড়িদার না হয় ধরতে পারবে না—কিন্তু ভগবান ত আছেন। তাঁর দণ্ড ফাঁসীকাঠের চেয়ে ভীষণ।"

রামরতন এবার খুব হাসিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "তাই নাকি? ভগবান আবার একজন আছেন নাকি? তুমি দেখে এসেছ নাকি?"

"না দেখি নি, তবে শুনেছি তিনি আছেন। লোকে বলে, তিনি সব দেখতে পান সব শুনতে পান। তাঁর চোখে ধূলো দিতে পারে এমন সাধ্য কারু নেই।"

"যেমন এক কাণে শুনেছ ভগবান আছেন, তেমন আর এক কাণে আমার কাছে শোন, ভগবান নেই। থাকাটাই সত্য—না থাকাটাই মিথ্যা, এর প্রমাণ কৈ?"

"তা জানি না।"

"তুমি দেখছি একটা আস্ত বোকারাম। ভগবানের ভয়ে যদি সকলেই তোমার মত ভীত হত, তাহলে দেখতে দুনিয়া ফকিরখানা হয়েছে। সব ন্যাংটা সন্ন্যাসীর আস্তানা। তাহলে দরিদ্র যে সে আর বড়মানুষ হতে চাইত না। বড় মানুষ যে, টাকার উপর টাকা বিছিয়ে যে শুয়ে আছে সে কখনো চাইত না যে তার সে সুখের শয্যা তাল প্রমাণ উঁচু হোক। এ অঞ্চলে যত বড় মানুষ দেখতে পাচ্ছ—মস্ত মস্ত বাড়ী, হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, কত লোকজন, বার মাসে তেরো পার্ব্বণ—তুমি কি মনে করেছ তারা তোমারই মত পাথর কেটে কেটে ধনী হয়েছে? এই ধরনা—আমাদের সর্দ্দার, ধর না নন্দরায়, বিধু সেনাপতি, চন্দ্র সিকদার—অমন কত নাম করব? তাদের কাছে জানতে যাও—বড় গলা করে তারা এখনই বলবে আমাদের মত সাধু আর নেই। তোমার মত সরলচিত্ত আহাম্মুখ যারা—তারাই শুধু এ কথা মানবে। কিন্তু যাদের একটুখানিও জ্ঞান আছে, তারা বলবে—যদি নিজে ধন চাও—তবে ধনীকে পথে বসাও, ফকির করে দাও, যদি সুখ চাও তবে অন্যের বুকে শেল হান। যদি মালা পরতে চাও তবে ভাল ভাল ফুল নিয়ে কাঁটা বিঁধে বিঁধে তাদের গাঁথ। দু চোখে যত দেখছ সবই মুখোস পরা। খুলে ফেল, দেখবে হত্যা বঞ্চনা, মিথ্যা, রাহাজানি—এমনি আরও কত কি, তাদের জন্যে মান মর্য্যাদা পদ-প্রতিষ্ঠা, সুখ সম্পদ মাথার ধরে নিত্য নিত্য বয়ে আনছে, তুমি আমি অবাক হয়ে কেবলি হাঁ করে চেয়ে দেখছি। তোমার ভগবান কি এই অবাধ স্রোতের গতি রোধ করতে পারছেন? না, করছেন? পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ জানবে—সংসারটা এই একই সুরে বাঁধা, সে সুরে কোথাও এতটুকু আঁশ পাবে না। যদি সুখ চাও, সম্পদ চাও, মান চাও, যশ চাও—তবে যা করলে তা আসে তাই করতে হবে—যেমন করে করলে আসে—তেমনি করেই করতে হবে। তাতে কাঁপলে চলবে না। ভাল-মন্দর বিচার করলে চলবে না। পাপ পুণ্যের মিথ্যা ধোকায় পড়লে হবে না। যদি সে ধোকায় পড় তবে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত কেবল পাথর কেটেই মরবে—আর ভাগ্যবান যে, তোমার সব্বনাশ? তারই কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করবে—হীরার টুকরা শুধু তারই হাতে এসে গড়িয়ে পড়বে।"

রামরতনের কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল ঢুকেবারে ঢোক গিলিল, তাহার পর বলিল, "সত্য সত্যই কি তাই?"

"নিশ্চয়ই। আমি এখন জীবিত আছি এটা যেমন সত্য—এও তেমনি সত্য। সিংহ ঘুমিয়ে থাকলে বানর হরিণ আপনি এসে তার মুখে পড়ে না। ক্ষুধা পেলে হরিণ ধরতে হয়। যার জন্যে এতোর মাস পাথর কেটেছ, দামোদরে ডুবতে গিয়েছ—যদি মনে কর তাকে পেতেই হবে—তবে ওঠ, আর দেরী করা চলে না। জেনো এ করে ধরা পড়লে লোকে বলবে গোবিন্দলাল মহাপাপী, তার মুখ দর্শন করতে নেই,—যদি ধরা না পড়, তবে দেখবে যে তাতেই তোমার জয়। তখন তোমার মত পুণ্যাত্মা আর জগতে নাই। তোমার মত মহৎ, তোমার মত মহানুভব, তোমার তুল্য সুখী জগতে আর দুটী দেখা যাবে না। আমি তোমায় কিছু দূরে এগিয়ে দিয়ে আসি চল। পথ ছেড়ে মাঠ দিয়ে যেতে হবে। দু ক্রোশ পথ—জান ত! ঐ দেখ অমাবস্যার রাত্রি কি সুন্দর অন্ধকার নিয়ে তোমার জন্যে দিক্ ঢেকেছে। সঙ্কটকে বরণ না করলে কি সম্পদ কখনো আসে বন্ধু? চল, বেরিয়ে পড়ি।"

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

লোকশিক্ষার উপায়

লোকশিক্ষা ও লোকমত এই দুইটী কথা আমরা বক্তৃতায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিলেও দুইটী জিনিষ সম্বন্ধে বিশেষ স্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। নিজের মতকে লোকমত বলিয়া চালানো আমাদের অভ্যাস। বক্তা বড় গলায় যে মতটি জন-সাধারণের প্রতিনিধি সাজিয়া প্রচার করেন, দেখা গিয়াছে সে মতটী তাঁহার নিজস্ব—জন-সাধারণের তাহা জানা ত দূরের কথা, তাহারা সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেও অনিচ্ছুক ও অপারগ।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ অনুষ্ঠানেরই খোঁজ-খবর লইলে দেখা যায়, যে জন-সাধারণের নামে উহা চলে, তাহারা উহার বিন্দু-বিসর্গও বোঝে না। জাতির প্রাণশক্তি যে কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আছে, তাহারা ত এতকাল কংগ্রেস চিনিতই না—অথচ আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের মত বড় প্রতিষ্ঠান আর নাই। পূর্ব্বে আমাদের কংগ্রেস ছিল Voltaireএর Roman Empireএর মত—Neither Indian, nor National nor a Congress—ইহার সঙ্গে দেশের প্রাণের যোগ ছিল না, কারণ জাতির মালিক যাহারা তাহারা ইহাকে চিনে না। এ কথা বর্ত্তমানের কংগ্রেস সম্বন্ধে না খাটিলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে বেশ খাটে। আমাদের দেশে আজও স্পষ্ট কোন লোকমত জন্মিয়াছে কিনা এবং সে লোকমতের মুখপাত্র প্রতিনিধি আমাদের মধ্যে বেশী আছেন কিনা এ কথা বলা শক্ত।

আমাদের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। অতি মুষ্টিমেয় লোকই নিজের দাবী-দাওয়া অথবা অভাব অভিযোগের প্রতীকার নিজেরা করিতে পারে। অভাব অভিযোগ বুঝিবার মত শক্তিরও অনেকের অভাব। ইহাদের স্পষ্ট কোন মতামত থাকা সম্ভব নহে। ইহারা কখনও উত্তেজনা দ্বারা আবার কখনও বা প্রতারণা দ্বারা অতি সহজেই চতুর লোকের হস্তগত হইয়া থাকে। যদি দৃঢ় লোকমত গঠন করা জাতির আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমাদিগকে দেশের জন-সাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে যে প্রাচীনকালে অতি বলিষ্ঠ লোকমত ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ লোকমতের জন্য শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতাদেবীর নির্ব্বাসনের কথা বলা যাইতে পারে। এখন দেখা যাক্, কি উপায়ে আমাদের দেশে লোক শিক্ষা দেওয়া হইত।

আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি—কাযেই এ দেশের যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল সমস্তই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত। কথকতা অথবা পাঁচালী গানের মধ্য দিয়া আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দানের আয়োজন ছিল। বাঙ্গালী জীবনের সুখ-দুঃখের, আশা ও আনন্দের কথা সকলই এই কথকতা ও গানের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিত। হর-গৌরীর গান প্রতি মাতৃ-হৃদয়ের শ্বশুরগৃহ-প্রবাসী কন্যার জন্য বুক-ফাটা ক্রন্দন। কথক কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেন, আর শ্রোতৃবর্গ নীরবে অশ্রুপাত করিত। দাশু রায়ের "ঠাকরুণ বিষয়ক" গান শুনিয়া বাঙ্গালী বধূ শিখিত যে দরিদ্র উমানাথই সতীর নিকট চির বৈভবশালী। রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল শুনিয়া অন্নদার মত ঘরে ঘরে মঙ্গলময়ী নারীর সৃষ্টি হইত। কথক লোকশিক্ষক ছিলেন; তিনি বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিতে গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের প্রাণে আনন্দ ও শিক্ষার স্রোত বহাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"লোকশিক্ষার একটা উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পীঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস-নুদুস কালো

কথক, সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, দধীচির আত্ম-সমর্পণ বিষয়ক সু-সংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মবেদন তশ্রুদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে, ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে, পাপ-পুণ্য আছে, যে, পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে, অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে, লোকহিত পরম কার্য্য। সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কথকতা লোপ পাইল। লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত বাতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারীতলা অথবা গ্রামে হরি-সভায় কখনও ভাগবত পাঠ কখনও বা চৈতন্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ কথার আয়োজন হইত। একজন কৃত্তিবাস অথবা কাশীদাসের 'অমৃত সমান' মহাভারত বিচিত্রসুরে আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে পাঠ করিত, আর দশজন শুনিত। দোকানী দোকান বন্ধ করিয়া ছুটিয়া আসিত—পরম শ্রদ্ধায় সেই মৃত্তিকায় আভূমি প্রণত হইয়া ধীরে এক পাশে আশ্রয় লইত। পাঠকের সে কথা পাঠ করিতে দরদর ধারে অশ্রুপাত হইত। মা জানকীর দুঃখে নৈশ আকাশ যেন ভারি হইয়া উঠিত। জানকীর দুঃখ যেন বাঙ্গালার প্রতি নর-নারীর নিজের দুঃখ, এমনি আবেগে সেই কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ কাঁদিয়া আকুল হইত। অশ্রু-জলের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার অর্দ্ধ-শিক্ষিত পাঠক ও শ্রোতা এই ভাবে প্রতি রজনীতে একাধারে জ্ঞান ও আনন্দ পাইত।

যদি বা কখনও দূরস্থান হইতে পাঠক অথবা কথক আসিত সেদিন গ্রামে ধুম পড়িয়া যাইত। কখনও চণ্ডী, কখনও ভাগবত আবার কখনও বা কৃষ্ণলীলার বিচিত্র রসের মধ্য দিয়া পল্লী নর-নারী জীবনের বিচিত্র অবস্থা ও আনন্দের আস্বাদ লইয়া রোগ, দুঃখ ও দারিদ্র্য ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিত। সমস্ত দিনের কর্ম্ম অবসানে কৃষক মাঠ হইতে আসিয়া বিশ্রাম সুখের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা পাইত।

ইহা ছাড়া যাত্রা ও কবিগান বিশেষ বিশেষ উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। আজ দেশের রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে; যাত্রা ও কবির স্থান থিয়েটার ও খেমটা নাচ অধিকার করিয়াছে। আজ আর মতিরায় গোবিন্দ অধিকারীর গান কোন বিবাহবাড়ীতে বা পূজাপার্ব্বণে দেখা যায় না। যাত্রার মত একটা লোকশিক্ষার উপায় একেবারে রুচিবিকারের দরুণ লোপ হইতেছে। এখন যে যাত্রা হয় তাহা কতকগুলি অসার নাচ ও গানের সৃষ্টি, সিন ছাড়া থিয়েটার মাত্র।

কবিওয়ালার লড়াই আজ আর বড় দেখা যায় না। গোপাল উড়ে অথবা এন্টুনি ফিরিঙ্গীর ঝগড়া, অথবা হরু ঠাকুরের ছড়া যে কত বড় কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক এবং তাহাতে যে জনসাধারণের মধ্যে কত উচ্চ ভাবের প্রচার হইত তাহা আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

একে একে সব লোপ পাইতেছে। বাংলার ভিখারী ভিখারিণী আর সে মধুর কৃষ্ণকথা গায় না, আর সে গান শুনিয়া গৃহকোণে বধূ ঘোমটার ভিতরে অশ্রুপাত করে না, আর খঞ্জনী মৃদঙ্গ তালে পল্লীপথ মুখর করিয়া পল্লীভিখারী মধুর হরিনাম করে না। ভিখারীর অভাব নাই। কিন্তু সেই আনন্দগান আর নাই। ভিখারী আজ থিয়েটারের গান গায়, বাবুরা মেয়েরা ফরমাস করিয়া তাহা শোনেন। আবার কেহ বা ভিখারী দ্বারস্থ হইবামাত্র বিদায় করিয়া দেন।

এমনি করিয়া একে একে প্রাচীন লোকশিক্ষার উপায়গুলি সব লোপ পাইয়াছে। সন্ধ্যার পর পল্লীগ্রাম আজ নিস্তব্ধ; চণ্ডীমণ্ডপে লোক নাই, গ্রাম লোকহীন, আনন্দহীন, প্রাণহীন। চণ্ডীমণ্ডপে আজ মোকদ্দমার শলা পরামর্শ হয়—সন্ধ্যার অন্ধকারে পল্লী আজ প্রেতের বাস ভূমির তুল্য বোধ হয়। জীবনের সে সরল আনন্দ প্রবাহ লোপ হইয়াছে। কেন এমন হইল? সে কথক

কোথায় গেল ? সে আনন্দ কোলাহল এমন করিয়া থামিয়া গেল কেন ?

আজ ঘরে ঘরে হাহাকার ; রোগ শোক দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বাঙ্গালার প্রাণশক্তি আজ নিষ্পেষিত। জীবন সংগ্রামের তাড়নে সব রস শুকাইয়া গিয়াছে। তাই আর কবির লড়াই শুনিবার মত প্রাণ নাই, যাত্রা শুনিয়া কাঁদা আর আসে না।

সর্ব্বোপরি রুচিবিকার আমাদের ঘটিয়াছে। তরল অসার নাটক অভিনয়ে আমরা আজ আনন্দ খুঁজিতেছি। আগে ছিল গ্রামে গ্রামে যাত্রার দল ; আজ হইয়াছে সখের থিয়েটার। অভিনয় সাহায্যে জাতীয় জীবন গঠিত হইবার সহায়তা হয় জানি, কিন্তু তেমন নাটক আমাদের দেশে বেশী নাই এবং থাকিলেও সেগুলির অভিনয় খুব কমই হয়। যাহারা কৃষ্ণ রাধা, রাম সীতার কথার বাহিরের জগৎকে জানে না, আমরা আজ তাহাদের সম্মুখে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা অথবা কাল্পনিক বীর রাম সিংহের কাহিনী অভিনয় করাইতেছি। ইহাতে তাহাদের না হয় আনন্দ না হয় শিক্ষা। এমন করিয়া একটী লোক-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান অভিনয়কে আমরা নষ্ট করিতেছি।

আজ আমরা জাতি গঠন লইয়া ব্যস্ত। জাতি গঠন করিতে হইলে আজ জাতিকে জাগাইতে হইবে। জ্ঞানের আলোকে এই মূক জন-সাধারণকে মানুষ করিতে হইবে। সমস্ত জাতি অশিক্ষায় আজ অন্ধ, আগে ইহাদিগকে চক্ষুষ্মান করিতে হইবে। উত্তেজনার মুখে জন-সাধারণ জাগিয়াছে বলা শক্ত নহে ; কিন্তু যেখানে জাগ্রতের মনে তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থার স্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই, সে জাগরণ কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। আজ আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি কি না।

আনন্দহীন শিক্ষা প্রাণস্পর্শ করে না। আবার আমাদিগকে সেই কথক, পাঠক, কবিওয়ালা ও যাত্রা-ওয়ালার দ্বারস্থ হইতে হইবে ; কর্ম্মকোলাহলের অবসানে আবার পল্লী-প্রাণকে আনন্দে রসে ও গানে সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। কীর্ত্তনে ও পদাবলীতে আবার বাঙ্গালীর নিরানন্দ গৃহে আনন্দ কোলাহল জাগাইতে হইবে। বিকৃত শিক্ষার ফলে আমাদের রুচি-বিভ্রম ঘটিয়াছে—আমাদিগকে এই সকল দেশীয় আমোদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। জাতির আদর্শ রাম-সীতা, চৈতন্য নিত্যানন্দ আজ আমাদের অপরিচিত হইয়াছেন—এই প্রকার আমোদের পুনঃ প্রতিষ্ঠানে আমরা আবার লক্ষ্যের সন্ধান পাইব। এখনও বাংলায় সেই কথক, পাঠক অথবা পাঁচালীকার সম্প্রদায় একেবারে ধ্বংস হয় নাই—আমাদের সহানুভূতিতে আবার তাহাদিগকে জীবিত করিতে হইবে। যে দেশে কানু ছাড়া গীত নাই, যে দেশের সকল অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকেন ভগবান, সেখানে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বেশী আয়াস পাইতে হইবে না। কথকতার মধ্য দিয়া নীতি প্রচারে জাতি গঠিত হইবে।

লোকশিক্ষা দানের আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায় আলোকচিত্র প্রদর্শন (magic lantern jectures) ডেনমার্কে ক্রিষ্টেন কলভ মহাশয় বহু কাল পূর্ব্বে ছায়াচিত্র সাহায্যে ছাত্রদিগকে কৃষি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে পরে সমস্ত ডেনমার্কে কৃষি-বিদ্যা প্রচার হইয়াছিল। ছায়াচিত্র ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই মুগ্ধ করে। ইহাতে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা পাওয়া যায়। অশিক্ষিতদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সমস্ত কথাই এই প্রকারে প্রচারিত হইতে পারে। আমি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহিত সংসৃষ্ট আছি—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে ঐ প্রকার আলোকচিত্র বক্তৃতা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষে উপযোগী। সন্ধ্যার পর সকলকে ডাকিয়া এই উপায়ে অনেক জ্ঞাতব্য কথা প্রচার করা সম্ভব।

যাহারা খৃষ্টীয় যুবক সমিতির (Y. M. C. A.) এবং শান্তি-নিকেতনের আলোকচিত্র বক্তৃতার কেন্দ্রগুলি দেখিয়াছেন তাঁহারা এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। আজ ৭।৮ বৎসরের মধ্যে একমাত্র হিতসাধন-মণ্ডলীর

(Social Service League) চেষ্টায় অনেক গ্রামে এই প্রকার বক্তৃতার ফলে স্থায়ী কায হইয়াছে।

লোকশিক্ষা বিস্তার জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেকস্থলে সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয় গ্রামের বৈঠকখানা ও চণ্ডীমণ্ডপে অনায়াসে বসান যাইতে পারে। সন্ধ্যার পর শ্রমিক ও কৃষকেরা অনায়াসে এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতে পারে। এই বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অথবা আধুনিক জগতের মোটামুটি সমস্যাগুলি বেশ সহজে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে।

সাময়িক পুস্তিকা প্রচারে অথবা লাইব্রেরী স্থাপনে এ দেশেও অন্যান্য দেশের ন্যায় লোকশিক্ষা কার্য্য অনেকের ভিতরে চলিতে পারে। আমাদের দেশে লাইব্রেরী গুলি তরল ও অসার উপন্যাসে ভরা, গ্রামের লাইব্রেরীতে কৃষি, বিজ্ঞান ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থাদি থাকা উচিত।

লোকশিক্ষা ব্যতিরিকে লোকমত গঠিত হইতে পারে না। আবার বলিষ্ঠ লোকমত গঠিত না হইলে কোন আন্দোলনই স্থায়ী হইতে পারে না। এই যে আমাদের দেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান হয় এবং কিছু কাল পরে লোপ পায়, তার প্রধান কারণ তাহার সঙ্গে জন-সাধারণের কোন যোগ নাই। রাষ্ট্র অথবা সামাজিক উভয় জগতেই জন-সাধারণকে বাদ দিয়া কিছু গড়িবার চেষ্টা অনেকটা ভিত্তিশূন্য অট্টালিকার মত হইতে বাধ্য। লোকমতকে উপেক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের সেই দিনই লোপ পাইবে, যে দিন আমরা জানিব ইহারা মেষ-পাল নহে, শিক্ষিতদের হাতের ক্রীড়নক নহে, ইহারা মানুষ, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে। লোকশিক্ষার বিস্তার হইলেই আত্মসম্মান জাগিবে—দেশপ্রেম জাগিবে—আর সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ লোকমত গঠিত হইয়া দেশকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে।

আমরা আজ দুঃখ করি আমাদের দেশের জন-সাধারণ আমাদের ত্যাগ, বুদ্ধি, রাষ্ট্র-নৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই বোঝে না। এ জন্য দোষী আমরাই। আমরা এতকাল তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়াছি, জাতির এক অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; লোক-শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে হইবে।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী।

নিবেদন *

যাঁহাকে অগ্রণী করিয়া আমরা আপনাদিগকে এই সারস্বত যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছি, যাঁহার লেখনী গদ্য পদ্য রচনায় তুল্য নিপুণা, যাঁহার বাণী সর্ব্বজন-মনোমোহিনী, যাঁহার বদান্যতার তুলনা দুর্লভ, সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আজ এখানে উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সাদর সম্ভাষণে, এবং সেবাপূজার বিধি ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে অসমর্থ; সুতরাং আমরা যোড়হাত করিতেছি—অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বাগত উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবী শত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বিক্রমপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ত বটেই, বর্ত্তমান যুগেও বিক্রমপুর বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিকের শিরোমণি জগদীশচন্দ্র এবং দেশনায়কগণের অগ্রণী চিত্তরঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া, সুদূর রেলওয়ে ষ্টেশনের বা দুর্গম পল্লী পোষ্টাফিসের কেরাণীসমাজ পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই বিক্রমপুরের লোক সুলভ।

* বিক্রমপুর ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

কাযেই বিক্রমপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সূচনায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিক্রমপুরের যে ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা এখন আর নাই। বিক্রমপুরের পূর্ব্ব ধনসম্পদ লুপ্ত, জনসম্পদ বিক্ষিপ্ত। সপ্তদশ শতাব্দে ঢাকা সুবে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল এবং বিক্রমপুর রাজধানীর ঐশ্বর্য্যের ভাগী ছিল। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি এখন যে বিশাল পদ্মা বিক্রমপুরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা আকারে একটা খাল মাত্র ছিল। কথিত আছে যে রথ টানা খাত হইতেই এই খালের উৎপত্তি। তারপর ব্রহ্মপুত্র নদের জলপ্রবাহ যমুনার পথে আসিয়া এই খাতে প্রবাহিত হইয়া কীর্ত্তিনাশা রূপে কেদার রায়ের, চাঁদরায়ের, মহারাজা রাজবল্লভের এবং আরও শত সহস্র ব্যক্তির কীর্ত্তিচিহ্ন গ্রাস করিয়াছে। কেদার রায়ের শ্রীপুর এবং রাজবল্লভের রাজনগর ত কবেই গিয়াছে। কেদার রায়ের কীর্ত্তির শেষ নিদর্শন রাজাবাড়ীর মঠ যাহা ৺রাজা শ্রীনাথ রায় এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ মেরামত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও গত বর্ষার পূর্ব্বের বর্ষায় কীর্ত্তিনাশা গ্রাস করিয়াছেন। এমন অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন যাঁহাদের চোখের সামনে ধুল্লা, মানগাঁও, বাঘিয়া, কালীপাড়া, তারপাশা, যশ্‌শা প্রভৃতি কত প্রসিদ্ধ কত সমৃদ্ধ গ্রাম কীর্ত্তিনাশার কবলগত হইয়াছে। গত অর্দ্ধশতাব্দে বোধ হয় বিক্রমপুরের বহু সহস্র সমৃদ্ধ পরিবারের ভিটামাটী উচ্ছন্ন হইয়াছে। কত শত পরিবার দেশছাড়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন যে সকল প্রসিদ্ধ বাঁড়ুযো, মুখুযো, চাটুযো, গাঙ্গুলী পরিবার আছেন তাঁহাদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষ অদূর অতীতে বিক্রমপুরবাসী ছিলেন। সর্ব্বনাশী কীর্ত্তিনাশা বিক্রমপুরের লোককে নির্য্যাতন করিয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের ইতিহাস উল্লিখিত হইতে পারে। ভাগ্যকুলের রায়দের ভাগ্যলক্ষ্মী সুস্থিরা হইলেও কীর্ত্তিনাশা ইহাঁদিগকে বারম্বার অস্থির করিয়াছে। রায়দের আদি নিবাস ছিল বাঘিয়ার দক্ষিণে স্থিত নূরপুরে। নূরপুর ভাঙ্গিয়া গেলে রায়েরা বাড়ী করেন হাউয়ালে। হাউয়ালে দুইবার বাড়ী ভাঙ্গিবার পর রায়েরা ভাগ্যকুল স্থাপন করিয়াছেন। ভাগ্যকুলে রায়েদের বাড়ী দুইবার ভাঙ্গিয়াছে। এখন মাঠের মধ্যে তৃতীয় ভাগ্যকুল ভরাট্ হইতেছে। কীর্ত্তিনাশার ভয়ে রায়েরা বিক্রমপুরে উৎকৃষ্ট প্রাসাদ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে সাহস করেন নাই। তথাপি তাঁহারা বিক্রমপুরের মায়াপাশ কাটিতে পারেন নাই। ধনীর দশাই যদি এরূপ, নির্দ্ধনের যে কি দুর্দ্দশা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিক্রমপুরের যে অংশ এখনও কীর্ত্তিনাশার বা ধলেশ্বরীর তরঙ্গাঘাত-মুক্ত সে অংশের লোকের অবস্থাও শোচনীয়। গ্রীষ্মে তাহাদের জলাভাব, বর্ষায় তাহাদের স্থলাভাব। সুতরাং বিক্রমপুরের কি আছে যাহা দিয়া বিক্রমপুরবাসী আপনাদিগের সেবা পূজার সমুচিত ব্যবস্থা করিবে? তার উপরে বিক্রমপুরে সম্মিলনী আহূত হইবার পর বিক্রমপুরবাসী দুইজন পরহিতব্রত মহাশয় লোক—রাজা শ্রীনাথ রায় এবং মুন্সীগঞ্জের উকীল উমেশচন্দ্র দাস পরলোক-গমন করিয়াছেন। বিক্রমপুরের সম্পত্তির মধ্যে আছে নামের মহিমা। এই নামের মহিমা আমাদিগকে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দুঃসাহস দান করিয়াছে; এই নামের মহিমা আপনাদিগকে এত কষ্ট সহিয়া অধিকতর কষ্ট ভোগের জন্য এখানে পদার্পণ করিবার প্রবৃত্তি দান করিয়াছে। নদীর তরঙ্গ এবং বর্ষার বন্যা যে প্রদেশের লোককে একপ্রকার যাযাবর করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা কি দিয়া আপনাদিগের যথোচিত সেবা করিবে?

এই যে মুন্সীগঞ্জ, ইহার একটু ইতিহাস থাকিলেও, ইহা একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। পর্টুগীজ জলদস্যুগণের আক্রমণ হইতে এই দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য নবাব মীরজুম্‌লা ইদ্রাকপুরের ক্ষুদ্র কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কেল্লাই মুন্সীগঞ্জের ভিত্তি এবং এই কেল্লার উপর মহকুমার হাকিমের কুঠী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় স্বাধীন ভৌমিকগণ যখন বিক্রমপুরের নিয়ন্তা ছিলেন, তখন বিক্রমপুরের অধিবাসিগণকে অনেক

সময় জলে স্থলে যুদ্ধে রত থাকিতে হইত। এখন সেই সুযোগ গিয়াছে।' এখন বিক্রমপুরবাসিগণ যুদ্ধের পিপাসা ঘোলে মিটাইবার জন্য জলে স্থলে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ফৌজদারী আদালতে মামলা মোকদ্দমা করিতে একটু বেশী ভালবাসেন। তাই মুন্সীগঞ্জ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ধনে দরিদ্র হইলেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আপনাদের ন্যায় দেশপূজ্য অতিথিগণের সেবার উপকরণ এখানে কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিক্রমপুরের অতীত ইতিহাস যতটা জানা যায়, তাহা হইতে দেখা যায়, বিক্রমপুরবাসী বরাবরই প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে বিশেষ বিরত এবং তাহাদের প্রকৃতি কতকটা তদনুসারে গঠিত। বিক্রমপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থের অভাব নাই। এই ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাদের পথ-প্রদর্শক। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়ের ঢাকার ইতিহাসে বিক্রমপুরের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বিক্রমপুরের ইতিহাসের নূতন উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বিক্রমপুরের বিবরণপূর্ণ বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। সরকারী প্রত্নবিদ্যা বিভাগের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামপালের ধ্বংসাবশেষ খননের সূত্রপাত করিয়াছেন। সুতরাং অচিরেই হয়ত বিক্রমপুরের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাসের উপাদান আপনাদের হস্তগত হইবে। খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দের চন্দ্র, বর্ম্মা, এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবারের কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় ঐ যুগে বিক্রমপুর প্রতিবেশী রাজবংশনিচয়ের বিরোধের ক্ষেত্র ছিল। নোদিয়া যেখানেই অবস্থিত থাক, এবং মিনহাজের উল্লিখিত রায় লখ্‌মনিয়া যিনিই হউন, মহম্মদ-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বরেন্দ্রদেশ অধিকৃত হইলে সেনবংশের শেষ নৃপতিগণ যে বিক্রমপুরে বা বিক্রমপুরের উপকণ্ঠেই আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরবাসিগণকেই যে পুনঃ পুনঃ তুরস্ক আক্রমণের বেগ সামলাইতে হইয়াছিল, গোদের উপর বিস্ফোটকের মত এই ত্রয়োদশ শতাব্দেও সেনবংশের এবং দেববংশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং পরিণামে নরপতি দেববংশ বিক্রমপুরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল এই কথা স্থির। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের আবিষ্কৃত একখানি নূতন তাম্রশাসনে দেখা যায়, দেববংশজ বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি দনুজমাধবের রাজধানী বিক্রমপুরেই ছিল।

ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। আকবর নামার রচয়িতার এবং বিদেশী পর্য্যটকগণের কৃপায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ইতিহাস কতকটা জানা যায় এবং সেই সূত্র ধরিয়া পূর্ব্বাপর অবস্থাও কতক পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকমহলের যুদ্ধে সুলতান দাউদ্ করারাণী সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি খাঁ জাহান ও তোডরমল্ল কর্ত্তৃক পরাজিত, ধৃত এবং নিহত হইলে বাঙ্গালায় পাঠানের রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালা দেশ মোগল বাদশাহের পদানত হইতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। বাঙ্গলা দেশ তৎকালে প্রকৃত প্রস্তাবে শাসিত হইত ভুঁইয়া (ভৌমিক) বা জমিদার-গণের দ্বারা। এই জমিদারগণের মধ্যে দ্বাদশ ভৌমিক ছিলেন, দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইসাখাঁ। ইসাখার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বিক্রমপুরের কেদার রায়। তৎকালে ভৌমিকগণের সহিত বাঙ্গলার সুলতানের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, আবুলফজলের আকবরনামার এই কয় পংক্তি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়।

"Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness, and made the twelve *Zemunders* of Bengal subject to himself. Out of foresight and cautiousness he refrained from waiting upon the rulers of Bengal, though he rendered service to them and sent them presents. From a distance he made use of submissive language."

যখন সমস্ত বাঙ্গলার একজন অধিপতি সুলতান

ছিলেন, তখন ইসাখাঁ যে অন্যান্য ভৌমিকগণের এলাকা স্বীয় পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা সম্ভব নহে। ইসাখাঁ দ্বাদশ ভৌমিককে আপনার অধীন করিয়াছিলেন (made subject to himself) এই কথার অর্থ, মোগল পাঠানের বিরোধের সময় অন্যান্য ভৌমিকেরা ইসাখাঁকে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং নীতি-কুশলতার জন্য আপনাদের অধিনেতা স্বীকার করিতেন। ইসাখাঁর নীতি ছিল তফাতে থাকিয়া বঙ্গাধিপতির আনুগত্য করা, পেশকস্ দাখিল করা, কিন্তু স্বীয় এলাকার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ না দেওয়া। অন্যান্য ভৌমিকেরাও যথাসম্ভব এই নীতির অনুসরণ করিতেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী মোগল সেনানী মাসুম কাবুলী ইসাখাঁর এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার পরে মোগল সুবাদার সাহবাজখাঁর সহিত ইসাখাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সুচতুর ইসা ছলে বলে কৌশলে আপন এলাকা হইতে মোগল সেনাকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আকবর বাদশাহ ইসাখাঁকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বিহার ও বাঙ্গলার জায়গীরদারগণকে একত্র হইবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। বেগতিক দেখিয়া ইসাখাঁ বাদশাহের আদেশ পালনে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও ধরা ছোঁয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং সর্ব্বদাই রাজদ্রোহিগণের সহায়তা করিয়া সুবাদারকে বিপন্ন করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

বিক্রমপুরের ভৌমিক চাঁদ রায় কেদার রায়ের নাম সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু চাঁদ রায় এবং কেদার রায় এই উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আকবর নামার একটী ঘটনাপ্রসঙ্গে আবুলফজল স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—চাঁদ রায় কেদার রায়ের পুত্র ছিলেন। ঘটনাটী এই, ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সুলেমান, ওসমান, দিলোয়ার প্রভৃতি পাঠানসর্দ্দারগণ মানসিংহ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া বাঙ্গলায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) লুণ্ঠনে বিফল মনোরথ হইয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভূষণার দুর্গ তখন কেদার রায়ের পুত্র চাঁদ রায়ের হস্তগত ছিল। পাঠান সর্দ্দারগণ নিকটবর্ত্তী জানিয়া পিতার উপদেশানুসারে চাঁদ রায় তাহাদিগকে বন্দী বরিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং কৌশলে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্দ্দারগণকে স্বীয় ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে দিলোয়ার এবং সুলেমান দুর্গে উপস্থিত হইলেন। চাঁদ রায়ের সঙ্কেত অনুসারে দিলোয়ার প্রথম ধৃত হইল, কিন্তু সুলেমানকে ধরা সম্ভব হইল না। সুলেমান অসি ধারণ করতঃ চাঁদ রায়ের কতকগুলি অনুচরকে নিহত করিয়া দুর্গের বাহির হইয়া পড়িলেন। চাঁদ রায় সানুচর তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। সুলেমানের বিপদের সংবাদ শুনিয়া ওসমান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে খুব যুদ্ধ হইল। চাঁদ রায়ের অধিকাংশ অনুচরই পাঠান ছিল। তাহারা প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বিপক্ষের সহিত যোগদান করিল। সুতরাং চাঁদ রায় পরাজিত এবং নিহত হইলেন। ভূষণার দুর্গ এবং এলাকা সহজেই পাঠানগণের হস্তগত হইল। ভূষণার জমিদারী পাঠানের হস্তগত হয় ইহা অবশ্য সুচতুর ইসাখাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং ইসাখাঁ কৌশলে পাঠানসর্দ্দারগণকে বশীভূত করিয়া ভূষণার দুর্গ এবং জমিদারী কেদার রায়কে ফিরাইয়া দেওয়াইলেন।

১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এ অবধি দশবৎসর কাল কার্য্যতঃ তিনি ইসাখাঁ এবং কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বিক্রমপুরের ছয় ক্রোশ ব্যবধানে সংঘটিত ইসাখাঁর সহিত এক যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ নিহত হইয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ইসাখাঁ কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র দাউদও যথাসম্ভব পিতার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দাউদ পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেদার রায়ের দিকেও মানসিংহের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ ভূষণার দুর্গ

অধিকার করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্গরক্ষার জন্য স্বয়ং কেদার রায় ভূষণায় উপস্থিত ছিলেন। মানসিংহের সেনা দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। কয়েকদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু একদিন দুর্গ মধ্যে একটী কামান ফাটিয়া যাওয়ায় কেদার রায়ের অনেক অনুচর নিহত হইয়াছিল, এবং তিনি স্বয়ং আহত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া ভয় এবং ভরসা দেখাইয়া কেদার রায়কে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কেদার রায় আরাকানের মগ রাজার সহিত মিলিত হইয়া আবার বাদশাহের শত্রুতা আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ স্বয়ং বৃহৎ একদল সেনা এবং কামান লইয়া কেদার রায়ের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর (আকবরনামার মতে নগরশূর) এখন কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত। শ্রীপুরের উপকণ্ঠে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কেদার রায় পরাজিত হইলেন এবং স্বয়ং গুলির আঘাতে আহত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রণস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পরে অনুসরণকারী শত্রুসেনা কেদার রায়কে ধরিয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু নীত হইবার অনতিকাল পরেই কেদার রায়ের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। (There was little life in him when he was brought before the Rajah, but he soon died.) জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেই কি "তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ," এই বলিয়া মানসিংহকে বিদ্রূপ করিয়া বীরকেশরী কেদার স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন?

কেদার রায়ের মৃত্যুর প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী পরে বিক্রমপুরে একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন—মহারাজা রাজবল্লভ। রাজবল্লভের সময়ে বাঙ্গালী অধঃপতনের চরম সীমায় পঁহুছিয়াছিল। সেই যুগে ধন, সম্পত্তি, এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জনের যে সকল সুযোগ ছিল, তাহার আশ্রয় লইয়া রাজবল্লভ বিশেষ অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজের আধিপত্য অঙ্গীকার করা ভিন্ন এ দেশের তখন আর কোন উপায় ছিল না। রাজবল্লভ পরোক্ষ ভাবে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন: সুতরাং তিনিও আমাদের স্মরণীয়।

ইংরেজের আমলে এদেশবাসীর একটী প্রধান লাভ হইয়াছে শিক্ষিত সমাজে রাষ্ট্রীয় ভাবের জাগরণ। দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবের অনুশীলনের এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের উন্নতির যাহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েকজন বিক্রমপুরের লোকও আছেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্বে বড়লাট লিটনের অবলম্বিত শাসন নীতি যখন এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল; তখন বিক্রমপুরের লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা জন্ ব্রাইট্, লর্ড হার্টিংটন্ প্রভৃতি উদারনৈতিক অধিনেতাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন এবং লর্ড রিপনের উদার শাসন নীতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া দেশের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। লালমোহন যদি ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ অমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া না আসিতেন তবে লর্ড রিপনের পক্ষে অতটা করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। লর্ড রিপনের সময় এদেশবাসী জনতন্ত্র-শাসনের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। আজ চল্লিশ বৎসর পরে ভারতবাসী এই পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ক্রমে হইতেছে। এই পথের যাহারা নায়ক, তাহাদের যাহারা অগ্রণী, আমাদের চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য।

রাষ্ট্রসেবায় বিক্রমপুরবাসী সময় সময় যতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের সেবায় সকল সময় ততটা অগ্রসর হইতে না পারিলেও কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। নব্য ন্যায়ের এবং নব্য স্মৃতির গুরুস্থান অবশ্য নবদ্বীপ। কিন্তু রঘুনন্দন, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধরাদির শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ অগ্রগণ্য। চন্দ্রনারায়ণের এবং কালীশঙ্করের পাতড়া নৈয়ায়িকগণের আদরের বস্তু। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনে স্যার জগদীশচন্দ্র ত ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। বিক্রম

পুর আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্র। বিক্রমপুরের রামদুর্লভ এবং গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসক সমাজের শিরোমণি ছিলেন। কিন্তু সুকুমার সাহিত্যের অনুশীলনে বিক্রমপুরবাসী পশ্চাৎপদ। আধুনিক যুগের প্রধান কবিগণের মধ্যে কেহই বিক্রমপুরী নহেন। কিন্তু আমাদের কালীপ্রসন্নের বান্ধব এবং বান্ধবে কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সরস সমালোচনা আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে এ কথা কেহই স্বীকার না করিয়া পারিবেন না।

হে বাণী-ভক্তবৃন্দ! এই যে সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের কয়েকটী কথা নিবেদন করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য আত্মপ্রচার নহে, ইহার উদ্দেশ্য আত্ম-পরিচয়। অতীত গৌরবের কথা লইয়া আস্ফালন বা অতীতের অগৌরবের কথা লইয়া চুল চেরাচেরি আমাদের এখনকার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের উন্নতি। ভবিষ্যতের উন্নতির পথে সহায়তা পাইব এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া আমরা এত ক্লেশ দিয়া এখানে আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার দুঃসাহস করিয়াছি। আপনারা দেশের প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষার গুরু, আমরা জিজ্ঞাসু। আমাদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন আমরা বংশানুক্রমে কোন্ বিষয়ে কতটা যোগ্যতার বা অযোগ্যতার উত্তরাধিকারী, দেশ কাল আমাদিগকে কোন স্বভাবগত গুণদোষের ভাগী করিয়াছে, তাই এই পুরাতন কাহিনীটুকু কীর্ত্তন করিলাম।

এ দেশের লোকের মধ্যে যাহারা অল্পাধিক পরিমাণে সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, বিংশ শতাব্দে তাঁহাদের ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা যখন এদেশে প্রচলিত হয় তখন এ দেশের লোক এ বিদ্যাকে অবিদ্যানাশিনী বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করে নাই, অর্থকরী বিদ্যা মনে করিয়া ইহার আশ্রয় লইয়াছিল। সূচনায় ইংরেজী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল এবং এখনও যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে স্মরণ শক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হয় বটে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, বিচার শক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তির এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের অবকাশ ঘটে না। উনবিংশ শতাব্দে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃত শিক্ষা হউক আর না হউক চাকুরী বাকুরী মিলিত, অথবা ওকালতি ইত্যাদি ব্যবসা করিয়াও অর্থোপার্জ্জন সম্ভব ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দে ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দে যে ইংরেজী বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা বা vocational ছিল, বিংশ শতাব্দে তাহার সেই ভোকেসনত্ব ঘুচিয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে আর টাকা রোজগার হইতেছে না। সুতরাং এখন অন্য প্রকারের ভোকেসনল বিদ্যাশিক্ষার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে কতটা সুফল ফলিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু একটা মস্ত কুফল ফলিয়াছে;—অ-ভোকেসনল বিদ্যার প্রতি লোকের বিশেষ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন নহে; বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অবিদ্যার নাশ, মনুষ্যত্বের বিকাশ। মনুষ্যত্ব কি? বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার 'বৃত্তি' নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।" আমাদের স্কুল কলেজে যে বিদ্যাশিক্ষা হইয়া আসিতেছে তাহা কতক পরিমাণে রীতির দোষে, কতক পরিমাণে আমাদের কুসংস্কারের বশে মনুষ্যত্ব সাধনের হিসাবে আমাদের যথোচিত উপকার সাধন করিতে পারে নাই। তথাপি এই একই রীতিতে শিক্ষিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের তুলনায় বাঙ্গলার লোককে গড়ে অধিকতর শিক্ষিত বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লোকের তুলনায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের অনুরাগ যে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় দেখা যায় তাহার কারণ আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য। যদিও এদেশের অধিকাংশ লোক ইংরেজী শিক্ষাকে কোন কালে অর্থকরী বিদ্যা ছাড়া আর বেশী কিছু মনে করিতে পারে নাই, তথাপি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এদেশে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন শক্তিশালী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা

৩। বাল্যজীবন—বিদ্যাশিক্ষা

৪। যৌবনে—প্রেমলীলা { সহজ-সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধ রমণীর কায়,
যৌবন-হিল্লোলে খেলে লহরী-লীলায় !—সুরেন্দ্রনাথ ।

৫। মধ্য বয়স—শক্তি ও ক্ষমতা

৬। প্রৌঢ়ে—জ্ঞানাধিকার

৭। বার্দ্ধক্যে—ভগবচ্চিন্তা
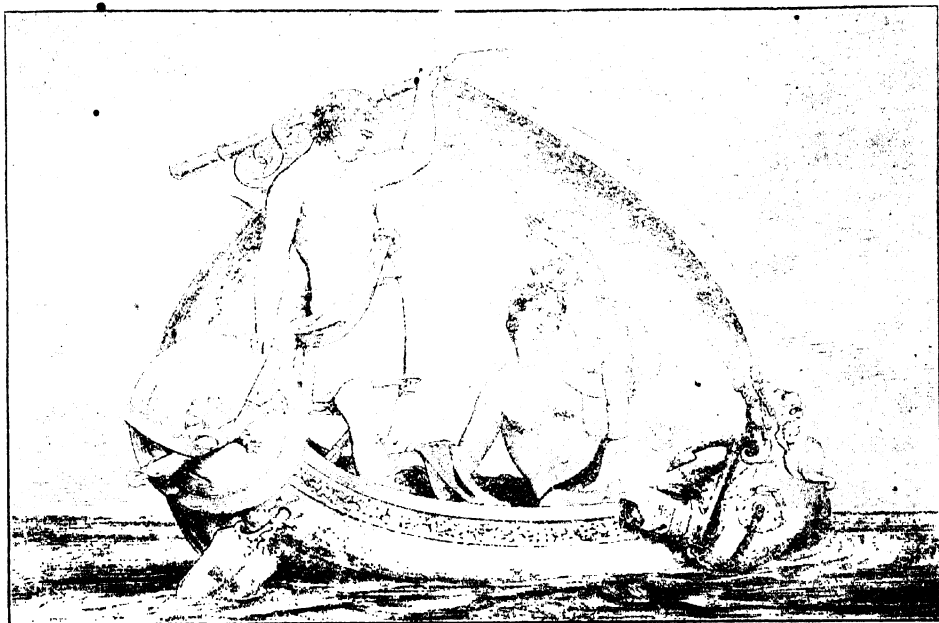
৮। "শেষের সে দিন"—যাত্রা শেষ

ডাকাতি-দমন

২

হুগলির সার্কিট হাউসে ডাকাইতি কমিশনারের যে সকল গোয়েন্দা ছিল তাহাদের মধ্যে সোনা ফকীর ও গুয়ে ফকীর বড় নামজাদা। ইহাদের কীর্ত্তি ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে হইলে লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাইতাম।

সোনা ও গুয়ে দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তবে ইহাদের বাড়ী মেমারী অঞ্চলে। মেমারী বর্দ্ধমান জেলায়, এখানে একটা রেলওয়ে ষ্টেশনও আছে। কেহ কেহ বলেন দত্তপাড়া গ্রামে ফকীর যুগলের আবাসস্থান ছিল। যাহা হউক সোনা ও গুয়ে অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় ছিল, যেখানে সোনা সেইখানেই গুয়ে, যেখানে গুয়ে সেইখানেই সোনা। যত ডাকাতী সব দু'জনে করিত। ইহাদের এমন ক্ষমতা ছিল যে ইহাদের মধ্যে যে কেহ একক ডাকাতী করিতে পারিত। অনেক যত্নে অনেক চেষ্টায় অনেক মিথ্যা কথায় অনেক প্রবঞ্চনায় সোনা ও গুয়ে হুগলীর হাকিট হাউসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের প্রত্যেককে একমণ করিয়া বেড়ী দেওয়া হইল —অর্থাৎ দুইটা আধমণ করিয়া বেড়ী পরান হইল। একরার করিয়া দুইজনেই গোয়েন্দা হইতে স্বীকৃত হইল। দুইজনেই গোয়েন্দাগিরি করিতে লাগিল। কিন্তু বন-বিহঙ্গের মন কখনও কি পিঞ্জরের সহিত সৌহার্দ্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে? সে প্রতিনিয়ত মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে, সুযোগ পাইলেই পলাইয়া যায়। সোনা ও গুয়ে তাহাই করিল। অবলীলাক্রমে বেড়ীগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, প্রহরীকে ফল-বিশেষ প্রদর্শন করিয়া শুভক্ষণে গুয়ে ও সোনা হুগলীর সার্কিট হাউস পরিত্যাগ করিয়া গভীর নিশীথ সময়ে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল—কিন্তু কেহই আর খুঁজিয়া পাইল না। সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। হুগলী বর্দ্ধমানের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি। যেন কোন্ মন্ত্রবলে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ছিল, এই গেল, আর নাই—গেল কোথায়? কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল না কি?

কিন্তু বেশ বুঝা গেল সোনা ও গুয়ে নিশ্চেষ্ট নাই। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ডাকাতী হইতে লাগিল। বুঝা গেল এসকল গুয়ে ও সোনার কার্য্য। যদি বলেন কিসে বুঝিব এসকল গুয়ে বা সোনার কার্য্য? সোনা ও গুয়ে কেহই অপরাপেক্ষা ন্যূন ছিল না। এরা দুজনেই একলা ডাকাতি করিতে পারিত। যেখানে একলা ডাকাতি করিত সেখানে বাটীর সদর ও খিড়কীতে দুইটা (কখনও বা এক দিকেই একটা) কলাগাছ পুঁতিয়া তাহার উপর জ্বলন্ত মশাল বসাইয়া দিয়া ডাকাতি করিত। কেহ কেহ বলিত যে কলাগাছের মানুষ করিত। সে যাহা হউক অনেকগুলি ডাকাতিতে এইরূপ বাটীর কখনও একদিকে কখনও দুইদিকে কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। তাহাতে লোকে নিঃসংশয়ে স্থির করিল যে এগুলি সোনা ও গুয়ের হাতের কাজ, আর কারও নয়। সুতরাং পুলিশ সোনা ও গুয়েকে ধরিবার জন্য নিতান্ত চেষ্টিত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া অনেক বছর কাটিয়া গেল। লোকে সোনা ও গুয়ের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। যখন সরকার বাহাদুর দেখিলেন যে আর তাহাদিগকে ধরিবার কোন উপায় নাই, তখন ধরিতে পারিলে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হইবে এই ঘোষণা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

কাহার অদৃষ্টনেমির কিরূপ আবর্ত্তন হইবে তাহা কালই বসিয়া বসিয়া ঠিক করিতেছেন। লোকে যখন

উপায় চিন্তা করিত। উভয়ে পরামর্শ করিয়া, খোরাকীর জন্য যে চাউল পাইত তাহা হইতে এক মুঠা করিয়া লুকাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যখন দেখিল যথেষ্ট চাউল জমিয়াছে, অর্থাৎ ১০ দিনের মত চলিতে পারে—তখন উভয়ে সাগরে ঝম্প দিল। দুইজন "ভেতো বাঙ্গালী" সেই অগাধ মহাসমুদ্রে, প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, কেবল জন্মভূমির প্রেমে মজিয়া ঝাঁপ দিল।

কতকদূর সন্তরণ করিয়া গেলে পর ভগবান, বন্দীদ্বয়ের যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করিলেন। বন্দীদ্বয় দেখিল একখণ্ড কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছে। সোনা ও গুয়ে উভয়েই সেই কাষ্ঠ খণ্ড ধরিয়া ঘোটকারোহণের ন্যায় চাপিল। সোনা বলিল, "ভাই গুয়ে, মা কালীর কি দয়া—এখন এক মাস সমুদ্রে ভাসতে পারবো।" গুয়ে বলিল—"যখন অদৃষ্টে কাঠ লেগেছে তখন এক মাস জলে ভাসতে হবে না, ডাঙ্গাও শীঘ্র লাগবে।"

এইরূপে গুয়ে ও সোনা মাত্র সেই কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া চলিল। কখনও ডুবিতেছে কখনও ভাসিতেছে। ক্ষুধার সময় কাপড়ে বাঁধা চাউল লইয়া চিবাইতেছে। জল নাই যে পান করিবে। এইরূপে প্রাণের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিল। যখন দিনের উপর দিন যাইতে লাগিল, যখন উভয়ে ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন উভয়েরই আশা ভরসা একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। যাহা হউক অষ্টম দিবসে প্রাতে তাহারা দেখিল দূরে উপকূল—প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। লক্ষ্য করিয়া গিয়া দুই জনে তীরে উঠিল। দেখে এক নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্যে ফল মূল খাইয়া, কয়েক রাত্রি গাছে গাছে বাস করিয়া দুজনে ক্রমে মগের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। বনভূমি পার হইলে সহসা সোনা বলিল, "দেখ ভাই গুয়ে, আমরা দুজনে আর একত্রে থাকব না; দুজনে একত্র থেকেই যত বিপদ। মনে হয় একলা থাকলে ধরা পড়তাম না। আমার ইচ্ছা এই মগের মুলুকে তুমি একদিকে যাও আমি অন্যদিকে যাই, আর যার অদৃষ্টে যা' আছে তাই ঘটবে, একত্রে আর থাকব না।" গুয়ের মাথায় বজ্রপাত হইল। সোনার কথাও যা কাযেও তা। কত বুঝাইল, রাগ করিল, পায়ে ধরিয়া কাঁদিল। শেষে বুঝাইল দুজনে একসঙ্গে না হইলে তারা কখনও আণ্ডামান হইতে পলাইতে পারিত না। গুয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু সোনা অচল অটল। একবার গুয়েকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, বনমধ্যে পলায়ন করিল। গুয়েকে বড়ই লাগিল। সে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই যে সোনার মনে এতটা ছিল। শেষে সেও কোমর বাঁধিল। দেখিল সে অঞ্চলে মজুর বড় আক্রা। গুয়ের শরীরে যথেষ্ট বল ছিল। সে মজুরি আরম্ভ করিল। কায করিত—ফাঁকি দিত না। মগেরা দেশে এরূপ মজুর পায় না, কেহ আপনার মত করিয়া কায করে না। সুতরাং গুয়ের ভারি পসার হইয়া পড়িল। সকলেই গুয়েকে খুঁজিতে লাগিল। নীলাম ডাক আরম্ভ হইল, গুয়েরও হু হু করিয়া পয়সা বাড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গুয়ের হাতে অনেকগুলি টাকা জমিয়া গেল। তখন তাহার দেশে আসিবার ইচ্ছা হইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গুয়ে একদিন রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রা করিল। ৩।৪ দিন ক্রমাগত হাঁটিয়া রেঙ্গুনে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে অনেক বাঙ্গালী দেখিল। সেখানে দিনকতক রহিল। এক একবার মনে করিল এইখানেই মগ রমণীকে বিবাহ করিয়া থাকিয়া যাই। কিন্তু বাটীর সেই মুখখানি যখন বার বার মনে পড়িল—তখন সে বলিয়া উঠিল—"সোনা বেটা বুঝবে কি? তার যে ও কম্ম নেই। মাগীকে ও ছেলেটাকে দেখতে গিয়ে যদি ধরাও পড়ি—ফের যদি আণ্ডামানে আসিতে হয় সেও ভাল।" সোনা বিবাহ করে নাই, কিন্তু দেশে গুয়ের স্ত্রীপুত্র ছিল।

কুক্ষণে গুয়ের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। কুক্ষণে গুয়ে রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া দেশের দিকে পা বাড়াইল। ক্রমাগত উত্তর দিকে গিয়া ডাঙ্গা পথে গুয়ে অনেক বন জঙ্গল দেশ দেশান্তর এড়াইয়া

হুতে আসিয়া উপনীত হইল। দিন কতক বিশ্রাম করিবার জন্য গুয়ে চাকরী স্বীকার করিল। হুগলীর জেলার পুলীশ কর্ম্মচারী সেখানে কি উপলক্ষে গিয়াছিল। গুয়েকে সে চিনিতে পারে। এদিকে আণ্ডামান হইতে সোনা ও গুয়ে পলাইলে সে কথা দেশের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল ও হুলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। সোনা ও গুয়ে বা তাহাদের কাহাকেও ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার আছে এ কথাও ঘোষিত হইয়াছিল। সুতরাং হুগলীর পুলিশের লোক কায়দা করিয়া গুয়েকে গেপ্তার করিল।

গুয়ে আবার হুগলীতে আসিল। সঙ্গীন চড়ান গোরা ব্যবারির পাহারায় তাহাকে রাখা হইল। গুয়ে এই অবস্থায় নিজমুখে তাহার পলাইবার কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল। যাহা হউক, বিচার হইয়া পুনরায় সে দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইল। আবার গুয়ে আণ্ডামানে প্রেরিত হইল।

যদি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সোনা ও গুয়ের জন্ম হইত তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাহাদের জীবনচরিত লেখা হইত; কিন্তু আমাদের দেশের এরূপ সাহস, বীরত্ব, নির্ভীকতা, কার্য্যসিদ্ধিতে অসাধ্য সাধন ক্ষমতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উদাহরণ স্থল কত কত মানবের কীর্ত্তি একেবারে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

ডাকাতী কমিশনের একটি ডাক্তারখানা ছিল। শিবকালী বন্দোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারখানার কার্য্য করিবার জন্য একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত ছিল, তাহার নাম সেখ মোবারেক। এই মোবারেক চুঁচুড়ার মাধব দত্তের বাটীর ডাকাতীর জন্য ধরা পড়ে। পরে দণ্ডিত হইয়া গোয়েন্দা হয়। মোবারেক মাধব দত্তের বাড়ীর ডাকাতীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিল।

"আমরা বারাকপুরের নিকট টিটাগড়ের রাজু বৈষ্ণবের দলের ঘটকের মুখে সংবাদ পাইলাম যে চুঁচুড়ার মাধব দত্ত কলিকাতার তিন চারিটি আফিসের মুচ্ছুদ্দী আর বড় ধনী। ইহাও সংবাদ হইল যে মাধব দত্তের গঙ্গাতীরের বাটীর খুব নিকটেই গোরাবারিক আর সেখানে সৈন্য আছে। দলপতি বলিলেন, গোরা আছে, তাহাতে কি হইয়াছে। ডাকাতির সংবাদ পঁহুছিলে বিউগেল বাজিবে, পোষাক পরিবার হুকুম হইবে, সাজিবে, তার পর কাওয়াজ করিবার পর, মার্চ্চ করিবার হুকুম হইবে, ততক্ষণ আমরা কার্য সাবাড় করিয়া চলিয়া আসিব। ডাকাতী করাই স্থির হইল। দুইখানা নৌকা করিয়া আমরা চুঁচুড়ায় আসিলাম। তীরে উঠিয়া সন্তর্পণে বাটীর ধারে গিয়া বাঁশ পুতিলাম। বাঁশ আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই বাঁশ দিয়া একে একে আমরা দোতলার ছাদে উঠিলাম। পরে চিলের দরজা ভাঙ্গিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিয়া দেখিলাম মাধব দত্ত ও একটী স্ত্রীলোক শয্যায় নিদ্রিত আছে। আমরা দ্বার ভাঙ্গিয়া একেবারে ঘরে গিয়া মাধব দত্ত ও স্ত্রীলোকটিকে বাঁধিয়া ফেলিলাম। পরে নীচে আসিয়া দেখিলাম দেউড়ীতে একজন লোক পাহারা দিতেছে ও সেইখানে ৮।১০ জন পাঠান নিদ্রিত আছে। আমরা পাহারাওয়ালাকে বলিলাম চীৎকার করিলে কাটিয়া ফেলিব। সে কিন্তু আমাদের ধরিবার পূর্ব্বে পলইয়া গেল, আমরা পাঠান গুলাকে একে একে বাঁধিয়া ফেলিলাম। যোড় হাত করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল, পেটের দায়ে আসিয়াছি, প্রাণে মারিও না। আমরাও অভয় দিলাম, বলিলাম চেঁচাইলে কাটিব, নহিলে কোন ভয় নাই। মনে হইয়াছিল পাঠানরা খুব লড়িবে, কিন্তু একজনও লড়িল না—ভেড়ার দলের মত কার্য্য করিল। আমরা বুঝিলাম স্বার্থই মূলাধার। আমি বাহিরে গিয়া সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঢাল তরবাল লইয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। চক্ষুর নিমেষে এই সব কার্য্য হইয়া গেল। বাড়ীতে লুট চলিতে লাগিল। আমি যখন রাস্তার এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ঘাটি দিতেছি, তখন একজ অশ্বারোহী গোরা আমার দিকে আসিল। আমি বুঝিলাম যে পলাতক দরোয়ানটা বারিকে খবর দিয়াছে, তাই সার্জ্জন আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইলাম। সাহেব আসিলে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, "খবর কি?" আমি বলিলাম "গোদাবন্দ সব ঠিক হায়। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গোল হইতেছে বোধ হয় লোক পড়িয়াছে।" সাহেব আমাকে

চৌকীদার মনে করিয়াছিলেন। আমরা মুখে এই কথা শুনিয়া সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া তরবাল খানি কোমে পুরিয়া ব্যারাকের দিকে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "খুব হুঁসিয়ার"। আমি যথারীতি বাতি দিতে আরম্ভ করিলাম। বাহিরে বিউগেল শব্দ শুনিতে পাইয়া অধিকক্ষণ থাকা আর নিরাপদ নহে বলিয়া, সঙ্কেত করিলাম। ইতোমধ্যে কাযও শেষ হইয়াছিল। আমরা বাঁশটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া গিয়া নৌকায় চাপিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আমরা যখন গঙ্গার মাঝ খানটাও ছাড়াইয়া গিয়াছি, তখন দেখিলাম একদল সৈন্য গঙ্গার দিকে আসিতেছে। তাহারা গঙ্গার কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইল ও সকলে একসঙ্গে আওয়াজ করিল। বার দুই তিন ঐরূপ আওয়াজ করিল। গুলি গোলা জলে পড়িল, আমাদের কাছেও আসিল না। আমরা নিরাপদে চলিয়া গেলাম। তার পর বাঁকুড়ায় এক জন ধরা পড়িয়া একরার করায় আমরা জন কতক লোক ধরা পড়ি। বৃদ্ধ রাজুও ধরা পড়িল। আমাদের সব মেয়াদ হইল। আমি আর কয়েক জন, গোয়েন্দা হইলাম। রাজুর কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিত। তাহাকেও একরার করিয়া গোয়েন্দা হইতে বলিলাম। শেষে ডাক্তার বাবুকে ধরিয়া বড় সাহেবকে বলিয়া, রাজুকে একদিন ডাক্তার বাবুর বাড়ী লইয়া গেলাম। ডাক্তার বাবু কত বলিলেন। শেষে রাজু বলিল, "আপনি দেবতা, আপনি ও আক্সারি করিবেন না। আমার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছে আর কটা দিনই বা বাঁচিব? যদি বাঁচি, দেখিতে দেখিতে ১২টা বছর কাটিয়া যাইবে। একরার করিয়া আর কতকগুলা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করি কেন? আমি বেশ আছি কোন কষ্ট নাই।" আমি ও ডাক্তার বাবু শুনিয়া অবাক্। বুঝিলাম রাজু দলপতি হইবার উপযুক্ত লোক।

আদালতে বিচারের সময় আসামী নিজ বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা হইতেই উক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইল।

আগামী সংখ্যায় বিখ্যাত রাধা ডাকাত ও তাহার রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কাহিনী এবং গোলাম সর্দ্দারের ডাকাতীর বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়।

পদ্মা

(বড় গল্প)

২৪

"হাঁরে পদ্মা, দিন দিন তোর এমন মড়ার আকার হচ্ছে কেন?" বলিয়া নীতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্মা তখন কুটনো কুটিতেছিল। সে ম্লান হাসিয়া কহিল, "কি যে পাগলের মতন বকো ছোড়দি!"

নীতা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "পাগলের মতন আমি বকছি না তুই বকছিস? আয়নাতে একবার তোর চেহারা-খানা দেখিস দেখি, কি রকম অস্থি চর্ম্ম সার দেহ হয়েছে।"

পদ্মা কহিল, "হতে দাও। এ শরীর থাকলেই বা কি গেলেই বা কি?" বলিয়াই সে কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "জামাই বাবুকে বল তিন গজ ছিটের কাপড় এনে দিতে, শৈলেনের পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে গেছে, আর একটা করে দেব।"

নীতা ঠিক ধরিয়াছিল, পদ্মার শরীর সত্যই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। তুলিয়ার রোগের সেবা করিবার সময় তাহার সংক্রামক রোগের বীজাণু তাহার দেহে প্রবেশ

য়াছিল। সেই জীবনধ্বংসকারী রোগের বীজাণু দিন তিলে তিলে পদ্মার জীবনীশক্তি হ্রাস করিতেছিল। পদ্মা অতি সাবধানে আপন পীড়ার কথা গোপনে । প্রথমে নীতা ভাবিল মানসিক কষ্টই তাহার তার কারণ। কিন্তু তাহার দেহ যখন অতিশয় ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন ধ্রুবজ্যোতি ও নীতা তাহার কারণ জানিবার জন্য ডাক্তার আনিবার প্রস্তাব করিল। ডাক্তার আনিবার প্রস্তাবে পদ্মা ম্লান হাসিয়া কহিল, "ছোড়দি, তুমি কি ক্ষেপেছ? আমার হয়েছে কি যে খামখা এক মুঠো টাকা নষ্ট করবে? আমি ডাক্তারের ওষুধ খাবনা।"

"বিশ্ববাণী"তে পদ্মার যে উপন্যাসখানি বাহির হইতেছিল তাহা শেষ করিবার জন্য পদ্মা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া উপন্যাসখানি শেষ করিল। যে দিন সে তাহা শেষ করিল, সেই দিন হইতে আর সে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিল না। সন্ধ্যা হইল। তখনও পদ্মা দিবানিদ্রা হইতে উঠিল না। দেখিয়া নীতা তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "পদ্মা, এখনও ঘুমুচ্ছিস নাকি?"

সন্ধ্যার ধূম্র আবরণ তখন বসুধা-রাণীকে ঢাকিয়া য়াছিল। অন্ধকারে ঘরের এক পার্শ্ব হইতে পদ্মা উত্তর , "না, ঘুমুই নি। কিন্তু বড় মাথাব্যথা করছে, তাই উঠতে চি না।"

নীতা তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, "গা যে পুড়ে । কখন জ্বর হল?"

পদ্মা কহিল, "জ্বর রোজই সন্ধ্যাবেলা হয় আর শেষ তে ছেড়ে যায়। কিন্তু আজ জ্বর ছাড়েনি।"

নীতা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া কহিল, "রোজ জ্বর হয় র? কৈ আমাকে ত কিছু বলিস নি। আমি জিজ্ঞেস লে ত হেসে উড়িয়ে দিস।"

পদ্মা কহিল, "আমি আর বাঁচব না ছোড়দি, আমার বড় ব্যথা।"

নীতা কহিল, "বালাই ষাঠ। ওকি অলক্ষুণে কথা! খ হয়েছে, ডাক্তার ডেকে ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। খ লুকিয়ে রেখেছিস তাই ত বেড়ে গেছে।"

পদ্মা অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "দোহাই তোমার ছোড়দি! আমার যদি সময় হয়ে থাকে তাহলে আমাকে যেতে দাও, আর এ ব্যর্থ জীবনের ভার বইতে পারছি না।"

কিন্তু নীতা শুনিল না। পাটনার বিখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসক আশুতোষবাবু ধ্রুবজ্যোতির আহ্বানে পদ্মাকে দেখিতে আসিলেন। পদ্মার বক্ষ পরীক্ষা করিয়া, মুখ বিকৃত করিয়া ইংরাজীতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই এই যে, রোগিণীর জীবনের মেয়াদ বড় জোর আর দুই মাস। প্রায় চারিমাস পূর্ব্বে সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রথম হইতে চিকিৎসা হইলে আরও কিছুদিন জীবিত থাকিত, কিন্তু এখন আর প্রতীকার নাই। তবে ডাক্তারের কর্ত্তব্য রোগীর যন্ত্রণার উপশম করিতে চেষ্টা করা, তাই তিনি প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিলেন। ডাক্তার পদ্মার সম্মুখেই ইংরাজিতে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া ধ্রুবজ্যোতি শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। কিন্তু ডাক্তার তাঁহার ইঙ্গিতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ধ্রুবজ্যোতির মতন একজন সামান্য ব্যক্তির গৃহে যে ইংরাজি শিক্ষিতা মহিলা থাকিতে পারে ইহা তাঁহার কল্পনায় আসে নাই। বাহিরে আসিয়া ধ্রুবজ্যোতি ডাক্তারকে আপন ইঙ্গিতের অর্থ বলিল। শুনিয়া অনুতপ্ত হইয়া আশুতোষ বাবু কহিলেন, "তবে ত কাযটা বড় অন্যায় হয়ে গেল! খুব আপনি যদি পূর্ব্বে একটু হিণ্ট দিতেন! আপনার শ্যালী ত শিক্ষিতা।"

ধ্রুবজ্যোতি কহিল, "শুধু শিক্ষিতা নন, এখনকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা।"

আশুতোষবাবু অন্যান্য চিকিৎসকদের ন্যায় কেবল রোগী ও টাকা লইয়া থাকিতেন না। তিনি সাহিত্য চর্চ্চাও করিতেন। মাঝে মাঝে বাঙ্গালা মাসিকে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সুললিত প্রবন্ধ বাহির হইত। তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, "এখনকার লেখিকাদের মধ্যে পদ্মা দেবী ছাড়া তআর কেউ প্রথম স্থান পেতে পারেন না। অন্ততঃ আমার মতে।"

ধ্রুবজ্যোতি দুঃখিত হইয়া বলিল, "আপনার কেন, বাঙ্গলার বেশীর ভাগ লোকেরই তাই মত। আমার এই শ্যালীই

পদ্মা দেবী। আপনার ভিজিট।" বলিয়া সে ডাক্তারের ভিজিটের চারিটা টাকা তাঁহার হাতে দিতে উদ্যত হইল।

ডাক্তার কহিলেন, "না আমি টাকা নেব না। আমি চিরকালই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত। ওঁর মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে যাবে। ওঁর জীবনরক্ষার চেষ্টা করা বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক থেকেও আমার কর্ত্তব্য। ওঁর চিকিৎসা করে টাকা নিতে আমি পারব না, আমায় মাফ করুন।" বলিয়া আশুতোষ বাবু চলিয়া গেলেন। ধ্রুবজ্যোতি চিকিৎসকের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পদ্মা কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহিল না। কহিল, "আর কেন ছোড়দি? ডাক্তারের কথা শুনলে ত! এবার আমায় যেতে দাও।"

নীতা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কাঁদিয়া ফেলিল।

ধ্রুবজ্যোতি কহিল, "পদ্মা দিদি, ওষুধ খাও। আমি তোমাকে ছোট বোনের মত দেখি, আমার মনে ক্ষোভ রেখ না। বড় ভাইএর কর্ত্তব্য আমাকে করতে দাও। তোমার ছোড়দির মনে কষ্ট দিও না। লক্ষ্মী দিদি আমার, ওষুধ খাও।"

নীতা কহিল "পদ্মা, তুই যদি ওষুধ না খাস, আমি মুখে অন্ন দেব না। আমি শৈলর মাথায়—"

দুর্ব্বল হস্তে নীতার মুখ চাপিয়া ধরিয়া পদ্মা কহিল, "চুপ কর ছোড়দি, ওকি কর তুমি। একটা হতভাগ্য অভিশপ্ত নারী জীবনের জন্য সোনার চাঁদের দিব্য করচ? দিন জামাই বাবু, ওষুধ দিন।"

ধ্রুবজ্যোতি বড় দাদার মতই অতি যত্নে অতি স্নেহে পদ্মাকে ঔষধ পান করাইল। তাহার পর তাহার মাথায় হাত দিয়া তাহার জটাবদ্ধ একরাশ চুলের গুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে কহিল "তোমার জীবন হেলার সামগ্রী নয় পদ্মা। এটা তোমার মহা ভুল। বাঙ্গালা দেশের সহস্র সহস্র পাঠক তোমার লেখার ভক্ত; তোমাকে শ্রদ্ধা করে। এত লোক যাকে এমন করে' পূজা করে, কে বলে তার জীবন তুচ্ছ, মূল্যহীন? আজ ডাক্তারের ব্যবহারে বুঝেছি যে তোমার আসন বাঙ্গালা সাহিত্যজগতে কত উচ্চে।"

—বলিয়া তিনি ডাক্তারের সকল কথা তাহাকে বলিলেন।

শুনিয়া পদ্মার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ পরে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কহিল, "আচ্ছা জামাই বাবু, বিশ্ববাণীতে যে আমার "পিপাসা" বার হচ্ছে তার শেষ পর্য্যন্ত কি আমি বেঁচে থাকব না?"

ধ্রুবজ্যোতি কহিলেন, "নিশ্চয় থাকবে। ডাক্তার বলেছেন তোমাকে ভাল করতে তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবেন।"

এই আশ্বাসে ঠিক শিশুর মতনই আশ্বস্ত হইয়া পদ্মা চুপ করিয়া রহিল। বাহির হইতে শৈলেন ডাকিল—"মাসীমা!"

নীতা কহিল, "আয় শৈল, তোর মাসীমার কাছে বস্‌বি আয়।"

কিন্তু পদ্মা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না বাবা তোমাকে আর কাছে বসতে হবে না। তুমি ওখান থেকে আমাকে দেখা দিয়ে যাও।"

শৈলেন্দ্র পদ্মাকে বড় ভালবাসিত, পদ্মার কথার অবাধ্য কখনও হইত না। পিতামাতার নিকট মাসীর পীড়ার কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। এখন মাসীমা তাহাকে নিকটে আসিতে দিলেন না দেখিয়া সে কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিল।

পদ্মা তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "শৈল, বাবা! অবুঝ হোওনা। আমার এ অসুখে কাছে বসতে নেই। এ বড় ছোঁয়াচে রোগ। আমার কাছে এলে তোমাদের যদি হয়, তাহলে আমি একদিনও বাঁচব না। লক্ষ্মী বাপ আমার, ঐ বাইরে থেকে আমাকে দেখে যেও।"

শৈল কখনও পদ্মার অবাধ্য হয় নাই, আজও হইল না। সে কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

২৫

মৃত্যু যাহাকে লইয়া যাইতে চাহে, তাহাকে ধরিয়া রাখে জগতে এমন সাধ্য কাহারও নাই। নীতা ও ধ্রুবজ্যোতি

সেবা ও আশুতোষ বাবুর চিকিৎসা ভাণ্ডার উন্মুক্ত চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া পদ্মা দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর লাগিল। নীতা পুত্র কন্যা ফেলিয়া পদ্মার সেবা লাগিল। ধ্রুবজ্যোতি পদ্মাকে অতিশয় স্নেহ তন, পদ্মার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে । সে দিন ডাকের পত্র আসিলে ধ্রুবজ্যোতি লেন, "পদ্মা, বিশ্ববাণী এসেছে। তোমার পিপাসা শেষ হয়েছে।"

"দেখি" বলিয়া ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত দিয়া পদ্মা পত্রিকা খানা । তাহার "পিপাসা" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছিল। টনোটে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে লেখিকা পদ্মা পীড়িতা; তাঁহার আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত পাঠকদের রচনা সুধা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।"

ড়িয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পদ্মা কহিল, "আর গ্য। জামাইবাবু, বাঙ্গলার পাঠকদের কাছে এই স" আমার শেষ উপহার, আর ওদের আমার লেখা হবে না।"

তাহার কথা শুনিয়া নীতা কাঁদিয়া উঠিল। আর জ্যোতিঃ যন্ত্রণা-কাতর দৃষ্টিতে তাহার মরণছায়াচ্ছন্ন মুখের চাহিয়া রহিল। কি উত্তর দিবে সে? পত্নীকেই বা লিয়া প্রবোধ দিবে? পদ্মার কথা যে সত্য।

মে পদ্মার উঠিবার শক্তিও লোপ পাইল। একদিন কহিল, "ছোড়দি, একটা কথা বলব রাগ করবে

নীতা কহিল, "আমি তোর উপর রাগ করব পদ্মা? যে আমার কত আদরের ছোট বোন!" পদ্মা চুপ করিয়া ল।

নীতা কহিল, "কি বলবি পদ্মা বল না?"

"ছোড়দি!" বলিয়াই পদ্মা চুপ করিল। নীতা বুকের ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হিল, "কি বলবি পদ্মা, বলে ফেল। আর বুকে ব্যথা পুষে স নে ভাই।"

করুণ-কাতর স্বরে ভীতা হরিণীর ন্যায় শঙ্কিত দৃষ্টিতে হিয়া পদ্মা কহিল, "ছোড়দি, শেষ সময়ে একবার—"

নীতা তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "প্রকাশের কথা বলছিস পদ্মা?"

"হ্যাঁ দিদি, তার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা না চেয়ে মরলে, মরণেও শান্তি পাব না।"

নীতা কহিল, "পদ্মা, একটা কথা বলবি?"

"কি কথা দিদি?"

"তুই কি প্রকাশকে ভালবাসিস্?"

পদ্মা কহিল, "এ কথা জিগ্‌গেস করছ কেন দিদি? বাসবো না বল্লেই বুঝি হয়? এ যে জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ!"

নীতা মৃদু কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কেন তাকে অমন করে ফিরিয়ে দিয়েছিলি?"

পদ্মা কহিল, "সে তুমি কি বুঝবে ছোড়দি! আমার যে তা না করে আর অন্য উপায় ছিল না। অসুখের সময় আমার ব্যভারে তোমরা আমায় পাষাণী ভাবতে। কিন্তু আমার অন্তরটা যদি তোমরা দেখতে পেতে, তাহলে দেখতে কি ভীষণ চিতার আগুন সেখানে জ্বলচে। কি যন্ত্রণা আমি সহ্য করেছি তা কেউ জানে না। কাউকে যেন জানতেও না হয়। উঃ, বুকে বড় ব্যথা।"

বলিয়া পদ্মা অতিশয় কাসিতে লাগিল। তাহার পর খানিকটা রক্ত বমন করিল। গর্ভধারিণী জননীর মতই নীতা পীড়িতা ভগিনীকে পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করাইয়া, দুই হস্তে সেই রক্ত পরিষ্কার করিয়া ঘরের মেঝেতে খানিকটা ফিনাইল ছড়াইয়া দিল। তাহার পর হাত ধুইয়া আসিয়া পদ্মার নিকট বসিয়া কহিল, "বল্ পদ্মা সব কথা বল্। আর মনের মধ্যে এ আগুন জ্বালিয়ে রাখিস নে ভাই।"

পদ্মা বলিতে লাগিল—"কি বলব ছোড়দি, দাদা ক্ষমা করতে বলেছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগেই আমি তাকে ক্ষমা করেছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি কাউকে দোষ দিই নি। কিন্তু তখন স্বামী বলে ওঁর উপর কোনও টান ছিল না, কখনও ওঁর কথা ভাবতুমও না। তারপর দাদা গেলেন, তোমাদের এখানে এলুম, ওঁর ওখানে যখন চাকরী নিয়ে যাই, তখনও আমার মনে কোন দুর্ব্বলতা ছিল না। ঠিক চাকরী করবার উদ্দেশ্যেই ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন গেলাম? বোধ হয় না গেলেই ভাল করতাম। তখন

আমি আমার মনের দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলুম না। পালাবার জন্ম ছটফট করতে লাগলুম। কিন্তু পালান হল না। তৃপ্তি এসে পড়ল। সে আমায় ছাড়লে না। তার কাছে টের পেলুম ওঁর মন জুড়ে আছে এই হতভাগিনী। তিনি নিজেও সুখী হন নি, তৃপ্তিও সুখী হয় নি। সতীনে তৃপ্তির বড় ভয়। তার বিশ্বাস সে মরলেই উনি পূর্ব্ব স্ত্রীকে ঘরে আনবেন। তাই শুনে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম যে, তৃপ্তির মৃত্যুর পর পত্নীর অধিকার নিয়ে ওঁর ঘরে কখনও থাকব না। আর একবার তৃপ্তির মৃত্যুর দিনও এই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। তাই প্রতিজ্ঞা ভেঙে ওঁর অমন অসুখের সময়ও যেতে পারিনি। বল ছোড়দি, এত ব্যথা বুকে জমিয়ে রেখেও যে বেঁচে থাকতে পারে, সে পাষাণ, না মানুষ?"

বলিয়া পদ্মা নীতাকে তাহার ক্ষীণ বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া তখন হু হু করিয়া অশ্রুরাশি, বাঁধ ভাঙ্গা নদীর জলরাশির মতন বাহির হইতেছিল। নীতার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। পদ্মার ক্ষীণ শরীর জড়াইয়া ধরিয়া নীতা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পত্নীর নিকট সকল কথা শুনিয়া ধ্রুবজ্যোতি প্রকাশকে অবিলম্বে পাটনাতে আসিবার জন্ম টেলিগ্রাফ করিল। কিন্তু প্রকাশ আসিলও না, কোন উত্তরও দিল না। এ দিকে পদ্মার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। সে প্রত্যহ প্রকাশের আশাপথ চাহিয়া থাকিত। নীতা বসিয়া তাহার বক্ষে মালিস করিতেছিল। পদ্মা কহিল, "ছোড়দি, সে এল না!"

নীতা চুপ করিয়া রহিল। কি উত্তর দিবে সে ভাবিয়া পাইল না।

পদ্মা কহিল, "সে আসবে না। আমি তার কাছে যে অপরাধ করেছি, তা ক্ষমা করা বড় শক্ত। আমার মৃত্যুর পর, আমি কত সহ্য করেছি তা তাঁকে বলে, আমায় ক্ষমা করতে বোল ছোড়দি। আর আমার বাক্সেতে প্রায় দশ বছর আগেকার লেখা তাঁর একখানা চিঠি আছে, তা তাঁকে ফিরিয়ে দিও।"

নীতা নীরবে তাহার কথা শুনিতেছিল। পত্রের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সে কহিল, "প্রকাশের চিঠি তোর কাছে, দেখি? চাবি দে।"

পদ্মার বাক্স হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িয়া, একটু চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীতা কহিল, "হায় অভাগী, এ চিঠি পড়েও কিছু বুঝতে পারিস নি?" পদ্মা উত্তর দিল না।

সেই রাত্রিতে ডাক্তারের বাড়ী হইতে ফিরিয়া ধ্রুবজ্যোতি ডাকিল—"নীতা।"

নীতা স্বামীর আহ্বানে তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ধ্রুবজ্যোতি কহিল, "রাস্তায় প্রকাশের চাকরের সঙ্গে দেখা হল। সে বল্লে, প্রকাশ আজ সকালে এসেছে।"

নীতা কাতর কণ্ঠে কহিল, "ওগো কাল তুমি তাকে যেমন করে পার নিয়ে এস। তার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে বুঝি ওর প্রাণ বেরিয়েও বেরুচ্ছে না। তার জন্তেই ও এখনও বেঁচে আছে। অভাগীর প্রাণের কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় নি। শেষ ইচ্ছাটা অপূর্ণ রেখে ওকে যেতে দিতে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!" বলিয়া নীতা কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রকাশ আসিয়াছে শুনিয়া পদ্মার মুখ আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণেকালের মধ্যে তাহার সে আনন্দের আলো নিবিয়া তাহার মুখকে নিরাশার মেঘমালায় আচ্ছাদিত করিয়া দিল। হতাশ কণ্ঠে পদ্মা কহিল, "তোমরা আমাকে ওর কাছে রেখে এস।"

শিহরিয়া উঠিয়া নীতা কহিল, "বলিস কি পদ্মা, এই শরীরে?"

পদ্মা কহিল, "হাঁ, আমি তার কাছে মহা অপরাধ করেছি, যদি সে না আসে! আমাকে যে তার ঘরে নিয়ে যাবার জন্তে বড় ব্যস্ত হয়েছিল। শেষটা তার ওখানেই আমায় মরতে দাও ছোড়দি।"

আহত স্বরে নীতা কহিল, "পদ্মা! পদ্মা! চুপ কর! আর বলিস নে, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি নে ভাই।"

ক্ষীণ স্বরে পদ্মা কহিল, "ভেবে দেখ ছোড়দি, আমি কত সহ্য করেছি। বাবার অকাল মৃত্যুর কারণ আমি। সত্যি বটে তাঁর শরীর ভাল ছিল না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট যদি অমন না হত, তা হলে বাবা বোধ হয় আরও কিছুদিন বাঁচতেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর পরও আমি সাধার

বেড়িয়েছি। আমার বুকের আগুনের তাত কারো লাগতে দিইনি। সত্য বটে তোমাদেরও ...। কিন্তু আমার মতন কি? আমিই যে তাঁর ...কারণ। তারপর দাদা, পিসীমা মরণ কালেও ... জন্যে শান্তি পান নি এ কথা যে আমি এক ... জন্যও ভুলতে পারি নি। তারপর তৃপ্তি, ... আমারই জন্যে সুখী হয় নি। উনিও অসুখী হয়েছেন, তার কারণও ত আমি। দেবরাণী আমাকে পাষাণী বলেছিল, কিন্তু সে যদি আমার বুকের ভেতরটা দেখতে পেত, তাহলে দেখত কি আগুন সেখানে জ্বলছে। সত্যই আমি পাষাণী। পাষাণ ছাড়া এত সহ্য করতে কেউ পারে না। কিন্তু আমার হৃদয় পাষাণে অজস্র ছেঁদা হয়ে গেছে।"

নীতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "পদ্মা, বোন, এত ব্যথা বুকে পুষে রেখেছিলি কেন? বড় দিদি আমি, আমাকে কি কিছু ... নেই?"

পদ্মা কহিল, "কিন্তু তাতে ত আমার জ্বালার একটুও ...হত না ছোড়দি। আমার যন্ত্রণা কমাবে কেবল মৃত্যু। আর জামাইবাবু আমার সঙ্গে চল, তোমরা আমাকে ... করবার জন্যে তাকে বল।"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নীতা কহিল "তাই পদ্মা! আমরা তোকে প্রকাশের কাছে রেখে আসবো! যদি ক্ষমা না করে, আমি তার পায়ে ধরব। তোর জন্যে ... আমি করব।"

২৬

দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইয়া প্রকাশ দুইদিন মাত্র ...তে আসিয়াছিল। দার্জ্জিলিং হইতে সে কলিকাতাতে ... লইয়া গিয়াছিল, অমরলতাকে সে কলিকাতায় ...নও বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া বোর্ডিংএ ...য়া আসিয়াছিল। গৃহিণীশূন্য গৃহে কন্যা আনিয়া কি ...ব, কে তাহার প্রতিপালনের ভার লইবে? তাহার মন ...য়ের প্রতি অতিমাত্রায় তাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ... অমরলতার মুখ চাহিয়া তাহাকে আবার সংসারে ফিরিতে হইল। অমরকে প্রতিপালন করিবার জন্য যে তাহাকে বাঁচিয়া থাকিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে!

সমস্ত দিন ভৃত্যদের সাহায্যে বিশৃঙ্খল গৃহস্থালীতে শৃঙ্খলা আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া, বৈকালে প্রকাশ অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে শয়ন কক্ষে একখানা কৌচে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তাহার অদৃষ্টের পরিহাসের কথা ভাবিতেছিল। মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া অস্তগামী রবির শ্রান্ত কিরণ ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃদু মৃদু সান্ধ্য সমীরণ প্রকাশের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল। এমন সময় বাহিরে গাড়ী থামার শব্দ হইল। প্রকাশ বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—"আঃ, বাড়ী আসতে না আসতে মক্কেলের উপদ্রব! দুদিন বিশ্রামও করতে পাব না?"

সম্মুখের বারান্দাতে মৃদু পদ শব্দ হইল। বিস্মিত হইয়া প্রকাশ দেখিল, এক গৌরাঙ্গী রমণী একখানা মোটা বিছানার চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, চঞ্চল গতিতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেছে। কে এ নারী? তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবরণে আচ্ছাদিত থাকিলেও তাহার সুগৌরবর্ণ ও ললিত অঙ্গসৌষ্ঠব বলিয়া দিতেছিল রমণী সুন্দরী! প্রকাশের নিকট এরূপ মক্কেল কখনও আসে নাই। বিস্ময়ের আধিক্যে প্রকাশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আগন্তুকার দিকে চাহিয়া রহিল। রমণী প্রকাশের অতি নিকটে আসিয়া মুখের আবরণ খুলিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল—"চিনতে পার প্রকাশ?"

প্রকাশ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়প্লাবিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"নীতা দিদি!"

রমণী কহিল, "হা আমি নীতা, অভাগিনী পদ্মার দিদি নীতা। তোমার কাছে কেন এসেছি তা জান প্রকাশ?"

প্রকাশ কহিল, "না। কি হয়েছে নীতা দি?"

নীতা কাতর কণ্ঠে কহিল, "প্রকাশ, আমি পদ্মার হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি। পদ্মার সকল অপরাধ আজ তুমি ক্ষমা কর।"

প্রকাশ কহিল, "কিসের ক্ষমা দিদি? আমার কাছে সে কোন দোষে দোষী নয়। যে নিজের অপরাধের ভারে

সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, তার অন্যের অপরাধ ভাববার অধিকার কি দিদি ?"

নীতা কহিল, "কিন্তু তার ধারণা, তুমি তার অপরাধ নিয়েছ। অন্ততঃ তার আত্মার তৃপ্তির জন্য একবার বল তাকে ক্ষমা করেছ। মৃত্যুকালে তাকে একটু শান্তি দাও।"

প্রকাশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কি বলছেন আপনি ? পদ্মার মৃত্যুকাল !"

নীতা কহিল, "হঁা, পদ্মা আজ অন্তিম শয্যায়। কেন, তুমি ওঁর তার পাওনি ?"

প্রকাশ কহিল, "না আমি কোনও টেলিগ্রাফ পাইনি। বোধ হয় দার্জ্জিলিংএ সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি প্রায় এক মাস পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং ছেড়েছি। আমি কলকাতাতে ছিলাম! তাই টেলিগ্রাফ আমার কাছে পৌঁছায় নি।"

নীতা কহিল, "উনি তোমার দার্জ্জিলিংএর ঠিকানাতেই টেলিগ্রাফ করেছিলেন। এখন সব বুঝছি। যাক্, তুমি তার অপরাধ নাও নি, তবে তার কাছে চল। তাকে নিজে বল। সে এসেছে।"

প্রকাশ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "পদ্মা এসেছে ? কোথায় সে ?"

নীতা কহিল, "হঁা, সে এসেছে। অন্তিমে তোমার বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার জন্যে এসেছে। বাইরে গাড়ীতে উনি পদ্মাকে নিয়ে বসে আছেন। তার বিশ্বাস, তুমি তার অপরাধ ক্ষমা করবে না। তাই সে নিজে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "পদ্মা—পদ্মা এসেছে ? চলুন তাকে নামিয়ে আনি।" বলিয়া প্রকাশ তাড়াতাড়ি পদ্মার উদ্দেশে চলিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীর ভিতরে মৃতপ্রায় পদ্মাকে ধরিয়া ধ্রুবজ্যোতি বসিয়া আছে। পদ্মার সেই কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া প্রকাশ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল—"এ কি দেখাতে এলে পদ্মা !"

পদ্মা চক্ষু বন্ধ করিয়া ছিল। প্রকাশের কথা শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া স্থির দৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার কথা বলিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ধ্রুবজ্যোতি কহিল, "পদ্মা, প্রকাশ এসেছে।"

অতি কষ্টে প্রাণের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বলিল, "ক্ষমা।"

প্রকাশ কহিল, "ক্ষমা চাইতে ত আমাকেই হবে পদ্মা ! পদ্মা—পদ্মা ! এতকাল পরে আমাকে এ ভাবে শাস্তি দিতে এলে ?"

পদ্মা কহিল, "না, শান্তি নিতে এসেছি।"

ধ্রুবজ্যোতি ও প্রকাশ উভয়ে ধরাধরি করিয়া, অসহায় শিশুর মত অতি সন্তর্পণে পদ্মাকে বাড়ীতে লইয়া গেল। ডাক্তার আশুতোষবাবু প্রকাশের আহ্বানে প্রকাশের বাড়ীতে পদ্মাকে দেখিতে আসিলেন। সন্ধ্যার পর ধ্রুবজ্যোতি ও নীতা পদ্মার নিকট প্রকাশকে রাখিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রকাশ পদ্মার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "পদ্মা, পদ্মা ! আমাকে ক্ষমা কর !"

ক্ষীণস্বরে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে পদ্মা কহিল, "তোমার অপরাধ আমি অনেকদিন ক্ষমা করেছি। ওগো, দাদার মরবার সময়ে আমাকে যে এই আদেশই তিনি করে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তোমার অসুখের সময় কেন আসিনি জান ?"

প্রকাশ কহিল, "না।"

তখন ধীরে ধীরে পদ্মা আপন হৃদয়ের দ্বার প্রকাশের নিকট খুলিয়া দিল। তাহার পর কাতরকণ্ঠে কহিল, "ওগো আমায় ক্ষমা কর ! অপরাধের চেয়ে শাস্তি আমার কত কঠোর হয়েছে, তা ভেবে তুমি আমায় ক্ষমা কর !"

প্রকাশ তাহার উত্তপ্ত ললাটে হাত রাখিয়া কহিল, "তোমার অপরাধ আমি কখনও নিইনি পদ্মা। তবে তোমার মনের শান্তি যদি হয়, তাহলে বলছি, তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করলাম। পদ্মা, একবার বল তুমি আমার ?"

নীতা ও ধ্রুবজ্যোতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

পদ্মা কহিল, "ওগো, আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝেছি, মান, অভিমান, দর্প বলে' নারীর কিছু নেই। নারীর আছে কেবল প্রাণভরা ভালবাসা।" বলিয়া পদ্মা কাঁদিতে লাগিল।

নীতা কহিল, "পদ্মা, কাঁদিসনে। এ নও কি শান্তি নি?"

"শান্তি! হ্যাঁ, শান্তি পেয়েছি বই কি!"

প্রকাশের বাড়ীতে আসার পর তিন দিন পদ্মা বাঁচিয়া ছিল। চতুর্থ দিনে, তাহার জীবনের শেষদিনে, ডাক্তার আশুতোষবাবু তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়াই বলিলেন, "আজ সব শেষ হয়ে যাবে।" নীতা ও ধ্রুবজ্যোতি সে দিন তাহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিল না।

পদ্মার চৈতন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল। বৈকালের দিকে তাহার কেমন একটু অবসাদ বোধ হইতে লাগিল। সে কহিল, "ছোড়দি, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।"

সকলেই বুঝিল, ইহা মহানিদ্রার আবেশ। প্রকাশ কহিল, "পদ্মা, আমাকে আর কিছু বলবার আছে?"

পদ্মা কহিল, "আছে, দেবরাণীকে সব কথা বোলো। আর, আমাকে ক্ষমা করতে বোলো! আর বোলো সে লক্ষী, সে বলেছিল একদিন আমাকে নিজেই এখানে আসতে হবে। তার কথা মিথ্যে হয়নি।"

প্রকাশ কহিল, "বলবো, তোমার সব কথাই আমি কে বলবো। পদ্মা, আমিই তোমার এই অকাল মৃত্যুর কারণ!"

প্রশান্ত স্বরে স্নিগ্ধ হাসিয়া পদ্মা কহিল, "তোমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টের লিখনই এই! অদৃষ্ট ছাড়া জগতে কেউ এক পা চলবার শক্তি নেই। তুমি এ ভেবে দুঃখ পেও না। অমরকে দেখো!"

এতগুলি কথা বলিয়া মরণপথযাত্রী পদ্মা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে হাঁফাইতে লাগিল।

প্রকাশ উঠিয়া উত্তেজক ঔষধ চামচে করিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। কিন্তু সব ঔষধ তাহার উদরে গেল না। কস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

নীতা কাঁদিয়া কহিল, "পদ্মা! পদ্মা! আজ কোথা—কোথা যাচ্ছিস?"

ক্ষীণ, স্তিমিতপ্রায় কণ্ঠে পদ্মা কহিল, "ছোড়দি, তুমি একদিন বলেছিলে যে আমাকে এখানে আসতে হবেই। মনে আছে?"

নীতা কহিল, "ও কথা বলিস্‌নে পদ্মা, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে!"

পদ্মা কহিল, "ছোড়দি, আশীর্ব্বাদ কর, যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে যেন সুখী হই। জামাই বাবু!"

ধ্রুবজ্যোতি কহিল, "কেন দিদি?"

অন্তিম নিশ্বাস টানিতে টানিতে পদ্মা বলিল, "জামাই বাবু! আপনার ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও শোধ করতে পারব না।"

ধ্রুবজ্যোতি গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "বড় ভাইয়ের কাছে ত ছোট বোনের ঋণ হতে পারে না দিদি! সেটা যে তার ন্যায্য পাওনা। আশীর্ব্বাদ করি, সংসারের জ্বালা আর যেন তোমায় সহ্য করতে না হয়।"

কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ধ্রুবজ্যোতির চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল।

"জামাই বাবু! ছোড়দি!"

"পদ্মা, পদ্মা! কি বলছিস্?"

পদ্মা ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "কোথায় তুমি? আমি ত তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে! ছোড়দি, আমার কাছে এস! জামাই বাবু, আমার কাছে আসুন! আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না! সব অন্ধকার! ওকি? ও সব কিসের আলো?"

ধ্রুবজ্যোতি ও প্রকাশ সমস্বরে পদ্মার কাণের নিকট ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। পদ্মা অন্তিম-নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল। ধ্রুবজ্যোতি তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতেছিল। সব শেষ হইয়াছে বুঝিয়া, সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "যাও পদ্মা! যেখানে সংসারের জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই, সেইখানে যাও। সুবিমল শান্তির রাজ্যে যেন তোমাকে অশান্তির ছায়াও স্পর্শ করতে না হয়!"

আর প্রকাশ? তাহার তখন জ্ঞান ছিল না। সে উন্মত্তের ন্যায় পদ্মার মরণাচ্ছন্ন মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। জ্ঞানহারা নীতা ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

এই সময় দুই ব্যক্তি ব্যস্ত ভাবে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। একজন কহিলেন—"বাঃ—সব শেষ হয়ে গেছে?

জীবন থাকতে আসতে পারলাম না! মুকুন্দের মেয়ে—আমার প্রিয় বন্ধুর মেয়ে পদ্মা আর নেই?"

ইনি "বাণী"র সম্পাদক অনাদি বাবু। অনাদি বাবু ব্রাহ্ম, তিনি নতজানু হইয়া মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্য উপাসনা করিতে লাগিলেন। অপর জন ছিলেন "প্রকৃতি"র সম্পাদক। সখেদে বলিয়া উঠিলেন—"বাঙ্গলা সাহিত্যাকাশের আজ একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে গেল। এঁর মৃত্যুতে সাহিত্যের যা ক্ষতি হল তা আর পূরণ হবে না।"

অনাদি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "হাঁ, বাঙ্গলা সাহিত্যের আজ বড় দুর্দ্দিন।"

বলিয়া সম্পাদক দুইজনেই মৃতদেহের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত

শ্রীনীহারনলিনী দত্ত।

সামাজিক নব সমস্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপন্যাস আদিতেও দেখিতেছি একজন অন্য আর একজনকে পবিত্র প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখী বা সুস্থ হইতে পারিলেন না। রমণী যদি বলিলেন "আমি তোমার স্ত্রী হইতে পারিতেছি না, আমাকে ভগিনী ভাবে দেখ"—পুরুষ তাহাতে তৃপ্ত নহেন, তিনি রমণীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইতে চাহেন, পত্নী ভাবেই পাইতে চাহেন। কেন, যদি কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমই উদ্দিষ্ট বস্তু হয়, তবে স্ত্রীভাবে না পাইলে কি তাহা ফুটিতে পারে না? ভগিনী ভাবে মাতৃ-ভাবে কি তাহা হইতে পারে না? প্রাণ দিয়া ভালবাসাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা কি পত্নীভাব না হইলে হইতে পারে না? অপর পক্ষে রমণীও প্রেমাস্পদকে ভ্রাতৃভাবে বা পিতৃভাবে ভাবিতে পারিবেন না,—স্বামী ভাবে অথবা প্রণয়ীভাবে (কারণ আজ-কালকার শাস্ত্রে নাকি বিবাহ-বন্ধনবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীভাবে পবিত্র প্রেম ফুটিতেই পারে না পরকীয় হওয়া চাই) না পাইলে চলিবে না? ইহার মূলে যে কি 'কেন', তাহা একবার সকলে প্রণিধান করিয়া দেখিবেন কি?

তারপর, অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, নবকুমার ও নবকুমারী যুবক যুবতী অথবা নিঃসম্পর্কীয় নব যুবক-যুবতী পরস্পর আলাপ করিবার সময়ে নির্জ্জন স্থানই বেশী পছন্দ করেন। সেখানে যুবকের বা যুবতীর পিতা মাতা, বয়স্ক ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি থাকিলে তাঁহাদের মনটা কেবল খুঁত খুঁত করে, আলাপটা ভাল জমে না। কেন এরূপ হয় বলিতে পারেন কি? উভয়ের মধ্যে সাধারণ কথোপকথন তো অবাধে সকলের সম্মুখেই হইতে পারে, তবে নির্জ্জনতার জন্য প্রাণের এ আগ্রহটা কেন? উপন্যাস আদিতেও দেখা যায় যে, এইরূপ ব্যক্তিরা পিতামাতা প্রভৃতির উপস্থিতিটা একটা বাধা-স্বরূপেই মনে করেন, আর সেরূপ ঘটিলে ঐসব অন্তরায়-উৎপাদনকারীদের উপর উভয় পক্ষই বিরক্ত হইয়া পড়েন।

পবিত্র ভাব সর্ব্বত্রই পবিত্র—তাহার জন্য নির্জ্জনতার দরকার হয় না। উহার মধ্যে অন্য ভাবের একটু কাঁটা থাকিলেই অন্যের উপস্থিতিতে তার খোঁচাটা মনে লাগে।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই সব কারণেই নব-যৌবন-প্রাপ্ত পুরুষ ও রমণীকে নির্জ্জনে বিবিক্তাসনে বসিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কারণ বয়সের এবং প্রকৃতির প্রভাবে প্রথমে মনে কোন গোল না থাকিলেও পরে উদ্দীপক কারণ-সমবায়ে সেরূপ ভাবের উন্মেষ

মনের মধ্যে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। মনে হয় একজন ইংরাজ লেখকের লেখায় পড়িয়াছিলাম যে চরিত্র এমনই একটা জিনিষ যে, কেহই যেন উহার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাসী না রাখে এবং সেইরূপ বিশ্বাসে বলে যেন উহাকে বৃথা পরীক্ষার মধ্যে না ফেলে।

আমি দেখিয়াছি, যে বাড়ীতে যে চাকর বা চাকরাণী বিশ্বস্ত ছিল, প্রভুর বিত্তাদি অপহরণ করিতে তাহাদিগকে দেখা যায় নাই, তাহাদেরই প্রতি অতি বিশ্বাস করিয়া ভাণ্ডারের চাবি তাহাদের হাতে দেওয়াতে এবং ভাণ্ডারে তাহাদের অবাধ গতিবিধির স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে তাহারা লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই—শেষে ভাণ্ডার হইতে জিনিস চুরী করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। একজন এইরূপ করিয়া ধরা পড়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীকার করিয়াছিল, "মাঠাকুরাণীই তো আমাদের সম্মুখে এত লোভের জিনিস ধরে দিয়ে আমাদের চোর বানিয়েছেন।" ঠিক কথা।

"বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" এ কথা অতি উত্তম এবং উচ্চ স্তরের তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সংসারে সেরূপ ধীর ব্যক্তি কয়জন দেখিতে পাওয়া যায় বলুন দেখি?—হতভাগিনী রূপজীবিনীগণের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইয়া, তৎকাল পর্য্যন্ত অতি নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তি, তাহাদের করুণ জীবন-কাহিনী নিজে শুনিয়া তাহাদের ব্যথার কথা সকলের কাছে প্রকাশ করিবেন এবং তাহাদের একটা গতি করিবেন, এইরূপ মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া উহাদের গৃহে গতায়াত আরম্ভ করিয়া, কিছুদিন মধ্যে নিজেই পাপকালিমা-লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন এমন একাধিক দৃষ্টান্তের বিষয় আমার জানা আছে।

এই সব কারণেই আমাদের দেশে রমণীকে মাতৃভাবে দেখিবার উপদেশ সর্ব্বদা দেওয়া হইয়াছে। নিজ পরিবার মধ্যে সম্পর্কিতা রমণীগণের অনেকের শেষেই 'মা' যুক্ত আছে—জেঠাইমা, কাকিমা, পিসিমা, মাসিমা, দিদিমা, কর্ত্তামা, বড়মা, ছোটমা ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহাদের কন্যাগণকেও ভগিনীভাবে দেখিবার বিধান করা হইয়াছে। নিঃসম্পর্কিত গ্রামবাসিগণের মধ্যেও ঐ কারণেই একটা পারম্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে তদ্দ্বারা নিজেদের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধনও যেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, সেইরূপ পাপাচারের উত্তেজনাও অনেকটা কম হইয়া যাইবে। কারণ বাল্যকাল হইতেই যাহাদের প্রতি একটা মাতৃভাব বা স্বসৃভাব বা দুহিতৃভাব অনুভব করিয়া আসিতেছি, তাহাদের প্রতি পাপভাব মনে আসিবার সম্ভাবনা থাকেই না, অথবা সেরূপ সম্ভাবনা অত্যন্ত কম হইয়া যায়। আমি পল্লীগ্রামবাসী, ঐরূপ সব সম্বোধন এবং সম্বন্ধ স্থাপনে আবাল্য অভ্যস্ত, এবং পল্লীর ভাব ধারার সঙ্গেও বিশেষ ভাবেই পরিচিত আছি। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতেও বলিতে পারি, পল্লীর অশিক্ষিত গ্রাম্য জনদিগের মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত কম। আর যেখানে যেখানে সময় সময় ইহার ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেও প্রায়ই প্রবীণ প্রবীণাগণের অনবধানতাবশতঃ বিবিক্তাসনে অবস্থানের সুযোগ বেশী পাওয়াতেই ঐরূপ ঘটিয়াছে।

একবার যদি কামরূপ পাপ-পিশাচ কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মানব মনোমন্দিরে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেখানকার পবিত্র দেবমূর্ত্তিগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া নিজে সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে আসীন হয়—এবং তখন সে মানুষকে যাহা ইচ্ছা করাইতে বাধ্য করিতে পারে। তখন আর নিষিদ্ধ সম্বন্ধের বাদ-বিচার কিছু থাকে না—তখন সে ব্যক্তি নিজেকে ঐ পিশাচের কবলগ্রস্ত বুঝিতে পারিলেও তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করে মাত্র। উহার এমনই মোহন আকর্ষণ যে তাহাতে অভিভূত হইয়াই পড়িতে হয়। তখন মুখে শত শতবার "গোপা মা, গোপা মা" বলিয়া জপ করিলেও কোনও ফল দর্শে না; সে জপ মনের উপর কোন দাগই বসাইতে পারে না—মন 'গোপা'কে তখন অন্যভাবেই ভাবিয়া সুখ পায় এবং অন্য ভাবেই তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতে থাকে। এই জন্যই সেইরূপ

ভাবের অবসর যাহাতে মনে না আসিতে পারে, সকলেরই চিত্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মন মত্তমাতঙ্গ, তাহাকে সর্ব্বদা জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ আঘাতে সংযত রাখিয়া সুপথে পরিচালনা করাই সচ্চরিত্র ব্যক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত। নতুবা বিশ্বপ্রেম দেখাইতে গিয়া বিশ্বপ্রেমের পরিবর্ত্তে বিশ্বকামের সাধক হওয়া বা রিরংসার দাস হওয়া কখনও সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে। এযাবৎ কাল আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের পবিত্র নির্দ্দেশানুসারে আমাদের ঘরের লক্ষ্মীগণ আমাদের প্রাচীণ পুণ্যময় আদর্শ সকলের অনুধ্যান করিয়া কোন হীন কার্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না! নিজ পতি পুত্রাদির সেবাযত্ন করিলে লোকে দাসীও হয়না, মেথরাণিও হয়না,—যাহাদিগকে ভালবাসি তাহাদের জন্য কিছু না করিতে পারিলেই হৃদয় অস্বস্তি অনুভব করে, অশান্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা নবপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বজনের সেবা যত্ন করিতে পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করেন বলিতেছেন, তাঁহারা নিজ ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, শ্যালা, পুত্র, কন্যা বা আত্মীয় স্বজনগণের সেবা যত্ন করিলেই অধঃপতিত হইবেন কেন, সেইটাই আমরা বুঝিতে পারি না। "নন্দলাল" শুধু পুরুষের মধ্যেই নহে—রমণীগণের মধ্যেও দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে!

আমাদের মানসিক ভাব কেবল বিকৃত হইয়া পড়িতেছে এবং সেই ভাব লেখনী মুখে পুস্তক পত্রিকাদিতে প্রচারিত হইয়া সমাজের মধ্যে কিরূপ বিষবীজ বপন করিতেছে, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা সংক্ষেপে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। কোনও এক মাসিক পত্রিকাতে কিছু দিন পূর্ব্বে একজন লেখক একটি গল্প প্রকাশিত করেন। গল্পটার নামটি আমার ঠিক মনে নাই—'যাত্রা' কি ঐরূপ কিছু হইবে। উক্ত পত্রিকাখানি আমার নিকট এখন নাই, স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহার মোটামুটি ভাবটা লিখিতেছি:—

আত্মহত্যাকারিগণের মৃতদেহ দর্শন ও তদ্বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য একজনের অত্যন্ত ঔৎসুক্য ছিল। একদিন একজন পুলিশকর্ম্মচারীর নিকট তিনি একটি আত্মহত্যার বিবরণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একজন যুবক এবং একজন যুবতী পরস্পর নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পতিত আছে। অনুসন্ধানে জানা গেল ইহারা দুজনে একত্র লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত এবং উভয়ের মধ্যে এমন কোন সম্বন্ধ ছিল যাহার জন্য তাহাদের পরিণয়ে সামাজিক বাধা ছিল। সুতরাং উভয়ের বিবাহ অসম্ভব হয়। রমণীটি অন্যের সহিত পরিণীতা হয়। তারপর প্রণয়ীর, প্রণয়িণীর নিকট গোপন ভাবে আগমন ও "পবিত্র প্রেম"চর্চ্চা। এ সংসার এ পবিত্র প্রেমের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ নয়, সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে সামাজিক বাধা বিঘ্ন নাই, পবিত্র প্রণয়ের স্রোত অবাধ—যেখানে পবিত্র প্রেমের কদর আছে, সেই প্রদেশে যাওয়াই তাহারা স্থির করিল। এক পত্র লিখিয়া রাখিয়া উভয়ে একত্র বিষপান করিয়া মৃত্যুমুখে যাত্রা করিল আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া, যেন মরণও বিচ্ছেদ না ঘটাইতে পারে। পত্রখানিতে তাহাদের উক্তরূপ মর্ম্মজ্বালাই প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যে সমাজ তাহাদের এই পবিত্র প্রেমকে সামাজিক বাধাদ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, তাহাকে যথারীতি গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। আর ভগবানের চক্ষে তাহাদের এ প্রেম যে স্বর্গীয় ভাবেই আদৃত হইবে, তাহা [illegible] জোরের সহিতই বলা হইয়াছে।—গল্পটি পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে, লেখক মহাশয়ের সম্পূর্ণ সমবেদনা এই দুটি প্রাণীর সঙ্গে; সমাজ যেন তাহাদের মিলনে কৃত্রিম বাধা উঠাইয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছে এই ভাবটাই তাঁর লেখার ভাবে পরিস্ফুট।

এখন আপনারা সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এইরূপ লেখার বিষময় প্রভাব কতদূর যাইতে পারে—আর অপরিপক্কমতি কিশোর কিশোরীদের মনে ইহা কিরূপ ভাব আনিতে পারে?

এই গল্পটা যদি কোন ইংরাজি গল্পের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ হয়, তবে সেই ইংরাজি নামগুলি দিয়া দিলে উহা এত ঘৃণিত বোধ হইত না; কারণ তখন এটা আমা-

দের সমাজের কথা নহে ইহা সকলে বেশ বুঝিতে পারিত। পাশ্চাত্য সমাজে খুড়তুত বোন, পিসতুত বোন, মাসতুতো বোন প্রভৃতির সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে বাধা নাই, সুতরাং ইংরাজ বালক বালিকাগণ ছোট বেলা হইতেই জানে যে তাহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার আটক নাই। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উপযুক্ত সময়ে পরস্পরকে স্বীয় প্রণয়াস্পদ রূপে ভাবিতে পারে, এবং হয়ত দুই পক্ষে সমান অনুরাগ জন্মিলে বিবাহও হইয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের দেশে ও সমাজে ঐরূপ প্রথা নাই। গল্প লেখক উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা খুলিয়া বলেন নাই, তবে একই পরিবারে পালিত বর্দ্ধিত ইত্যাদির দ্বারা এবং সামাজিক এমন সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে ছিল যাহাতে বিবাহ বাধা পড়ে—ইত্যাদি হইতে অনুমিত হয় যে, ঐরূপ কোন নিষিদ্ধ ভাই-বোন সম্বন্ধই উভয়ের মধ্যে ছিল। অথচ উভয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ ভাবের অনুরাগ জন্মিয়া গেল। ছি! ছি! ছি! বাল্যকাল হইতেই নিষিদ্ধ সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহ বিধান নিষিদ্ধ এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিলে, যতই কেন প্রীতি স্নেহের বন্ধন উভয়ের মধ্যে হউক না, তাহা ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহই হইয়া থাকে; ঐরূপ প্রণয়ের বিকাশ উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে হয় না। আমার বোধ হয় আমাদের সমাজের ঐরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট যুবক যুবতী এবং নরনারী সকলেই এই একই সাক্ষ্য দিবেন যে, কখনও তাঁহাদের মনে ঐরূপ ভাব কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। যদি তাই সম্ভব হয়, তবে কবে বা শুনিব যে সহোদর সহোদরার মধ্যেও ঐরূপ প্রণয় জাগিয়া উঠিয়াছে—কারণ খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে যাহা সম্ভব, সহোদর সহোদরাদের মধ্যেই বা তাহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হইবে কেন? আমাদের হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারে সহোদরা ও খুড়তুতো, জেঠতুতো ভগিনীতে কোন প্রভেদ পার্থক্য নাই; একথা সকলেই জানেন। তাই আবার বলি—ছি! ছি! ছি!

তারপর, এরূপর প্রণয় যে পবিত্র বলিয়া ভগবানের পাঞ্জাসহি প্রাপ্ত তাহা কে কেমন করিয়া জানিলেন? ভগবানের সঙ্গে এবিষয়ে ত কাহারও প্রত্যক্ষভাবে কোন বোঝাপড়া হয় নাই! সমাজবাধা বলিয়া যাহা মানা যায়, তাহা যদি কৃত্রিমই হয়, তাহা হইলে তো সবই কৃত্রিম! স্ত্রী পুরুষ যে যাহাকে ইচ্ছা করে সেই তাহার সহিত মিলিতে পারে! সহোদর সহোদরার মিলনই যে ঈশ্বরের নিকট পবিত্র বলিয়া আদৃত নহে তাহাই বা কে বলিল? একজনের স্ত্রী যে অন্যভোগ্যা হইতে পারিবে না—তাহাতেও তো **ঈশ্বর প্রণীত** কোন শাস্ত্র দেখিনা! মাতাপুত্রের সম্বন্ধেরই বা মূল্য কি? —এসব আলোচনা করিতেও ঘৃণা হয়! তবু কি বলিতে হইবে, এইরূপ সব চিত্রে সমাজশরীরের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে না—সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকতা নাই? জানিনা কোন সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লেখক ঐ পাপ-চিত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং কি মহদুদ্দেশ্যে সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় উহা প্রকাশে অনুমোদন করিয়াছিলেন! মূর্খ, অজ্ঞান আমি, তার উপর বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপস্থিত—এ তথ্য নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত! আমি তো মনে করি যে এরূপ অতি ধিক্কার-জনক গল্প মাসিক পত্রিকার অঙ্কে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

আরও এক কথা—সেই রমণী যদি সেই নিষিদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়ের প্রতি এত পবিত্র প্রেমই পোষণ করিলেন, তাহা হইলে তিনি যে বিষপানটা, পরের পরিণীতা পত্নী হইবার পরে চুরী করিয়া নিজ নাগরের আলিঙ্গনের মধ্যে গিয়া করিলেন, সেটা তো অনায়াসেই বিবাহের পূর্ব্বেই করিয়া সব লেঠা চুকাইয়া ফেলিতে পারিতেন! তাহাতে তবু তাঁহার একনিষ্ঠতার একটা পরিচয়ও পাওয়া যাইত! কিন্তু সে সময় বেশ ভাল মানুষটির মত আর এক বেচারীর সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া লইতে এবং তাহার পর তাহার সহিত স্বামী স্ত্রী ভাবে বাস করিতে তাঁহার সে পবিত্র প্রেমের চক্ষে দ্বিচারিণীত্বটা কি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারিল না? তাহার সহিত ঐ সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া গোপনে প্রণয়া-

স্পদকে চোরের মত ঘরে ডাকিয়া আনিতে তাঁহার পবিত্র প্রেমের কোনখানে একটু খোঁচা বাধিল না কি? বলিহারি "পবিত্র" প্রেমের চিত্র!

তিনি যদি কুমারী অবস্থায় বিষপানও না করিতেন, বরং চিরকাল কুমারী থাকিবারই কল্পনা অটল অচল ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার একটা মর্য্যাদা থাকিত! তবে, সে সব করিলে তাঁর "নারীত্ব সফল" হয় কি করিয়া?"

এইরূপ গল্পের দ্বারা সাহিত্যের স্বাস্থ্য কতদূর কলুষিত হয়, আর তাহা সমাজে সংক্রমিত হইয়া তাহার পবিত্রতা কতদূর ক্ষুণ্ণ করে—তাহা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন। সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, এবং সাহিত্যিকের সমাজের নিকট দায়িত্ব কতখানি, তাহা আমি বহুবৎসর পূর্ব্বে "বীরভূমি" নামক মাসিক পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অদ্য প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বারান্তরে অবসরক্রমে তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা থাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার অন্তর্গত আরও নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। "নারীর অধিকার" প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমার কিছু নিবেদন করিবার সঙ্কল্প আছে। আর, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ এবিষয়ে যে সব আলোচনা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমি দুইচারি কথা বলিবার বাসনা করি। ভগবান যদি দিন দেন, আর এই প্রবন্ধে যদি বন্ধুগণের বিরক্তি ও তিরস্কারভাজন না হইয়া থাকি জানিতে পারি, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব। অদ্য এইখানেই নিবেদন ইতি।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মর্ম্মবাণী

রূপসী প্রেয়সী মোর!
প্রথম প্রেমের অতুল সে ঊষা
মনে কি আছে লো তোর?
নরম কপোলে সরম-মাধুরী,
চলন-ভঙ্গে ছলন, চাতুরী,
নধর অধরে সুধারস ভরা,
অধীরা পরাণ চোর!
সে কি অতুলন প্রভাত প্রথম,
রূপসী প্রেয়সী মোর!
সে দিন বালিকা বকুল তলায়
পরা'লে মালিকা আমার গলায়,
জ্বালা মাখা স্মৃতি মালা বকুলের,
বালা, সে তোমারি ডোর!
আজো সে রয়েছে বজ্রের মত
বেড়িয়া হৃদয় মোর।
পুলক সেদিন উদ্বেল ছিল
উদার হৃদয়ে তোর!

* * * *

হায়, হায়, স্মৃতি জ্বালা দেয় শুধু,
দেয়না ত আর কিছু সে!
বিষ চাই আজ, বিষ চাই ওগো,
যায় না এজ্বালা পীযূষে!
রাঙা সুস্বপন ভেঙেছে যে আজ
প্রণয় পরেছে কঙ্কাল সাজ,
ধূ ধূ করে হিয়া, একদিন যাহা
পুলকে ছিল বিভোর!
নির্ভর, সুখ, কোথা অতুলন,
অপরূপ, রূপ নিখিল-মোহন,
অকারণ খেলা, হাসি মধু-মেলা,
সকল-ই আজি উজোড়?
কি পিয়া বিপুল পিয়াসা মিটিল
রূপসী প্রেয়সী তোর?

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

মূক প্রণয়ী ও তাহার চিকিৎসক

(স্পেনীয় লেখক Matias de los Reyes হইতে)

স্যাভয়ের ডিউক-এর রাজধানী তুরিণ হইতে অনতিদূরে 'মণ্টকলার' দুর্গ-প্রাসাদে, ঐ দেশের একজন প্রধান নাইটের বিধবা পত্নী বাস করিতেন। তাঁহার নাম ফিনেয়া। তিনি তরুণী, রূপসী, ও গুণবতী; তাঁহার নির্জ্জন-প্রিয়তা ও মধুর ব্যবহার, তাঁহার রূপ-লাবণ্যের উপর একটা উজ্জ্বল প্রভা নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহার চাল-চলন এরূপ আড়ম্বরশূন্য ছিল যে, দেখিলে মনে হয়, সারা জীবন বুঝি তিনি প্রাসাদের পরিবর্ত্তে, একটা সামান্য গ্রাম্য-কুটীরে বাস করিয়া আসিয়াছেন। আর কখনও বিবাহ করিবেন না ইহাই তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র নির্জ্জন একটা পল্লী-ভবনে বাস করিতেন। একটি মাত্র ভৃত্যের সাহায্যে এইখানে সামান্য ঘর-কন্নার কাযেই নিযুক্ত থাকিতেন। কাহারও সহিত বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। কেবল পর্ব্ব উৎসবের দিনে গির্জ্জায় যাইতেন; এবং নিজের অবস্থা অপেক্ষা নীচু ধরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

সে দেশের একটা প্রথা আছে,—শান্তির সময় যদি কোন খ্যাতনামা বিদেশীয় ব্যক্তি ভ্রমণের জন্য আসেন, তাহা হইলে ঐ দেশের মহিলারা তাঁহাকে অতিথি বিবেচনায় বিশেষরূপ আপ্যায়ন যত্ন ও করিয়া থাকেন। কিন্তু ফিনেয়া এই প্রথাটা পালন করিতেন না। এবং সব সময়েই, "আমি একাকিনী বাস করি"—এই অছিলায় কাহাকেও আমন্ত্রণ করিতেন না।

কিন্তু এই সময় মণ্টকলারের নাইট এইখানে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার নাম লেলিও। তিনি দুর্ব্বলের সহায়, একজন প্রখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন; এখানে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে আসিয়াছিলেন। নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া, গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে, 'মাস' উপাসনার মন্ত্র পাঠ শুনিতে তিনি গির্জ্জায় গেলেন। এই গির্জ্জায় ফিনেয়াও প্রায় যাইতেন। তিনি ফিনেয়াকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন—তৎপূর্ব্বেই এই মহিলার বিদ্যা-বুদ্ধি ও কলানৈপুণ্যের খ্যাতি তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি "ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া" তাহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন। সুতরাং সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, যেমন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে তাঁর প্রেমানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তুরিণে গিয়া, সরকারী কাযকর্ম্ম সমাধা করিয়া, ফিনেয়ার হৃদয়-জয়ের উদ্দেশ্যে মণ্টকলারে ফিরিয়া আসিলেন। আশপাশের অন্ধি-সন্ধি নিরূপণ করিতে কিছুদিন কাটাইলেন; কিন্তু তাঁহার বাঞ্ছিতা নিজ নিয়মানুসারে কেবল গির্জ্জায় যাইবার সময়েই বাড়ী হইতে বাহির হইতেন। যদি কখনও নাইট্ মহাশয় তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি তখনই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া এইরূপ কথোপকথনে নিজের অসম্মতি জানাইয়া দিতেন। রমণীর এই আচরণ লেলিওর অসহ্য হইয়া উঠিল; কিন্তু ফিনেয়া যতই তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতে লাগিলেন, ততই তাঁর প্রেমানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রেমিকের সর্ব্বপ্রকার কৌশলই তিনি খাটাইয়া দেখিলেন। তাঁহার আশা যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাঁহার চেষ্টার প্রাবল্যও ততই বাড়িতে লাগিল। ফিনেয়া যতই তাঁহাকে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল, ততই তিনি তাহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন; ততই তিনি আরও আগ্রহের সহিত তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই বিধবার দৃঢ়তা ও কঠোরতার সম্মুখে কি উপহার, কি আদর-যত্ন, কি ধৈর্য্য—সমস্তই বিফল হইল।

হতভাগ্য প্রেমিক কার্য্য সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না; তথাপি তাঁহার সঙ্কল্পের একটুও পরিবর্ত্তন হইল না। তাঁর ক্ষুধা চলিয়া গেল, চোখে নিদ্রা নাই, —শীঘ্রই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকেরা রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইয়া, কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না—ঐরূপে আস্তে আস্তে তিনি মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার এইরূপ অবস্থা, তাঁহার এক বন্ধু এস্পোলেটোর নাইট্, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লেলিও বন্ধুর নিকট তাঁহার প্রেমের বিবরণ ও তাঁর রোগের কারণ সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রেয়সীর নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার কথা একটু বেশী করিয়াই বলিলেন। আরও বলিলেন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইবে।

এস্পোলেটোর নাইট্ তাঁহার বন্ধুর পীড়ার কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে সস্নেহভাবে বলিলেন, "লেলিও, তোমার এই প্রেমের ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। কোন ভয় নেই, আমি এই মহিলাকে কোন রকমে বাগিয়ে আন্‌তে পারব।"

লেলিও উত্তর করিলেন, "আর কিছু আমি চাই নে; তুমি তাকে কেবল বল্‌বে, তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের দরুণ আমার কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। আমার মনে হয়, যদি সে একথা জান্‌তে পারে তাহলে সে আর ওরকম ধনুকভাঙ্গা পণ করবে না, আমার ভালবাসার প্রস্তাব এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু বল দেখি, তুমি কাযটা কি ক'রে আরম্ভ করবে? কেবলমাত্র একঘণ্টা কালের দর্শনের জন্যে, তাকে আমি কত কাকুতি মিনতি করেছি, কত রকম ফিকির ফন্দি করেছি—তবুও সফল হতে পারি নি।"

বন্ধু বলিলেন, "তুমি শুধু তোমার আরোগ্যের জন্য চেষ্টা কর; আর বাকী সমস্ত কায আমাকে করতে দাও।"

লেলিও, তাহার বন্ধুর আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট হইল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই রোগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে পারিল। তাহার চিকিৎসকেরা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। এস্পোলেটো-বাসীরা খুব বচনপটু, ও সুরসিক। উহারা অন্যকে নিজের মতে আনিতে খুব দক্ষ। তা ছাড়া যে সব জিনিস নারীর খুব পছন্দসই, নারীর কৌতূহল জাগিয়া উঠে, উহারা সেই সব জিনিসের ব্যবসা করে। নাইট মনে করিলেন, এইরূপ একটা সামগ্রীর দ্বারা নিজের মৎলব হাঁসিল করিবেন। তাই তিনি একটা ঝুড়ী কিনিয়া, তাহা নানাবিধ সামগ্রীতে পূর্ণ করিলেন এবং পথ-চলতি বুড়া ফেরিওয়ালা সাজিয়া সেই বিধবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিনেয়ার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌছিয়া, সেই জিনিষ গুলার কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

ফিনেয়া, এই হাঁকডাক শুনিয়া, নিজেই দ্বারদেশে আসিল, এবং হস্ত ইঙ্গিতে ফেরি-ওয়ালাকে ডাকিল। ফেরি-ওয়ালা এই আহ্বানে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, স্বকীয় ছদ্ম-বার্দ্ধক্যের সুযোগ লইয়া খুব সহজ ভাবে ও বাচালতা সহকারে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। ফিনেয়া ঝুড়ীর ভিতর হাত দিয়া জিনিস গুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং বিভিন্ন সামগ্রীর নির্ব্বাচনে বেশ একটু সুরুচি প্রদর্শন করিয়া, একখানা বহুমূল্য সুন্দর কাপড়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"আমার যদি সাধ্য হত আমি সমস্তই খরিদ করতাম।"

ফেরি-ওয়ালা বলিল, "ঠাকরুণ, সমস্তই আপনি নিন্‌-না; দাম জিজ্ঞাসা করবেন না—এ সমস্তই আপনার নিজস্ব বলে মনে করুন। আপনার পছন্দ হয়েছে—এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

ফিনেয়া বলিল, "ওমা! সে কি কথা? এমন কোন জিনিস আমি চাই নে, যার আমি দাম দিতে পারব না। আমার মত স্ত্রীলোক বিনামূল্যে কোন জিনিস নিতে পারে না। যাই হোক, এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কাপড়খানির দাম কত, আমাকে বল। তোমার জিনিস বিনা মূল্যে নেব, এ হতেই পারে না।"

ফেরি-ওয়ালা উত্তর করিল, "আপনার মুখখানি যেমন সুন্দর, আপনার হৃদয়খানিও তেমনি উদার। আমি

আপনাকে যা দিচ্ছি, আপনার সৌন্দর্য্যের সম্মুখে সেটা আমার ভক্তি অঞ্জলি স্বরূপ মনে করবেন।"

এই কথা শুনিয়া, বৈশাখ-সূর্য্যরশ্মিতে প্রথম উদ্‌ঘাটিত গোলাপ-কুঁড়ির মত ফিনেয়ার গাল লাল হইয়া উঠিল। তথাকথিত দ্রব্য-বিক্রেতার আপাদ মস্তক মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি যে ধরণে আমার সঙ্গে কথা বলচ, তাতে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। বল দেখি তোমার মৎলবটা কি? আমার মনে হয়, যার কাছে তোমাকে পাঠান হয়েছে, তার কাছে না এসে, তুমি ভুলক্রমে অন্য লোকের কাছে এসেছ।"

তখন, মুখের ভাবে কোন বদল না করিয়া, নীচের দিকে চোখ নত করিয়া, ফেরিওয়ালা বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল। বলিতে লাগিল, তাঁর অবজ্ঞার দরুন লেলিও কত কষ্ট পাইয়াছে, তাঁর প্রতি লেলিওর কি জ্বলন্ত অনুরাগ, লেলিও কত গুণবান পুরুষ কি ধন ঐশ্বর্য্য, কি সাহস বিক্রম, কি সৌজন্য, কি প্রিয়ভাষিতা—সমস্ত বিষয়েই সে কত উচ্চ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে, সে এতটা সফল হইল যে, ফিনেয়া কোন এক সঙ্কেত স্থানে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার প্রণয়াতুরকে দেখা দিবে প্রতিশ্রুত হইল।

লেলিও, তাহার বন্ধুর পরিশ্রমে প্রীত হইল, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানের অভিমুখে তাড়াতাড়ি যাত্রা করিল। ফিনেয়া তাহার ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া, লেলিওকে নিজ বাড়ীর পিছনের নিম্ন মহলের একটা কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষখানি খুব প্রশস্ত—উহার শেষ প্রান্তে ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিল। ঘরটা এত প্রশস্ত যে তাহাদের কথাবার্ত্তা সেখান হইতে ভৃত্যের শুনিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। লেলিও প্রেমার্দ্র নয়নে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিল, তার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে সমস্ত বলিল। শেষে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার দয়া ভিক্ষা করিল। বলিল—"যদি তুমি আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর তবে আমি তোমার চিরদাস হয়ে থাকব।"

রমণী উত্তর করিল, "আমি একজন বিধবা, প্রেমের কথা আমার মনে আর স্থান পায় না। আমি এখন ধর্ম্মের সেবাতেই নিযুক্ত। এমন কত সুন্দরী মহিলা ত আছে যারা এই সব নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়।"

অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর লেলিও যখন দেখিল তার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে, তখন সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আমার যখন আর কোন আশা নেই, আমার উপর যখন তোমার একটুও দয়া হল না, তখন, যে দেশ আমাদের দুজনেরই দেশ, সেই দেশের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে শান্তি দাও—তোমার পদতলেই আমি জীবন বিসর্জ্জন করব।"

ফিনেয়া একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "আমার উপর তোমার ভালবাসা সত্যই খুব বেশী কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমার একটা অনুরোধ যদি তুমি ধর্ম্মতঃ রক্ষা কর, তাহলে তার প্রতিদান স্বরূপ আমার ভালবাসা পাবে।"

মোহাচ্ছন্ন নাইট, না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি শপথ করছি তোমার অনুরোধ আমি ধর্ম্মতঃ নিশ্চয়ই পালন করব, বল তোমার কি অনুরোধ।"

রমণী বলিল, "আমার অনুরোধ এই—এখন থেকে তিন বৎসরকাল, তুমি কোন মানুষের সঙ্গে কথা কবে না—সে পুরুষই হোক, স্ত্রীলোকই হোক। এই তিন বৎসর তোমায় বোবার মত থাক্‌তে হবে!"

প্রেয়সীর নিদারুণ অনুরোধ শুনিয়া লেলিও একেবারে বজ্রাহত হইয়া পড়িল। এ যে পাগলের মত অনুরোধ। এ যে নেহাৎ পাগলামি! এই অনুরোধ পালন করা যে অসম্ভব। কিন্তু গুরু গম্ভীর শপথের পর, এই অঙ্গীকার পালন ভিন্ন উপায় নাই। নিজ মুখের উপর হাত রাখিয়া লেলিও হস্তের ইঙ্গিতে ফিনেয়াকে তার সঙ্কল্প নীরবে জানাইয়া দিয়া, নীরবে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

লেলিও গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে হঠাৎ বোবা হইয়াছে বলিয়া ভাণ করিল। যাহারা তাহাকে জানিত, সকলেই এই দুর্ঘটনার জন্য তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতে লাগিল। লেলিও নটকলায়

হইতে তুরিনে গেল, সেখানেও বাক্‌শক্তি লোপের ভাণ করিতে লাগিল। তাহার পর সে ফেরারায় যাত্রা করিল; যুবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া তাহার খ্যাতি সেখানকার ডিউকের দরবারে আগেই পৌছিয়াছিল।

ডিউক দরবারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। লেলিওর বীরপুরুষোচিত চালচলন সভাসদ্‌গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। শীঘ্র একটা সুযোগও উপস্থিত হইল। একটা যুদ্ধে তিনি বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া ডিউকের সাহায্য করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে ডিউক এই উপকারের জন্য লেলিওকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। কিন্তু তার মূকতায় ডিউক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং যাহাতে আরোগ্য লাভ হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইটালিময় ঘোষণা করিয়া দিলেন—যে কেহ এই মূক নাইটের জন্য ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহাকে তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন। যদি তাহার ঔষধে আরোগ্য লাভ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে; ঐ টাকা না দিতে পারিলে সে কারাবদ্ধ হইবে।

অসংখ্য চিকিৎসক তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির সমস্ত সম্বল নিঃশেষ করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইল এবং কারাগারে বদ্ধ হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অবশেষে ফিনেয়া, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে মনে মনে স্থির করিয়া, রাজদরবারে আসিয়া জানাইল সে নাইটের মূকতা সারাইয়া দিতে পারিবে। বড় বড় বিদ্বানেরা যাহা পারে নাই, একজন সামান্য স্ত্রীলোকে তাহা করিতে পারিবে, রাজসভাসদেরা এই কথা নিতান্ত হাস্যজনক মনে করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ রমণীর নিপুণতার পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুকও হইলেন—এবং তাহাকে লেলিওর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। লেলিওর ঘরটি প্রাসাদের একটা নিভৃত অংশে অবস্থিত ছিল।

ফিনেয়া, লেলিওর নিকট যেরূপ সাগ্রহ আদর ও অভ্যর্থনা পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহা ঘটিল না। লেলিও প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল, সে ফিনেয়ার সমস্ত প্রণয় সম্ভাষণ উপেক্ষা করিল; মনে করিল ফিনেয়া অর্থলুব্ধ হইয়াই এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে তাহাকে কতটা ভাল বাসিয়াছিল, এবং তার নিষ্ঠুর আচরণে কতনা কষ্ট পাইয়াছে সে সব কথাও তার মনে জাগিতেছিল।

এইরূপ চিন্তার দ্বারা লেলিও নিজ জলন্ত প্রেমকে একটু প্রশমিত করিয়া, ফিনেয়ার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইবে, এবং তাহাকেও একটু কষ্ট দিবে বলিয়া স্থির করিল। ফিনেয়া তাহাকে মিষ্ট ভাষায় অভিবাদন করিয়া তাহাকে নিজ মনোগত অভিপ্রায় জানাইল—কিন্তু প্রত্যাশার অনুরূপ উত্তর না পাইয়া বলিল, "লেলিও, তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না? আমি তোমার সেই প্রেয়সী ফিনেয়া, কিছুকাল পূর্ব্বে যার প্রতি তুমি কত ভালবাসা জানিয়েছিলে।"

লেলিও ইসারা ইঙ্গিতে তাকে উত্তর দিল, "আমি তোমাকে খুবই চিনি" এবং নিজের জিহ্বা স্পর্শ করিয়া ও মাথা নাড়িয়া তাহাকে জানাইল যে তাহার বাক্‌শক্তি নাই।

ফিনেয়া একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিল, "তোমার প্রতিজ্ঞা থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিচ্ছি; তোমার নীরব থাকিবার মেয়াদ পূর্ণ হতে এখনও ছ'মাস বাকী থাকলেও আমি নিজের অঙ্গীকার পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ অক্ষুণ্ণ আছে।"

এই সব কথার কোন উত্তর না দিয়া লেলিও শুধু তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিল, ও দুঃখের একটা ভাব মুখে প্রকাশ করিল।

লেলিওর প্রতিজ্ঞা অটল দেখিয়া ফিনেয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যে অলৌকিক কাণ্ড করিবে বলিয়া এত বড়াই করিয়াছিল—সেই অলৌকিক কাণ্ড কি অশ্রুপাত, কি অঙ্গীকার, কি অনুনয়-বিনয়—কিছুতেই ঘটাইতে পারিল না। অবশেষে তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিল। রাজ দরবারে তাহার অর্থ দণ্ড হইল—এবং অর্থদণ্ডের টাকা দিতে না পারায়, অন্য লোকেদের ন্যায় সেও কারাগারে আবদ্ধ হইল।

এই ঘটনার পর, প্রতিশোধটা বেশ ভাল রকমই লওয়া হইয়াছে মনে করিয়া, লেলিও ডিউকের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং যে জিহ্বা এতদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, সেই জিহ্বাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া,—কেন সে এতদিন নীরব ছিল, তার সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। তারপর ডিউকের নিকট অনুনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল,—যে সকল লোক তাহার জন্য অন্যায়পূর্ব্বক কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে যেন এখনই মুক্তি দেওয়া হয়। ফিনেয়াকেও ডাকিয়া পাঠানো হইল। সমস্ত দরবারের সম্মুখে লেলিও তাহাকে এইরূপ বলিল,—

"তুমি ত বেশ জানো ফিনেয়া, কত আশা করে' আমি তোমার আরাধনা করেছিলুম। তার প্রতিদানের আমি সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলাম না কি? আমার পরিশ্রমের পুরস্কার আমি কি পেয়েছি তাও তুমি জান—একটা গুরুগম্ভীর শপথের দ্বারা তিন বৎসর কাল নীরব থাকতে তুমি আমাকে বাধ্য করলে। এই দণ্ডাজ্ঞা আমি এতদিন অবিরাম পালন করে এসেছি। এখন তুমি যে দণ্ড ভোগ করছ, তোমার নিষ্ঠুরতার দরুণ তার চেয়ে বেশী দণ্ড তোমার প্রাপ্য হলেও, আমি তোমার হয়ে ডিউক বাহাদুরের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে বলছি; আমার আরোগ্যের জন্য যে পুরস্কার অঙ্গীকৃত হয়েছিল সেই পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। মহামহিম ডিউক বাহাদুরের নিকট আমি অনুনয় করছি যেন ঐ পুরস্কারের টাকা যৌতুকস্বরূপ তোমাকে দেওয়া হয় এবং তিনি যেন তোমার পাণিগ্রহণ করতে আমাকে অনুমতি দেন। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি আর একটু সাবধান হবে, আর একটু সহজ-বশ্য হবে।"

ডিউক ও তাঁর সভাসদবর্গ সকলেই লেলিওর সম্ভাষণের প্রশংসা করিলেন। ডিউক বাহাদুর ফিনেয়াকে এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম করিলেন। বলিলেন, লেলিওর আরোগ্য-সাধন ফিনেয়া দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। নাইটেরও পদোন্নতি হইল; লেলিও ডিউকের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠিলেন। খুব ঘটা করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। ডিউক. নাইটকে তাঁহার রাজধানী ফেরারায় বাসস্থাপন করিতে সম্মত করাইলেন। লেলিও ফিনেয়ার সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি

কি পুরুষের পক্ষে কি স্ত্রীলোকের পক্ষে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া সাময়িক পত্রাদিতে আলোচনা চলিতেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে বর্ত্তমান শিক্ষার অনেক দোষ। বর্ত্তমানের শিক্ষা আমাদিগকে অলস, বিলাসী, অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা, স্ত্রীলোকের মূর্খতাই ইহার প্রধান কারণ। শিশু যখন জন্মে, তখন তার চিত্তবৃত্তি কোমল ও পবিত্র—ঠিক যেন, একটি কুসুম কলিকা। ফুল বাতাসের সাহায্যে শিশিরের সাহায্যে বিকাশ লাভ করিয়া আপনার সৌরভ রাশি সেই বাতাসেই বিতরণ করে। মানব শিশুর চিত্তও তার গৃহের চালচলনের সাহায্য লাভ করিয়া বিকশিত হইতে থাকে, এবং বেশীর ভাগ চিত্তের গঠন তার গৃহের অনুরূপই হইতে থাকে। মানব শিশুর চিত্ত মানবের ভাব ভাষা লইয়াই গঠিত হয়। ইংরাজ শিশু ইংরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলা বলে না, এবং বাঙ্গালী আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় না। কিন্তু সে যদি ইংরাজ গৃহে থাকিয়াও দিবসের অধিকাংশ সময়ই বাঙ্গালা

শুনে তাহা হইলে সে বাঙ্গালা ভাষাতেই অভ্যস্ত হয়। ইহা হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাহা দেখে যাহা শুনে তাহার দ্বারাই তাহার মস্তিষ্ক ও চিত্তবৃত্তি গঠিত হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া সে তাহার মাতার চালচলন অনুকরণ সব চেয়ে বেশী করে এবং বাটীর ভিতরে তাহার যে প্রিয় তাহারও অনুকরণ করিতে থাকে। শিশু মাত্রেই অনুকরণ করিতে ভালবাসে। অন্ততঃ ভালবাসার বস্তুর প্রভাব মানুষের উপর আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তাহাকে ঠেকানো যায় না ইহা সর্ব্বজন বিদিত সত্য। শিশু অধিকাংশ সময় থাকে তার মাতার নিকট ও বাটীস্থ স্ত্রীলোকগণের নিকট। অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাংলার শিশু নিবিড় ভাবেই মাকে ও বাটীর স্ত্রীলোকগণকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং এই সময়েই শিশু-চিত্ত শিশু-মস্তিষ্ক বেশী গঠন লাভ করে। এই সময়ে সে মার নিকট, বাটীর অপর স্ত্রীলোকের নিকট যাহা পায়,তাহাতেই তাহার হৃদয় মন মস্তিষ্ক কতকটা পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে।

শক্ত মাটীতে একটা কিছু গড়িতে অনেক প্রয়াস পাইতে হয়। অনেক জল ঢালিয়া অনেক ছানিয়া তবে তাহা দ্বারা কুমার কিছু গড়িতে পারে। কিন্তু নরম মাটীতে—একেবারে কাদাতে নয়,—একটা কিছু অনায়াসে গড়িতে পারা যায়। শিশুর চিত্ত ও মস্তিষ্কও তদ্রূপ গঠন করা সহজ কার্য্য। মাতা শিশুর কচি মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে যে ভাবের প্রেরণা করিবেন, তাহাই তাহার চিত্তে ও মস্তিষ্কে থাকিয়া যাইবে, এবং সে চক্ষে যাহা দেখিবে তাহাও তাহার মস্তকে ঢুকিয়া থাকিবে ও সময়ের প্রভাবে পুষ্টিলাভ করিবে। সকলেই জানেন আমাদের বাংলায় যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই জননী বিবিধ সদ্‌গুণশালিনী ও উন্নতমনা। আমি দেখিয়াছি, ইংরাজ রমণী শিশুর বাক্যস্ফুর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে তাহার আচার ব্যবহার ধর্ম্ম সভ্যতা ভদ্রতা বুঝাইতে আরম্ভ করেন। শিশুও মার আদেশানুযায়ী পথে চলিয়া ক্রমেই নিজের সভ্যতা ভদ্রতায় অভ্যস্ত হইয়া ওঠে। কাযেই বাংলা দেশে জন্মিয়াও ইংরাজ শিশু ইংরাজেরই অনুরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে বাংলার কিছু থাকে না। সেই স্থলে বাংলার শিশু শাসনহীন উপদেশহীন হইয়া বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। তার পর, ইংরাজ শিশু মাসখানেকের হইতেই তাহাকে স্বাধীন মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় উন্মুক্ত মাঠ, উদার আকাশ, খোলা পথ ঘাট তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এবং ইহাতে তাহার হৃদয় স্বাধীন ও উন্মুক্ত হইয়া উঠিতে থাকে। তার পর, শিশু পাঁচ বৎসরের হইলেই তাহাকে ঘোড়া চড়া অভ্যাস করানো হয়। ইহাতে তাহার হৃদয়ে সাহস ও বীর ভাবের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ইংরাজ শিশু সকল দিক হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সাহসী নির্ভীক ও স্বাধীনচিত্ত হইয়া বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। তা ছাড়া তাহার জননী সহস্র রকম বীরের কাহিনী শুনাইয়া শিশুচিত্তে বীর রসের সৃষ্টি করেন; নিজের জাতির মহত্ব শুনাইয়া তাহার হৃদয়কে গৌরবগর্ব্বে স্ফীত করেন। এইভাবে তাহার হৃদয়কে শিশু কাল হইতে এমনভাবে গঠিত করেন যে, সে সময়ক্রমে এমন একটা হৃদয় লাভ করে যাহাতে প্রয়োজন হইলে সে দেশের জন্য জাতির জন্য মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতে দ্বিধা বোধ করে না বা যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা স্মরণ করিয়া ভীত হয় না, বা বাঙ্গালী সন্তানের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মত কোনও দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ করে না।

তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে ইংরাজ শিশুর শিক্ষা, শিশু মাস-খানেকের হইতেই আরম্ভ হয় এবং এই সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা তাহার মাতাই দিয়া থাকেন। এই হিসাবে আমাদের বাংলার শিশু জন্মিয়া কি করে? সে অন্ততঃ ছয় মাস গৃহকোণে বদ্ধ থাকে। বাংলার মা তাহাকে ভূতের ভয়ে বাতাসের ভয়ে ঘরের বাহির করেন না। ইহাতে শিশুর চিত্তে ভীরুতার সৃষ্টি হয় এবং তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতে থাকে। তাহার পর সে মাতার নিকট হইতে কোন মহৎ বাক্য মহৎ জীবনী ত শুনিতে পায়ই না, বরঞ্চ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া অনেক আব্দার হইতে বিরত করা হয় এবং ঘুমের সময় ঘুমাইতে না চাহিলে ভূত রাক্ষসাদির ভয়ে কাতর করিয়া ঘুম পাড়ান হয়। এইভাবে তাহার শিশু-

চিত্তে দুর্ব্বলতার সৃষ্টি হইতে থাকে। বাঙ্গালা ঘরের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই কলহ আছে, তাহার কারণ একে অন্যের সহিত বনিয়ে চলিতে জানেন না এবং এক আদর্শে গঠিত না হওয়ার দরুণ একের মতের সঙ্গে অপরের মতের সামঞ্জস্য থাকে না; এবং মুর্খতার দোষে শিক্ষার অভাবে মনের ক্ষুদ্রতার জন্যও কলহের সৃষ্টি হয়। অনেকেই জানেন, বর্ত্তমানের অনেক মেয়েদের আত্মহত্যার কারণ শ্বাশুড়ী। অথচ এই সমস্ত বুড়ির দল ত সেকালের লোক—বর্ত্তমানের শিক্ষার তাঁরা কোন ধারই ধারে না। কিন্তু শিক্ষার গভীরতা থাকিলে তাঁহাদের মনে এত ক্ষুদ্রতা আসিত কি? বাঙ্গালার শিশু, মাতার নিকট হইতে হৃদয় গঠিত হইবার কোন শ্রেষ্ঠ উপাদান ত পায়ই না বরং সে প্রায়ই কলহ শুনিয়া থাকে এবং কলহের কটু বাক্য শ্রুতিকালীন উদ্দীপনাপূর্ণ হিংসা দ্বেষ জড়িত বাক্যাবলী, অশ্লীল হাব ভাব শিশু চিত্তে হিংসা দ্বেষ ও কলুষের সৃষ্টি করিতে থাকে; এবং সে বড় হইতে না হইতে সংসারের মন্দের ভাগটা ষোল আনা বুঝিয়া লইবার অবসর পায়। বাংলার জননী তার শিশুকে কোনও মহৎ কাহিনী শুনাইতে বা উদারতা শিক্ষা দিতে জানেন না, বা যে ভাবে শিশু চিত্তকে গঠিত করিতে হয় তাহার কিছুই জানেন না। কারণ তিনি নিজেই জাতীয় মহত্ত্ব, দেশের গৌরব কোন কিছুই অবগত নহেন। যদি বা কেহ কিছু জানিয়া শিক্ষা দিতে যান, যে ভাবে কথা কহিলে যে সুরে কথা কহিলে শিশুর মর্ম্মস্পর্শী হইবে সে ভাবে সে সুরে কহিতে জানে না। তাহা জানিতে হইলে কিছু অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশের ধারণা স্ত্রীলোক হিসাব লিখিতে শিখিলে চিঠি লিখিতে শিখিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু অত সামান্য শিক্ষায় তেমন বাক্য তেমন সুর কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারে না বা হৃদয় গঠিত করিবার ক্ষমতা সৃষ্টি হইতে পারে না। বাংলার শিশু যখন দেশের বীরের কাহিনী বা মহৎ জীবনী শুনিতে পায়, তখন সে একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। এবং সে সময় তার চিত্ত ও মস্তিষ্কের প্রায় চৌদ্দ আনা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালার শিশু মন্দের ভিতর হইতে ফুটিয়া মন্দের সাহায্যে গঠিত হইয়া বড় হইতে থাকে এবং তাহার ভিতরকার সেই সব মন্দ গুণ লুক্কায়িত অবস্থা হইতে সময় ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে, এবং সে তখন সেই মন্দগুলি সমাজের বুকে ছড়াইতে থাকে। আপনারা অনেকে রবি বাবুর এই কবিতাটী পড়িয়া থাকিবেন—

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রি!
চরণ পদ্মে নমস্কার
ফিরে লও তব লক্ষ মুদ্রা
ফিরে লও তব পুরস্কার!

ঋষিকে ভুলাইতে যে নর্ত্তকীর দল বনে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এই উক্তি করিতেছে। ঋষির চিত্তে তাহারা মন্দভাব জাগাইতে পারে নাই। ঋষি তাহাদিগকে দেবতার নূতন সৃষ্টি বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। এই ঋষি জন্মে স্ত্রীলোক দেখেন নাই, কানন কান্তারে মানুষ হইয়া তিনি মন্দের কিছুই জানেন না—একটী বয়স্ক শিশুই আছেন। কিন্তু তিনি যদি মন্দের কিছু জানিতেন শুনিতেন, তাহা হইলে হয়ত এ চেষ্টায় তাঁহার চিত্তে মন্দ ভাবের সৃষ্টি হইত এবং তিনি বাহিরে পতিত না হউন্ অন্তরে পতিত হইতেন। আমাদের ভারতে এমন ঋষির দৃষ্টান্তও অনেক আছে যাঁহারা ভালমন্দের ভিতরকার মানুষ, আর তাঁদের ভিতরে অনেকের পতনও ঘটে। কিন্তু যাঁহারা কানন কান্তারবাসী ঋষি তাঁদের পতন ঘটিয়াছে এমন খুব কম শুনা যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় মানুষ অবস্থা ভেদে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত হয়, এবং স্থান কাল পাত্র মানবকে গঠিত করে, এবং সময়ানুযায়ী তদ্রূপ ফল প্রসব করে।

সেকালে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা যথেষ্ট হইত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আদর ছিল উদার-চিত্তবৃত্তির, মনুষ্যত্বের। সে কালের লোক চরিত্রবানও ছিল বেশী। এ কালেও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা কম হয় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা ও মনুষ্যত্বের আদর হয় কম। এ জন্য এ কালের লোকেরা পূর্ব্ব কালের লোকাপেক্ষা মনুষ্যত্ব হিসাবে অনেক হীন। বর্ত্তমান শিক্ষার ত্রুটী বা দোষ এইখানেই সব চেয়ে বেশী। আর আমাদের বাঙ্গালী যে দুর্ব্বলচিত্ত, অলস, অকর্ম্মণ্য, বিলাসী হইয়া উঠিতেছে, তাহার মূল কারণ তাহাদের শিশু জীবনে হৃদয় গঠিত হইবার শ্রেষ্ঠ উপাদান না পাওয়া। সকলেই জানেন, বোধ-

শক্তি রসের সৃষ্টি করে। বাঙ্গালীর শিশুরা দশ এগারো না পার হতেই মন্দের প্রায় ষোল আনা বুঝিয়া লয়। কারণ তাহাদের বোধ শক্তির তখন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং শুনিবারও কিছু বাকি নাই। মাটীতে যে জাতীর বীজটী পড়ে সে যে তদ্রূপ ফল প্রসব করিবে এ ত স্বাভাবিক। তা ছাড়া গর্ভাবস্থায় মাতার মনোভাব শিশু হৃদয়ে কার্য্য করে। এ কথা আমাদের বাংলার কয়টী রমণী জানেন? আর ক'জনেই বা সেজন্য সৎ-চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখেন? মোটের উপর, আমাদের বাঙ্গালী রমণী শিশুর অন্তর বাহির গঠন করিতে জানেন না। তা ছাড়া আমাদের বাংলার সমাজের আর একটী অকল্যাণকর প্রথা, বাল্যবিবাহ। এই বাল্য বিবাহের মূলে আছে বিলাসিতা, আত্মসুখপ্রিয়তা। ইহা ত বিলাত হইতে আসে নাই, ইহা আমাদের বাঙ্গালীর মজ্জাগত। ইহারই দোষে অকাল মাতৃত্বের অধিকাংশ রুগ্ন সন্তানই বাংলার সমাজ পুষ্টি করিতেছে। এই সমস্ত সহস্র কারণে বাংলার কি হিন্দু কি মুসলমান দুর্ব্বলচিত্ত রুগ্ন, সঙ্কীর্ণমনা, হীনমস্তিষ্ক। মানুষের মত মানুষ তাই বাংলা দেশে অতি অল্প জন্মে। বাংলা দেশের মঙ্গল চাহিতে হইলে সমাজ শক্তিকে দৃঢ় করিতে হইবে ও বাংলার নারী সমাজকে সংস্কার করিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় বরণীয় করিতে হইবে। তাহা না হইলে বাঙ্গালীর হারানো শক্তি ফিরিয়া আসিবে না। এ কথা প্রত্যেক বাঙ্গালীর জানা উচিত, নারী পৃথিবীর অর্দ্ধেক।

মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা।

শুকতারা

(চিত্র)

১

বিবাহ বাটী,—অন্তঃপুর।

(অন্তঃপুরিকারা কথোপকথনে ব্যস্ত)

"তা, বর মন্দ কি দিদি? একরকম ভালই বল্‌তে হয়।"

"রংটা একেবারে কালো।"

"তা কালো হোক্, ভাই, মুখের গড়ন বেশ।"

"দেখিস্ ভাই সাবধান, ঠাকুরজামাই অনেকদিন বাড়ীছাড়া—"

"মরণ, কথার ছিরি দেখ একবার!"

"তা যাহোক্ বয়স একটু হয়েছে।"

"তা আর বল্‌তে!"

"কত হবে বল দিকি? চল্লিশ?"

"চল্লিশ আর কোন্ লজ্জায় না হবে!"

"চেহারাটা একেবারে চোয়াড় চোয়াড়।"

"মেয়েই বা তোমার কি ননীর পুতুল বাপু যে, চেহারার অত ব্যাখ্‌খানা করছ?"

"আর কচি খুকিটিও নয়।"

"মিথ্যে নয়, বিয়ে হ'লে এত দিন তিন ছেলের মা হ'ত। ধেড়ে মাগীর সঙ্গে কি আর ছেলে ছোকরা সাজে!"

"মাগীর কিন্তু বরাত জোর বল্‌তে হবে। নিখরচায় তো এত বছর কাটালে; আর মেয়ের বিয়ে, তাও দিব্যি পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গলে!"

"কিন্তু সে কথাটি মুখ দিয়ে সে একবার উচ্চারণ করবে! তা হবার যো নেই। মুখে যেন সবক্ষণই আমড়া দিয়ে আছেন! মরণ আর কি!"

"টের পেতেন এই মেয়ের বিয়ে নিয়ে—যদি অন্য কোথাও থাক্‌তেন! মাগীর রকম দেখিচিস্ ভাই—তোর মেয়ের বিয়ে—মেয়েকে দেখ্‌বি শুন্‌বি, সাজাবি গোজাবি;

তা নয় বাইরে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন দেখাচ্ছেন কত কাযই কচ্চেন, একটু অবসর নেই যে, মেয়ের কাছে একটিবার বসেন।"

"তোমাদের কি বাছা পরের কুচ্ছো করা ছাড়া আর হাতে কায নেই? ও বেচারি নিজের দুঃখে নিজে মরে আছে। সকাল থেকে ঝি চাকর বামুন এই তিন জনের কায করে বেড়াচ্চে, তবু তার দোষ বার কচ্চ? খুব যা হোক্!"

"দোষ বা'র কত্তে আবার কোথায় দেখ্‌লে গা? অমন লোক-দেখানো কায না কল্লেই নয়?"

"চুপ্, চুপ্, এদিকে আস্‌ছে যে!"

"তা আসুক কারো একচালায় তো বাস নয়!"

"এই যে ঠাঁকুরঝি, কোথায় গেছলে এতক্ষণ?"

"বরযাত্র খেতে বস্‌বেন যেখানে, সেখানে পাতের এঁটো ছিল, তাতে কুকুরে মুখ দিয়েছিল। কেউ পরিষ্কার করতে চাইলে না। তাই এঁটোটা পরিষ্কার করে এলাম।"

"ওমা বল কি, কুকুরের এঁটো এই রাত্তিরে ছুঁলে! এই কাপড়ে আবার হেঁসেল ছোঁবে ত?"

"সে কাপড়ে কেন ছোঁব ভাই? পুকুর থেকে ডুব দিয়ে তবে আস্‌চি।"

"তাই বল! তা নইলে যেত এই সব ছিষ্টি এখনি ফেলা!"

"তুমি তো বর দেখ্‌তে গেলে না একবারও, আমরা ছাদ থেকে দেখে এসেছি। বেশ বর, মন্দ নয়। তবে একটু বয়স হয়েছে, আর একটু কালো রং। তা হোক্ কত সুন্দরী মেয়ের ভাগ্যে ওই জুট্‌ছে না।"

"যা ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন, তাই ভাল।"

"তা আর বল্‌তে! বলে, আপনার ভাইতে আজকাল এতটা করে না; ছবির বাবা তবু তো তোমার খুড়তত ভাই। যথেষ্ট করছেন।"

"দাদাকে ধরেই তো আছি, নইলে কোথায় বা থাক্‌তাম? কি করেই বা রাণীর বিয়ে দিতাম?"

"বর স্ত্রী-আচারে আস্‌চে, শীগ্‌গির সব তৈরি হয়ে নাও গো!"

"শুন্‌লি তো—চ' চ'। তুমি যাবে নাকি মাসী? একবার তবু দেখে এস।"

"না মা, আমি এখন অন্য সব কায দেখি। তোমরা দেখে এস।"

(যাইতে যাইতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে) "মাগো, কায যেন কেউ করে না। দেখেও বাঁচিনে!"

"তুমি কেন গেলে না মা একবার দেখ্‌তে? আমি না হয় পাণগুলো সেজে রাখি। তুমি একবার ঘুরে এস।"

"না মা, কায ফেলে গিয়ে কি হ'বে? সব কায মিটুক, তখন যাব'খন।"

"রাণী আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখেনি কিনা তাই সন্ধ্যের আগে আমাকে বল্‌ছিল,—'ঝিমা, মা কোথায় গেলেন আজ?' হাজার হোক বয়স হয়েছে তো; সে বুঝেছে, কালই যেতে হবে মাকে ছেড়ে, তাই তোমার জন্যে মন-কেমন কচ্ছিল।—তা হোক্ মা, চোখের জল ফেলো না এমন দিনে। ওই ঘরই যেন করে জন্ম জন্ম।"

"ওগো, গিন্নী তোমায় ডাক্‌ছেন শীগ্‌গির এস। তাঁর বোন্‌ঝির ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়্‌ছে, শীগ্‌গির তাদের চাট্টি খাইয়ে দেবে।"

"যাই চল মা।"

"মাগো! মাগীকে আজকের দিনেও যেন নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিচ্চে। আহা বেচারী একটা কথা বল্‌তেও জানে না! ওর কি মার প্রাণ নয়? ওর কি ইচ্ছে করে না যে, মেয়েকে একটু সাজায় গোজায়, কাছে একটু থাকে! যেমন অদেষ্ট!"

২

রাত্রি বারোটা অতীত হইয়া গিয়াছে। বর বধূ বাসর ঘরে। দুই চারিটী রমণী বাসর ঘরে খানিকক্ষণ ছিলেন, কিন্তু বর গান গাহিতে জানে না শুনিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিলেন।

বর। এরা যে চ'লে গেলেন, ভালই হ'ল। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। একি, কথা কইতে যাব, আর তুমি ঘোমটা একহাত টেনে দিলে যে! এখন ত কেউ নেই, তবে লজ্জা কিসের, ঘোমটা খোল।

বর বধূর ঘোমটা একটু কম করিয়া দিল। বধূ ঘোমটা আর টানিয়া দিল না, কিন্তু নিরুত্তরে নত মস্তকে রহিল।

বর। সুন্দর মুখখানি তোমার, কিন্তু বড় ম্লান। আমি কালো তাই কি দুঃখ হয়েছে?

বধূ। (অতি মৃদুস্বরে) না।

বর। তবে কেন অমন ক'রে রয়েছ? বিয়ের দিন মেয়েদের মুখ তো প্রফুল্লই থাকে। তুমি কেন অমন ক'রে আছ?

বধূ। আজ সমস্ত দিন মাকে দেখিনি, তাই বড় কষ্ট হয়েছে।

বর। মাকে দেখনি কেন?

বধূ। আজ সমস্তক্ষণ মা যে কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

বর। কি কাজ এত তাঁর? এত লোকজন তো রয়েছে!

বধূ। তা থাক্‌লেও মার খাটুনির বিরাম নেই।

বর। তাহ'লে উকিল বাবু বুঝি তোমার আপন মামা নন্; নয়?

বধূ। না, আপন নন্; একটু দূর সম্পর্কে মামা হন্। মা যে আমাকে নিয়ে কি কষ্টেই পড়েছিলেন! আর তুমি যদি রাজী না হ'তে, মার কি অবস্থাই হ'ত সকলের কাছে!

বর। ওঃ তাই! সে জন্যে বরযাত্রদের তেমন যেন কেউ খাতির করলে না।—ও কি কাঁদছ কেন? ছিঃ!

বর পরম স্নেহে বধূর মুখ মুছাইয়া দিল। তথাপি বধূর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সজল চক্ষু লইয়া সে স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

চোখ মুছান ছাড়িয়া দিয়া বর বধূর মস্তকে ও পৃষ্ঠে প্রীতিভরে হাত রাখিল, পাশের ঘরের ঘড়ীতে ৩ টা বাজিল।

খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল—বাহিরে চারিদিক স্নিগ্ধ শুভ্র চন্দ্রালোকে ভরিয়া গিয়াছে। দুইজনে বিনিদ্র নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বধূর হাত দুইখানি বরের হাতের মধ্যে কখন আসিয়া পড়িয়াছিল।

বর। কে আস্‌ছেন এ দিকে?

বধূ। মা; এতক্ষণে মা আস্‌ছেন।

মা আসিতে বর ও বধূ উঠিয়া উভয়ে একসঙ্গে প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিল।

মায়ের চোখের জলে আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়িল। পূর্ব্ব দিকে তখন শুকতারা মায়ের চোখের মতই জল্ জল্ করিতেছিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

মায়ের রূপ

(গান)

ওমা, তোর রূপ ফুটেছে
পল্লী-আঙিনায়,
তোর শস্যশ্যামল রূপের জোয়ার
দিখিদিকে বয়ে যায়।
কলাই মটর সরষে বনে
পুষ্পভরা শ্যাম কাননে—
তোর ভরা আঁচল খুলে দিছিস্,
হেরে সবার নয়ন জুড়ায়।
তোর রূপ দেখে ওই নবীন ধানে
বান ডেকেছে সকল প্রাণে,
ছেলেরা তোর ভক্তি ভ'রে
প্রণাম করে পায়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন।

'টিরোলী আল্পসের তালে তালে'—শ্রীবিনয়কুমার সরকারের মনোজ্ঞ ভ্রমণ-কাহিনী। জানিবার অনেক কথাই আছে। লেখক মহাশয়কে একটা কথা বলিতে চাই, পাঠকদের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, সে কথাটা তিনি যেন ভুলিয়া না যান। পাঠকেরা তাঁহার তালে তালে আর চলিতে পারিতেছে না। 'বিচার-বিক্রয়'—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত বহুল তথ্য-পূর্ণ সঙ্কলন। পূর্ব্বে এদেশে শাসন ও বিচার-বিভাগ কিরূপ ছিল, আর এক্ষণে বিচার বিক্রয় করিয়া বৎসরে বৎসরে কোর্টফিতে ও সমন-জারী বাবদ গবর্ণমেণ্ট কত টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার তালিকা আছে। সমনজারি ব্যাপারে যে কত গোলযোগ ঘটে তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই গোল মিটাইবার জন্য চিন্তাশীল লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবন-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—"সমন গোপন করিয়া একতরফা ডিক্রী করা দেওয়ানী মামলায় যেন একটা নিত্য নৈমিত্তিক কৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথচ পোষ্ট অফিসের মারফতে এবং তাহার সহিত ইউনিয়ন বোর্ডের হাত দিয়া যদি সমনজারীর ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, সমনজারী ব্যাপারে এতটা অসুবিধা ঘটে না। কেহ কেহ বলেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে চৌকীদারের হাত দিয়া সমনজারীর ব্যবস্থা করিলে বিশেষ গোলযোগ হইবে না। আমরা তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস, প্রবল ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রাম্য চৌকীদারকে হাত করা কঠিন ব্যাপার নহে। ইউনিয়ন বোর্ডের ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট সকলেই নিতান্তশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নহেন। সুতরাং পোষ্টাফিসের সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে সমনজারি করিবার ব্যবস্থা করাও নিতান্ত আবশ্যক। * * সামান্য সামান্য দেওয়ানী মামলার বিচার-ভার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধু চরিত্র লোক দ্বারা গঠিত সালিশ দিগের হস্তে অর্পণ করা এবং কোর্ট ফিস ও সমনজারির খরচা কমাইয়া দেওয়া সরকারের নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

'ভূপেন্দ্রনাথ বসুর জীবন-চরিত' ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারকল্পে কর্ম্মবীর ভূপেন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রবীণ সাহিত্যিক বিবৃত করিয়াছেন। 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা'—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের নমুনা ইহাতে অনেক আছে। কর্ম্মবীর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার নিকট কেবল মাত্র বিশ্লেষণ মূলক (analytical) গদ্য-সাহিত্যের ধারায় বিবৃতি চাই না—আমরা চাই গঠনমূলক (synthetical) কার্য্যকারণের বিবৃতি। কেন একধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যধারার আশ্রয় গ্রহণ করিল—কেন নদীস্রোতের ন্যায় প্রবহমান ভাষাশ্রিত ভাব-স্রোত অন্যখাতে প্রবাহিত হইল? বাঙ্গালা ভাষা জীবন্ত ভাষা। এভাষার গতি ভবিষ্যতে কোন্ পথে হওয়া উচিত, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তিনি নব ভগীরথের ন্যায় তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিন। 'আঁতুড়ে নিয়ম পালন—শিশুর জন্য'—ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়-লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। সকলের জানা উচিত। বেশ সহজ ভাষায় লিখিত। 'জীবন ও শিল্প'—'ভিক্টো সেমিজ'—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। চলনসই প্রবন্ধ। 'বাঙ্গালার গীতি কাব্য—বৈষ্ণব কাব্য'—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। প্রাচীন সাহিত্যে লব্ধ-জ্ঞান লেখক মহাশয়ের বৈষ্ণব কাব্য বুঝাইবার জন্য চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 'খনির শ্রমিক সমস্যা'—লেখক শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস্-সি মহাশয় বলিতে চান, 'শিক্ষা পাইলে কুলীদের আত্মোন্নতির চেষ্টা আপনা হইতেই আসিবে; স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিকতর যত্ন লইবে—মদ খাওয়া কমাইয়া দিবে।' কথাটা খুব সত্য; কিন্তু শিক্ষা দেয় কে, আর শিক্ষা লয়ই বা কে? 'শ্লীল ও অশ্লীল সাহিত্য'—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। নূতন কথা কিছুই নাই। তথাপি লেখক মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ আধুনা আর্টের অজুহাতে যে সকল অশ্লীল রচনা বাহির হইতেছে সেগুলি বন্ধ করা যে উচিত একথা বলিবার তাঁহার সৎ সাহস আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—'যাহা অশ্লীল, দুর্নীতি প্রচারই যাহার মূল লক্ষ্য, তেমন জিনিষ সহজেই ধরা যায়—সাহিত্যের ও সমাজের গ্লানিকর, তেমন জিনিষের বেসাতী করিতে যদি কেহ বদ্ধপরিকর হয়, মাত্রা ছাড়িয়া গেলে তেমন জিনিষ বন্ধ করিতে সব দেশেই আইনের

সাহায্যের প্রয়োজন হয়।' 'জাতীয় অর্থনীতি'—শ্রীজ্যোতি-ভূষণ সেন এম-এ লিখিত প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। 'চীনের নরক' আর একটী সঙ্কলিত প্রবন্ধ। রসরাজ শ্রীঅমৃতলাল বসু মহাশয়ের'পুরাতন পঞ্জিকা'বেশ চলিতেছে। সেকালের নিখুঁত অনেক চিত্রের সমবেশ ইহাতে আছে। রস-রচনা বাঙ্গালাদেশ হইতে এক রকম উঠিয়া যাইতেছে বলিলেই হয়। পুরাতন এই রচনার ধারাকে যাঁহারা এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অভাব-দুঃখক্লিষ্ট বাঙ্গালীর অন্তরে হাসির লহর ছুটাইয়া তিনি বাঙ্গালীকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আনন্দদান করেন ও তাঁহার দুঃখ শোকের কথা ভুলাইয়া দেন। ভগবান 'শিব-রাত্রির সলিতা' আমাদের রসরাজকে আরও কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখুন।

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

'চট্টগ্রামের কয়েকটী দৃশ্য'—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত। চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; কিন্তু পরিচয়ে যাহা লেখক মহাশয় দিয়াছেন, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত, বর্ণনভঙ্গী ভাল না। পথপ্রদর্শক guide বহি গুলিতেও ইহা অপেক্ষা বেশী বর্ণনা আছে। একস্থলে কিন্তু বেশ কবিত্ব আছে—সেস্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:— 'দিনশেষে বিদায়-রবির ক্লান্ত-রঙ্গীন কিরণ যখন সমুদ্রের অতলস্পর্শী সিন্ধুর সহিত কোলাকুলী করিতে থাকে, সেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক মধুর রূপটার নিকট চিত্রকরের অঙ্কনপটুতা, কবির কল্পনা, বক্তার বাক্-চাতুর্য্য ও লেখকের শব্দ-বিন্যাস কৌশল প্রভৃতি আপনা হইতেই পরাজয় স্বীকার করে। যিনি সমুদ্রের সৈকত ভূমিতে থাকিয়া স্বচক্ষে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার কান্ত-মধুর রূপ দর্শনে নির্ম্মল আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন ব্যথিতের হা হুতাশ—কালের ভৈরবী মূর্ত্তি এখানে নাই; আছে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় নিখিল ভরা আনন্দ—আর আনন্দ।' 'পল্লী-বিধবা ও শিক্ষা'—প্রবন্ধে শ্রীমতী গিরিবালা রায় মহোদয়া যে সমস্যা তুলিয়াছেন, তাহার সমাধান করেন নাই। তাঁহার স্বাধীন মত ব্যক্ত না করিলে প্রবন্ধের মূল্যই নির্ণীত হইতে পারে না। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তৌফীর 'মহম্মদপুর' ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অজ্ঞাত পর্ব্ব' বহুল চিত্র-শোভিত তথ্য-পূর্ণ মনোজ্ঞ ভ্রমণ-কাহিনী। 'পল্লী-সংস্কার ও সংগঠন'—প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে সকল সুচিন্তিত কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। এ প্রবন্ধ, তাঁহার ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা সকলে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ। 'আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার না সংহার'—প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না। আলোচনা না হইলে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য মনীষী হর্নলে সাহেবের অনুবর্ত্তী শ্রীযুক্ত গণনাথ সরস্বতী মহাশয়ের মত সকল আলোচিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। 'হস্তপদাদির বিকৃতি ও বৈচিত্র্য'—প্রবন্ধে কাপ্তেন ডাঃ সত্যকুমার রায় মহাশয় চিত্র সাহায্যে অঙ্গগঠনে প্রকৃতির খেয়ালের কতকগুলি নিদর্শন দিয়াছেন। 'চন্দননগরের ক্রীড়াকৌতুক' শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় বিশেষ কিছুই দিতে পারেন নাই। 'বেলজিয়ম' শ্রীনরেন্দ্র দেবের সঙ্কলিত মনোজ্ঞ ভ্রমণ-কাহিনী। 'বাদ প্রতিবাদের' ভিতর আমরা প্রবেশ করিতে চাই না। তবে লেখক শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংযত ভাষায় শ্রীমতী রাধারাণী দত্তের 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক' প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ।

বঙ্গবাণী—চৈত্র।

'রামগোপাল ঘোষ'—জীবনচরিত। জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও কর্ম্মীর জীবনচরিত যতই আলোচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের সমালোচনা হওয়া উচিত নয়। 'অসুন্দর'—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথ বলিতে চান—'অসুন্দরের মধ্যে একটা ভাণ থাকে, সুন্দরের কোনরূপ ভাণ থাকে না। মিথ্যার আবরণে অসুন্দর নিজেকে আচ্ছাদন করে আসে, সুন্দর আসে অনাবৃত—সত্যের উপরে তার প্রতিষ্ঠা। আর্ট যা তা সুন্দর ও সত্য ভাণ যা যা তা অসুন্দর এবং অসত্য। আর্ট বস্তুর ও ভাবের সত্যটাই প্রকাশ করে যা ভাণ তা শুধু বাহিরের জিনিষটা দিয়ে ধোঁকা দিয়ে যায়, এই জন্য একে বলি সুন্দর অন্যকে বলি অসুন্দর, একে বলি সত্য অন্যকে বলি অসত্য। এমনি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে নানা মতামত রয়েছে দেখা যায়। জিনিষটা ছেড়ে দিয়ে বলা যেতে পারে, সুন্দর যে শুধু শুধুই সুন্দর একারণে সে কারণে সুন্দর নয় এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি অসুন্দর সে অসুন্দর বলেই অসুন্দর।' ** 'সব সুন্দর কাল রচয়িতা আপনাকে গোপন রাখে অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে।'

'বিশ্ব রচনার মধ্যে দেখতে পাই সুন্দর আছে অসুন্দরও আছে, মানুষ এ দুটাকে আলাদা করে দেখে বলেই

তুলনায় দেখে একটা সুন্দর অন্যটা অসুন্দর কিন্তু বিশ্ব-রচয়িতা তিনি এ দুটকেই সৌন্দর্য্য ফোটানোর কাযে লাগাচ্ছেন—রূপদক্ষদের কারবার দেখি সুন্দর অসুন্দর দুইকে নিয়ে।” শিল্পাচার্য্য ‘রূপদক্ষ’ শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত পরিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেন নাই। সে অর্থে ইহা ‘ভাস্করকে’ই (sculptor) বুঝাইত কিন্তু শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় সাধারণ শিল্পী অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটীতে রস-কলাকুশল অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বড় নাই। আর এক কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যতিচিহ্নের (punctuation) অভাবে প্রবন্ধটী পাঠ করা একরূপ দুরূহ ব্যাপার। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মল্লিনাথ রূপে এ কাজটা করিয়া দিলে ভাল হয়। আমার বাক্তব্যটা উদ্ধৃত ছত্রগুলি পাঠ করিলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভাবাবেশে লেখক মহাশয় যাহা বলিয়া গেলেন বা লিখিলেন তাহা সম্পাদন করাও সম্পাদকের অন্যতম কাজ। ‘ভোগ না বৈরাগ্য’—শ্রীহারচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ এবারে সমাপ্ত হইল। লেখক মহাশয় কি বলিতে চান যে, জগতের cultural ধারা একই খাতে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়? প্রত্যেক জাতির ভাব-ধারার বৈশিষ্ট্য আছে ও থাকিবে এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। হিন্দু আত্মসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতিদের মত ভোগের মহিমা উপলব্ধি করেন নাই—করিয়াছিলেন ত্যাগের ও বৈরাগ্যের মহিমা। আদর্শ পার্থক্য জগতে কোন দিন বিলুপ্ত হয় নাই, হইবেও না। এ প্রবন্ধে ভোগের ওকালতি বেশ আছে—ত্যাগের দিকটা আদৌ বলা হয় নাই। তরুণ প্রাণে এ প্রবন্ধ লালসার উদ্রেক করিবে, মোহ আনয়ন করিবে—আপাতরম্য সুখের সন্ধানে ছুটাইবে; কিন্তু শান্তি দিতে পারিবে না। লেখক মহাশয় বলিতে চান,—‘আধুনিক ইতিহাসে দেখি যে জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ঋদ্ধি-সিদ্ধি, শৌর্য্য-বীর্য্য, কাব্যকলা, ঐশ্বর্য্য বিলাসে উন্নতিশীল জাতি সমূহ ভোগের ধ্যান-ধারণায় আত্মবিনিয়োগ করিয়া জাতীয় সাধনার বিবিধ বিভাগে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং বিশ্ব আলোড়ন করিয়া ভোগোপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক মহা কল্যাণে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। আর চক্ষুকর্ণের অগোচর, ভাষার অতীত, অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নিঃশ্রেয়সের লোভ, আত্মপ্রত্যয়ের অখণ্ড ধারণা, স্বানুভূতির অভ্রান্ত প্রেরণা অগ্রাহ্য করিয়া দৈন্যকে অথবা ঐশ্বর্য্যের সম্ভ্রম দিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত শাকান্নে তৃপ্তি-প্রয়াসী ভারত অর্জ্জনমূল মমত্ববোধময় ভোগে ঔদাসীনতার অধর্ম্মের ফলে ভাবের হাটে সব হারানো পথের ভিখারী। জীবনটাকে “নেতি নেতি” বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিতর আপনাকে পাইতে গিয়া শোচনীয় হীনতা দীনতার চোরাবালির মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে।’ ত্যাগে যে শান্তি পাওয়া যায়, সে কথাটা আদৌ লেখক মহাশয় এখনও ভাবিবার অবসর পান নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাশ্চাত্য সুবিধাবাদীদের মতামত গুলি তিনি যে ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। বোধহয় তিনি নিজেও একজন তরুণ। কালে তাঁহার মতটা ‘বদ্‌লে’ যেতে পারে! ভাষা বেশ সুন্দর। ‘ফরাসী শিক্ষাবিজ্ঞান’—৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। এত অধিক সংখ্যক ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ বাঙ্গলার আর কোন কাগজেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ‘বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনাম্‌চা—গুরুজী’ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের প্রথমাংশ। বিষয়টি ভাল করিয়া বলিবার শক্তি বিশেষজ্ঞ সুন্দরী বাবুর বেশ আছে। ‘ভারতবর্ষে’ যখন এই শ্রেণীর প্রবন্ধ বাহির হইত, তখন আমরা সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতাম। লোক-শিক্ষার উপযোগী প্রবন্ধ, সকলের পাঠ করা উচিত। ‘৺লোহারাম শিরোরত্ন ও মালতীমাধব’—রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল। বৈয়াকরণ লোহারাম মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত মালতী-মাধব নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। এ সংবাদ শুধু লেখক মহাশয় দেন নাই, তাঁহার ভাষার সহিতও আমাদিগকে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ‘ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল ও সহজ প্রচারের কারণ’—শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত। লেখক তাঁহার বক্তব্য প্রবন্ধের শেষে এইরূপে বলিয়াছেন—“দেশের রাজার সাহায্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অত্যাচারে লোকের সে ধর্ম্মের প্রতি বিমুখতা ও বুদ্ধদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার সহজ ও সরল পালি ভাষায় জনসাধারণের সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য অহিংসা ও সর্ব্বজীবে দয়া এবং পবিত্র জীবন যাপন এই বাণী স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিচারে অধিকার ভেদাভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচার করাই তদানীন্তন মনুষ্য-সমাজের প্রাণে গিয়া সাড়া দিয়াছিল।” বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত এই প্রবন্ধে নূতন কোন কথাই নাই। গবেষণার পরিচয়ও লেখক মহাশয় দিতে পারেন নাই। ‘বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়,’ ‘আশুতোষের জীবন-চরিত’, ‘তিলক চরিত্র’ তিনটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। ‘জাতিভেদ—স্বদলে’ সম্পাদক মহাশয়ের লেখা। আলোচ্য বিষয়, ‘একই দলের লোকের মধ্যে কি কারণে শ্রেণী-বিভাগ ঘটে, আর শ্রেণীগুলির মধ্যে

কি কারণে জাতিভেদ জন্মিয়া লোকেরা পরস্পরে সামাজিক ব্যবহারে নিঃসম্পর্কিত হয়'—তাহাই লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তিনি এখন পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন ; নূতন কথা সামান্যই দিয়াছেন। এ মাসের বঙ্গবাণী পূর্ব্বের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেকের ভিতরই চিন্তাশীলতার অভাব দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। ভাবুক পাঠকদের ভাবিবার খোরাক জোগাইতে না পারিলে প্রবন্ধ গৌরব রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার।

প্রবাসী—চৈত্র।

'নির্ভাবনার দুর্ভাবনা'—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় বলিতে চান, পূর্ব্বে নিজের প্রয়োজনের জন্য সকলকেই কিছু না কিছু ভাবিতে হইত, কার্য্য করিতে হইত, এক্ষণে আর তাহা আবশ্যক হয় না। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অপরে ভাবিয়া ঠিক করিয়া দেয়।' লেখক মহাশয়ের কথায় আমরা বলি,—"আকবর শা থেকে সবাই ভেবে গেল, বিধাতা তিনি ভাবছেন সৃষ্টির ভাবনা, আমাদের মতো এত বড় এমন চমৎকার নির্ভাবনা নিয়ে জীবন যাপন কেউ করতে পারলে না।' তারপর তিনি বলেছেন,—'আর শুধু একটু খুঁৎ রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে চাকরির ভাবনা ; ওইটে হ'লেই সব ভাবনার পারে অলস-পুরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা মেরে বলি, open sesame, আর অমনি দরজা খুলে যায়।" কিন্তু লেখক মহাশয়ের, এখনও ভাবনা হয় তাঁর ছাত্রেরা কে কেমন কাজ করছে, কে চাকরি পাচ্ছে না পাচ্ছে, কে মেয়ের বিয়ে দিলে না দিলে, কে মেডেল পেলে না পেলে। ছেলেদের ভাবনা এখনো তাঁর মাথায় ঘোরে। ছেলেদের গল্প লেখার ভাবনা, ছবি লেখার ভাবনা, প্রবন্ধ লেখার ভাবনা তাঁকে ঠেলে তোলে ঘুম থেকে এখনো।' তাই লেখক মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, 'এত ভাবনা নিয়ে নির্ভাবনার স্বর্গে গিয়ে ঠেলে ওঠা তার কোনদিন হবে না।' আমরাও তার সঙ্গে বলি—ভাবনার হাত থেকে মানুষ কোনদিনই রক্ষা পাবে না—চিন্তাই মানুষকে মানুষ করে—চিন্তাই মনুষ্যের বৈশিষ্ট্য। দার্শনিক দেকার্ত্তে সত্যই বলিয়াছেন cogito ergo sum আমার অস্তিত্ব আমার চিন্তার উপরই নির্ভর করে। রসরচনাকুশল লেখক মহাশয়ের নিকট এই রচনায় রসের তরলতা দেখিয়া মনে হইল লেখক মহাশয় উপরোধে যন্ত্রবিশেষকে গলাধঃকরণ করিয়াছেন। 'আলেখ্য রচনায় কৃতিত্ব' —শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প কথায় লেখক মহাশয় শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিল্পী 'আসবাব পত্রের সাহায্যে আলেখ্যের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না। তিনি কেবল মানুষটীকে আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু তাহাকে এমন জীবন্ত করিয়া আঁকেন যে তাহাকে ফুটাইবার জন্য অবান্তর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। শিল্পীর আলেখ্য তেলের রঙে (oil-colour) অঙ্কিত নয়, তাঁর উদ্ভাবিত অভিনব প্রণালী জল-চিত্রে (water colour) অঙ্কিত। 'বাংলা ভাষার দৈন্য' —শ্রীসত্যভূষণ সেন। লেখক মহাশয় এ প্রবন্ধে যে সকল অভাব অভিযোগের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই ; কিন্তু তিনি কেন যে বঙ্গ ভাষার দীনতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নৈরাশ্যের কারণ কি ? বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে কি আমরা আশা করিতে পারি না, তাঁহার উল্লিখিত দোষগুলি অচির কাল মধ্যে বিদূরিত হইবে ? আর লেখক মহাশয় সকল অভিযোগ পূরণ করিবার ভার দিয়াছেন 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' উপর। অথচ এত গুলি গুরুভার কেবল মাত্র পরিষদের উপর দিলে চলিবে কেন ? প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ সকল বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। সাময়িকদিগের সকলেরই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। লেখক মহাশয়ের নিকট কি আমরা অন্ততঃ একটা বিষয়ে সুমীমাংসার জন্য অনুযোগ করিতে পারি না ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, তিনি 'বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের, ঢাকার অধিবেশনে একটা ভৌগোলিক অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।' নাই বা হইল, তিনি জন কতক কর্ম্মীকে লইয়া এরূপ একটা সমিতি গঠন করুন না, এবং আপনাদের কার্য্যের ফলাফল সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থাপিত করুন, ভূগোল-বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণামূলক দুই চারিটা প্রবন্ধ পাঠ করুন, দেখি দেশ সাড়া দেয় কি না ? সকল কার্য্যের ভার পরের উপর দিয়া চলিবে কেন ? সৎকার্য্যে অগ্রসর হইলে কর্ম্মীর অভাব হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ এ কার্য্য করিতে হইলে তরুণদিগের সাহায্য প্রয়োজন। দেশ ভ্রমণে তাহাদের অদম্য উৎসাহের পরিচয় মাসিক পত্রিকায় আমরা পাইয়া থাকি। তাঁহাদের সাহায্যে এ কার্য্য অগ্রসর হওয়া দুরূহ হইবে না। 'পল্লী সঙ্গীতে ভক্ত কবি ফকির লালন সাঁ'—শ্রীমতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ছিঁয়ড়ে নামক গ্রা

ভক্তকবি ফকির লালন সার আস্তানা ছিল। ইহা গড়াই নদীর ধারে, কুষ্টিয়া সহর হইতে এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। 'লেখা-পড়া তিনি জানিতেন কি না সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাঁর গানগুলি বেশ ভক্তি-উদ্দীপক ও উদার ভাবপূর্ণ। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য জ্ঞান তাঁর আদৌ ছিল না। সকল ধর্ম্মেই তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল।' গানগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য'—শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম কর্তৃক ভারত সরকারের বার্ষিক বাণিজ্য-বিবরণী হইতে সঙ্কলিত। 'চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদের আদি স্থান নির্ণয়'—শ্রীহরিহর শেঠ। ইহাতে লেখক মহাশয়ের গবেষণার ও অনুসন্ধিৎসার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ৫খানি পুরাতন মানচিত্র ও কয়েকখানি চিত্র-শোভিত এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখক মহাশয় নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তালডাঙ্গা ও তাউৎখানার বাগান ও তন্নিকটস্থ জঙ্গলপূর্ণ স্থানই ফরাসী চন্দননগরে ফরাসীদিগের অধিকৃত স্থানসমূহের মধ্যে প্রথম সম্পত্তি। 'জাতি-গঠন ও বিচার-বুদ্ধি' Welfare পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ। লেখক মহাশয় বলিতে চান,—"ভারতবর্ষের জাতি-গঠন সমস্যা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়া আন্তর্জাতিকতা বা মানবিকতার প্রাধান্য স্বীকার না করা গোঁড়ামীর ফল। যেমন আন্তর্জাতিক ব্যবহারে অন্য জাতিকে ক্ষতি-গ্রস্ত করিয়া কোন একটী বিশেষ জাতিকে সমৃদ্ধ করা মূর্খতা, তেমন জাতি-গঠনেও অন্য সকল সম্প্রদায়কে অসুবিধায় ফেলিয়া কোন একটী বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র। গৃহ-নির্ম্মাতা অপেক্ষা জাতি-গঠনকারীর কার্য্য অনেক আয়াসসাধ্য: কারণ গৃহ-নির্ম্মাণে জড় ইষ্টকাদি লইয়া কার্য্য করিতে হয়—আর জাতিগঠনে চেতনা বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ মানবের ইচ্ছাশক্তি লইয়া কার্য্য করিতে হয়। মানুষ দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসিলেও, স্বার্থ, প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, জাতীয়তা, ধর্ম্মমত বা কোন সংস্কার জাতিভেদ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবার দূরে থাকিতেও চায়। সম্পূর্ণ ভাবে ঐ কারণগুলির উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর নহে এবং পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাও আবশ্যক। এ কারণ জাতি-গঠনকারীকে সর্ব্বদাই সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে—সর্ব্বদাই তাঁহার লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বিকর্ষণী শক্তি আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর না হয় এবং দলবদ্ধ থাকিবার স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট না করে। বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া জাতীয় সমস্যা সকলের মীমাংসা ও সমাধান করিতে পারিলে তবে জাতি-গঠন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। হিন্দু-মুসলমানে এক সম্মিলিত জাতি-গঠিত করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের লোককে, কতকগুলি গোঁড়া মতও সংস্কারকে বর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় বলিতে চান, "গান্ধীজির মতানুযায়ী অস্পৃশ্যতা নিবারিত হইলে, হিন্দুর গোঁড়ামি অংশতঃ বর্জ্জিত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে যথার্থ রোগোপশম হইবে না। জাতিভেদের ভূত পুরাপুরি ছাড়াইতে হইবে। হিন্দুদের গোঁড়ামি রক্ষা করিতে গেলে তাহা সম্ভবপর নহে।" কথাটা কিন্তু আমাদের প্রাণে ঠিক লাগিতেছে না—জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেই যে জাতি-গঠন কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে তাহা বোধ হয় না। বস্তুতঃ জাতিভেদ যে জাতি-গঠনের একমাত্র অন্তরায় তাহা স্বীকার করা যায় না। লেখক মহাশয়ও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সংসারে ভেদ কোনদিন অন্তর্হিত হয় নাই—যে কোন আকারেই এই 'ভেদ' দেখা দিয়া থাকে—ধর্ম্মের ভেদ, অর্থের ভেদ, মতভেদ, পদমর্য্যাদার ভেদ, মানুষকে মানুষ হইতে দূরে রাখে। সমান ধর্ম্ম মানুষকে আকর্ষণ করে। তবে জাতি কি গঠিত হইবে না? জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দেশ-মাতৃকার সেবায় জাতিগঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেই বা নানারূপ ভেদ স্বত্বেও স্বাদেশিকতার ফলে নূতন জাতি গঠিত হইবে না কেন? জাতি-বৈরিতা বিদ্বেষমূলক, কিন্তু হিন্দুদিগের জাতিভেদ সর্ব্বত্র বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই বিদ্বেষের ভাব পূর্ব্বে ছিল না, এখন ইংরাজী শিক্ষার ফলে নিম্ন বর্ণের ভিতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ দেখা গিয়াছে। নিম্নবর্ণের সাধারণ লোকের বিশ্বাস স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। কথাটা কি সত্য? গুণকর্ম্ম বিভাগের জন্যই বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ণের পরিবর্ত্তন বহুবার দেশীয় রাজাদের আমলে হইয়াছে। আবারও যে সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন হইত না তাহাও কেহ বলিতে পারেন না; কিন্তু ইংরাজ আমলে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস প্রকৃত শিক্ষালাভ হইলে এ বিদ্বেষ থাকিবে না। একত্রে আহার না করিলে বা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে যে দেশকে ভালবাসিতে পারা যায়

না—দেশের জন্য যে প্রাণ উৎসর্গ করা যায় না এ কথা রাজপুতদিগের ইতিহাস শিখা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে। সকল বর্ণের লোকদের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা ও শিক্ষা প্রচার করিলে মানুষ দেশকে বুঝিতে পারিবে, তখন জাতীয়তা আপনিই গঠিত হইবে।

ধর্ম্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

'প্রণবের ব্যাখ্যা'—সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা। একেই বিষয়টী নীরস ও জটিল; তদুপরি লেখক মহাশয় সরল করিয়া বলিতে পারেন নাই। এ সকল বিষয় সহজবোধ্য ভাষায় লিখিতে না পারিলে লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। তবে ইহা spiritualism বা প্রেততত্ত্ব বিজ্ঞানের ভূমিকা মাত্র। আসল প্রবন্ধের অপেক্ষায় আমরা রহিলাম।

বঙ্গবাণী—চৈত্র।

'রাজযোগ' প্রবন্ধ শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিরচিত। স্বামীজী প্রথমে জীবের ও মনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারপরে তিনি আনন্দ-ব্রহ্ম সদ্‌গুরুর স্তুতিবাচন করিয়াছেন। এটা না করিলেও প্রবন্ধের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হইত না। ইহাতে তাঁর গুরুভক্তির প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না। তাঁর বক্তব্য এই—"গীতোক্ত রাজযোগই সম্পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মের কেন্দ্র। সৃষ্ট বস্তুর কোন না কোন ধর্ম্ম আছে। জড় ও চেতনের ধর্ম্ম আছে; ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই। কম্পন ব্যতীত কোন বস্তুর সৃষ্টি হ'তে পারে না। আত্মজ্ঞান-হীনতার নামই মৃত্যু। এই মৃত্যুই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপে মনের ঠিক উপরে অহঙ্কারের (তমের) মধ্যে বাস করে। যে কার্য্যপ্রণালী দ্বারা এই মৃত্যুকে জয় করা যায় তার নাম রাজযোগ। মৃত্যুঞ্জয় হওয়াই গীতোক্ত ধর্ম্ম।'

'(১) শ্রীগুরু-কৃপায় জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দেখে জানার নাম জ্ঞান। (২) যে উপায়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করা হয় তার নাম যোগ। জানার পর মন যখন সর্ব্বশক্তির আধার সেই বিরাট্‌কে দেখে, তখন মনের মধ্যেও একপ্রকার ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম-ভাবের উদয় হয় তার নাম ভক্তি। (৪) সেই ভক্তি যখন পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মন গলে যায়—তার নাম প্রেম। (৪) এই জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও প্রেমে মন যখন মাতোয়ারা হ'য়ে উঠে তখন সে দেখে ভগবান্ কি করে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করেন—অর্থাৎ সৃষ্টি কোথা হতে এল, কোথায় আছে এবং প্রলয়ান্তে কোথায় যাবে এবং এই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে ও বাহিরে তাঁহার অবস্থিতি অথচ তিনি নির্লিপ্ত—তার নাম বিজ্ঞান।' বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদ ভাবে স্বামীজী বুঝান নাই। প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আর যদি এই প্রবন্ধেই লেখক মহাশয় তাঁর বক্তব্য শেষ করে দিয়ে থাকেন, তা হলে সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। ভাষার মধ্যে উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বেশী 'এই সেই ভারতভূমি ইত্যাদি (১৪৪—১৪৫ পৃষ্ঠা) লিখিবার কোনরূপ প্রয়োজন ছিল না। স্বামীজীর নিকট আমাদের অনুরোধ, বক্তৃতার সময় সাধারণের অনুভূতি-উদ্রেক ও অনুভূতি বিবৃতি করিবার জন্য এ ভাষার প্রয়োজন আছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধে যুক্তির (reason) প্রাচুর্য্য থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী—চৈত্র।

'অজাতশত্রুর ব্রহ্মবাদ'—দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক লিখিত প্রবন্ধ। অনুবাদ সরল হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সহজবোধ্য এখনও হয় নাই। এইরূপ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; ইহাতে উপনিষদের আখ্যানভাগের সহিত সাধারণে পরিচিত হইবার সুবিধা পায়; কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আমরা এরূপ কেবল অনূদিত প্রবন্ধ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

বিজ্ঞান

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন।

এই সংখ্যাতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ "ভারতে লৌহ" নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত লৌহ আকরের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণ সরকারী কাগজ-পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ৩৫ কোটি হইতে ৪০ কোটি মুদ্রার লৌহ ভারতে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে লৌহের আকর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান এবং আকর

হইতে লৌহ নিষ্কাষণের জন্য যে কয়েকটী সমবায় আছে তাহাই যথেষ্ট নহে। এইরূপ কার্য্যে উপযোগী আরও অধিক সমবায়ের প্রয়োজন এবং যাহাতে আমাদের দেশীয় যুবকগণ উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হইয়া এই সমস্ত সমবায়ের পরিচালনার ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে পারেন সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধটী জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ তবে অসাবধানতা জনিত দুএকটী ত্রুটী আছে যেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেখক বলিয়াছেন যে ভূতত্ব বিভাগের তাৎকালীন সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, এন, বসু ময়ূরভঞ্জের লৌহ প্রস্তর ক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মিঃ বসু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর এই সুবিখ্যাত ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেখক মহাশয় অপর এক স্থলে স্ফটিক শব্দ quartzএর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু "স্ফটিক" এই শব্দটী crystal এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় "ভারতের বনভূমি" নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অরণ্য এবং অরণ্যজাত বৃক্ষ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে বন-বিভাগ হইতে রাজ-সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকা লাভ হইয়া থাকে এবং যদি ক্রমশঃ উচ্চ বেতনভোগী য়ুরোপীয় দিগের স্থলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনভোগী দেশীয় লোক নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে এই বিভাগ হইতে অনেক বেশী আয় হইবে। এই সম্বন্ধে যথাবিহিত করিবার জন্য জন-সাধারণ ও জন-নায়কগণকে লেখক মহাশয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রবাসী— চৈত্র ১৩৩১।

"সাঁওতালী গান" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয় কতকগুলি সাঁওতালী সেরেইএর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সাওতালদের সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক বিবরণ বাহির হইয়াছে কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকা সেই সমস্ত বিবরণের সহিত পরিচিত নহেন। এই হিসাবে কালীপদবাবুর প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক মহাশয় কয়েকটী গানের মূল পদগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত পদ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সাওতালী গানের উপর বাঙ্গালাভাষা নিজের প্রভাব অনেক পরিমাণে বিস্তৃত করিয়াছে, এবং দু এক স্থলে সুমার্জ্জিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :—

"অতি সুকুমার গায়,
চলিতে বাজিবে পায়।"

কথা সাহিত্য

বঙ্গবাণী— চৈত্র।

"স্যাঙ্গাৎ" গল্পে একটি রাঁধুনী বামুনের সারল্য প্রতিফলিত হইয়াছে। উপসংহারভাগ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ভাবের দারিদ্র্য ও ঘটনাবলীর সম্যক সন্নিবেশে অক্ষমতা এই দুই দোষই পরিস্ফুট হইয়াছে।

"জীবনযাত্রা" গল্পটির ভাষা শিথিল, ভাব অস্পষ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থের গল্পে এক চোর আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সে কতকগুলি অলঙ্কার চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে নাই, কিন্তু বিবেকের প্রেরণায় সেগুলি ফেরত দিতে আসিয়া ধরা পড়িল। যিনি বিচারক তিনিই বহুকাল পূর্ব্বে, এই চোর যখন ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল, তখন তাহাকে ভিক্ষার্থী দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ভিক্ষার চেয়ে চুরি করাও ভাল। চোরের প্রতি পাঠকের একটু দয়া আসিতে পারে, কিন্তু সমাজনীতি মতে তাহার যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা নীতিজ্ঞের বিচার্য্য। মোপাসাঁর কোনও গল্পে এইরূপ একটি চোর বর্ণিত হইয়াছে। সে চোর ক্ষুধার্ত্ত এবং আপনার কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত নয়। এ গল্পের চোর দরিদ্র—আপনার কার্য্যের জন্য কতকটা অনুতপ্ত। তাহার বাচালতা অত্যধিক। কোন বিচারক আদালতে চোরকে এতটা বাচালতা প্রকাশ করিবার অবকাশ দেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

ভারতবর্ষ— চৈত্র।

"জাগরণ" গল্পে একটি বালিকার অন্তরে নারীত্বের উন্মেষ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনায় কোন নিপুণতা বা বিশেষত্ব দেখিলাম না।

"মেঠো হাকিমের কড়চা"য় আসরকীর চিত্রটি উপভোগ্য। তবে রচনা দীর্ঘ এবং আখ্যানভাগের ক্রম-বিকাশ ভাল করিয়া দেখান হয় নাই।

"নিশীথ রাতের ঘুম" রোজেটির একটি কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। লেখক অনুবাদ করিলেই ভাল করিতেন। ইংরাজী ভাব অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাবের অনুরূপ হয় নাই।

না—দেশের জন্য যে প্রাণ উৎসর্গ করা যায় না এ কথা রাজপুতদিগের ইতিহাস মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সকল বর্ণের লোকদের মধ্যে আত্মোন্নতি চেষ্টা ও শিক্ষা প্রচার করিলে মানুষ দেশকে বুঝিতে পারিবে, তখন জাতীয়তা আপনিই গঠিত হইবে।

ধর্ম্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

'প্রণবের ব্যাখ্যা'—সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা। একেই বিষয়টা নীরস ও জটিল; তদুপরি লেখক মহাশয় সরল করিয়া বলিতে পারেন নাই। এ সকল বিষয় সহজবোধ্য ভাষায় লিখিতে না পারিলে লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বিএর প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। তবে ইহা spiritualism বা প্রেততত্ত্ব বিজ্ঞানের ভূমিকা মাত্র। আসল প্রবন্ধের অপেক্ষায় আমরা রহিলাম।

বঙ্গবাণী—চৈত্র।

'রাজযোগ' প্রবন্ধ শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিরচিত। স্বামীজী প্রথমে জীবের ও মনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারপরে তিনি আনন্দ-ব্রহ্ম সদ্গুরুর স্তুতিবাচন করিয়াছেন। এটা না করিলেও প্রবন্ধের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হইত না। ইহাতে তাঁর গুরুভক্তির প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না। তাঁর বক্তব্য এই—"গীতোক্ত রাজযোগই সম্পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মের কেন্দ্র। সৃষ্ট বস্তুর কোন না কোন ধর্ম্ম আছে। জড় ও চেতনের ধর্ম্ম আছে; ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই। কম্পন ব্যতীত কোন বস্তুর সৃষ্টি হ'তে পারে না। আত্মজ্ঞান-হীনতার নামই মৃত্যু। এই মৃত্যুই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপে মনের ঠিক উপরে অহঙ্কারের (তমের) মধ্যে বাস করে। যে কার্য্যপ্রণালী দ্বারা এই মৃত্যুকে জয় করা যায় তার নাম রাজযোগ। মৃত্যুঞ্জয় হওয়াই গীতোক্ত ধর্ম্ম।'

'(১) শ্রীগুরু-কৃপায় জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দেখে জানার নাম জ্ঞান। (২) যে উপায়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করা হয় তার নাম যোগ। জানার পর মন যখন সর্ব্বশক্তির আধার সেই বিরাটকে দেখে, তখন মনের মধ্যেও একপ্রকার ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম-ভাবের উদয় হয় তার নাম ভক্তি। (৪) সেই ভক্তি যখন পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মন গলে যায়—তার নাম প্রেম। (৪) এই জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও প্রেমে মন যখন মাতোয়ারা হ'য়ে উঠে তখন সে দেখে ভগবান্ কি করে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করেন—অর্থাৎ সৃষ্টি কোথা হতে এল, কোথায় আছে এবং প্রলয়ান্তে কোথায় যাবে এবং এই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে ও বাহিরে তাঁহার অবস্থিতি অথচ তিনি নির্লিপ্ত—তার নাম বিজ্ঞান।' বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদ ভাবে স্বামীজী বুঝান নাই। প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আর যদি এই প্রবন্ধেই লেখক মহাশয় তাঁর বক্তব্য শেষ করে দিয়ে থাকেন, তা হলে সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। ভাষার মধ্যে উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বেশী 'এই সেই ভারতভূমি ইত্যাদি (১৪৪—১৪৫ পৃষ্ঠা) লিখিবার কোনরূপ প্রয়োজন ছিল না। স্বামীজীর নিকট আমাদের অনুরোধ, বক্তৃতার সময় সাধারণের অনুভূতি-উদ্রেক ও অনুভূতি বিবৃতি করিবার জন্য এ ভাষার প্রয়োজন আছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধে যুক্তির (reason) প্রাচুর্য্য থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী—চৈত্র।

'অজাতশত্রুর ব্রহ্মবাদ'—দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক লিখিত প্রবন্ধ। অনুবাদ সরল হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সহজবোধ্য এখনও হয় নাই। এইরূপ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; ইহাতে উপনিষদের আখ্যানভাগের সহিত সাধারণে পরিচিত হইবার সুবিধা পায়; কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আমরা এরূপ, কেবল অনূদিত প্রবন্ধ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

বিজ্ঞান

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন।

এই সংখ্যাতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ "ভারতে লৌহ" নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত লৌহ আকরের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণ সরকারী কাগজ-পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ৩৫ কোটি হইতে ৪০ কোটি মুদ্রার লৌহ ভারতে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে লৌহের আকর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান এবং আকর

হইতে লৌহ নিষ্কাষণের জন্য যে কয়েকটী সমবায় আছে তাহাই যথেষ্ট নহে। এইরূপ কার্য্যে উপযোগী আরও অধিক সমবায়ের প্রয়োজন এবং যাহাতে আমাদের দেশীয় যুবকগণ উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হইয়া এই সমস্ত সমবায়ের পরিচালনার ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে পারেন সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধটী জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ তবে অসাবধানতা জনিত দুএকটী ক্রটী আছে যেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেখক বলিয়াছেন যে ভূতত্ব বিভাগের তাৎকালীন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, এন, বসু ময়ূরভঞ্জের লৌহ প্রস্তর ক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মিঃ বসু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর এই সুবিখ্যাত ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেখক মহাশয় অপর এক স্থলে স্ফটিক শব্দ quartzএর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু "স্ফটিক" এই শব্দটী crystal এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় "ভারতের বনভূমি" নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অরণ্য এবং অরণ্যজাত বৃক্ষ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে বনবিভাগ হইতে রাজ-সরকারের প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকা লাভ হইয়া থাকে এবং যদি ক্রমশঃ উচ্চ বেতনভোগী য়ুরোপীয় দিগের স্থলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনভোগী দেশীয় লোক নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে এই বিভাগ হইতে অনেক বেশী আয় হইবে। এই সম্বন্ধে যথাবিহিত করিবার জন্য জন-সাধারণ ও জননায়কগণকে লেখক মহাশয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রবাসী—চৈত্র ১৩৩১।

"সাঁওতালী গান" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয় কতকগুলি সাঁওতালী সেরেইএর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সাওতালদের সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক বিবরণ বাহির হইয়াছে কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকা সেই সমস্ত বিবরণের সহিত পরিচিত নহেন। এই হিসাবে কালীপদবাবুর প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক মহাশয় কয়েকটী গানের মূল পদগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত পদ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সাওতালী গানের উপর বাঙ্গালাভাষা নিজের প্রভাব অনেক পরিমাণে বিস্তৃত করিয়াছে, এবং দু এক স্থলে সুমার্জ্জিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :—

"অতি সুকুমার গায়,
চলিতে বাজিবে পায়।"

কথা সাহিত্য

বঙ্গবাণী—চৈত্র।

"স্যাঙ্গাগে" গল্পে একটি রাঁধুনী বামুনের সারল্য প্রতিফলিত হইয়াছে। উপসংহারভাগ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ভাবের দারিদ্র্য ও ঘটনাবলীর সম্যক সন্নিবেশে অক্ষমতা এই দুই দোষই পরিস্ফুট হইয়াছে।

"জীবনযাত্রা" গল্পটির ভাষা শিথিল, ভাব অস্পষ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থের গল্পে এক চোর আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সে কতকগুলি অলঙ্কার চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে নাই, কিন্তু বিবেকের প্রেরণায় সেগুলি ফেরত দিতে আসিয়া ধরা পড়িল। যিনি বিচারক তিনিই বহুকাল পূর্ব্বে, এই চোর যখন ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল, তখন তাহাকে ভিক্ষার্থী দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ভিক্ষার চেয়ে চুরি করাও ভাল। চোরের প্রতি পাঠকের একটু দয়া আসিতে পারে, কিন্তু সমাজনীতি মতে তাহার যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা নীতিজ্ঞের বিচার্য্য। মোপাসাঁর কোনও গল্পে এইরূপ একটি চোর বর্ণিত হইয়াছে। সে চোর ক্ষুধার্ত্ত এবং আপনার কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত নয়। এ গল্পের চোর দরিদ্র—আপনার কার্য্যের জন্য কতকটা অনুতপ্ত। তাহার বাচালতা অত্যধিক। কোন বিচারক আদালতে চোরকে এতটা বাচালতা প্রকাশ করিবার অবকাশ দেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

"জাগরণ" গল্পে একটি বালিকার অন্তরে নারীত্বের উন্মেষ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনায় কোন নিপুণতা বা বিশেষত্ব দেখিলাম না।

"মেঠো হাকিমের কড়চা"য় আসরকীর চিত্রটি উপভোগ্য। তবে রচনা দীর্ঘ এবং আখ্যানভাগের ক্রমবিকাশ ভাল করিয়া দেখান হয় নাই।

"নিশীথ রাতের ঘুম" রোজেটির একটি কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। লেখক অনুবাদ করিলেই ভাল করিতেন। ইংরাজী ভাব অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাবের অনুরূপ হয় নাই।

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের "কথার ফেরিওয়ালা"য় একটি অর্থলোলপ বরকর্ত্তার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই বরকর্ত্তাই কথার ফেরিওয়ালা। চিত্রটি উপভোগ্য। তবে রচনা দীর্ঘ, অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাও কম নয়।

প্রবাসী—চৈত্র।

শ্রীঅমিয় বসুর "সান্ত্বনা" মধুর ও করুণ। সান্ত্বনায় কোমল অন্তরের মাধুর্য্য পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। পরের ছেলের প্রতি ভ্রাতৃভাব খুব যে নূতন ব্যাপার তাহা নয়। তবে রচনাকৌশলের জন্য ইহা এই গল্পে বড়ই সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাঁহারা গল্পে আখ্যান বস্তুর অনুসন্ধানেই তৎপর, তাঁহারা এই রচনায় দেখিতে পাইবেন, রচনানৈপুণ্য থাকিলে অনেক সামান্য ঘটনাও সুন্দর চিত্রে রূপান্তরিত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় জুদারমানের মূল জার্ম্মাণ হইতে একটি নাটক অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদিত নাটকটির নাম "টৈয়া।" লেখকের যত্ন প্রশংসনীয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী "প্রেমের কাহিনী"তে মোপাসাঁর একটি গল্পের মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। ভাষা সর্ব্বত্র মোপাসাঁর গল্পের উপযোগী না হইলেও, প্রাঞ্জল।

কবিতা

বঙ্গবাণী—চৈত্র।

"বাতাস" কবিতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। এই কবিতাটি পড়িয়া আমরা মোটেই তৃপ্ত হইতে পারি নাই। তাঁহার নিকট হইতে আমরা নূতন বাণী শুনিতে চাই, তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য এখনও সমগ্র জগৎ উদ্‌গ্রীব।

"প্রচেতা" শ্রীকালিদাস রায় —কবিতার আকারে ও ছন্দে ইহা বঙ্গ-বাণীর তিন পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ রচনা। পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিশ্চয় কবিতার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। নতুবা এই দুর্বোধ্য রচনা প্রকাশিত হইল কেন? কবিতাটি আগাগোড়া সংস্কৃত বহুল শব্দের সমষ্টি ভিন্ন ইহাকে আর কিছুই বলা চলে না। নমুনা স্বরূপ দুই চারিটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রণমি যাদসাম্পতি রুদ্ররথী, নমি তব পায়
শিবরূপে প্রেয় দাও, শ্রেয়ঃ দাও তব চণ্ডিমায়।
ঊর্ম্মিরথে তব, উপপ্লব রথ-বল্গা ধর,
ছুটে সিন্ধুবাজি রাজি, উৎক্ষেপিয়া ফেনিল কেশর।
সীমরেখা হারাইয়া একাকার অষ্ট চক্রবাল
দিগ্বিজয় অভিযানে, পাশায়ুধ মহা দিক্‌পাল!"

"গোপন" শ্রীমতী সুনীতি দেবী। একটী ফরাসী কবিতার অনুবাদ। অনুবাদ মন্দ হয় নাই, তবে স্থানে স্থানে একেবারে গদ্য হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী লাইন উদ্ধৃত করিলাম।

"এমনি করে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল কথা,—
আমার এমন ভাগ্য শুনে গ্রামের যুবকদল
ঈর্ষ্যাকাতর প্রাণে তাদের পেলে বড় ব্যথা!
হাঁসল কিন্তু মুখের হাসি! এতও জানে ছল!

"আঁধার" কবিতা—কবির নাম নাই। অর্থহীন শব্দের ঝঙ্কার মাত্র।

"প্রতিধ্বনি"—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের রস বর্জ্জিত কবিতা। এটীকে কবিতা না বলিয়া রহস্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। কবি সত্য বলিয়াছেন

"দুখ দিয়া প্রাণ কেন গড়িয়াছ, ওগো ভগবান্?"

"ছিটে-ফোঁটা" কবিতা, কবির নাম নাই। ইহাতে বেশ একটু হাস্যরস আছে।

প্রবাসী—চৈত্র।

"ঝড়" কবিতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। ইহা একটী সুন্দর কবিতা। কবি বলিয়াছেন, তীরে দাঁড়াইয়া অনর্থক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া পলাইলে চলিবে না। যে ঝড় ঝঞ্ঝা আনে, বন্যা আনে, মৃত্যু আনে, বজ্রের গর্জ্জন আনে, এ ঝড় সে ঝড় নয়। এ ঝড় মেঘ-মন্দ্রে, অভয়ের অভয়-বার্ত্তার কথাই বলে।

কবি গাহিয়াছেন,

"আমি সে যে প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে,
রুদ্রের নিশ্বাস।
"বলে সে বক্ষের কাছে
আছে আছে পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত—
তুমি পান্থ, আমি পান্থ।
জয় জয় জয়।

সংসার বন্ধনের মধ্যে নানাবিধ বিপদ ঝঞ্ঝায় পড়িয়া পথভ্রান্ত হইও না। এখানে দিবারাত্রি মায়া মোহের অহঙ্কারের প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত। তাই কবি বলিতেছেন—

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে,—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে
এ দেখি প্রলয়।"
ঝড় বলে—"ভয় নাই
যাহা দিতে পারো তাই
রয়, রয়, রয়।

মনুষ্য-জীবন ধারণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে যাহা করিবে তাহাই তোমার রহিবে। সেই কর্ম্মই তোমাকে সংসারে ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সেই পরম আত্মীয়ের অভয় চরণে সমুপস্থিত করিবে।

"আনাতোল ফ্রাঁস" কবিতা, শ্রীকালিদাস রায় রচিত। ইহা একটা বিশেষত্ব বর্জ্জিত কবিতা।

"বাদল প্রিয়া" কবিতা, লেখক শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত। ইহা কতকগুলি মিষ্ট শব্দের প্রদর্শনী। এ কবিতায় যাহা খুঁজিবেন তাহাই পাইবেন। কবি "কাজল দেশের স্বপন সখী" কে ডাকিয়াছেন এবং কিভাবে স্বপন সখীকে আসিতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে ভোলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"আয়লো মৃদুল দোদুল পায়।"

দোদুল পায়ে চলা একটা বড় কসরৎ—অভ্যাস না থাকিলে হাত-পা ভাঙ্গিবার খুবই সম্ভাবনা!

"নারী" কবিতা, লেখক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। এই জঘন্য রুচির কবিতা কেমন করিয়া প্রবাসীর মত কাগজে স্থান পাইল তাহা ভাবিবার বিষয়!

"আকন্দ" কবিতা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতা। কবিতা-রস-পিপাসু পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করি। বহুদিন এমন সুন্দর কবিতা আমরা পাঠ করি নাই। ভাষায় ভাবে ও ছন্দে, সৌন্দর্য্য সর্ব্বদিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অবজ্ঞাত; কবিজন-উপেক্ষিত আকন্দ পুষ্পকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিয়া কোন কবি তাহাকে অভিনন্দন করিয়াছেন কি না জানি না। অনাদৃত আকন্দকে কবি কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই শুনুন।

"আকাশের এক বিন্দু নীলে
তোমার পরাণ ডুবাইলে,
শিখে নিলে অনন্তের ভাষা!
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালবাসা।
দেবতার প্রিয় তুমি গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ,
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ॥

"আগমনী" কবিতা, লেখক শ্রী—। এই কবিতাটিতে কবির অন্তরের নিজস্ব বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা আমাদের সনাতনী আগমনী নয়। ব্যক্তি বিশেষের বেদনা যদি সাধারণের বেদনারূপে পরিস্ফুট হইতে না পারে তাহা হইলে তাহা সাহিত্যের আসনে কোনদিন স্থান পাইবার যোগ্য নয়। ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ বেদনা সমালোচনা করা উচিত নয়।

ভারবর্ষ—চৈত্র।

"দরিদ্রতা" শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ রচিত কবিতা। কুমুদরঞ্জনের এ রচনাটি সার্থক হয় নাই।

কপোতাক্ষী তীরে—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণের ইহা একটি বিশেষত্ব বর্জ্জিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা। এই সংখ্যায় মৌলবী গোলাম মুস্তাফা বি-এ বি-টির "ভোরের আলো" কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। ছন্দের নূতনত্ব আছে! ইহা আরবী মোজরাহ ছন্দে রচিত। বর্ত্তমান সংখ্যায় আর যে কয়টি কবিতা আছে তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

সতী

(গল্প)

চৌরঙ্গি অঞ্চলে, বিলাত-ফেরৎ-গণের এক ক্লাবের বারান্দায় বসিয়া চারি বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। সকলেই প্রায় সমবয়স্ক, তবে কেহই চল্লিশের নীচে নহেন। সকলেই খ্যাতি, মান ও বিত্ত সঞ্চয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আজ এই ক্লাবে, একটা উৎসব ছিল। সে

ওদের চেননি, আমি ওদের হাটহদ্দ বুঝে নিয়েছি। তুমি কি ভাব বার্থা তোমার প্রেমে জর জর হয়েছেন?"

"অন্ততঃ আমি হয়েছি। তিনিও যে আমায় ভালবাসেন, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি প্রোপোজ করলে বোধ হয় তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

আমিও ব্যঙ্গভরে বলিলাম, "নিশ্চয়ই করবেন না। তুমি যে একজন বহু লক্ষপতির সন্তান, তা শ্রীমতী জানতে পেরেছেন যে! তুমি যেমন নির্ব্বোধের সর্দ্দার, পড়েছ একজন এডভেঞ্চরেসের হাতে, আর মনে করছ তিনি বুঝি একজন সীতা বা দময়ন্তীই হবেন। আমার কথা না শুনলে শেষে তোমার নাকের জলে হতে হবে তা তোমায় বলে দিচ্চি ভায়া!"

ধীরেন গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, আমার সঙ্গে আর কোনও কথা কহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরস্পরকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া, আমরা নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন প্রাতরাশের পর, সাড়ে নয়টার ট্রেণে আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

৩

তিনমাস পরে ধীরেনের পত্রে জানিলাম, সেই গর্দ্দভ, কুমারী বার্থাকে প্রোপোজ করিয়াছে—বসন্তের মধ্যভাগে মে মাসে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়। পত্রখানি পড়িয়া রাগে সেখানা মুচড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। আপন মনে বলিতে লাগিলাম—একটা মাস এগিয়ে ১লা এপ্রিল বিবাহ হলেই ভাল হত—"সকল মূঢ়ের দিন"-টাই তোদের বিবাহের পক্ষে সুপ্রশস্ত।

শীত ফুরাইল, বসন্তকাল আসিল। কৈ, ধীরেনের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ত এখনও আসিল না! আমার উপর সে যা চটিয়াছে, বোধ হয় আমায় নিমন্ত্রণই করিবে না।

নিমন্ত্রণ পত্র আসিল না—কিন্তু একদিন এক টেলিগ্রাম আসিল। সর্ব্বনেশে টেলিগ্রাম। বার্থা টেলিগ্রাম করিয়াছে—"ধীরেন সাংঘাতিক পীড়িত। সে তোমার দেখিতে চায়—শীঘ্র এস।"

সেইদিনই সন্ধ্যার পর, গ্লাডষ্টোন ব্যাগে খানকতক কাপড় চোপড় পুরিয়া, আমি 'স্কচ্ এক্সপ্রেসে' গ্লাসগো যাত্রা করিলাম।

পরদিন বেলা ১০টার সময়, গ্লাসগোতে নামিয়া, ক্যাব লইয়া, সোজা বার্থার ঠিকানায় গিয়া পৌছিলাম। দরজার কড়া নাড়িতে, একটা লালমুখী মোটা মাগী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, "তুমি কি মিষ্টার ডাট্? আমার কন্যা বার্থা কি তোমায় টেলিগ্রাম করিয়াছিল?"

ও হরি! এই বুঝি বিবি ম্যাক্জন? আমি ভাবিয়াছিলাম এ বাড়ীর দাসী। টুপী তুলিয়া বলিলাম, "হাঁ, মিস্ বার্থার টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি আসিয়াছি। তিনি কোথায়?"

বিবি ম্যাকজন বলিলেন, "ভিতরে আসুন, বলিতেছি।"—আমাকে ড্রয়িং রুমে লইয়া গিয়া বসাইয়া বলিলেন, "বার্থা হাঁসপাতালে। মিষ্টার ঘোষাল সেখানে বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী—বার্থাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে।—আমি মেয়েটাকে কত নিষেধ করিয়াছিলাম, মিনতি করিয়াছিলাম, রাগ করিয়াছিলাম,—বলিয়াছিলাম, মিষ্টার ঘোষাল লক্ষপতির সন্তান, তাঁহার ত টাকার অভাব নাই—উচ্চ বেতনে ভাল ভাল নার্স নিযুক্ত করিয়া দাও—না হয় আমিও কিছু সাহায্য করিব—ও সব ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—

দেখিলাম বক্তৃতা দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা; বাধা দিয়া বলিলাম, "ঘোষাল এখন কেমন আছেন, আপনি জানেন কি?"

বিবি ম্যাকজন্ বলিলেন, "কাল বিকালেও আমি সংবাদ লইতে গিয়াছিলাম। হাউস্ সার্জ্জন বলিলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি আরও বলিলেন, 'তোমার মেয়ে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবা করিতেছে'—তার ধৈর্য্য

তার সহিষ্ণুতা তার বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিলেন; আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন, যথেষ্ট সাবধানতা লওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি রোগের বীজ বার্থার শরীরেও সংক্রামিত হওয়া কিছুই বিচিত্র কহে। মিষ্টার ড্যাট—আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; এখন চলুন, দু'জনে যাই,—দুইজন বা তিন জন ভাল ভাল বহুদর্শী নার্স নিযুক্ত করিয়া, বার্থাকে বুঝাইয়া, তাহাকে নিরস্ত করি—নহিলে,—নহিলে,—বার্থাকে যদি ঐ রোগে আক্রমণ করে—তবে আমার কি হইবে!"—বলিয়া বৃদ্ধা, চোখে রুমাল দিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, যাই চলুন। আমার ব্যাগটা দয়া করিয়া এখন আপনার গৃহে রাখুন, ফিরিয়া, একটা বাসা ঠিক করিয়া উহা লইয়া যাইব।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ব্যাগ দিন, দয়া করিয়া দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি কাপড় বদলাইয়া আসিতেছি। আপনার জন্য এক পেয়ালা চা ও কিছু প্রাতরাশ পাঠাইয়া দিব কি?"

আমি বলিলাম, "না, ধন্যবাদ। প্রাতরাশ আমি ট্রেণেই শেষ করিয়াছি।"

বৃদ্ধা ব্যাগ লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, পূর্ব্বে যাহা মনে করিয়াছিলাম, ধীরেন বহু লক্ষপতির সন্তান শুনিয়াই বার্থা তাহাকে জালে ফেলিয়াছে—সে ধারণা দেখিতেছি ভুল। আসল ভালবাসা না থাকিলে নিজের জীবন কেহ সঙ্কটাপন্ন করিতে পারে না এ কথা সুনিশ্চিত।

দশ মিনিট পরে, বৃদ্ধা নামিয়া আসিলেন। রাস্তায় বাহির হইয়া ক্যাব লইয়া আমরা হাঁসপাতালে গিয়া পৌঁছিলাম।

হাউস সার্জ্জন সাহেবের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "ঘোষালের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই যাইতেছে। জীবনের আশা খুবই কম।"

বার্থার মা বলিলেন, "আমার মেয়ের কি হইবে, ডাক্তার? তার রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? ঈশ্বরের দোহাই, ডাক্তার, আমার মেয়েকে রোগীর নিকট হইতে তাড়াইয়া দাও। নহিলে সেও বাঁচিবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি সাবালিকা। স্বেচ্ছায় না গেলে, আমরা ত জোর করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে পারি না।"

"তাকে খুব ভয় দেখাও। বল, এই বেলা তুমি সরিয়া পড়, নহিলে তুমি শুদ্ধ মরিবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে ভয়ও দেখাইয়াছি, কোনও ফল হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, উনি আমার স্বামী এবং উনি হিন্দু। উনি যদি মরেন, আমি নিজেকে হিন্দু বিধবা বলিয়া মনে করিব—এবং সতী হইব।"

বিবি ম্যাকজন্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? 'সতী' হইব কি?"

ডাক্তার সাহেব, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই না মিষ্টার ডাট্?"

আমি বলিলাম, "তাই বটে।"

শুনিয়া বিবি ম্যাকজন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"Oh, how foolish! How horrible!" (উঃ—কি মূঢ়তা! কি ভয়ঙ্কর!)—হায় হায়, কি হইবে ডাক্তার? রোগী যদি মরে, বার্থা যদি তার সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়া মরিতে চায়, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে! আমার যে একগুঁয়ে মেয়ে, সব পারে ও! উহা নিবারণের কি কোনও উপায় নাই, ডাক্তার?"

ডাক্তার বলিলেন, "যথেষ্টই আছে। আমাদের আইনে উহা চলিবে না। আত্মহত্যা চেষ্টা করিলে পুলিস গিয়া বাধা দিবে।"

"Thank God!"—(ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)—বলিয়া বৃদ্ধা একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

আমাদের সেখানে রাখিয়া, ডাক্তার রোগীকে দেখিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া রোগী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করিবেন চলুন—কিন্তু আধঘণ্টা মাত্র।"

বসন্ত-রোগীর সান্নিধ্যে কাহাকেও লইয়া যাইতে হইলে

যে সকল প্রক্রিয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা করিয়া, ডাক্তার আমায় ধীরেনের কক্ষে লইয়া গেলেন। তার সারাদেহ কম্বলে ঢাকা—কেবল মুখ খানি বাহির হইয়া আছে। সে মুখ আমি চিনিতে পারিলাম না—বসন্ত গুটিকায় তাহা আচ্ছন্ন। দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল; কিন্তু রোগীর সাক্ষাতে অশ্রুপাত করা অন্যায় বিবেচনায় কষ্টে আমি উহা সম্বরণ করিলাম।

ডাক্তার সাহেব বার্থাকে বলিলেন, "মিস্ ম্যাকজন, তুমি চল, স্নানাদি করিয়া, তোমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। *তিনি তোমায় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"*

বার্থা, ধীরেনের শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি ত ততক্ষণ তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা কও, প্রিয়তম, আমি শীঘ্রই আবার আসিতেছি।"

ক্ষীণস্বরে ধীরেন কি বলিল আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না। বার্থা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ, ধীরেন?"

ধীরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "আর, কেমন আছি ভাই! আমার দিন ত ফুরিয়ে এসেছে! বড় জোর আর একদিন কি দু'দিন বোধ হয়?"

আমি বলিলাম, "নন্‌সেন্স! ও কি কথা? তুমি ভাল হবে। ২।১ দিনের মধ্যেই বোধ হয় একটু সুরাহা হবে।"—মুখে বলিলাম বটে কিন্তু বুকে জোর পাইলাম না।

ধীরেন বলিল, "সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমি গেলে আমার বাপ মার কি হবে? তাঁদের না হয় অন্য পুত্রকন্যা আছে—কিন্তু বার্থার কি হবে?"

বলিলাম, "শুনলাম, উনি যেমন তোমার সেবা করছেন, তেমন সেবা মা কিম্বা স্ত্রী ছাড়া বোধ হয় আর কেউ পারে না।"

ধীরেন বলিল, "বেশী বেশী। কোথায় মনে করেছিলাম, আর মাসখানেক পরে ওকে বিবাহ করে সুখী হব—তা না হয়ে, হল কিনা চিরবিদায়ের ব্যবস্থা!"

আমি মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। শেষে বলিলাম, "ভাই, ছ'মাস পূর্ব্বে তুমি যখন প্রথম ওঁর কথা আমায় বলেছিলে, তখন ওঁর সম্বন্ধে আমি যে সকল নিষ্ঠুর ও অপমানকর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম, এখন দেখছি তা ভুল—মহা ভুল। সে জন্যে তুমি আমায় মাফ্ কর ভাই।"

ধীরেন বলিল, "এ দেশে যেমন পাঁচটা আমরা দেখি, সেই অনুসারেই তুমি বলেছিলে, তোমার দোষ কি? তুমি ত জানতে না। আর, ওর *যে এত গুণ, তা আমিই কি তখন সব জানতাম? ওকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে আমার মা বাপ আত্মীয় স্বজন বিরক্ত হবেন শুনে, ও কি বলেছিল, জান? ও বলেছিল, আমি ত সেখানে গিয়ে মেমের মত থাকব না। তোমার* বোনেদের ছবিতে যেমন দেখেছি, আমি সেই রকম শাড়ী পরবো, সিন্দূর পরবো, হাতে খাব, খালি পায়ে বেড়াব—তা হলেও কি আমি তাঁদের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারব না?—সবই হল। শাড়ী শাঁখা সিঁদুর সবই পরা হল।"—বলিতে বলিতে ধীরেনের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেবের নিকট বার্থা যে 'সতী' হইবার কথা বলিয়াছিল, সে কথা ধীরেন ত শোনে নাই, ভাবিলাম এখন উহাকে বলি। তার পর আবার মনে হইল, সে কথা বলিয়া উহার যাতনা বাড়াইয়া আর ফল কি?

একটু শান্ত হইয়া ধীরেন বলিল, "ভাই, দুটি কাযের জন্যে তোমায় ডেকেছি। প্রথম, আমার মৃত্যু হলে, এরা যেন আমার কবর না দেয়। লণ্ডনে যে ক্রিমেটোরিয়ম্ আছে, আমার কফিন সেইখানে নিয়ে গিয়ে দাহ কোর। দ্বিতীয় কথা, ব্যাঙ্কে আমার এখনও পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর জমা আছে। বাসায় আমার ওয়ার্ডরোবের দেরাজে আমার চেক বই আছে। দু' তিনখানা চেক আমার সই করাও আছে। অন্ত্যেষ্টি খরচ দুই একশো পাউণ্ড যা লাগে তা বাদে, সমস্ত টাকার চেক লিখে বার্থাকে দিও। এই দুইটি কাযের জন্যেই বিশেষ করে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আর, দেশে ফিরে গিয়ে, আমার মা

বাপকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিও। আর কি বলবো?”—আবার তার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেব এই সময়ে আসিয়া বলিলেন, “মিষ্টার ডাট্‌, অর্দ্ধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করেন ত বিকালে আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারেন।”

ধীরেনের দিকে চাহিয়া বলিলাম, “এখন তা হলে আসি ভাই।”—বলিয়া উঠিলাম।

করিডরে যাইতে যাইতে দেখিলাম, স্নান সারিয়া, তপস্বিনী গৌরীর মত, বার্থা রোগীকক্ষ অভিমুখে যাইতেছেন। আমি টুপী তুলিলাম,—কেবলমাত্র এটিকেট্‌ রক্ষার জন্য নহে,—তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার বুক ভরিয়া গিয়াছিল।—নীরবে আমি তাঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিলাম।

৪

আর তিনটি দিন মাত্র ধীরেন জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, সেই কাল ব্যাধি, বার্থার শরীরেও আত্মপ্রকাশ করিল।

আমি তৎপূর্ব্বেই ধীরেনের চেকবই হইতে দুইখানি চেক কাটিয়া রাখিয়াছিলাম। একখানি অন্ত্যেষ্টি ব্যয় জন্য, অপরখানি বার্থার নামে। ধীরেনের মৃত্যুর পরদিন বার্থার চেকখানি আমি ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়া যথাকর্ত্তব্য তাঁহাকেই করিতে বলিয়াছিলাম।

পরদিন বার্থার সঙ্গে গিয়া আমি দেখা করিলাম।

বার্থা জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কবে লণ্ডনে ফিরিবেন?”

বলিলাম, “তোমাকে আরোগ্যের পথে দেখিয়া, তারপর আমি লণ্ডনে যাইব।”

বার্থা একটু মৃদু হাসিল। বলিল, “ধীরেনের কফিন ভাল জায়গায় আছে ত?”

“আছে।”

“দেখুন, আমি মরিলে, আমাকেও কেহ যেন কবর দেয় না। আমিও দাহ হইব। এবং—বুঝিলেন?”

আমি বলিলাম, “বুঝিয়াছি। ঈশ্বর করুন, তাহা যেন আমায় না করিতে হয়। আপনি ভাল হইয়া উঠুন।”

বার্থা বলিল, “ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, দেখাই যাউক। দেখুন, ধীরেনের সেই চেকের কথা। যদি আমি বাঁচি, ও চেক আমি লইব; যদি না বাঁচি, তবে ঐ টাকা এই হাঁসপাতালে, ধীরেনের স্মৃতিরক্ষার্থ দিয়া যাইব। ডাক্তার সাহেবকে আমি সে কথা বলিয়াছি।”

প্রতিদিন আমি গিয়া বার্থার সংবাদ লইতাম। সপ্তম দিনে, বার্থার আত্মা, তার প্রিয়তমের আত্মার অনুসন্ধানে অনন্তের পানে ছুটিল।

পরদিন রাত্রের ট্রেণে, একযোড়া কফিন বুক্‌ করিয়া, একই ভ্যানে, পাশাপাশি রাখাইয়া লণ্ডনে লইয়া গেলাম। ক্রিমেটোরিয়মের অধ্যক্ষকে যাত্রার পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। অপরাহ্ণ কালে লণ্ডনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে তাহাদের শববাহী গাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সেই গাড়ীতে, উভয় কফিন লইয়া, দাহগৃহের একটি লৌহময় চেম্বারের মধ্যে দুটিকে পাশাপাশি স্থাপন করাইয়া, ফুল কিনিতে গেলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। শ’ খানেক টাকার ফুল ও মালা কিনিয়া আনিয়াছিলাম, কফিন দুইটির উপর সেগুলি সাজাইয়া দিলাম। তার পর, চেম্বারের লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল। অধ্যক্ষ, বিদ্যুৎগৃহে প্রবেশ করিয়া, সুইচ্‌ টিপিয়া দিলেন।

“এইবার তোদের ফুলশয্যা হোক্‌”—বলিয়া, চোখে রুমাল দিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

*   *   *   *

দত্ত সাহেবের কাহিনী যখন শেষ হইল, তখন রাত্রি প্রায় ১টা। “বাই জোভ!—এত রাত হয়েছে?”—বলিয়া শ্রোতৃগণ উঠিলেন। নীচে নামিয়া, নিজ নিজ মোটর আরোহণে, ক্লাব ত্যাগ করিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

স্বর্ণ মন্দির।

উপন্যাস। শ্রীব্যোমকেশ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা রোজ প্রিণ্টীং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ১০৪।৩ বলরাম দের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৪২ পৃঃ, কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৷০।

ব্যোমকেশবাবু একে একে অনেকগুলি উপন্যাস লিখিলেন; আমরা তাহার ২১ খানির এই স্তম্ভে সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রশংসাও করিয়াছি—সেগুলি গার্হস্থ্য উপন্যাস। এখানি গার্হস্থ্য চিত্র হইলেও, ইতিহাস-গন্ধী। ইহাতে বিক্রমপুর রাজ্যের রাজধানী শ্রীপুরের কথা আছে, সোণার গাঁও অধিপতি নবাব ঈশাখাঁর কথা কথা আছে, যুবরাজ কেদার রায়ের কথা আছে। গল্পটি বেশ জমিয়াছে, নায়িকা "মানসী"র চরিত্রটি আমাদের নিকট বড়ই সুন্দর ও মিষ্ট লাগিল।

শ্রীশ্রীদুর্গার দকারাদি সহস্র নাম।

পুঁথির আকারে মুদ্রিত। সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন, লালগোলা (মুর্শিদাবাদ) মূল্য ।৶০

স্তোত্রটি কুলার্ণব তন্ত্র হইতে সংগৃহীত, এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ইহা ভক্তগণের নিকট সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। কেবল মূল সংস্কৃতটুকুই আছে—একটু ব্যাখ্যা থাকিলে সাধারণের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইত।
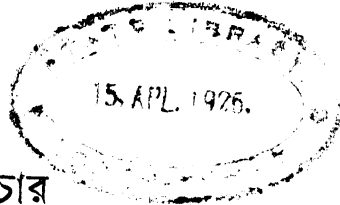
সাহিত্য-সমাচার

আমাদের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত "যক্ষ বা লামার দেশ" প্রবন্ধের ৬ পৃষ্ঠায় ছবির নিম্নে মুদ্রিত "লেপচা" মহিলা স্থানে "নেওয়ার" মহিলা হইবে; এবং চিত্র গুলি যে শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তাহাও স্বীকার করিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের "সীতা ও সরমা" গ্রন্থের সংশোধিত ৩য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে, মূল্য ১৷০ মাত্র। প্রকাশক—মেসার্স এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিগত ৯ই ও ১০ই এপ্রিল তারিখে ঢাকা মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মূল সভার সভাপতি ছিলেন—মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়; সাহিত্য-শাখার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ইতিহাস শাখার শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার; দর্শন শাখার শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং বিজ্ঞান-শাখার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী।

বিগত ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র বাঁশবেড়িয়া গ্রামে "হুগলি জেলা পাঠাগার সম্মিলনী ও প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী জমিদার বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী এম-এ, বার-এট-ল মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। হুগলি জেলার পাঠাগার সমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটি স্থায়ী সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য—জেলার সাধারণ পুস্তকাগার গুলির উন্নতি বিধান।

কলিকাতা
১৬।১ এ বিডনষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৭শ বর্ষ | ১ম খণ্ড — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ — ১ম খণ্ড | ৪র্থ সংখ্যা

অগ্নি

সৃষ্টিতত্ত্বে অগ্নি

উপনিষৎ উপদেশ করে—চক্ষুর্দৃশ্য পদার্থের মধ্যে অগ্নি সর্ব্বপ্রথম পদার্থ। মনুর মতে অপ্ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। মনু জলকেই অগ্নির জনক বলিয়াছেন, এই উক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই 'অপ্' সাধারণ জল নয়। ইহা ভূতসমূহের সম্মিলিত তরলাবস্থা। শাস্ত্রে বহু স্থলে ইহাকেই কারণবারি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদ্ বলে, অগ্নিই জলের জনক। বেদান্ত-মতে বায়ু অগ্নির জনক।

কঠোপনিষদে 'লোকাদিং অগ্নিম্' বলিয়া যে অগ্নির উল্লেখ আছে তাহা এই স্থূল অগ্নি নহে। সেই অগ্নি হিরণ্যগর্ভ বা প্রথম শরীরী।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষাত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত......" বলিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম হইতে তেজ বা অগ্নির উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছে; ইহা দ্বারাও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে স্থূল অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না; কেন না, শ্রুতির সকল স্থলেই আকাশাদিক্রমে ভূতের উৎপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে প্রাণ, মন ও আকাশাদি সৃষ্টির পরই অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এখানে তৎ-শব্দে তেজের কারণ যে 'বায্যাত্মা' তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে যে এখানে জগতের কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া ভূতের মধ্যে প্রথমে তেজেরই উল্লেখ করা হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এখানে 'দৃশ্যমান (অর্থাৎ যাহা চোখে দেখা যায়) জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দৃশ্যমান জগতের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজোময় জগতের মূল কারণ—তেজ বা অগ্নি।

মনু প্রথমেই জলের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। ইহা মনুর স্বকপোল-কল্পিত কথা নয়। শ্রুতিতেও ইহা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছে—'সোঽর্চ্চন্নচরত্তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্ত।' মনু তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। এখানে বুঝিতে হইবে, এই জল-সৃষ্টি ক্ষিতি বা পৃথিবীর পূর্ব্বসৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে প্রথম

সৃষ্টি নয়। সকল শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, জল সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণাদিক্রমে যে সৃষ্টিক্রম শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে এখানে জলসৃষ্টিতেও সেই ক্রমই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জলের পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্ন্যাদি প্রাণান্ত সৃষ্টি ইহার অন্তর্ভূত। তবে পৃথিবীর কারণ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া শ্রুতি এখানে সেইগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এই জন্যই জলেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ-গুলির উল্লেখ করেন নাই।

শ্রুতির অনেক স্থলে প্রথমেই জল সৃষ্টির কথা উল্লিখিত আছে। সকল স্থলেই যে পৃথিবীমাত্রের কারণ-নির্দ্দেশই শ্রুতির অভিপ্রেত তাহা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, সৃষ্টির আদিভূত জলসৃষ্টি যে ভূত-ভৌতিক জলসৃষ্টি তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। সকল ভূতের অসংহত অবস্থা ক্রমে সংহত হইয়া সমস্ত বিশ্বে পরিণত হইয়াছে, শাস্ত্রে অনেক স্থলে যাহাকে কারণার্ণব বলা হইয়া থাকে, সেই কারণবারি বা অসংহত ভূতরাশিকেই লক্ষ্য করিয়া সকল স্থলে শ্রুতিতে 'অপ্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কাজেই সকল ভূতের সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই অপ্ বা কারণ-সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত।

প্রথম শরীরীর নাম অগ্নি কেন ?

মহাপ্রলয়ে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন কোন গুণেরই কোন ক্রিয়া হয় না। তারপর যখন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন প্রথমেই রজঃশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। রজের উদ্বোধ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর নয়; কারণ, ক্রিয়া রজেরই মূর্ত্তি। আর ক্রিয়া না হইলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সৃষ্টিও সম্ভবপর নয়। কাজেই সাম্যাবস্থার ভিতর দিয়াই রজঃ বা ক্রিয়াশক্তিরই প্রথম উদ্বোধ হয়। এই যে উদ্বুদ্ধ রজঃপ্রধান কারণ-শরীর ইহাই প্রথম শরীর। ইহাই হিরণ্যগর্ভ। আর ইহাকেই অগ্নি বলা হইয়াছে। ইহাকে অগ্নি বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। আমাদের মনে হয়, রজোগুণ তাপস্বরূপ। আর অগ্নিও রজঃ-প্রধান বলিয়া তাপময়। রজোগুণের পরিচয় দিতে হইলে তাপ-জনকতা হিসাবেই রজোগুণের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। স্থূল জগতে অগ্নি তাপজনক বলিয়া এই হিসাবে সূক্ষ্ম প্রথম শরীরীকে রজঃপ্রধান বলিয়া অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়।

ঋগ্বেদের ঋষি ও অগ্নি

ঋগ্বেদে দশটী মণ্ডল। প্রথম ও দশম মণ্ডল বিভিন্ন বংশের ঋষিগণের দ্বারা উদ্গীত। দ্বিতীয় মণ্ডলে শুধু একজন ঋষির সূক্ত আছে—ঋষির নাম গৃৎসমদ। তৃতীয় মণ্ডলে কেবল বিশ্বামিত্রেরই সূক্ত। বামদেব চতুর্থ মণ্ডলের এবং অত্রি পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। ভরদ্বাজ ষষ্ঠ এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। অষ্টম ও নবম মণ্ডলের বাণী যথাক্রমে কণ্ব ও অঙ্গিরার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। এই যে এক একজন ঋষির নাম করিলাম, এই সমস্ত ঋষি বলিতে শুধু ইঁহাদিগকে বুঝায় না, ইঁহাদের বংশকেও বুঝায়।

প্রত্যেক মণ্ডলের সূক্তগুলি ঋষি-সম্বোধিত দেবতাদের ক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ক্রম হিসাবে অগ্নির প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তগুলি প্রথম স্থান অধিকার করে; তারপর ইন্দ্রের প্রতি আরাধিত সূক্তের স্থান; অতঃপর অন্য দেবতার প্রতি ঈরিত বাণীর স্থান। প্রথম আটটী মণ্ডলে প্রধানতঃ এই ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। কেবল সোমস্তুতিতেই নবম মণ্ডল পরিপূর্ণ—সাম-সংহিতার সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ, আর দশম মণ্ডলের সহিত অথর্বসংহিতার আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐতরেয় আরণ্যক এবং আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখা যায়, কয়েকজন ঋষি ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন; আবার জনকয়েক ঋষি অগ্নির স্তুতি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকেই প্রধান করিয়াছেন। ইন্দ্র-স্তুতিকারক ঋষিগণের মধ্যে আঙ্গিরস সব্য ইন্দ্রের প্রধান উপাসক;

আর অগ্নি-স্তুতিকারক ঋষিগণের মধ্যে শাক্ত্য পরাশরকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

কুৎস

কুৎস ঋষি নবম মণ্ডলের ঋষি অঙ্গিরার বংশোদ্ভব। ইনি অগ্নি ও ইন্দ্রকে এক করিয়াছিলেন। অঙ্গিরা অগ্নি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কুৎস অগ্নিকে প্রধান করিয়া ইন্দ্রকে অগ্নির অন্তর্গত করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইন্দ্র ও অগ্নির কার্য্য একই। ইন্দ্র পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন। কেমন করিয়া করেন? তিনি সমস্ত পদার্থ হইতে রস আকর্ষণ করেন। সেই রসকে ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট করিয়া মেঘাকারে পরিণত করেন। পরে সেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া পৃথ্বীকে শস্যশালিনী করেন। (মেঘগণ অগ্নির মাতা; কারণ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ অগ্নিরই একটী রূপ-বিশেষ।) কুৎস অগ্নিকে ইন্দ্রের মধ্যে এবং ইন্দ্রকে অগ্নির মধ্যে দেখিয়াছেন। অগ্নি ইন্দ্রের এক রূপ, সূর্য্য ইন্দ্রের অপর রূপ। তিনি সূর্য্যরূপে আকাশে ও অগ্নিরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করেন।

যখন বজ্রপাত, বৃষ্টিপতন হয়, নক্ষত্রের বিমল ঔজ্জ্বল্য বা সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি প্রকাশ পায়, তখন তন্মূলে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে যেমন ইন্দ্রশক্তি বলা যায়, তেমনই আবার অগ্নিশক্তিও বলা যায়। কুৎসের অত্যুচ্চ ঔদার্য্যে ইন্দ্রশক্তি ও অগ্নিশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সব্য ইন্দ্রকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, পরাশর অগ্নিকে সেই ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। অগ্নি যে শুধু পার্থিব অগ্নি তা নয়। তিনি আকাশেও বিরাজ করেন, বায়ুমণ্ডলেও অবস্থিতি করেন। যেখানে যত শক্তির কার্য্য, পরাশর সেই সমস্তের মূলে অগ্নিকে দেখিতেছেন। কাজেই সব্য ঋষির ইন্দ্র ও পরাশরের অগ্নির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে না। সব্যের চিন্তা ইন্দ্রের ও পরাশরের চিন্তা অগ্নির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে কুৎস তৎফলে অগ্নি ও ইন্দ্রের সমীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যখনই সব্যের ইন্দ্র ও পরাশরের অগ্নি তাঁহার স্তম্ভিত বিমুগ্ধ হৃদয়ে সম্মিলিত হইলেন, তখনই তিনি বিদ্যুতের প্রোজ্জ্বল জ্যোতির সঙ্গে বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ মিশাইয়া গান করিলেন—

চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহনা উতস্থঃ।
তাবিংদ্রাগ্নী সধ্র্যংচা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা
বৃষেথাং॥ ১।১০৮।৩

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের কল্যাণকর নাম দুটী একত্র সম্মিলিত করিয়াছে; হে বৃত্রহন্তৃদ্বয়! তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এক সঙ্গে বসিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদের উদরে সেচন কর।

কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বুঝায়; সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।

দীর্ঘতমা—গৃৎসমদ

কুৎসের পর দীর্ঘতমার আবির্ভাব। এই ঋষিও অগ্নির উপাসক। আদিত্যরূপ অগ্নি ইঁহার উপাস্য। এই অগ্নির মধ্যে ইনি শুধু ইন্দ্রকে কেন, মিত্র, বরুণ, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতিকেও দেখিয়াছেন। দীর্ঘতমা আদিত্য-রূপী অগ্নিকে জন্মরহিত ও এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দেবকে তিনি অগ্নির মধ্যেই দেখিয়াছেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ দীর্ঘতমার পথ অনুসরণ করিয়া অগ্নির মধ্যে ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও ত্বষ্টাকে দেখিয়াছেন।

তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র, ও তাঁহার বংশোদ্ভব ঋষিগণ অগ্নির উপাসক। ইঁহারা অগ্নিকে প্রধান করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক। বিশ্বামিত্র উক্তি করিয়াছেন—অগ্নি সর্ব্বজ্ঞ, চিত্তবান্, চেতনাবান্ ও জগৎপতি। অগ্নি সকল দেবতার পূজ্য ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি বলিতেছেন—

"ত্রীণি শতা-ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ
দেবা ন চাসর্পয়ন্।" ৩।৯।৯

৩৩৩৯ দেবতা অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।

ষষ্ঠমণ্ডলের ঋষি ভরদ্বাজও অগ্নি-উপাসক। তিনি অগ্নির যজ্ঞ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতিহৃদয়
আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু
নূ মলিষ্যে॥" ৩।৯।৬

(তোমার গুণ শুনিবার জন্য) আমার কর্ণ এবং (তোমার রূপ দেখিবার জন্য) আমার চক্ষু ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে যে (বুদ্ধিস্বরূপ) জ্যোতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাও তোমার স্বরূপ জানিবার জন্য (উৎসুক) হইয়াছে, দূরস্থ বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত আমার মন তাঁহারই দিকে ধাবিত হইতেছে। আমি কেমন করিয়া (বৈশ্বানরের) স্বরূপ বলিব? আর কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিব?

আবার তিনি ইন্দ্রেরও বীর্য্যে আস্থাবান্ হইয়া তাঁহারও স্তুতি করিয়াছেন। শেষে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কে এক সঙ্গে স্তুতি করিতে করিতে বলিতেছেন—

"বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।
সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহ
মাতরা। ৬।৫৯।২

হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের যে জন্মমহিমা কীর্ত্তিত হয়, সে সমস্ত সত্য ও প্রশংসার যোগ্য। তোমাদের দুজনেরই এক জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা; তোমাদের মাতা সকল স্থানেই আছেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নরেন্দ্রের সহানুভূতি

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

নায়ক।

তাহার কেবল একটি মাত্র দোষ ছিল;—বাকী তাহার সবই গুণ। তাহার দোষের কথা পরে বলিব। এখন তাহার বহু গুণের কথা বলি শুন। সে কৃতবিদ্য;—প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়াছিল, এবং মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তমরূপে এম্-বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ভগবান তাহাকে চাকুরীজীবি করেন নাই; চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সে পিতার একমাত্র পুত্র; এবং তাহার পিতা, বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। বিদ্যা ও ধনের উপর, তাহার মনোমোহন রূপ, এবং যথেষ্ট শারীরিক বল ছিল;—তাহার রূপ ও বলশালী দেহ গ্রীসদেশীয় পুরাতন ভাস্কর্য্যের আদর্শ হইতে পারিত। কিন্তু বিদ্যা, ধন, রূপ ও বলের উপর মানুষের আরও এক গুণ আছে, তাহা না থাকিলে, মনুষ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না; সেই গুণের নাম চরিত্র। সে চরিত্রবান্ ছিল কি? হাঁ, তাহার চরিত্রও দর্পণের মত নির্ম্মল। সে পিতা-মাতার বাধ্য পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহপূর্ণ আত্মীয়, ভৃত্যবর্গের মিষ্টভাষী প্রভু, বন্ধুদিগের নিকট উদার এবং সদা উপকারক, এবং দরিদ্র ও আতুরগণের প্রতি মুক্তহস্ত ছিল।

ঐ সকল গুণ থাকিলে কি হয়? তাহার একটা মহৎ দোষ ছিল; সে অত্যন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সহানুভূতিটা কি একটা দোষ? অন্য লোকের পক্ষে দোষ না হইতে পারে; কিন্তু যেমন, 'গুণ হইয়া দোষে হইল বিগ্যার বিগ্যায়,' তেমনই তাঁহার পক্ষে এটা দোষে দাঁড়াইয়াছিল বটে। কথাটা আমরা পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সেই গুণ ও দোষ-সম্পন্ন যুবকের নাম, কুমার নরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়; অথবা সংক্ষেপে খোকাবাবু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদ্যদের মেয়ে।

যে পাড়ায়, পাড়া যুড়িয়া খোকাবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়ী, সেই পাড়ার একপ্রান্তে কয়েকখানা খোলার ঘর ছিল। তাহাতে কয়েক ঘর দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিত। এই সকল গৃহস্থের মধ্যে রাজারাম সেন নামক এক ব্যক্তি পাড়ায় কবিরাজী করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

রাজারামের প্রতিপাল্য অনেকগুলি;—বৃদ্ধা বিধবা মাতা, সধবা সন্তানপ্রসবিনী স্ত্রী, বিবাহযোগ্যা দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা, তদ্ভিন্ন একটি জিলাপি-প্রিয়া কন্যা, পাঠরত অষ্টম বর্ষীয় পুত্র, আর একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র। এই সামান্য উপার্জ্জনে এতগুলি প্রতিপাল্যের নানা ব্যয় বহন করা কবিরাজ মহাশয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি শিক্ষিত কবিরাজ হইলেও, দারিদ্র্য-নিবন্ধন তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিতেন না। গাড়ী ঘোড়া রাখা দূরের কথা, একটি ঠিকা ঝি রাখিবারও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। গৃহের কর্ম্ম গৃহিণীই সমাধা করিতেন; হাট বাজার কর্ত্তা নিজে করিতেন; জ্যেষ্ঠা কন্যা রাস্তার ধারের কল হইতে ছোট বাল্‌তি করিয়া জল আনিয়া দিত, এবং কখনও নিকটবর্ত্তী মুদীর দোকান হইতে কোনও দ্রব্য কিনিয়া আনিত।

বাল্‌তিটী আজ কার্য্যান্তরে থাকায় বড় মেয়ে একটী পিতলের নূতন কলসী লইয়া রাস্তার কলে জল আনিতে গিয়াছিল। কলের তলদেশ পিচ্ছিল ছিল। মেয়েটি পূর্ণকুম্ভ কষ্টে কটিদেশে উঠাইয়া যেমন গৃহপ্রত্যাগমন জন্য অগ্রসর হইবে, অমনই পদস্খলিত হইয়া, সশব্দে ফুটপাথের পাথরের উপর পড়িয়া গেল। ইহাতে সে নিজে ত যথেষ্ট শারীরিক বেদনা পাইলই; তাহার পিতলের নূতন ঘড়াটিও খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় পিতা-মাতার নিকট অত্যন্ত তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা করিল। সে ব্যথিত ও কর্দ্দমলিপ্ত দেহ লইয়া উঠিল, কিন্তু সহসা বাটী ফিরিতে পারিল না; দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্র কোথা হইতে ফিরিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে তাহার মোটর ল্যাণ্ডো তাহাদের বাটীর কারুকার্য্য শোভিত বৃহৎ ফটকে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু প্রবেশ করিবার আগে, ক্রন্দনমানা বৈদ্যকন্যা ও তাহার পদতলে ভগ্ন কলসী তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, চোখে জল আসিতে লাগিল। মোটর থামাইয়া সে সত্বর ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইল; এবং সমবেত লোক সকলের নিকট হইতে বালিকার পরিচয় ও অন্যান্য অবস্থা জানিয়া লইল। বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, উহার বিশেষ কোনও শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই। তাহাকে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও। শীগ্‌গির কাদা-মাখা ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল; আর একখানা শুক্‌ন কাপড় পর, আর একটু গরম দুধ খেও।"

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে নরেন্দ্রের অশ্রুপূর্ণ লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "দুধ আমি খাইনে; আর, শুক্‌ন কাপড় ত আর আমার নেই,—সকাল বেলা এড়া কাপড় কেচে দিয়ে, এই কাপড় পরে' জল নিতে এসেছিলাম।"

বালিকার করুণ চাহনি দেখিয়া, এবং অভাবের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রের ব্যথিত হৃদয় আরও ব্যথিত হইল; সে বলিল, "তবে তুমি আমাদের বাড়ীতে চল। আমার মা তোমায় কাপড় দেবেন; আর তুমি যদি

দুধ খেতে না চাও, আর কিছু খেতে দেবেন।"

বালিকা সকরুণ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি, নরেন্দ্রের সহানুভূতিমাখা মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "কিন্তু এখন বাড়ীতে জল নিয়ে না গেলে যে আমাদের রান্না হ'বে না। আর নতুন ঘড়া ভেঙ্গে গেছে বলে মা যে আমায় বক্‌বেন।" এই বলিয়া বালিকা আবার কাঁদিতে লাগিল।

অশ্রুভারে নরেন্দ্রের লোচন পূর্ণ হইল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তোমাদের বাড়ীতে কি জল আন্‌বার অন্য লোক নেই?"

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না; আমিই দু'বেলা এই কল থেকে জল নিয়ে যাই, তাতেই নাওয়া, কাপড় কাচা, আর দু'বেলা রান্না-বান্না হয়।"

নরেন্দ্র বিষন্নমুখে বলিল, "আচ্ছা, এখন ওসব কথা তোমার ভাব্‌বার দরকার নেই। এখন তুমি আমাদের বাড়ীতে গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল গে, আর একটু কিছু খাওগে। আমি ততক্ষণ একটা ঠিক এই রকম নূতন ঘড়া কিনে, তোমাদের বাড়ীতে জল দেবার ব্যবস্থা কর্‌ছি।

বালিকা জানিত, কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। সে নরেন্দ্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল; এবং আবার নরেন্দ্রের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বলা বাহুল্য, বালিকার সেই দৃষ্টিতে প্রেমের গন্ধ মাত্র ছিল না।

কিন্তু নবীন যুবকগণের স্বভাব এই যে, তাহারা কিশোরীগণের চাহনি-মাত্রকেই প্রেমের চাহনি মনে করে। তাই এই নিতান্ত প্রেম-রস-হীনা দুঃস্থা বালিকার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিপাতে নরেন্দ্র প্রেমের সন্ধান পাইল। নরেন্দ্র বালিকাকে, গাঁইটছড়া বাঁধা নববধূর মত, পথ দেখাইয়া, মাতার কাছে লইয়া গেল। মাতা নরেন্দ্রের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, বালিকাকে এক খানি ভাল বস্ত্র দিলেন; তাহার বস্ত্রখানি পরিচারিকার দ্বারা পরিষ্কৃত করাইয়া তাহার হস্তে দিলেন; দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইলেন; এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় দিলেন। সঙ্গে একজন পরিচারিকা, নরেন্দ্রের আনীত নূতন কলসে জল পূর্ণ করিয়া, এবং ভগ্ন কলসের টুক্‌রাগুলি লইয়া গেল। নরেন্দ্রের মাতার আদেশে সে উহাদের আবশ্যক মত, আরও কয়েক ঘড়া জল আনিয়া দিল।

পরদিন, প্লাম্বার আসিয়া, নরেন্দ্রের উপদেশ মত, রাজারামের খোলার বাড়ীর ক্ষুদ্র উঠানে জলের কল বসাইয়া, পাকা চৌবাচ্চা গাঁথিয়া দিল। তৎ পরদিন নরেন্দ্রের কোনও বন্ধু, চিকিৎসার জন্য নরেন্দ্রের নিকট আসিলে, নরেন্দ্র রাজারামকে দেখাইয়া দিল; বলিল, "আমাদের ডাক্তারীতে কিছুই নেই; কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। আর্য্য ঋষিরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল বুঝতেন; তাঁদের তৈরী চিকিৎসা শাস্ত্র কখনও ভ্রান্ত হতে পারে না; তাঁদের ওষুধ আমাদের দেশের জল হাওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আর ওবাড়ীর রাজারাম কবিরাজ মশায় সে শাস্ত্র ও ঔষধ খুব ভাল রকমই জানেন।" তত বড় ধনী লোকের পুত্র, তত বড় পাশ করা ডাক্তারের কথা কোন বন্ধুই অবহেলা করিল না। ফলতঃ পরদিন হইতেই রাজারামের সৌভাগ্যের সূচনা হইল। এবং তিনি এক বৎসরের মধ্যে সুপাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন।

নরেন্দ্র পবিত্র প্রেম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত ছিল। সে জানিত, যে প্রেমে স্বার্থ নাই, কামনা নাই, যাহা কিছু চায় না, তাহাই স্বর্গীয়। বিবাহটা পরম স্বার্থপরতা; তাহা কেবল একাকী ভোগ করিবার সর্ত্ত মাত্র। তাই রাজারাম যখন কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া নরেন্দ্রের নিকট কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিতে আসিলেন, তখন নরেন্দ্র হাসি মুখে প্রণয়িনীর বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে সমস্ত ভারই গ্রহণ করিল; এবং বিবাহের দিন তাহা উপহার দিয়া মনে করিল, উহা তাহার স্বার্থশূন্য প্রেমের সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডোমেদের মেয়ে।

তাহার পর, নরেন্দ্রের নূতন নূতন সহানুভূতি ঘটিতে লাগিল। সব সহানুভূতি গুলিই ক্রমে নিঃস্বার্থ প্রেমে পরিণত হইতে লাগিল। এ ক্ষেত্রে সহানুভূতি বা প্রেমের পাত্রী হইল এক ডোম জাতীয়া দশম বর্ষীয়া কৃষ্ণকায়া বালিকা।

একদিন বালিকা দোকান হইতে এক পয়সার দুইখানি জিলাপী কিনিয়াছে; ঠোঙা মধ্যস্থ জিলাপী দুইখানর রসপূর্ণ সুবর্ণ কান্তি দেখিতে দেখিতে, সে তাহার মধুরতার ধ্যানে তন্ময় হইয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া পরস্বাপহারী এক চিল আকাশপথে বিচরণ করিতে করিতে, আধার সমেত জিলাপী দুইখানি ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ায় বালিকা কাঁদিল, এবং চিলের পশ্চাতে ছুটিল। কিন্তু ডোম কন্যা পাপিষ্ঠ শকুন্তের অনুসরণ করিতে পারিল না; অল্প দূর অগ্রসর হইয়া, দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্র ফটকের নিকট গোলাপ বাগানে দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য লক্ষ্য করিল। করুণায় এবং সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া রাস্তায় ক্রন্দনমানা বালিকার নিকট গেল। দোকান হইতে এক রাশি জিলাপী কিনিয়া, এবং অপর দোকান হইতে একখানি গামছা কিনিয়া, বালিকার চিল-আতঙ্ক নিবারণ জন্য, জিলাপী গামছায় বাধিয়া তাহার হাতে দিল। বালিকা সজল নয়নে নরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। নরেন্দ্র সেই সজল দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিল,—প্রেম।

ইহার পর, বালিকা প্রত্যহ সেই রাস্তা দিয়া যাইত; প্রত্যহ গোলাপ বাগানে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র করুণ দৃষ্টিতে সেই মসী-মূর্ত্তি দেখিত; প্রত্যহ রাস্তায় বাহির হইয়া বালিকার নিকট আসিত; প্রত্যহ বালিকা তাহার নিকট জিলাপী যাচ্ঞা করিত; প্রত্যহ নরেন্দ্র তাহাকে জিলাপী ও অন্যান্য মিষ্টান্ন কিনিয়া দিত; এবং প্রত্যহ বালিকা মিষ্টান্ন পাইয়া আনন্দপূর্ণ নয়নে নরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইত।

নরেন্দ্র সেই আনন্দপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষুতে ও সেই হাস্যময় কৃষ্ণ অধরে নিগূঢ় প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহার পর, কয়েক দিন রাস্তায়, গঙ্গাতীরে শ্মশানে তাহাদের বাসস্থানে যাইয়া সেই ক্ষুদ্রকায়া প্রেমময়ীর ইচ্ছানুযায়ী ডুরে শাড়ী, লাল ছিটের জ্যাকেট, মাথা আঁচড়াইবার গোলাপী চিরুণী গোলাপী রঙের সাবান প্রভৃতি নানাবিধ উপহার সামগ্রী ক্রয় করিয়া দিয়া, প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি সাধন করিত।

কিন্তু তাহার এই পবিত্র প্রণয় অধিক দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই। প্রণয়িনীর রক্তলোচন মদ্যপায়ী পিতা সেই শ্মশানে মৃতদেহের অপ্রাচুর্য্য দেখিয়া, প্রচুর মৃতদেহ-সমাকুল ও লাভজনক অন্য শ্মশান ক্ষেত্রে উঠিয়া গিয়াছিল; এবং কন্যাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; এবং দারুণ বিস্মৃতি বশতঃ সে আপন নূতন ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাণী হাবী।

তোমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, নরেন্দ্রের আর একটা সহানুভূতিমূলক প্রেম কাহিনী আমরা বিবৃত করিব।

এ ক্ষেত্রে সহানুভূতির পাত্রী যথার্থই একজন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী। যুবতীর একটী চক্ষু বিকৃত; কিন্তু তাহার দ্বারা সে কিছু কিছু দেখিতে পাইত। অপর চক্ষুর পল্লবদ্বয় পরস্পর লিপ্ত; সুতরাং তাহা একবারে দৃষ্টিহীন। এই যুবতীর কেহ ছিল না। সে কোন্ জাতীয়া, নিজেও সে তাহা জানিত না; তাহার বাল্য কালে তাহার মাতাও এ বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। তাহার নাম হাবী ওরফে কাণী।

একদা হাবী যষ্টিহস্তে রাজপথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল; সহসা নরেন্দ্রের মোটর আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। শকটচালক যানের গতিবেগ ত্বরিত শমিত

না করিলে হাবীর ভবলীলা তখনই শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু বিধাতার তাহা অভিলষিত না হওয়ায়, সেদিন সে বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু কতকটা আতঙ্কে, কতকটা আঘাতে সে রাস্তার ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

দেখিয়া নরেন্দ্রের সহানুভূতি প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিল। সে অবিলম্বে শকট হইতে অবতরণ করিয়া, সোফারের সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে হাবীকে আপন মোটরে উঠাইয়া লইল, এবং চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে লইয়া গেল। মোটরে হাবীর জ্ঞান হইয়াছিল। এক্ষণে নরেন্দ্র নিজে এবং হাঁসপাতালের ডাক্তারগণ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া করিয়া বলিলেন যে, সে কোনও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই; হাঁসপাতালে বাস করিবার তাহার কোনও প্রয়োজন হইবে না।

তখন নরেন্দ্র অতি সাবধানে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল; এবং বলিল, "চল, আমার গাড়ীতে তোমাকে তোমাদের বাড়ীতে রেখে আসি।" এই বলিয়া নরেন্দ্র হাবীকে হাঁসপাতালের বাহিরে লইয়া আসিল; এবং আপন গাড়ীতে উঠাইয়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

হাবী সেই প্রথম তাহাদের বাড়ীর কথা শুনিল। সে হাসিয়া, তাহার বিকৃত নয়ন হইতে বিদ্যুত্তুল্য কটাক্ষ নরেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ী? হেঁ হেঁ! আমার বাপ মরে গেছে, মা মরে গেছে, বাড়ীও মরে গেছে।"

নরেন্দ্র বুঝিল, হাবীর মাতাপিতাও নাই, বাড়ী ঘরও নাই। আহা, কি দুঃখ, কি কষ্ট! করুণায় তাহার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কোথায় যাবে?"

হাবী আবার হাসিল; হাসিয়া বলিল, "কি জানি!" এমন হাস্যজনক প্রশ্ন সে আগে কখনও কাহারও মুখে শুনে নাই।

নরেন্দ্র চিন্তিত হইল; ভাবিল, তবে এই প্রেমময়ীকে কোথায় রাখিবে? অনেক চিন্তার পর, সে মনে মনে মনে একটা মতলব ঠিক করিয়া হাবীকে বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে এস। আমাদের এই ঝামাপুকুরে একটা বাড়ী আছে; তাতে আমি কখন.কখনও থাকি বলে' সেখানে একজন চাকর আর একজন বামুনও আছে, আর বাড়ীর দরোয়ান ত আছেই। চল, সেইখানে তুমি থাক্‌বে। তোমার খাবার পরবার আর থাকবার যাতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবো।"

হাবী, তাহার হাবী নাম লইয়াও, অন্যান্য কামিনীগণের ন্যায়, বেশ বুঝিল, তাহার যে কাণা কটাক্ষে, ভূতো বেনে, পরাণে বাগ্‌দী, হারুখোঁড়া প্রভৃতি মহারথিগণ মজিয়াছিল, এই ধনী ও সুন্দর বাবুটীও সেই কটাক্ষজালে আবদ্ধ হইয়াছে। না হইবে কেন? একটা চোখ যদি কাণা না হইত, এবং রংটা যদি রোদে রোদে এমন পুড়িয়া না যাইত, তবে সেও এই কাঁচা বয়সে স্বর্গের একজন অপ্সরী হইতে পারিত। ভাবিল, এবার তাহার কপাল ফিরিল।

কিন্তু তোমরা ত নরেন্দ্রকে বেশ চেন। সে জানিত যে, যথার্থ প্রেম কখনও স্বার্থ চাহে না; যে প্রেম সম্পূর্ণ কামনাশূন্য, তাহাই পবিত্র; অতএব সে হাবীকে ঝামাপুকুরের বাটীতে স্থাপিত করিয়া, কেবল তাহারই সুখের বিধান করিতে লাগিল; নিজের কোন কামনা রাখিল না। সে কি আপন প্রেমপাত্রীকে কলঙ্কিত করিতে পারে?

নিজের এই অভিনব ও পবিত্র প্রেমকাহিনী নরেন্দ্র কখনও গোপন করিতে চেষ্টা করে নাই। সুতরাং সেই কাহিনী সহজেই ঢি ঢি হইয়া পড়িল। এবং আত্মীয় বন্ধু মহলে চোখ টেপাটিপি চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

শুনিয়া, নরেন্দ্রের মাতা বড়ই চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, ছেলের শীগ্‌গির বিয়ে দাও।"

"কেন? শীগ্‌গির কেন? ছেলে কি বিয়ের জন্যে অধৈর্য্য হ'য়েছে?"

"হয়েছে, বোধ হয়। ছেলের এদিকে ওদিকে মন প'ড়েছে।"

"গিন্নী, এবয়সে ওটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়; ওরকম আমাদেরও একদিন প'ড়ত। দেখ, গিন্নী, সেই বয়সে, তোমাদের চোখটা বড় ভয়ানক জিনিষ!"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু যার দিকে ছেলের মন পড়েছে, সে মোটেই চেয়ে দেখে না; সে কাণি!"

"বল কি, বেটা শেষকালে একটা কাণির সঙ্গে মজে গেল? দাঁড়াও, আহাম্মুক বেটাকে জব্দ করে দিচ্ছি। এই মাসের মধ্যেই একটি ডাগর মেয়ে দেখে, তার বিয়ে দিচ্ছি।"

বাস্তবিক নরেন্দ্রের পিতা সেই মাসের মধ্যেই এক পঞ্চদশবর্ষীয়া পদ্মপলাশাক্ষীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। বধুর নাম সরসীবালা।

আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নরেন্দ্র মাতাপিতার অত্যন্ত বাধ্য পুত্র; এজন্য সে সেই বিবাহে সহজেই সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু হাবী বর্ত্তমানে, সে বিবাহিতা বধূকে কখনও প্রেমের সামগ্রী মনে করিল না; তাহার প্রতিমাসদৃশ রূপরাশি কখনো চাহিয়াও দেখিল না। বিবাহের দিন, শুভদর্শনের সময়, চক্ষু মুদিয়া, কোনও মতে আপনার প্রেমধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল।—এক প্রণয়িনী থাকিতে অন্যা রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করাটা সে মহা অধর্ম্ম মনে করিল।

আসল কথা, নরেন্দ্র মাতার মুখে তাহার পরিণীতার যে বিবরণ শুনিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ে করুণা বা সহানুভূতির উদয় হইবার কোনও কারণ ছিল না; অতএব তাহার প্রতি সে প্রেম-নয়নে কেন দৃষ্টিপাত করিবে? তেমন সুন্দরী, তেমন ধনী কন্যা, তেমন হাস্যময়ী, তেমন লাবণ্য-ললিত-দেহা বরনারীকে, মাতা পিতার অনুরোধে বিবাহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি করুণা করিবার নরেন্দ্র কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইল না। যাহার অত রূপ, যাহার কোন অভাব নাই, পীড়া নাই, ব্যথা নাই, দুঃখ নাই, যে কখন কোন বিপদে পড়ে নাই, নরেন্দ্র শুধু শুধু কেন তাহার প্রতি করুণা করিবে? কেন তাহার প্রতি সহানুভূতি জাগিবে?

নরেন্দ্রের শ্বশুর মহাশয়, নরেন্দ্রের পিতার ন্যায়, মহা ধনী না হইলেও, ধনী ব্যক্তি। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব-যোজিত এক খানি সুন্দর পাল্কী-গাড়ী ছিল। তিনি তাহাতে চড়িয়া মাঝে মাঝে জামাতাকে আহার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেন। নরেন্দ্রও শ্বশুরালয়ে যাইত, আহার করিত; কিন্তু পত্নীর সহিত কোনও আলাপ করিত না;—শ্যালী শালাজ কেহ তাহার আহার স্থানে আসিলে, সে মাথা হেঁট করিয়া খাইত। আহার করিয়াই বাটী চলিয়া আসিত, কখনও শ্বশুরালয়ে নিশাযাপন করিত না। এইরূপে, সে কখনও তাহার কাণী প্রণয়িনীর প্রতি বিশ্বাসহন্তা, বা নিজে দ্বিচারী হয় নাই।

নরেন্দ্রের শ্বশ্রূঠাকুরাণী জামাতার এই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ব্যবহার পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই কন্যার দুরদৃষ্টের নিন্দা করিতেন; এবং বিষণ্ণা থাকিতেন।

নরেন্দ্রের নববধূ সরসীবালা একদিন মাতাকে তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে শুনিয়া কহিল, "মা, তুমি আমার অদৃষ্টের নিন্দে করো না; ভগবান কার স্বামীকে এত রূপবান, এত বিদ্বান, এত ধনবান ক'রেছেন বল দেখি? কার স্বামী অত বড়লোক হয়েও অত নিরহঙ্কারী, অমন নিরীহ ভাল মানুষ হয়?"

মাতা বলিলেন, "তা ত জানি; তোকে নেয় না, এই যা' দোষ।"

সরসী বলিল, "হয় ত আমারই কোন দোষ আছে। হয়ত আমি তাঁকে ভাল রকম বুঝতে পারি নি। তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁদের বাড়ী গিয়ে থাকতে হয়। আমি বলছি, মা, তুমি আমাকে মাস কতকের জন্যে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও, তা'হলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

এদিকে নরেন্দ্রের জননীও পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "ও সব

ঠিক হ'য়ে যাবে এখন। ও কথা তোমায়ও ভাবতে হ'বে না, আমায়ও ভাবতে হ'বে না। বৌমা সেয়ানা মেয়ে, তাঁকে নিয়ে এস। তিনি এসে ছেলেটাকে ঠিক ক'রে নেবেন এখন।"

মাতা তাহাই করিলেন। অবিলম্বে সরসীর মাতাকে পত্র লিখিলেন।

সরসীর মাতা কন্যার মনোভাব পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন। এক্ষণে বেহাইনের পত্র পাইয়া, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্বশুরালয়।

সরসী আসিয়া, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পদে প্রণাম করিল। শ্বশ্রূ, বধূর প্রচ্ছন্ন প্রতিভাপূর্ণ প্রসন্ন ললাট এবং নয়ন কোণে চতুর, হাস্যময় কটাক্ষ দেখিয়া প্রসন্না হইলেন ও বুঝিলেন যে, হাঁ, যে কায তাঁহারা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এই বুদ্ধিমতী ও অসামান্য রূপবতী তাহা অনায়াসে সমাধা করিতে পারিবে। বধূর চিবুক ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা, তুমি স্বামী সোহাগিনী হ'য়ে, আর এই ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে, জন্ম জন্ম থেকো।'

সরসী নত মস্তকে শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। তাহার পর, প্রতিভার দর্পণস্বরূপ অতি বৃহৎ লোচনদ্বয় আনত করিয়া, মৃদুস্বরে কহিল, "মা, আমার একটা কথা আছে। আমি এ বাড়ীতে এসেছি বা আছি, একথা আপাততঃ কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।"

শ্বশ্রূ বুদ্ধিমতী, বধূর কথার তাৎপর্য্য বুঝিলেন, 'কারু' শব্দের অর্থ নরেন্দ্র। বলিলেন, "না। তোমার এ বাড়ীতে আসার কথা খোকা জানে না, আমিও জানাব না।" বধূ শিখিল, তার স্বামীর আর এক নাম খোকা।

সরসী সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে, পারুল নাম্নী এক পরিচারিকার সহিত ত্রিতলে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল। দেখিল, তাহার জন্য, তিনটি সুসজ্জিত কক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—একটি বসিবার ঘর, একটি শুইবার ঘর, এবং একটি প্রসাধন কক্ষ। সে প্রথমেই প্রসাধন কক্ষে যাইয়া, পিত্রালয় হইতে আনীত আপ[ন] বস্ত্রালঙ্কার সকল গুছাইয়া রাখিল। তাহার পর মুখ হা[ত] ধুইয়া বৃহৎ দর্পণে আপন সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখিল[;] ভাবিল, এ মূর্ত্তির পূজারী ত কখনও ইহাকে পূজা করি[ল] না। যদি তাহাকে দিয়া এই মূর্ত্তির পূজা করাইতে ন[া] পারি, তবে বৃথায় এই নারীজন্ম ধরিয়াছি, তবে বৃথা[য়] এই মূর্ত্তির অধিকারী হইলাম; তবে পূজার আগে[ই] এ মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দেওয়া ভাল। ভাবিতে ভাবিতে সরসী বসিবার ঘরে গিয়া একখানি বিচিত্র সোফা[য়] অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিল। বসিয়া বসিয়া আবার ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে আপন কমল-দল-নিন্দিত, অলক্তক-রঞ্জিত চরণদ্বয় নিরীক্ষণ করিল; দেখিয়া, কি ভাবিল জানি না। কিন্তু পরক্ষণে আপন জিহ্বা দংশন করিয়া মুখে বলিল, "ছি, ছি! এমন কথা মনেও ভাবতে নেই;—স্বামী যে আমার মাথার মণি, গুরুজন। হায়, কি পাপে এই মহাগুরুর আমি কখনও পদসেবা করতে পারলাম না?" সরসী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষণপরে কি ভাবিয়া সে বারান্দায় আসিল। সেখানে গৃহকর্ত্রীর আদেশানুযায়ী পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

সে বলিল, "আমার নাম পারুল; কিন্তু সবাই আমাকে পারী বলে ডাকে।"

সরসী। পারুল? বেশ নামটি ত। আমি তোমাকে পারুল বলেই ডাকব। তুমি কতদিন এখানে আছ?

পারুল। তা' পাঁচ ছ' বছর হ'বে। আর যত দিন বেঁচে থাকবো, মনে করেছি এই খানেই কাটিয়ে দেব। এমন বাড়ী আর কোথা পাব? এত যে ঐশর্য্যি তা' একটুও দেমাক নেই। আবার দয়ার কথা কি বলবো। আপনার বিয়ের সময়, আমরা সকলেই গরদ আর অনন্ত পেয়েছিলাম। আবার আমাদের খোকা বাবুর দয়াটা সব চেয়ে বেশী। শুনুন, বৌ-রাণী! এ পাড়ায় একটা বস্তিদের মেয়ে ছিল—

সরসী। তোমাদের খোকাবাবু বুঝি তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলন?

পারুল। না গো, না; সে তো মোটে বার বছরের মেয়ে। প্রেম নয়, কেবল দয়া। কারুর শরীরে একটু ব্যথা লাগলে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। একবার আমি পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়েছিলাম। তা দেখতে পেয়ে, খোকা বাবু ছুটে এসে, করলেন কি, জানেন বৌ-রাণী?

সরসী। জানি। ছুটে এসে তোমায় বুকে তুলে নিলেন।

পারুল। ওমা! আমি লজ্জায় মরে যাই। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম—তাই রক্ষে! নইলে বুকে তুলে নিতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে,' কোনও কুভাবে নয়। তাঁর দেবতার মত চরিত্তির।

সরসী। পারুল, তুমি একবার তোমাদের খোকা বাবুকে আমায় দেখাতে পার?

পারুল। আপনি তাঁকে কতবার দেখেছেন?

সরসী। সেই বিয়ের সময় একবার দেখেছিলাম, সে একটুও মনে নেই। এখন তুমি একবার দেখাতে পার?

তোমরা বুঝিয়াছ, সরসী পারুলকে রচা কথা বলিল। সে বহুবার তাহার স্বামীকে দেখিয়াছিল—বিবাহের পর, শ্বশুরালয়ে আসিয়া দেখিয়া ছিল, নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীতে আহার করিতে যাইলে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিল; সত্যই সে ভুলে নাই,—উজ্জ্বল বর্ণে তাহার অন্ধকার হৃদয়ে সে মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু সরসীর এ ছলনা, প্রেম-রহস্য-বোধহীনা পারুল বুঝিতে পারিল না। সে কহিল, "এর পরে কত দেখা হ'বে। এখন সমস্ত দিন বাইরে থাকেন বটে, কিন্তু এর পরে আপনার ওই রাঙা পায়ের গোলাম হ'য়ে থাকবেন।"

সেদিন সরসী পারুলকে আর কোন কথা বলিল না; দিবা অবসান হইয়াছে দেখিয়া, নিম্নতলে, যেখানে শ্বশ্রূঠাকুরাণী পচিকাগণকে রাত্রের রন্ধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, সে সেখানে নামিয়া আসিল।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী আদর করিয়া বলিলেন, "এস, মা এস।"

সরসী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট বসিল। কিন্তু অল্প কাল মধ্যে, নরেন্দ্র মাতার সন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায়, সে অতি সত্বর অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া অন্তরালে লুকাইল; এবং অন্তরালে থাকিয়া স্বামীকে দেখিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালীঘাটে গমন।

সরসী স্বামীর অজ্ঞাতে একমাসকাল শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া, পুরনারীগণের নিকট সকল কথা শুনিয়া বুঝিল, স্বামীর রোগ কোন খানে। বেশ বুঝিল, এ রোগের সহিত প্রণয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই; ইহা কেবল তাহার করুণাময় স্বামীর হৃদয়ের সহানুভূতি মাত্র; ইহা কেবল একটা বৃহৎ আত্ম প্রবঞ্চনা। তখন, এই রোগের নানারূপ প্রতীকারের কথা সরসী মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

স্বামীর কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য যে সকল মহিমময়ী হিন্দুনারী আপন জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সরসীবালা তাহাদেরই একজন। স্বামীর সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য, সে কখনও ভাবিল যে, একটা কোন অঙ্গহানি করিয়া আপনাকে দুঃস্থা করিয়া ফেলে; কখনও ভাবিল যে, যদি সে রোহিণীর মত আপনাকে জলনিমজ্জিতা করিতে পারে, তাহা হইলে গোবিন্দলালের মত, তাহার দয়াপ্রবণ স্বামী আসিয়া তাহার মুখমধ্যে মৃতসঞ্জীবন ফুৎকার দিয়া তাহাকে নিশ্চয় সঞ্জীবিতা করিবেন; কখন ভাবিল যে, সে স্বামীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া নিজের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলেই, তিনি তাঁহার ক্রোড়ে আদরে সেই চূর্ণ মস্তক তুলিয়া লইবেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্বালানিবারক স্নিগ্ধ হস্ত বুলাইয়া দিবেন।

কিন্তু স্বামীর রোগ নিরাময় করিবার জন্য সরসী-বালাকে এই সকল বীভৎসলীলা কিছুই করিতে হইল না। ভগবান যেন সেই সতীর হৃদয়ব্যথা বুঝিতে পারিয়া দুইটা বড় রকম সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথের কাণী প্রণয়িনী, এক নূতন প্রণয়পাত্র সংগ্রহ করিয়া এবং কতক কতক গৃহসামগ্রী ও নরেন্দ্রের ঘড়ী চেন লইয়া, নরেন্দ্রের অদ্ভুত প্রেমের শিকল কাটিয়া পলায়ন করিল। দুই দিন পরে, সেই নূতন প্রেমিক, ক্ষীরভোজী ও নীরত্যাগী মরালের মত, তাহার দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া কাণীকে ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইল। তাহার পর, কাণী আর নরেন্দ্রকে মুখ দেখাইতে সাহস করিল না;—প্রণয়ের কথা সে না হয়, গোপন করিতে পারিত; কিন্তু সে যে চুরি করিয়াছিল! প্রণয়িনীর অদর্শনে, নরেন্দ্রের মুখ এত ম্লান হইয়া গেল যে; অন্তরাল হইতে সেই মুখ দেখিয়া—আমরা সত্যকথা বলিব—সরসীর বৃহৎ লোচনদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুখকর বিপদ।

সরসীর পিত্রালয়ের এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রের নবম বর্ষ বয়সে জ্বর বিকার রোগে প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তার মা সে সময় মানত করিয়াছিলেন, "হে মা কালীঘাটের কালী, আমার বাছাকে ভাল করে দাও, সময় হলে, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে ওর পৈতে দিব।"—মা কালী সে প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, ছেলেটি বাঁচিয়া গিয়াছিল। সেই ছেলে এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় হইয়াছে—তার মা বাপ তাকে সঙ্গে করিয়া উপনয়ন জন্য কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে বাসা ভাড়া করিয়াছেন।

সরসীর পিতৃ-পরিবারের সহিত ইঁহাদের বিশেষ সম্প্রীতি। উপনয়নের পূর্ব্বদিন, গৃহিণী সরসীকে দেখিবার জন্য এবং তার শ্বাশুড়ী যদি অনুমতি করেন, ২।১ দিনের জন্য তাহাকে লইয়া আসিবার অভিপ্রায়ে, সরসীর শ্বশুরালয়ে আসিয়া দর্শন দিলেন।

বিকাল বেলা সরসীর শ্বাশুড়ীর অনুমতিক্রমে, সরসীকে তিনি ভবানীপুরের বাসায় লইয়া আসিলেন।

পরদিন প্রাতে দুইখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহারা সকলে কালীঘাট গমন করিলেন।

উপনয়ন সংস্কার শেষ হইলে, বাসায় ফিরিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইলেন। ভাড়াটিয়া গাড়ী দুখানি অপেক্ষা করিতেছিল। ছেলেটির পিসিমা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে গাড়ীতে বসিলেন, সরসীও সেই গাড়ীতে বসিল। অন্য গাড়ীতে ছেলেটি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতামাতাসহ বসিল। গাড়ী ছাড়িবে এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর আসিয়া ছেলেটির বাপকে কি বলিলেন। তাঁহারা সকলে নামিলেন, বলিলেন, মন্দিরে আর একটু কায বাকী আছে—দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ফিরে আসছি। তোমরা গাড়ীতেই বসে থাক।"

পিসিমা বলিলেন, "চল না, আমরাও যাই।"

সরসী বলিল, "রৌদ্রে আমার বড়ই কষ্ট হয়েছে, আমি আর হাঁটতে পারবো না।"

পিসিমা বলিলেন, "আচ্ছা তোমরা দু'বোনে তা হলে গাড়ীতে বসে থাক। আমি ওদের সঙ্গে যাই।" বলিয়া তিনি নামিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিল, "আমিও যাব পিসিমা।" বলিয়া সেও নামিয়া পড়িল। বলিল, "সরসী তুই বোস ভাই। আমরা শীগ্‌গির ফিরে আসছি।"

কালীঘাটের মন্দিরের দরজা হইতে কিছু দূরে, রাস্তার এক পার্শ্বে সরসীকে লইয়া, ভাড়াটীয়া গাড়ীখানা যেন কিছু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কোচোয়ান ঘোটকদ্বয়ের মুখের বল্গা খুলিয়া দিয়া, বসিয়া বসিয়া, তাহাদের মুখে ঘাস দিতেছিল। সরসী গাড়ীর মধ্যে বসিয়া, গাড়ীর পশ্চাতের খড়খড়ির পাখী তুলিয়া, কৌতুহল বশতঃ রাস্তার দিকে চাহিয়া ছিল।

মিনিট দুই পরে, দূরে পথ-প্রান্তে মোটর গাড়ীতে ও কে আসিতেছে? ঐ ত নরেন্দ্র—ঐ ত সরসীর স্বামী। গাড়ীতে সোফার ছিল না; নরেন্দ্র নিজেই শকট চালনা

করিয়া আসিতেছিল। সরসী মহা আগ্রহভরে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে গাড়ী আরও নিকটবর্ত্তী হইল।

পথিপার্শ্বস্থ একজন অন্ধ ভিক্ষুককে রক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্র সহসা শকট দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরাইয়া, উঁহার গতিরোধ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই, পথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সরসীর অশ্বযানের পশ্চাৎ দিকের সহিত উঁহার সংঘর্ষ হইল। সরসী হঠাৎ শকটমধ্যে নিম্নস্থানে নিম্নমুখে পড়িয়া গেল এবং উভয় জানুতে আহত হইল। সংঘর্ষে মোটরখানির কোন অনিষ্ট হয় নাই; কোচোয়ান তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখিল যে তাহার শকটেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। এই সময় সরসী বেদনার কাতরোক্তি করিল।

তাহা শুনিয়া নরেন্দ্র মোটর হইতে সত্বর অবতরণ করিল। এবং কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সে তিনজন জানানী সোয়ারী লইয়া আসিয়াছিল, দুই জানানা মন্দিরে গিয়াছেন, আর এক জানানা গাড়ীর ভিতর আছেন। ইহা অবগত হইয়া, কোচোয়ান নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই, নরেন্দ্র অশ্বযানের দ্বার উদ্ঘাটিত করিল; এবং করুণা-কাতর চক্ষে সরসীর মূর্ত্তি দেখিল; এবং বলিল, "আমি ডাক্তার; আমাকে লজ্জা করবেন না; আপনার কোথায় লেগেছে, বলুন।"

সরসী তাহার বাক্যের কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া, নরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল; ভাবিল, ইহার আঘাত গুরুতর হইয়াছে, নচেৎ বাক্‌শক্তি লোপ হইল কেন? নরেন্দ্র ঠিক করিয়া ফেলিল যে, মূর্চ্ছিতাকে অবিলম্বে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে হইবে, এবং শকট-চালক সহজে তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, নরেন্দ্র মনে করিল, বিলম্বে রোগিণীর অনিষ্ট হইতে পারে; সুতরাং সে কোচোয়ানকে ক্রমে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বখশিস দিয়া সম্মত করিল।

সম্মতি পাইয়া, আপন পত্নীকে সংজ্ঞাহীনা এবং অপরিচিতা বোধে সে আপন বলশালী বাহুতে অবলীলা-ক্রমে গ্রহণ করিল; এবং পুষ্প-মালার ন্যায় আপন বক্ষে ধারণ করিয়া, মোটর-ল্যাণ্ডোর ভিতর বৃহৎ আসনে শোয়াইয়া দিল। এবং ত্বরিত গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। চালকের আসনে গিয়া বসিয়া নরেন্দ্র মহাবেগে গাড়ী চালাইয়া দিল।

বহন কার্য্য সমাধা হইলে, বুদ্ধিমান কোচোয়ান ভাবিয়াছিল, এ স্থানে শূন্য গাড়ী লইয়া অবস্থান করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এবং পঞ্চাশ টাকা হজম করা সম্বন্ধে সুবিধাজনক নহে। অতএব সে তৃণ-ভক্ষণ-নিরত অশ্বগণের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

চিকিৎসায় বাধা।

স্বামীর নিজ হস্তচালিত গাড়ীতে যাইতে যাইতে, সরসী ভাবিল, "ইনি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমার বড্ড লেগেছে মনে করে, যদি ইনি আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যান, তা' হ'লেই ত সর্ব্বনাশ! কোথায় যাচ্ছেন, একটু কৌশল করে আগে ওঁর কাছে থেকে জেনে নেওয়া ভাল।" এই ভাবিয়া, যখন ময়দানের মধ্যস্থ পথ দিয়া মোটর গাড়ী ধাবিত হইতেছিল, তখন সরসী সহসা ব্যথিতের কাতর ধ্বনি করিল।

তাহা শুনিয়া, নরেন্দ্র পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে গাড়ী থামাইল; এবং ল্যাণ্ডোর দ্বার খুলিয়া, কল্পিত দুঃস্থার নিকট আসিয়া, অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে প্রশ্ন করিল, 'কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?"

তাহার স্বামীর মত সুবিদ্বান চিকিৎসকের ভ্রম ও বিষাদপূর্ণ মুখ অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দেখিয়া, সরসী, স্বামীকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিয়াছে বুঝিয়া, অত্যন্ত পুলকিতা হইয়া, কাতরাইতে কাতরাইতে কহিল, "আমি আর বাঁচব না। আমায় আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? শ্মশানে?"

নরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল; প্রবল সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "না, না, তুমি বাঁচবে না কেন? আমি তোমাকে হাঁসপাতালে

নিয়ে যাচ্ছি; সেখানে ভাল ডাক্তারকে দেখিয়ে নিশ্চয় তোমায় ভাল করে দেব।"

সরসী ক্রন্দনের অনুনাসিক স্বরে কহিল, "ও মা! হাঁসপাতাল? শুনেছি সেখানে মুর্দ্দফরাসের, মেথরের আর খৃষ্টানের হাতে খেতে হয়; জাত-জন্ম কিছু থাকে না।"

নরেন্দ্র বুঝিল; জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে, চিকিৎসা করাব?"

সরসী কহিল, "কেন, তোমাদের কি বাড়ী নেই? সেইখানেই নিয়ে যাওনা কেন? যদি কখনও ভাল হ'য়ে উঠি, আর যদি তোমাদের দরকার থাকে, তাহ'লে তোমাদের বাড়ীতেই ঝি হ'য়ে থাকব। নয় ত অন্য কোনও যায়গায় একটা চাকরী যুটিয়ে নেয়। আমি যাদের বাড়ীতে এখন কায করি, তারা এই ঘটনার পর, আর আমায় রাখবে না।"

এ কথায় নরেন বুঝিল, এ কোন বড় লোকের বাড়ীর ঝি। কিন্তু চেহারা ত ঝির মত নয়! তা, বড়লোকের গৃহিণী বা কন্যা বধূদের খাস ঝিরা একটু সৌখীনভাবেই থাকে বটে!

নরেন্দ্র করুণ-কণ্ঠে বলিল, "কেন, এ ঘটনার পর রাখবে না কেন? এ রকম দৈব-বিপদ সকলকারই হ'য়ে থাকে!"

সরসী বলিল, "কিন্তু সকলকে ত তোমার মত একজন নবীন যুবা মোটরে তুলে নেয় না। ছি ছি! পরপুরুষ হয়ে তুমি আমায় ছুঁয়েছ! আর কি আমার জাতজন্ম কিছু আছে? কে জানে, আমি যখন অজ্ঞান ছিলাম,—"

নরেন্দ্র বিব্রত হইয়া বলিল, "না, আমি কোনও অন্যায় করিনি; তোমার জাত ঠিক আছে। আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না। তোমাকে আমি আমার গাড়ীতে এনেছি বলে, কেউ যদি চাকরী না দেয়, আমি মাকে বলে তোমাকে আমাদের বাড়ীতেই রেখে দেব। তা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তোমাকে টাকা দেব, তুমি আলাদা বাড়ীভাড়া করে থেকো। সেখানে আমি কেবল দিনে একবায় গিয়ে, তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না, দেখে আসব। এখন শুধু একবার তোমায় পরীক্ষা করে দেখব;—আমার জানা দরকার, আমি নিজে তোমায় চিকিৎসা করতে পারব কি না।"

সরসী স্বামীকে আরও প্রবঞ্চিত করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি একজন ডাক্তার?"

নরেন্দ্র বলিল, "হাঁ।"

সরসী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি আমার চিকিৎসা করতে পারবে না কেন? তুমিই আমার চিকিৎসা করো;—হাঁসপাতালে অমায় দিওনা। তা হলে আমি মরে' যাবো।"

নরেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, বেশ। কিন্তু তোমার যেখানে লেগেছে আমি কেবল সেই যায়গাটা পরীক্ষা করতে চাই।"

সরসী বলিল, "লেগেছে আমার হাঁটুতে। হাঁটুর কাপড়টা তোমার সমুখে খুলতে হবে নাকি? তা ত কোনও মতে পারব না মশাই। তুমি বরং আমার হাতটা দেখনা কেন!" এই বলিয়া ফুল্লপুষ্পদল সন্নিভ আপন ললিত বাম করতল নরেন্দ্রের নয়নাগ্রে ধরিল।

নরেন্দ্র মুগ্ধনয়নে, যেন গোলাপদল বিগঠিত সেই কর-তল ও নবনীত-বিগঠিত সেই প্রকোষ্ঠ অবলোকন করিল। সেই সুকোমল হস্ত আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিল; এবং কিছুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষার কোন উদ্যোগ না করিয়া, আপন স্পন্দিত হস্তমধ্যে তাহার কোমলতা অনুভব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহার প্রেমপ্রবণ করুণ হৃদয়মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হইল; সে তাহার প্রেমময়ীর মুখের সন্ধানে তাহার ঘন অবগুণ্ঠনের উপর অত্যন্ত আগ্রহময় দৃষ্টি স্থাপন করিল।

সরসী আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস কষ্টে প্রশমিত করিয়া আবার রহস্যলীলা আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমার হাত দেখে, আমার পায়ের বেদনাটা কত তা বেশ বুঝতে পারছ ত?"

নরেন্দ্র সরসীর করতল ত্যাগ না করিয়া ম্লানমুখে বলিল, "না!"

সরসী বলিল. "তা হলে তুমি ডাক্তারী জান না।

আমার কি হয়েছে তা আমার মুখে শোন। তোমার এই গাড়ীর ধাক্কা লেগে আমি আমার গাড়ীর মাঝখানের গর্ত্তে মুখ থুবড়ে পড়ে যাই; তাতে আমার দুটো হাঁটুই ভেঙে গেছে—উহু হু!"

নরেন্দ্রের মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল; কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশই আমি করে ফেলেছি! তোমার দুটো পাই আমি ভেঙ্গে দিয়েছি! লক্ষীটি তুমি একবার তোমার ভাঙ্গা হাঁটুটা আমায় দেখতে দাও।" এই বলিয়া নরেন্দ্র আপন করধৃত সরসীর পদ্ম হস্ত অত্যন্ত সন্তর্পণে সরসীর বক্ষের উপর নামাইয়া দিল; এবং সরসীর অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই তাহার চরণদ্বয় ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিল।

সরসী বলিল, "ও মা, কি ঘেন্নার কথা! এখানে? এই প্রকাশ্য রাস্তার মধ্যে?"

নরেন মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, চল।"—বলিয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া, তাহার সেই ঝামাপুকুরের খালি বাসায় গিয়া পৌছিল। সরসীকে নামাইয়া নিম্নতলের একটি কক্ষে শয্যায় শোয়াইয়া তাহার জখম পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইল।

বাস্তবিক সরসীর হাড় ভাঙ্গে নাই; কেবল একটু ক্ষত হওয়ায় কিছু রক্তপাত হইয়াছিল মাত্র। তাহাতে যে ব্যথা হইয়াছিল, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তার আনন্দে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে নরেন্দ্র তাহার চরণ আকর্ষণ করায় সে পুনরায় জানু প্রদেশে ব্যথা অনুভব করিল। সেই ব্যথার জন্য এবং স্বামী কর্ত্তৃক চরণ স্পর্শ পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য সরসী মুখে "উঃ" বলিয়া, আপন সরোজ সন্নিভ চরণদ্বয় বস্ত্র মধ্যে গুটাইয়া লইল।

আঘাত পরীক্ষা করিতে না পাইয়া নরেন্দ্র ম্লানমুখে বসিয়া রহিল।

ম্লানমুখের কি কিছু শোভা আছে? সরসী সেই শোভা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া, আপন অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া ফেলিল। দেখিল তাহার হৃদয়ের ধন, তাহার চরণ তলে ম্লানমুখ নত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ করে ভাবছ কি?"

"ভাবছি……।" কিন্তু নরেন্দ্রের আর কথা বাহির হইল না। সে তাহার অবনত মস্তক তুলিয়া সরসীর দিকে চাহিবামাত্র, উন্মুক্ত অবগুণ্ঠন পথে তাহার হাস্যময় চক্ষের অত্যন্ত কৌতুক ও চাতুরীপূর্ণ অথচ লজ্জাবিজড়িত কটাক্ষ নয়নগোচর করিল। তাহার ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল; সে আর কথা কহিতে পারিল না। মুগ্ধনেত্রে সেই চক্ষের দিকে তাকাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল; ভাবিল, মানুষের চোখ কি এমন সুন্দর হয়?

সরসীও ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে স্বামীর সেই মুগ্ধনেত্র মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কোনও কথা কহিতে পারিল না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, স্বামী এখনও অভুক্ত অবস্থায় আছেন। অতএব সে তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইবার জন্য বলিল, "আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে না?"

নরেন্দ্র চেতনালাভ করিয়া বলিল, "চল, তোমাকে বাড়ীতেই নিয়ে যাই। সেখানে স্ত্রীলোক দ্বারা তোমার আঘাত পরীক্ষা করিয়ে, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো।

দশম পরিচ্ছেদ

দাসী।

নরেন্দ্র বাটীতে পৌছিয়াই, সরসীকে গাড়ীতে ফেলিয়া, ছুটিয়া মাতার কাছে গেল; এবং তাহারই গাড়ীতে আঘাত প্রাপ্তা একটি দুঃস্থা রমণীর বিপদকাহিনী বিবৃত করিয়া বলিল যে, এমত লজ্জাশীলা সুন্দরী যুবতী সে আর কখনও দেখে নাই; এবং এই লজ্জাশীলাকে তাহার স্ত্রীর জন্য নির্দ্ধারিত ত্রিতলের খালি কক্ষ সকল, কয়েকদিনের জন্য ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিল।

মাতা সহজেই অনুমতি দিলেন।

তখন নরেন্দ্র দাসীদিগের সাহায্যে সরসীরকে বহন করিয়া ত্রিতলের নিভৃত কক্ষে লইয়া আসিল।

মা আসিয়া, রোগিণীকে দেখিয়া, "ওঃ" বলিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। নরেন্দ্র, দাসীদিগের দ্বারা ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ করাইয়া তাহা তাহাদিগের দ্বারা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধাইয়া লইল। তাহার পর, সে রোগিনীর সম্মুখে আসিয়া, তাহার অপাঙ্গ রঙ্গময় নয়নের দিকে মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া তাহাকে বলিল, "এইবার একটু দুধ খেয়ে, একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

সরসী আর আপন আনন অবগুণ্ঠাবৃত করে নাই। —সে বুঝিয়াছিল, তাহার মুখাবলোকন করিলেও, নরেন্দ্র তাহাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারিবে না। সে খোলা মুখেই বলিল, "আমার জন্মে তোমার আর ভাবনা নেই। এখন আমি দুধ খাব,—আর বল যদি, দু'খানা মাছভাজাও খেতে পারি; তার পর ঘুমাব, স্বপন দেখব, আর যা' যা' করবার সবই করব। এখন তুমি শীগগির চারটি খাওগে; তোমার মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে?"

এতদিন নরেন্দ্রই কেবল তাহার প্রেমপাত্রীদিগের প্রতি করুণা ও সহানুভূতি দেখাইয়াছিল; কিন্তু নিজে কখনও তাহাদিগের করুণা বা সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। আজ সে তাহার বুভুক্ষিত উদর লইয়া, তাহার সৌন্দর্য্যময়ী প্রণয়পাত্রীর নিকট এই অনাস্বাদিত অভিনব সহানুভূতি পাইয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিল। পুলকপূর্ণ মুখে কহিল, "তুমি কেমন করে বুঝলে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে?"

সরসী বলিল, "তোমার শুক্‌নো মুখ দেখে; আর তোমায় যে আমি বড্ড······কিন্তু সে কথা আমি পরে বলবো; এখন তুমি খেতে যাও।"

নরেন্দ্র বলিল, "কিন্তু আমার ত আজ বাড়ীতে খাওয়া হবে না। সকালে যেখানে যাচ্ছিলাম সেইখানে খেতে হ'বে। কালীঘাটে আমার নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা হয় ত আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

সরসী হাসিয়া বলিল, "তা যাচ্ছ, যাও; কিন্তু এবার যেন আমার মত আর একটিকে যুটিয়ে এন না। তা'হলে আমি রাগ করবো।"

নরেন্দ্র সেই ভুবনমোহন হাসি দেখিল; সেই সুধাময় কৌতুকবাক্য শুনিল; প্রীতিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল; কহিল, "না, না, তুমি রাগ কোর না; আমি আর কাউকে আনব না। সেখান থেকে খেয়ে, বেলা দু'টার সময়, ফিরে আসবো।"

নরেন্দ্র নিজ বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল।

স্বামী চলিয়া গেলেই, সরসী শ্বাশুড়ীকে সকল কথা বলিল। সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের দুশ্চিন্তা নিবারণ জন্য তখনই ট্যাক্সিতে লোক ছুটিল। সরসী যথাসময়ে আসিয়া আবার রোগিণী সাজিয়া শয্যায় শয়ন করিল ও শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। নরেন্দ্র দুইটার সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিয়া সরসীর নিদ্রিত মুখ নীরবে ও মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিল; এবং জানুপ্রদেশ, তস্করের ন্যায় স্পর্শ করিয়া, অনুভব করিয়া লইল ক্ষতস্থানের বন্ধনটা ঠিক আছে কি না?

সরসী জাগরিত হইয়া সেই আগ্রহময় দৃষ্টি দেখিয়া কি ভাবিয়াছিল কে জানে!

সেই অবধি, নরেন্দ্র সকালে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ সরসীর সরস কথা শুনিতে লাগিল। প্রত্যহ পূর্ব্বদিন অপেক্ষা, তাহার রোগীকে পরীক্ষা করিবার কাল দীর্ঘ হইতে লাগিল; প্রত্যহ তাহার প্রেমপূর্ণ নয়নের আগ্রহ আরও অধিক হইতে লাগিল।

সেই আগ্রহপূর্ণ নয়নের দৃষ্টিতলে, সরসী কোনও ক্রমে আপনাকে সংযত রাখিয়া, আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু পক্ষকাল পরে, সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। বলিল, "তুমি সব সময় আমাকে দেখতে আস ব'লে, এবাড়ীর লোক মনে করে যে, তুমি বুঝি আমায় ভালবেসে ফেলেছ।"

নরেন্দ্র সরল ভাবে স্বীকার করিল, "সত্যিই আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। আর আমার মনে হয়, তোমারও আমার দিকে একটু সহানুভূতি আছে।"

সরসী হাসিয়া বলিল, "ওমা! ওমা কি হবে! তুমিও আমায় ভাল বেসেছ? শেষে তুমি আমায় বিয়ে করে ফেলবে না তো?"

নরেন্দ্র বিষণ্ণ মুখে বলিল, "তা যদি সম্ভব হ'ত!"

সরসী সমদুঃখীর ন্যায় বলিল, "তার জন্যে আর দুঃখ কেন? বিয়ে না হ'ক, তুমি ত অনায়াসে আমাকে তোমাদের বাড়ীর একজন দাসী করে রাখতে পার। আমি ত আগে তাই চেয়েছিলাম।"

নরেন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "কি! আমার ভালবাসার জিনিষকে দিয়ে আমি এঁটো বাসন মাজিয়ে নেব?"

সরসী বলিল, "তা, বাসন মাজতে না দাও, এ দাসীকে তোমার চরণ সেবা করতে দিও। এই পনের দিন, তুমি আমার ভাঙা পায়ের সেবা করেছ; এখন আমি ভাল হ'য়েছি, এখন আমি তোমার ভাল পায়ের সেবা করবো।"

এই বলিয়া সরসী সত্বর উঠিয়া, আপনার মস্তক নরেন্দ্রের পদতলে লুণ্ঠিত করিয়া দিল।

তাহার পর, নরেন্দ্র ক্রমে সরসীর সকল পরিচয়ই শুনিল।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ইতিহাস

(মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও ভদ্র মহোদয়গণ,

এই বিদ্বজ্জন-ভূয়িষ্ঠ পরিষদে ইতিহাসের সভাপতি পদে বরণ করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে মহৎ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই গৌরবময় পদমর্য্যাদার দাবী করিতে পারি এমন যোগ্যতা যে আমার নাই তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তবে বর্ত্তমান কালে সম্ভবতঃ কলির প্রভাবেই যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ এই মহৎ নীতির বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক নানা ক্ষেত্রে অযোগ্যকে উচ্চ পদ দেওয়াই রীতিসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই রীতি প্রয়োগে কৃতসংকল্প হইয়া আপনারা ইতিহাস শাখায় তাহার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। 'কালো হি বলবত্তরঃ'—কালের প্রভাব আপনারাও এড়াইতে পারেন নাই—আমিও না—সুতরাং আমার অযোগ্যতার বোঝা লইয়াই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি।

বাঙ্গালার অতীত গৌরবের কেন্দ্রস্থল বিক্রমপুর—আমাদের অদ্যকার এই মিলন ক্ষেত্র ঐতিহাসিকগণের পবিত্র তীর্থ। বিক্রমপুর বাঙ্গালার কীর্ত্তিমুকুটের মধ্যমণি, বাঙ্গালার মহিমাকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্কর। এই নদনদী পরিবেষ্টিতা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালীর বিক্রম উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সেন পাল চন্দ্র বর্ম্ম প্রভৃতি প্রথিত বীরবংশের রাজগণ এই বিক্রমপুরে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া ইহাকে সার্থকনামা করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের বীর-বিক্রম-কাহিনী বাঙ্গালীর গৌরব গাথা। দুর্দ্ধর্ষ তুরস্ক সৈন্য যেদিন আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগরিমা লোপ করিয়া সিন্ধু হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, সেদিনও আর্য্য রাজলক্ষ্মী আর্য্যাবর্ত্তের এই পূর্ব্বপ্রান্তে শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। প্রদীপ নিবিবার আগে যেমন শেষ একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে—তেমনি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বীর-বিক্রম বাঙ্গালার অস্তায়মান গৌরব রবির শেষ রশ্মি উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

কিন্তু কেবল বাহুবলই যে একমাত্র বল নহে, ভারতবর্ষ চিরদিনই এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে। ভারতের রাজকুল-চূড়ামণি, মৌর্য্য সম্রাট অশোকবর্দ্ধন এই সারসত্য উপলব্ধি করিয়া ইহা পর্ব্বতগাত্রে চিরদিনের জন্য অমর

করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মযুদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই কৃপায় বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্ম পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই নবীনতর গৌরবের ক্ষেত্রেও বিক্রমপুরের কীর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই বিক্রমপুর হইতেই একদিন ধর্ম্মযুদ্ধের বিজয় যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি শ্রীজ্ঞান অথবা অতীশ দীপঙ্কর এই বিক্রমপুর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিবারি লইয়া দুর্গম তিব্বতের চির-পিপাসিত নরনারীর ভক্তিপ্রণত শীর্ষে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আজও সেই দূর দেশের অধিবাসীরা বিক্রমপুরের এই শান্তিসেনার নায়ককে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। বিক্রমপুর বাঙ্গালার রাজগণ ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উভয়েরই জয়স্কন্ধাবার হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ আর সে জয় স্কন্ধাবার নাই, আজ আর বাঙ্গালীর বীর পদভরে মেদিনী কম্পিত হয় না, আজ আর বাঙ্গালীর ধর্ম্মদেশনার আশায় দূরদেশ-বিদেশের অধিবাসীরা উন্মুখ হইয়া থাকে না। বিক্রমপুরের অতীত গৌরব সকলই গিয়াছে কিন্তু ইতিহাসের কৃপায় তাহার স্মৃতিটুকু আছে—এই ক্ষীণ স্মৃতিটুকুই এখনও বাঙ্গালীর পরম ও চরম গৌরব। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—বাঙ্গালীর চাহিবার এক স্থান আছে নবদ্বীপ। আমি বলি, বাঙ্গালীর চাহিবার আর এক স্থান আছে তাহা বিক্রমপুর।

বঙ্কিমবাবু ও বর্ত্তমান ইতিহাস।

বঙ্কিমবাবু যেদিন বড় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সাহেবরা পাখী মারিতে গেলেও তাহার ইতিহাস থাকে কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই"—সে দিন আর এ দিনে অনেক প্রভেদ। তখন মুশলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থই আমাদের প্রধান উপজীব্য ছিল। তাই মুশলমান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ জয়ই বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত। বাঙ্গালার গৌরব-শ্মশান নো-দিয়া নামক সহরে সে চিতাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল কেবল তাহারই রক্তিমচ্ছটায় তখন বঙ্গদেশের অতীত ইতিহাস উদ্ভাসিত হইত। কিন্তু আজ ঐতিহাসিকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অতুল অধ্যবসায়ে বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রকৃত উপকরণ ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইতেছে। অবশ্য এ কার্য্য খুব অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই; কিন্তু যাহা হইয়াছে—তাহা সামান্য হইলেও নগণ্য নহে। মুষ্টিমাত্র হইলেও তাহা স্বর্ণমুষ্টি। বাঙ্গালাদেশের স্বনামখ্যাত দুইজন মনীষী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নবসংগৃহীত উপকরণগুলির সাহায্যে বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া এই স্বর্ণমুষ্টি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি রাখালবাবুর ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। উপন্যাসপ্লাবিত বঙ্গদেশে ইতিহাস গ্রন্থের এইরূপ আদর ও সম্মান দেখিয়া মনে হয় যে বাঙ্গালার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থের রচনার আশা সুদূর-পরাহত নহে।

কিন্তু কেবল বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস আলোচনাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত নহে। বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের এক অংশ মাত্র এবং তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ; সুতরাং বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। সুখের বিষয় অনেক বাঙ্গালী লেখক এবিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য এযাবৎ তাঁহাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলদ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সমুদয় তথ্য আধুনিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে একখানি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই। আজকাল এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। সম্প্রতি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বি-এ ও এম-এ শ্রেণীতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উঠিয়াছিল—কিন্তু বঙ্গভাষায় লিখিত উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব এই প্রস্তাব গ্রহণের বিষম অন্তরায় হইয়াছে।

সত্য বটে বাঙ্গালা মাসিক পত্রসমূহে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইগুলি অধিকাংশ স্থলেই বঙ্গ সাহিত্যের

অগৌরব। কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে, ঐ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কি কি আলোচনা হইয়াছে।—তত্তৎ আলোচনার সারসংগ্রহ করিতে পারিলেই প্রবন্ধের গৌরব হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, প্রবন্ধলেখক আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে কি গবেষণা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষার শৈশব অবস্থায় যে কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধই আদৃত হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের এখন সে অবস্থা আর নাই—সুতরাং জগতের সাহিত্যের সমক্ষে স্বীয় গৌরব প্রতিপন্ন করিতে হইলে ইহাকে নূতন পথে চালিত করিতে হইবে। কিছুদিন হইল কোন কোন মাসিক পত্রে 'বেতালের বৈঠক' অথবা অনুরূপ নামধারী একটি অংশে নানা বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর ও আলোচনা দেখিতে পাই। ইহাতে অনেক গুরুতর ঐতিহাসিক তথ্যের উত্থাপন ও মীমাংসা নিয়মিত ভাবেই হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিতে চাই না—কিন্তু ঐতিহাসিক প্রশ্নোত্তরগুলি দেখিলে অনেক সময় হাস্য সম্বরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠে। আবার অনেক সময়ে প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে যে সব সংবাদ দেওয়া হয় তাহা পড়িয়া মনে হয় যে উত্তরদাতা ৫০ বৎসরের পুরাতন লোক—গত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে ঐতিহাসিক জগতের কোন খবরই রাখেন না। যেমন একজন প্রশ্ন করিলেন যে, অমুক বিষয়ে জানিতে হইলে কি কি গ্রন্থ 'পড়া আবশ্যক'—উত্তরে এমন কয়েকখানি বইয়ের নাম করা হইল যাহা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার কোনই মূল্য নাই। অপর পক্ষে নূতন তথ্যপূর্ণ ঐ বিষয়ের যে সমুদয় গ্রন্থে প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই। দুইশত বৎসর পরে যদি কেহ এই মাসিক পত্রগুলি আলোচনা করেন, তবে তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালাদেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চা-সম্বন্ধে যে ধারণায় উপস্থিত হইবেন—তাহা বাঙ্গালীর বা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বাঙ্গালী এখন প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন এবং তৎসম্বন্ধে সুলিখিত প্রবন্ধও বাঙ্গালা মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সিন্ধুনদের গর্ভ হইতে অতি প্রাচীন সভ্যতার যে সমুদয় নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে অনেক গুলি সুলিখিত প্রবন্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয় এই আবিষ্কারের বিবরণ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্রেই প্রকাশিত হয়। ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব। কিন্তু এই সমুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি বিনা বিচারে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও আলোচনা সকল প্রকাশিত হয় তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব ম্লান হয়। ইহার জন্য, আমার মতে, মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের দায়িত্ব খুব বেশী। যত দূর জানি, তাহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পরীক্ষা বা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহারা কোন আয়াসই স্বীকার করেন না। পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ হস্তগত হইলেই তাহা ছাপাইয়া দেন। অবশ্য আমার এই অনুমান হয়ত সত্য নহে, অথবা মাত্র আংশিক ভাবে সত্য; কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস যে, কারণ যাহাই হোক, ফলের জন্য মুখ্যতঃ সম্পাদকগণই দায়ী। আশা করি সম্পাদক মহাশয়েরা আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং এই সমালোচনায় কোনরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণ আরোপ করিবেন না।

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্য সুসমৃদ্ধ ও গৌরবপূর্ণ করিতে হইলে আমাদের আরও কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক রচনা সরস ও লিপিকৌশলযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে কোন প্রকারে কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ ও আলোচনা করিলেই প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের গৌরব রক্ষিত হয় না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "যাহা কিছু লিখিবে সুন্দর করিয়া লিখিবে"—এই অমূল্য উপদেশটি ঐতিহাসিক লেখক মাত্রেরই স্মরণ রাখিতে হইবে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও

প্রবন্ধ যে আজকাল অনেকের নিকট ভয়াবহ বস্তুতে পরিণত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ রচনায় সৌকুমার্য্যের অভাব। এই অভাব দূর করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণে ইতিহাসের আদর হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইংরেজী ভাষায় লর্ড মেকলে, গ্রীণ, আর্ণল্ড প্রভৃতির সরস ঐতিহাসিক রচনা সাধারণ পাঠকের মধ্যে ইতিহাস চর্চ্চার পথ সুগম করিয়াছিল। অবশ্য সকলেরই এইরূপ লিপিকুশলতার ক্ষমতা নাই। কর্কশ শিলাখণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের রচনার মধ্যে সরসতার অভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্য ও সাধনার ফলে সরস লিপিচাতুর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। পেশাদার ঐতিহাসিকগণ মালমসলা সংগ্রহ করিতেছেন, এখন সুরম্য সাহিত্য-শিল্পিগণ যদি দক্ষ মণিকারের ন্যায় তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া অপূর্ব্ব রত্নহার রচনা করিয়া বঙ্গভারতীর কণ্ঠে উপহার দিতে পারেন, তবেই আমাদের আশা সফল হয়।

তারপর ঐতিহাসিক বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রায়শঃই ভারতবর্ষের ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই লিখিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে যে বিশাল জগৎ, তাহার হাওয়া সাহিত্যকে এক প্রকার স্পর্শ করে নাই বলিলেই চলে। কোন কোন মাসিক পত্রে বর্ত্তমান জগৎ নামক অধ্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত একটু আধটু বিবরণ থাকে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বর্ত্তমান জগতের ইতিহাস ও সভ্যতার সম্বন্ধে সুলিখিত প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান জগতের ইতিহাস ও সভ্যতার বিবরণ বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে এরূপ অপাংক্তেয় হইবার কারণ কি? ভারতবর্ষ বর্ত্তমান জগতের এক অংশ ও ইহার সহিত অর্দ্ধাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ। বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষ কখনও বাঁচিতে পারিবে না। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ত্তমান ইতিহাসের কোন ছায়াপাত পর্য্যন্ত নাই বলিলেই চলে, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। অবশ্য কোন কোন মাসিকপত্রের মন্তব্য নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে—কিন্তু ইহার সহিত প্রকৃত ঐতিহাসিক আলোচনার প্রভেদ খুব বেশী। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে কত রাজ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মানব সভ্যতা কত নূতন পথে অগ্রসর হইতেছে, কত নূতন নূতন ঐতিহাসিক সমস্যা জগতের রাজনীতিবিদ্‌গণকে বিচলিত করিতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও তো শুনিতে পাইতেছি না। আবার বলিতেছি, বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদকগণের এ বিষয়ে দায়িত্ব খুব বেশী। মাসিকপত্রই আজকাল লোকশিক্ষার প্রধান উপায়। সুতরাং মাসিক পত্রে এই সমুদয় আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইবে এবং বাঙ্গালার লোকশিক্ষারও বিশেষ সহায়তা হইবে।

বর্ত্তমান ছাড়িয়া প্রাচীন জগতে গেলেও বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা পদে পদে উপলব্ধি হইতে থাকে। ভারতবর্ষের বাহিরে যে প্রাচীন সভ্যতা ছিল তাহারও আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে দেখিতে পাই না। এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যে ভারতসভ্যতা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারও কোন আলোচনা প্রায়শই দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্য এশিয়ার ভূগর্ভখনন করিয়া প্রাচীন ভারত-সভ্যতার কত অমূল্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইল—তৎসম্বন্ধে কত বিপুলকায় গ্রন্থ ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার কোন সাড়াশব্দ নাই। পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতবাসিগণ যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বঙ্গোপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে যে তাহারা নব ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিগত পঁচিশ বৎসর অনুসন্ধানের ফলে সে সম্বন্ধে কত রাশি রাশি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার কোন প্রতিধ্বনি নাই। চীন দেশের সহিত ভারতবর্ষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সে

সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে—কিন্তু এখনও তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অপরাপর প্রাচীন সভ্যতারও আলোচনা আবশ্যক। তুলনামূলক সমালোচনা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। প্রাচীন আসিরীয়া, ব্যবিলনীয়া, মিশর, ক্রীট, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের আলোচনাও অন্ততঃ এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই অন্যান্য দেশের ইতিহাসের আলোচনা হয়—ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব দেশেই ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট আয়োজন আছে; অথচ আমাদের দেশে ইহা চিরকালই উপেক্ষা ও অনাদর লাভ করিয়া আসিতেছে ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়।

অথচ বঙ্গ সাহিত্যের এই অভাব দূর করিতে হইলে খুব বেশী পাণ্ডিত্য বা পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। ইংরাজী ভাষায় যে সমুদয় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিত হয়—তাহার সাহায্যে অতি অল্প আয়াস স্বীকার করিলেই বঙ্গ ভাষায় এই সমুদয় বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করা যায়। ইউরোপীয় অন্য ভাষা জানা থাকিলে তো কাজটী আরও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ ভাবে বিদেশীয় সাহিত্যের দোহন করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর অনেক যুবক ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ইঁহারা সকলেই স্বাধীনভাবে গবেষণার সুযোগ ও সুবিধা পান না। সুতরাং তাঁহারা যদি বিদেশীয় গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্যে এই সমুদয় জ্ঞান ভাণ্ডার মাতৃভাষায় দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করেন তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসই আলোচিত হয়। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ভাবে হয় না। ইতিহাস বলিতে কেবল রাজবংশের কাহিনী ও প্রসিদ্ধ ঘটনামাত্র বুঝায় না; ইতিহাসের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাতে মানব সভ্যতার সকল বিভাগেরই ক্রমবিবর্ত্তনের বিবরণ থাকা চাই। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন সভ্যতা সমাজ প্রভৃতির বিশেষভাবে আলোচনা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে আমরা সামাজিক বিপ্লবের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিষয় আলোচনা ব্যতীত আমাদের সঠিক পথ-নির্দ্দেশ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। অথচ সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক আলোচনার বিশেষ অভাব। স্ত্রী শিক্ষার অভাব, অবরোধ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ দেখিতে পাই, কিন্তু অতীত ইতিহাসের অন্ধকার ভেদ করিয়া এ সমুদয়ের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির মূলতথ্য নির্দ্ধারণের বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে না। অতীতের ভিত্তির উপরই ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সুতরাং অতীতের সঠিক বিবরণ জানা একান্ত আবশ্যক। আর কেবলমাত্র ঘটনা পরম্পরা জানিলেই সঠিক বিবরণ জানা যায় না। এই সমুদয় ঘটনার পরম্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের মূল লক্ষ্য প্রাচীন কালের তথ্য উদ্‌ঘাটন করা। কিন্তু সেই সমুদয় তথ্যের সাহায্যে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রাচীন কালের সভ্যতা ও সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা ও তাহার ভবিষ্যৎ গতি নির্দ্দেশ করা ঐতিহাসিকের প্রধান কার্য্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম। এই যুগে ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। আমাদের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা এখন ভক্তি ভাব ও অন্ধ বিশ্বাসের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তৎপরিবর্ত্তে এখন ঐতিহাসিক সত্যের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কঠোর ঐতিহাসিক সত্যের সাহায্যে প্রত্যেক সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর হইতে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা একটু

পরিষ্কার হইবে। সমাজ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইলেই অনেকে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সনাতন অপরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম জিনিষটি কি? ইতিহাসে ইহার কোন স্থান নাই—ইহার একমাত্র ভিত্তি আমাদের চিরাগত সংস্কার। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; যে সমুদয় সামাজিক আচার ও ব্যবহার আমরা এখন হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া জ্ঞান করি এককালে হিন্দু সমাজে তাহার অস্তিত্বই ছিল না। এখানে ঐতিহাসিক সত্যের সহিত সংস্কারের বিরোধ; সুতরাং দৃঢ়ভাবে, নানা দিক দিয়া এই ঐতিহাসিক সত্যের আলোচনা করিতে হইবে। ইতিহাস সত্যের উপাসক। আমাদের সংস্কার ও ভাবে যত বড় আঘাতই লাগুক না কেন সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। ঐতিহাসিক জাতি, ধর্ম্ম, দেশ প্রভৃতির সকল বন্ধন এড়াইয়া নির্লিপ্তভাবে কেবল সত্যের অনুসন্ধান করিবেন ও মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিবেন। তাঁহার জাতীয় গৌরব, ধর্ম্ম বিশ্বাস ও দেশাত্মবোধ যতই ক্ষুব্ধ হউক না কেন, তাঁহাকে সত্য প্রচার করিতেই হইবে। সত্যের সহিত কোনরূপ আপোস করা চলিবে না। এই মহান লক্ষ্য ও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে লইয়া ঐতিহাসিককে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহাকে চিরকাল অসত্য ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, কারণ সন্ধি অসম্ভব।

কথাগুলি শুনিতে ভাল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে সহজসাধ্য নহে। সম্প্রতি আমাদের দেশে এক প্রকার সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা অতীতকে গৌরবময় দেখিতে চায়—এবং বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে তাহাই ভাল ইহা ঘোষণা করিতে ব্যস্ত। ইতিহাস অনেক স্থলেই এইরূপ দেশাত্মবোধের সহায়ক হয় না। সুতরাং ইহারা ইতিহাসকেই পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রচলিত শিশুপাঠ্য ইতিহাসের দুরবস্থা দেখিয়া আমার কোন বন্ধু একখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি ইহা পাঠ্য করিলেন না; কারণ ইহাতে লেখা ছিল যে তৈমুরলঙ্গ নিষ্ঠুর হত্যাকারী ও আকবর মদ্যপায়ী ছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই উভয় ঘটনাই সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতিও তাহা স্বীকার করেন। তবে এই সমুদয় ঐতিহাসিক সত্য পাঠ করিয়া কোমলমতি শিশুগণের স্বীয় সমাজ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা হইতে পারে এই নিমিত্ত সমিতির সভ্যগণ উক্ত পুস্তক পাঠ্য করিলেন না। আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের এইরূপ সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ইহা দ্বারা মুসলমান সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও পরোক্ষে হিন্দু সমাজের উদারতা ঘোষণা করিলেন। বোধ হয় উপরে ভগবান তখন হাসিতেছিলেন। কারণ কিছুদিন পরে, পশ্চিম বঙ্গের পাঠ্য পুস্তক সমিতির হস্তে আর একখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের বিচারভার পড়িল; তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ্য করিলেন না, কারণ ইহাতে লেখা ছিল যে বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ অন্য জাতির কন্যা বিবাহ করিতেন ও বিভিন্ন জাতির প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতেন। শুনিয়াছি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণ মহাসমাজ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া বাঙ্গালার ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ঘটনাটি সামান্য হইলেও ইহা আমাদের মানসিক বিকারের যে পরিচয় প্রদান করে তাহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। মিথ্যার উপরে কোনও জাতি নিজের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়িতে পারে নাই, হিন্দু ও মুসলমান কেহই পারিবেন না। সত্য অপ্রিয় হউক অথবা প্রিয় হউক তাহাকে বরণ করিতেই হইবে। যাহারা দেশের ও সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাদিগকে এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অসত্য ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত তুচ্ছ করিয়া সত্যের বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিয়া ইতিহাসের ক্ষুদ্র তরণীখানি সাহিত্য সমুদ্রে ভাসাইতে হইবে।

কেবল বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে

নহে, অপেক্ষাকৃত ছোট খাট বিষয়েও ঐতিহাসিক জ্ঞানের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক ব্যভিচারের বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। নাটক অথবা উপন্যাস যে ইতিহাস নহে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু যিনি ঐতিহাসিক নাটক অথবা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি একেবারে নিরঙ্কুশ একথা স্বীকার করিতে পারি না। ঐতিহাসিক সত্যের দায়িত্ব-ভার যিনি বহন করিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি অনায়াসেই ঐতিহাসিক নামগুলির পরিবর্ত্তে কল্পিত নাম ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিক নামের সঙ্গেই কতকগুলি ভাব ও স্মৃতি বিজড়িত আছে, নাট্যকার হিসাবে এগুলি তাহার বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু যদি তিনি ইতিহাসের নিকট হইতে সুবিধাটুকু আদায় করিতে চাহেন তবে অসুবিধাটুকুও তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক যদি ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন তবে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। যে সমুদয় ঘটনা অথবা আচার ব্যবহার সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক বা নাট্যকার কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কিন্তু যে সমুদয় ঘটনা বা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই; যাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং যেখানে ঐতিহাসিকের অগ্রসর হইবার কোনই উপায় নাই, সেখানেই নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিকের অব্যাহত গতি। তিনি সেইখানে তাঁহার সৃষ্টিকুশল কল্পনাকে অবাধ গতি প্রদান পূর্ব্বক নব নব রসের উদ্ভাবন করিয়া ইতিহাসের নীরস শুষ্ক তরুকে বিচিত্র পত্রপুষ্প শোভিত করিয়া তুলিতে পারেন। কেবলমাত্র এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যাহা জ্ঞাত অথবা সুপরিচিত সত্য, তাহার সহিত এই কল্পনার কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য না হয়।

কেবল নাট্যগ্রন্থ নহে, রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয়েও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ পদে পদে ঘটিয়া থাকে। অনেকস্থলেই বসন ভূষণ পরিচ্ছদ অথবা দৃশ্যাবলী প্রভৃতি কোন বিষয়েই ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। অবশ্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলতা বহু ব্যয়-সাপেক্ষ এবং সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। কিন্তু বিনা ব্যয়ে অথবা স্বল্প ব্যয়েও যাহা করা যাইতে পারে, কেবলমাত্র কর্ত্তৃপক্ষের অনবধানতায়, ঔদাসীন্যে অথবা জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহা হইতেছে না। প্রাচীন ভাস্কর্য্য অথবা চিত্রাবলীর আলোচনা পূর্ব্বক দৃশ্যাবলী ও পরিচ্ছদের যথাসাধ্য সংস্কার সাধন করিয়া অনায়াসেই আমাদের অতীত সভ্যতার চিত্রটিকে দর্শকের মানসচক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় এবং ইহা শিল্প ও জ্ঞান উভয়েরই প্রসারে সহায়তা করে। সুখের বিষয় এ বিষয়ে রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি একটু আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি মনোমোহন নাট্যমন্দিরে সীতা নামক নাটকের অভিনয়ে উক্ত নাট্যাধিকারীর ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াস দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি দৃশ্যাবলী, পরিচ্ছদ, নৃত্যকলা প্রভৃতির ভিতর দিয়া অতীত যুগের চিত্রটি আমাদের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই নাটকটির প্রারম্ভে কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'কথা কও' শীর্ষক সুপরিচিত কবিতাটি সুর তান সহযোগে গীত হয়, ইহাতেই নাট্যাধিকারীর সূক্ষ্ম অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিকই সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতির ভিতর দিয়া অনাদি ও অনন্ত অতীতকে কথা বলাইতে হইবে। যুগ যুগান্তের যে কত চিরন্তন বাণী স্তব্ধ হইয়া আছে—তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইতিহাসের উদ্দেশ্য অতি মহান্। তাহার সাধনের উপায়ও অতি বিচিত্র। মৌন নির্ব্বাক অস্পষ্ট অতীতকে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করিতে হইবে, তাহার অভেদ্য কুহেলিকার বর্ম্ম ভেদ করিতে হইবে। এই বিজয় যাত্রার অভিযানে ঐতিহাসিক বন জঙ্গল কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দেন, পরে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও নাট্যাধিকারী তাঁহাদের বিচিত্র জয় সম্ভার লইয়া ঐ পথে অগ্রসর হন।

স্থূল কথা এই যে, আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসকে দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থে সীমাবদ্ধ না করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিতে হইবে। আমাদের এই জাতীয় নব জাগরণের দিনে ইতিহাসকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে জাতির অতীত আছে, তাহার ভবিষ্যতের ভরসাও আছে। বর্ত্তমান যুগে গ্রীস ও ইটালী যে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, অতীত যুগের স্মৃতি ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারিত কি না সন্দেহ। অতীতের স্মৃতি, শক্তি ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং জাতীয় জীবনের জড়তা দূর করিয়া ভবিষ্যৎ গৌরবের পথ নির্দ্দেশ করে। অতীতের ভিত্তির উপর প্রকৃত দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা যেরূপ সহজ ও দৃঢ় হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং জাতীয় জীবন উদ্বোধনের এই মহান্ সহায় যাহাদের পক্ষে দুর্লভ নহে তাহাদের ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। আজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিজ্ঞানশক্তির তীব্র প্রভাবে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হইয়াছে—সুতরাং শিক্ষা-কেন্দ্র মাত্রেই বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা উড্‌ডীন হইয়াছে। আজ বিদ্যার্থিগণ বিজ্ঞানের কুহকেই মুগ্ধ; বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে যাহা কিছু আছে সকলই অনাদৃত ও উপেক্ষিত। জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা খুবই সত্য, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের শক্তি অদ্ভুত হইলেও অসীম ও অনন্ত নহে। বিজ্ঞান জড় পদার্থের উপর আধিপত্য সৃষ্টি করিয়াছে, আকাশ বাতাস জল স্থল তাহার দানবীয় শক্তিতে পরাভূত হইয়াছে, কিন্তু মানবাত্মার উপর তাহার কোন প্রভাব নাই। বিজ্ঞান অপূর্ব্ব যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। বিজ্ঞানের বলে এই জাতির মধ্যে নব নব শক্তির উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান কখনও এই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। যদি এই মৃত জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হয়, তবে ইতিহাসকেই মূল সাধন স্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, কিন্তু ইতিহাস যেমন বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিতে পারে না, বিজ্ঞানও তেমনি ইতিহাসের অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। প্রাণহীন শক্তি কেবল উপদ্রবের সৃষ্টি করে, আবার শক্তি ব্যতীত প্রাণবানকেও দুর্ব্বল পঙ্গু হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। জাতীয় জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল একটিকে মাত্র অবলম্বন করিলে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব।

দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্র গুলিতে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্রমশঃই কমিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—তাহাতে 'ইতিহাস' পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে একখানি ঐতিহাসিক পাঠ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ইতিহাসের গুরুত্ব যে শিক্ষার্থিগণের নিকট পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় যদি শিক্ষার্থিগণ ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত না হয়, তবে পরবর্ত্তী আই-এ, বি-এ, ও এম-এ, পরীক্ষা গুলিতেও ইতিহাসের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কমিবে—কারণ ইহার কোনটিতেই ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত নহে; পরন্তু শিক্ষার্থিগণের নির্ব্বাচন সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব হইতে কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মিলে পরবর্ত্তী কালে স্বেচ্ছায় তাহা নির্ব্বাচন করার খুব বেশী সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপেক্ষা ও জনসাধারণের অনাস্থা অগ্রাহ্য করিয়াও ইতিহাস শাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে। যে কয়েকজন মনস্বী এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। এই বিষয়ে বাঙ্গালাদেশকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। বাঙ্গালার কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুনদের গর্ভ হইতে বহু প্রাচীন সভ্যতার যে সমুদয় নিদর্শন বাহির করিয়াছেন তাহা দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর

এই আবিষ্কার কাহিনী এখন জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—অনেকেই আশা করিতেছেন ইহাতে প্রাচীন সভ্যতার এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কৃত হইবে। একজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক দ্বারা এই আবিষ্কার কার্য্য সম্ভব হইয়াছে—ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু বড় বড় আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকিয়াও, তাঁহার নিজের দেশের কথা বিস্মৃত হন নাই। সম্প্রতি তিনি রামপালের নিকটবর্ত্তী হরিশ দীঘিতে খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; ইহাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক মালমশলা আবিষ্কৃত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

বাঙ্গালার আর এক কৃতী সন্তান দীঘাপতিয়ার রাজবংশধর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাঙ্গালার অতীত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। যদি কোনও দিন বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের উদ্ধার সম্ভবপর হয় তবে তাহার মূলে শরৎকুমারের উদ্যম ও যত্ন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি পাহাড়পুরে যে খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অল্প দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত আশাহত হইয়াছি। যখন পাহাড়পুরের খননকার্য্য আরম্ভ হয় তখন অনেকেই ইহার সফলতার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন—বাঙ্গালাদেশে এরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানের এই প্রথম সূচনা সমস্ত দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শুভ ইচ্ছার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কিন্তু অকস্মাৎ এক অন্তর্বিরোধ এই শুভ কার্য্যের মহৎ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। এ বিষয়ে কে দোষী কে নির্দ্দোষী তাহার বিচার করিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আমাদের নাই; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের সমগ্র ঐতিহাসিকগণের পক্ষ হইতে আমি কুমার বাহাদুরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি তিনি যে উপায়েই হউক তাঁহার আরব্ধ মহৎ অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের এই বাৎসরিক সম্মিলন যেন কেবলমাত্র দিবসব্যাপী উৎসবে পর্য্যবসিত না হয়। যাহাতে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইতিহাস-গঠনে সহায়তা করিতে পারে, তাহার জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। ঐকান্তিক অনুরাগ ও সাধু সংকল্প থাকিলে অনেকেই সাধ্যানুসারে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিতে পারেন। কার্য্য-উপলক্ষ্যে যে সমুদয় ভদ্রমহোদয়গণ বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাস করিতেছেন তাঁহারা স্বল্প আয়াসেই ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিবরণ, প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রফলক সংগ্রহ, প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য স্থানীয় লোকের পক্ষে খুব ব্যয়সাধ্য বা কষ্টসাধ্য নহে। এখনও বঙ্গদেশের নানা স্থানে কত প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রফলক কর্ম্মকার ও সুবর্ণকারের হস্তে ধ্বংস হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনেক সময় বাহিরের লোকের পক্ষে এ সমুদয়ের সংবাদ রাখাই অসম্ভব। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা করিলেই এই সকল অমূল্য জিনিষ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অন্ততঃ তাঁহারা যদি এই সমুদয় সংবাদ ঐতিহাসিকগণকে অথবা সাহিত্যপরিষৎ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কিংবা ঢাকা মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানান, তাহা হইলেও অনেক জিনিষের উদ্ধার হইতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার করা অতীব মহৎ ও দুঃসাধ্য কার্য্য, দশের ও দেশের সাহায্য ব্যতীত ইহা একেবারে অসম্ভব। এই বাৎসরিক সম্মিলনী যদি আমাদের সকলের মনে এই বিষয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগাইয়া তোলে, তবেই ইহার ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান সফল বলিয়া মনে করিতে হইবে। সকলের পক্ষেই বড় কার্য্য করিবার সুবিধা ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে না—কিন্তু সাধ্য ও সুবিধার অনুরূপ ছোট ছোট কাযগুলিও যদি আমরা সম্পন্ন করি তবেই অপরের পক্ষে বৃহৎ কার্য্য করা সম্ভব হইবে। আপনাদিগের সকলের নিকট আমার এই সর্ব্বশেষ কিন্তু সর্ব্বপ্রধান নিবেদন: আশা করি, আমার এই নিবেদন নিষ্ফল হইবে না।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

নবীনের অভিনন্দন

(মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

যিনি চির-নবীন, যিনি উৎসবের দেবতা, যাঁর আবির্ভাবে সকল মিলন নূতন আনন্দে, উৎসাহে ও সফলতায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, সেই দেবাদিদেবকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি। যিনি আজ এখানে প্রধান ব্রতীর পদ গ্রহণ ক'রে এই সম্মিলনীকে গৌরব মণ্ডিত ক'রেছেন, যিনি আজ আমাদের মাতৃ-ভাষাকে মহীয়সী ও গরীয়সী ক'রে, বিশ্ব-সাহিত্যে একটা উচ্চ স্থান দিয়েছেন, তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দ্বারা অভিনন্দিত করছি। বিদেশাগত সুধীজন, যাঁরা বহু ক্লেশ ও অসুবিধা স্বীকার ক'রে এসে আমাদের এই ক্ষুদ্র বিক্রমপুরকে ধন্য ক'রেছেন তাঁদের ও সম্মিলিত জনমণ্ডলীকে আমার বিনীত নমস্কার জানাচ্ছি।

আজ যে আমি কিছু বলবার জন্যে এখানে দাঁড়িয়েছি, এটা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি নিজেই আমার এই দুঃসাহসিকতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, এবং ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতার গ্লানি আমাকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। এ আসরে যিনি আজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন, সাহিত্য-জগতে তাঁর স্থান কত উচ্চে, তা কারও অবিদিত নেই। আজ তাঁর এবং অন্যান্য সাহিত্য-রথিগণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আমার মত একজন রমণীর কিছু বল্‌তে যাওয়া যে কত বড় লজ্জার বিষয়, তা আমার চেয়ে বেশী কেউ অনুভব করবেন না। কিন্তু তবুও আমাকে বল্‌তে হচ্ছে। আমি যা ব'লব, তা এখানকার যোগ্য হবে না, তা আমি জানি। এটা সাহিত্য-সভা, কিন্তু সাহিত্য আলোচনা ক'রতে আমি আসিনি; আমি তরুণের দলকে কিছু বল্‌বার জন্যে এসেছি। যে সকল সাহিত্য-সেবক নানা স্থান হ'তে এসেছেন, তাঁদের মুখের কথা শুনতে এখানে, নবীন দলের আগমন অবশ্যম্ভাবী; সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তাদের জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করবার মত অনেক জিনিষ আছে, এ সুযোগ তারা উপেক্ষা করবে না—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে, বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হলেও, মাতৃহৃদয়ের কল্যাণ কামনা নিয়ে তাদের কাছে এসেছি। তাই আজ সকল লজ্জা ভয়, সঙ্কোচ ঠেলে ফেল্‌তে সমর্থ হয়েছি। আমার এই দুঃসাহসিকতা অন্য কেউ মাফ না কল্লেও, যাঁদের জন্যে এসেছি, তাঁরা যে মাফ করবেন, এটা বোধ হয় আমার পক্ষে দুরাশা নয়।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, "আমরা চিন্তা করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে; এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে, যাদুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়, দেখি সমস্তই নবীন। এই যে প্রথম কালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই আমাদের বলে দিচ্ছে।"

আমাদের ছেলেদের আনন্দোজ্জ্বল উৎসাহদীপ্ত তরুণ শ্রী-মণ্ডিত মুখগুলির দিকে চাইলে আমার এ কথাই মনে হয়, এরা যেন প্রভাতের মতই নবীনতা, সরলতা এবং জীবনের বার্ত্তা নিয়ে এসেছে; নিরানন্দ, অবসন্ন, ভারাক্রান্ত সংসার, দেশ, সমাজ ও জাতিকে নূতন বলে বলীয়ান, প্রাণবান, সুন্দর মধুর করে তুলবে। এদের সরল প্রাণে ভালবাসবার শক্তি অসাধারণ। এরা চুলচেরা বিচার করে' ভালবাসবার পাত্রাপাত্র নির্ব্বাচন করেনা। পল্লীগ্রামের চিরন্তন দলাদলির পূতিগন্ধ এদের স্পর্শ করে না, নৈরাশ্যের অন্ধকার এদের আচ্ছন্ন করে না, নবীন জীবনের প্রেরণায় এরা গতিশীল;—সকল বাধা তুচ্ছ করে উদ্দাম বেগে এরা অগ্রসর হয়, পিছনের দিকে তাকায় না, মৃত্যুভয়ে এরা ভীত নয়, কর্ত্তব্যের জন্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে

এরা বিপদসাগরে ঝাঁপ দিতে পারে, এই নবীনের ধর্ম্ম। স্বার্থ কলুষিত সংসারকে সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করবার জন্যে, জড়তা দূর করে সজীবতা দান করিবার জন্যে, নিরাশার মাঝে আশার বাণী শোনাবার জন্যেই বিধাতা এদের পাঠিয়েছেন, এরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

হে আমার বাংলা মায়ের তরুণ সন্তান, তোমরা কি এমন দানের মর্য্যাদা রাখবে না? আজ আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে দেশ উদগ্রীব হয়ে তোমাদের মুখপানে চেয়ে আছে। তোমরা যাদুকরের হাতের "সোণার কাঠি"—তোমাদের স্পর্শে মৃত সজীব হয়ে ওঠে, এ ত মিছে কথা নয়; এ যে সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের চিরন্তন সত্য। এস নবীন, এস সন্তান, জ্বলন্ত উৎসাহ নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চল, মায়ের প্রাণের শুভ কামনা তোমাদের ভিতরে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করবে, তোমাদের মহৎ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করবে, তোমাদের আনন্দলোকে বিচরণ করবার সহায় হবে।

আজকাল নবীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাচীনের মুখে সর্ব্বদাই শুনতে পাওয়া যায়; যেন এদের অপরাধ ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারার মত পুরুষকার খুব অল্পই আছে। সেকালের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি যায় মানুষগুলি পর্য্যন্ত নিখুৎ, নির্দ্দোষ ছিল, আর একালের কথা বলবার নয়, একেবারে রসাতলে গেছে। অবশ্য একাল সেকাল ব্যবধানে পঞ্চাশ বছরও হতে পারে, আবার দশ বছরও হতে পারে। এই সমালোচকের দল যদিও একালের এই অবনতির জন্যে খুব আড়ম্বর করেই দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই সংশোধনের কামনায় যে ব্যথার সুরটুকুর আভাস পাওয়া সম্ভাবনা, তার পরিবর্ত্তে উঁচু গলায় দোষকীর্ত্তনের একটা নিষ্ঠুর আনন্দের সুরই যেন তাতে বেজে ওঠে। থাক্ না দোষ ত্রুটি, কিন্তু তা কি আমাদের স্নেহের রাজ্য থেকে এদের দূরে নিয়ে যেতে পারে? যদি তাদের মঙ্গল, সঙ্গে সঙ্গে দেশের জাতির মঙ্গল চাই, তবে তাদের শিক্ষা দেবো, শাসন করব, ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব, কিন্তু ভালবাসা ক্ষমা ও সহানুভূতি চাই। এখনকার ছেলে মেয়েরা কিছুই নয়, একেবারে উচ্ছন্ন গেছে, এই কথা ব'লে বেড়ালে এবং নিরাশার বাণী শোনালে সুফল কিছুই হবে না, পরন্তু কুফল অনেকখানি হবার সম্ভাবনা।

ছেলেদের আমরা কদাচার হতে রক্ষা করব, কিন্তু কারাগারে আবদ্ধ ক'রে নয়; তাদের মুক্তির আনন্দ দেবো কিন্তু কুস্থানে না পড়ে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখব, তবেই তারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। মানুষের স্বাভাবিক শক্তি ও ব্যক্তিত্বকে শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা তার উন্নতির পরিপন্থী এবং তাতে মানুষের মর্য্যাদা নষ্ট হয় ব'লে আমার বিশ্বাস। মনুষ্যত্ব জিনিসটার মূল্য বড় বেশী, তাকে চেপে পঙ্গু ক'রে রাখা ঠিক নয়। কখনও কখনও শাসনের শৃঙ্খলটা একটু কড়া হওয়া দরকার—যখন ভালমন্দ বোঝবার শক্তি জন্মায় না, অথবা অন্ধ হয়ে বিপথেই চলে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়, আত্মপ্রত্যয়ের রূপ ধরে আত্ম প্রতারণা মনকে অধিকার ক'রে বসে।

ছেলেদের মুখে স্বাধীন চিন্তা কথাটা একটু বেশীই শোনা যায়। স্বাধীন চিন্তার দোহাই দিয়ে অনেক সময় তাদের স্বেচ্ছাচারিতার পথে যেতে দেখা যায়। মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বাধীন চিন্তার অর্থ অনাবশ্যক বিদ্রোহ নয়। ঠিক পথটি তাদের উপদেশ ও আদর্শ দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, কিন্তু দুর্জ্জয় বাধার সৃষ্টি ক'রে নয়; তাতে অন্তরে বিদ্রোহ ঘনিয়ে ওঠে। ভূগর্ভস্থ অগ্নিরাশি যেমন এক সময়ে প্রচণ্ড বেগে বহির্গত হয়ে শোভনা বসুন্ধরাকে বিধ্বস্ত করে দেয়, তেমনি এই অন্তর্বিদ্রোহের ফল ঘোর অশান্তিময় হয়ে উঠতে পারে। আমার মনে হয় নিন্দা, উপহাস, বল প্রয়োগ এবং নৈরাশ্যে নয়,—ক্ষমা ভালবাসা এবং বিশ্বাসই ঠিক পথে নেওয়ার সহজ উপায়। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো!"

নবীনেরা আমায় মাফ করবেন, একটা জিনিস আমাকে বড়ই ব্যথা দেয়, সেটি হচ্ছে তাঁদের শ্রদ্ধাহীনতা এবং অবিনয়। সময়, শিক্ষা অথবা কি যে এজন্য দায়ী তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এটা বলতে পারি যে

যে এতে নৈরাশ্যের কারণ নেই। বর্ত্তমান সময়ে বিনয়ের অবতার মহাত্মা গান্ধী এদের নেতা।

এরা তাঁর জীবন থেকে খাঁটি দেশাত্মবোধ জিনিসটি যেমন পেয়েছে, বিনয় ও শ্রদ্ধার ভাবটিও তেমনি গ্রহণ করতে সমর্থ হবে এই আমার বড় আশা।

ছেলেরা শরীরে ও মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অন্ধ স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে সকল ভয় ভাবনা ও বিপদের সম্ভাবনা হতে আঁচল চাপা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখলে কখনও তারা কর্ম্মপটু হবে না এবং বিপদকে বিমুখ করবার মত শক্তিলাভ করতে পারবে না। বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েই তাকে বিমুখ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। গাছে উঠ না মাথা ফাটবে, খেলতে যেও না পা ভাঙ্গবে, সাঁতার দিও না জলে ডুবে মরবে, রোগীর সেবা করতে যেও না রাত জেগে অসুখ করবে, দু মাইল পথ হেঁটে যেও না পা ব্যথা করবে, এমন করেই আমরা ছেলেদের অকর্ম্মণ্য, এবং কষ্টে অসহিষ্ণু ক'রে তুলি; তার ফলে এরা চিরদিন জীবন্মৃত হয়ে থেকে আমাদের পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। এদের এই চরম দুর্ভাগ্য থেকে কবে আমরা রক্ষা করতে পারব জানি না।

হে আমার তরুণ, যদি তোমরা জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে চাও, তবে সংযত সত্যনিষ্ঠ বিনয়ী শ্রদ্ধাবান প্রেমিক এবং কর্ম্মনিষ্ঠ হও। উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য স্থির করে অগ্রসর হও। সব চেয়ে বড় কথা, আনন্দ কখনও হারিও না। বিশুদ্ধ আনন্দই সকল কর্ম্মে উদ্দীপনা দেয়। হৃদয়ে কখনও সঙ্কীর্ণতা স্থান দিও না। আত্মসুখস্পৃহাই মানুষকে সঙ্কীর্ণ করে তোলে। অতএব আত্মপরায়ণতা ত্যাগ কর। একদিন বিবেকানন্দের আহ্বানে তোমরাই সাড়া দিয়েছিলে, তাই আজ দেশ-সেবার শুভমূর্ত্তিটি ফুটে উঠেছে; দেশের ডাকে তোমরাই আত্মপ্রাণ তুচ্ছ ক'রে বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলে, তাই আজ জাতির কলঙ্ক কাপুরুষতা দূরে সরে গেছে; যুগে যুগে তোমরাই আত্মদান ক'রে প্রেম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছ। বিধাতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন দ্বারা তাঁর উপাসনা সার্থক করবার অধিকারী তোমরাই অন্তরে বাহিরে সচেতন হও। অন্তরে সচেতন না হলে সদসৎ বুঝবার শক্তি আসবে না। আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে চল, পথ তোমাদের আপনিই সহজ হয়ে উঠবে। যদি কখনও পা পিছলে পড়ে যাও, নিরাশ হয়ো না; মায়ের জাত অসীম ক্ষমা অপরাজেয় স্নেহ নিয়ে এসে তোমাদের ধূলিমলিন অঙ্গ মুছে দেবে। মনে রেখো মৃত্যু অপেক্ষা বিপদসঙ্কুল জীবন শ্রেয়। সুতরাং জড়তা পরিত্যাগ কর।

তোমরা আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে বড় হয়ে ওঠ। তোমাদের মধ্যে যে প্রচুর প্রাণ-শক্তি রয়েছে, ছোট হয়ে থাকা ত তোমাদের শোভা পায় না। তোমাদের ভিতরে রুদ্রতেজ নিহিত আছে; সে তেজ খর্ব্ব ক'রে রেখে আপনাকে দীন করো না। দুঃখ আঘাত অপমানে নুয়ে পড়ো না। নৈরাশ্য যে মৃত্যুর কুহেলিকার আবরণ তোমাদের চারিদিকে জমিয়ে তুলবে, উৎসাহের আগুন জেলে তা দূর করে দেও। যেখানে প্রকৃত জীবন,—শান্তি, মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য সেইখানেই প্রকাশ পায়। এই সজীবতা, নবীনতা ও আনন্দ তোমাদের বার্দ্ধক্যেও যৌবন-বলে বলীয়ান্ করে রাখবে, যদি সময় থাকতে এর সাধনে যত্নবান হও। ভগবান তোমাদের সহায় হউন।

আমি ছেলেদের ভালবাসি ব'লে তাদের কল্যাণ-কামনা করি। এ অধিকার আমি মানুষের হাত থেকে পাই নি; এ বিধাতার দক্ষিণ হস্তের দান। এই সভাস্থ সকলের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই, আমি ছেলেদের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যা বলতে এসেছি, তা অনাবশ্যক হতে পারে কিন্তু অনধিকার চর্চ্চা কেউ বলবেন না।

আমার জন্মভূমির ভবিষ্যতের ভরসাস্থল নবীন সম্প্রদায় সত্যপথ চিনে নিতে শিখুক এবং সাফল্যের পথে অগ্রসর হোক, এই আমার প্রাণের কামনা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা গুপ্তা।

নারী ও হিন্দু সমাজ

বিভিন্নদেশের সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন যুগ হইতে সকল জাতির মধ্যেই নারীকে বৃক্ষাশ্রিতা বল্লরী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সকল সমাজেই "স্ত্রিয়োনাস্তি স্বতন্ত্রতা" প্রভৃতি পুরুষের বাক্যের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষিণী করিয়া রাখা হইয়াছে। নারীও এতদিন সাগরাশ্রিতা তটিনীর মত পুরুষের মধ্যে তাহার সকল স্বতন্ত্রতা মিশাইয়া দিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, এবং নারীজন্মের একমাত্র কাম্য মাতৃত্বগৌরব লাভে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছে।

কিন্তু আজ এ নব জাগরণের যুগে নারী-সমাজ "ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এ চিরপুরাতন মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের এ নব নারীজাগরণের সাড়া বিশাল সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি অতিক্রম করিয়া ভারত উপকূলেও আসিয়া পঁহুছিয়াছে, এবং এ দেশের জাতীয় জীবনে বিশেষভাবে বাস্তব হইয়া না উঠিলেও নারীসমাজে আংশিকভাবে সংক্রামিত হইয়াছে।

জীব-জগতের ইহা স্বধর্ম্ম বা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম যে সবল চিরদিন দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখিতেই বাসনা করে এবং যখনই কোন নিষ্পেষিত জীব বা জাতি বহুবর্ষব্যাপী অত্যাচার নিষ্পীড়নের ফলে স্বাধীনতা লাভের জন্য মস্তক উত্তোলন করে, তখনই বলবান আপ্রাণ চেষ্টায় তাহার সে ন্যায্য অধিকার লাভের পথে বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকে।

তাই চিরদিন পরমুখাপেক্ষিণী, পরাসক্তা নারীকে আজ স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াসী দেখিয়া পুরুষ সমাজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে শ্রমিক ও ধনীর লড়াইএর মত রীতিমত যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। যাহা হউক, নারী-সমস্যা এ দেশের সমাজ ও রাজনীতিবিদ্‌গণকে বিশেষভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলিলেও তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা গণ্ডীরেখা টানিয়া দিয়া আর নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না।

যে রাজসরকার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কোন মহিলা এম-এ, বি-এল কে ওকালতি করিবার সনদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেই রাজসরকারের অধীনে আজ মহিলা উকিল ও হাকিমের কার্য্য করিতেছেন। সামাজিক ব্যাপারেও নারী সমস্যা নেতৃবৃন্দের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাই হিন্দু মহাসভায় গত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় হিন্দু নারীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :—

"But the condition of the Hindu women at the present moment is far from satisfactory, and that is due to the arrogance of Hindu men and to their failure of duty towards their women."

সত্য সত্যই আজ হিন্দুনারীর অবস্থা অতি শোচনীয়; কিন্তু দেশের দুরদৃষ্টক্রমে হতভাগ্য আমরা সেদিকে দৃষ্টিহীন! দেশের ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততিগণের জননী কন্যা আজ বিদেশীয় অর্থনীতির সূক্ষ্ম পরিমাপ দণ্ডে ভার বলিয়া বিবেচিতা, জন্মমাত্রে বিধাতার অভিশাপ রূপে পরিগণিতা! দুঃখ দারিদ্র্য প্রপীড়িত হিন্দু পরিবারে কন্যার আগমনে "কন্যা নাম মহাদুঃখং ধিগহো মহতামপি" স্মরিয়া মাতার উষ্ণশ্বাস প্রবাহিত ও পিতার শিরে অর্থচিন্তায় অশনিপাত অনুভূত হয়।

পিতৃকুলের অর্থনাশিনী বলিয়া বাল্য হইতে কন্যা, আহার বিহার বেশভূষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুত্রাপেক্ষা হীনভাবে প্রতিপালিতা ও শাস্ত্রমতে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" হইলেও শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিতা হইয়া থাকে।

তৎপরে বংশধারা রক্ষার হেতুভূত বিবাহ সংস্কার অনুষ্ঠানে

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ক্রয় বিক্রয় নীতির প্রবর্ত্তন হেতু দরিদ্র পিতামাতা অর্থের সাশ্রয় অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া—

"আদৌ তাতো বরং পশ্যেত্ততো বিত্তং ততঃ কুলম্।
যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিম্॥"

বাক্যের অনুসরণ করিতে পারেন না এবং তাহার বিষময় ফলে কত সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা অপাত্রে পতিত হইয়া আজীবন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। (১)

পূর্ব্বে সমাবর্ত্তন না হইলে বিবাহের অধিকার জন্মিত না, কিন্তু আজকাল "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং, নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং" প্রভৃতি নয়টী কুললক্ষণের কোনটি বর্ত্তমান না থাকিলেও পুরুষনামধারী জীবও বিবাহের অধিকারী এবং আমদানি কাটতির পড়তায় বাজারে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য।

শাস্ত্রে আছে, "যাহার পত্নী নাই সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে পারে না, পিতৃগণের সহিতও তাহার মাখামাখি সম্পর্ক ঘটে না। পিতৃগণ পুরুষ পরম্পরায় পিণ্ড ভোজনের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যে ব্যক্তির পত্নী নাই সে বংশধারা রক্ষায় অশক্ত। যে ব্যক্তি বংশধারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না সে পৈতৃক সম্পত্তিতে পূর্ণমাত্রায় অধিকার পাইতে পারে না।" (২)

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, "লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদ্গতি সম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফলদ্বারা সেরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না।" (৩)

ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত পুরুষের পক্ষে যাহা একান্ত কর্ত্তব্য সংস্কার, আজ তাহা শুধু কন্যাপক্ষের দায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যেন বিবাহে কন্যারই গরজ, পুরুষের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। স্বার্থান্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে এই ভ্রান্ত ধারণারূপ যে পাপকে আমরা হেলায় সমাজ শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দিয়াছি, সেই পাপ আমাদিগকে সকল রকমে দুর্ব্বল করিয়া আমাদিগের অন্তরটাকে পর্য্যন্ত দীন করিয়া ফেলিয়াছে।

এতদূর নীচাশয়তা আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়াছে যে, অর্থলালসার অপরিতৃপ্তি হেতু হিন্দু পিতা নিরপরাধা পুত্রবধূকে নির্ব্বাসিত করিয়া পুত্রকে দারান্তর পরিগ্রহে বাধ্য করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে পারে না। (৪) নীচতা, অর্থগৃধ্নুতার বিষময় ফলে হিন্দু অন্তঃপুরের কত সুকোমল কুসুম অকালে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কত পবিত্র প্রাণ পাপের কলুষ স্পর্শে কলঙ্কিত হইতেছে। (৫) আমাদিগের অধঃপতিত জীর্ণ অন্ধ সমাজ তাহার প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া মূক জড়ের মত দাঁড়াই দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিয়া যাইতেছে।

যে হিন্দুনারী এতদিন সাবিত্রীর ন্যায় পতিপ্রেম, ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণুতা, মাতার ন্যায় শুশ্রূষা, কন্যার ন্যায় সেবা দিয়া হিন্দু সন্তানগণকে বর্ম্মের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সেই হিন্দু নারী আজ বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা হইতেছে।

পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ নারীর অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে, পুরুষের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এক হতভাগ্য হিন্দুসমাজ নারীকে একমুষ্টি উদরান্নের নিমিত্ত পথের কুক্কুরীর অধম করিয়া সর্ব্বতোভাবে পুরুষের খামখেয়ালি ও যথেচ্ছাচারের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। যদৃচ্ছাক্রমে হিন্দু স্বামী, বিনা অপরাধে ভরণপোষণের সংস্থান পর্য্যন্ত না করিয়া স্ত্রীকে অব্যবহার্য্য ছিন্ন পাদুকার মত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। হিন্দু সমাজের এ বিচিত্র বিধানই নারীর সকল দুর্দ্দশা সকল তাচ্ছিল্য

১। পক্ষান্তরে দুরাশয় পিতা, অর্থের নিমিত্ত রুগ্না, অশিক্ষিতা, কুরূপা পাত্রীকেও পুত্রবধূরূপে ঘরে বরণ করিয়া আনিয়া পুত্রের সকল সুখ শান্তি নাশের কারণ হইয়া থাকেন।

২। যজ্ঞকথা—৫ম পৃষ্ঠা।

৩। আস্তিক পর্ব্বাধ্যায়

৪। রেলওয়ে গার্ড মিঃ উইলি হডসন কর্ত্তৃক মলিনা হরণের যে মামলা মালদহে চলিতেছে তাহারই শোচনীয় বৃত্তান্ত শ্রবণে লিখিত।

৫। রংপুর গাইবান্ধার সুভাষিণী হরণের মোকর্দ্দমায় পিতা কর্ত্তৃক স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতী কন্যাকে মুসলমানের নিকট বিক্রয় করা ও সতীত্ব রক্ষার্থ চেষ্টিতা কন্যাকে পুনঃ পুনঃ তাহার হস্তে সমর্পণের মর্ম্ম বিদারক ঘটনা শ্রবণে লিখিত।

অনাদরের মূল। যে নারী জাতীয় জীবনের উন্নতির কারণ-রূপিণী, তাহার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মঙ্গলের প্রতি উদাসীনতার ফলে দেশে শিশু ও প্রসূতিমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভ্রংশবুদ্ধি আমরা, আপনার ত্রুটী সংশোধনে প্রবৃত্ত না হইয়া তন্নিমিত্ত নারীকেই, মাতৃত্বগৌরব ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকি। শিশুমৃত্যুর সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে কোন লেখক লিখিয়াছিলেন, "সরকারী বেসরকারী সকল রিপোর্টেই আমরা দেখিতে পাই শিশুর অকাল মৃত্যু আমাদের দেশেই ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।" (৬)

যখন দেখিতে পাইতেছি যে দেশের এই দুর্দ্দিনে নারী-সমাজে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতেছে না, তখন এ অভিযোগ মিথ্যা বলিতে পারিতেছি না। যখন দেখিতে পাই যে তাহাদের অঙ্কে শয়ন করিয়াই শিশু অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, এবং তাহারা সাময়িক শোকের বশে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াই আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে এবং শোকাবহ ঘটনার পুনরভিনয় যাহাতে না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকে, তখন কি এ অভিযোগ সত্য বলিব না যে, মাতৃত্বের গৌরব এদেশের নারী ভুলিয়া গিয়াছে।

হিন্দু মাতার প্রতি এ অন্যায় দোষারোপের পূর্ব্বে কিয়ৎকাল একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিত যে, হিন্দু নারীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি পুরুষের দৃষ্টিহীনতা, তাহার ইন্দ্রিয়-সংযমাভাব, এবং বৈদেশিক বিলাসভোগ স্পৃহাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইহার জন্য দায়ী।

বৈদেশিক সভ্যতার অনুকরণ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা সীমাবদ্ধ আয়ের অধিকাংশ, জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যাদি বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া, বেশভূষার অনাবশ্যক পারিপাট্য সাধনে ব্যয়িত করি। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের ভাগ্যে দুগ্ধ ঘৃত মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন কচিৎ ঘটিয়া থাকে। তদুপরি গৃহকর্ম্মের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম, ও দুর্ব্বল শরীরে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে অকালে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, ব্রাইট্স্ পীড়া ও ক্ষয় ইত্যাদি উৎপন্নের পক্ষে সহায়তা করিয়া প্রসূতির শরীরকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে।

সঞ্জীবনী রস স্বরূপ বক্ষের যে অমৃতধারার সাহায্যে শিশুর জীবন রক্ষা হয়, সে অমৃতের উৎস প্রসূতির বক্ষ হইতে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; সুতরাং শিশুর আর প্রাণরক্ষা হইবে কিরূপে, এবং অন্তঃসারশূন্যা প্রসূতিও বা প্রাণধারণ করিবে কিরূপে?

হিন্দু মহাসভার সভাপতি মহাশয়, তাঁহার অভিভাষণে শিশু ও প্রসূতিমৃত্যু লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"Hindu women die at a very early age and the number of maternity fatalities is alamingly large amongst the Hindus. We must attend to it if we want to save our women from early demise."

হিন্দুনারীর অবস্থা ও অধিকারের উন্নতি সাধন, এবং অযথা সন্তানপ্রসবের প্রতিরোধকল্পে বৈজ্ঞানিক উপায়দ্বারা গর্ভসঞ্চার পরিহারের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত এ শোচনীয় বীভৎস ব্যাপার নিরাকরণের আর দ্বিতীয় উপায় লক্ষিত হয় না। "By the dissemination through proper channels of birth control knowledge concerning scientific safe and sure methods of contraception.) স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি ও ভরণপোষণ করণোপযোগী আর্থিক সামার্থ্য অনুসারে যে কয়টী সন্তানের জন্ম অভিপ্রেত, তাহার সংখ্যা অতিক্রম করা কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে জনৈক অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক লিখিয়াছেন :—

"Woman has the undeniable right to limit her children to the number that she can adequately provide for. and the number that is consistent with her health and strength and that of her children." (৭)

৬। পরিচারিকা—আষাঢ়, ১৩৩০।

৭। A. B. Patrika, 11. 4. 25

এপ্রসঙ্গে কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কোন লেখিকা লিখিয়াছিলেন, পুরুষ "তাহাদের উপর জুলুম করিয়া মাতৃত্বলাভের ব্যবস্থা করে, এবং তাহাদের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও সুখ নষ্ট করে।" (৮)—নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারক ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে। যে হিন্দুনারী এতদিন আদর্শ মাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ স্ত্রীরূপে হিন্দুগণকে সকল কার্য্যে উদ্দীপনা দান করিয়া আসিয়াছে, সেই হিন্দুনারী আজ জীবন্মৃতা ও সন্তান প্রসবের যন্ত্রমাত্রে পরিণতা হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, করাচীনগরে নারীসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "কোন সাধনাতে প্রেরণাদানের শক্তিটি নারীর শক্তি। শিক্ষায়, রাজনীতিতে নারীর অন্তরের প্রেরণা না পেলে কখনও শক্তি সত্য ও গভীর হয় না।"

বহুবর্ষব্যাপী অনাদর উপেক্ষায় দীনা, রুগ্না, ব্যথিতা হিন্দুনারী শক্তি-হীনা হইয়া পড়িয়াছে, তাই সেই মহীয়সী নারীশক্তির অভাবে হিন্দুর সকল সাধনা সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পরিণত হইতেছে। ঐ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "আমাদের সব অনুষ্ঠানেই নারীর কর্ত্তব্য, নারীর সাধনা অনেক পরিমাণে দরকার, সেইটে যদি বাদ পড়ে, শূন্য থাকে, তবে অনুষ্ঠান একপেশে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

এই নিমিত্তই বোধ হয় ত্রেতাযুগে ভগবানরূপী শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক যজ্ঞদীক্ষা কালে কনকসীতা পত্নী হইতেন!

তাই দেশবাসী আজ যে মহাব্রতের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছে, সে ব্রতের প্রতিষ্ঠাকল্পে মৃতকল্পা হিন্দুনারীকে পুনর্জীবিতা করিয়া আবার তাহাকে শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই শক্তিরূপিণী হিন্দুনারীর "তপস্যার জ্যোতিতে প্রাচ্যের আত্মাও জাগিবে, আমাদের মৃতপ্রায় আচার, ভারগ্রস্ত সত্য, তাদের সাধনার বলে প্রকাশিত হবে। নিত্য সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আবার জাগবে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, দুঃখ্য-দৈন্য-ক্লিষ্ট ভারতে, স্বর্গের পুণ্য আলোক আবার শান্তিসুধা বিকীরণ করবে। (৯)

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

৮। পরিচারিকা—আষাঢ় ১৩৩০

৯। রবীন্দ্রনাথ—করাচীনগরে নারীসভায় বক্তৃতা।

পাগ্‌লী

(গল্প)

দুপুর রাত্রে সুনীল বারান্দায় আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল—"ও ঠাকুর, ঠাকুর, ওরে ফেলা শীগ্‌গির ওঠতো, শীগ্‌গির একটা আলো নিয়ে আয়।"

অসময়ে বাবুর আহ্বানের কারণ বুঝিতে না পারিয়া হিন্দুস্থানী রাঁধুনী তেওয়ারী বিশেষ ব্যস্তভাবে একটা হ্যারিকেন হাতে আসিয়া কহিল—"কেয়া বাবু?"

"শুনছো একটা শব্দ! কাকেও বাঘে ধরলে নাকি?"

শব্দটা তেওয়ারীর কাণে আসিতেই সে ভীত হইয়া কহিল—"কেয়া জানে হুজুর।"

ক্রুদ্ধ হইয়া সুনীল কহিল—"কেয়া জানে কি? চল এখনি দেখিতে হবে।"

লণ্ঠনটা মাটীতে বসাইয়া দিয়া সে প্রায় হাত যোড় করিয়া বলিল—"সের কা মুখ্‌মে মাৎ যানা বাবু।"

অধিকতর উদ্ধতভাবে সুনীল কহিল—"ভীতু কোথাকার! ডাক সেই নূতন চাকরটাকে, সে এদেশী লোক আছে।"

গোলমাল শুনিয়া নূতন ভৃত্য লখিয়া পূর্ব্বেই উঠিয়া আসিয়াছিল। এখন একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—"কোন ভয় নেই বাবু, ও একটা পাগ্‌লী চেঁচাচ্ছে।"

বিস্মিত মুখে সুনীল বলিল, "এই গভীর আঁধার রাতে এমন চীৎকার করছে কেন?"

"ঐখানে ওর স্বামীর কবরের পাশে বসে অমন চেঁচায়।"

কথাটা যেন রহস্যপূর্ণ ভাবিয়া সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "কবরের পাশে ব'সে? আচ্ছা, কতদিন থেকে এমন করছে বলতে পার?

"সে অনেক দিন।"

সুনীল ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাহার স্ত্রী কমলা বলিল, "সত্যি বড্ড ভয় হয়েছিল, কি চীৎকার! আচ্ছা, এখানে কি খুব বাঘের ভয়?"

সুনীল 'হুঁ' বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিয়াই শুইয়া পড়িল। তখনও সেই রব সেইরূপই শোনা যাইতেছে। শয্যায় পড়িয়া সুনীল ভাবিল, ইহা তো উন্মাদের প্রলাপ নয়, যেন একটা মর্ম্মন্তুদ যাতনার কাতরোক্তি। ইহার মধ্যে নিশ্চয় কিছু গুহ্য ব্যাপার নিহিত আছে, ভাবিতে ভাবিতে কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

২

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন অবধি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটানো সুনীলের অভ্যাস বা বড় মানুষী চাল। তাই, সে বারের যাত্রাটা ঘাটশিলায় মনস্থ করিয়া একটা বাংলা ভাড়া লইয়া সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে ঠাকুর তেওয়ারী ও খানসামা ফেলা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য কাযকর্ম্ম করিবার জন্য স্থানীয় ভৃত্য লখিয়াকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

পরদিন সকলে লখিয়ার সহিত পাগলীর আস্তানায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, পাতায় ঘেরা একটী কুঁড়ের দ্বারে বসিয়া একটী শীর্ণ রমণী। তাহারই সম্মুখে কবরের মত একটী মাটীর ডিপি ও তাহার উপর কতগুলা ঝরা ফুল। স্ত্রীলোকটী একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া নিবিষ্ট মনে বসিয়া আছে। তাহার চুলগুলি রুক্ষ ও চক্ষু কোটরগত। দেখিলে মনে হয় যেন কত কাল রোগ ভোগের পর সবে মাত্র উঠিয়া বসিয়াছে। পরিধানে একখানি মলিন ছিন্ন বস্ত্র।

কবরের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি ও ফুলের রাশি দেখিয়াই সুনীল বুঝিল যে, তাহার গত রাত্রির ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত নয়, বরং তাহাই যেন প্রকট হইয়া সমস্ত মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

কতকটা নিকটে অগ্রসর হইয়া সে পাগলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওগো বাছা, আমাদের বাসায় যাবে?"

অর্থশূন্য দৃষ্টি সুনীলের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া পাগলী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

আরও একটু কাছে সরিয়া সুনীল বলিল, "চল না, তোমায় খেতে দেব, কাপড় দেব। যাবে?"

স্ত্রীলোকটী এইবার মুখ খুলিল, "কোথায়?"

সুনীল হাত বাড়াইয়া বলিল, "এই কাছেই, অঘোর বাবুর বাঙলা।"

"আজ না, কাল বিকালে যাবো।" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া পাগলী জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল।

৩

সমস্ত দিনটা আশায় আশায় কাটাইয়া বৈকালে উদ্‌গ্রীব হইয়া সুনীল বাঙলার সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় পাইচারি করিতে করিতে মুহুর্মুহু রাস্তার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল।

কমলা গৃহের মধ্য হইতে জানালায় মুখ বাড়াইয়া বলিল, "তুমিও কি তার মত হলে নাকি? সে একটা পাগল, তার জন্যে আবার এত ব্যস্ততা!"

জানলার নিকটে সরিয়া গিয়া সুনীল বলিল, ""না গো না, তুমি নিশ্চয়ই দেখো কতবড় একটা ব্যথা তার মধ্যে লুকানো আছে। সেদিন সেই কবর ও ফুল দেখে আমি যেন কতকটা বুঝতে পেরেছি।"—বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, পাগলী গেটের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া সে বরাবর বাটী মধ্যে চলিয়া গেল।

কমলা পাগলীকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া একখানি নূতন কাপড় পরিতে দিল। পরে জলযোগের জন্য একান্ত অনুরোধ করিতেই সে ঝর ঝর করিয়া এমনি ক্রন্দন সুরু করিয়া দিল যে, তাহাকে কোনরূপে নিরস্ত করিতে না

পারিয়া কমলা নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। তবে কি আহারের সঙ্গেই ইঁহার রহস্য জড়িত!

সুনীল দালানে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কমলা আসিয়া ব্যাপারটা বিবৃত করিতেই সে গৃহের মধ্যে যাইয়া দেখিল, যদিও কান্নার বেগ কমিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও চোখে ও কপোলে তাহার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান।

আহারের জন্য অনুরোধ না করিয়া সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ব্যাপারটা কি আমায় বলবে? তুমি যে পাগল নও তা প্রথম থেকেই বেশ বুঝতে পেরেছি।"

অপরিচিতের করুণায় পাগলীর মন তখন আর্দ্র। সে ভাবিল, ইহাদের নিকট আমার দুঃখ প্রকাশ করিলে এ দগ্ধ হৃদয় হয়তো কতকটা শান্ত হইবে।

সে সজল চক্ষু দুটী সুনীলের মুখের পানে স্থাপন করিয়া করুণ স্বরে বলিল, "বাবু, সে একটা নিদারুণ দুঃখের কাহিনী। বলতে বুক ফেটে যায়, শুনলে আপনারাও কষ্ট পাবেন।"

কমলা বলিল, "বল বোন, শুনে যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা করবো।"

"না; সে চেষ্টার বাইরে চলে গেছে। তবে এতদিন কেউ জিজ্ঞাসাও করে নি, আমিও কাউকে বলিনি। সকলে জানে আমি পাগলী; তাই সেই রকমই থাকি। কিন্তু আপনাদের কাছে বলবো, যদি এ পোড়া প্রাণে কিছু শান্তি পাই।"

তিন জনেই নীরব। ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির যা অবস্থা এও যেন ঠিক তাই। পাগলী যেন কি একটা প্রলয়ের বার্ত্তা রাষ্ট্র করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে পাগলী বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবু আমরা হিন্দু, জাতে গোয়ালা, মুসলমান নই। তবে কবর কেন দেখলেন ও তার সঙ্গে কি আমার সম্পর্ক তা একটু পরে বুঝবেন।"

সুনীল বলিল, "জাতির সম্বন্ধে আমার মনে কোন কথা উদয় হইনি, তবে কবরটার বিষয়ে যে একটা নিগূঢ় রহস্য আছে তা আমার প্রথম থেকেই ধারণা হ'য়েছিল। তার পর?"

পাগলী বলিতে লাগিল, "আমার শ্বশুর বাড়ী হাওড়া জেলায়। দুধ বিক্রী ক'রে শ্বশুরের অবস্থা বেশ ভাল হয়। বড়ই কৃপণ, চোটা সুদের কারবার আছে, একবার তাঁর হাতে পড়লে খাতকের সহজে নিস্তার নেই। এখন দুধের ব্যবসা ছেড়ে ঐ মহাজনীই করেন।"

হঠাৎ থামিয়া সুনীলের দিকে চাহিয়া বলিল, "মনে করবেন না মিছামিছি গুরুজনের নিন্দা করছি।"

সুনীল সেই সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "না, না, তুমি বলে যাও।"

"আমার বিয়ের কিছুদিন পরে শ্বশুর আমার স্বামীকে বল্লেন—তোমাকে বাইরে থেকে কিছু কিছু রোজগার করতে হবে, নইলে চলছে না। স্বামী বল্লেন—আমি তো তেমন লেখাপড়া শিখিনি, কি আর উপায় করতে পারবো বলুন? তার চেয়ে, ঐ দুধের ব্যবসা করি, নয়তো চাষবাস করি। শ্বশুর মশায় কিছুতেই রাজী হলেন না। বল্লেন, ভগবানের কৃপায় এখন সকলেই আমাদের মান্য করে, ওসব ছোট কায আর আমাদের করা চলে না। —ওগো, কি বলবো, তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে আমাকে ছেড়ে দূর দেশে থাকেন। কিন্তু বাপের কথায় বাধ্য হতে হল। একদিন চোখের জল জোর করে চেপে, আমাকে কত বুঝিয়ে, চাকরী করতে কলকাতা চলে গেলেন। তখন কি জানি সেই যাওয়াতেই আমার সর্ব্বনাশ হবে, তাহলে কি যেতে দিতুম! ওগো কি করেছি—" বলিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া পুনরায় বলিল, "মাস তিনেক বাদে একবার বাড়ী এলেন, বাপকে কিছু টাকাও দিলেন। চেহারা দেখে আমার বুক কেঁপে উঠলো—তেমন সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা কি হ'য়ে গেছে! জিজ্ঞাসা করে জানলুম—চাকরী একটা কারখানায়, কায—লোহা পেটা, মাইনে ২২৲ টাকা। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির উপর আবার নিজেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়, নইলে ঐ অল্প মাহিনায় নাকি কুলোয় না, বাপকেও টাকা দেওয়া হয় না। এতে শরীর তো

ভাঙ্গবেই। আমাকে সঙ্গে নিতে কত জেদ করলুম কিন্তু টাকাতে কুলোবে না ব'লে কিছুতেই রাজী হলেন না। চারদিন বাদে আবার কলকাতায় চলে গেলেন।

"তারপর দু এক মাস অন্তর প্রায় আসতেন। প্রত্যেক বারেই মনে হত চেহারা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই রকমে দু বছর কাটলো। শেষে একদিন ঘরে এলেন পাল্কী ক'রে। এমনি দুর্ব্বল যে কথা ক্ষীণ হয়ে গেছে, চলতে গেলে পড়েন। তখন শ্বশুর মশায়ের দৃষ্টি পড়লো, দু' চার জন হাতুড়েকে ডাকলেন। সকলেই কিছুদিন ধরে ওষুদ দিলে, কিন্তু কোন উপকার হল না। শেষে আমি শ্বশুরকে অনেক করে বলতে তিনি গ্রামের পাশ করা ডাক্তারকে আনলেন। তিনি পরীক্ষা করে যা বল্লেন তাতে এই বুঝলুম যে, হজমের শক্তি একবারে কমে গেছে, আর তার একমাত্র ওষুদ কোন পাহাড়ে জায়গায় হাওয়া বদলান। শুনেই শ্বশুর মশায় ঠোঁঠ উল্টে বল্লেন—সে সব হবে না, আমার সে অবস্থা নয়; তাছাড়া ওসব ভদ্রলোক ও বড় লোকের কায।—তাঁকে আমরা দু'জনে অনেক কাকুতি মিনতি করলুম, কিন্তু তিনি কোন কথায় কাণ দিলেন না। শাশুড়ীকে ধরলুম, কিন্তু বৃথা। তিনিও আমাদের মতই কুপোষ্য ও নিঃস্ব। হা পোড়া কপাল, আমারও কি তিন কুলে কেউ আছে যে তাদের সাহায্য চাইবো। বাবা মা কবে মারা গেছেন জানি না, আমি মামার বাড়ীতেই প্রতিপালিত। আমার বিয়ের পর থেকে তাঁরা আর সংবাদ নেন্নি। কাযেই স্বামীকে বল্লুম, তুমি আর একবার বাবাকে বিশেষ করে বল।

"একদিন বাপকে ডেকে পায়ে ধরে কি অনুরোধ, কি কান্না—বাবা, তুমি এত টাকার কারবার করছ আর তোমার টাকা নেই? আমাকে কিছু ভিক্ষে দাও বাবা, নইলে আমি আর বাঁচবো না। আমি মলে কে তোমার ভোগ করবে বাবা? আর তো আমার ভাই নেই। দাও বাবা ভিক্ষে দাও, আমি বাঁচি।"

"এইবার শ্বশুর ২০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। স্বামী হেসে বল্লেন—ও টাকা তো গাড়ী ভাড়াতে চলে যাবে বাবা।—কিন্তু তিনি আর একটা কড়িও দিতে রাজী হলেন না, রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হায়রে টাকা—ছেলের চেয়েও তার আদর কদর বেশী।

"কি করি কিছুই স্থির করতে না পেরে, দু'জনে অসময়ের বন্ধুকে ডাকতে লাগলুম। তিনি দয়া করলেন, আমার মাথায় একটা যুক্তি এসে গেল। পরের দিনই আমার সমস্ত গহনা বন্ধক দিয়ে ২২৲ টাকা জোগাড় ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হলুম। অনেক খুঁজে পাহাড়ের কাছে সাঁওতাল পাড়ায় একটা ছোট ঘর ভাড়া ক'রে রইলাম।

"কিন্তু বাবু, রোগা শরীরে সেই কুঁড়ে ঘরে থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দ্দি বসে একদিন তাঁর ভয়ানক জ্বর হ'ল। দু দিন যেতে না যেতেই তিনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন। কি করবো, কাকে ডাকবো, একলা মেয়ে মানুষ, ভেবে সাঁওতালদের কাছে কেঁদে পড়লুম। আহা তারা কত চেষ্টা করলে, কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টে কিছুতেই কিছু হ'ল না। একদিন দুপুর রাত্রে আমার সীঁথির সিঁদুর মুছে গেল।"—বলিয়া সে মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিজেকে কতকটা সামলাইয়া পাগলী পুনরায় বলিতে লাগিল—"কোন রকমে বুক বেঁধে তার শেষ কাযের জন্যে প্রস্তুত হলুম। সেই সাঁওতালরা—আমার অসময়ের বন্ধুরা—বল্লে, একলা দাহ করা সম্ভব হবে না, তার চেয়ে পুঁতে ফেলাই ভাল। আমি সম্মত হতেই তারা গর্ত্ত খুঁড়ে দিলে। আমি আমার প্রাণের নিধিকে বুকে চেপে নিয়ে —বাবু গো—সেখানে—সেই মাটীর শয্যার উপর—শুইয়ে—ওঃ—

এই দুঃখময় কাহিনী শুনিয়া, স্বামী স্ত্রী উভয়েই অশ্রুপ্লাবিত মুখে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল।

কিছু পরে, অনেক অনুরোধে পাগলী সামান্য কিছু আহার করিল। আহারান্তে সুনীল ও তাঁহার স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া আপনার কুটীর অভিমুখে প্রস্থান করিল।

শ্রীপঞ্চানন দত্ত।

ডাকাতি দমন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাধানাথ নামক ডাকাইত একজন পরোপকারী উদার চেতা গৃহস্থ সন্তান ছিল। সে কিরূপ অন্যায় অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রাধানাথ জাতিতে চণ্ডাল, তবে সুন্দর ও সুঠাম পুরুষ ছিল। দেহযষ্টি যেন চাবুক, তাহার উপর যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্য ও চাঞ্চল্য ক্রীড়া করিত। রাধানাথের বাড়ী 'মস্থরে ন'পাড়া', থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী। রাধানাথ যৌবনে নানা অস্ত্র খেলা শিক্ষা করিয়াছিল; লাঠি, সড়্‌কি, তরবারি, রাঃবাঁশ, ঢেঁকি ঘুরাইত। এক নিশ্বাসে বহুদূর দৌড়িয়া যাইতেও পারিত। জলে দুই দিন ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিত, অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্তরণ করিতে পারিত, রাধা সাঁতার দিয়া অনেক বার গঙ্গ পার হইয়াছিল। ফলতঃ গ্রামের লোকে জানিত রাধানাথকে ডাকিলেই হইল। দুরারোহ নারিকেল বৃক্ষে উঠিতে হইবে, ডাক রাধানাথকে। অমুকের ভারি ব্যারাম হইয়াছে, দশ ক্রোশ গিয়া অমুককে সংবাদ দিয়া আসিতে হইবে, এ কার্য্য করিতে আর কেহই নাই, কেবল রাধানাথ। ইহার উপর রাধানাথ অনেক ঔষধ ও মন্ত্র তন্ত্র জানিত। তোমার পা কাটিয়া গিয়াছে, রাধানাথের কাছে যাও এখনই রক্ত বন্ধ হইবে, এখনি দুই ঘণ্টায় ক্ষত সারিয়া যাইবে। রাধানাথ যে ঔষধ দিত তাহার নাম "ডাকাতে ঔষধ"। ছেলেদের কোন পীড়া হইলে রাধানাথ আরাম করিবে। কাহারও উপর কোন রকম 'নজর' লাগিলে সেও রাধানাথ আরাম করিবে। সাপে কামড়াইয়াছে, যাও রাধানাথের কাছে, সে ভিন্ন গ্রামবাসীদের আর কি গতি আছে? রাধানাথ এই সকল ঔষধ ও মন্ত্রাদি তাহার মাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। লোকে তাহার মাতাকে ডাকিনী বলিত—সে বড় "গুণী" ছিল, উত্তর কালে সে নাকি বলিত, রাধানাথ মরিয়া গেলে যদি তাহার একখানা হাড় পাই তবে আবার যেমন রাধানাথ তেমনি করিব। যাহা হৌক সে কথা পরে হইবে।

রাধানাথ প্রথমে নির্ব্বিরোধী বাঙ্গালী কৃষক ছিল—সাতেও নাই পাঁচেও নাই। তবে সেই সময় প্রজার উপর কোম্পানীর লোকের অত্যাচার মধ্যে মধ্যে হইত, সে দেখিতে পাইত, তাহাতে তাহার ভারি রাগ হইত। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী যে কোন আদালতের লোকই হউক না, রাধানাথ সকলের উপর অত্যন্ত চটা ছিল। তাহার গ্রামে সরকারী কার্য্য করিতে গেলে রাধানাথ বাধা দিত। দুই একজনের বাড়ী ক্রোক করিতে আসিলে রাধানাথ মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। পেয়াদা নাজির নালিস করিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষী অভাবে কিছু হয় নাই। আবার ফৌজদারীর আসামী গ্রেপ্তার করিতে সরকারী লোক আসিল, রাধানাথ মারিয়া তাড়াইয়া দিল। এই সমস্ত কারণে পাঁচখানা গ্রামের লোক রাধানাথের প্রতি আকৃষ্ট হইল। অনেক যুবক রাধানাথের নিকট খেলা শিখিতে লাগিল —তাহারা ওস্তাদ (গুরু) বলিয়া তাহাকে মানিত। রাধানাথের শিষ্যদলের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থও ছিলেন। শিষ্যেরা ত তাহাকে গুরু বলিয়া মানিবে সম্মান করিবেই, কিন্তু এখন গ্রামশুদ্ধ লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা রধানাথকে মানিতে লাগিল। যাহার যাহা আবশ্যক সে রাধানাথকে গিয়া বলিত। রাধানাথকে বলাও যা কার্য্য সম্পন্ন হওয়াও তা। সুতরাং গ্রামের লোক একেবারে তাহার বশ্যতাপন্ন হইয়া পড়িল।

গ্রামের মাথা ছিলেন শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়। কেবল যে মস্থরে নপাড়া গ্রামের তিনি মাথা ছিলেন তাহা নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলেরও মাথা ছিলেন। সকল

লোকেই তাঁহাকে সম্মান করিত। কাহারও গাই বিয়াইলে ঠাকুরদের পরেই মুখুয্যে মহাশয়কে আগে দুধ দিবে। গাছের কলা কাঁদিটা পাকিলে মুখুয্যে মহাশয় আগে ছড়া কতক পাইবেন ইত্যাদি। এই সম্মান মুখুয্যে মহাশয়ের ছিল। কিন্তু এখন রাধানাথের পসারে সে সম্মান লোপ পাইতে চলিল। এখন কলা কাঁদিটা তেলী বৌ রাধানাথকে দেয়—বলে "মুখুয্যেকে দিলে আমার কি হবে? রাধা যে চার দিনের হারাণো আমার বুধী গাইকে খুঁজে এনে দিয়েছিল—শুনেছি গোচোরে নিয়েছিল, রাধা সন্ধান করে তাহাকে মেরে গাই কেড়ে আনে।" প্রাণকৃষ্ণ চট্টোর গাই বিয়াইলে সে এবার দুধ রাধানাথকে দিয়াছিল, মুখুয্যে মহাশয়কে দেয় নাই। সেদিন বিশ্বাসদের চাঁড়ালগেঁড়ে পুকুরে মাছ ধরা হইয়াছিল। মাছ ধরার সময় শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এইখান দিয়া একতারপুরে খাজানা আদায় করিয়া বাটী ফিরিয়া আসেন; বিশ্বাসরা তাহা দেখিয়াছিল, তবুও মুখুয্যে মহাশয়কে কোনও মাছ না পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে রাধানাথকে মাছ পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেদিন আর একটি ঘটনা হইয়াছিল। বড় একটি কালবোস মাছ উঠিলে বিশ্বাসদের ন'বাবু বলেন যে ওটা মুখুয্যে মহাশয়কে দেওয়া যাইবে। ইহার পরও সেই মাছ রাধানাথকে দেওয়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তি মাছ লইয়া রাধানাথকে দিতে আসে, সে ঐকথা, রাধাকে বাড়াইবার জন্য তাহাকে বলিয়াছিল। রাধানাথ শুনিয়া সে মাছ লইল না বলিল ইহা মুখুয্যে মহাশয়কে দাও গে। মুখুয্যে যখন শুনিলেন রাধানাথ মাছ লয় নাই পাঠাইয়া দিয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। যে হিংসা তাঁহার হৃদয়কে স্তরে স্তরে তুষের আগুনের ন্যায় দগ্ধ করিতেছিল তাহা আজ সহসা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। "চাড়াল বেটা হলো কি! এ্যাঁ? শ্রীনাথ মুখুয্যেরও মুরুব্বি, দয়া করে মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন। শালাকে এই আস্পর্দ্ধার প্রতিফল দিব, বাঁধাব শালাকে—জেলে পচাব। বামন হয়ে চাঁদে হাত?"

মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত স্থানীয় থানার দারগা বাবুর বিশেষ প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং বলাই বাহুল্য রাধানাথের আজি হইতে নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। কোথাও চুরি হইয়াছে, রাধানাথের ঘর খানা-তল্লাসী আরম্ভ হইল। কোথাও ডাকাতী হইয়াছে রাধানাথ চালান যাইল। লোকে একেবারে অবাক্। রাধানাথ অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইত—গ্রামস্থ অপরাপর লোক চেষ্টা করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিত। ক্রমে রাধানাথ ও গ্রামস্থ লোক বুঝিতে পারিল যে এই সকল কার্য্যের মূলে আছেন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়। এক-দিন রাধানাথ সন্ধ্যার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গেল। তিনি শিবের ঘরের দ্বারে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন। সন্ধ্যা শেষ হইলে রাধানাথ মাটিতে নাকখত দিয়া বলিল, "ঠাকুরমশায়, জানবিৎ কোন পাপ ত করিনি—কেন আপনার কোপে পড়লাম? ভাল—আমার অদৃষ্টের দোষে যা হবার তা হয়েছে, এখন আমায় মাফ করুন, নইলে হয় আমার গলায় দড়ি দিতে হবে, নয় দেশত্যাগী হতে হবে। অপরাধ যদি হয়ে থাকে মাফ করুন।"

মুখুয্যে মহাশয় রাধানাথকে দেখিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কোন ক্রমে ক্রোধ সংবরণ করিয়া কথা শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে বলিলেন, "গলায় দড়ীই তোমার হবে, তবে সে দড়ী ফাঁসির। হয় জেলে পচাব—নইলে ফাঁসিতে ঝোলাব। অপরাধ? অপরাধ? বেটা আমার কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! ঘোর অপরাধ! দেবতা ব্রাহ্মণের আগ ভাগ খাওয়া? শ্রীনাথ মুখুয্যে তোমার সমযোগ্য নয়, উনি আজ গ্রামের কর্ত্তা। হায় ধর্ম্ম, চাঁড়াল ব্যাটা বামুনের মাথায়, দেবতার মাথায়? ঘোর কলি! ঘোর কলি! দূর হ বেরো বেটা সমুখ থেকে, দূর হ। কৈ হ্যায় রে, পাকড়ো ডাকু শালাকো পাকড়ো।" এক নিশ্বাসে কথা গুলা শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়া ফেলিলেন।

কথা যত শুনিতেছে রাধানাথ ততই চমৎকৃত হই-তেছে। তারপর সে দেখিল, যেমন কৈ হ্যায় রে বলা, আর অমনি মুখুয্যের বাটী হইতে দুইজন বরকন্দাজ ছুটিয়া

তাহাকে ধরিতে আসিল। রাধানাথ এক লম্ফে ১৫ হাত পিছাইয়া পড়িল। লাফ দেখিয়া বরকন্দাজ দুইজন অবাক্। মুহূর্ত্তমাত্র সেইখানে দাঁড়াইয়া রাধানাথ তার-স্বরে বলিল, "দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী, রাধানাথ কোন অপ-রাধে অপরাধী নয়। তবে মুখুয্যে মশায়ের ব্যবহার পাষাণেরও অসহ্য। কপালের ভোগ বারমাস। রাধানাথ আজ থেকে ডাকাত। সাবধান, আমার যদি গলায় দড়ী হয় তোমারও হবে। মা কালীর ইচ্ছা।"

মুখোপাধ্যায় ও বরকন্দাজ দুইজন, আর পূর্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় যিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সকলে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন—রাধানাথ নিমেষে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন রজনী যোগে মসুরে নপাড়া হইতে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও বরকন্দাজ দুইজন কোথায় চলিয়া গেল। রাধানাথও অদৃশ্য হইল।

অল্পদিন মধ্যেই রাধানাথের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাধানাথ পত্র লিখিয়া টাকা চায়, যদি পাইল উত্তম, নহিলে টাকা দিতে অস্বীকার-কারীর বাড়ী ডাকাতি হইল। রাধানাথের ডাকাতির টাকার কিরূপ গতি শুনিবেন? কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, ঋণদায়, ব্যাধিদায়—এই সকল দায়ে পড়িয়া যদি কেহ রাধানাথের শরণাগত হইত, সে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামত টাকা পাইত। মিথ্যা কথা বলিয়া কেহ টাকা চাহিত না, চাহিতে ভরসা করিত না। রাধানাথের গতিবিধি কোথা নাই? সে যে সব জানে, মিথ্যা কথা টিকিবে না, ধরা পড়িয়া যাইবে। কেহ তোমার সম্পত্তি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে? ভয় কি? রাধানাথ আছে। কেহ ফৌজদারী দায়ে পড়িয়াছে—সেও রাধানাথের সাহায্য পাইবে। রাধানাথ নিজ গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে ডাকাতী করিত না, দূর দূরান্তরে দশ বিশ ত্রিশ ক্রোশ দূরে গিয়া ডাকাতী করিত। রাধানাথের দল কখন কোথায় থাকিত তাহা কেহ বলিতে পারিত না। রাধানাথ গ্রামের লোকের কণ্ঠহারের কণ্ঠমণি, যেমন ছিল তেমনই আছে। গ্রামের সমস্ত লোক শ্রীনাথ বাবুর উপর চটিয়া গিয়াছে। মুখোপাধ্যায় একঘরে হইয়াছেন।

রাধানাথ কখনও কখনও নিজে একলা ডাকাতী করিত, কাহারও সাহায্য লইত না। রাধানাথের ও তাহার দলের অনেক লোকের বাঁশের পা ছিল। লম্বা লম্বা বাঁশের গিটে পা রাখিয়া হু হু করিয়া চলিয়া যাইত। রাধানাথ সর্ব্ব বিষয়ে দলের অপর সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। গ্রামে পাঁচজন ভদ্রলোকের নিকট বসিয়া রাধনাথ গল্প করিতেছে, রাত্রি ১০টা হইয়াছে। "শৌচ হইতে আসি" বলিয়া রাধানাথ চারি ক্রোশ দূরে একজন দুষ্ট বণিকের বাটীতে ডাকাতি করিয়া আবার ঘণ্টাখানেক মধ্যে তথায় ফিরিয়া আসিল। রাধানাথ নানা ঔষধ জানিত, হাত পা কাটিয়া গেলে বা হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে সেই সকল একদিনে আরাম করিতে পারিত। ঐ সকল ঔষধের নাম "ডাকাতে ঔষধ"। রাধানাথের মাতার নাম ছিল ডাকিনী। সে বলিত যে, যদি রাধানাথ আমার মরে, আর তার একখানা হাড় পাই, আমি তাহা হইলে আবার একটা রাধানাথ সৃষ্টি করিতে পারি। লোকে বলিত সে ভারি ওস্তাদ।

বলা বাহুল্য রাধানাথের নামে সহস্রটা কৃত অপ-রাধের জন্য সহস্রটা ওয়ারীণ জারী ছিল। তাহাকে ধরিবার জন্য সর্ব্বদা লোক ফিরিত। কিন্তু রাধানাথ গ্রামে থাকিত না বলিয়া তাহাকে অন্যত্র খুঁজিত, গ্রামে বড় একটা খুঁজিত না। এজন্য রাধানাথ লুকাইয়া লুকাইয়া প্রায়ই গ্রামে আসিত, আবার রাতারাতি চলিয়া যাইত। কিছুকাল ডাকাতি করার পর রাধানাথের একটি অবিদ্যা জুটিয়াছিল—সে গ্রামে বাস করিত। রাধা-নাথকে ধরিবার জন্য শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন এই অবিদ্যার শরণাপন্ন হইলেন। অবিদ্যা কিন্তু কিছুতেই রাধানাথকে ধরাইতে রাজী হইল না। রাধানাথও এ সব সংবাদ পাইত। শেষে মুখোপাধ্যায় এত রাগান্বিত হইলেন যে, নিজে পুলিশের সব লোক সঙ্গে লইয়া এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাধানাথও প্রকাশ

করিল যে সে অনেক সহ্য করিয়াছে, আর সহ্য করিবে না, সে এবার শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুণ্ডটা শ্রীশ্রীকালী মাতাকে উপহার দিবে। সুতরাং মুখোপাধ্যায়ের রক্ষার্থে পুলিস প্রহরী গ্রামে সর্ব্বদা বসিয়া রহিল। কাযেই এই সকল পুলিশ প্রহরীকে, রাধানাথের সেবক ও গ্রাম্য লোকের হস্তে মধ্যে মধ্যে বড়ই উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত।

রাধানাথের প্রগাঢ় কালীভক্তি ছিল। ৺কালীপূজা না করিয়া, মা-কে না জানাইয়া, সে কখনও ডাকাতী করিতে যাইত না। রাধানাথ তাহার ওস্তাদজীর নিকট কালীর স্বরূপ কি বুঝিয়া লইয়াছিল, সুতরাং স্ত্রীলোক মাত্রকেই সে মা বলিত ও জগদম্বা জ্ঞানে মনে মনে ভক্তি ও প্রণাম করিত। বালিকা ও কুমারীকে সে সাক্ষাৎ কালিকা দেবী বলিয়া বুঝিত, ভেদ জ্ঞান করিত না। রাধানাথের হুকুম ছিল যে, যদি তাহার দলস্থ কেহ কখনও কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে তবে অমনি তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইবে।

একবার এই ঘটনাটি হইয়াছিল। একদা একজন ব্রাহ্মণ রাধানাথের ডাকাতীর দলে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। আসিয়া অবধি সে বলিতে আরম্ভ করে যে, অমুক গ্রামের অমুকের বাড়ীতে অনেক টাকাকড়ি আছে, সেইখানে ডাকাতী করিলে প্রচুর লাভ হইবে। রাধানাথ সংবাদ লইল যে সে ব্রাহ্মণ গরীব। যতদূর প্রকাশ তাহার টাকাকড়ি নাই। সুতরাং ডাকাতি করিতে রাধা অস্বীকার করিল। ডাকাত ব্রাহ্মণও ছাড়ে না। সে বলিল আমি দায়ী হইব, যদি মাল না পাওয়া যায় কাঁচা মাথা দিব। তখন অগত্যা ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া রাধা ডাকাতী করিতে স্বীকার করিল। ধার্য্যদিনে যথাকালে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। ডাকাতেরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাক্স পেটরা ভাঙ্গিতেছে, আর সেই ব্রাহ্মণ ডাকাত একটা সিঁড়ির নীচে নিভৃত স্থানে একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনষ্ট করিতেছে। দৃষ্টিমাত্র ক্রোধে জ্ঞানহত হইয়া একজন ডাকাত তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইয়া ব্যাপার দেখিল। বুঝিল কোনক্রমে সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণ যুবক শেষে ডাকাতগণের আশ্রয় লইয়া যুবতীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে। রাধানাথ গম্ভীরভাবে বলিল, "মা কালী, কেন এমন হল? কোথাকে কি পাপ করিল? আমার পতন নিকট।" রাধার সঙ্কেতে তৎক্ষণাৎ ডাকাতগণ চলিয়া গেল।

রাধানাথ, শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অত্যাচারে নিতান্ত পীড়িত হইয়া শেষে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি করা স্থির করিল। একথাও ঠিক হইল যে, শ্রীনাথ উপস্থিত থাকিলে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড ধূলি চুম্বন করিবে। শ্রীনাথের স্ত্রী ছিল না, বাটিতে শ্রীনাথের একটি কুমারী কন্যা ও একটি বর্ষীয়সী বৃদ্ধা ছিল—আর কেহই ছিল না। বাটীতে শ্রীনাথ আসিয়াই বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার বাটীতে ডাকাতি হইবে। তিনি তখনই অতি গোপনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যথা সময়ে ডাকাতগণ রেরে করিয়া আসিয়া মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পড়িল। তাহারা চারিদিক পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোথাও শ্রীনাথকে দেখিতে পাইল না। তখন সহসা রাধানাথ দেখিল, কপাটের পার্শ্বে কি একটা লুকাইয়া রহিয়াছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল যে, শ্রীনাথের কুমারী কন্যা। রাধানাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেই কন্যাকে কোলে করিয়া তাহাকে যথোচিত আদর করিয়া, সংবাদ জানিল, শ্রীনাথ মুখো বাড়ীতে নাই, সন্ধ্যার সময়েই পলাইয়াছে। তখন নিকটস্থ ময়রা বাড়ী হইতে সন্দেশ আনাইয়া কুমারীসেবা করিয়া, রাধানাথ চলিয়া গেল। শ্রীনাথের বড়ই পরমায়ু। উত্তর কালে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই কন্যার বলাগড় থানায় দীর্ঘস্থই গ্রামে বিবাহ হয়। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহাকে গ্রামস্থ সকলে নপাড়ার জেঠাই বলিয়া ডাকিত। এই ডাকাতির গল্প ইনিই স্বমুখে অনেকের নিকট বলিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীনাথ রাধানাথকে ধরাইবার জন্য প্রাণপণ করিলেন। গ্রামে আর একটিও পুলিশ পাহারা রহিল না। রাধানাথকে ধরিবার জন্যে আর কেহ চেষ্টা করিত না। রাধানাথও দেখিল যে, তাহাকে ধরিবার

জন্য কোম্পানীর আর বড় চেষ্টা নাই—সুতরাং শিথিলতা ও অবসন্নতা তাহাঁকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে রাধানাথ ঘোর মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা গ্রামস্থা তাহার সেই অবিদ্যার নিকট থাকিত। একদিন শ্রীনাথ বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিলেন, রাধা তাহার অবিদ্যার ঘরে অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িয়া আছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। তখনই পুলিশ প্রহরী আনাইয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাধা সে দিনও পালাইয়া গেল—সময়ে অবিদ্যা তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল।

শেষে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া রাধার অবিদ্যাকে বশীভূত করিল। অবিদ্যা সংবাদ দিল যে, রাধা আবার মাতাল হইয়াছে। এবার পুলিস পাহারা চুপে চুপে গিয়া বাড়ী ঘেরাও করিল ও উঠানে সরিষা ছড়াইয়া দিল। রাধা অবিদ্যার ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছে, আর উর্ণনাভ শ্রীনাথ তাহার চতুর্দ্দিকে জাল বিস্তার করিতেছে। কে আর এবারে তাহাকে সংবাদ দিবে, অবিদ্যা যে শ্রীনাথের বশীভূত হইয়াছে! গ্রামের লোক বিপদ গণিল। তাহাদের ইচ্ছা নয় যে রাধার কোনরূপ অমঙ্গল হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেদিন রাধার মা বাড়ী ছিল না। গ্রামের দু এক জন সাহসী লোক তফাৎ হইতে চীৎকার করিয়া রাধাকে সাবধান করিতে প্রয়াসী হইল। যখন অবিদ্যা দেখিল যে, গ্রামের লোক এইরূপে তার "মানুষ"কে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তখন সে রাধানাথকে জাগরিত করিয়া, পুলিস ঘেরাও করার কথা বলিল। রাধানাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—বুঝিল একটা বিশ্বাসঘাতকতা হইয়াছে। তখন আর কি হইবে? জয়কালী বলিয়া যেমন উঠানে পড়িয়া ছুটিবে, অমনি সরিষার উপর পড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে বাঁশ দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরা হইল। অনেক ধস্তাধস্তির পর রাধানাথের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী পড়িল। রাধা পুলিশ বেষ্টিত হইয়া হুগলীর ডাকাতি কমিশনের বাড়ীতে চলিল।

আজ হুগলীর ডাকাতী কমিশনের বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—রাধা ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। যেন সার্কিট হৌসে কোন মেলা বসিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতেই পিপীলিকার ন্যায় লোকের সারি রাধানাথের ফাঁসি দেখিতে চলিয়াছে। লোকের বিশ্বাস রাধা মরিবে না; তার মা যদি হাড় পায় তবে তখনই আর একটি রাধা সৃষ্টি করিবে। সরকার বাহাদুর যখন শুনিলেন রাধার মা কোথায় গিয়াছে, তখন সে ফিরিয়া না আসিতে আসিতেই কায সাবাড় করিতে মনস্থ করিলেন। সন্ধ্যার সময় রাধা পঁহুছিয়াছিল, সুতরাং সেই রাত্রে সাক্ষী আনিতে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। প্রাতঃকালে সরাসরি বিচার করিয়া কমিশন ফাঁসির হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, রাধার মা যেন কাছে আসিতে, ফাঁসী দেখিতে, বা হাড় লইতে না পায়। কেহ কেহ বলেন, রাধানাথের বিচার খুব গোপনেই হইয়াছিল, আর সাক্ষী এক শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধরাধামে আজ রাধানাথের শেষ দিন। প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, দেহ দিয়া, অর্থ দিয়া রাধানাথ যে সকল লোকের উপকার করিয়াছিল—একদিন নয় দুইদিন নয় কুড়ি বৎসর ধরিয়া উপকার করিয়াছিল—তাহারা আজ আসিয়াছে, দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া রাধানাথকে, উপকারী বন্ধুকে, শেষদিনে জন্মের মত দেখিতে আসিয়াছে। রাধানাথ নিরন্নকে অন্ন দিত, দিগম্বরকে বস্ত্র দিত, আতুরকে ঔষধ দিত। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, প্রায়শ্চিত্তদায় এ সকল দায় হইতে রাধানাথ রক্ষা করিত। রাধা ধনীর লইয়া গরীবকে দিত, কৃপণের ধন লইয়া দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিত। ডাকাতীর সময় অত্যাচার ছিল না। চাবি দেও, জিনিষ লইয়া যাই। পূর্ব্বে পত্র লিখিলে যে টাকা দিত, তাহার বাটী ডাকাতি হইত না। বিলাতের রবিন হুডের অপেক্ষা রাধা অনেক উচ্চ, তাহা সরকার জানিতেন। তাই পাছে লোকে রাধাকে ছিনাইয়া লয়, এই জন্য অনেক পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তবে রাধার তুলনা কি কেবল রাধা? না, আরও আছে—বিশ্বনাথ বাবু। বিশ্বনাথ

বাবুর নাম এত অধিক হইবার কারণ এই যে, তিনি ৪।৫ জেলা লইয়া কার্য্য করিতেন আর রাধা একটা মাত্র জেলা লইয়া থাকিত। বিশ্বনাথ লেখাপড়া জানিত, সদ্বংশ জাত, রাধানাথ নিরক্ষর চণ্ডাল। সে যাহা হৌক, লোকে লোকারণ্য। রাধার অবিভা আত্মগ্লানির দহনে থাকিতে পারে নাই, সে ও আসিয়াছে, দূরে প্রহরীগণ তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, নিকটে আসিতে দিতেছে না। রাধার অবিভা বলিয়া অনেক লোক তাহাকে দেখিতে পাওয়ায় সেখানে বড় ভিড়। আর সেই ধরাইয়া দিয়াছে বলিয়া সকলে তাকে মারিতে উদ্যত, সুতরাং পুলিশ তাহাকে যত্নে রক্ষা করিতেছে। আর রাধার মা? সে হতভাগিনী আজ শেষ দিনে একবার পুত্রকে দেখিতেও পাইল না! কোথায় গিয়াছে, হয়ত সংবাদই জানে না। আর এক পার্শ্বে উচ্চ স্থানে—সেখানে ভিড় নাই—একটু নিভৃতে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় করতলে কোপল বিন্যাস করিয়া ভাবনা-সাগরে ভাসিতেছেন, আত্মগ্লানি দাবাগ্নিতে শতধা দগ্ধ হইতেছেন। আজ মনে মনে বলিতেছেন—এক একবার চীৎকার করিয়াও বলিতেছেন—"হায় হায় কি করিলাম? কেন ধরাইলাম? প্রাণসম প্রিয়তমা কন্যা আমাকে যে হাতে ধরিয়া বলিয়াছিল—'বাবা, রাধা জ্যেঠা আমাকে বড় ভালবাসে, তাকে ধরাস নি।' হায় হায়, কেন শুনিলাম না? ঈর্ষার বশে কি সর্ব্বনাশই করিলাম!" শ্রীনাথ আজ উন্মত্ত। এক একবার অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, রাধার ফাঁসি হইলে তিনি নিজে গলায় দড়ি দিয়া মরিবেন। রাধার শোক তাঁহার কন্যাকে যে বড়ই লাগিবে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া রাধানাথ আসিল। ধীর গম্ভীর দৃঢ় পদবিক্ষেপে ফাঁসী মঞ্চে উঠিল। একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। দূরে দেখিল তাহার অবিভা পুলিস পাহারা ঘেরা—তাহাকে কাছে আসিতে দিতেছে না। রাধাকে দেখিয়া সে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে ও ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। রাধানাথ গভীর ভাবে তাহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া, কি মনে করিয়া, হো হো করিয়া, একবার হাসিয়া উঠিল। তারপর রাধার চক্ষু লোকারণ্যের মধ্যে যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিল—যেন অন্বেষণের বস্তু মিলিল না। পুনরায় রাধানাথ আবার কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল, আবার তাহার নয়নদ্বয় লোকারণ্যে কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। এবার কিন্তু অন্বেষণের বস্তু মিলিল। এ বস্তু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। দেখিবা মাত্র রাধানাথ একবার চমকাইয়া উঠিল—শ্রীনাথ আর সে শ্রীনাথ নাই, জীর্ণ, শীর্ণ, প্রায় দুই দিনেই বার্দ্ধক্যে উপনীত, দুইদিনে জরাগ্রস্ত। যুক্ত কর কপালে তুলিয়া ঘাড় নোয়াইয়া রাধানাথ ভক্তিভাবে শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম করিল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মুখুয্যে মশায়, তোমার শত্রু রাধা চল্ল, কিন্তু আবার দেখা হবে। আপনি ভাল করেছেন—পাপের নিবৃত্তি হল, কিন্তু পাপ করবার মূল আপনিই। তাই বা কেন, কপাল ছাড়া পথ নাই। সকলই মা কালীর ইচ্ছা।" এই কথা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক্। পুলিস কি সঙ্কেত করিল। রাধানাথ স্থির হইয়া দাঁড়াইল, হাত যুক্ত করিয়া দেব দেবীকে প্রণাম করিল—গঙ্গাকে প্রণাম করিল। তারপর চীৎকার করিয়া বলিল, "ভাই সকল, সকলে একবার জয় কালী বল, একবার জয় কালী বল।" তখন সেই লোকারণ্য-সমস্বরে গম্ভীর আরাবে বলিল—"জয় মা কালী, জয় মা কালী!" জয় মা কালী শব্দ জল স্থল কানন ছাইয়া বাষ্পার্ণব ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল।

রাধার মুখে মুখোশ দিয়া গলায় ফাঁস দেওয়া হইল। রাধানাথ স্থির হইয়া কালী নাম জপ করিতেছে—চক্ষু মুদিয়া আছে। কর্ত্তার সঙ্কেতে পুলিস পাহারা কাষ্ঠ দণ্ডের উভয় পার্শ্বের দড়ী একই মুহূর্ত্তে কাটিয়া দিল। রাধানাথ দড়ীতে দোদুল্যমান হইয়া একেবারে মঞ্চ হইতে ৮ হাত নীচে পড়িয়া ঝুলিতে লাগিল। সব ফুরাইল।

তখন সেই লোকারণ্য বিরাট চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুলিস বেটন সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। রাধানাথের হাড় তাহার মা যাহাতে না পায় তাহার বন্দোবস্ত পুলিশ কর্ত্তৃক হইল।

শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় সেইদিন গলায় দড়ী দিয়া মরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোক আসাতে কার্য্য সমাধা হয় নাই। শেষে একদিন তিনি চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিলেন।

গোলাম সর্দ্দারের কাহিনী।

বর্দ্ধমান জেলার রায়না গ্রামে গোলাম সর্দ্দার নামে একজন নামজাদা ডাকাইত ছিল। তাহার প্রবল প্রতাপে এককালে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা প্রকম্পিত হইত। তাহার দলে বহু লোক থাকিত। একবার সে বাঁশবেড়িয়া সংলগ্ন খামার পাড়া গ্রামে মাইতে কাঁসারী নামক একজন অর্থশালী লোকের বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে আসে। সেই তাহার শেষ ডাকাতি। গভীর রজনীতে ডাকাত পড়ার ভীষণ "রে রে" শব্দ চতুর্দ্দিকের গ্রাম সমূহকে সজাগ করিয়া তুলিল। লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখনকার দিনে সমৃদ্ধ গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে একজন করিয়া সর্দ্দার থাকিত। তাহারাও সুযোগমত ডাকাতি করিত, কিন্তু স্বগ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহাদের এলাকার মধ্যে কেহ ডাকাতি করিতে আসিলে বাধা দিত। বাঁশবেড়িয়াতে এইরূপ অনেকগুলি সর্দ্দার ছিল। তাহারা অবিলম্বে একত্র হইয়া ডাকাতদের শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাতিয়ার সহ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তাহারা যখন ঘটনাস্থলে পৌছিল তখন প্রায় ডাকাতির কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহারা ডাকাতদের পালায়নের পথ আটক করিল। কিয়ৎক্ষণ তুমুল লড়াইয়ের পর বক্ষে বর্ষা বিদ্ধ হইয়া গোলাম প্রাণত্যাগ করিল—তাহার মুণ্ড লইয়া যাইবার জন্য তাহার দলস্থ লোকেরা অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু বাঁশবেড়িয়ার সর্দ্দারদের নিকট পরাভূত হইয়া তাহারা "জাল গুটাইল"—নৌকা পথে পলায়ন করিল। গোয়েন্দাদের বহু চেষ্টায় গোলাম সর্দ্দারের দলের অনেকগুলি ডাকাইত ধরা পড়িয়া কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। প্রতিরোধকারী সর্দ্দারের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য গবর্ণমেণ্ট আমাদের বাড়ীতে এক দরবারের ব্যবস্থা করেন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ সর্দ্দারদের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া কার্য্যের তারতম্যানুসারে তাহাদিগকে স্বুবর্ণ ও রৌপ্য বলয় উপহার দেন। আমরা তাহাদের কাহাকেও কাহা কও সেই বলয় পরিধান করিতে দেখিয়াছি।

এইরূপে একে একে বহু নামজাদা ডাকাইত ধরা পড়িয়া, অনেকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত বা দ্বীপান্তরিত হওয়ায়, ডাকাতেরা ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং উপযুক্ত নেতার অভাবে তাহাদের কার্য্যের প্রসার হ্রাস হইতে থাকে। একেবারে ডাকাতি দমন না হইলেও, ডাকাতি কমিশনের অক্লান্ত চেষ্টায় দেশে মোটের উপর শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫-৬০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের শাসন বিবরণীতে লিখিত আছে—

"The Commission for the suppression of dacoity has during the last year greatly extended its operations, and it has now its ramifications in nearly every district of Bengal. Great, too, has been the success of its exertions. In many districts the crime may be said to be almost extinct."

শাসন বিবরণী পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সে সময় অনেক জেলায় ডাকাতি প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ডাকাতি কমিশনের সৃষ্টি হয় সেই হুগলী জেলা হইতে কিন্তু ডাকাতি লোপ পায় নাই। এখনও কোন কোন বৎসর হুগলী জেলা বঙ্গদেশ মধ্যে ডাকাতির সংখ্যার তুলনায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকে। তবে খাঁটি বাঙ্গালী ডাকাইতের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন যে সকল ডাকাতি হয় তাহা অধিকাংশ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দস্যু প্রকৃতির লোকদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। স্থানীয় অসৎ প্রকৃতির লোকের সহায়তায় রেলের কুলী বা কলের শ্রমজীবী প্রভৃতি অনেক ডাকাতিতে লিপ্ত

থাকে। দেশের লোক যতদিন পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে তবু আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান হইবে না, ততদিন ডাকাতি দমন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইবে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইংলিস সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"The difficulty of detection lies in the rapidity of movements possible here, the timidity of the residents, and their failure to give the police any clue. Large number of foreigners pass through this district in search of work, and dacoits are not suspected."

এই ধরুন, ১৯০০ সালে হুগলী জেলায় ২৫টি ডাকাতি হয়, তন্মধ্যে ১৯টীর কোনও কিনারা হয় নাই—৬টী ডাকাতি পুলিশ চালান দেয়—তন্মধ্যে নিম্ন আদালতে ২টীর আসামী খালাস পায় ও সেশন আদালতের বিচারে ৪টীর মধ্যে ৩টী ডাকাতির আসামী দণ্ড পায় ও একটির আসামীগণ খালাস পায়।

সার জর্জ্জ কম্পবেল তাঁহার "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" (Modern India) নামক পুস্তকে বাঙ্গালার তাৎকালিক পুলিশ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"In Bengal proper, both the police and people are effiminate and the former has attained an unfotunate notoriety as being more active for evil than good. The misdeeds of the Bengal police may be a good deal exaggerated, but they are doubtless inefficient and apt to be corrupt. The chance of efficiency seems to be much lessened by the precautions which it is necessary to take against extortion and malversation on their part. A Bengal Inspector, insted of being an active, soldier-like man, mounted on a pony, is generally an obese individnal, clad in fine linen, who can hardly walk, and would think it death to get on horseback. He affects rather a jndicial than a thief catching character."

ইংরাজীতে একটি কথা আছে God helps those who help themselves—নিজেরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া কেবল পুলিশের উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেই হইবে। হুগলী জেলায় প্রায় এগার লক্ষ লোকের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য, কেবলমাত্র ৮১৩ জন পুলিশ আছে; অর্থাৎ একজন পুলিশ ১৩০০ জন অধিবাসীকে রক্ষা করিবে। ইহা কি কখনও সম্ভব? নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে দুর্গতির সীমা নাই। হুগলী সহরের যুবক বৃন্দ সহরবাসীর ধন প্রাণ রক্ষার জন্য সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া Defence party প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পালা ক্রমে তাঁহারা রজনীতে সহরে পাহারা দিয়া থাকেন। তাঁহারা কয়েক দল ডাকাইত ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কারও পাইয়াছেন। যদি গ্রামে গ্রামে এরূপ Defence party স্থাপিত হয় তাহা হইলে চুরি ডাকাতি আপনা হইতেই দমন হইবে—বাহিরের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না।

সমাপ্ত

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়।

মনের দাগ

(গল্প)

আমাদের বাড়ীর পাশে পত্রবহুল আম কাঁঠালের ফাঁকে ফাঁকে যে খোলার বাড়ীটি দেখা যায়, তার অধি-অধিবাসীরা এখন আর নেই, কিন্তু তাদের সকরুণ স্মৃতি বাড়ীটির সর্ব্বাঙ্গে ঘিরে রয়েছে। এই দিকটায় তাকালে এখনও আমার সমস্ত অন্তর মথিত করে অশ্রু ঠেলে আসতে চায়।

ওঁর বদলীর চাকরী। তখন সবেমাত্র আমরা এ যায়গায় এসেছি। উঠিয়ে আনা সংসার নূতন করে গুছিয়ে, কারো সঙ্গে আলাপ দূরে থাক সকলের পরিচয় নেওরা পর্যান্ত হয়নি। কেবল পাশের বাড়ীর মেয়েটা রোজই আসত, কিন্তু অকারণে নয়—একটু চায়ের প্রার্থনা নিয়ে।

জিনিসটা সামান্য, আর আমাদেরও ও পাট ছিল, কিন্তু বিস্ময় জন্মাত মেয়েটির চাইবার ধরণ দেখে। বাজার দূরে, চাকর নেই—নিদেনপক্ষে কয়লা আসেনি বলে চায়ের কোন না কোন উপকরণ মেয়েটি চাইত। মনে ভাবতাম হয়ত এরা খুব গরীব; চায়ের নেশা আছে কিন্তু পয়সায় কুলোয় না। স্বামীও একদিন তাই বল্লেন। তখন মেয়েটির কথা শুনে ভারী হাসি পেত। মানুষের স্বভাবই এই—নিজের দীনতাটুকু মিথ্যার আবরণ দিয়ে প্রাণপণে ঢাকতে চায়।

একদিন বল্লাম, "খুকী, তোমার মা বুঝি চা খান? তাহলে তুমি একটু ভোরে এস, আমাদের ত তখন চা হয়, তোমার মার জন্যে এক পেয়ালা নিয়ো।"

পরদিন কিন্তু মেয়েটি আর এল না; তার পরের দিন এসে বল্লে, তার মা ত রোজ চা খান না, দরকার হলে চেয়ে নেবেন।

ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল বেড়ে গেল। কারো সঙ্গে যে আলাপ হয়নি, নইলে প্রতিবেশীর সর্ব্বাপেক্ষা গোপন কথাটা জানতে আমাদের বেশীক্ষণ লাগে না। সেই পাশের বাড়ী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হল বটে কিন্তু একটু বিলম্বে।

দিনকয়েক পরে সেদিন পাড়ার সব মহিলা আমাদের বাড়ীতে সমবেত হয়েছিলেন। কথায় কথায় হঠাৎ একটি প্রৌঢ়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাশের বাড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

আমি বল্লাম, "না, এখনো যেতে পারিনি। তবে ওদের মেয়েটা রোজ আসে।"—সবাই জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কেন, কিছু চাইতে বোধ হয়?"

বলে ফেল্লাম, "হাঁ, ওরা বোধ হয় চা খান—" বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। কথাটা বলা বোধ হয় উচিত হয়নি, কিন্তু তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় ছিল না।

প্রৌঢ়া মহিলাটি বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বল্লেন, "এখানেও বাকী রাখেনি? মাগো ওদের হায়া নেই! মেয়েটাকে শুদ্ধ উঞ্ছবৃত্তি শেখানো হচ্ছে।"

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বল্লাম "নানা—ওত সামান্য জিনিস।"

তিনি বল্লেন, "যাদের ভাত জোটে না—তাদের আবার চায়ের সাধ কেন?" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, দরজার সামনে লালপেড়ে শাড়ী পরণে একটি বৌ এসে ম্লানমুখে দাঁড়িয়েছেন। সুন্দর মুখখানি কিসের লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত। তাঁরই কথা আলোচনা হচ্ছিল বুঝতে পেরে আমিও লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে সমাদর করে এনে বসালাম। কিন্তু এর পরে কথাবার্ত্তা আর তেমন জমল না, সবাই যেন নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে বউটীও তাড়াতাড়ি কাযের ছুতো করে উঠে পড়লেন।

পরে শুনলাম ইনি মদ্যপায়ী স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ভদ্রলোক যা মাইনে পান মদের দোকানে তার অর্দ্ধেক যায়, তার পর ছেলে পুলেদের নিয়ে এঁকেই মুস্কিলে পড়তে হয়। এদের চাওয়ার জ্বালায় নাকি পাড়াশুদ্ধ সবাই অস্থির। অবস্থা বুঝেও কেউ আর এদিকে ঘেঁসতে চায় না। তবে বউটি নাকি খুব ভাল আর শান্ত স্বভাব। এই যে স্বামী এত গোয়ার কচ্ছেন তা মুখে একটু রা নেই। এতই কি ভাল বাপু ? ছেলে মেয়ে রয়েছে, এত নরম হলে চলবে কেন ?

২

দুদিনের আলাপেই বউটী যেন আমার মনের অনেকটা অধিকার করে বসলেন। ঘুরে ফিরে তাঁর কথাটাই আমার মনে জাগতো। স্বামী তাই ঠাট্টা করে বলতেন—এ যে বাড়াবাড়ি। তাঁর নিজস্ব জিনিষটা নাকি বেদখল হয়ে যাচ্ছে! বাড়াবাড়ীই বটে, কিন্তু কিছুতেই এই দুঃখের সংসারটির কথা আমি ভুলতে পারতাম না। যখন তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখতাম, স্বামী ও সন্তানদের খাইয়ে স্বল্পাবশিষ্ট অন্ন দুটির পরে এক গ্লাস জল খেয়ে বউটি নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করছেন তখনি মনটা আহা বলে উঠত। ইচ্ছে করত বাড়ী থেকে কিছু এনে দিই, কিন্তু পাছে তিনি অপমান বোধ করেন এই ভয়ে মুখ ফুটে কোন দিন বলতে পারিনি।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা দিদি, আপনি আপনার স্বামীকে কিছু বলেন না ?"

বউটি একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লেন, "বলি বৈকি, কিন্তু নেশার সময় সব ভুলে যান। তার পরে যে অবস্থা হয়, সে তুমি বুঝবে না বোন—তখন তিনি কৃপার পাত্র।"

মনে মনে বল্লাম, "কৃপার পাত্র না ছাই! আমি হলে দেখে নিতাম। যে আমার দুঃখ দেখবে না—তাকেই আবার কৃপা করতে হবে নাকি ? এ কখনও সংসারের নিয়ম নয়।

সেদিন সকালে এ দিকের জানালায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সকাল বেলা আমার বিশেষ কিছু কায থাকে না। স্বামী চা খেয়েই বাইরে চলে যান। রান্নার জন্যে রাঁধুনী আছে, কুটনো টুটনোগুলি পুরাণো ঝি দেখে শুনে কাটে।

অন্যমনস্কভাবে ঘুরে ফিরে এই দিকটায় দাঁড়াতে চোখে পড়লো, আমাদের দু'বাড়ীর মাঝখানের পোড়ো জমিটুকুতে যে দুচারটি কাঁটানটের গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটি আর তার ছোট ভাই তারি শাক সংগ্রহ করছে। ছেলেটি বছর তিনেকের হলেও, দু'হাত পুরে শাক তুলে তার ক্ষুদে দিদিটির কাযের অনেক সহায়তা করছিল। একটুক্ষণ তাই দেখে আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খুকী, তোমার মা কি করছেন ?"

মেয়েটি বল্লে, "মা রান্না চাপিয়েছেন।"

বল্লাম, "এত সকালে ?"

মেয়েটা বল্লে, "কাল মার অসুখ করেছিল কি না, বিকেলে রাঁধতে পারেন নি, তাই—"

"কি অসুখ খুকী, জ্বর ?"

"কি জানি, তা তো জানি নে। শুধু বল্লেন, তোমাদের জন্য রুটি করে রেখেছি তাই খাওগে, আমি ত উঠতে পারব না। তা মোটে তিনখানা রুটী ছিল, কিচ্ছু পেট ভরল না। তাই আজ আমরা শাগ্‌গির খাব কি না।"

আমি চুপ করে রইলাম। কেন যে কাল রান্না হয়নি তা অনুমান ক'রে আর কিছু বলতে ইচ্ছে হল না। দেখতে দেখতে ওরা কোঁচড় ভর্ত্তি করে শাক তুলে নিলে। হয়ত এই গুলোই ওদের সেদিনের খাওয়ার একমাত্র উপকরণ। কিন্তু অবোধ শিশু দুটি আপনাদের কর্ম্মের সফলতায় এমনি আনন্দ কোলাহল করে তাদের মায়ের কাছে গেল, শুনে শুধু মনে মনে বল্লাম "আহা!"

দুপুরে পাশের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বউটি তখন শুয়ে ছিলেন, আমায় দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। রক্তিম মুখ আর ছল ছল চোখ দুটি দেখে বুঝতে পারলাম, সত্যি অসুখ করেছিল। একটু লজ্জিত

হয়ে বল্লাম, "শুয়ে ছিলেন, আমি এসে বাধা দিলুম।"

বউটি বল্লেন, "তার আর কি হয়েছে?"

আমি বল্লাম, "তবু অসুস্থ শরীরে—কাল বুঝি জ্বর হয়েছিল?"

"জ্বর? কৈ না তো।"

"হয়নি? আপনার ছোট মেয়ে বল্লে কিনা অসুখ হয়েছিল, তাই ভয় হল শেষটায় জ্বরে পড়লেন বুঝি!"

"ছোট মেয়ে বল্লে? ওঃ"—ব'লে বউটি হঠাৎ থেমে গেলেন। আর কিছু বলতে অনিচ্ছুক দেখে আমিও চুপ করে রইলাম।

খানিকক্ষণ গল্প করে উঠব উঠব মনে করছি, এমনি সময়ে এ পাড়ারই একটি স্ত্রীলোকটি ছোট একটি পুঁটুলী হাতে নিয়ে এসে তাঁকে বল্লে, "নাও, কিছু কাযে লাগলো না এসব! কেউ কিনতে চায় না গো, বলে এ তো ঘরে ঘরে সবাই করচে, দাম দিয়ে কে নেবে বল।"

দেখলাম, বউটির মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। ব্যাপার বুঝতে দেরী হল না। ঐ স্ত্রীলোকটিকে আমি আগে দেখেছি! এর ছেলের একটা দোকান আছে, বউটি বুঝি নিজের হাতের সেলাইগুলো বিক্রির জন্য দিয়েছিলেন। তাও আজ ফিরে এল! সেই জন্যেই বলে অভাগার দৃষ্টিতে সাগরও শুকিয়ে যায়।

স্ত্রীলোকটি চলে গেলে সেলাইগুলো নেড়ে চেড়ে বউটিকে বল্লাম, "বেশ ত করেছেন, কেউ নিলে না কেন? একটা কথা বলব দিদি?"

বউটি আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "কি?"

আমি বল্লাম, "আমায় দেবেন এসব? আমি বাড়ী গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বউটি এবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, "আমায় দয়া করছো ভাই? তাই করো, আমি যে আর সইতে পাচ্ছিনে।"

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বল্লাম, "না না তা কেন? এসবের আমার অনেকদিন থেকে সখ ছিল যে!"—কথাটা ঠিক সত্যি নয়, কেন না এসব সাধারণ সেলাই গুলো সবাই পারে। বউটি তা বুঝতে পেরেছিলেন তাই বল্লেন, "যাই হোক, আমায় সাহায্য করুন দিদি, আমি যে আর ছেলে মেয়েদের সামলাতে পাচ্ছিনে।"

আমি একটু ব্যথিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি আত্মীয় স্বজন কেউ নেই?" বল্লেন, "খেতে দেওয়ার কেউ নেই। আর জন্মে কত পাপই করেছিলাম দিদি, ঘরের ভিতর যে পড়ে থাকব তাও এই পেটের শত্রু গুলোর জন্যে পারবার যো নেই। কি আর বলব, আপনার চোখে ত কিছু ঢাকা নেই, চা আমি খাইনে দিদি, কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে পড়ে"—বলতে বলতে কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আমিও নীরবেই চোখের কোণটা মুছে ফেল্লাম। এর পরে কিছু বলবার মত প্রবৃত্তি বা শক্তি ছিল না। আমরা দুঃখের কল্পনায় কাঁদি, কিন্তু সত্যিকার দুঃখ যে কত ভীষণ তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

৩

সেদিন মনটা বড় খারাপ হয়েছিল। সন্ধ্যে বেলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁগা, এমন কোন কায নেই, যাতে ভদ্র ঘরের মেয়েরা দুরবস্থায় পড়লে করে খেতে পারে?" তিনি বল্লেন, "হ্যাঃ! ছেলেদেরই নেই তা মেয়েদের! দেশে যে এখন অন্নচিন্তা চমৎকারা!"

"তাই যদি হয় তবে উপায় হয়না কেন? ধর যারা ছেলে পুলে নিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে, কি কষ্ট ভেবে দেখ একবার।"

তিনি বল্লেন, "মুস্কিল বটে, মেয়েদের যে আবার একটুতে সম্মানে আটকায়।"

আমি বল্লাম, "বাঃ তবে কি তুমি বল পেটের দায়ে সম্মান ত্যাগ করিতে হবে? সে যে মানুষ প্রাণ গেলেও পারে না। সব দেশেই শুনিতে পাই একটা পথ আছে। দুর্ভাগ্য কেবল বাংলার মেয়েদের।"

তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন, "কেন, রাঁধুনী গিরি?

আমাদের দেশে ত অনেকে সম্মান বজায় রেখে তাই করে।"

হঠাৎ কেন জানি না ভারী রাগ হল। বল্লাম, "খুব বলেছ যাহোক্! তাই বা ক'জন পারে? একটু বয়েস না হলে ও-পথেও যে কাঁটা। আর তাতে যে সম্মান কত, তা শুধু ভুক্তভোগীই জানে।"

তিনি হেসে বল্লেন, "তা, তুমি ত ভুক্তভোগী নও, তুমিই বা কি করে জানলে?"

অকারণে রাগ করে নিজেই একটু কুণ্ঠিত হয়েছিলাম, তার ওপর ওঁর কথায় লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইলাম। তিনি বুঝতে পেরে নিজেই আবার বল্লেন, "তুমি কেন বলছ আমি বুঝতে পেরেছি। কি করবে বল, দেশের অধিকাংশ লোকের এই অবস্থা, যে যেমন কপাল নিয়ে আসে।"

ঠিক। কপালের দোহাই ছাড়া দুঃখীর আর সান্ত্বনা নেই ত। কেন ভেবে মরি?

এরপর নানা উপলক্ষ ধরে আমি চাল ডাল তরকারী মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতাম। বউটী একদিন কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেন, "আমার জন্যে কেন এত পাঠিয়েছেন দিদি?"

আমি কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বল্লাম, "আমি আপনার চেয়ে কত ছোট, তবু আমায় দিদি ব'লে লজ্জা দেন কেন?"

তিনি সস্নেহে আমার চিবুক স্পর্শ করে বল্লেন, "তুমি যে আমার বড় বোনের মত স্নেহের চোখে দেখ্‌ছ; দিদি বল্লেও তোমায় উপযুক্ত বলা হয় না। তা ছাড়া, তোমার স্বামীর অধীনেই ত এঁরা সব চাকরি করে খাচ্চেন।"

আমি লজ্জায় মুখ নত করে রইলাম।

৪

হঠাৎ একদিন শুনলাম তারা দেশে যাচ্ছে।

দুপুরে বউটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই তিনি বল্লেন, "সম্বল চাকরী টুকু গেছে দিদি।"

এবিভাগে অনেক দিন থেকে শিক্ষিত অর্থাৎ পাশ করা লোক নেবার কথা হচ্ছিল, কিন্তু পুরানো কর্ম্মচারীরা প্রাণপণে এর বিরুদ্ধে যুঝ্‌ছিলেন। এতদিনে আশা ভরসা ঘুচে গেল।

দুঃখিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন উপায়?"

"দেশে যাচ্ছি, উপায় জানি নে দিদি। বিনা ভাড়ায় ভিটেটুকু পাব, আর যিনি মুখ দিয়েছেন, তিনি আহারও দেবেন একথা যদি সত্যি হয়, তবে হয়ত তাও জুটবে।" ব'লে তিনি একটু হেসে চুপ করলেন। কিন্তু হাসি ত সে নয়, যেন কান্না, অথবা কান্নার চেয়েও সকরুণ। এ শুধু অনুভব করবার জিনিস, বলে' বোঝান যায় না কত দুঃখে মানুষ ওরকম ভাবে হাসতে পারে।

যাত্রার দিনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীর উদ্দেশ্যে অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করে, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেল্লেন। শেষ বয়সে এতদিনের চাকরী ছেড়ে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করা সহজ নয়। বড় দুঃখ হ'ল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হাঁগা, বুড়ো যারা, তাদের কায না নিলেই হতো। এ বয়সে ভদ্রলোক আর কি করবে বল দিকি?"

স্বামী বল্লেন, "অত নরম হলে কি চলে? কর্ত্তব্য এমনি কঠোর, তার কাছে দয়া মায়ার স্থান নেই। সেখানে দয়া করা দুর্ব্বলতা মাত্র।"

কি জানি! এ সংসারের রীতি নীতি এখনো বুঝতে পারি নি। সামান্য দয়ায় যদি একটি সংসার বেঁচে যায়, তবে হলই বা একটু দুর্ব্বলতা।

ওরা চলে গেল। কয়েক দিন মনটা বড় খারাপ রইল। শেষটায় নিজেই মনকে সান্ত্বনা দিতাম, হয়ত তারা ভালই আছে। শুনেছি পল্লীগ্রামে জীবনযাত্রা অনেক সহজ, আর ভগবানের বিধানে দুঃখীরও অন্ন জোটে। হয়ত ভদ্রলোকটী এতদিনে কোন কায জুটিয়েছেন। আর যদিও ওঁরা বামুন ন'ন, তবু তাঁর স্ত্রী হয়ত কোন স্বজাতির বাড়ী রান্না ক'রে, কিম্বা বাড়ীতে নানাবিধ কায করে' নিজেদের দীনতা দূর করছেন। এই রকম কত কল্পনা করতাম। দূরের জিনিস মানুষকে বেশী আশান্বিত করে তোলে, কিন্তু সেটা

যে মরীচিকার মতই মিথ্যা ভ্রম, তা টের পেলাম মাস দুই পরে।

সেদিন ও পাড়ায় সমস্ত মেয়েরা একবাড়ীতে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে যেতেই শুনতে পেলাম, কার আত্মহত্যার কথা সবাই বলাবলি করছেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কার কথা বলছেন?"

একটি মহিলা বলে উঠলেন, "তুমি শোননি গা? তোমাদেরই প্রতিবেশী যে সেই বউটা, আত্মহত্যা করেছে! আহা জ্বালা জুড়িয়েছে এতদিনে।"

আর একটি মহিলা বল্লেন, "এও এক ফ্যাসাদ বাবু! নিজের দুঃখই বড় হ'ল? আর ছেলে মেয়েদের যে ভাসিয়ে গেল!"

মনে বড়ই আঘাত লাগল। শেষটায় এই করলে? আত্মহত্যা মহাপাপ, এ যে আমাদের জন্মগত সংস্কার। চিরকাল যে এতটা সহ্য করে এসেছে, হঠাৎ কি দুঃখে সে এমন ক'রে প্রাণ দিয়ে বস্‌ল?

পূর্ব্বোক্ত মহিলাটি আবার বল্লেন, "বুড়ো বেচারী দেশে গিয়েএকেবারেই বেকার বসে ছিল। বউ বেচারী আর সামলাতে পারেনি। ছেলে মেয়েদের ভাসিয়ে গেল বলছ, তাদের দুঃখই ত চোখের উপর আরো অসহ্য হ'ল কিনা।"

তাই হবে। আমি ত জানি সহ্য করার শক্তি তার কত বড়। কাল্পনিক বা নভেলি দুঃখে সে প্রাণ দেয়নি। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে দুঃখের চরম—অনশনের কষ্ট—সে ভোগ করেছে তার সাক্ষী আমি আছি। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ সীমায় না গিয়ে সে আপনার প্রাণ দেয়নি।

থেকে থেকে তার সেদিনের সেই হাসিটুকু মনে পড়তে লাগল। তার কথা এ জীবনে ভুলতে পারব কি? সুখের দিনে দেখলে যার কথা মনে ঠাঁইও পেত না, দুঃখের জীবন দিয়ে সে আমার মনে এমনি দাগ দিয়ে গেছে যে এদাগ হয়ত কখনও মুছবে না।

শ্রীপ্রমীলা সেন।

মুক্তি

যাই যবে স্নিগ্ধ শ্যামাঙ্গন ছাড়ি তব
হে আমার বঙ্গ ভূমি! রূপ অভিনব,
ম্লান হয়ে আসে মম চোখে। বার বার
তোমা তরে ঝরে মম নয়নের ধার,—
মাতৃহারা ক্ষুদ্র শিশু সম। পেলে প্রাণ
বাঙ্গালার; কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান
বুকে আকড়িয়া তারে বলি হাসি হাসি;
ভাই ভাই দুইজনে—মোরা বঙ্গবাসী!

একান্ত নীরবে
ছাড়ি যবে ভারতের উপকূল সবে;—
শেষ তট-রেখা হয় দিগন্তে বিলীন
কল্পলোকে মূর্ত্তি শুধু জাগে নিশিদিন,
আপনা ছড়াতে নিয়ে নিখিল মাঝারে
ক্ষুদ্রতার পাশ শুধু জাগে চারিধারে!

যদি পাই ভারতীয়,—হোক্‌না মারাঠী
অথবা পাঠান শিখ কিবা গুজরাটী,
গাই সবে মিলি মোরা হয়ে একতান
ভাই, ভাই মোরা আজি ভারত-সন্তান!

একদিন যবে,
মুদিয়া আসিবে মম চোখ দু'টী ভবে!
চিরন্তন রূপৈশ্বর্য্য এ বিশ্ব ধরার,
ঢেকে যাবে, সন্ধ্যা নেমে আসিবে আমার;
যদি কারো সনে দেখা হয় লোকান্তরে
হোক না জনম তার এসিয়ার প'রে,
অথবা সে ইউরোপে। ধনী কি নির্ধন
শিশু, যুবা কিংবা বৃদ্ধ হোক্ না সেজন,
কোলাকুলি করি তারে বলিব সম্ভাষি;
বিশ্বমানবের ভাই—আমি বিশ্ববাসী।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

জলার্থিনী রেবেকা [চিত্রকর W. HILTON R. A.

(ভাবী শ্বশুর অলঙ্কার উপহার পাঠাইয়াছেন—The Holy Bible, Genesis, Ch. XXIV)

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ।

অমাবস্যার অন্ধকার রজনী, পথও নির্জ্জন বন্ধুর, কখনো উচ্চে উঠিয়াছে কখনো বা নিম্নে নামিয়াছে। আকাশ মেঘলিপ্ত—মেঘের ছিদ্রপথে কখনো কখনো দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের অগ্নিজিহ্বা দিকচক্রবালের একদিক্ হইতে অন্যদিক্ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, কখনো বা বহু দূর হইতে সমাগত ক্ষীণ অম্বুনাদ শুনা যাইতেছে—এমন সময় মহুয়ার সরবতে উত্তেজিত গোবিন্দলাল বৃহৎ যষ্টি হস্তে কাণা নদীর সেতুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, এমন অন্ধকার রজনীতে এমন নির্জ্জন স্থানে কিছু করিলেও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই; তবুও তার মনের মধ্যে এক অজ্ঞাত ভীতির আবির্ভাব হইতে লাগিল। ভগবান পাপীর শাসনকর্ত্তা, এই কথাটা দুই একবার মনে হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়িল বন্ধু রামরতন বার বার বলিয়াছে—ওসব কিছু নয়, বাজে কথা। গোবিন্দলাল হৃদয়ে সাহস পাইল,। পাপানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বেও, সুমতি, পাপীর হৃদয়ে সাড়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা অতি ক্ষীণ। এরূপ যদি না হইত—তবে পৃথিবীতে পাপের স্রোত এত বহিত না!

তখন অদূরে অশ্বের পদশব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। অশ্বকণ্ঠের ঘুঙ্গুর বাজিতে লাগিল ঝণর—ঝণর—ঝণর। গোবিন্দলাল আর পাপ পুণ্যের বিচার করিবার অবসর পাইল না। সবলে যষ্টি ধরিয়া সেই জরাজীর্ণ অল্প পরিসর কাষ্ঠের সেতুর উপর একটু সুবিধা মত স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে—নিকটে—আরও নিকটে ঘুঙ্গুরের শব্দ হইতে লাগিল ঝণর—ঝণর—ঝণর। সহসা একবার চপলা চমকিল। সেই তীব্র অথচ ক্ষণকাল স্থায়ী আলোকে গোবিন্দলাল দেখিল, যে স্থানে পথটি ক্রমে উচ্চ হইয়া সেতুর মুখে আসিয়াছে একা তখন সেইখানে। উত্তেজনায় গোবিন্দলালের হৃৎপিণ্ড বেগে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। তাহার মুষ্টি যষ্টির উপর দৃঢ়বদ্ধ হইল। গাড়ী নিকটে আসিবা মাত্র, ব্যাঘ্র যেমন হরিণের উপর লাফাইয়া পড়ে—গোবিন্দলালও তেমন সম্মুখে আসিল এবং প্রবল বেগে অশ্বের মুখের উপর আঘাত করিল। অশ্ব ভীষণ রব করিয়া দুই পদে দাঁড়াইয়া উঠিল। ঘাটোয়াল চিৎকার করিতে লাগিল—ডাকু—ডাকু—ডাকু—তাহার ভীত কণ্ঠ বাতাসে মিলাইবার পূর্ব্বেই গোবিন্দলাল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ভীষণ বেগে আঘাত করিল,—পর মুহূর্ত্তেই ঘাটোয়াল সহ একা ও অশ্ব ঘোর নাদে নীচে পড়িয়া গেল। অশ্বের আর্ত্তনাদে কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সমস্ত নীরব।

গোবিন্দলাল আর সেতুর উপর থাকিতে পারিল না। পলায়ন করিবার জন্য দৌড়াইয়া যেমন কিছু দূর অগ্রসর হইল—অমনি দেখিল; অন্ধকার পৃথ্বীতল ভেদ করিয়া কোথা হইতে রামরতন উঠিয়া বজ্র মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এবং কহিল, "পালাও কোথা?"

গোবিন্দলাল উন্মত্তের ন্যায় বলিল, "পেরেছি—পেরেছি—ঠিক পেরেছি।" ক্ষিপ্রকরে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রামরতন বলিল,—"চুপ চেঁচিও না। চল, দেখে আসি।"

উভয়ে সাবধানে সেতুর নিচে নামিয়া দেখিল, ঘাটোয়ালের মৃতদেহের উপর একা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভগ্নপদ অশ্ব প্রস্তরে আহত হইয়া সংজ্ঞাহীন, টাকার থলিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একটা থলি তুলিয়া লইয়া রামরতন কহিল, "এই ধর হাজার টাকা। আর সব যেমন আছে থাক। চল তবে যাই।"

পরদিন প্রভাতে যখন কৃষকগণ মাঠে বাহির হইল—তখন দেখিল কাণা নদীর সেতুর কয়েকখানি পুরাতন কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া একা নিচে পড়িয়াছে, এবং প্রস্তরে আহত হইয়া ঘাটোয়াল মহাদেও এবং অশ্ব দুইই মরিয়াছে।

ঘাটোয়ালের টাকা ও বস্ত্রাদি চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেতু হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বন অসুরিয়া গ্রাম। সেকালে তথায় একজন মুখ্য বা গ্রামের মণ্ডল থাকিত। একজন কৃষক তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া আনিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই এই দুর্ঘটনার সংবাদ মেঝিয়ার সর্দ্দার ও গঙ্গাজল ঘাটীর ফাঁড়িদারের নিকট গিয়া পঁহুছিল। ফাঁড়িদার দুই দিন ধরিয়া বিশেষ এবং গোপন অনুসন্ধানের পর জানিল যে, সেতুটী অল্প পরিসর এবং জীর্ণ ছিল। সর্দ্দার উহার সংস্কার করে নাই। মহাদেও ঘাটোয়ালের অশ্ব দুষ্ট এবং অশিক্ষিত ছিল। মহাদেও ঘাটোয়াল নিজেই উহাকে শিক্ষা দিত। সত্বর বাঁকুড়া পৌছিবার জন্য কাহারও বারণ না মানিয়া সে একাই বাহির হইয়াছিল।

এইরূপ প্রমাণ থাকিলে সিদ্ধান্ত করিতে আর কতক্ষণ লাগে? ফাঁড়িদার অবিলম্বে উপরে লিখিল—"দুষ্ট অশ্বের দোষেই ঘাটোয়াল গাড়ীসহ নীচে পড়িয়া মরিয়াছে—কেহ তাহাকে হত্যা করে নাই। টাকা কড়ি মূল্যবান বস্ত্রাদি সমস্তই ঘটনার স্থানে পড়িয়া আছে; রাহাজানি হইলে দস্যু এগুলি ফেলিয়া যাইত না।"

সর্দ্দার মৃদুকণ্ঠে দুই একবার বলিল বটে, "হাজার টাকার একটা তোড়া দেখছি না।" ফাঁড়িদারের রক্তচক্ষু মুহূর্ত্তে তাহাকে নীরব করিয়া দিল। ফাঁড়িদার কহিল, "সবই তোমার চালাকি! এই যে জীব-হত্যা হলো, এ জন্য কেবল তুমিই দায়ী। কেন তুমি সেতু সংস্কার কর নি? সরকারের চাকরান খাও না? এখন আবার উল্‌টে দাবী করা হচ্চে—'হাজার টাকার তোড়া পাই না।' দস্যু তোমার সকল টাকা রেখে একটা তোড়া নিয়ে পালিয়েছে—কেমন না? আমি গঙ্গাজল ঘাটীর ফাঁড়িদার—আজ বিশ বৎসর এই কায করছি, তোমার মত ঢের ঢের সর্দ্দার দেখেছি। তুমি এসেছ আমার সঙ্গে চালাকী করতে!"

সর্দ্দার বুঝিল ঘোর আপদ উপস্থিত। সে আর টাকার দাবী করিল না। দেখিল,—সেতুটা সত্যই জীর্ণ হইয়াছিল—উহার সংস্কার-সাধনও তাহারই কর্ত্তব্য ছিল। যদি ফাঁড়িদার উপরে জানায় যে, সর্দ্দার কর্ত্তব্য-পালন করে নাই বলিয়াই এই দুর্ঘটনা হইয়াছে তবেই ত পেঁয়াজ পয়জার দুইই হইবে! সর্দ্দার রীতিমত ফাঁড়িদারের পূজা করিতে লাগিল। থানায় রিপোর্ট গেল—এই নরহত্যার জন্য কেহই দায়ী নহে—ইহা দৈবাধীন ঘটনা। তদন্তকালে মেঝিয়ার সর্দ্দার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। মৃত মহাদেও ঘাটোয়াল সর্দ্দারের লোক। তাহার মৃত দেহের সৎকার করিবার আদেশ দেওয়া গেল।"

রামরতনের নিকট এই সব সংবাদ পাইয়া গোবিন্দলাল নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল,—আর ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই।

গোবিন্দলালের আর ধরা পড়িবার আশঙ্কা রহিল না বটে, কিন্তু একটা নূতন উপদ্রব তাহাকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল। সে যখন ঘাটোয়ালের মাথায় লাঠি মারিয়াছিল—তখন বিদ্যুতের আলোকে তাহার ভয়-চকিত মুখ সে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিল। এখন চক্ষু মুদিলেই গোবিন্দলাল সেই মুখ দেখিতে লাগিল। যাহাতে উহা বেশী না দেখিতে হয় সেজন্য সে নিদ্রা ত্যাগ করিল।

ছাড়াইতে চাহিলেই যদি সকলে ছাড়িত—তাহা হইলে সংসারের অনেক দুঃখ কমিয়া যাইত। গোবিন্দলাল ভয়ে নিদ্রা ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু নিদ্রা তাহাকে ছাড়িল না! প্রকৃতি দেবী মানুষের সুবিধা-অসুবিধা সময়-অসময় মানিবেন কেন? অমাবস্থার পর অনিদ্রায় তিনদিন কাটিল। চতুর্থ দিনে গোবিন্দলাল রামরতনের গৃহে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিত অবস্থায় সে স্বপ্নে দেখিল, —ঘাটোয়ালের ভীতি-বিহ্বল পাণ্ডুবর্ণ মুখ—সেই অস্থির দৃষ্টি! ঘাটোয়াল যেন তাহাকে বলিতেছে,—সাবধান গোবিন্দলাল, মানুষকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছ, কিন্তু ভগবানকে পারিবে না।

পাশেই রামরতন নিশ্চিন্তে মহুয়ার সরবৎ পান করতেছিল এবং এক একবার নিদ্রিত গোবিন্দলালের মুখের দিকে চাহিতেছিল। রামরতন দেখিল, সহসা গোবিন্দলালের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, ললাট কুঞ্চিত

হইল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, কপোলদেশ স্বেদে সিক্ত হইয়া উঠিল।

"গোবিন্দলাল গোবিন্দলাল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রামরতন তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। গোবিন্দলাল উঠিয়া অর্থহীন লক্ষ্যহীন শূন্যদৃষ্টিতে রামরতনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রামরতন কহিল, "অমন করে চেয়ে আছ যে? কি দেখছ?"

ভীতকণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "সেই মুখ!"

রামরতন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি দেখছি স্ত্রীলোকেরও অধম!"

এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দলাল যেন অনেকটা নিজেকেই বলিতে লাগিল—"সেই মুখ! ঠিক সেই মুখ! সেই অস্থির দৃষ্টি! সেই মুষ্টিবদ্ধ কর! এখনই বলে গেল,—গোবিন্দলাল সাবধান। মানুষকে ফাঁকি দি ছে, কিন্তু ভগবানকে পারবে না!

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে গোবিন্দলাল! তুমি একটু সরবৎ খাও—"

রামরতন গোবিন্দলালের মুখের কাছে মছুয়ার পাত্র ধরিল। পিপাসায় তখন গোবিন্দলালের আলজিভ শুষ্ক হইয়াছিল। সে এক নিঃশ্বাসে পাত্রটি শূন্য করিয়া রামরতনকে ফিরাইয়া দিল। রামরতন বলিল, "গোবিন্দলাল! মরা মানুষ ফিরে আসে এ কথা কি বিশ্বাস কর?"

"করি।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রামরতন কহিল,—"কর? কখনো কি দেখেছ?"

"না, শুনেছি।"

"যার কাছে শুনেছ, সে কি কখনো দেখেছে বলতে পার?"

গোবিন্দলাল নীরব হইয়া রহিল। রামরতন বলিতে লাগিল, "কেউ কখনো যা দেখে নি, মূর্খ ভিন্ন কে তা বিশ্বাস করবে?"

সুরা তখন অল্পে অল্পে গোবিন্দলালকে উত্তেজিত করিতেছিল। তাহার মুখের ভাব, কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে তখন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সে কহিল, "বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু মন থেকে যে দূর করতে পারছি না!"

"বাল্যকাল থেকে ভূতের গল্প শুনতে শুনতে আজ তোমাকে সত্যিই ভূতে পেয়েছে! এ সংসার যুদ্ধের রঙ্গভূমি, ঠাকুরমার রূপকথার যায়গা নয়। এখানে অত হালকা হ'লে চলবে না,—মনকে পাথর করতে হবে।"

"বাবা বলতেন, মানুষ যেখানে মরে তার আত্মা সেইখানে ঘুরে বেড়ায়—প্রতিশোধ না নিয়ে যায় না!"

"আত্মা, হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ, সে আবার একটা কি? কেউ কি তাকে দেখেছে, না জেনেছে! কেউ না। ও সব রচা কথা। মানুষ, কীট, পতঙ্গ সংসারে আসে,—যার যেমন যোগ্যতা, সে তেমনি কাটায়! হাসে খেলে, তারপর মরে। ব্যস্, সেই ত তার শেষ। দিন দিনই ত আমরা এই দেখছি।"

"তা দেখছি বটে, কিন্তু শুনেছি শাস্ত্রে বলে যে মৃত্যুর পর তার জীবন আছে।"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে রামরতন বলিল, "আছে না কি? চমৎকার! সেখানেও কি মানুষ সরযুর প্রেমে উন্মত্ত হয়?"

গোবিন্দলাল এ কথার উত্তর দিল না। মাথা হেঁট করিয়া রহিল। রামরতন বলিতে লাগিল—"আমি কি মানি জান? এই দু'চক্ষে যা দেখি। যারা বলে মৃত্যুর পর জন্ম আছে, তাহারা ভুল বলে,—না দেখেই বলে। আনো দেখি একটা লোককে, মৃত্যুর পরের জীবনটা যে স্বচক্ষে দেখে এসেছে! পুঁথিতে অমন অনেক বাজে কথা লেখা থাকে—সেই জন্যেই ত লেখাপড়া শিখি নি! আমাকে গোটা কতক তালপাতা এনে দাও না।—আমি এখনই গ্যাঁট্ গ্যাঁট্ করে' শাস্ত্র লিখে রেখে যাচ্ছি। দু'শ বৎসর পর যদি কোন গৃহস্থের বাড়ী থেকে সেখানা বের হয়, আর লোকে দেখবে যে তার কাঠের মলাট দু'খানা চন্দনে, তেলে আর সিন্দুরে

মলিন হয়ে গেছে—অমনি দেশ-বিদেশে রটনা হবে, হিন্দুর একখানা নূতন শাস্ত্র বেরিয়েছে। তার নাম হবে কি জান'? 'রামরতন সংহিতা!' তোমার মত বোকারাম যারা তারা পরম আনন্দে সে গ্রন্থখানা মাথায় করে ঘুরে বেড়াবে। আমি যদি বলি—দামোদরে আগুন লেগেছে, তুমি কি তাই বিশ্বাস করবে?"

"তা কেন করব? জলে কি আগুন লাগে?"

"যে কখনো দামোদর দেখেনি—দামোদর একটা নদী কি পাহাড়, কি গাছ তা জানে না, তার কাছে যদি বলি?"

"সে হয় ত বিশ্বাস করবে।"

"তোমার ভূতের ভয়ও তেমনি।"

গোবিন্দলাল মহা সমস্যায় পড়িল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, রামরতন ঠিকই বলিয়াছে। কিন্তু পিতৃবাক্যে তাহার অত্যন্ত আস্থা ছিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার বাবা ত যা' তা লোক ছিলেন না। তিনিও ত বলতেন, মরা মানুষ মৃত্যুর স্থানে ফিরে আসে, ইচ্ছা করলে তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বলে দিতে পারে।"

রামরতন এবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার বাবার এতে কিছুমাত্র দোষ নেই। আমি তাঁকে চোখে দেখি নি বটে, কিন্তু শুনেছি যে তাঁর মত সাদা-সিদে ভাল-মানুষ লোক এ অঞ্চলে আর ছিল না। আর তার প্রমাণ দেখ না—সেই জন্যেই ত আজ তুমি কড়িশূন্য কাঙ্গাল! আর তোমাদের অর্থে কত জনের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব ঠাকুর সেবা চলছে। তুমি তোমার বাবার যে ধনের অধিকারী, কেষ্টা নায়েবের ষড়যন্ত্রে আজ তা গৌরদাসের ভোগে লাগছে। তার আজ গোহাল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান। পাপ-পুণ্য বলে যদি কিছু একটা থাকত, তবে তার মাথায় কি বাজ পড়া উচিত ছিল না? কোন্ কালের কোন তালপাতার পুঁথিতে কি লেখা ছিল—কত হাত ঘুরতে ঘুরতে কত রকমে মূর্ত্তি বদলাতে বদলাতে শেষে তা এসে পড়েছিল তোমার বাবার হাতে। তিনি যেমন পড়লেন, অমনি তা' বিশ্বাস করলেন।"

গোবিন্দলাল এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার যে সন্দেহ গেল না, ইহা রামরতন বুঝিতে পারিল। গোবিন্দলাল ভাবিল, মৃতের আত্মা আসে কি না তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতাম! ভগবানের দণ্ড আছে কি নাই যদি তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম!

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা যখন অতিক্রান্ত হইল, ষষ্ঠীর খণ্ডিত চন্দ্র যখন দামোদর তীরে শাল তরুর শিরে উঠিয়া চঞ্চল জলে নিজের চঞ্চল প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিল, তখন গোবিন্দ-লাল রামরতনের গৃহ হইতে একাকী বাহির হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের নীরব প্রান্তরে চন্দ্রকরের শোভা দেখিবার অবকাশ তখন তাহার ছিল না। তাহার চিত্ত তখন ঘোর সংশয়-দোলায় দুলিতেছিল। মানুষের দণ্ডকে ত সে ফাঁকি দিয়াছেই ভগবানের দণ্ডকেও ফাঁকি দিতে পারা যায় কি না তাহাই জানিবার জন্য সে তখন একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। তাহার মন বলিতে লাগিল, ফাঁড়িদারের সিদ্ধান্ত যাহাই কেন হউক না—ভগবান্ সমস্তই দেখিয়াছেন। তুমি অর্থের লোভে নিরপরাধ ঘাটোয়ালকে হত্যা করিয়াছ তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। জীবনে হউক জীবনান্তে হউক এই পাপের দণ্ড তোমাকে লইতেই হইবে।

নিজের মনের সহিত নানা তর্ক করিতে করিতে গোবিন্দলাল অগ্রসর হইতেছিল। সহসা দেখিল কাণা নদীর সেতু সম্মুখে। সে শিহরিয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কি এক আকর্ষণ বলে গোবিন্দলাল সেই সেতুর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সে যতই সেতুর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভগবানের দণ্ডের ভয় ততই সত্যের আকারে তাহার সম্মুখে ফুটিতে

লাগিল। গোবিন্দলাল প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিল—পারিল না।

সে যখন সেতুর নিকটে আসিল, তখন চন্দ্র অস্তমিত হয় নাই। দুই একখানি লঘু মেঘ মধ্যে মধ্যে উড়িয়া আসিয়া উজ্জ্বল চন্দ্রালোককে মলিন করিয়া দিতেছিল। অদূরে বৃক্ষরাজির পত্রাবলী মৃদু পবনে সর্ সর্ করিয়া তখন সেই হত্যার স্থানের ভীষণ নীরবতাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল ধীরপদে সেতুর নিম্নে নামিল। দেখিল, তখনো ভগ্ন এক্কা সেই স্থানে পতিত রহিয়াছে, অশ্বের মৃতদেহ হইতে দারুণ পূতিগন্ধ বাহির হইতেছে। লোকে যাহাকে কাণানদী বলে—সেইখালের তীরে নবীন চিতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভস্মরাশি। গোবিন্দলাল সেই চিতা-পার্শ্বে নতজানু হইয়া বাষ্পনিরুদ্ধ কাতরকণ্ঠে কহিল, "হে অশরীরী! তুমি যদি সত্যই এখানে থাক—তবে আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। ভগবানের দণ্ড হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।"

তখনই গোবিন্দলালের মনে হইল—রামরতন যেন নিকটে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আর অতিশয় শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে কহিতেছে, "ধিক্ তোমাকে,—ধিক্ তোমাকে, ধিক্ গোবিন্দলাল, তুমি পুরুষ হয়েছিলে কেন? এই না আজই তোমায় বলেছি মরা মানুষ ফেরে না। দেখলে ত? এখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গলো ত?"

গোবিন্দলালের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, মন বিভ্রান্ত হইল। তাহার চিন্তার স্রোত অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরিল। সে দেখিল—দূরে কর্কশ শুশুনিয়া পর্ব্বত—মজুরেরা প্রাণ-পণে প্রস্তর কাটিতে ব্যস্ত—সেও তাহাদের দলের একজন। তাহার দুই করে রুধির ঝরিতেছে। দরিদ্র সে, নিঃসহায়, বন্ধুহীন সে। তাহার দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে হরি সামন্ত কহিতেছে—'ভিখারীর আবার ভালবাসা!' তাহার পরই দেখিল লাবণ্যময়ী স্বপ্নময়ী সুন্দরী সরযূ। তাহার দুই নয়নে ঝর ঝর করিয়া বারি ঝরিতেছে। সরযূ কাতর দৃষ্টিতে তাহারই পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

গোবিন্দলাল ভাবিল, রামরতন যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। ঘাটোয়ালকে হত্যা না করিলে আমি টাকাও পাইতাম না, সরযূও আমার হইত না। একটী নয়, একাদশ মাস অশেষ শ্রম করিয়া দেখিয়াছি, অর্থ মিলিল না। অথচ আমারই পিতার ধনে আজ যারা মেঝিয়ার বড় মানুষ তাহারাই এখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। আর তাহাদের বিচারেই আমি এখন উন্মাদ!

ইচ্ছা করিলেই আমি অনেক অর্থ লইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা না লইয়া যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মাত্র লইয়াছি। লোভে নরহত্যা করি নাই—দায়ে পড়িয়া করিয়াছি। কে আমাকে এ দায়ে ঠেকাইল? কে আমাকে দরিদ্র করিয়া পৃথিবীতে আনিল? ভগবান্ নয় কি?

ভগবানের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র গোবিন্দলালের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! সে আর ভাবিতে পারিল না; আর বিচার করিতে পারিল না। সে উঠিবার চেষ্টা করিল—উঠিতে পারিল না। মনে হইল কিসে যেন তাহাকে সেই চিতা পার্শ্বে ধরিয়া রাখিয়াছে! কি কঠিন—কি কঠিন—সে বন্ধন কি কঠিন!

ওকি ও? দগ্ধ নরদেহের গন্ধলিপ্ত চিতাভস্ম হইতে কে ও মাথা তুলিতেছে? এ যে সেই, এ যে সেই ঘাটোয়াল। ম্লান চন্দ্রালোকে মুখ খুব স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না বটে, কিন্তু চক্ষু দুইটী রক্ত গোলকের মত জ্বলিতেছে। গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল; কিছুতেই পারিল না। সে শুনিল,—ঘাটওয়াল যেন কহিতেছে, "আজ নয়, ত্রিশ বৎসর পরে।"

ত্রিশ বৎসর পরে? কি? হত্যার প্রতিশোধ? কি, কি সে প্রতিশোধ? গোবিন্দলালের সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ ঝরিতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া একবার সে কোনরূপে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই গুণমুক্ত বাণের ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আবার—আবার—ঐ আবার। গোবিন্দলাল শুনিল কে যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে,—কে যেন মেঘমন্দ্রে ডাকিতেছে, "গোবিন্দলাল! ও গোবিন্দলাল!" ফিরিয়া চাহিতে

গোবিন্দলালের সাহসে কুলাইল না, সে উল্কার বেগে ছুটীতে লাগিল।

লক্ষ্যহীন গোবিন্দলাল এইরূপে অনেকক্ষণ দৌড়াইয়া একটী বৃক্ষতলে আসিয়া বসিয়া পড়িল এবং কাতর হইয়া ধুঁকিতে লাগিল। যে যখন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল—তখন দেখিল,—উষার আলোকে আকাশ উজ্জ্বল, সে আলোক ধারা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। আলোক ও আঁধার-লিপ্ত গঙ্গাজল ঘাটার ফাঁড়ি অদূরে দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিল,—দণ্ডই যদি হয় তবে তাহা এখনই হইয়া যাউক। ত্রিশ বৎসর দিনের পর দিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে আরও ভীষণতর যন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হওয়া অপেক্ষা ধরা দেওয়াই ভাল। গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে ফাঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

ফাঁড়ির প্রবেশ দ্বারের নিকটে গিয়া গোবিন্দলাল দেখিল, তখনো কোন লোক বাহির হয় নাই। সে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল, যাই ফাঁড়িদারকে ডাকি,—তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলি; মৃত্যু ত একদিন হইবেই, না হয় ফাঁসী কাঠেই মরিলাম। ফাঁড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার জন্য গোবিন্দলাল দক্ষিণ করে সে দ্বার স্পর্শ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—ফাঁসীর দড়ী যাচিয়া গলায় পরিব?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল ফিরিল। ফিরিয়াই দেখিল, রামরতন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সে হাসি তীব্র বাণের ন্যায় গোবিন্দলালের হৃদয়ে বিঁধিল।

রামরতন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "কি ভায়া, ধরা দিতেই যদি এসেছ—তবে স'রে যাচ্ছ যে? চল না, ফাঁড়িদারকে আমিই ডেকে দিচ্ছি।"

গোবিন্দলাল মস্তক হেঁট করিয়া রহিল। অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, রামরতন আসিল কোথা হইতে?

রামরতন তাহার হস্ত ধরিয়া মেঝিয়ার পথে যাইতে যাইতে কহিল, "তুমিত ছুট্‌তে পার খুব! আমি পর্য্যন্ত হার মেনে গেছি! রাত্রে কোথায় গিয়েছিল?"

গোবিন্দলালের কণ্ঠ দিয়া তখন স্বর বাহির হইতেছিল না,—সে বিজড়িত স্বরে বলিল, "সেই খানে।"

"কেন? ভূত দেখ্‌তে নাকি?"

গোবিন্দলাল অত্যন্ত লজ্জিত হইল। রামরতন কহিল, "কি দেখলে?"

"তাকেই দেখেছি।"

"দেখেছ?" রামরতন এরূপ ভাবে হাসিল, যে, গোবিন্দলাল ভাবিল—তাহার মৃত্যু ভাল ছিল। রামরতন গোবিন্দলালকে ছাড়িল না। পুনরায় বিদ্রূপ পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কেমন দেখলে? সেই মুখ, সেই ভাব, কেমন নয়? চিতাভস্মের ভিতর থেকে মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল?"

গোবিন্দলাল তখন নিতান্ত অসহায়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিল। রামরতন বলিল, "সে বুঝি বলে' দিলে, যাও ফাঁড়িদারের কাছে—সেখানে ফাঁসীর দড়ী প্রস্তুত আছে। তবে, পিছিয়ে এলে যে? ভাবলে বুঝি সে দড়ী বড় শক্ত—গলায় লাগবে?"

গোবিন্দলাল ব্যাকুল চিত্তে বলিল, "সত্যি বলছি দেখলাম—দুটো রক্তরাঙ্গা চক্ষু আমার দিকে চেয়ে আছে। সে যেন তখন বল্লে—আজ নয়—ত্রিশ বৎসর পরে।"

"অমনি তুমি ভোঁ দৌড়? আমি যত ডাকি গোবিন্দলাল ও গোবিন্দলাল, ততই তোমার বেগের বৃদ্ধি। শেষে কোথায় যে বনের মধ্যে লুকাইয়া গেলে—একেবারে অদৃশ্য! কত খুঁজে খুঁজে তবে এসে ধরেছি।"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি?"

"নিশ্চয়। এই শরীরে আমি, আমার প্রেতাত্মা নয়। আমি ক'দিন থেকে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করছি। তোমায় কি আমি একা ছেড়ে দিতে পারি ভায়া? যখনই দেখলাম তুমি বাড়ীতে নেই, তখনই বুঝলাম ভূত দেখতে এসেছ। কাযেই আমাকেও আসতে হল। যখন আমি কেবল সেতুর উপর উঠেছি, তখন আমারই পাশ

দিয়ে তুমি ছুটে গেলে। আমিও ছুট দিলাম। তা, ফাঁড়িতে এলে কেন ?"

"ভাবলাম, ত্রিশ বৎসর পর যদি দণ্ড নিতেই হয়—তবে এখনই নি। প্রত্যহ মরার চেয়ে কি একদিনে মরা ভাল নয় ?"

"তা ভালো বই কি! মরার চেয়ে মৃত্যু ভয়টা বেশী যাতনা দেয়। ত্রিশবৎসর কি ? দুই একটা দিন। ত্রিশ বৎসরে হিমালয় সাগর হতে পারে। কবে তোমার জ্বর হবে—সেই ভয়ে আজই এসেছিলে ওষুধ খেতে ? কে বল্লে যে, ত্রিশ বৎসর পরে তোমার দণ্ড হবে ?"

"তার আত্মা।"

এবার রামরতন রুষ্ট হইয়া বলিল, "আবার আত্মা ? এত বলছি, তুমি বুঝেও বুঝবেনা। এই সব পাগলামী করে দেখছি তুমিও মজবে, আমাকেও মজাবে। যখন ধরা পড়বে, অমনি তখন বলবে—যত দোষ রামরতনের; সে আমার হাতে ধরে এসব করিয়েছে। তোমার মত হাল্কা লোকের রীতিই এই! যে ভাল করে তোমরা আগে তারই মাথা খাও। তোমার উপকার করে দেখছি ভালো করি নাই। তোমার দামোদরেই ডুবে মরা উচিত ছিল।"

গোবিন্দলাল এবার যুক্তকরে কহিল, "মার্জ্জনা কর ভাই মার্জ্জনা কর। তোমার ঋণ কি আমি শোধ দিতে পারি ?"

শ্লেষের কণ্ঠে রামরতন কহিল, "তা আর পার না ? আজ ফাঁড়িতে গেলেই পারতে। এত যে বলছি তবুও তুমি ভাবছ মরা মানুষ ফিরে আসে—তার আত্মা মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায় ?"

"তবে কি আত্মা নাই ?"

দৃঢ়কণ্ঠে রামরতন বলিল, "নাই—নাই—নিশ্চয় নাই।"

"তবে কি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ ?"

"শেষ বৈ কি। যদি তা না হতো, তবে এই যে হাজার হাজার বছরের পুরাতন স্থানটী এর কোথাও না কোথাও কিছু পরিচয় পাওয়াই যেত।"

অতিশয় সন্দিগ্ধ চিত্তে গোবিন্দলাল বলিল, "কি জানি, বলতে পারি না। আমার মন কিন্তু বলে এই খানেই শেষ নয়—শুধু মানুষকে ফাঁকী দিলেই চলে না, ভগবানেরও দণ্ড আছে।"

হাসিয়া রামরতন বলিল, "আছে নাকি ? তোমার পিতার ধন সম্পত্তি যারা লুটে পুটে খাচ্চে তাদের কি কোন দণ্ড হয়েছে ? তারাই না আমাদের সমাজের মুকুটমণি! আর তুমি অবস্থার গতিকে বাধ্য হয়ে যা করেছ—তার জন্য ভয়ে কেঁচো হয়েছ। এথেকেও বুঝতে পার না যে মানুষের কাছে ধরা না পড়লে দণ্ডের আর ভয় নাই।"

গোবিন্দলাল ভাবিয়া দেখিল—একথা ঠিক। সমস্ত পৃথিবীর বক্ষের উপর বসিয়া প্রকাশ্যেই যাহারা পাপানুষ্ঠান করিতেছে তাহাদের দিন ত সুখেই যাইতেছে। তবে আর দণ্ড কোথায় ? কিন্তু তাহার মন বলিতে লাগিল ভুল—ভুল—দণ্ড আছেই।

গোবিন্দলাল কহিল,—"আমার মন বলে দণ্ড আছে, কিন্তু মনের সঙ্গে যখন তর্ক করি তখন আমি বুঝি যে নাই—দণ্ড নাই। ভয়টা যায় না কেন বলতে পার ?"

বাধা দিয়া রামরতন বলিল, "রজ্জু দেখে সর্প বলে ভ্রম হয়, সে দোষ কি রজ্জুর না তোমার ? ভগবানের দণ্ডের ভয় ? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। এনে দেখাও দেখি তোমার ভগবানকে। বেশী নয় মাত্র একটী বার দেখাও। তাহলে তোমার সব কথা মেনে নেবো।"

এবার ঋষিদিগের দোহাই দিয়া গোবিন্দলাল বলিল—"আমরা ত মূর্খ, যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা সকল শাস্ত্র দেখেছেন, তাঁরাই বলেছেন ভগবান আছেন। তিনিই দণ্ডদাতা।"

রামরতন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল—"তোমার সঙ্গে আর পারা গেল না দেখছি। সেদিনই ত সব বলেছি—খানকতক তালপাতা এনে দাও না, আমি এখনি নূতন শাস্ত্র গ'ড়ে দিচ্ছি। ঋষি বলেছেন বলেই কি সব মেনে নিতে হবে ? আমাদের কি একটা বিচার বুদ্ধি নাই ? যদি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেই-নাই পারি—তবে আর আমরা মানুষ কিসের ? আমরা কি

কলের পুতুল যে, চিরটা কাল পরের ইঙ্গিতেই চলে যাব ?”

বাধা দিয়া গোবিন্দলাল বলিল “সকলেই কি স্বাধীন চিন্তা করতে অধিকারী ?”

“কেন নয় ? শুধু তোমার ঋষিদেরই বুঝি সেই অধিকার ? তাঁদের চালাকীর নমুনাটা একবার দেখ। তোমাদের হাত পা বেঁধে পঙ্গু করবার জন্য সেই কোন কালে তাঁরা বলে গেলেন—ভগবান আছেন, তিনিই দণ্ডদাতা, পুরস্কর্ত্তা। আর আজও সেই পাকে পড়ে তোমরা হাবুডুবু খাচ্চ। ভারি মজা আর কি। ভূতের ভয় দেখিয়ে তোমাকে আমাকে নিরস্ত করে তাঁরা যা' খুসী তাই করে গেছেন। তোমার ব্রহ্মাদেব, ইন্দ্রদেব—আর অধিক কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দেখ, পঞ্চ কন্যাকে স্মরণ কর, তোমার মহাভারত, রামায়ণ পড়—পুরাণের পাতা খোল —কত উদাহরণ পাবে। সুরাপান, পরদার গমন, হত্যা, ব্যভিচার—কোনটা যে পাবে না তা'ত জানিনা। দেখ, সব চেয়ে শক্ত লোকের মন বাঁধা। সে কালের ঋষিরা দেখ্‌ছি তা'ও বেঁধেছেন। এদিকে আবার ভয়ও আছে। বার বার বলে গেছেন—অন্য জাতি যদি ধর্ম্মকথা কয় ধাতু গলিয়ে মুখে ঢেলে দাও—তার জিভ পুড়িয়ে দাও। কেন ? পাছে তারা চালাকীটা ধরে দেয় বলে ? সে কালের ঋষিদের কথা ছাড়া—আমরা ত আর তাঁদের দেখতে যাইনি। একালের ঋষিদের কথা একবার ভাব—কেউ কি মনে প্রাণে ভগবান্‌কে বিশ্বাস করে ? স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য—এসব মানে ? কিছু না। তবে মুখে না বল্লে চলে না তাই বলে—ভগবান্ আছেন বৈকি—তিনি পাপীর দণ্ডদাতা, ধার্ম্মিকের মোক্ষ দাতা।”

বিভ্রান্ত চিত্তে গোবিন্দলাল ভয়ে ভয়ে কহিল, “যদি ভগবানই না থাকেন—তবে এই সুন্দর ধরা সৃষ্টি করেছে কে ? এই ফুল—এই ফল—ঐ গ্রহ নক্ষত্র ?”

প্রশ্ন শুনিয়া রামরতন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল এবং হাস্য বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, “এই কথা ? সৃষ্টি আবার কি ? এসব যে ছিলই, আছেই, থাকবেই। মানুষের বিদ্যা বাড়লে সে নিজেই এমন কত সৃষ্টি করতে পারবে। সেকালে অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলেই রাবণের দাস, একালে তারা আমাদের সকলের দাস। দেখ দেখি উন্নতি কত হয়েছে। এই রক্তাক্ত মৃত্তিকা দেখছ—কাঁকড়, পাথর, কট্ কট্ করছে—তুমি যদি নিত্য জলসেক না কর, লাঙ্গল না ধর—দিক দেখি তোমার ভগবান্ ধানের একটা গাছ !”

গোবিন্দলাল এ সকল কথা শুনিয়া থতমত খাইল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, “এত লোক তবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে কেন ?”

“আগেই ত বলেছি ওটা সামাজিকতার সজ্জা। তুমি বুঝি মনে কর—যাঁরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে ঢাক পিটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা বুঝি প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে ভগবান্ আছেন, ধর্ম্ম আছে, পাপ পুণ্য আছে ? কখ্‌খনো না !”

“তবে একথা নিশ্চিত যে পাপ পুণ্য নেই ?”

“না।”

“ভগবান ?”

“নেই।”

“ভগবানের বিচার ?”

“ভগবানই যদি না থাকেন, তবে বিচার করবে কে ? মৃত্যুর পর মানুষের কি থাকে যে তার বিচার হবে ? এই শরীরটারই ত সুখদুঃখ ? সে দেহ ত পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। চিতাভস্মের কি বিচার চলে ?”

“সুখ দুঃখ কি সাথী শুধু শরীরের ?”

“নয় ত কি ?”

“কেন, মনের ?”

“মনের ? মন কি শরীর ছাড়া ? তোমার হাতে এই চিমটি দিলাম। ব্যথা পাচ্ছ ? কাট দেখি আমার মনে চিমটি।”

গোবিন্দলাল তর্কে পরাজিত হইল বটে, কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিল না। মনে হইতে লাগিল কোথায় যেন একটা ফাঁক রহিয়া গেল। কিন্তু রামরতন যাহা বলিতেছিল—তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইবার জন্য গোবিন্দলাল এতই ব্যস্ত হইয়াছিল যে, সে তর্ক করিতে ক্ষান্ত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহার দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী একদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল, যাঁহার হাস্যরস-সমুজ্জ্বল প্রহসনগুলি একদিন নির্ম্মল 'শুভ্র সংযত হাস্য'রসে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, যাঁহার সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া কত অশান্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়াছে এবং চিরদিন করিবে, যাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত সন্দর্ভাবলী কত নূতন নূতন ভাব ও চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছে, যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদ্ভুত অধ্যবসায়ের ফলে বঙ্গীয় পাঠকগণ সংস্কৃত, ফরাসী, মারাঠী প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রত্নখনির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, সাহিত্যের সেই অবিশ্রান্ত সেবক, শিল্প ও ললিতকলার সেই একনিষ্ঠ সাধক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

বংশবিবরণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিচয় জ্ঞাত নহেন, বঙ্গদেশে এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি নাই। বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে ঠাকুর বংশীয়গণ শতাব্দীকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং বহুদিন ব্যাপিয়া করিবেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর, সমাজের উন্নতির জন্য, রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য, উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য, দেশীয় শিল্প ও ললিতকলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত যে মহাপুরুষ তাঁহার সমগ্র শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যিনি সকল বিষয়েই যথার্থ 'প্রিন্স্' নামের যোগ্য, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিতামহ। দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ,—বংশগৌরব কেবল অক্ষুণ্ণ নহে, উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। সকল সৎকার্য্যে অগ্রণী, দানে মুক্তহস্ত, সাধুতায় অপরাজেয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনায় একনিষ্ঠ দেবেন্দ্র নাথকে দেশবাসী "মহর্ষি" আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, নাট্যকলা ও সাহিত্যে অনুরাগ, গভীর আশ্রিত-বাৎসল্য ও দীনজনে দয়া, গিরীন্দ্রনাথের নাম তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের নামের সহিত বাঙ্গালীর

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহার সুন্দর আকৃতি এবং তদধিক সুন্দর হৃদয় দ্বারকানাথের ইংলণ্ড প্রবাস-কালে কত বিলাসলালিতা ডিউক-পত্নীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, যিনি পরের দুঃখ বিমোচনার্থ স্বয়ং ঋণজালে জড়িত হইয়াও মুক্তহস্তে দান করিতেন, এবং বেতন হইতে তাঁহার অপরিমিত ব্যয় সঙ্কুলান করা অসাধ্য বলিয়া যিনি সহকারী কলেক্টর অব্ কাষ্টম্‌সের (তৎকালে) দুর্ল্লভ পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন,—সেই নগেন্দ্রনাথও অকালে স্বর্গারোহণ না

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিলে বাঙ্গলীর সামাজিক জীবনের উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔরসে, সাধ্বী সারদা দেবীর গর্ভে যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রত্নগর্ভা দেবী সারদার পুত্রদিগকে পূর্ব্বপুরুষগণের নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে হয় না,—তাঁহারা সকলেই স্বনামধন্য। 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র কবি সেই জন্য গর্ব্বভরে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন ;—

"ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর,
গুণ জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ;
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।"

জন্ম ও বাল্যজীবন। সন ১২২৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গৃহস্থিত পাঠশালায় জনৈক গুরু মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের তত্বাবধানে জনৈক গৃহ-শিক্ষকের নিকট ইংরাজি পাঠ আরম্ভ করেন। হেমেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সরল বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ফরাসী ভাষাতেও বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হীরাসিং নামক জনৈক পাঞ্জাবীর নিকট তিনি কুস্তি শিখিয়াছিলেন এবং শারীরিক বলের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করাইয়াছিলেন এবং সন্তরণ বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন কিন্তু যৌবনে তিনি অশ্বারোহণ, শীকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষারীতি অতি কঠোর ছিল। তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

সারদা দেবী

খেলিবার সময় সঙ্কোচ করিয়া পড়িবার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হয়। বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ্য পুস্তক পাঠে বিতৃষ্ণা জন্মে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

শিক্ষা। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেণ্টপলস্ স্কুল, মণ্টেগু আকাডেমী, হিন্দু স্কুল ও কলিকাতা কলেজে (পরে আলবার্ট কলেজ নামে খ্যাত) বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পাঠে যে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। হিন্দু স্কুলে পাঠকালে তিনি পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগ না দিয়া শিক্ষকদিগের ছবি আঁকিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বচেষ্টায় রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে শিখেন। এই চিত্রাঙ্কনবিদ্যানুশীলনের ফলে আমরা সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলালের এবং রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবনের প্রতিকৃতি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কলেজ হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন এবং পাঠ্য পুস্তকে চিরদিন অবহেলার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেও আশ্চর্য্যরূপে সাফল্যলাভ করেন। কলিকাতা কলেজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাতে মনীষী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লিউ, সি, বনার্জীর) পিতৃব্য উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, সার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি শিক্ষাদান করিতেন এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র নীতি উপদেশ প্রদান করিতেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে ভারত বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকগণের মধ্যে সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র, (প্রসিদ্ধ শিল্পী ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতা) গুণেন্দ্রনাথ জোতি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবুর সমবয়সী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, উদারহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাঠে অবহেলা করিয়া গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় অনেক সময় গান বাজনা ও গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিতেন। কৈশোরে ইঁহাদের মাথায় নানা প্রকার কল্পনা আসিত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতেন। সেকালের আদর্শে বসন্তোৎসব করা, পাশ্চাত্য আদর্শে ফ্রিমেসন সম্প্রদায় গঠন করা, জাতীয় পরিচ্ছদের সংস্কার সাধন প্রভৃতি কত প্রকার খেয়াল বহু অর্থব্যয়ে কার্য্যে পরিণত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার কথা উঠে, বাঙ্গালা সাহিত্যে extravaganza নাট্য নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরাতন সংবাদপত্র 'প্রভাকর' হইতে কতকগুলি মজার কবিতা দিয়া এক অদ্ভুত নাট্য প্রস্তুত করেন এবং গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় সেই অদ্ভুত নাট্যের মহলা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহাতে একটি গান ছিল—

ও কথা আর ব'লোনা, আর বলোনা,
বলছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে!—

হাঃ হাঃ হাঃ—এই যায়গাটার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানের সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বৈঠকখানায় অনেক সময়ে ঐরূপ 'হাঃ হাঃ হাঃ' সুরে এবং ধুপধাপ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত।

বিদ্যালয় ত্যাগ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং বোম্বাই প্রদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার বাল্যবন্ধু মনোমোহন ঘোষ দুইবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষভাগে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে এক উদ্যান বাটিকায় তিনি প্রথমে অবস্থান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি এফ্-এ পরীক্ষা প্রদানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মনোমোহনের নিকট ফরাসীভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট বোম্বায়ের গল্প শুনিয়া বোম্বাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহাকে এফ-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত বোম্বাইয়ে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গীত ও নাট্যকলার চর্চ্চা। বোম্বাইএ অবস্থানকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন এবং একজন গুজরাটি মুসলমান কলাবিদের নিকট উত্তমরূপে সেতার বাদ্য শিক্ষা করেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পিয়ানো বাজাইতেও শিখেন। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী নামক একজন নিপুণ গায়ক তখন ব্রাহ্ম সমাজে গান করিতেন। ইঁহার নিকট হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত পূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিখিয়া লইয়াছিলেন। হারমোনিয়াম বাদক বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুনাম হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বাঙ্গালা গানের সহিত হারমোনিয়াম বাজাইতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি এই সময়ে হিন্দী গান অবলম্বনে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও তাঁহার খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ন্যায় নাট্যকলায় গভীর অনুরাগ ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী, জ্যোতিবাবুর সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিলিয়া এই সময়ে একটি নাট্য সমিতি গঠিত করেন। এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত নাটকের অভিনয়ে কৃষ্ণকুমারীর জননীর ও শেষোক্ত নাটকের অভিনয়ে সার্জ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইরূপ অভিনয় করিতে করিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট অভিনয় যোগ্য নাটকের অভাবের প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয়।

নবনাটক। উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইবার জন্য ইঁহারা ব্যগ্র হইলেন। 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'র তাৎকালীন প্রধান শিক্ষক এবং ইঁহাদের ভূতপূর্ব্ব গৃহ শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় পরামর্শ দিলেন, কৌলীন্য বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক প্রণয়ন করান হউক। বিষয় স্থির হইবামাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে উক্ত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের রচয়িতাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মনোমোহন ঘোষ (যৌবনে)

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু একখানিও পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইল না। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে কোনও খ্যাতনামা নাট্যকারের উপর নাটক লিখিবার ভার অর্পণ করা স্থির হইল। তখন নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ তর্করত্ন উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বাসকের বাটীতে, 'বেণী সংহার' ঐবৎসরে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে, 'রত্নাবলী' ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাইকপাড়া রাজবাটীতে এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শাঁখারিটোলায় বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার উপরই সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। গুণেন্দ্রনাথের অগ্রজ সাহিত্য-রসিক গণেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থিয়েটার ছেলে খেলায় হয় না। থিয়েটার যদি করিতে হয় তবে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাল করিয়া করাই উচিত।" তিনি পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৫০০ পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন এবং নাট্যশালা সমিতি নূতন করিয়া গঠিত করিলেন।

এই নাট্যশালা সমিতির অনুরোধে রামনারায়ণ তর্করত্ন অল্প সময়ের মধ্যেই 'নব নাটক' নামক নূতন নাটক প্রণয়ন করিলেন। ১২৭৩ সনের ২৩শে বৈশাখ এক প্রকাণ্ড সভা আহূত হইল এবং কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নাটক খানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। সভাপতি প্যারীচাঁদ মিত্র রৌপ্য পাত্রে রক্ষিত পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলয়া প্রদান করিলেন। কেবল ইহাই নহে, গণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থ-স্বত্বও নাট্যকারকে প্রদান করিলেন।

অতঃপর অভিনয়ের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল। গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না। ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্র কন্‌সার্টের হারমোনিয়ম বাদকের ভার গ্রহণ করিলেন; অভিনয়েও নটীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নটীর মুখে একটি সুললিত সংস্কৃত গীত ছিল :—

মলয় নিলয় পরিহার পুরঃসর
দূর সমাগম ধীরে,
বিকচ কমলকুল কলিকা পরিমল
বাহিনি বহতি সমীরে।
বহু পরিণায়ক নাথ বধূরব
সীদতি সপদি শরীরে
জলদতি বিরহ কৃশানুকৃশা কিল
মজ্জতি লোচন নীরে॥

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি (১২৭৯ সাল ২২শে পৌষ) যোড়াসাঁকোয় নব নাটক প্রথম অভিনীত হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিই অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে অভিনয়ের সুখ্যাতি করেন। দর্শকগণের আগ্রহাতিশয্যে ইহার পর উপর্য্যুপরি আটবার যোড়াসাঁকোয় নবনাটক অভিনীত হয়।

এই অনুষ্ঠানে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের চিরানন্দময় উপাসক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে কালীগ্রাম হইতে গণেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্যদ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পূর্ণ করিলে।"

নবনাটকের আখ্যানভাগে তাদৃশ বৈচিত্র্য ছিল না। স্ত্রীপুত্র সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দার পরিগ্রহের বিষময় ফল প্রদর্শন করাই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। গবেশ নামক জনৈক জমিদার, স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করেন। নব পরিণীতা স্ত্রী চন্দ্রলেখার উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সুবোধ দেশত্যাগ করেন। ক্রমে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। অবশেষে চন্দ্রলেখার প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের ফলে গবেশ বাবুও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন!

এই নাটকের অভিনয় ও সজ্জাদি এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে গ্রন্থের যাহা কিছু দোষ ছিল তাহা কাহারও লক্ষ্যপথে আসে নাই। বলা বাহুল্য স্ত্রীগণের ভূমিকা পুরুষদিগের দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথের শ্যালক অমৃতলাল ও বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। সীনগুলিও নিপুণ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। পঞ্চম দৃশ্যের সীনে নানাবিধ লতা পাতা এবং জীবন্ত জোনাকী পোকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। জোনকী পোকা ধরিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছিল এবং এক

মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

একটী পোকার জন্য দুই আনা হিসাবে পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইয়াছিল।

অভিনয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল যে রাম-নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় মনের আনন্দে নাটকের প্রতিকূল সমালোচনাকারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—"যারা প্লট (plot) নাই প্লট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।"

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের একস্থানে এই নাটক ও তাহার অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"The plot is poor and destitute of interesting incidents. * * * In truth, the acting was infinitely better than the writing of the play."

কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও এই অভিনয়ের সুখ্যাতিপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমরা উহা হইতে নটীর

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কিরূপে দর্শকগণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়া ছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছি :—

"The play opened with the usual appearance of Nat and Nattee with the customary prologue. Both were clad beautifully and Nattee particularly presented a very graceful figure. Her atttiude, gestures, and motions were as delicate as they were becoming though her singing we must confess was not up to the mark."

সঙ্গীত সম্বন্ধে সমালোচক যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার বিষয়ে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তৎকালে ব্রাহ্ম সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুগায়করূপে বিলক্ষণ খ্যাতি হইয়াছিল, বোধ হয় সংস্কৃত গীত বলিয়া সাধারণের তাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই এপ্রেল সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে আহম্মদাবাদ হইতে লিখিয়াছিলেন,—"I am afraid Jotee will feel rather lonely here. You know how shy he is by noture. So I cant get him to mix much with the Europeans or natives here. I suppose time alone will cure him." বৃদ্ধ বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"হাঁ, হেমদাদার সামনে অভিনয় করতে হবে মনে করে আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল।" তাঁহার শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এই স্থানে শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একটি স্মৃতি-কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমৃতলাল বলেন, যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলেজে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়েন, তখন অমৃতলাল হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক ছাত্র। এক একদিন গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইলে ছুটির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (তৎকালে গোলদীঘিতে অবস্থিত) ডেভিড হেয়ারের প্রস্তর মূর্ত্তির নীচে দণ্ডায়মান হইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেন। অমৃতলাল মুগ্ধ হইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার তেজঃপূর্ণ পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেন, সে অপরূপ সৌন্দর্য্য কোনও গ্রীক্ ভাস্করের আদর্শ হইতে পারিত। রহস্য করিয়া অমৃতলাল বলেন যে, 'তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলাম তাহাই রক্ষা, নতুবা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা হইলে কি করিতাম বলা যায় না।'

নটীবেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরমা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে' এই সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে। সেই বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নটীর বেশ পরিয়াই, সাজ ঘরে কনসার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন।

হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সীটন কার সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কনসার্ট শুনিবার জন্য, এবং কি কি যন্ত্রে কনসার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য, কনসার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা, জেনানা" বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে জেনানা কেহই ছিলেন না, যাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ।"

হিন্দুমেলা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর একটি আন্দোলনে মাতিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহপাঠী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রচারিত 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক, নবগোপাল মিত্র মহাশয়, স্বদেশ প্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কল্পনানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্র মেলার (পরে হিন্দু মেলা নামে খ্যাত) অনুষ্ঠান করেন। এই মেলায় স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সঙ্গীত এবং বক্তৃতাদি দ্বারা দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইত। গণেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং উৎসাহেই এই প্রদর্শনী সাফল্য লাভ করিয়াছিল। গণেন্দ্রনাথ এই মেলায় গীত হইবার জন্য অনেকগুলি সুন্দর জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভারত সঙ্গীত—"মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান"—যে গান লক্ষ্য করিয়া 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ভবিষৎ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"এই মহা সঙ্গীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয় কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"—সেই গান এই মেলার জন্যই প্রথম রচিত হয়।

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, 'উদাসিনী'র কবি অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতিও এই মেলার জন্য জাতীয় ভাবের উদ্দীপক বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন আহম্মদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের নিকটে। গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজি পত্রাংশের অনুবাদ পাঠে প্রতীত হয় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন ফরাসীভাষা, চিত্রাঙ্কনবিদ্যা ও সেতার বাদন শিক্ষা করিতেছিলেন :—

১১-৫-৭—জ্যোতি আমার নিকট ফরাসীভাসা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিনা জানি না!

২-৬-৬৭—জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

৪-৯-৬৭—জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসী শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক—সমাজে মিশিতে পারে না। বোধ হয় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার হিন্দু মেলার অধিবেশনের পূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বাৎসরিক মেলায় পঠিত হইবার জন্য 'উদ্বোধন' নামক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলিয়া হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে মেলায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ১৮।১৯ বৎসর বয়সে রচিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটির কিয়দংশ পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থি চর্ম্ম সার!

অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়!
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃসুধা শত নদী-ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কৈলাসপর্ব্বত ও মান সরোবর দর্শন

১১। খেলা

পথে একাকী চলিয়াছি, জন মানব কেহ নাই। উত্তর মুখে চলিয়াছি, পূর্ব্বদিকে সন্নিকটে কালী গঙ্গা, তৎপরে হিমালয়ের উচ্চ শিখরশ্রেণী। এই নেপাল প্রদেশে পশ্চিম দিকে খুব উচ্চ পর্ব্বত, তাহারই গা দিয়া রাস্তাটি চলিয়াছে। কালীর ভীষণ গর্জ্জন ও পর্ব্বতশ্রেণীর সৌন্দর্য্য—কি অপরূপ মিলন! এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দথিতে অপরূপ ভোটিয়া রমণী রুমা দেবীর কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। বড় কঠিন চড়াই চড়িতে হইবে। খেলা পৌছিবার চড়াই প্রসিদ্ধ চড়াই। এখনও তিন চার মাইল তত বেশি কষ্ট পাইতে হইবে না কারণ এ রাস্তাগুলি তত খারাপ নয়।

পর্ব্বতের ধারে ধারে বরাবর কালী গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়া চলিয়াছি। কালী গঙ্গার গর্ভের দিকে এক নির্জ্জন স্থলে দূর হইতে বড় বাঘের গন্ধ পাইতে লাগিলাম। কেহই লোকজন নাই, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অগ্রসর হইতেই হইবে ইহাই স্থির রাখিলাম। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে চলিয়া সেই স্থানটি পার হইলাম। পরে খেলা পৌছিয়া শুনিলাম, আজ কয়েক দিন হইল ঐস্থানে একটি বাঘ আসিয়াছে, মনুষ্যকে আক্রমণ করিতেছে না, কিন্তু গো মহিষাদি নষ্ট করিয়াছে। এই সকল পর্ব্বত-মালা ঘন জঙ্গলে পরিবেষ্টিত; মনুষ্য সমাগমের কোনও উপায় নাই। ভীষণ ভীষণ গুহা আছে, সেই সকল স্থানে এই বাঘেরা থাকে। আমাদের ভারতবর্ষের পারে সচরাচর কম দেখা যায়, কিন্তু কালী গঙ্গার পর পারে বাম তীরস্থ নেপাল রাজ্যে অনেক দেখা যায়। এই পার্ব্বতীয় বাঘ গুলিকে স্নো লেপার্ড বলা হয়। ইহারা তুষারাবৃত স্থানেও থাকিতে পারে। অন্যান্য সময় গ্রামের সন্নিকটের জঙ্গল গুলিতে শিকার সংগ্রহ করিতে আসিয়া, নিজেও মনুষ্যের শিকার হইয়া থাকে। ইহাদের চামড়া বড়ই দামি ও ইংরাজদিগের হস্তে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কারণ কাছের পাহাড় গুলিতে বসতি খুব কম। এগুলি অত্যুচ্চ পাহাড় ও বড়ই শীতপ্রধান; সেই কারণে এ স্থানে কেহ বাস করিতে চাহে না। ধারচুলা হইতে খেলা পর্য্যন্ত মাত্র জুম্মাওরাথি নামক একটি গ্রাম পর্ব্বতের উপরে আছে কিন্তু তাহারা সাধারণ পার্ব্বতীয় লোক নয়, তাহারা অন্য, রকম পার্ব্বতীয়। তাহাদিগকে রাউত বলা হয়। রাউতেরা উলের কম্বল মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। একখানি খুব লম্বা কম্বল তাহাদের পরিধেয়, তাহাকেই এমন সুন্দর রূপে সর্ব্বত্র জড়াইয়া লয় যে, দেখিতে মন্দ হয় না। খেলার লোকগুলিও এই রকম। তাহার পরেই

ভোট দেশ, সেখানকার আচার ব্যবহার ও পরিধেয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে।

এই বারে খুব কঠিন চড়াই আসিয়া পড়িয়াছে। আজ পর্য্যন্ত যে সব চড়াই চড়িয়াছি সেগুলি ইহার সম্মুখে কিছুই নহে। সমুদ্র তীর হইতে উচ্চতা ৬ হাজার ফুটের কম হইবে না, অতএব নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতেছে। দ্বিপ্রহর রৌদ্রের উত্তাপ, তাহার উপর এই শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, পদে পদে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। কোন রকমে আস্তে আস্তে চলিতেছি ও আবার দম লইয়া বিশ্রামের পর অগ্রসর হইতেছি। বেলা ৩ টার সময় খেলা পৌছিলাম। খেলার স্কুল মাষ্টারের কাছে যাইয়া উঠিলাম। স্কুল ঘরটি গ্রামের শেষে পশ্চিমাংশে। কাছেই জলের ঝরণা আছে, স্কুল মাষ্টার আমার সঙ্গে যাইয়া দেখাইয়া দিলেন। ঐ স্থানে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। স্কুল মাষ্টার পাক করিবার জন্য উপরোধ করিলেন কিন্তু আমার কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ছিল, উহাই ভোজন করিলাম। ভোজনান্তে বিশ্রাম করিলাম, কিন্তু মাছির জ্বালায় এখানেও বিশ্রাম পাইলাম না। ধারচুলায় মাছির কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল।

খেলা উচ্চ হিমালয়ের পার্ব্বতীয় শিখরে, বড়ই সুরম্য স্থানে অবস্থিত। খেলা গ্রামটি বড়ই ছোট ও গ্রাম্য জনগণের ঘরগুলি যদিও দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ঘরের চারিধার আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। স্ত্রী ও পুরুষ গুলি আসলে দেখিতে মন্দ নয়। মুখশ্রী বেশ ভাল ও রং পরিষ্কার, কিন্তু তাহারা এত অপরিষ্কার থাকে যে, দেখিতে বড় কদাকার বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পর্ব্বত দেখিয়াছি তাহা হিমালয়ের হিম আবৃত দৃশ্য নহে, কিন্তু এইবার হিমালয়ের প্রকৃত রূপের ছটা কিছু কিছু দেখিতে পাইব। হিমাবৃত রূপ ছটার মাত্র আজ আভাস পাইতেছি। কিন্তু আর একটু আগে না যাইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পূর্ব্ব উত্তরে নেপালের দিকে দূর পর্য্যন্ত পর্ব্বত গুলি বরফে সাদা দেখা যাইতেছে, কিন্তু পশ্চিম উত্তরে ও দক্ষিণে একবারে উচ্চ উচ্চ পাহাড়ের দেওয়াল, সেই কারণ এদিকে অপর পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছে না। কিন্তু একদিকে বরফ ও একদিকে সুন্দর শ্যামল জঙ্গল দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হইতেছে। খেলা গ্রামের নীচেই উত্তর পশ্চিমে পশ্চি দারমা হইতে 'দারমা গঙ্গা' আসিয়া কালী গঙ্গার মিশিয়াছেন। এখান হইতে কালী গঙ্গা আর দেখা যাইতেছে না, কিন্তু ভীষণ নাদ শোনা যাইতেছে।

১২। পাঙ্গু

পরদিন ৫ই আষাঢ় ২০শে জুন, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া খেলা পোষ্ট আফিসের ডাক হরকরার সহিত পাঙ্গু অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। প্রায় দেড় মাইল খুব নিম্নদেশে চলিয়াছি, স্থানে স্থানে এত ঢালু যে সন্তর্পণে না চলিলে পড়িয়া যাওয়া কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। গ্রীষ্মকালের সকাল বেলা উত্তর হইতে হিমালয়ের শীতল বায়ুতে বড়ই আরাম বোধ হইতেছে। পাহাড়ের পাদদেশে দারমা গঙ্গার তীরে পৌছিলাম। গঙ্গার বিস্তার সামান্য ও তাহার উপর একটি ছোট কাঠের পুল। পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। খাড়িধারের চড়াই আরম্ভ হইল। বরাবর রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। রাস্তা পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া একবার পশ্চিম একবার পূর্ব্ব ও আবার পশ্চিম-পূর্ব্ব হইয়া চলিয়াছে। এইরূপ সর্পগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতেছি। আজ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে হইতেছে না, একটু বাদলা হইয়াছে।

চড়াই চড়িয়া পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে পৌছিলাম, কিন্তু সম্মুখে দেখি আর একটি উচ্চতর শৃঙ্গ আছে, সেটিও উঠিতে হইবে। পর্ব্বতের গায়ে পূর্ব্বদিকে রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, আজ খুব উচ্চে উঠিয়া পড়িয়াছি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। তাহা হইতে কিন্তু প্রাকৃতিক লীলা আরও আশ্চর্য্যজনক। যাঁহারা পার্ব্বতীয় দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই পর্ব্বত বক্ষে মেঘের খেলা দেখিয়াছেন। আমিও দেখিয়াছি। কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজ যেন মেঘ-পল্লীর ভিতর দিয়া চলিয়াছি। তাহার পর

অপরের ঘর, মাঝখানে আর মেঘ নাই। মেঘেরা পাহাড়ের যেথানে সেথানে গাছের আড়ালে ও পর্ব্বতের গহ্বরে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, আবার দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া মেঘ পল্লীর রাস্তা ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কোনটি সাদা কোনটি কালো, নানা রঙে রঞ্জিত। প্রায় এক ঘণ্টাকালে মেঘেদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে চলিয়াছি। পর্ব্বতের উচ্চস্থানে কতকগুলি হনুমান দেখিতে পাইলাম। অদূরে একটি কৃষক নিজের হাল বলদ লইয়া চাষ করিতেছে। মেঘ ভায়াদের জন্য বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু বোধ হইল অতি উচ্চ পাহাড়ও শস্য-শ্যামল। এইবারে অপর শৃঙ্গটি চড়িতে লাগিলাম, কিন্তু ইহা চড়িতে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না, কারণ ইহা বিশেষ উচ্চ নহে। মাত্র এই পর্ব্বতের একটি চুড়া। এখন রাস্তা একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে হইতেছে। এইবার অদূরে চাষবাস দেখা যাইতেছে। দুইটি পাহাড়ের মধ্যে ঐ যে সমতল জমি উহাই পাঙ্গু গ্রাম।

পাঙ্গু পৌছিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! আজ এখানে হিমালয়ের অপরূপ ছটার দর্শন হইল। গ্রামে ঢুকিব না, একবার এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লই। বরাবর চড়িয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, বিশ্রামে শান্তি ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দ লাভ করি। হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন দিতেছে। যাহা দর্শনের জন্য এতদিন আশা সঞ্চয় করিয়া আসিতেছিলাম তাহা আজ অনেকটা পরিপূর্ণ হইল। আশা পরিতৃপ্ত হইল বটে, কিন্তু তৃষ্ণা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। যদি হিমালয়ের রূপচ্ছটা এইরূপ হয়, তবে কৈলাসের সৌন্দর্য্য কতই না হইবে। লোকে সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা দেখিবার অবসর কখনও পায় না। আজ পর্য্যন্ত জগতে এমন কোন চিত্রকর জন্মেন নাই যিনি সে সৌন্দর্য্য পটে আঁকিতে পারেন। ঋষি মুনিরা হিমালয় বর্ণনায় ইহার আভাস মাত্র দেখাইয়াছেন, কিন্তু হিমালয়ে না আসিলে তাহার লেশমাত্র অনুভূত হইতে পারে না। এই সামান্য জীবনে অনেক রকম দেখিয়াছি, কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম ইহা কৈলাস ছাড়া আর কোথাও দেখিতে পাইব না।

অনুপম সৌন্দর্য্যের মাধুরী আস্বাদন করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। গ্রামে পৌছিয়া গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতের বাসায় উঠিলাম। পণ্ডিত পাঠশালায় পড়াইতেছিলেন, তিনি খবর পাইয়া শীঘ্র আসিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। শিষ্টাচারী নবযুবক ব্রাহ্মণ। এইবার আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি—এটি ভুটিয়াদের দেশ। তাহারা জাতিতে ভুটিয়া। পূর্ব্বে তাহারা তিব্বৎ দেশবাসী ছিল কিন্তু অনেক কাল হইতে ভারতবর্ষে বসবাস করিয়া এখন অনেকটা হিন্দুর মত হইয়া গিয়াছে। নিজদিগকে 'স্বাকেরা ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এ দেশে বিরল। যদিও আজ ব্রাহ্মণের বাসা পাইলাম কিন্তু পরে ভুটিয়াদের সঙ্গেই থাকিতে হইবে।

পণ্ডিত পাঠশালা বন্ধ করিয়া আসিয়া পাক করিয়া অতি সাদরে ভোজন করাইলেন। ভোজনে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। খেলা পর্য্যন্ত প্রতিদিন গ্রীষ্মের জন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু আজ যেন একটু ঠাণ্ডা আছে। আহারান্তে বিশ্রামের সুবিধা পাইলাম। কিন্তু এতদূর আসিয়াও মাছি হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। পাহাড়ের গ্রাম ও গ্রামবাসীদিগের অপরিচ্ছন্নতাই মাছির কারণ; উহাতে হিমালয়ে বাসের আনন্দ ও সুখটুকু সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

১৩। সোসা

বিশ্রামের পর বৈকালে আরও একটু অগ্রসর হইব মনস্থ করিলাম। সম্মুখেই ও পারে যে পাহাড়টি, উহার উপরে যে গ্রাম অবস্থিত, উহারই নাম সোসা। এটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, ঐ গ্রামে পট্টি চৌদাসের পটোয়ারি থাকে। আজ সন্ধ্যাকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

হইবে। পটোয়ারি বিশাল সিং ও তাঁহার ভাই প্রেম সিং ইঁহারা তিব্বতে তাকলা কোটের বাজারে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যান—ইঁহাদের সহিত যাওয়া সুবিধা হইতে পারে। আমার জিনিষ পত্র সমস্তই পাঙ্গুতে ছাড়িয়া দিলাম, কারণ সোসাতে আমার শীত বস্ত্রাদির বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।

এই ছোট গ্রামের সন্নিকটে শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে একটি কুৎসিত স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথা যাইব। আমার হাতে কমণ্ডলু থাকায় ও বেশ অন্য রকম হওয়ায় আমাকে সে ভারতের গঙ্গা প্রদেশের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, কাশী হইতে আসিয়াছি, কৈলাস যাইব। সে আমাকে বলিল, "মহারাজ, আমি বড় দীন দুঃখী, কিন্তু আজ আমার এখানে অতিথি হইতে হইবে, আমি যাহা কিছু পারি তাহা দিয়া আজ অতিথি সৎকার করিব। ঐ অদূরে আমার পর্ণ কুটীর।" স্ত্রীলোকটী বেশ হিন্দি কথা বলে, ভুটিয়া দেশের লোকেরা এ রকম বলিতে পারে না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে এবং কি কর? সে বলিল, "আমার পিতা একজন সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অযোধ্যা দেশ হইতে আসিয়া এই স্রোতস্রেণী নদীর কাছে বসবাস করিয়াছিলেন। পরে তিনি আমার মাতা ভুটিয়া রমণীকে বিবাহ করেন। আমি তাঁহার গর্ভজাত কন্যা। আমার দুইটি সহোদর ভাই আছে। আমরা সকলে এই গ্রামেই থাকি। আমার কয়েকটি পুত্র কন্যা আছে। আমার ভ্রাতৃদ্বয় বেশ গৃহস্থ। আপনি আমার দেশস্থ, তাই আপনাকে দেখিয়া আজ বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি; আমার উপর দয়া করুন।" আমি বলিলাম, "ভদ্রে, তুমি দয়াশীলা, ভগবান তোমার উপর দয়া করুন, আমার দয়া করিবার ক্ষমতা নাই।" আমি কাল বিলম্ব করিতে পারিলাম না, সুতরাং তাহাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া পথে অগ্রসর হইলাম। পরে জানিতে পারিলাম, এই স্ত্রীলোকটির পিতা অযোধ্যা দেশবাসী কোনও সাধু ছিলেন, তিনি এই স্থানে থাকিয়া পট্টি চৌদাসের সর্ব্বত্রই নিজের ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য যশস্বী হইয়াছিলেন এবং অনেককাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীর মত থাকিয়া সকলের বিশেষ পূজনীয় হইয়াছিলেন। কিন্তু কালচক্রে পড়িয়া তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়; তিনি গৃহস্থ হন ও সংসার রূপী কালিমার এই কয়েকটি সন্তানরূপী রেখা চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দি প্রবাদ, "রম্‌তা যোগী, বহতা পানি"—হইলেই পবিত্র থাকে।' জল বদ্ধ হইলে আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচারী "রম্‌তা" (ভ্রমণকারী) না হইয়া, সংসারের কাছে থাকিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

পাহাড়ের কোলে শস্যক্ষেত্রের ধারে ভুটিয়া রমণীরা কায করিতেছে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। তাহারা কার্য্যে বড়ই পটু। হাসিয়া গান গাহিয়া কায করিতেছে। এ দেশে ধান্য, গোড়া হইতে ছেদন করা হয় না, মাত্র শীষগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। চড়াইও বেশ উঠিতেছে, কিন্তু নানারূপ দৃশ্যের মধ্যে কিছুই কষ্ট অনুভব করিলাম না।

সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই সোসায় পৌছিলাম। এটি বড়ই পরিষ্কার গ্রাম দেখিলাম। এই গ্রামে যে কয়েকটি লোক বাস করেন সকলেই সমৃদ্ধিশালী, সেই কারণ বোধ হয় গ্রামটি তাঁহারা পরিষ্কার রাখিয়াছেন। ইঁহাদের ঘরগুলি অতি সুন্দর, ত্রিতল। বাটীর পশ্চাদ্ ভাগের দেওয়াল পাহাড়ের পার্শ্ব কাটিয়া করা হইয়াছে, পাশের দুই ধারের দেওয়াল গুলি মাটি ও পাথরের গাঁথা, কিন্তু সম্মুখে সমস্তই কাষ্ঠের। ছোট ছোট দরজা ও জানালা অতি সুন্দর কারু-কার্য্য-যুক্ত কাষ্ঠে প্রস্তুত। আমার বোধ হয় এক একটি দরজায় অনেক পরিশ্রমে ফুল ইত্যাদি খোদিত করা হইয়াছে। ছাদ শ্লেট পাথরের—সকলি দেখিতে বড় সুন্দর।

আজ রাত্রে বিশাল সিংহের বাড়ীতে থাকিলাম। তাঁহারা যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন ও থাকিবার খুবই সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহাদের ছাগল এখনও পর্ব্বত হইতে ফেরে নাই. পাঁচ সাত দিনে আসিবে, ইতো মধ্যে তাঁহারা

তিব্বতে পাঠাইবার জন্য ছাতু আটা, ছাগলের ভার বহন উপযোগী কম্বলের ছোট ছোট থলিতে ভরিয়া বোরাবন্দি করিতেছেন। এই থলি গুলিকে ইঁহারা খাঁচা বলেন। এক একটি খাঁচায় ৫ সের করিয়া, দুই ধারে দুইটি থলিতে ১০ সের জিনিস যাইতে পারে। আজ সমস্ত সন্ধ্যাটি ইঁহাদিগকে খাঁচা তৈয়ার করিতে দেখিলাম। আরও দশ পনের দিন পরে ইঁহারা যাইবেন স্থির করিয়াছেন। সেই কারণ ইঁহাদের সহিত আমার যাওয়া হইবে না। স্থির করিলাম, কল্য প্রত্যূষে রুংতিয়া যাইয়া কি হয় দেখা যাইবে। আজ রাত্রে বড়ই সুখে নিদ্রা যাইলাম।

১৪। রুং ও তিয়া বা তিজা

৬ই আষাড় ২১শে জুন, খুব প্রত্যূষে উঠিয়াই তিজা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সম্মুখে সামান্য চড়াই, তাহা অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। পথের দুই ধারেই ঘন জঙ্গল, দূর পর্য্যন্ত পাহাড় গভীর গর্ত্তে নামিয়া গিয়াছে। সোসার কাছের পাহাড় গুলিতে বৃক্ষের অভাব দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখানে বড় বড় দেবদারু গাছ দেখা দিতেছে। চড়াই অতিক্রম করিয়া প্রায় ৩ মাইল নামিতে হইল। এইখানে একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামটি পর্য্যন্ত উতরাই তেমন কষ্টদায়ক হয় নাই, কিন্তু এইবার যে সরকারী রাস্তা সোজা সিধা হইয়া গালা গিয়াছে, তাহা ছাড়িয়া ডান দিকে ভাঙ্গিয়া গ্রামের ভিতর হইয়া গ্রাম্য পথ দিয়া তিজার দিকে নামিতে লাগিলাম। রাস্তাটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও পাথরে পরিপূর্ণ, সেই কারণ নামিতে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম। এক মাইলের উপর নামিয়া রুংতিজায় পৌছিলাম। রুং ও তিজা পাশা পাশি দুইটি গ্রাম, কিন্তু বসতিটি খুব সংলগ্ন বলিয়া একটি গ্রাম বোধ হয়। তিজা গ্রামে ঢুকিলাম। পাহাড়ী গ্রামের যে দোষ, গ্রামে ঢুকিতেই তাহাই দেখিতে পাইলাম। রাস্তাগুলি আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, পা ফেলিবার উপায় নাই। সর্ব্বত্রই জঙ্গল, কাছে কাছে গাই গরু চরিতেছে, অদূরে তুষারাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গ। গ্রামে ঢুকিয়া সমস্ত গ্রামটি অতিক্রম করিয়া লালসিং পাতিয়ালের বাড়ীতে পৌছিলাম। ইঁহার নামে পূর্ব্ব হইতে পত্র লিখিয়া আমার আসিবার খবর দেওয়া হইয়াছিল এবং আজ সকালে পৌছিব ইহাও কাল পাঙ্গু হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। পাতিয়াল মহাশয় আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহে আর অনেকগুলি ভদ্রলোক প্রতীক্ষায় ছিলেন, সকলেই কৃপা করিয়া আমাকে সাদরে বসাইলেন।

লালসিং পাতিয়াল একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ও ধার্ম্মিক ভুটিয়া ব্যবসায়ী। তিব্বতে ইঁহার খুব বড় উলের ব্যবসা আছে। পাহাড়ের নীচে টনকপুরেও শীতকালে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যান। আলমোরা জেলার সর্ব্বত্রই ইঁহার নাম প্রসিদ্ধ। যেখানে যেখানে ভুটিয়ারা ব্যবসা করে, সেখানে ইঁহার ব্যবসায়ে বেশ খ্যাতি আছে। ইনি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী ও কানপুর যাইয়া থাকেন। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীদের যেরূপ হইয়া থাকে, ইঁহারও প্রায় সেই রকম হইতেছে। সমস্ত কারবার চাকরদের হাতে থাকায় তাহারা যথেষ্ট আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই কারণে ইনি সম্প্রতি কয়েকটি মামলায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন ও কিছু উদ্বিগ্ন আছেন। ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা তিব্বৎ হইতে বেশ ভাল ভাল গালিচা আনে। এক একটি গালিচা ১০০৲।২০০৲ টাকা মূল্যের হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ীতে এইরূপ অনেকগুলি থাকে, কেহ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে এইগুলি ব্যবহার করা হয়। আজ ইঁহারা এই রকম অনেক গুলি গালিচা পাতিয়াছেন। সকলে মজলিস্ করিয়া বসিয়া আছেন। গালিচাগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর, সেই জন্য উল্লেখ করিলাম। ভুটিয়ারা ইহাকে দল বলে। সকলে দলে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের মজলিস্। হুকা গুলি নারিকেলের নহে, কিন্তু নারিকেলের হুকার মত কাঁসা ও পিতলে প্রস্তুত। খুব লম্বা নল দিয়া গড়গড়ার মত টানিয়া ধূম পান করিতে হয়। কলিকাগুলি যেন এক একটি ধুনুচি, চতুর্দ্দিকে লোহার তারে বেষ্টিত, লোহার শিকল দিয়া একটি চিমটা দোদুল্যমান। এই

পার্ব্বতীয় দেশে তামাকের একটি পাতাও উৎপন্ন হয় না, সুদূর বেহার ও আউদ হইতে অবশ্যই তামাকের আমদানি করিতে হয়, কিন্তু তামাক খাওয়ার খুব ধুম। সেই কারণ, বঙ্গদেশীয় মহাশয়দের প্রীতার্থে তামাকের কথাটা উল্লেখ করিলাম।

অনেকক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলাম। অনেক রকম কথাবার্ত্তা হইল। তিনি গ্রামের বহির্ভাগে আমার জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। গ্রামের বাহিরে থাকিলে মাছি হইতে নিস্কৃতি পাইব সেই কারণে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। গ্রাম্য পোষ্ট আফিসের ওভারসিয়ার আমার আসিবার পর এখানে পৌঁছিল অতএব তাহারও বাসা আমার সঙ্গেই হইল; পাতিয়াল মহাশয় সমস্ত আহারীয় সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন। ওভারসিয়ার পাক করিল। আহারান্তে বিশ্রামলাভ করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

বর্ত্তমান যুগের মথুরা

আমাদিগের পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থমধ্যে পুষ্কলাবত, তক্ষশীলা, বিদিশা, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও বারাণসী প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়, মথুরা নগরীটী তাহাদের অন্যতম। রামায়ণে লিখিত মধুদৈত্যের নিবাস মধুপুরী বা মধুবন নামক স্থানটী বর্ত্তমান মথুরা সহর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও যমুনা নদী হইতে সেই স্থানটী বহু দূরে। সেখানে কোন কালে শত্রুঘ্ন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। বর্ত্তমান মথুরা সহর যমুনার পশ্চিম তীরে কোন্ সময় হইতে স্থাপিত হইয়াছে তাহাও ঠিক জানা যায় না। তবে হরিবংশে আমরা দেখিতে পাই যে রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারা স্বর্গারোহণ করিলে পর ভীমদেব নামে গোবর্দ্ধনের একজন রাজা এই স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার নগরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎপরেই হরিবংশে আরও দেখিতে পাওয়া যায়;

"ক্ষেম্যং প্রচার বহুলং হৃষ্টপুষ্ট জনাবৃতং।
দামনী প্রায় বহুলং গর্গরোদ্গার নিস্বনম্॥
তক্র নিস্রাব বহুলং দধিমণ্ডার্দ্রমৃত্তিকং।
মন্থানবলয়োদ্গারৈ র্গোপীনাং জনিত স্বনং॥

অর্থ—সুরম্য গোচারণ ভূমি বহুল হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ গোবন্ধন রজ্জুসঙ্কুল, গর্গর শব্দ ঝঙ্কৃত ঘোলস্রাব বহুল, দধি মণ্ডের দ্বারা সিক্ত মৃত্তিকা এবং মন্থনকালে গোপীগণের বলয় শব্দে মুখরিত মথুরা নগর।" উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তৎকালে এ স্থানে গোপগণই বহুলভাবে বাস করিত। কেহ কেহ বলেন দধি মন্থনের মথ ধাতু হইতে মথুরা শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তাহার পর যখন চৈনিক পরিব্রাজকেরা এ স্থান দেখিতে আইসেন, তখন তাঁহারা এ স্থানকে বৌদ্ধ প্রধান নগর বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এখানে বিংশতিটী সঙ্ঘারাম ও মৌদ্গল্যায়ন, সারীপুত্র, আনন্দ ও রাহুল প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নামে ও উপগুপ্তের নামে কতকগুলি স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন সহরের ভিতরে অনেকগুলি স্তূপ বা টিলা অধিবাসিগণের আবাস ভবনে ও দেব মন্দিরাদিতে আবৃত হইয়া গিয়াছে। তবে সহরের বাহিরে গেলে কয়েকটী উচ্চ উচ্চ মৃত্তিকার টিলা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা ষ্টেশন হইতে বৃন্দাবন যাইবার ছোট রেলপথের উভয় পার্শ্বে এইরূপ টিলার অভাব নাই। বলিতে কি, এখানে যত মৃত্তিকার স্তূপ দেখিয়াছি, অপর কোথাও তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। (১) সেই টিলার গাত্রে যে সকল পাষাণ

১। বৌদ্ধপ্রধান দেশ সকলে অনেক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পালি ভাষায় স্তূপের প্রতিশব্দ থুপ, সিংহলে ডাগোবা,

বা ইষ্টক রচিত পরিক্রমাপথ, বেষ্টনী, সোপান ও স্তম্ভ প্রভৃতি ছিল সেগুলি কাল বশে বা মুসলমানগণের উপদ্রবে খসিয়া গিয়াছে। কোথাও বা স্থানীয় লোকেরা ঐ সকল প্রস্তরাদি লইয়া নিজ নিজ বাসভবনের উপকরণ করিয়াছেন। কতকগুলি টিলার উপর হিন্দু দেব-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি বৌদ্ধযুগে কোন্ টিলা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

এক সময়ে টিলাগুলি যে দুই তিন থাকে উপরে উঠিয়াছিল তাহা আজিও দেখিলে বুঝা যায়। পরে আমরা একে একে তাহার পরিচয় দিব।

মথুরার উত্তরে অম্বরীশ টিলার নিকট হইতে নগরী বেষ্টন করিয়া একটী মৃন্ময় উচ্চ প্রাচীর মথুরা সহরের দক্ষিণে হোলি দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। সেইটী কোথাও দুই তিন তালা পর্য্যন্ত উচ্চ, কোথাও ভূমির সহিত সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। লোকে এইটীকে 'ধুলকোট' বা মৃৎপ্রাচীর বলে। বোধ হয় হিন্দু রাজাদিগের আমলে, শত্রুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই প্রাচীরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনকার লোকে সেটীর সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখে না। এ নগরীর বৃন্দাবন, ডিগ, ভরতপুর ও হোলিনামে চারিটী দরওয়াজা আছে। কলিকাতার দক্ষিণে যেমন গড়ের মাঠ, মথুরার দক্ষিণেও সুবিস্তীর্ণ ময়দানে আদালত গৃহ, যাতুঘর, ভিক্টোরিয়া উদ্যান ও সাহেবদিগের বাড়ী। সহরের ভিতর হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদিগের বাস, এবং অধিকাংশ দেব মন্দির স্থাপিত। গ্রাউজ্ সাহেব তাঁহার মথুরা বিবরণে লিখিয়াছেন যে, আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বাটী বা প্রাসাদ অধুনা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাহা কিছু পুরাতন অট্টালিকাদি ছিল ১৮০৩ খ্রীঃ ৩১শে আগষ্ট তারিখের মধ্যরাত্রির ভীষণ ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ইংরাজ আমলে যে ২।৩ তলা বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নীচে দোকান ঘর ও উপরে লোকের বাস। কয়েকটী প্রশস্ত রাস্তায় লছমীচাঁদ শেঠের ব্যয়ে পাথর বসান হইয়াছে। অবশিষ্ট পথগুলি প্রাচীন হিন্দু সহরের ন্যায় গলি ঘুঁজি ও আঁকা বাঁকা। বায়ু ও আলোকের পথ অনেক স্থানে নিরুদ্ধ। এখন মিউনিসিপালিটী পথ ঘাটের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিতেছেন। যমুনাতীরে সহরটী প্রায় দেড় মাইল। পরপার হইতে সহরটীকে দেখিতে বেশ সুন্দর দেখায়। তবে বাটীগুলির উপর শিখর বা চূড়া নাই বলিয়া বারাণসীর ন্যায় তত মনোরম নহে।

এবার আমরা মথুরার ঠাকুরগুলির পরিচয় দিব। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরামণ্ডলে কেশবদেব, ভূতেশ্বর প্রভৃতি ষোলটী দেবদেবী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ বজ্রনাভের বিবরণ কিন্তু বরাহ পুরাণে নাই। স্কন্দ পুরাণে কেবল গোবিন্দ ও হরি দুইটী মাত্র নাম আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েন্সাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখিতে পাই, গুপ্ত বংশীয় সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের পুত্র (৪৮৫ খৃঃ) বজ্রনামে একজন রাজকুমার নালন্দার বৌদ্ধ মঠে কয়েকটী সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি মথুরা অঞ্চলে কোন দেব মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন কি না প্রকাশ নাই। এই গুপ্তবংশীয় বজ্রই পুরাণ মধ্যে বজ্রনাভ হইয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তবে নামের বেশ মিল আছে।

মথুরা বৈষ্ণব-প্রধান সহর। মথুরার চৌবেরা নিম্নলিখিত শ্লোকে এখানকার দেবতাগুলির এই তালিকা দিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে প্যাগোডা, নেপালে চৈত্য, মথুরা অঞ্চলে টিলা বলে। বরাহ পুরাণের ১৬৯ অধ্যায়ে ১৫, ১৬, ১৭ শ্লোকে আছে—"মথুরার অর্দ্ধচন্দ্র স্থান মধ্যে প্রাণত্যাগ বা অন্যত্র মৃত দেহ এখানে সৎকার বা দাহ করিলে বা অন্যত্র দাহকরা অস্থি এখানে প্রোথিত করিলে যত কাল দেহীদিগের অস্থি মথুরার অর্দ্ধচন্দ্রে থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বর্গসুখ লাভ করিবে।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে কেবল বৌদ্ধেরা নহে, তাহাদের দেখাদেখি হিন্দুরা পর্য্যন্ত এখানে অস্থি সমাহিত করিতেন। আজিও সে প্রথা ঘুচে নাই। দূরদেশে মৃত বৈষ্ণবের চিতা দগ্ধ অস্থি এখানে আনিয়া আজিও প্রোথিত করিয়া ছত্রী বা তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয়। এখন সেগুলিকে "সমাজ" বা সমাধি বলে। ছত্রীর ভিতর রাধাকৃষ্ণের চরণ অঙ্কিত থাকে।

বল্লভাচার্য্য বিট্‌ঠলনাথ ও তাঁহার পুত্রগণ

"ভূতেশ্বরঞ্চ বারাহং কেশবং ভাস্কর ধ্রুবম্।
দীর্ঘবিষ্ণুঞ্চ বিশ্রান্তিং মহাবিদ্যেশ্বরীং তথা॥
মথুরায়াং নরো দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপাদ্ বিমুচ্যতে।"

ইহাদের মধ্যে কেশবজী, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রান্তি ও বরাহ এই চারিটী বিষ্ণু। ভূতেশ্বর শিবলিঙ্গ, ভাস্কর সূর্য্যদেব, ধ্রুব বালক মূর্ত্তি। মহাবিদ্যা তিনটী নারীমূর্ত্তি এখানকার দেবমূর্ত্তিগুলিকে প্রথমে গিজনীর মামুদ পরে সেকেন্দর লোদী এবং শেষ আওরঙ্গজেব তিনজনে তিনবার নিঃশেষভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যে মূর্ত্তিগুলি এখন বিদ্যমান আছে সেগুলি যে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি তাহা না বলিলেও চলে। বৃন্দাবনের ন্যায় এখানে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রাধান্য নাই। এখন ইংরাজ আমল হইতে কয়েকটী রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

(১) **কেশবজী**—ইনি মথুরার প্রধান দেবতা। কেশব নামোৎপত্তির এইরূপ বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। দেবতারা কংসের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সকাশে যাইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাদিগকে একগাছি কৃষ্ণ ও একগাছি শ্বেত কেশ দিয়া বলিলেন যে, এই কেশ হইতে আমি কৃষ্ণ ও বলরাম নামে বসুদেবের দুইটি পুত্র হইয়া জন্মিব। তাঁহারাই কংস বধ করিবেন।" এইরূপে কেশ হইতে কৃষ্ণের উৎপত্তি বলিয়া তাঁহার কেশব নাম হইয়াছে। (২) কেশবদেবের মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণাধঃ

(২) বিষ্ণুমূর্ত্তি, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অবস্থান ভেদে কেশব, মাধব, বাসুদেব এমন কি গোবিন্দ, হরি কৃষ্ণ প্রভৃতি চব্বিশ রকম নাম হয়। তদ্ভিন্ন দ্বিভুজ অষ্টভুজ, বিংশতি ভুজ পর্য্যন্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরাতেই অষ্টাবক্র গোপাল গরুড় গোবিন্দ মূর্ত্তি দুইটি অষ্টভুজ। (বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয় পুস্তক দেখুন)। কেশব শব্দের আর অর্থ কেশবহুল ব্যক্তি। এবং কে জলে শব ইব তিষ্ঠতি অর্থও কেহ কেহ করেন। চৌবে ঠাকুরেরা এই চতুর্ভুজ কেশব মূর্ত্তিকেই কিষণজী মহারাজ বলেন। যদি গুপ্ত রাজাদিগের সময়ে বা পরে বৈষ্ণবপুরাণগুলি সত্যই রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কেশব নামে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াই কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া আখ্যান রচনা করিয়া থাকিবেন। গুপ্তরাজাদিগের স্থাপিত কেশব মূর্ত্তিটিকে মামুদ গিজনি নষ্ট করেন। পরে হিন্দুরা

মথুরার যাদুঘরে সংগৃহীত বিভিন্ন যুগের বিচিত্র ধ্বংসাবশেষ সকল

হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র ও বামাধঃ হস্তে গদা। উভয় পার্শ্বে দুইটী সঙ্গিনী বা পার্শ্ব-দেবতা। দক্ষিণে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী। যে স্তূপের উপর কেশব দেবের মন্দির প্রথমে স্থাপিত ছিল সেটী প্রায় ৩০ফুট উচ্চ চতুষ্কোণ স্তূপ। লম্বে ৮৪০ফুট প্রস্থে ৬৫৩ ফুট। এটী দুই থাকে উঠিয়াছে। উপরের থাকটী অপেক্ষাকৃত ছোট। উপরের থাকের চারিকোণে চারিটী ছত্রী বা গম্বুজ ছিল। এ স্তূপটিকে সাধারণে কাটরা টিলা বলে, কাটরা শব্দের অর্থ বাজার বা সরাই। আওরঙ্গজেব ১৬৭১ খৃঃ ইহার উপর কেশব দেবের মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া তাহারই উপকরণ লইয়া ১৭২ ফুট লম্বা ৬৬ফুট চওড়া প্রায় ৪০।৪৫ ফুট উচ্চ একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মসজিদটি কারুকার্য্যহীন সাদাসিদা ধরণের একটী গম্বুজ বিশিষ্ট, তবে খুব উচ্চ বলিয়া দূর হইতে দেখা যায়। নাম জুম্মা মস্‌জিদ। আজিও মসজিদের পশ্চাৎ দিকে পূর্ব্ব হিন্দু মন্দিরের ভিত্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরার চৌবেরা বলিয়া থাকেন যে দ্বাপর যুগে এই টিলার উপর কংসের কারা-গারে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভগ্ন হিন্দু মন্দিরটী নির্ম্মাণের একটি ইতিহাস আছে। আকবরের জীবিত কালেই বুন্দেলখণ্ডের রাজা বীরসিংহ-দেব, আইন আকবরী রচয়িতা বিপক্ষ আবুল ফজলকে হত্যা করিয়া শাহজাদা সেলিমের প্রীতিভাজন হন। পরে তিনি যখন জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন বীরসিংহদেব জাহাঙ্গীরের অনুমতি লইয়া তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী ভগ্নপ্রায় কেশব দেবের মন্দিরটির স্থানে তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি শিল্পকলা বিভূষিত, পরম রমণীয় মন্দির গঠন করিয়া দেন। বীরসিংহ নির্ম্মিত মন্দিরটি এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহার শোভা দেখিয়া ট্রাভর্ণিয়ার, বর্ণিয়ার, মানুসী প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা পর্য্যন্ত বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা সেকো ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত রেলিং বসাইয়া দিয়া শোভা বর্দ্ধন করেন। এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বে যে খাল প্রবাহিত হইত, সেটি বহুকাল হইল মরিয়া গিয়াছে, ও তাহার কিয়দংশ, দিল্লী যাইবার রাজপথের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব তাঁহার আর্কিওলজিকেল সার্ভে পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এই কেশব-জীর মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে চার পাঁচ মাইল

নূতন যে কেশব মূর্ত্তি বসান তাহাকে আওরঙ্গজেবের উপদ্রবে বুধোলী বা নাথদ্বারে পাঠান হয়। তাহার পর অপর

স্থানের মধ্যে ভূমি খনন করিয়া বৌদ্ধ ও জৈনদিগের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং অতি প্রাচীনকালে যে, বৌদ্ধদিগের এখানে বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি একবার (Vol. I) বলেন যে, এই কেশবজীর স্তূপটী হিয়ন্থসাং বর্ণিত পূর্ব্বে উপগুপ্তের বিহার মধ্যে স্থাপিত বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ স্তূপ ছিল। পরে (Vol. XX) বলিয়াছেন যে সেই কেশ ও নখ স্তূপটি যমুনাতীরে কেল্লার ভিতর ছিল। (৩) আমরা মথুরার যাদুঘরের বর্ত্তমান কিউরেটার পণ্ডিত রাধাকিষণ রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে, এই কেশবজীর স্তূপটি পূর্ব্বে উপগুপ্তের বিহার ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক Arriaen এই মথুরাকে Klasobora এবং রোমক ঐতিহাসিক Pliny এ স্থানকে Clisobora বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন এ উভয় নামই কেশবপুর বা কৃষ্ণপুর নামের অপভ্রংশ, অথবা এখানে বুদ্ধদেবের কেশ ছিল বলিয়া কেশবপুর নামও হইতে পারে। আজিও লোকে এ পল্লীকে কেশবপুর মহল্লা বলিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কেশব শব্দটী কেশ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বরাহ পুরাণে ১৫৬ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে দেখিতে পাই, বরাহদেব যেখানে কেশ পাতন করিয়াছিলেন ও কেশী দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে স্থানের নাম কেশী ঘাট। এবং শাক্তদিগের মতে দক্ষতনয়া সতীর কেশ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার নিকট কেশিনী নামে পীঠস্থান হইয়াছে। শেষ দুইটী কেশীঘাট ও কেশিনী দেবী—বৃন্দাবনে অবস্থিত। সে যাহা হউক, বুদ্ধদেবের কেশ ছিল অথবা হিন্দুদিগের কেশবজী, বরাহদেব ও সতীর কেশ পতন যে জন্যই হউক, এ অঞ্চলে যে একটা কেশ সংসৃষ্ট ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

কঙ্কালী টিলায় প্রাপ্ত বীরসিংহ নির্ম্মিত কেশবজী মন্দির তোরণের কপালী (lintel)

আমরা গুপ্তযুগের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে ১৮৮৩খৃঃ প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারেল কানিংহাম সাহেব আওরঙ্গজেব নির্ম্মিত মসজিদের প্রাঙ্গণ হইতে একখানা শিলালেখ পাইয়াছেন। তাহার যাদুঘরের নম্বর Q. 5। তাহাতে লিখিত আছে—"মহারাজ শ্রীগুপ্ত প্রপৌত্রস্য মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ পৌত্রস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তস্য পুত্রেণ দত্তদেব্যাং সমুৎপন্নেন পরম ভাগবতেন।" এই পর্য্যন্তই লিখিত আছে। ইহার পর যাহা লিখিত ছিল তাহা পাথর খানাকে মানান সই করিবার জন্য ভাস্করেরা ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে সেই পুত্রের নাম চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়। তিনি কি করিয়াছিলেন সেইটা মাত্র জানা নাই।

তবে শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, তিনি 'পরম ভাগবত' অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সেই জন্য আমরা অনুমান করিতেছি যে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় উপগুপ্ত নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের কেশ স্তূপের উপর

৩। বীল সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত হিয়াংথসাং পুস্তকের (নূতন সংস্করণ) ৭৭ পৃষ্ঠায় নখ ও কেশ স্তূপের বিবরণ পাইবেন।
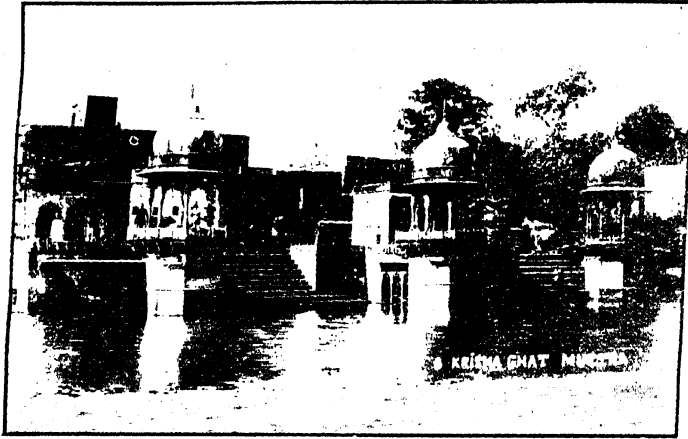
মথুরা কৃষ্ণঘাট

অথবা পার্শ্বে কেশব নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। মন্দির প্রাঙ্গণে চন্দ্রনামোৎকীর্ণ বিষ্ণুধ্বজ দিল্লীর লৌহ স্তম্ভটা তিনিই প্রোথিত করিয়া থাকিবেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই এবিষয় মীমাংসা করিবেন. (৪) আমি তীর্থযাত্রী মাত্র।

আরও একটা কথা এই যে, বরাহপুরাণে ১৫৮ অধ্যায়ে ৯।১০ম শ্লোকে দেখিতে পাই—"যেজন অচ্ছিন্ন বস্ত্রের বর্ত্তিকাযোগে ঘৃতপূর্ণ পাত্রে করিয়া কেশবের সমক্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি অন্তে পঞ্চ যোজন দীর্ঘ, পঞ্চ যোজন আয়ত দীপমালা-মণ্ডিত বিমান লাভ করে।" চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ স্তূপ গুলিকে দীপ মালায় বিভূষিত করা হইত। কেশব মন্দিরে এইরূপ দীপ দান প্রথাটাও হয়ত বৌদ্ধদিগের অনুকরণ হইলেও হইতে পারে।

জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৬২ খৃঃ কেশব মন্দিরের সন্নিকটে একটা অতি প্রাচীন কূপের ভিতর হইতে ৪ফু ৩॥০ইঃ উচ্চ বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। সেইটা এখন লক্ষৌ মিউজিয়মে আছে। তাহার পাদপীঠে গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে যে, ২৩০ গুপ্তাব্দে (৫৪৯।৫০ খৃঃ) জয়ভট্টানাম্নী কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সে মূর্ত্তিটিকে যশোবিহারে দান করিয়াছিলেন। যশ নামক মহাস্থবির উপগুপ্তের গুরু ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মথুরায় অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী যশের নামে বিহার ছিল, তথায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ৫ম গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সময়ে পর্য্যন্ত বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইত। সাহেবেরা অনুমান করিয়াছিলেন যে, কেশব দেবের মন্দিরটি হয়ত একটি আদি বৌদ্ধবিহারের উপর দণ্ডায়মান আছে। সংশয় ঘুচাইবার জন্য ১৮৯৬ সালে ডাঃ ফুরার সাহেব মসজীদ হইতে ৫০ ফুট দূরে, উত্তর-

৪। দাক্ষিণাত্যে, যেখানে মুসলমানদিগের ততটা উপদ্রব হয় নাই, অনেক দেবমন্দিরে এক একটা ধ্বজ বা স্তম্ভ আজিও প্রোথিত রহিয়াছে। উড়িষ্যায় জগন্নাথ দেবের ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও এইরূপ স্তম্ভ আছে। উড়িয়া পাণ্ডারা যাত্রীগণকে লইয়া 'এটি মথা কর' বলিয়া প্রণাম করিতে বলেন। বরাহপুরাণে ১৬০ অধ্যায় ৩৬ শ্লোকে "কৃষ্ণপূজিত সুশিখর, সৌরভময় স্তম্ভোচ্চয়কে (উচ্চ স্তম্ভকে) প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবার বিধান আছে। সুতরাং মথুরাতে যে দুই একটা পবিত্র স্তম্ভের পূজা হইত, তাহা নিঃসংশয় বুঝা গেল। তবে সে স্তম্ভগুলা অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বা অন্য কাহারও জয়স্তম্ভ বা বিষ্ণুধ্বজ কিনা ঠিক বলিতে পারি না। দিল্লীর সেই স্তম্ভের কথাটা গুপ্ত রাজগণের বিবরণে দিয়াছি, দেখিবেন।
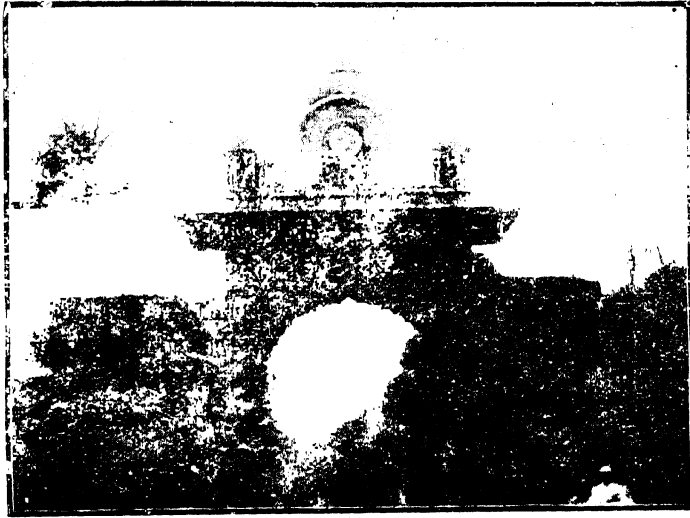
মথুরা—হার্ডিঞ্জ গেট

পশ্চিম দিকে, ৮০ফুট লম্বা ২০ফুট চওড়া ২৫ফুট গভীর খাদ খনন করিয়া পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ের কিছুই পাওয়া গেল না। কেবল বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ মিলিতে লাগিল। ২০ফুট ভূমির নিম্নে একটি বৌদ্ধস্তূপের গোলাকার পরিক্রমা পথ পাওয়া গেল। সেই বড় বড় লাল পাথরগুলার মধ্যে একখানা পাথরের গায়ে খোদিত লিপি পড়িয়া জানা গেল যে, সংবৎ ৭৬ সালে কুশানরাজ বসিষ্ক এই স্তূপটিকে মেরামত করিয়াছিলেন। উপরে অবস্থিত মসজীদের ইষ্টকময় ভিত্তিটা সেই স্তূপের পরিক্রমা পথের উপর রহিয়াছে। এবং মধ্যস্থল দিয়া পরিক্রমা পথ গিয়াছে বলিয়া সমস্ত স্তূপটি বা পথটা বাহির করিতে পারা গেল না। বসিষ্কের নামাঙ্কিত সেই শিলালিপি মুদ্রিত হয় নাই। এবং পণ্ডিত রাধাকিষণ রায়বাহাদুরও বহু অনুসন্ধানে তাহা খুঁজিয়া পান নাই। তথাপি জানা গেল যে কনিষ্ক ও হবিষ্কের মধ্যবর্ত্তিকালে বসিষ্ক নামে একজন কুশান সম্রাট মথুরায় ছিলেন। তবে কথিত-স্থানে একটা মৌমাছির চাকের মত গর্ত্ত করা ইষ্টকময় স্তূপের বা প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ এখনও সত্যই রহিয়াছে। সেটাকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিয়া মনে লাগে না। ডোসেল সাহেব বলিতেছেন, এখন (১৯১০ খৃঃ) ফুরার সাহেব বর্ণিত সেই গোলাকার পরিক্রমা-পথটা কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। সেস্থানের অনেকটা উপর দিকে বড় বড় লাল পাথরের সেতুর মত ৪৮ফুট লম্বা একটা পথ আজিও রহিয়াছে। এ সেতুটা ১২ বা ১৩ শতাব্দীর হইলেও হইতে পারে। ইহার সহিত স্তূপের কোন সংস্রব আছে কি না বুঝা যায় না। সেতুটা উত্তর দক্ষিণে ৪৮ ফুট লম্বা ৪৷৷০ ফুট চওড়া। এক একখানা পাথর ৬৷৷×১৷৷০× ৯ ইঃ। তাহার মধ্যে পাঁচখানা পাথরের গায়ে ত্রিশূলের মত চিহ্ন খোদিত আছে। সে পাথরগুলা দুইথাকে তিন তিন খানা করিয়া পাশাপাশি সাজান, এবং লোহার আঁকড়া দিয়া আঁটা। এই সেতুর অনেকটা নিম্নে ৫৯ ফুট উচ্চ একটা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো ইটে গাথা প্রাচীর বাহির হইয়াছে। সে প্রাচীরের ইটগুলা ১১×৮৷৷০ ×২৷৷০ ইঞ্চি। এখানটা খনন করিবার সময় আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মন্দিরের কতকগুলা ভগ্ন খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে চারিদিকে

মুখওয়ালা দণ্ডায়মান অর্থাৎ চারিটি সর্ব্বতোভদ্রিকা জৈন প্রতিমা পাওয়া গেল। সেই প্রতিমার নিম্নে কুশান সময়ের ব্রাহ্মি অক্ষরে যাহা লিখিত আছে তাহার অর্থ—ভটিদাসনামে একজন জৈন ভিক্ষু শক-সত্রপ সোদাসের (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) রাজত্বকালে এ স্তম্ভ বা মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। (১০১১।১২ সালের আর্কিওলজিকেল সার্ভে রিপোর্ট দেখুন)

মসজীদের পশ্চিম দিকে বা পশ্চাদ্‌ভাগে একটা ছোট দেবালয়ের ভিতর ইংরাজ আমলে বা তাহার কিছুপূর্ব্বে স্থাপিত একটা নূতন কেশবজী এখন রহিয়াছেন। তাহার দালানটা পূর্ব্বদ্বারী, সম্মুখে ছোট প্রাঙ্গণ। ইহার পূর্ব্ব গৌরব "কেশবসমো দেব নঃ" আর ততটা নাই; যাত্রী প্রদত্ত অর্থে সেবা চলে, কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। ইঁহার মন্দিরের পার্শ্বে অপর দুই তিন খানা ছোট ঘরের ভিতর, বারোয়ারির সঙের মত মৃত্তিকা নির্ম্মিত বসুদেব ও দেবকী প্রভৃতি স্থাপিত আছেন।

চৌবেরা এখন সেই আধুনিক ঘরগুলিকে যাত্রিগণের নিকট কংসের কারাগার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহার পশ্চিমে কংস রাজার মল্লদিগের থাকিবার স্থান মল্লপুরা। দক্ষিণ দিকে পাথরের গাঁথা প্রাচীর বেষ্টিত পোৎরাকুণ্ড—অর্থাৎ কৃষ্ণের সূতিকাগারের বস্ত্রগুলি এই পুষ্করিণীতে ধৌত করা হইত। ইহাতে বার মাস জল থাকে না।

আমরা কেশবজীর স্তূপ সংক্রান্ত যে সকল খণ্ড খণ্ড জৈন বৌদ্ধ পৌরাণিক মহম্মদীয় ইতিহাস ও নিদর্শন সকল নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি, সে গুলিকে একত্র করিলে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এই টিলার পার্শ্ব দিয়া যমুনার একটি শাখা প্রবাহিত হইত। তাহার তীরে যশ ও উপগুপ্ত নির্ম্মিত বিহারে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ স্তূপ ছিল। লোকে তখন এস্থানকে কেশপুর বলিত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে শক সম্রাট বসিষ্ক সে বিহারের সংস্কার সাধন করেন। তাহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পরম ভাগবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সেই কেশ স্তূপের উপর অথবা পার্শ্বে কেশব নামে একটি চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে লৌহ নির্ম্মিত একটি বিষ্ণুধ্বজও (স্তম্ভ) স্থাপন করেন! ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ গিজনি সে সমস্ত ধ্বংস করিয়া দেন। হিন্দুরা অপর একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপন করিলে তাহাও সেকেন্দর লোদী বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ে বা কিঞ্চিৎপূর্ব্বে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দুরা পুনরায় একটি নূতন মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। জহাঙ্গীরের সেনাপতি বীরসিংহদেব তাঁহার সুন্দর মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব সে মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজীদ করিয়া দিলে, কেশবদেবকে নাথদ্বারে বা কানপুরের নিকট বৃধোলী গ্রামে পাঠান হয়। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মোহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে সওয়াই জয়সিংহের অনুরোধে অপর একটি কেশব মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই এখন মথুরায় মসজীদের পশ্চাৎ দিকে সমতল ভূমিতে একতলা মন্দিরের ভিতর রহিয়াছে। সেই লৌহ স্তম্ভটিকে তোমর রাজারা দিল্লীতে লইয়া গিয়াছেন, এখন পুরাণী দিল্লীতেই রহিয়াছে। যমুনার সে শাখাটা ভরাট হইয়া গিয়া রাজপথ হইয়াছে। মথুরার প্রধান দেবতা কেশব দেবেরই যখন এতবার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন, তখন অন্য দেবতাগুলির বিষয় পাঠক-গণ নিজেরাই অনুমান করিয়া লইবেন।

(২) **দীর্ঘ বিষ্ণু**—বরাহপুরাণে এ নাম আছে। ইঁহার মন্দির বারাণসীর রাজা পাটনীমল কর্ত্তৃক ভরতপুর দরজায় যাইবার পথে চক বাজারে স্থাপিত। চৌবে ঠাকুরেরা বলেন, ইনি দীর্ঘাকার হইয়া কংসকে টিলার উপর হইতে পাতিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইঁহার নাম দীর্ঘবিষ্ণু হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটী কেশবজী অপেক্ষা উচ্চে কিছু বড়। শ্রী সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার পূজারী। মন্দিরটী বড় হইলেও সুদৃশ্য নহে।

৩। **গতশ্রম** বা **বিশ্রান্তিদেব**—ইঁহাকে লোকে কৃষ্ণানাথও বলে। বিশ্রান্তিদেব নামটী বরাহপুরাণে

আছে। কংস বধের পর ইনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ইঁহার টিলাটী বিশ্রান্ত ঘাটের নিকট। উচ্চে ২০।২৫ ফুট হইবে। সোপান বাহিয়া উপরে দেবালয়ে যাইতে হয় চারিদিকে দোকান ও দোতালা বাটী আছে বলিয়া সহসা টিলা বলিয়া বুঝা যায় না। দেবালয়টী দুই মহলে বিভক্ত। প্রথম অঙ্গনে ছোট মন্দিরের ভিতর সাক্ষী-গোপাল রহিয়াছেন, ২য় অঙ্গনে দালানের মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, চৌবে ঠাকুরেরা সে দুইটী নারী মূর্ত্তিকে রাধা ও কুব্জা নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রী সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার পূজারী। ধৌলপুরের মহারাজ প্রদত্ত গ্রামের আয় হইতে সেবা চলে। তৎভিন্ন যাত্রিগণ হইতেও বেশ আয় আছে। মন্দিরটী বড় পুরাতন বলিয়া মনে হইল। ১৮০০ খৃঃ প্রাণনাথ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত ২৫০০০ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিলাম।

৪। **আদিবরাহদেব**—ইনি চৌবে পাড়ায় মাণিক চক মহল্লার ছোট মন্দিরের ভিতর রহিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্ত্তির উপর বরাহ মুখ। তাঁহার দন্তে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণ্যাক্ষ অসুরকে দলন করিতেছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁহার পূজারী। যাত্রী দত্ত আয় হইতে সেবা চলে। কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। এ মন্দির হইতে অতি অল্পদূরে অপর একটী ছোট মন্দিরের ভিতর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অপর একটী বরাহমূর্ত্তি আছে। বরাহপুরাণে আদি বরাহ ও শ্বেত বরাহ দুই নামই আছে। পূর্ব্বে মথুরায় চৌবেরা সৌর বা সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বরাহপুরাণে (১৩০ অ ৭৫ শ্লোক) আছে—

"সূর্য্যং তং বরদং দেবং মথুরাণাং কুলেশ্বরং।"

শক সত্রপেরা বা শ্বেত হুনেরা হয়ত এই সূর্য্য পূজা মথুরায় প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। কেন না তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তৎপরে গুপ্ত রাজাদিগের সময় হইতে এখানে বিষ্ণু ও তাঁহার অবতারগণের পূজা প্রচলিত হইলে পর, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, খুব সম্ভব বরাহোপাসক মিহির ভোজ নামক রাজা এখানে তাঁহার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। চৌবেরা এখন সূর্য্যোপাসনা মৌনভাবে করেন। তাঁহারা শিব, শক্তি ও গণেশের পূজা করিলেও, মুখ্যভাবে বিষ্ণুর উপাসক, এবং আপনাদিগকে বিষ্ণুর ৩য় অবতার বরাহদেবের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, যথা—

"সর্ব্বে দ্বিজা কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে ভুবি॥"
মাথুর চৌবে বা চতুর্ব্বেদী, মাগধ গয়ালী॥

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, কপিল নামে এক বিপ্রর্ষি এই আদি বরাহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধ্যান করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে ইন্দ্র ইহাঁকে স্বর্গে লইয়া যান। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় এই মূর্ত্তি লইয়া আসেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া এই মূর্ত্তিটিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন; শত্রুঘ্ন লবণ বধের পর সেই মূর্ত্তিটিকে মথুরায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। *

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

* ভ্রম সংশোধন—গত বৈশাখ মাসের মানসী ও মর্ম্মবাণীর ২১৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে আরও একটু খোলাসা ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এইরূপ ভাবে শোধন হইবে—গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সেই জন্ম অসুর নিধনকারী ঐশ্বর্য্যভাবাপন্ন যদুবংশীয় বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণকে (মথুরায় সমস্ত লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিকে) গৌণভাবে পূজা করিয়া থাকেন। বেণুবাদ্য-বিনোদী ত্রিভঙ্গ নর্ত্তক রসময় গোপ-বংশীয় নন্দনন্দন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমময়ী রাধাই ইঁহাদের মুখ্য উপাস্য ইষ্টদেবতা। ইঁহাদের রাধা আরাধিকা বা সেবিকা সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাতে প্রেম ভিন্ন ঐশ্বর্য্যভাবের লেশ মাত্র নাই। ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর স্থান বৃন্দাবনে নাই। যমুনার পরপারে বেলবনে বসিয়া লক্ষ্মী প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনের দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছেন। আমরা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি যাহা নিজেই বুঝিতে পারি নাই তাহা অপরকে বুঝাইতে যাইব কেন? মোটামুটি ভাবে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই বলিলাম। বঙ্কিমবাবু ছাঁটিয়া বাদ দিয়া ভগবদ্গীতা হইতে সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডব সখা আদর্শ মানব ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনকারী যে কৃষ্ণচরিত গঠন করিয়াছেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য গোপেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের কোন সম্পর্ক নাই। বাঙ্গালীর পদকর্ত্তারা যে মধুর আদিরসের গীতি গুলিতে কেবল বৃন্দাবন লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কারণ ইঁহারা বৃন্দাবনের গোপীকুল-কেলি-বিলাসী লম্পট রসময় কৃষ্ণেরই উপাসক এবং ইহাই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়িয়া কুত্রাপি না যাইবার গূঢ়ার্থ। (এ বিশেষণটী চৈতন্যদেব স্বয়ং নিজ রচিত শ্লোকে দিয়াছেন—"যথা তথা বা বিদধাতুলম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ॥")

আমাদের মনে হয় রূপ ও সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা কটক, সাক্ষীগোপাল ও রেমুনার গোপীনাথ প্রভৃতি উড়িষ্যার ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া বৃন্দাবনেও তদনুরূপ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। কেননা বরাহ পুরাণে এইরূপ ত্রিভঙ্গ মুরলীধর কৃষ্ণ মূর্ত্তির উল্লেখ পাই নাই। মথুরায় চৌবেরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি গুলিকেই কৃষ্ণ মহারাজ বলিয়া অভিহিত করেন।

গত চৈত্র মাসের ১৫৮ পৃষ্ঠায় আদি বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে উদিপী নগরে মধ্বাচারী মঠে প্রতিষ্ঠিত আদি কৃষ্ণ মূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তি নহে।

নগবালা

(উপন্যাস)

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও দিল্লীযাত্রা।

যেমন পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি শিববিহীন মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তেমনই এই কলিকালে পূজনীয় মাতাঠাকুরাণী কৃষ্ণকমল বিহীন জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহের মহা ভোজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; এবং দক্ষের ন্যায় সতীকন্যার দেহত্যাগ, এবং প্রেতোপদ্রবের আশঙ্কাও রাখেন নাই। বিবাহের দিন প্রভাত কালেই তাঁহার মনোমধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, আজ হয়ত কৃষ্ণকমল জ্যোতির্ম্ময়ী-রত্নে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়া মনোদুঃখে কিছু উপদ্রব করিতে পারে ; মনোমধ্যে এই সন্দেহ উপস্থিত হইবা মাত্র, তিনি বিবাহ-ভোজের বিপুল উদ্যোগ কার্য্যে অবহেলা করিয়া, প্রথমেই এক গোপনীয় স্থানে এক বলশালী ব্যক্তির সহিত, অন্যের অজ্ঞাতসারে সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাহার হস্তে এক শত মুদ্রা, এবং শ্রবণ মূলে কিছু গুহ্য উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সেই নিগূঢ় উপদেশ অনুযায়ী, উক্ত বলশালী ব্যক্তি, সমস্ত দিন কৃষ্ণকমলের সন্ধানে ফিরিয়া অপরাহ্ণ কালে তাহার সাক্ষাৎ পাইল।

কৃষ্ণকমল কিছু সশঙ্ক চিত্তে তাহার বলশালী দেহ অবলোকন করিল বটে ; কিন্তু তাহার সুরাপানের সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ কোনও ক্রমে অবহেলা করিতে পারিল না। ভাবিল, সুরা পান করিয়া, কিছু স্ফূর্ত্তির সহিত বিবাহ ভোজে যোগদান করিবে। অতএব সেই বলশালী ব্যক্তির সহিত কোনও অকথ্য স্থানে যাইয়া, তাহার সহিত, তাহার অনুরোধে এবং ব্যয়ে, সন্ধ্যা হইতে সুরাপান আরম্ভ করিয়া দিল। সুরা তাহার রুচিমত ছিল, এবং সে জন্য তাহাকে কিছুই ব্যয় করিতে হয় নাই ; তাই অল্পকাল মধ্যে সে কিছু অধিক পরিমাণেই পান করিয়া ফেলিল। ফলতঃ কৃষ্ণকমল, পরিপক্ক সুরাপায়ী হইলেও, কিছু কালের মধ্যেই, জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা, এবং তাহার বিবাহ ভোজের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল ; এবং আরও কিছুকাল মধ্যে সে ভোজে উপস্থিত হইবার শক্তিও হারাইল।

এইরূপে মাতাঠাকুরাণী পত্র দ্বারা এবং মুখে কৃষ্ণকমলকে আহ্বান করিলেও সে সেই মহা ভোজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এইরূপে শুভ্রবেশধারিণী শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী একটা অদর্শনীয় ও কদর্য্য উৎপাতের উৎকণ্ঠা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে জ্যোতির্ম্ময়ী নির্ব্বিঘ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশকে বিবাহ করিয়াছিল ; এবং কৃষ্ণকমলের হাজার টাকা দাবীর সম্বন্ধেও তাহাকে চিন্তিত হইতে হয় নাই।

মাতাঠকুরাণী জামাতাকে বরাভরণ দিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট বারাণসী যোড়, একটী রত্ন-অঙ্গুরী, সুবর্ণের ঘড়ী ও চেন, এক সেট সুবর্ণ রচিত বোতাম, এবং ফ্রেম হীন চশমা ; এই সকল দ্রব্য তাঁহার বাটীতেই সঞ্চিত ছিল ; কন্যার ভবিষ্যৎ বিবাহের জন্য তিনি ক্রমে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দিল্লীতে নূতন সংসার স্থাপনের জন্য নগদ বার শত টাকা জামাতাকে উপহার দিয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন যে দিল্লী পৌছিবার পর কন্যাকে মাসে মাসে আড়াই শত টাকা মাসহারা দিবেন।

গাইট ছটার সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ উদার চেতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ঐ সকল আভরণ ও অর্থ নবপত্নীর বাক্সে রাখিয়া এবং হাতের হলুদ মাখা সূত্র পকেটে রাখিয়া, বিবাহ চিহ্ন সকল গোপন করিয়া, প্রভাতে বাটী ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া, অন্ন জল মুখে দিয়া একটী দীর্ঘ দিবানিদ্রার দ্বারা, রাত্রি জাগরণ ক্লান্তি বিদূরিত করিবার জন্য উপরে আপন শয়ন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিল।

নগবালা শ্বশ্রুঠাকুরাণীর ইঙ্গিত পাইয়া, স্বামীর উচ্ছিষ্ট পাত্রে আপন ভোজন কার্য্য সত্বর সমাধা করিয়া উপরে গেল; এবং নিদ্রিত পতির পদসেবা করিতে পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিল। আহা! দুর্ভাগিনী তখন স্বপ্নেও জানিতে পারে নাই, যে স্বামীর সেবা করিয়া সে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিল, সেই স্বামীই অন্যের প্রতি অনুরাগী হইয়া তাহাকে পূর্ব্বরাত্রে বিবাহ করিয়াছে; এবং এই বিবাহের জন্যই রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত কলেবর হইয়া নিদ্রিত হইয়াছে।

এই দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর, রামপ্রাণবাবু অপরাহ্নে অফিস হইতে প্রত্যাগত হইলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ তাঁহাকে বলিল, "আমি কালই সকালের এক্সপ্রেসে দিল্লী যাব ঠিক করেছি।"

পুত্রগত প্রাণ রামপ্রাণ বাবু আশু পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "কালই? এত শীগ্গির কেন, এখনও ত জয়েন (join) করবার পাঁচ ছ দিন দেরী আছে। তুমি আমার একটী ছেলে; এই ভাদ্র মাসটার তোমাকে বিদেশে পাঠাতে আমার মোটে ইচ্ছা হচ্ছে না।"—বলিতে বলিতে, তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল, এবং তাঁহার কণ্ঠ একেবারে বাষ্পরুদ্ধ হইয়া পড়িল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ অশ্রুভারাক্রান্ত পিতাকে বক্র নয়নে নিরীক্ষণ করিল। বার্দ্ধক্যের এই আতিশয্য সে সহ্য করিতে পারিল না। উদ্ধত কণ্ঠে কহিল, "তোমার ইচ্ছেমত আর কায হ'বে না। কাল আমায় যেতেই হ'বে। নইলে বাসা টাসা ঠিক করে, পয়লা কাযে যোগ দিতে পার্ব্বো না। গবর্ণমেণ্ট ত তোমার ভাদ্র মাস বুঝবে না।"

রামপ্রাণ বাবু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "তা ত বুঝেছি। তবু এই ভাদ্র মাস বলেই আমার মন সরছে না। একবার দরখাস্ত করে দেখলে হ'ত, দিনটা বদলাতে পারা যায় কি না। আমাদের বড় সাহেবকেও বলে কয়ে দেখতাম।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পিতাকে ধমক দিয়া বলিল, "তোমার বড় সাহেবের বাবার সাধ্যি নেই যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাল্টায়। দেখছি, তুমি ঐ সব করে, শেষকালে আমার চাকরীটা নষ্ট করে দেবে। ভাদ্রমাস টাস্ তোমাদের কুসংস্কার আমি মানিনে, আমি কাল সকালেই যেতে চাই। গাড়ী ভাড়ার টাকাটা তোমরা ঠিক করে রেখো। আমার বাক্সটা আমিই গুছিয়ে নেব এখন।"

অনন্যোপায় রামপ্রাণ বাবু অগত্যা বুঝিলেন যে, ধর্ম্মের চেয়ে চাকুরীই বড়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী ভাড়াতে আর অন্য অন্য খরচে আপাততঃ তোমার কত লাগবে?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "বোধ হয়, টাকা শ' খানেক হলেই চলবে।"

রামপ্রাণ বাবু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তাইত! আমার হাতে ত এখন পঞ্চাশ টাকা বই নেই; আর পঞ্চাশ টাকা কোথা থেকে যোগাড় করি?"

গৃহিণী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি চিন্তাকুল স্বামীকে অর্থ চিন্তার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া কহিলেন, "টাকার জন্যে তুমি ভেবোনা; সব টাকা আমি দেব এখন।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ অর্থহীন মাতা পিতার সামান্য অর্থের নিরর্থক ও হীন কাহিনী শুনিল না; তখন তাহা শুনিবার তাহার অবসর ছিল না; তাহা শুনা, উচ্চমনা সুশিক্ষিত যুবকদের কর্ম্ম নহে। সে উত্তম রূপে সজ্জিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে বেলা অবসানের অনেক পূর্ব্বে গিয়া উপস্থিত হইল।

জ্যোতির্ম্ময়ী তখনও আপন শয়ন কক্ষে অবসন্ন দেহে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল।

পূর্ব্বরাত্রে সে যে অধিকার লাভ করিয়াছিল, সেই অধিকারের বলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়া দিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী নয়ন উন্মীলন করিয়া নিদ্রালস দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ আদরকারী যুবাকে অবলোকন করিল।

দুই এক কথার পর জ্যোতিঃপ্রকাশ তাড়াতাড়ি পত্নীর নিকট হইতে আপন গচ্ছিত অর্থের কিয়দংশ

গ্রহণ করিয়া সত্বর বাহির হইয়া গেল। এবং বিপণিতে বিপণিতে পরিক্রম করিয়া দুইটা বৃহদাকার পেটক, আবশ্যক বস্ত্র ও পোষাকাদি, এবং একটী হ্যাণ্ড ব্যাগ ক্রয় করিয়া আনিল, এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর দুইটী ট্রাঙ্কে দিল্লী বাসের জন্য আবশ্যক তৈজসাদি এবং বিছানা বালিশ উত্তমরূপে গুছাইয়া রাখিল। পরে ঐ সকল দ্রব্য হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া যাইয়া, পরদিন পাঞ্জাব মেলে দিল্লী যাইবার জন্য, দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিল, বার্থ (berth) রিজার্ভ (reserve) করিল, এবং মালগুলি ওজন করিয়া অ্যাড্ভান্স লগেজ করিল।

নব পত্নীর সহিত শুভ মিলনের আশায় জ্যোতিঃপ্রকাশ ষ্টেশনের কার্য্য সমাধা করিয়া শ্বশুর বাটীতে আসিয়াছিল। কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! সে মাতাঠাকুরাণীর নিকট শুনিল যে, জ্যোতির্ম্ময়ী দীর্ঘ দিল্লী বাসের পূর্ব্বে তাহার বন্ধু বর্গের নিকট একবার শেষ বিদায় লইবার জন্য, সন্ধ্যা আটটার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ মাত্র আহার করিয়া, বাটী হইতে বাহির হইয়াছে; রাত্রি আড়াই প্রহরের পূর্ব্বে তাহার বাটি প্রত্যাগমনের কোনও সম্ভাবনা নাই!

এই অন্তর-পীড়ক কুসংবাদ শুনিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ অগত্যা আপনার হীন বাটীতে ফিরিতে বাধ্য হইল; শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রদত্ত উৎকৃষ্ট আহারে বঞ্চিত হইয়া, আপন গর্ভধারিণী দত্ত দীন অন্ন খাইতে বাধ্য হইল; এবং নবীনা প্রিয়তমার পুষ্পসন্নিভ সুখ-শয্যায় স্থান না পাইয়া, পুরাতনা পত্নীর কন্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিতে বাধ্য হইল। হায়! পত্নীর স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈশভ্রমণ সভাজগতে আধুনিক সুশিক্ষার সুফল জানিয়া, সে বিনাবাক্যে, স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিরহিতা, অশিক্ষিতা পুরাতন পত্নীর প্রেমহীন পূজা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

পরদিন প্রভাতে, বাটীর লোক সকল জাগরিত হইয়া, তাহার দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সে যে, সন্ধ্যাকালে পাঞ্জাব মেলে দিল্লী যাত্রা করিবে, তদ্‌বিষয়, কারণ বশতঃ, বাটীর কোনও লোককে অবগত হইতে দেয় নাই; তাহারা জানিত যে, সে বেলা আটটার সময় বাটী হইতে রওনা হইবে। অতএব নগবালা সকালে সকালে উঠিয়া স্বামীর পেটক মধ্যে বস্ত্র সকল গুছাইয়া রাখিল, শ্বশ্রূমাতার নির্দ্দেশ মত, যাত্রা পথে, কুসুম পল্লবাদি শোভিত শুভদর্শন মঙ্গলঘট স্থাপন করিল, এবং রন্ধন জন্য তরকারী কুটিয়া দিল। মাতা সকালে সকালে স্নান করিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। রামপ্রাণ বাবু, পুত্রের আবশ্যক অর্থ, গৃহিণীর নিকট পাইবার প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং নানারূপ আশার ছবি মানসপটে আঁকিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে পুত্রকে নানা বিষয়ে সতর্ক হইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সুশিক্ষিত জ্যোতিঃপ্রকাশ পিতার এই সকল অনর্থক উপদেশে উত্তরোত্তর বিরক্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে বেলা হইল। জ্যোতিঃপ্রকাশ স্নান করিল, আহার করিল। রামপ্রাণ বাবু পুত্রকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন; এবং দ্বারে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন। নগবালা স্বামীর শেষ বিদায় চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায় আপন শয়ন কক্ষে যাইয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ গোপন করিল।

পুত্রকে বিদায় দিতে মাতার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। যাহাকে জীবনে কখনও চক্ষের অন্তরাল করেন নাই, সেই প্রাণাধিক পুত্রকে, বহুকালের জন্য, বহুদূরদেশে পাঠাইতে তাঁহার চোখ ফাটিয়া, তাঁহার গণ্ড বহিয়া, তপ্ত অশ্রুধারা, ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি রক্তধারার মত সেই অশ্রুধারা, অশ্রুজলসিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলেন। পুত্রের দিল্লী যাত্রার খরচ দিবার জন্য, সিক্ত বসনাঞ্চল হইতে, চাবি লইয়া তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিলেন, মুখ নত করিয়া বাক্সের ভিতর দেখিলেন। কিন্তু বাক্সে ত একটি কপর্দ্দকও দেখিতে পাইলেন না! যে চক্ষের জলে তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তাহা উত্তমরূপে মুছিয়া, আবার বাক্সের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহাও নিরর্থক হইল। তিনি স্মরণ করিয়া দেখিলেন যে, অল্পদিন আগে, যখন রমেশকে

কুড়ি টাকা ঋণ দিয়াছিলেন, তখন বাক্সের মধ্যেই তাঁহার যাবতীয় অর্থ বর্ত্তমান ছিল। এখন তাহা কোথায় গেল? তিনি কি করিবেন? কোথা হইতে স্বামীকে পুত্রের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ দিবেন? অর্থাভাবে যখন পুত্রের দিল্লী যাওয়া স্থগিত হইয়া যাইবে, অপিচ চাকুরীর হানি হওয়া সম্ভবপর হইবে, তখন, হায় হায়, তিনি কি করিবেন? প্রতিশ্রুত অর্থ সময়ে না পাইলে, স্বামী কিরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন, তাহা চিন্তা করিয়া, গৃহিণীর ভগ্ন বক্ষ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে অসহ্য বক্ষের পীড়ায় তিনি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

দ্বার হইতে শটক চালক হাঁকিল, "বাবু আর কত দেরী?"

রামপ্রাণ বাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আর একটুও দেরী হ'বে না, বাপু! এই টাকাটা নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ছি।" অতঃপর সিঁড়ির নিয়ে দাঁড়াইয়া তিনি গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওগো টাকা নিয়ে তুমি শীগ্‌গির নেমে এস তো।"

স্বামীর আহ্বানের গৃহিণী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বলিতে বলিতে পারিলেন না যে, অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সুতরাং তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন এবং কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন যে, যদি দৈবাৎ ভুলক্রমে, তাঁহার কাপড়ের বাক্সে টাকা তুলিয়া রাখিয়া থাকেন! তাই তিনি কাপড়ের বাক্স খুলিয়া, কাপড় সকল বাহির করিয়া উহাদের ভাঁজ খুলিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন; কিন্তু যে অর্থ তাঁহার সুশিক্ষিত প্রাণাধিক পুত্র আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা তিনি কোথায় খুঁজিয়া পাইবেন? আহা! গৃহিণীর তখনকার কষ্ট ও মনোভাব বর্ণনীয় নহে।

রামপ্রাণ বাবু কিয়ৎকাল গৃহিণীর জন্য অপেক্ষা করিয়া, আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না; তিনি আবার ডাকিলেন, এবং ডাকিতে ডাকিতে উপরে উঠিলেন। দেখিলেন, শ্বেত বস্ত্ররাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং তাহার মাঝখানে, শ্বেত পুষ্পরাশি মধ্যে নির্ব্বাক দেবশিলার ন্যায়, গৃহিণী নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নয়ন হইতে দেবতার স্নানজলের মত, অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রামপ্রাণ বাবু ভীত হইয়া কহিলেন, "তোমার কি হ'ল?" গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমার টাকা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে।'

রামপ্রাণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন খানে রেখেছিলে?"

গৃহিণী কহিলেন, "আমার বেশ মনে আছে, ঐ বাক্সের মধ্যেই রেখেছিলাম; তবু এই কাপড়ের বাক্সটা খুঁজে দেখলাম; কোথাও পেলাম না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতী পুত্র নিম্নতল হইতে যেন মহা বিদ্যার অহঙ্কার উদ্গিরণ করিল—"কি, তোমাদের টাকা বের করা হবে না? শেষকালে, আমি কি গাড়ী ফেল্ করবো?"

রামপ্রাণবাবু শঙ্কিত হইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "তাই ত, টাকাটা কোথায় গেল? তুমি বোধ হয় ভুলে অন্য কোন যায়গায় রেখেছ। যাহোক, তা' এর পরে খুঁজে দেখো এখন। আপাততঃ তোমার একখানা গহনা দাও। ষ্টেশনে যেতে যেতে রাস্তায় কোনও পোদ্দারের দোকানে বাঁধা রেখে, এক'শ টাকা নেবো এখন। তাই দিয়ে আপাততঃ ছেলেকে ত দিল্লী পাঠাই!"

গৃহিণী কহিলেন, "আমার অন্য গহনা ত নেই। এই বালা দু'গাছি আছে।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তাই এক গাছা খুলে দাও।"

গৃহিণী প্রকোষ্ঠে একটা ছিন্ন বস্ত্রের পাড় জড়াইয়া, বালা খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "এক গাছায় কি এক'শ টাকা পাবে?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ আবার নিম্নতল হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

রামপ্রাণবাবু তাড়াতাড়ি গৃহিণীকে বলিলেন, "তবে ও গাছাও দাও।—দুঃখ কোর না। এর পর ঐ ছেলে তোমাকে কত বালা, কত ভাল ভাল গহনা পড়িয়ে দেবে।"

গৃহিণী দুই হাতের বালা খুলিয়া দিলেন; এবং প্রাণাধিক পুত্রকে বিদায় দিবার জন্য স্বামীর সহিত নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ মাতা পিতাকে নিম্নতলে সমাগত দেখিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা বাক্স খুলে এক'শ টাকা বার করতে কতক্ষণ লাগে?"

রামপ্রাণবাবু মৃদুভাবে কহিলেন, "তোমার মা টাকা কোথায় রেখেছেন, এখন তা মনে করতে পারলেন না। সে এখন খুঁজে বার করা, তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নয়; সে সময় মত খুঁজে দেখবেন এখন। এখন ওঁর এই বালা যোড়াটা নিয়ে যাচ্ছি; মোড়ের ঐ পোদ্দারের দোকানে বাঁধা রেখে এক'শ টাকা নিয়ে তোমায় দেব, চল। দুর্গা, দুর্গা!"

সুশিক্ষিত জ্যোতিঃপ্রকাশ বিলম্বকারিণী, বুদ্ধিহীনা, ক্রন্দনমানা মাতাকে বিদায়কালে একটা প্রণাম করা কিংবা উৎসুকনয়নো ভক্তিমতী পত্নীর ভক্তির প্রণাম গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। একবারে দ্রুতগতি গাড়ীতে গিয়া উঠিল।—আশ্চর্য্য! বিধাতার এই রাজ্যে, গাড়ীতে উঠিবার সময়, পদস্খলিত হইয়া তাহার চরণাস্থি চূর্ণ হইয়া গেল না কেন?

রামপ্রাণবাবু গাড়ীতে উঠিবার সময়, নানা অনুযোগকারী গাড়োয়ানকে বলিলেন, "এইবার চল, বাবা। একটু দেরী হ'য়ে গেছে; চার আনা পয়সা বেশী দেব এখন; ঐ পোদ্দারের দোকানে একবার দাঁড়িও!"

পোদ্দার সেই বালা যোড়াটি বন্ধক রাখিয়া কেবল মাত্র পঁচাত্তর টাকা দিতে চাহিল; কিন্তু তাহাতে বাবাজীর দিল্লী যাইবার খরচ কুলাইবে না। অগত্যা তিনি একশত পাঁচ টাকায় উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। এই অর্থ লইয়া তিনি সত্বর গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। ষ্টেশনে পুত্রকে একশত টাকা গণিয়া দিলেন। পুত্র অল্পকাল মধ্যে টিকিট কিনিয়া উহা হস্তে লইয়া আবার পিতার কাছে ফিরিয়া আসিল, এবং পিতাকে অনুগামী করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল।

রামপ্রাণবাবু গাড়ীর দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী-ধ্যানরত স্তব্ধ পুত্রকে বিদেশে নানাপ্রকার সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিলেন; তারে পৌছান সংবাদ দিতে বলিলেন, এবং গাড়ী ছুটিবার পূর্ব্বে, বলয় বিক্রয়ের বাকী পাঁচ টাকাও পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "এ পাঁচ টাকাও নিয়ে যাও; বিদেশে কত রকম দরকার হ'তে পারে; কিছু বেশী থাকা ভাল।"

গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী বাজিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ পিতৃদত্ত মুদ্রা পকেটস্থ করিয়া, পিতাকে কৃপা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা আছে ত?"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চলন্ত গাড়ীর সহিত চলিতে চলিতে রামপ্রাণবাবু বলিলেন, "তার দরকার নেই। এখনও লোদের তেজ হয় নি। এইটুকু পথ, আমি হেঁটে যেতে পারবো। তোমার ঐ পাঁচ টাকা বেশী থাকলে, বিদেশে তোমার কত কাযে লাগবে।" কথা কহিতে কহিতে, গাড়ীর বেগ আরও একটু বর্দ্ধিত হইল। রামপ্রাণবাবু আরও একটু বেগে চলিলেন, ছুটিলেন, কিন্তু বেগবান গাড়ীর সমকক্ষ হইবার তাঁহার আর ক্ষমতা কুলাইল না; তিনি চলন্ত গাড়ীর দিকে তাকাইয়া সজল লোচন বসনপ্রান্তে মুছিলেন।—হায় স্নেহান্ধ বৃদ্ধ, কবে তোমার চোখ হইতে দুরাশার মনোহর আবরণ খসিয়া পড়িবে? কবে তুমি তোমার সুশিক্ষিত পুত্রের সুশিক্ষার সন্ধান পাইবে?

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—চৈত্র ১৩৩১।

বাঙ্গলার গীতি-কাব্য—বৈষ্ণব-কাব্য—'বাঙ্গলার কবি গোবিন্দদাস'—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ক্রমশঃ প্রকাশ্য আলোচনা। এবার পড়িয়া আমরা হতাশ হইলাম। প্রথমেই লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—'মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝাঁকে বাদ দিয়া ঐ নামে কয়েকজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি ছিলেন। গোবিন্দ সেন কবিরাজ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি, শ্রীনিবাস ঠাকুরের পুত্র গতি গোবিন্দ, আর একজন কবি গোবিন্দ ঘোষ ও গোবিন্দ বসুর নাম পাওয়া যায়। শেষের তিনজন কবি কোন কোন পদে নিজেদের নাম স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, সেই কয়টী পদে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। বাকি সমস্ত পদেই শুধু গোবিন্দদাসের নাম। কোন্ গোবিন্দদাস কে, তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়।' প্রবীণ লেখক মহাশয় এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি যে চক্রবর্ত্তী কবির, এ ধারণা তাঁহার কিরূপে হইল? এইরূপ ফাঁকা কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বা অন্য কোনরূপ প্রমাণদ্বারা তাঁহার একথা সমর্থন করেন। লেখক মহাশয়ের মত বৈষ্ণব-সাহিত্য-রসিক একথা কিরূপে লিখিলেন যে, "ওহে শ্যাম তুঁ বড় সুজন জানি"—ইত্যাদি পদটী বিরহের অবস্থায় রাধা বলিতেছেন? তিনি কি জানেন না যে, এই পদটি 'সাক্ষাৎ আক্ষেপানুরাগে'র একটী প্রসিদ্ধ পদ। "বাঙ্গলার বিপ্লব-কাহিনী"—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগোই। এখনও চলিতেছে। "বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ধারা"—(২) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ ধারা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে চলিতেছে। তাঁহার নিকট আমরা আরও একটু বিস্তৃতভাবে গদ্য-সাহিত্যের ধারা দেখিতে চাই। অনেক প্রাচীন লেখকের ভাষা ও ভাবের সহিত তিনি আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতে ভুলিয়া যাইতেছেন। প্যারীচাঁদমিত্র ওরফে টেকচাঁদঠাকুরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ইতঃপূর্ব্বে সাধারণের ধারণা ছিল, গ্রাম্য কথিত ভাষায় কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করা যায় না। টেকচাঁদ এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য এই অভিনব ভাষায় সৃষ্টি করিলেন। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত শব্দবহুল বিদ্যাসাগরী ভাষার উপর অম্লমধুর কশাঘাত করিবার জন্যই আলালী ভাষা'র সৃষ্টি।' কথাটা কি ঠিক? ভাষা একদিনে সৃষ্টি হয় না। ভাষার ক্রমবিকাশ আছে। ভাষা ভাব প্রকাশের বাহন, সর্ব্বপ্রকার ভাব একরূপ ভাষায় প্রকাশ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়—স্বাভাবিকও নয়। লেখক মহাশয় অন্যত্র এই কথাই বলিয়াছেন—'আমার মনে হয়, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষাও গুরু গম্ভীর হওয়া আবশ্যক। * * আবার লঘু বিষয়ের জন্য লঘু ভাষাও প্রয়োজন।' ভাব প্রকাশের অস্বাভাবিকতার জন্যই আলালী ভাষায় লেখক মহাশয়কে এপথ ধরিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে এ ভাষার সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় পূর্ব্ব হইতে ভাব প্রকাশের এ অভাব অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, অনেকেই দূর করিবার উপায়ও চেষ্টা করিতেছিলেন, শেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—টেকচাঁদ ঠাকুর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ৺ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় বিরচিত 'কলিকাতা কমলালয় প্রথম তরঙ্গে'র ভাষা উল্লেখ করিতে পারি। এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। নগর-বাসী ও পল্লীবাসীর কথোপকথন ছলে কলিকাতা বাসীদের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতি নানা বিষয় এ পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। পল্লী-বাসীর ভাষা সংস্কৃতবহুল, আর নগরবাসীর ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা। ৪২ পৃষ্ঠা হইতে একটু তুলিয়া দিতেছি:—"ন উঃ—ওহে ভাই শুন, এ বাঙ্গলা দেশ, এস্থান বড় কঠিন তাহার মধ্যে বিশেষত কলিকাতা এখানে কোন অংশে লোকের অনুরাগ পাওয়া ভার, যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি অধিক দান করেন তবে তাঁহাকে কহে খরাইয়া গেল। ইহার কি বিষয় হইবেক, এ প্রকার দান করিয়া কত লোক দরিদ্র হইয়াছে তাহার সাক্ষী অমুক হালদার প্রভৃতি গিয়াছেন। যদি কেহ দান না করেন

তবে তাঁহাকে বড় মানুষ যদি কেহ বলে তবে অন্য ব্যক্তি কহে রাম রাম বল তাহার নাম মুখাগ্রেও আনিও না সেটা কৃপণের শেষ কৃতঘ্ন তাহার নাম করিলে সে দিন ভাল যায় না, তার অন্য লোককে দেওয়া দূরে থাকুক আপনি খায় না পরে না।" ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তৎপরে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, 'আলালের ঘরের দুলাল ও বিজয় বসন্ত' বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস।' শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় আরও বলিয়াছেন বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়। এ দুইটা সিদ্ধান্ত কিন্তু এখনও অবিসংবাদী সত্য বলিয়া স্থির হয় নাই। 'তর্করত্ন মহাশয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব নাটক রচনা করেন, ইহাই সর্ব্ব প্রথম নাটক।' আচার্য্যদেব যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সাহিত্য পরিষদে যাইতেন, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে রচিত তারাচরণ শীকদার প্রণীত' ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের কথা জানিতে পারিতেন ও প্রথম বৎসরের ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত সম্পাদিত 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গলার সাহিত্যের অনেক কথাই জানিতে পারিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—'এখন আমরা গল্পের বইয়ের কথা আলোচনা করব। ১৮৩৮—৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙ্গালায় গল্পের বই বের হয়। বই দু'খানির নাম শুনলেই তা'দের সম্বন্ধে বেশ ধারণা হবে। এ'দের একখানির নাম "নলবাবু বিলাস", আর একখানির নাম "নববিবি বিলাস"। এ সব বই এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। "নববিবি বিলাস" আমি একখানা পেয়েছিলাম; তাতে প্রথম ও শেষ দিক নেই, মাঝে কয়েক পাতা মাত্র ছিল। প্রথম যারা গল্প লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, অনুবাদই প্রায় তাঁদের অবলম্বন ছিল।' অবশ্য 'নববাবু বিলাস' বা 'নববিবি বিলাস' এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেখিবার সুবিধা হয় নাই। সে সম্বন্ধে আমার এখনও কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। অন্যত্র ঐ প্রবন্ধে অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয় টেকচাঁদ ঠাকুর কৃত 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বাংলার প্রথম মৌলিক গল্পের বই বলেছেন। খণ্ডিত 'নববিবি বিলাস' তিনি একখানা দেখিয়া ছিলেন, 'নববাবু বিলাস' তিনি দেখেন নাই; কি করিয়া সে পুস্তক সম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন যে সেটাও অনুবাদ গ্রন্থ মাত্র। যাহা হউক, এ বিষয়ে যতদিন আরও অধিক আলোচনা না হয় ততদিন প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিকে প্রথম উপন্যাস বা প্রথম নাটক বলিয়া ঘোষণা করা সমীচীন নয়। ছাপার ভুলে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের স্থানে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, লিখিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বাঙ্গলা ভাষার পরিণতি লেখক মহাশয় যে ভাবে দেখাইতেছেন, তাহাতে তিনি যে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিতেছেন তাহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। 'দুগ্ধ শিল্পের ভবিষ্যৎ' —শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত। এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা যতই বৃদ্ধি পায় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। ইহাতে অনেক জানিবার কথা আছে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ প্রসঙ্গ'—অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রবন্ধের নামকরণ হইতেই আলোচিত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য পণ্ডিতের নিকট হইতে কেবলমাত্র বঙ্কিমবাবুর মত শুনিতে ইচ্ছা করি না। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে পারিলে ভাল হইত। আজিকার দিনের বর্ণ-বৈষম্য ঘটিত ও শুদ্ধি-বিষয়ক আলোচনাকারীরা যদি বঙ্কিমবাবুর মতটা একটু পড়িয়া দেখেন, তাহা হইলে উপকৃত হইবেন। লেখক মহাশয়ের সহিত আমরাও বলি, 'বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ অতীত যুগ বা প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। নির্ব্বিচারে প্রাচীন সকল বিধি-ব্যবস্থা, মত ও বিশ্বাসের তিনি সমর্থন করিতেন না।' আমরা আরও বলিতে চাই, বঙ্কিমচন্দ্র ভাবের অগ্রদূত ছিলেন। সামাজিক অনেক সমস্যার সমাধান তিনি করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, কারণ তখন তাঁহারাই ভারতবর্ষের শিক্ষক ছিলেন—জ্ঞানের ধারাকে তাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ত্যাগের মহিমা তাঁহারা হৃদয়ে অনুভব করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন; কিন্তু তিনি কেবলমাত্র জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের সমাদর কোন দিন করেন নাই। তাঁহার কথায় বলি, —'যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব, যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ভক্তি করিব।' বাস্তবিক ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারে তাঁহার উদার মত দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আজিকার দিনের শুদ্ধি-সংস্কার (Sudhi movement) তাঁহার 'আর্য্যকীরণ' ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'দ্বৈত শাসন সংস্কার'—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাময়িক প্রসঙ্গ উপলক্ষে লিখিত সুন্দর প্রবন্ধ। 'জীবন ও শিল্পে'—শিল্পী যোগেশচন্দ্র রায় এবার ব্লাউজের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্যশাখার সভাপতির বক্তৃতা। আয়তনে ইহা বড় নয়। শ্রোতা বা পাঠক দিগের ধৈর্য্যের সীমা ইহা লঙ্ঘন করে নাই; কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য, তাঁহার মত লোকের নিকট হইতে তাঁহার ও তৎপক্ষীয় তরুণ সাহিত্যিক দিগের ওকালতী আমরা সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে শুনিতে চাহি নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি বা প্রসার সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা কিছু শুনিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম; সাধারণভাবে অন্ততঃ তিনি কিছু না বলিলেও, তিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সে বিষয়েও অর্থাৎ কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি তাহা জানিতে পারিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার স্থান যাহা পাইয়াছি তাহা সাহিত্য শাখার কোন প্রবন্ধ লেখকের প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে অপর কেহ আলোচনা করিতে পারিবে না জানিয়া, অপর পক্ষকে তাঁহাদের মত-সমর্থন জন্য সুযোগ বা অবকাশ না দিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া নিম্নস্থ নিরস্ত্র শত্রুদিগকে আক্রমণ করা ভারতীয় যুদ্ধ-নীতির অনুমোদিত নয়।

প্রথমেই শরৎবাবু আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার 'চুল ও বুদ্ধি দুইই পেকে সাদা হয়ে উঠেছে।' তার পরেই তিনি বলেছেন, 'তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ পতাকার আহ্বান আমাকে মানতেই হবে।' মুন্সীগঞ্জ সভাপতি-মনোনয়ন ব্যাপারে নবীন দলের হাত কতটুকু ছিল, আর প্রাচীনদের হাতই বা কতটুকু ছিল তাহা সঠিক জানিতে না পারিলে আমরা নবীনদলেরও জয় ঘোষণা করিতে পারিব না। 'অপ্রত্যাশিত মনোনয়নটা' তাঁহার বিনয়-ভাষণ মাত্র—আমরা জানি তিনি সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন তাহার মূল্য কত। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন,—'প্রায় বছর দশেক পূর্ব্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যেকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি। 'অবশ্য রামের সুমতি, ১৩১৯ সালে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁহার 'বড় দিদি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত কি হয় নাই? অবশ্য 'দেবদাস' ও 'মন্দির' বহু পূর্ব্বের লেখা। তিনি বাঙ্গলার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর দশেকের ঘটনাই জানেন। ইচ্ছা থাকিলে তিনি ইহার পূর্ব্বের ঘটনাও জানিতে পারিতেন। আর তাঁর অভিভাষণে দশ বৎসরের কি কি ঘটনা তিনি যে বলিয়াছেন, তাহাও ত দেখিতে পাইতেছি না। অন্যত্র তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যকদের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়?' কেন? তাঁহার অপরাধ কিসে? তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার মাথায় চুল ও বুদ্ধি পাকিয়াছে, আর আমরা জানি তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি বয়সে নবীন নহেন। তিনি কি প্রাণে এখনও নবীন বলিয়া নবীনের দলে প্রবেশ করিতে চান? কি কারণে তিনি নবীন দলের মুখপাত্র হইলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই? রবীন্দ্রনাথ কোন দলের? নবীন বা প্রবীণ দলের? তাঁহার অপরাধ-নিষ্কৃতি-প্রয়াসের জন্য তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা করিব। তাঁহার এ প্রয়াস যে বিফল হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য গোটা কতক কথা বলিতে চাই। তিনি বলিতেছেন, 'প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাবে ও আদর্শে, এমন কি প্রায় সকল বিষয়েই। আর্টের জন্যই আর্ট, একথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলি নি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।' একথাটা কি ঠিক? গত পৌষ মাসের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত নদীয়া শাখা সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন পঠিত 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন শুনুন,—'আর এই ঐশ্বর্য্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায় —art, morality এবং ধর্ম্মে। এ তো একজনের হতেই পারে না—এ বিশ্ব মানবের সম্পত্তি। জেনে এবং না জেনে মানুষের চেষ্টা এই সম্পত্তি এই কাম্য বস্তুর দিকে অবিশ্রাম চলেছে,—এ বিশ্বাস আমার কিছুতেই ভুল নয়। অতএব যা অসুন্দর; যা immoral, যা অকল্যাণ কিছুতেই তা art নয়, moral নয়, ধর্ম্ম নয়। Art for art's sake কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হ'তে পারে না, এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটা কিছুতেই সত্য নয়;—শত সহস্র লোকে গলা ফাটিয়ে তুমুল শব্দ করে বল্লেও সত্য নয়।' যদি কথাটার তাৎপর্য্য আজ পর্য্যন্ত তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে কয়েক

মাস পূর্ব্বে এসব কথা কি তিনি না বুঝিয়া তোতা পাখীর মত শোনা কথা বলিয়া গিয়াছেন? নবীন ও প্রবীণের বিরোধ দেখাইতে গিয়া শরৎবাবু লিখিয়াছেন, 'সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য সেবীর সহিত প্রাচীন পন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটু বাক্যের সূত্রপাত হয়েছে।' এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাহের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নবীন সাহিত্যিকদের ভিতর কয়জন বিধবার বিবাহ দিবার সাহস দেখাইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন? 'চরিত্রহীনে' শরৎবাবু সাবিত্রী বা কিরণময়ীর বিবাহ দেন নাই—'পল্লী সমাজে', 'রমা ও রমেশের' বিবাহ দিতেও সাহস পান নাই। 'বড় দিদি'তেও সুরেন্দ্র ও মাধবীর বিবাহ দেন নাই। তাঁহার কথাতেই বলি, 'রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না, তার পরিণাম হল এই যে, এই বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল।' কিন্তু আমরা বলি তাঁহার সৎ সাহস থাকিলে তিনি বিবাহ দিতেন—আর এরূপ করাই তাঁহার উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। বিবাহের ন্যায় পবিত্র জিনিস আর কি আছে? তিনি রমার ব্যর্থ জীবনের চিত্র কেন অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তিনিই নির্দ্দেশ করিতে পারেন। নর নারীর ভালবাসা স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে পবিত্র জীবন বহন করা দুরূহ। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, প্রভাতকুমার চারুচন্দ্র, এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষাও সৎ সাহস দেখাইয়া বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। কৈ সমাজে তাঁহাদের কেহ এই কার্য্যের জন্য নিন্দা করে নাই। অন্ততঃ নিন্দামূলক সমালোচনা ত পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিধবার বিবাহ দিতে শরৎবাবু পারেন নাই, বোধহয় সমাজ জিনিষটাকে তিনি দেবতার মতই মানেন অথচ মুখে বলেন মানি না। কবিরা ভাবের অগ্রদূত। যখন তিনি 'পল্লী সমাজ' বা 'বড়দিদি' লিখিয়াছেন, তাহার বহু পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত মনীষীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র এপথে অগ্রসর হন। যা'ক্—তাঁহার আর একটা কথা আলোচনা করিতে চাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?" এখানে তিনি বিনাপ্রমাণেই কথাটাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। জানি না কোন্ অনুভূতি বলে বা সংস্কারবশে অথবা দূরদৃষ্টিফলে তিনি এইসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। আর একটা কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। সকল সত্যের কি সাহিত্যে স্থান থাকা উচিত, না তাহা সাধারণে প্রচার করা আবশ্যক? ভারতবর্ষে চিরদিন সতীত্বের পূজা প্রচলিত। সতীর মহিমা ভারতবর্ষের কাহিনীতে গল্পে, গাথায়, সাহিত্যে, কাব্যে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। ভারতে এ সতীত্বের মহিমা বুঝাইবার প্রয়োজন নূতন করিয়া আর হয় না। শরৎবাবুর নূতন আবিষ্কৃত সত্য একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব ঠিক এক বস্তু নয়, তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে! একনিষ্ঠ প্রেম সতীর যে অন্যতম লক্ষণ তাহাও দেখিতেছি তাঁহার নিকট নূতন জিনিষ, বিবাহিত নারীর স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমই তাহাকে সতীপদ বাচ্য করিয়া তুলে। সতীর অন্য সহস্রবিধ গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু পতির প্রতি প্রেমের নিষ্ঠাই যে প্রধান গুণ, তাহা অস্বীকার আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসীই করেন নাই।

পরিশেষে শরৎবাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—'সাহিত্যের সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে এলাম। যেটা তার চেয়েও বড় এর আনন্দ এর সৌন্দর্য্য, তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না।' সাড়ে চারি পৃষ্ঠার উপর আরও অর্দ্ধ কিংবা একপৃষ্ঠা এ সম্বন্ধে বলিলে সকলেই আগ্রহ করিয়া শুনিত। তিনি ইচ্ছা করিলেই বলিতে পারিতেন। এখন একটা কথা বলিয়া আমরা এ আলোচনা শেষ করিতে চাই। শরৎবাবু বলিয়াছেন,—'মাস কয়েক পূর্ব্বে পূজাপাদ রবিবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, এবারে তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয় ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্ত্তে গল্প? আমি একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়াছিলেন, সে ঢের ভাল। এর অধিক আর কিছু তিনি বলেন নাই।' এই প্রবন্ধ যিনিই মনোযোগের সহিত পড়িবেন তিনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত হইয়া ঐ কথাই বলিবেন, গল্প লিখিয়া শরৎ বাবু সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই করিতে থাকুন, দায়িত্ব বিহীন সমালোচকদের দলে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টা তাঁহার না করাই ভাল। যে বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি ও সংযম থাকা সমালোচকের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা এই প্রবন্ধে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ

জয়দেব—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন। ভক্তকবির জীবন-চরিত ও কাব্য সুন্দর ভাবে আলোচিত হইতেছে। লেখার ভিতর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধে বাঙ্গালী—ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র এম্ বি। বিগত মহাযুদ্ধে বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালী যে সাহস ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে তাহা পাঠ করিয়া লেখক মহাশয়ের সহিত সত্যই বলিতে হয়,—'এ সময় বাঙ্গালী তাহার চিরন্তন জড়তা জঞ্জালের মত ঠেলিয়া হঠাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল, ইহার কারণ কি? ইহার মূলে সত্যকার একটা সাড়ার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ছোট কাজ করিতে বাঙ্গালী অপমান বোধ করে নাই—বাঙ্গালী পলটনে, জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারী ও ইলেক্‌ট্রীক কাজে সর্ব্বত্রই সাহসের পরিচয় দিয়াছে, এমন কি অবলীলাক্রমে এরোপ্লেনে চড়িয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এ বিভাগে দুইজন মাত্র বাঙ্গালীর—ফ্লাইট কাপ্তেন বানার্জ্জী এবং ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অবস্থা বিশেষে সে অবস্থার দাস হইয়া পড়ে নাই। আনাতোলিয়ার ভীষণ শীতে (—২ ডিগ্রী ফা) থাকিয়াও সে জমিয়া যায় নাই।' পরিশেষে লেখকের সহিত আমরাও বলি,—'মেকলের তুলিকায় অঙ্কিত বাঙ্গালীর সে প্রতিকৃতি এখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে; এবং উন্নতবক্ষ, উদ্দাম তেজ, অসীম মনোবল আবার পুরাকালের ন্যায় গম্ভীর অথচ দৃঢ় স্বরে বলিতেছে—বন্দে মাতরম্!' খৃষ্টান তীর্থরাজ পাদোহ্বা—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম এ। সচিত্র মনোজ্ঞ ভ্রমণ কাহিনী। এইরূপ ভ্রমণ কাহিনী হইতে অল্পায়াসে দ্রষ্টব্য স্থানের ইতিহাস ও তত্রত্য নরনারীদের আচার ব্যবহার জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত সৃজনন'থ মৌস্তফী মহাশয় এবার 'মহম্মদপুর'-কাহিনী শেষ করিয়াছেন। বীরত্বের লীলাভূমি সীতারামের বড় সাধের মহম্মদপুরের অনেক কথাই এই সচিত্র প্রবন্ধে আছে। 'অষ্ট্রীয়া' সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। নারী প্রসঙ্গে ইসলাম—শ্রীযুক্ত মহম্মদ অবদুল্লাহ। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে নারীর যে উচ্চ স্থান ও মর্য্যাদা ছিল তাহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'তেরশত বৎসর পূর্ব্বে মুসলিমদিগের মাতা পত্নী ও কন্যাদিগকে মুহম্মদ যে সম্মান দিয়া গিয়াছেন, প্রতীচ্যে আইনে আজ পর্য্যন্ত তাহা সাধারণ ভাবে নারীর প্রাপ্য হয় নাই। ইসলামে সৃষ্টিকর্ত্তার পরে মাতা অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মানের পাত্র আর কোন ব্যক্তিই নহে। নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নারী ইচ্ছামত নিজের সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব বা তাহার ব্যবহার করিতে পারেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মত ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না। দুশ্চরিত্রতা বা ব্যভিচারের জন্য কেবল নারীকেই সমাজ-চ্যুত করা হইত না, লম্পট পুরুষও সমাজচ্যুত হইত। বিবাহের পূর্ব্বে যৌতুকের ব্যবস্থা আছে, ইহা স্ত্রীর প্রাপ্য। কোরাণের আদেশ—নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। যে নারীকে বিপথে যাইতে শিক্ষা দেয় সে আমার পথের পথিক নহে। ** স্ত্রীরা স্বামীদের পরিচ্ছদ ও স্বামীরা স্ত্রীদের পরিচ্ছদ।' গার্হস্থ্য জীবন ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির কথাও সুন্দর ভাবে এ প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গে—শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ 'হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা' ও শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশী বি-এল 'পতিত সমস্যা'—আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্গবাণী—বৈশাখ

গ্রামের কথা—শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। গ্রাম-সংস্কার লইয়া আজকাল অনেকেই অনেক কথা বলেন; কিন্তু অবহিত ভাবে সে গুলির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল লেখকদিগের গ্রামের সহিত পরিচয় খুবই অল্প। এই লেখক মহাশয়ের গ্রামের সহিত পরিচয় যে আছে, গ্রামের সংস্কারের জন্য তিনি যে চিন্তা করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। লেখক মহাশয় একটা খুব সত্য কথাই বলিয়াছেন,—'দ্রব্যোৎপাদকই জাতির মেরুদণ্ড। আর বাঙ্গালার প্রধান উৎপাদক কৃষক। এই কৃষক মানুষ না হইলে দেশটা উৎসন্ন যাইবে। তাহাদিগকে মানুষ করিতে হইলে—ভূমি, শ্রম ও মূলধন এই তিনটার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে অথবা গ্রাম ছোট হইলে দুই তিনখানি গ্রাম লইয়া একটী সমবায় সমিতি স্থাপিত করিতে হইবে। কৃষকদিগকে মূলধন দিবার, বীজ সংগ্রহ করিবার ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তবে কৃষক মহাজনের আশ্রয় ভিক্ষা না করিয়া অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে। সমবায়ের পরিসর বৃদ্ধি পাইলে, ভূমিজ পদার্থ হইতে শিল্পজ পদার্থের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ কৃষির সহিত শিল্প জড়িত কৃষক ও শিল্পীর অভাব দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন। তাহার জন্য অর্থ চাই। এ অর্থ তাহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে। শুধু যন্ত্র

হইলেও চলিবে না। ভূমি ও ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। সমবায়ের কার্য্যে কৃষকের অবস্থা উন্নত হইতে পারে।' লেখক মহাশয় পরিশেষে যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—'হিন্দু মুসলমান সমস্যা পল্লীগ্রামে এখনও ততটা উৎকট ভাব ধারণ করে নাই। এখন যেমন হিন্দু মুসলমান এক রৌদ্রে ধান শুকায়, এক পুকুরে জল খায়, এক রাস্তা দিয়া হাঁটে, এক স্কুলে পড়িতে যায়, এক সঙ্গে বসিয়া গ্রাম্য সুখ দুঃখের আলোচনা করে, শিক্ষিত লোকের সহযোগিতা এই সম্বন্ধ খারাপ করিয়া না দিয়া কি আর ভাল করিয়া দিতে পারিবে না?' কথাটা খুব সত্য। আমাদের মনে হয় এখন পল্লীগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তুলিবার কোন প্রয়োজনই নাই; নিরক্ষর কৃষকদিগের উন্নতি যাহাতে হয় সেই দিকেই সংস্কারক দিগকে অবহিত হইতে হইবে।—এবারও রামগোপাল ঘোষ, আশুতোষের জীবন চরিত, ও তিলক চরিত তিনটী জীবনবৃত্ত ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ।—সংস্কৃত ভাষা-বিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ। লেখক মহাশয় সরল ভাবে আপনার বক্তব্য বুঝাইতে পারেন নাই। তিনি বাহ্যধ্বনির কারণরূপী 'চিন্ময়' শব্দকে বুঝাইবার জন্য বৈয়াকরণগণের স্ফুট বাদের আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ—শ্রীযুক্ত কলিঙ্গনাথ ঘোষ। 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন' সম্বন্ধে মহাত্মার মত গুলি এবার আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। 'জাতিভেদ—স্বদলে'—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। লেখক মহাশয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, পৃথিবীর সকল দেশেই যদি প্রাকৃতিক নিয়মে জাতিভেদ জন্মিতে পারে, তবে ভারতবর্ষের মত ইউরোপে এক একটী জাতি চিরস্থায়ী-রূপে বংশাবদ্ধ হয় নাই কেন? এই 'কেন'র উত্তর আলোচনা-সাপেক্ষ। লেখক মহাশয় বলেন,—'ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ; রুসদের দেশ বাদ দিলে বাকি সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে বড় নয়। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে বহু জাতীয় লোক আপনাদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিয়া অন্যের সঙ্গে বিনা বিবাদে বাঁচিয়া থাকিবার মত আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। এ দেশে ইউরোপীয় ধরণের দেশ জয়ের অভিনয় হয় নাই। এ দেশময় সকল লোকের স্বার্থে উদ্দীপ্ত হইয়া একটী দেশ বিশেষের 'একটি জাতির' লোকরা একলক্ষ্যে দল বাঁধিয়া কখনই জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয় নাই; কাজেই নীচ জাতির লোকদের মূল্য ও আদর বাড়িয়া উচ্চ ও নীচের মধ্যে প্রভেদ ভাঙ্গিবার পথ হয় নাই।' বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজ-নামচা—শ্রীসুন্দরীমোহন দাশ। এবারকার লেখা পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। বৃদ্ধ ডাক্তার মহাশয়ের মনে রাখা উচিত যে, তিনি কেবল মাত্র ডাক্তারী ছাত্রদের জন্য লিখিতেছেন না। সাধারণের জন্য লিখিত প্রবন্ধে ব্যভিচারের জঘন্য কথা যত না থাকে ততই ভাল। শ্লীলতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বলিলে, সমাজের উপকার করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে অপকার করিয়াই বসিবেন।

প্রবাসী—বৈশাখ

পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ডায়েরী' বা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার ও ভাবের বিবৃতি এ দেশের লোক বড় একটা রাখে না। পাশ্চাত্য জগতের মনীষীরা প্রায়ই 'ডায়েরী' বা রোজ নামচা রাখেন। সুকবি ও সুলেখক নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রে 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী' যখন লিখিতেন, তখন আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। তারপর বহুদিন ঐ ভাবের 'ডায়েরী' পাঠ করি নাই। অধুনা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী' পাঠ করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছি। চিন্তার গভীরতায় ভাবের উদারতায় ও প্রকাশের ভঙ্গিমার নূতনত্বে এ ডায়েরী অপূর্ব্ব হইয়াছে। মাঝে মাঝে কবিতাগুলি বড়ই সুন্দর,—উপভোগ্য। কবিবর পৃথিবীর বহুদেশই ভ্রমণ করিয়াছেন। বহুদেশের নর-নারীর প্রেমের কাহিনী শুধু তিনি পাঠ করেন নাই, স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধাও পাইয়াছেন; কিন্তু এই ভারতের নারীর প্রেমই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ভাল লাগা ও ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিয়ে তাঁহার কথায় আমরা সঙ্কলন করিয়া দিলাম:—'বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল্ আছে; ভালোলাগা আর ভালোবাসা, এই দুটো শব্দে আছে প্রেম সমুদ্রের দুই উল্টোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগে সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসা। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালো লাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধনা। * * কারো পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভাবে হ'য়ে ওঠে, ভালোভাবার ভালো ইচ্ছায় মন কানায় কানায়

ভর্ত্তি হয়, তখন তারেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা।

"ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপের (personality) পরম প্রকাশ। * * এই অনুভূতির পূর্ণতা একটী শক্তি। ভালোবাসার বিষয়ের মধ্যে অসীমকে বোধ করিবার শক্তি, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে সীমার মধ্যে জাগিয়ে তোল্‌বার শক্তি। * * বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে, প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এ সমস্ত সত্তাটার অনুবাদ হচ্ছে প্রেম। মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজেকে সাধারণের সামিল ক'রে অলস হ'য়ে বসে থাকে, প্রেম ব্যক্তি-বিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না; তাকে অর্থ দিয়ে বলে তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েছি তুমি অসাধারণ।

"ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী। ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা যেত তা হ'লে দেখ্‌তে পেতাম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কি কাজ করেছে। শক্তির যে ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল, আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, একান্ত যে ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনিনে। বিস্ময়ের কথা এই যে বিশ্বের স্ত্রী-প্রকৃতিকেই ভারতবর্ষ শক্তি বলে জেনেছে।

"সকলেই জানে এই শক্তির বিকারের মত এমন সর্ব্বনেশে বিপদ আর কিছুই নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দ্রৌপদী বল জুগিয়েছেন। বীর আণ্টনির হৃদয় অধিকার করে ক্লিওপেট্রা তাঁর বল হরণ ক'রে নিল। সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন সাবিত্রী। যে প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না, পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায়, সে-প্রেম ত রিপু!

"স্ত্রীপুরুষের প্রেমেও সেই এককথা। নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত করতে পারে কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়, নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম্ম সেবাধর্ম্ম—সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আরেক সুরও বাজ্‌তে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টঙ্কার, সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সঙ্গীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।"

"রক্তকরবী"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রক্তকরবীর নানারূপ ব্যাখ্যা বাহির হইতে দেখিয়া কবিবর স্বয়ং পাঠকদিগকে জানাইয়া দিতেছেন, গোপন অর্থ বাহির করিবার প্রয়াস না করিয়া সাহিত্যরসপিপাসুগণ যেন রস হিসাবে ইহা উপভোগ করেন। তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন, রামায়ণের আখ্যানভাগের সহিত রক্তকরবীর আখ্যানভাগের সমতা থাকিলেও তিনি উহা হইতে ঋণগ্রহণ করেন নাই। বিশ্বকবি বলেন—'আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রামায়ণ যেমন রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটীও রূপকনাট্য নয়। রক্তকরবীর সমস্ত পালাটী নন্দিনী ব'লে একটী মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, তেম্‌নি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন—তা হ'লে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। নয় তো রক্তকরবীর পাপ্‌ড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজ্‌তে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হ'লে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছেন যে, মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজসুখের, সেই সহজ সৌন্দর্য্যের।' কিন্তু আমাদের মনে হয় বেদান্তের ব্যাখ্যা যেমন সকল মতবাদীরাই ভিন্ন ভাবে করিয়াছেন, রক্তকরবীর পাঠকদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহার ব্যাখ্যা চলিবে। "রবীন্দ্রনাথের বাণী"—শ্রীমতী হেমলতা দেবী। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা হাস্যপরিহাসে, কথাসাহিত্যে, গীতিকাব্যে, সমালোচনায়, কবিতায় ও গানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন, দুইটা কারণে রবীন্দ্রনাথের লেখা সর্ব্বসাধারণের নিকট সহজবোধ্য নয়; 'প্রথমতঃ যিনি অনন্তের বার্ত্তা শুনাইতেছেন তাঁহার বার্ত্তা এত গভীর ও এত ব্যাপক যে, পরিষ্কার করিয়া রেখা টানিয়া তাহা বুঝান কঠিন; দ্বিতীয়তঃ তাঁর গদ্যপদ্য লিখিবার ভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।' "হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ"—লেখকমহাশয় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল উদার মতের আলোচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা হাওয়া বাঞ্ছনীয়। "বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য"—শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু। লেখক মহাশয় গর্কি ও শেখভ

সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদেশিক কলাবিদ্গণের আলোচনা দেশে যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। তাঁহাদের আদর্শের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে—তাঁহাদের নিকট হইতে নূতন ভাব সংগ্রহ করিতে না পারিলে জাতীয় ভাবসম্পদ বর্দ্ধিত হইবে না। "কারখানাবাদী ও স্বাচ্ছন্দ্যবাদী"—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়। চিন্তাশীল লেখক মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইয়া বলিতে চাই,—'আমরা যদি শেষ অবধি কারখানাই চাই, তাহা হইলে সে কারখানার মালিক হইব আমরাই। সে কারখানা-জীবন এরূপভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে একই স্থানে অথচ কাছাকাছি জায়গায় পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিক চালিত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়; অথাৎ যাহাতে পারিবারিক-জীবন ভাঙ্গিয়া না যায়। শ্রমিকদিগকে যাহাতে শুধু "ফ্যাক্টর অফ্ প্রোডাক্শন" অর্থাৎ উৎকর্ষ উৎপাদনের উপকরণ রূপে ব্যবহার না করা হয় যাহাতে ঐশ্বর্য্য উৎপাদনই যে তাহাদের উপকারের জন্য ইহা সর্ব্বদা প্রমাণ করিয়া দেখানো হয়, এমন সকল উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রমজীবীর বাসস্থান, খাদ্য বস্ত্র ও জীবনধারা যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে জাতির সকল মানুষের উৎকর্ষের মধ্যেই জাতীয় স্বাচ্ছন্দের স্থিতি এবং শুধু কারখানায় চিম্‌নি, কয়লার খনির সুড়ঙ্গ ও যন্ত্রের তীব্র ঝঙ্কার করিলেই সে উৎকর্ষ আবির্ভূত হয় না।'

দর্শন

প্রবাসী—বৈশাখ

"পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডায়েরীতে নূতনত্ব আছে। ইহা দিনপঞ্জী মাত্র নহে। কোনও জাহাজে বসিয়া বা কোনও সহরে পৌছিয়া এক এক দিন কবি তাঁহার চিন্তার ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাই এই ডায়েরী। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতা স্বভাব-সিদ্ধ। কখনও গদ্যে কখনও পদ্যে, কখনও প্রবন্ধে কখনও বক্তৃতায় এই চিন্তাশীলতা আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে! ডায়েরীতে যে সকল সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা দর্শন শাস্ত্রের বিচারে তুচ্ছ নহে। বর্ত্তমান সভ্যতার চাঞ্চল্য, প্রাণের বিকাশে আনন্দের স্থান, জীবনে নারীর সহযোগিতা প্রভৃতি অনেক তত্ত্বই তিনি, সুন্দর, সরল, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। দার্শনিকেরা যে সকল বিষয় জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলেন, কবি তাহা অনুভূতির দিক দিয়া উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ডায়েরীর সঙ্গে কতক-গুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়া ভাবধারাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই ডায়েরীতে বিশ্লেষণের বালাই নাই, রসের প্রবাহ আছে।

"ভারতীয় দর্শনের মূলধারা প্রবাহ"—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মিলনে দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ। যাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি কথার জালে সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন না। শাস্ত্রী মহাশয় অল্প কথায় ভারতীয় দর্শনের মূল সত্যগুলি অতি নিপুণতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, আত্মতত্ত্ব, অনাত্মতত্ত্ব—সবগুলি জিজ্ঞাসুর দিক দিয়া ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে তিনি যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান করা আবশ্যক; দেশের দার্শনিক চিন্তাগুলিকে পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব সংগ্রহ গ্রন্থে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা, যাহা সংগৃহীত হয় নাই, তাহারই সংখ্যা বেশী। তাই এখন নূতন করিয়া একখানি সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ লিখিবার প্রয়োজন আছে। ইহার উপ করণের অভাব নাই। কেবল সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃতে লিখিত ধর্ম্ম বা দর্শন শাস্ত্র গুলি অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মমত ও মধ্যযুগের প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত ধর্ম্মমতগুলির মধ্য হইতে উপকরণ আহরণ করিতে হইবে। মুসলমানেরা আমাদের নিকট-প্রতিবেশী, তাঁহাদের সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিতে হইবে। পারসীরাও অনেক প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। তাঁহা-দের নিকট হইতেও কিছু পাওয়া যাইবে। চীন ও তিব্বতে এককালে আমাদের গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল। সে সমস্ত মূলগ্রন্থ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে চীন ও তিব্বতীয় ভাষা হইতে ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। প্রথমতঃ সংস্কৃতেই ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।—অতি উত্তম কথা। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সর্ব্বাংশে সমর্থন করি।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র ১৩৩১

"মুক্তি ও ভক্তি"—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ তর্কভূষণ। প্রবন্ধটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং সমস্ত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। তবে তর্কভূষণ মহাশয় একা-

ধারে বৈদান্তিক পণ্ডিত, এবং ভক্তিশাস্ত্রের অধিকারী। এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এ দেশে বিরল। জ্ঞান ও প্রেমের, ভক্তি ও মুক্তির সমন্বয় ইহার দ্বারাই সম্ভবে। আমরা তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে ভক্তির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা শুনিতে উৎসুক হইয়া রহিয়াছি।

বিজ্ঞান

বঙ্গবাণী—বৈশাখ

"জীবের নিত্যতা"—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক মহাশয় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি মূলকথার আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হইয়াছে যে ইহাতে সাধারণ পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির কোনও সহায়তা করিবে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রবাসী—বৈশাখ

"দর্পণের কথা"—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধে লেখক কাচ প্রস্তুতের ও রৌপ্যপাতনের প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে দর্পণের ফ্রেম কি ভাবে তৈয়ারী হয় তাহাও পাঠকদিগকে জানাইয়াছেন। প্রবন্ধের যে অংশে কাচ প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে সেই অংশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, চুণ খনি হইতে আসে; কিন্তু চূণের পাথর (lime stone) খনি হইতে পাওয়া যায় ইহা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইত। কি ভাবে কাচ প্রস্তুত করা হয় সে সম্বন্ধে লেখক একটী অতি সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কোন কোনও স্থানে কাচ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাচের কারখানার একটি বিবরণ থাকিলে এই সন্দর্ভের মূল্য বৃদ্ধি পাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, পাঠকদের মনোগ্রাহী করিবার জন্য প্রবন্ধে ছবি প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু এই সমস্ত ছবিরও নির্ব্বাচন একটু বিবেচনার সহিত করা উচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দর্পণের ফ্রেম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লেখক মহাশয় সেগুন কাঠের যে কয়েকটী আলোকচিত্রের অবতারণা করিয়াছেন সেগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা গেল না। "কি আশ্চর্য্য জীবন কাহিনী এই সেগুন বৃক্ষের!" এই বাক্যটি সমস্ত প্রবন্ধ মধ্যে অত্যন্ত খাপছাড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধ হইতে যে moral সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধের শেষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠে ছেলেবেলার Wonderful pudding এর গল্প মনে পড়িয়া গেল। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার হস্তে এই প্রবন্ধ যাইবে তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এই moral টুকু না লিখিলেও চলিত।

ভারতবর্ষ—চৈত্র ১৩৩১ এবং বৈশাখ ১৩৩২

"নৃতত্ত্বে জাতি নির্ণয়"—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাতে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি চর্ব্বিত চর্ব্বণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে গুলিতে মৌলিকতা ও সজীবত্বের এত অভাব থাকে যে সাধারণতঃ পাঠ করিবার ইচ্ছা হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী, বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ অভিজ্ঞ ও পাকা ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। তবে মনে হয়, লেখক যেরূপ বৈজ্ঞানিক ধাৎ লইয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। প্রবন্ধের শেষ অংশে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি এই বৈজ্ঞানিক ধাতের উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। প্রবন্ধের উল্লেখিত দু'একটী বিষয় ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাভা দ্বীপে প্রাপ্ত Pithecanthropos erectus এর কথা বলা যাইতে পারে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "এই জীবের অস্থির পায়ের বুড়া আঙ্গুলগুলি মানবের সদৃশ ছিল।" কিন্তু যাভা দ্বীপের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোনওটীতে পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উল্লেখ নাই। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে আধুনিক যুগের স্তরে Pithecanthropos এর অস্থি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কি ঠিক? তিনি অপর স্থলে বলিয়াছেন যে, Seton Kerr সাহেব ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদি লেখক মহাশয় Seton Kerr এর এই আবিষ্কারের তারিখের উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত, কারণ Seton Kerr ব্যতীত আরও অনেকে বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রস্তরায়ুধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, নিয়াণ্ডার্থাল জাতি সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য জাতি। এই কথাটী ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। বর্ত্তমান যুগের মানুষ ও নিয়াণ্ডার্থাল জাতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য আছে এবং সেই ঐক্য বুঝাইবার জন্যই ইহাদিগকে এক গণ (genus) ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু নিয়াণ্ডার্থাল জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুই প্রকার জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা মানুষের ন্যায়

Homo এই গণের অন্তর্গত, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মানুষ ও নিয়াণ্ডার্থাল জাতি হইতে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকা হেতু ইহাদিগকে দুই ভিন্ন জাতির অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই কথা অবশ্য ঠিক যে শেষোক্ত এই দুই জাতি হইতে বর্ত্তমান মানুষের যতখানি পার্থক্য, নিয়াণ্ডার্থাল জাতি হইতে বর্ত্তমান মানুষের পার্থক্য সেই তুলনাতে কম।

কবিতা

প্রবাসী—বৈশাখ

"পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ডায়েরীর ভিতরে অনেকগুলি সুন্দর কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "না পাওয়ার উদ্দেশে" কবিতাটিতে যাহাকে পাওয়া গিয়াছে, 'অরুণ আভা'র মত আঁধারতীরে কবির মানস-স্বপ্নকে সে আসিয়া সগৌরবে চুম্বন করিয়াছে। বিশ্ব বাউলের একতারার ঝঙ্কার 'অ-ধর' হইলেও সোনার অক্ষরে ধরা পড়িয়াছে। 'আনমনার' উদ্দেশে লিখিত কবিতাটী রসের বিচিত্র আল্‌পনায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কবির ঈপ্সিত অনুকূল লগ্নের উদয় হইয়াছে, তাঁহার শান্ত-সুরের সান্ত্বনার গান কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে। মৌমাছির মধু সঞ্চয় উপলক্ষে লিখিত কবিতাটী মর্ম্মস্পর্শী। মৌমাছির লক্ষ্য মধুকণা মাত্র, বসন্তের ফুল-বন লুণ্ঠন করিয়া সে তাহার সৌন্দর্য্য ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই কবিতাটিতে উপমার রঙীন্ রসের ধারার সহিত আকাশের পেয়ালা হইতে অক্ষয় স্বর্ণ-আলোকের মধুর ঝরণা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। "বহুদিন মনে ছিল আশা" প্রভৃতি ছত্র গুলিতে কবির ধ্যানের আনন্দে আমরা তন্ময় হইয়াছি। "উদয়াস্ত দুই তটে" কবিতাটিতে কবি-হৃদয়ের বিজন পুলিনে বিরাট নিস্তব্ধতার মহাশঙ্খ মুখরিয়া উঠিয়াছে। 'পূর্ণতার সাধনার বনস্পতি চাহে ঊর্দ্ধ পানে'—কবিতায় ধ্রুবত্বের মূর্ত্তি মানস-নেত্রে প্রতিভাত হইয়াছে। সরল-সুন্দর উদার ভাষার ভিতর দিয়া কবির ভাবের দুন্দুভি অপূর্ব্ব ছন্দে ধ্বনিত হইয়াছে।

"সুন্দরের দূত"—শ্রীকালিদাস নাগ। রচনায় প্রাণের অভাব। "সুর-সমাপ্তি" কবিতায় লেখক শ্রীসুনীরকুমার চৌধুরী বিনয় ও নৈরাশ্যের ভাণ করিয়া আপনার কবিত্ব-শক্তির কথা অনর্গল উচ্ছ্বাসে লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস—একদিন তাঁহার কবিতা 'অভয়-ভৈরব রবে প্রভাতের দ্বারে হানা দিবে।' তথাস্তু।

আজকাল অনেক নূতন কবি নূতন নূতন ছন্দ লইয়া আসিতেছেন। কয়েকটি নূতন ছন্দ আমরা পাইয়াছি—যথা, ঘেটক, বেহালা, ও চরকী। শ্রীযুক্ত সজনীকান্তের দৌলতে আর একটি নূতন পাইলাম—হাপর ছন্দ। ভাষার কি বহর! গদ্যও হার মানিয়া যায়। কবিতার শেষাংশে তিনি সভ্যতাকে উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি সরল ও ভাববহুল। কবিতাটি ঐখান হইতে আরম্ভ করিলেই সুপাঠ্য হইত।

বসুমতী—চৈত্র ১৩৩১

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "সাহিত্য" কবিতাটী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। "ধূলি"—শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষের একটী সলনসই সনেট্। "বর্ষ-সংহার"—শ্রীমাখনলাল মৈত্র। এই কবিতাটীতে কবি 'কবিতা সুন্দরী'কে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। "চাতকী"—শ্রীমতী মোহিনী দেবীর চলনসই কবিতা। ফটিকজল পান করিবার নিমিত্ত চাতকীর যে একটা ব্যগ্রতা আছে, লেখিকার রচনায় তাহা পাওয়া গেল না। "গুণী ও গুণগ্রাহী"—পদ্য কি গদ্য কিছুই বোঝা গেল না। "বোধন"—শ্রীরামেন্দু দত্ত। কবিতাটীতে রস সম্যক্ ফুটিয়া উঠে নাই। "বসন্তে"—শব্দের ঝঙ্কার আছে—কিন্তু প্রাণে অনুভূতি জাগায় না। "মহাত্মা গান্ধী"—শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা। ছোট্ট কবিতাটী সরল ও সুন্দর। মহাত্মার মহত্ত্ব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। "সর্ব্বজ্ঞ"—শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী। বীণাপাণির সম্যক্ সম্মান কবি দিতে পারেন নাই। কবিতাটী বিশেষত্ব বর্জ্জিত। "পল্লী-জননী"—শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্তের ব্যর্থ রচনা। "গুণীর প্রয়াণে"—শ্রীকালিদাস রায়। সঙ্গীতাচার্য্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর তিরোধানে শোকের উচ্ছ্বাস মাত্র।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ

"অকূলে"—অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার রচিত। আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কবিতাটীর রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত যশ এরূপ কবিতা প্রকাশিত হইলে ক্ষুণ্ণ হইবে। "প্রার্থনা"—শ্রীরামেন্দু দত্তের ক্ষুদ্র কবিতা। ইহাতে কবিত্ব নাই। "ফাঁকি"—বন্দে আলি মিয়া। ইহার মধ্যে বিরহ আছে—মিলন আছে—কিন্তু উভয়ই ফাঁকি। কবির নামকরণের বাহাদুরী আছে। "মুক্তি বাঁধন"—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইহা মুক্তিও নহে বাঁধনও নহে। তবে তরুণলেখকের সহৃদয়তা আছে, চর্চ্চা রাখিলে

কবিত্বশক্তির স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। 'স্মরণে'—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। ইহাতে কবির গোপন ব্যথা প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যথার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'লর্ড কার্জ্জন'—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। চন্দে লিখিত সুখ-পাঠ্য গদ্য। 'তর্পণ'—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। এটি শোকের কবিতা। "আমার বাড়ী"—শ্রীমতী মানকুমারী বসু। এইটিই এবারকার ভারতবর্ষের কাব্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। আজকাল মাসিক পত্রিকায় কবিতার দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইতে হয়। "আমার বাড়ী" কবিতাটী মধ্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল। সর্ব্বপ্রথমেই ইহার স্থান হওয়া উচিত ছিল। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে মানকুমারীর পূর্ব্বযশ রক্ষিত হইয়াছে।

বঙ্গবাণী—বৈশাখ

"কর্ণিকার" শ্রীকালিদাস রায়। কবিতাটি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। কবির যশ এই কবিতার ভাবে ভাষায় ও ছন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কবি, খনির সোনাকে বৃক্ষের শাখে শাখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার ভিতর বেশ একটি নূতন ভাবের কনকরশ্মি মধুর ছন্দে দুলিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভাবের সঙ্গে ভাষার মিলনে ছন্দের মাধুর্য্য আরও মধুর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"বৈশাখের ঐ শাখে শাখে বনে ফুটিয়া উঠেছে
সোনার খনি
মাটির তলের সব সোনা আজি কাঙাল তরুরে
করেছে ধনী।
চারু পল্লব, শ্যাম বৈভব, ফল গৌরব ছিল না তার
একেবারে সে যে হয়েছে কুবের বহিতে পারে না
সোনার ভার॥
নব বরষের বরণের লাগি প্রকৃতি কি আজ সালঙ্কারা?
নবাভিষিক্ত বৈশাখ-শিরে কনক ছত্র ধরেছে কারা!
নভোগঙ্গার স্বর্ণ ধারাটি নামিল কোথা কি তরুর শিরে?
সোনার স্বপনে বন বনান্ত দিগ্ দিগন্ত ভরিল কিরে?"

কবি কবিতার মধ্যে দিয়া প্রাণ ভরিয়া সোণা বিলাইয়াছেন,—

কানে গুঁজে নেরে রাখাল বালক, চুলে গুঁজে নেরে
ব্যাধের মেয়ে।
বনবালাগণ মালা গেঁথে পর, কে আছিস কোথা
আয়রে ধেয়ে।

অনেকদিন কালিদাস বাবুর নিকট হইতে এমন সুন্দর কবিতা আমরা পাই নাই।

"নীলমণি"—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। ইহাতে কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই, তাহার উপর অত্যন্ত দীর্ঘ। ভাষায় ছন্দ ও মিলের একান্ত দৈন্য। এখানে দুইটি পদ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম।

"হয়ত তখন ছিল না আকাশ নীল
শুধু ছিল আলো রাশি
সারাটা শূন্য ঝ'লত গো ঝিল ঝিল
দশদিক উদ্ভাসি।

—ইহার সমালোচনার নিষ্প্রয়োজন।

"স্বর্গ ভ্রষ্ট"—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। এই কবিতাটির ভাব ও জিজ্ঞাস্য বিষয় কবিতার পক্ষে বড়ই গুরুগম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। কবি বোধ হয় ভাব-স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াই তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"কোথা আমি? একি ধরা ভাসিতেছে আকাশ-সাগরে!
হে নিবস্ত অনুভূতি! একবার জাগরে জাগরে!
কোথা হ'তে শূন্য পথে শ্যাম ধরা হইল উদ্ভূত?
আকাশ-সিন্ধুর এ কি আনন্দের অমৃত বুদ্বুদ?

—পাঠক ইহার উত্তর দিন।

"বসন্ত প্রয়াণে"—শ্রীমতী সুনীতি দেবী। ইহাতে কোন নূতন ভাব নাই।

"কপালকুণ্ডলা"—শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী। বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা অবলম্বন করিয়া লিখিত। কবিতাটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে কপালকুণ্ডলার সরল, চঞ্চল, সংসার-অনভিজ্ঞ বালিকা মূর্ত্তিটি চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

"সাঁওতাল" (আরবী ছন্দ—মন্ সয়া?) শ্রীযুক্ত গোলাম মোস্তফা মিঞা। কবিতাটি বেশ সুন্দর ও সরল হইয়াছে।

কথা-সাহিত্য

প্রবাসী—বৈশাখ

বৈশাখের "প্রবাসী"র একমাত্র নিজস্ব সম্পূর্ণ গল্প শ্রীমতী শান্তা দেবীর "পথের দেখা।" তা ছাড়া দুটি অনুবাদ আছে, ধারাবাহিক আছে। পথের দেখা ঠিক গল্প নয়, একটী ছোট্ট চিত্র। শ্রীমতী শান্তা দেবীর পাকা হাতের লেখা, কাযেই গল্পের execution এর সৌষ্ঠবে ত্রুটি নাই তা বলাই বাহুল্য। ঝর ঝরে ভাষায় অবাধে তিনি ছবির মত সব জিনিষ আঁকিয়া গিয়াছেন, আর তাঁর সুপরিচিত পরিহাস রসিকতারও পরিচয়

দিয়াছেন। কিন্তু গল্পটীর পরিকল্পনায় লেখিকার সুপরিচিত রসসমৃদ্ধির অভাব দেখা যায়। স্থানে স্থানে অসঙ্গতিও আছে। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেলে মন্দ লাগে না. কিন্তু তাঁর "শিক্ষার পরীক্ষা" প্রভৃতির মত মনের ভিতর কোনও দাগ রাখিয়া যায় না। গল্পের ভিতর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। নারীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া লেখিকা তাঁর চিত্রটির ভিতর বহুতর detail ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহা অল্প পুরুষের সাধ্য। বেশভূষা ও প্রসাধন হইতে আরম্ভ করিয়া জলশঙ্খের আকার ও ব্যবহার প্রভৃতির যে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আছে তাহা সম্পূর্ণ সত্যানুসারী কিন্তু বর্ণণার চাতুর্য্যে তাহা মনের পীড়া উৎপাদন করে না।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ

ভারতবর্ষে দুইটি সম্পূর্ণ গল্প আছে—দুইটিই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তার বেশী নয়। দুইটি গল্পেরই বিশেষত্ব এই—কলিকাতার চেকনাইদার ধোপদস্ত বাহিরের আবরণে যে ক্লেদময় পঙ্কিল জীবন আছে তাহাই এ দুটির উপজীব্য। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়ের "শিকার" গল্পে একটি ত্রিশ টাকা মাইনার কম্পোজিটারের খোলার ঘরের সংসারে উৎপীড়িতা স্ত্রীর একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আছে। লেখকের এ উদ্যম উৎসাহ পাইবার যোগ্য। বাঙ্গলা সাহিত্য আভিজাত্যের মোহ পরিত্যাগ করিয়া দীন দরিদ্রের সংসারের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলে সব দিক দিয়া ভাল হইবে। কিন্তু এ চেষ্টার পক্ষে দুটি জিনিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ লেখক যে শ্রেণীর কথা লেখেন সে শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হইলে তাঁর চিত্রগুলি অসত্য ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং যে লেখক এই পরিভূত জীবনের ছবি আঁকিবেন তাঁর সেই শ্রেণীর সঙ্গে খুব বেশীভাবে মেলা মেশা করা দরকার। না হইলে তাদের বাহিরের ব্যবহার তাঁরা যতই লক্ষ্য করুন তাদের অন্তরের পরিচয় পাইবেন না। আলোচ্য গল্পে লেখক নীলমণি বা সুধার মনের ঠিক সত্য পরিচয় দিতে পারেন নাই। যদি সে পরিচয় তিনি পাইতেন তবে দেখিতে পাইতেন, স্বামীর নিষ্ঠুরতা ও স্ত্রীর অসহায় ভাবের ছবির উপর এত অতিরিক্ত রঙ্ না চড়াইয়াও একটা পরম করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করা সম্ভব। দ্বিতীয় কথা এই যে, সব গল্পেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত—দরিদ্র—অবহেলায় লাঞ্ছিত দরিদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি শিক্ষিত ভদ্র সাধারণের সমবেদনা আকর্ষণ করা। খুব রং চড়ান লেখায় এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। গল্পের গাঁথুনী এবং বর্ণনায় এমন একটু সুকুমার কৌশল থাকা আবশ্যক যাহাতে মনটাকে নরম করিয়া আপনি ইহাদের দিকে টানিয়া লয়। "শিকার" গল্পটিতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। লেখকের হৃদয় আছে, কল্পনার জোর আছে, তিনি যদি দরিদ্র-জীবনটাকে খুব ভাল করিয়া আলোচনা করেন, তাদের সঙ্গে মিশিয়া তাদের ভিতরকার জীবনটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন, তবে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে রস সৃষ্টির একটা অপূর্ব্ব নূতন আকরের সন্ধান পাইবেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "রক্তের টান" সম্বন্ধেও এ সব কথা খাটে। তাঁর গল্পের উপজীব্য যে ভাব তাহা অত্যন্ত মামুলী হইয়া পড়িয়াছে। বড়লোকের ছেলে বখিয়া গিয়া গুণ্ডা হইয়া গেল। শেষে এক গুণ্ডা বন্ধুকে পোড়াইতে গিয়া শ্মশানে পুত্রের চিতা দেখিয়া আকুল হইয়া স্ত্রীর কাছে ফিরিয়া গেল—এ কাহিনী করুণ কিন্তু বৈশিষ্ট্য বিহীন। হারুর চরিত্রের ভিতর বিরুদ্ধ ভাবের পাশাপাশি সমাবেশ ফুটাইয়া তুলিলে মনোজ্ঞ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা ফোটে নাই। লেখককে আমরা এই অনুরোধ করি যে, যে মানুষের কথা তিনি লিখিবেন, রক্ত মাংসের জীবনে আগে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইবার যেন চেষ্টা করেন, তবেই তাঁর গল্প নানা সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র ১৩৩১

মাসিক বসুমতীতে চৈত্রে তিনটি ছোট গল্প আছে। "মোড়লের পো" শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লেখা। "ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়ান" বাতিকের একটী করুণ চিত্র। গল্পটির মধ্যে করুণ রস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ান হইয়াছে। গল্পের কলাসৌষ্ঠবের দিক হইতে রসের ধারা এত মোটা না হইলেই ভাল হইত। লেখক যেন একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়া অরসিকের চক্ষে রসের আলো ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। নতুবা গল্পটী বেশ; ভাষা ও চিত্রাঙ্কনে নারায়ণচন্দ্রের সহজ পটুতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। "কোন পথ?" শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের একটি গল্প। ভাবিয়াছিলাম না জানি কোন দুরূহ সমস্যা ইহাতে উত্থাপিত হইবে। কিন্তু সমস্যা যাহা আছে তাহা শিশুজন সুলভ। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তির নাট্যাভিনয় দেখিয়া লেখকের নীতিভয়াতুর চিত্তে যে সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁর চরিত্রের গৌরব যতই সূচিত করুক, ইহা আশ্রয় করিয়া তার ভিতর রসের কোনও ধারা প্রবাহিত হইয়াছে কিনা তাহা বুঝা গেল না; হইয়া

থাকিলে তাহা ভাষার দৈন্য ও কড়মড়ায়মান কঠোরতায় মাঠে মারা গিয়াছে।

"বেকারের বোকামী"—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। চাকরী-বুভুক্ষু বাঙ্গালা দেশে যে ক্ষীণ রস পিপাসা এখনও জীবিত আছে, তাহা ইহাতে কতকটা তৃপ্ত হইতে পারে। চাকরী নেওয়া না নেওয়া লইয়া যে চরিত্র গৌরবের আদর্শ লেখক ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বিষয় বস্তুর তুচ্ছতায় তাহা সম্যক্ মনোহারী হইতে পারে নাই।

চিত্র

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রধানতঃ মৌলিক ছবি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে। অন্যান্য আলোক চিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আবশ্যক মত অভিমত প্রকাশিত হইবে। এই সম্পর্কে গোড়াতেই দুই একটি কথা বলিয়া রাখা সঙ্গত। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ছবির সহিত গদ্য পদ্য রচনার এইটুকু প্রভেদ যে, ভাব প্রকাশের জন্য ছবি কোন ভাষা বিশেষের ধার ধারে না। সুতরাং ইহা দ্বারা যে বস্তু সৃষ্ট হয় তাহা গদ্যপদ্য রচনার দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ হইতে অধিকতর ব্যাপক। সুতরাং তাহার আলোচনা সমধিক কঠিন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ছবি জিনিসটা দর্শকের নিতান্তই মানসিক অনুভূতির বিষয়। পরন্তু এই অনুভূতি দর্শকের cultural perceptionএর উপর নির্ভর করে। সুতরাং অধিকারী ভেদে ইহা উপভোগ্য। কেহ "ক" দেখিয়া কাঁদেন, কেহ বেত্রধারী গুরুমূর্ত্তি স্মরণে শিহরিয়া উঠেন। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা একটা সামান্য নক্সায় রেখা সমষ্টি মাত্র দেখেন, আবার অনেকের চোখে উহাতে একটা সম্পূর্ণ অট্টালিকার স্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহার আর একটা দিক আছে। যাহা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, তাহা চোখে পড়িলেই চট্ করিয়া বুঝিতে পারি, তাহার জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একটা জিনিস যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত আকারে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়, তবে নিতান্তই গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। যথা, এটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে,

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল ;"

কিন্তু

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে—"

বলিলেই মনে হয়, তাইত, বাগবাজারে আসিলাম নাকি? অপিচ যথা, অনেকে মনে করেন যে চোখে যেমনটি দেখা যায়, সেই রকম ছবি আঁকাই প্রশস্ত। ঠিক কথা। আবার অনেকে প্রাচ্য পদ্ধতি অনুযায়ী অঙ্কিত ছবি দেখিয়া অধিক আনন্দ উপভোগ করেন এটাও ঠিক। পূর্ব্বোক্ত দর্শকের পক্ষে এই নূতন (পুরাতন!) ধরণের ছবি উপলব্ধি করিবার মত sense এখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা ফার্ষ্ট বুক ও রয়াল রিডারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত একই রকমের ছবি দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং দোষ কাহারও নয় এবং এই দুই প্রকার ছবি সম্বন্ধে দ্বন্দ্বের কোন কারণ নাই।

তৃতীয় কথাটা ছবির technique সম্বন্ধে। বাস্তব জগতে যে জিনিষটা আছে, সেটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে গভীরতায় একটা স্থান জুড়িয়া আছে। তাহাকে একটা চেপ্টা কাগজ বা ক্যানভাসে এমন করিয়া প্রতিফলিত করিতে হয় যেন ঐ স্থানাশ্রয়ী পদার্থটাও চেপ্টা না হইয়া অবয়ব ধারী রূপেই বিকশিত হইয়া উঠে। এই প্রয়োজন বশতঃই techniqueএর উৎপত্তি। এ ক্ষেত্রে techniqueএর অবজ্ঞা করিলে ছবি তাহার উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য্য ভ্রষ্ট হয়। প্রাচ্যপদ্ধতি অনুযায়ী অঙ্কিত ছবিতে বিশেষরূপে পদার্থের বিকৃতি নাই—উহাতে বহু পরিমাণে ভাবের সমাবেশ আছে। তাহা রেখায় রঙে ধরণে ধারণে মনের কাণে কাণে অনেক গোপন কথা নিবেদন করে।

চতুর্থ কথাটা একটু গোলমেলে অর্থাৎ ইহা লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে; তাহা হইলেও কথাটা বলা ভাল। আর্টের একটা দোহাই আছে। আর্টের দোহাই দিয়া এমন অনেক কথা বলা হয় এবং এমন অনেক ছবি আঁকা হয় যাহাতে সত্য এবং সৌন্দর্য্যের সীমানা হইতে বহু দূরে থাকিয়াও অনায়াসে সমালোচনা এড়ান যায়। কিন্তু আর্ট জিনিসটা নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খলতার উল্টা। উহার আট ঘাট বিলক্ষণ শক্ত বাঁধনে বাঁধা, কিন্তু শক্ত হইলেও সে বাঁধন এতই স্থিতিস্থাপক (elastic) যে মনীষী রচয়িতার পক্ষে তাঁহার ব্যক্তিত্বের উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদানের নিতান্তই অনুকূল।

উপরিউক্ত কথা কয়েকটি অতি সংক্ষেপে বলা হইল, কিন্তু এগুলি মনে রাখিলে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সফল হইবে।

প্রবাসী—বৈশাখ

"বনদেবী"—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন বর্ণের ছবি। প্রাচ্য-কলাসম্মত। Reproduction ভাল হয় নাই। ব্লকের দোষে মূল ছবির বিশেষত্ব নষ্ট

হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাবে, রেখায়, বর্ণের বৈচিত্র্যে এবং সমাবেশে সুন্দর হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, অবনীন্দ্রনাথের তুলিকার উপযুক্ত হয় নাই।

"ঝড়"—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। তিন বর্ণের ছবি, প্রাচ্যকলা সম্মত। বাতাহত পথিকত্রয়ের গতি মুহূর্ত্তের জন্য এই ছবিতে সুন্দররূপে ধরা পড়িয়াছে। মূর্ত্তির বিন্যাস (composition) বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ধারণ (atmosphere) যথেষ্ট আছে। কিন্তু reproduction ভাল হয় নাই।

"জেবউন্নিসা"—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। তিন বর্ণের ছবি। অনেকটা মিশরী ছবির অনুকরণ ; ভাববিহীন। নিতান্তই বিশেষত্ব বর্জ্জিত।

"ফোয়ারার ধারে,"—শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিন বর্ণের ছবি। প্রাচ্যকলা-সম্মত কিন্তু অনেক পরিমাণে বাস্তবের ছাপ আছে। হয়ত এইটাই শিল্পীর বিশেষত্ব। ভাব, রেখা, বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি বিশেষ উপভোগ্য।

"সুরের নেশা"—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তিন বর্ণের ছবি। প্রাচ্যকলা এবং বাস্তবের খিচুড়ী, ভাবের এবং techinqueএর অনেক গলদ।

এই ছবি গুলি দেখিতে দেখিতে আর একটি ছবি চোখে পড়িল। তাহা ভাষায় অঙ্কিত। প্রবাসীর এই সংখ্যার ১০১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন —"যেতে যেতে রংএর পাগলীর সঙ্গে দেখা হয় একদিন রেখার জন্যে পাগল রূপবান ছেলের, দুজনকে দুজনের মনে ধ'রে যায়, এ দেয় ওকে হোলী খেলার পিচকারি, ও দেয় তা'কে চোখের পাতায় কাজল-লতা, দুজনে মিলে খেলা-ঘর পেতে ব'সে যায় রূপকথার রাজত্বে গিয়ে।"

অবনীন্দ্রনাথ "রূপ-রেখার রূপকথায়" যে কথাটা লীলার ছলে লিখিয়াছেন, তার প্রত্যেকটা কথা শিল্পী এবং চিত্ররসিকের বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার বিষয়। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কোমল তুলিকাধারী, সমালোচকের মত তুলাদণ্ডধারী নহেন। তাঁহার কথায় সত্য সুমধুররূপে বিকশিত, পরিমাপের পাটিগণিতের ঠক ঠকে আওয়াজ তাহাতে নাই। কথাটা অত্যন্ত সত্য যে বর্ণ এবং রেখার একত্র সমাবেশেই ছবির পূর্ণ সার্থকতা। আমাদের দেশের শিল্পীদের অনেকেই এই মূল কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, অথবা, আয়াসসাধ্য বলিয়া, করেন নাই।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র, ১৩৩১

"কল্যাণী"—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা। তিনবর্ণের ছবি। বাস্তব। বৌবাজার ষ্টুডিও, কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের অন্য সংস্করণমাত্র। ভাব, ভঙ্গী, অ্যানাটমি প্রভৃতির বিশেষ অভাব। জীবন্ত মডেলের সাহায্যগ্রহণ করিলে হয়ত চলিতে পারিত।

"দিনের শেষে ভিখারী"—শ্রীযুক্ত • এম দত্ত। তিনবর্ণের বাস্তব। ভাব ও ভঙ্গী আছে, অ্যানাটমি ও techinque নাই। ইঁহাকেও মডেলের আশ্রয় লইতে অনুরোধ করি।

"দিবা স্বপ্ন"—ভাস্কর শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক। একখানি রিলিফের (Bas-relief) একবর্ণ চিত্র। বিশেষ প্রশংসার্হ। ভাব ভঙ্গী, রেখা সমাবেশ, মডেলিং সুন্দর হইয়াছে।

"প্রতীক্ষা"—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি। তিন বর্ণের ছবি। বাস্তব। কালীঘাটের পটকেও হার মানাইয়াছে। ইহাতে কিছুই নাই। আছে কেবল গলদ।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ

"নাগ-পঞ্চমী"—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। তিন বর্ণের ছবি। বাস্তব। রেখাবর্ণ বিবর্জ্জিত। ভাবের অভাব। অ্যানাটমির অনাটন। পার্‌স্পেকটিভ পরাভূত। ইঁহাকেও মডেলের আশ্রয় লইতে হইবে।

"তপোবনে"—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ। তিনবর্ণের ছবি। প্রাচ্যকলার আদর্শ,—বাস্তবের ছায়া। ঝোঁকটা প্রাচ্যকলার দিকে। যদি তাহাই হয়, তবে কিছুকাল ধরিয়া ইঁহাকে প্রাচ্যকলানুমোদিত কতকগুলি মূল চিত্র বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি। বর্ণে ও রেখায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলে আলঙ্কারিক (decorative) চিত্রের সার্থকতা থাকে না।

"ওমর খৈয়মের" একটি রুবায়েৎ অবলম্বনে অঙ্কিত একটি চিত্র—শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনবর্ণের। প্রাচ্যকলা ও বাস্তবের মিশ্রণ। নায়ক নায়িকার ভাব ভঙ্গী মন্দ নহে, কিন্তু ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের গাছপালার বাস্তব অঙ্কনের সহিত খাপ খায় নাই।

"নির্ব্বাসিতা"—শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর পরামাণিক। তিনবর্ণের ছবি। বাস্তব। বিলাতী আবছায়া। অ্যানাটমির বিশেষ অভাব। ইঁহাকেও মডেলের সাহায্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গসাহিত্যে মোসল্‌মান

(বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ১৬শ অধিবেশনে পঠিত)

বঙ্গবাণীর চরণ-প্রান্তে আমার দীন পূজার হীন সম্ভার অর্ঘ্যরূপে অর্পণ ক'রব বলে, সংশয়সংক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য এই মোস্‌লেম-বালার হৃদয়কে এমন করে ওলট্‌ পালট্‌ করেছে যে, কতবার মনে করেছি আর নয়, পূজার উপাচার মন্দিরের দ্বারে রেখেই প্রস্থান করি। আমার পূজার প্রথম ফুল "স্বপ্নদৃষ্টা" পাঠে সেই সময় ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, রায় জলধর সেন বাহাদুর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দেশবন্ধু প্রভৃতি মহোদয়গণের আশীর্ব্বাদ না পেলে আমার পুষ্পপাত্রে আর দু'টি কুসুম চয়ন কর্‌তে পা'রতাম না। আমার "জন্‌কী বাঈ বা ভারতে মোস্‌লেম বীরত্ব" ও "আত্মদান" বঙ্গবাণীর যোগ্য নয় তা জানি! কিন্তু মোস্‌লেম নারীর একান্ত সাধনার যে ওদের পেয়েছি, সে কথা বল্‌তে সঙ্কোচ করিনে। আর সেই সাধনার মূলে এই কথাই বড় হয়ে রয়েছে যে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, বাগ্‌দাদের লোক হ'লেও আমি বাঙ্গলার মেয়ে—আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। বাঙ্গলাই আমার মুখের প্রথম ভাষা হ'য়ে ফুটেছিল। এই বাঙ্গলার ফলে আর জলে কলেবর বৃদ্ধি করে' দু'কাণ ভরে প্রতি নিয়ত বাঙ্গলা কথা শুনে ও সর্ব্বক্ষণ বাঙ্গলা ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করেও আমার অনেক মোস্‌লেম ভ্রাতা, নিজেদের বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে যখন কুণ্ঠা বোধ করেন, তখন আমার প্রাণে বড় লাগে। তাঁরা মনে করেন বাঙ্গালী বল্‌তে যেন কেবল হিন্দুই বুঝায়। জীবনের সেই প্রথম উষা থেকে তাঁদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল। আর এই ভ্রমই বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদের নগণ্যতার প্রধান—প্রধানই বা বলি কেন, একমাত্র কারণ; এবং বাঙ্গলার জাতীয় জীবন সংগঠনের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

সাহিত্যসেবা জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে ধাবিত করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবনের যে অনুন্নত অবস্থা চল্‌ছে, এর একমাত্র কারণ সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের স্থানাভাব। এবং এই স্থানাভাবেরও মূলীভূত কারণ আমাদের জন্মগত অধিকারে অনাস্থা ও আত্মবিস্মৃতি।

দিনের পর দিন আস্‌ছে, আবার চলে যাচ্ছে, অথচ আমাদের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে না। আমরা সর্ব্বপ্রকারের বাঙ্গালী হ'য়েও মনে করি আমরা "পরদেশী"—মনে করি বাঙলা আমাদের বিমাতা মাত্র।

বাঙ্গালী শব্দটা কাণে গেলেই আমাদের মনের ভিতর হিন্দু-মোসল্‌মানের বিচ্ছেদ সূচক একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হয় কেন? কেনই বা আমরা নিজেদের ঐ মধুর আখ্যা হ'তে অনেক অন্তরে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি? বঙ্গমাতার স্নেহ কি মাতৃ-স্নেহ থেকে কোনও অংশে কম যে, বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দিতে আমাদের প্রাণে এত দ্বিধা, এত সঙ্কোচ?

আমার প্রথম দিনের রবির কর বাঙ্গলার আকাশকে আলো করেছিল—আমার প্রথম দিনের আত্ম-নিবেদন বাঙ্গলার বাতাসকেই কাঁপিয়ে তুলে, জগদীশ চরণে পৌঁছেছিল। অমি যে সেই বাঙ্গলার মাটিতেই আমার শেষের ঠাঁই খুঁজে নিতে চাই! বাঙ্গলা কি আমার পর?

পাঞ্জাবী বল্‌তে ত' পঞ্চনদের মোসল্‌মানেরা সেখানকার শিখ হিন্দুদের থেকে একটা বিভিন্ন জীব হ'য়ে থাকৃতে চা'ন্‌ না। বেহারী মোস্‌লমান ও হিন্দু উভয়েই ত নিজেদের বেহারী বলে পরিচয় দিতে একটা গৌরব মনে করেন। মোস্‌লেম-প্রধান কাশ্মীর, এমন কি সুদুর পেশওয়ার বা কাবুলে পর্য্যন্ত যে কয়েক জন হিন্দু বাস করেন, তাঁরাও ত' নিজেদের কাশ্মীরী, পেশওয়ারী বা

কাবুলী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে বাঙ্গালী মোসল্‌মানের এ অধঃপতন কেন? অথচ এই বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর অপেক্ষা মোস্‌লমানের সংখ্যাই বেশী।

অপর পক্ষে দেখ্‌তে পাই, হিন্দুগণও মনে করেন, তাঁরাই যেন বাঙ্গলা মায়ের এক মাত্র সন্তান, বাঙ্গলার মোসলমান যেন তাঁদের বৈমাত্রেয় ভাই।

কেন? আমরা কি বঙ্গমাতার আপন সন্তান নই? আমরাই বা নিজেদের দাবি ছা'ড়ব কেন? আমাদের ত' আর অন্য দেশও নাই, অন্য ভাষাও নাই। আমরা আমাদের এই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিকে বিমাতা মনে ক'রে, কেনই বা গর্ভজাত সন্তানের পবিত্র দাবি ছেড়ে দিব? সত্য যা' তা' কি কেউ ঠেলে রাখ্‌তে পারে? প্রাণে প্রাণে ত' জানি—মা ত' আমাদের কুমাতা ন'ন।

জানি ত' আমরা, সেই পাঠানের অস্তগমন—বাঙ্গলায় মোগলের আগমন। জানি ত' আমরা, তখন হিন্দু-মোসল্‌মানে বাহুতে বাহু বেঁধে, কেমন করে একটা বৃহৎ বঙ্গভূমি রচনা করতে চেয়েছিল—কেমন করে তারা একটা শোণিত-রাঙ্গা জয়ের বেদীর উপর গড়ে তুল'তে চেয়েছিল হিন্দু মোস্‌লমানের দেশ-মাতৃকা—বিচিত্র হেমাভরণভূষিতা বলবীর্য্যময়ী ধনধান্য পরিপূর্ণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী লোকপালিনী জগদ্ধাত্রী।

কিসে সেই বল এনেছিল যা'তে সকল দ্বিধা সকল সঙ্কোচ দূর করে দিয়েছিল? যা'তে বিচ্ছেদের ভিতর থেকে মিলনের বাঁশী বেজে উঠেছিল—যা'তে বিষ হ'য়েছিল অমৃত? আমি বলিতে চাই, সে এই ভাষার বাঁধন—সে এই বাঙ্গলা মায়ের মধুর বুলি। সেই বাঁধন আজ কাট্‌তে চাইলে তা পা'রব কেন? আরবী বা বাগ্দাদী কুয়াসাকে টেনে আন্‌লে, শুধু যে ঘরের দীপকেই মলিন করা হ'বে, এই কথাটাই আমি আজ করযোড়ে নিবেদন ক'রতে চাই। বাঙ্গলায় যদি একদিন আমরা পরগাছার মত এসেও থাকি, কিন্তু গাছটাকে জড়িয়ে ধরে, তার সঙ্গে মিলে এক হ'য়েছি। সেটা বিধির বাঁধন। সে বাঁধন কাট্‌তে পারে এমন শক্তিমান কি কেউ আছে? এখনো যদি বুকের উপর পাথর বেঁধে জলে নামতে যাই—তবে ডুবে মরাই সুনিশ্চিত।

একথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে একদিন বাঙ্গলার সাহিত্য—বাঙ্গলার আচার, বাঙ্গলার রীতি নীতি, বাঙ্গলার উৎসব, বাঙ্গলার ক্রীড়া কৌতুক পর্য্যন্ত, বাঙ্গলায় এক নবীন মোসলেম-জগৎ গড়ে তুলেছিল। মোস্‌লেমের ভাষা, মোস্‌লেমের আদব্-কায়দা বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ ও সাহিত্যকেও তাদের একটানা খাতের ভিতর দিয়ে বয়ে যেতে দেয়নি।

এখন কথা হ'চ্চে যে—এই দুর্ব্বলতা আমাদের কোথা থেকে এল? বাঙ্গলা ভাষা শেখ্‌বার ভয়েই কি আমরা বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে এত অনিচ্ছুক? তা' বই আর কি? না হ'লে হিন্দুর সঙ্গে একত্রে, এক মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে আজ আমাদেরই বা এ দুর্গতি কেন? কেনই বা বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্র হ'তে আমরা এত দূরে রয়েছি?

জাতীয় জীবন গড়ে' তুল্‌তে হ'লে সাহিত্য বিজ্ঞানকেই অবলম্বন কর্‌তে হ'বে। এর অন্য পথ আর নাই। আজ মোসল্‌মান সম্পাদিত এক খানি মাসিক বা একটা ভাল সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাই না কেন? বর্ত্তমানে যে সামান্য দু'একজন লেখক লেখিকা দূর আকাশের তারার মত মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ কর্‌ছেন, শুধু তাঁদেরই উপর ভরসা রেখে কত দিন আর চলে?

মোস্‌লেম সমাজে যতদিন স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন না হচ্ছে, ততদিন আমাদের ক্ষুদ্রতার কালী মুছে দিবার উপায় নাই। বল্‌তে দুঃখ ও লজ্জা হয় যে, এখনও আমাদের এই হতভাগ্য সমাজের অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে স্ত্রী-শিক্ষা খুবই দোষাই। স্ত্রী-শিক্ষা যে কত আবশ্যক ও মূল্যবান বস্তু, তা' তিনিই জানেন, যাঁর পরিবারে শিক্ষার আলোক-ধারা ভাগীরথীর ধারার মত প্রবেশ কর্‌তে পেরেছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে মাদ্রাজের ভাইজাগা-পট্টমে বেড়া'তে গিয়ে, একজন অব্রাহ্মণ ভদ্র লোকের বাড়ীতে বাসা নিয়েছিলাম। কিন্তু দেখে আশ্চর্য্যান্বিত

হ'য়েছিলাম যে, সাংসারিক কার্য্যান্তে বধূরা প্রত্যহই নিজেদের ছেলে মেয়েগুলিকে পড়া'তে বস্‌তেন। আর বেশ সুন্দর রূপে ফাষ্ট বুক ও সেকেণ্ডবুক পড়া'তেন। কেউবা তেলেগু ভাষার অর্থ বিন্যাস কর্‌তেন। তৈলঙ্গী ভাষায় ইংরাজী শব্দের অর্থ বলে' দিতে শুনে, তখন কতবার ভেবেছি,—আমার্ জাতীয়েরা কবে এম্‌নি ধারা গ্রহণ কর'বে?

নারী আমরা, আমরাই ত' সৃষ্টিকারিণী। আমরা যদি বাঙ্গলায় একটা স্ত্রী-শিক্ষা-মণ্ডলী গড়ে' তুল্‌তে পারি, তা' হ'লে আমাদের সমাজের পুরুষদের ঘুম ভাঙ্গতে পারে —সমাজের ক্ষুদ্রতা দূর হ'তে পারে। কবে যে সে শুভ দিন আ'স্‌বে, আমি তা'রই প্রতীক্ষায় পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিশ্বকবির আশার গান, আমার অন্তরে নিয়ত ঝঙ্কার তুল্‌ছে—

"আসিবে সে দিন আসিবে—"

নূরন্নেছা খাতুন।

আলেয়ার ব্যথা

আমি তো মনে করি, তোমারে ধরি ধরি,
পশারি দু'টী বাহু
বাঁধিতে হৃদি পাশ!
এত যে কাছে তুমি, এখনি তোমা চুম'
ঘুচিবে সব জ্বালা, পূরিবে সব আশ!
পুলকে নাচে বুক, আহা রে কিবা সুখ!
জীবন-মরুভূমি
নিমেষে ফুলময়!
কুহরে কোটি পিক, মধুর দশ দিক্,
হোলির শশী হাসে, মলয় মৃদু বয়।
আমি তো মনে করি, তোমারে ধরি ধরি
পশারি দু'টী বাহু, আকুল প্রেমময়!

পলকে দূরে সরি' যাও হে কেন হরি,
কাঁদায়ে শুধু মোরে
অধীর করি' হায়?
সকল সুখ-হাসি, সকল শোভা রাশি,
স্বপন হেন যেন নিমেষে টুটে যায়!
তুমি তো পর নও, পরাণ-প্রিয় হও,
আপনা হতে তোমা
জানি গো আপনার!
নিঠুর সম তবু, ছলনা একি প্রভু,
জনম ধরি' কত করিছ অনিবার!
আলেয়া-আলো জ্বালি' সাজাও দুখ-ডালি
তোমারে ধরি-ধরি—দাওনা ধরা আর।

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অন্নপূর্ণার আসন

পরিবর্ত্তনশীল কালের বিচিত্র গতিতে আমরা অনেক সম্পদ হারাইয়া নব সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। অপহৃত সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য একটু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বাংলা আজ রিক্তা, দীনা—তাহার বিশিষ্টতা ও নিজস্ব বৈভব কালগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শত সহস্র রত্নরাজির সহিত বঙ্গজননীগণ আর একটি নিজস্ব সম্পত্তি হারাইতে বসিয়াছেন—সেটি আমাদের অন্নপূর্ণার আসন।

এখন রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা বুঝাইতে কুৎসিত রোগ গ্রস্ত, কদাচারী, মলিন মুর্ত্তি পাচক ঠাকুর আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। যাহাদের আচার ব্যবহারে ঘৃণা বোধ হয়, গোপন রোগের ইতিহাস শুনিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, আমরা বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া, আলস্যের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকেই সাদরে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছি। শুধু স্থান দেওয়া নয়—নিঃসন্দেহে স্বামী, পুত্র, পরিজনদের জীবন পোষণের ভার সমর্পণ করিয়াছি।

রন্ধনশালার অগ্নির উত্তাপে এখন আমাদের মাথা ধরে; হিষ্টিরিয়া রোগের সূত্রপাত হয়। পিতা মাতা স্বামী পুত্রের জন্য স্বহস্তে খাদ্যপ্রস্তুত করাটিকে এখন বড়ই লজ্জা ও অপমানের বিষয় মনে করি। আজকাল আমরা শিক্ষার নাম করিয়া কুশিক্ষার আশ্রয় লইয়াছি। আমাদের দৃষ্টি বাহিরের চাকচিক্যেই আকৃষ্ট, জীবনের সমস্ত রূপরসের উৎস যে কোথা হইতে প্রবাহিত হয়—আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছি।

সহরে—বিশেষতঃ কলিকাতা নগরীতে—গৃহে পাচক না থাকিলে মান সম্ভ্রম নাকি বজায় থাকে না! ধনীর ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থদেরও পাচক চাই। অনেক অভাবগ্রস্তের সংসারে অর্থাভাবে ঝি চাকর পর্য্যন্ত রাখা হয় না, বাড়ীর মেয়েরা প্রসন্ন বদনে ঝি চাকরের খাটুনী খাটিয়া থাকেন, তাহাতে কথা নাই, যত গোল রন্ধনে। ঝি চাকর নাই, অথচ খোরাক পোষাক বাদ নগদ ১৪ টাকা মাহিনার একটি পাচক বিরাজমান, এমন গৃহস্থের সংখ্যাও অল্প নহে।

সহরবাসিনীরা সঙ্গিনীদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসেন, "হ্যাঁ গা, তোমাদের রান্না করে কে? তোমাকেই রাঁধতে হয়? আহা বড় ত কষ্ট! নিত্যি তিরিশটি দিন হাঁড়ি ঠেলা—বাড়ীর পুরুষ কি এটা দেখতে পায় না?"

হায়, দেখিবে কে? যে পুরুষের দেখিয়া প্রতীকার করিবার কথা—তাহার তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। সকাল সন্ধ্যায় টিউশানী করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের রক্তআঁখির সমুখে দিবাব্যাপী হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া তাহার শরীর মন একটা ক্লান্তির কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। তাহার স্ত্রী ঘরে বসিয়া কর্ম্মশ্রান্ত স্বামীর নিমিত্ত দুইটি রান্না করিলেই মহাভারত যেন অশুদ্ধ হইয়া যায়, মান মর্য্যাদা অতল সলিলে বিসর্জ্জিত হয়। স্বামী বিনা বিশ্রামে বিনা খাদ্যে দিন দিন শুষ্ক শীর্ণ হইবেন, তাহা দেখিয়াও কি প্রতিবেশীদের নিকটে নিজেদের "বাবুত্ব" অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে?

বহুকাল হইতেই বহু লোকের একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা রান্নাঘরে ঢুকিতে পারে না, কায করিতে পারে না; জ্যোৎস্না দেখিয়া, ফুলের মধু খাইয়া হাওয়ার উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহা ভুল। শিক্ষায় মানুষ অবনত হয় না, উন্নত হয়।

অনেক স্বচ্ছল সংসারে শিক্ষিতা মেয়ের কার্য্য কুশলতা নিরীক্ষণ করিলে অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। যেমন তাঁহাদের কার্য্যের শৃঙ্খলা, তেমনি রন্ধনে পরিপাটা। কায যেন তাঁহাদের কায নয়, আনন্দময় খেলারই রূপান্তর।

প্রচুর পরিমাণে ঘি দুধ খাইয়া সোফায় শুইয়া নভেল পড়িলে শরীর কাহারো ভাল থাকিতে পারে না। উপযুক্ত পরিচালনা অভাবে প্রকৃতিদত্ত সুন্দর সুগঠিত শরীরও রোগের আলয় হইয়া পড়ে।

যাঁহাদের পথে বাহির হইবার উপায় নাই; কোনরূপ শারীরিক ব্যায়াম নাই, তাঁহাদের পক্ষে রন্ধন, পরিবেষণ ও বাটনা বাটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাঁহারা অতিরিক্ত সন্তান প্রসব জনিত দুর্ব্বলতায় বা শারীরিক অসুস্থতায় অশক্ত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নিজেদের খাদ্য প্রস্তুতের ভার পাচকের হস্তে দেওয়া কাহারও উচিত নহে।

কলিকাতার স্বল্প-পরিসর আলো-বাতাস-বর্জ্জিত রন্ধনশালা অনেকের পক্ষেই ভীতিপ্রদ বটে, তবু আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে অনেক কষ্টকর কার্য্যও আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। যাঁহাদের রান্নাঘরে উপযুক্ত আলো, বাতাস

নাই, তাঁহারা অক্লেশে তোলা উনুন ব্যবহার করিতে পারেন। তোলা উনুনের সুবিধা—ছাদ কিংবা বারান্দা হইতে ধরাইয়া লইয়া একটি পরিষ্কার স্থানে বসিয়াও রান্না করা যায়। রোগের বিষ মিশ্রিত পাচক হস্তের পঞ্চব্যঞ্জন অপেক্ষা নিজেদের স্বহস্তে প্রস্তুত একটি ব্যঞ্জনও ভোক্তার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক, ও জীবনী শক্তির পরিবর্দ্ধক।

একে ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্য এ দুর্ব্বলজাতির জীবনী-শক্তি অপহরণ করিতেছে, তাহার পর অখাদ্য কুখাদ্য খাইলে এ জাতি কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত থাকিতে পারিবে না। গৃহলক্ষ্মীগণ একটি বার কি ইহা ভাবিয়া দেখিবেন?

আপনাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জনদের খাদ্য সম্বন্ধে আপনারা উদাসীন থাকিলেও, সৌভাগ্যের বিষয় দুই একটি পুরুষ এ বিষয়ে উদাসীন নাই। গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "আহারে ব্যভিচার" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাচকের রন্ধন সম্বন্ধে বহু সংবাদ জানিতে পারিবেন।

জননীগণ, আপনাদের অন্নপূর্ণার আসনে আবার আপনারা প্রতিষ্ঠিতা হউন; আপনাদের তরুণ সন্তানের দল হোটেলের চপ কাটলেট প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের স্বহস্তের স্বদেশী নাম ও উপাদানে প্রস্তুত অমৃতের আদর করিতে শিখুক!

শ্রীগিরিবালা দেবী।

সুখ ও দুঃখ

সুখ-সরে স্নান করিতে এলাম, সুখ দিল মোরে ফাঁকি,
দুঃখ তখন হৃদয়-কুঞ্জে আমারে লইল ডাকি।
সুখের অঙ্কে স্থান পাব বলে পিয়াসা সলিলে ভাসি—
দুঃখ ধরিয়া বক্ষের মাঝে ভুলাল যাতনা-রাশি।
সুখের বাসনা দুরাশা মাত্র, সুখ সদা ফেলে ঠেলে,
দুঃখ আমারে ছুটে আসি কোলে তুলে লয় অবহেলে।
সুখ আসি যবে উপনীত হয় কভু বিজলীর প্রায়,
দুঃখ পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায় পল্লীবধূর ন্যায়।
সুখ চলে যায় আবার যখন মমতা করিয়া চূর,
দুঃখ তখনি আসি' দেখা দেয় করিতে বেদনা দূর।
সুখ আসি, যায় বিরাগের ভরে মুখের আলাপ রাখি—
দুঃখ যতনে ধরে সে সময় তাই তা'তে ভাল থাকি।
সুখ, হায় প্রভু, তব কাছ হতে টানি' নিয়ে যায় দূরে
দুঃখ তোমায় আনে সে সময় আমার হৃদয়-পুরে।
সুখ চাহিনাক'—মমতা পূর্ণ ক্ষণিক স্বপনে ভরা—
দুঃখ-রেখায় বুক ভরে থাক তোমায় আপন করা॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ক্ষুদকুঁড়া

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। পুস্তকখানির অধিকাংশ কবিতাই "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাস বাবু যে যে শ্রেণীর রচনায় সিদ্ধহস্ত, এ পুস্তকে সেই সেই শ্রেণীর রচনাই অধিকাংশ। কবি দরিদ্র পল্লী-সংসারের সুখদুঃখগুলি এ গ্রন্থেও পর্ণপুটের মত মর্ম্মস্পর্শ ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। 'গ্রাম প্রবেশ', 'শেষ সম্বল', 'গাভীহারা', 'মজুরের গোহারী', 'অনাবৃষ্টি' ও 'মেছুনী' বঙ্গের পল্লীজীবনের এক একটি কারুণ্যপূর্ণ মধুর চিত্র। গোকুল গীতির মধ্যে "মধুমাসে" বড়ই মধুর।

হায়—আজ মধুমাসে বুঝি বরষা এলো!

তায়—গোকুল অকাল মেঘে ছেয়ে যে গেল।
রাঙ্গা—আঁখির পুটে—মুহু বিজুরী ছুটে
কালো—কাজর গলিয়া লোর অঝোরে ঝুরে।"

মধুর গীতি রচনায় কবির কুশলতা বঙ্গীয় পাঠকের অবিদিত নহে। হিন্দু সংসারের গার্হস্থ্য জীবন চিত্রণেও কবির খ্যাতি যথেষ্টই আছে। এই চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। 'মিলনোৎকণ্ঠিতা', 'প্রোষিত ভর্ত্তৃকা', 'আসন্ন পরিণয়', 'সহধর্ম্মিণী', 'পুনর্ম্মিলন' ইত্যাদি কবিতা পর্ণপুটের কবির যশ আরও বাড়াইয়া দিবে।

অনুবাদগুলি ঝঙ্কারময়, সনেটগুলি গভীরভাবে পূর্ণ, সঙ্গীতগুলি রস-প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ।

পুস্তকখানিতে কবিতাগুলিকে ভাবানুক্রমে সাজাইবার শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। দুই তিনটি কবিতা শুধুই ঝঙ্কার-সর্ব্বস্ব। সেগুলিকে এই সংগ্রহে স্থান না দিলে সংগ্রহটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত। কবি অনুপ্রাসের জন্য স্থলে স্থলে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে ছন্দের মাধুর্য্য বাড়িলেও রসের প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। জামী হইতে অনূদিত কবিতা দুটিতে কালিদাস বাবু পারসী আবহাওয়া রচনা করিতে পারেন নাই। সামান্য ত্রুটী সত্ত্বেও ক্ষুদকুঁড়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিই করিয়াছে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

লঙ্কা অপারেশন খিচুড়ী

খণ্ডকাব্য। শ্রীশ্যামাপদ মুখপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা বুধোদয় প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই পয়সা।

লেখক বলেন, যদি দেশের উন্নতি করিতে চাও তবে দাসবৃত্তি ছাড়িয়া বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন কর, বিদেশী বর্জ্জন করিয়া স্বদেশীয় শিল্পের প্রতি মন দাও, এবং স্বার্থপরতা ও কপটতা ত্যাগ করিয়া, একান্ত মনে দেশের সেবা কর, নচেৎ "হুজুগে হাটের গোলে গোলযোগই অবির্ভাব" হইবে। এই কবিতা অথবা ছড়া যিনি বাঁধিয়াছেন, তিনি বাঁধনদার ভাল।

দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ

স্বর্ণময়ী শিরিজের প্রথম গ্রন্থ। লেখকের নাম নাই, সম্পাদক শ্রীগোপীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১৭ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲

ইহাতে দেশভক্তি ও আত্মোৎসর্গ মূলক ১২টী গল্প আছে। ঘটনা গুলি নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়, ক্রাইমিয়ান, ফরাসী-প্রাসীয়, রুষ-জাপান প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিবরণ হইতে সংগৃহীত। প্রত্যেক কাহিনীতে দেশভক্তি ও আত্মোৎসর্গের ভাবটি অতি উজ্জ্বল রূপেই প্রতিভাত। ভাষাটি সহজ, বর্ণনা গুলি সরস, বালক বালিকাগণের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছে। জননীরা তাঁহাদের শিশুপুত্রগণের নিকট, ভবিষ্যতে তাহাদের কিরূপ টুকটুকে রাঙা বউ হইবে সে ভবিষ্যদ্বাণী না করিয়া, এইরূপ সব কাহিনী শুনাইলে এ জাতিটা এখনও খাড়া হইয়া উঠিতে পারে। মৃত্যু যে কিছুই ভয়াবহ ব্যাপার নহে,—বরং দেশের জন্য মৃত্যু যে পরম বাঞ্ছনীয়, এই কথাটা শৈশব কাল হইতেই মনে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। এই বহির কাহিনীগুলি সেই উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষরূপ সহায়তা করিবে।

মারচেণ্ট অফ্ ভিনিস

শ্রীআশুতোষ ঘোষ এল-এম-এস কর্ত্তৃক অনূদিত। কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৩৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

প্রবীণ লেখক মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে মহাকবি শেক্সপীয়রের "ম্যাকবেথ" নাটক খানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এই অনুবাদ গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীকে উপহার দিয়াছেন। অনুবাদ সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও মূলের অনুগামী হইয়াছে। "মার্চ্চেণ্ট অব্ ভেনিস্" পাঠকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতা
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৭শ বর্ষ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩২

১ম খণ্ড
৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

পঞ্চম ভাগ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম ভক্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বেণী পালের সিঁতির বাগানে শুভাগমন করিয়াছেন। আজ সিঁতির ব্রাহ্ম সমাজের ষাণ্মাসিক মহোৎসব। চৈত্র পূর্ণিমা, ২২শে এপ্রেল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, বৈকালবেলা। অনেক ব্রাহ্ম ভক্ত উপস্থিত, ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘেরিয়া দক্ষিণের দালানে বসিলেন। সন্ধ্যার পর আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম উপাসনা করিবেন।

ব্রাহ্ম ভক্তেরা ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভাল-বাসা। আর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মভক্ত। অনুরাগ না প্রার্থনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা।

'ডাক দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে'—শ্রীরামকৃষ্ণ সুর করিয়া এই গানটী গাইলেন।

"আর সর্ব্বদাই তাঁর নাম গুণগান, কীর্ত্তন, প্রার্থনা, করতে হয়। পুরাতন ঘটী রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে? আর বিবেক, বৈরাগ্য, সংসার অনিত্য এই বোধ।"

[ব্রহ্ম ভক্ত ও সংসার ত্যাগ।

সংসারে নিষ্কাম কর্ম্ম।]

ব্রাহ্ম ভক্ত। সংসার ত্যাগ কি ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই তাদের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। দু আনা মদে কি মাতাল হয়?

ব্রাহ্ম ভক্ত। তারা তবে সংসার ক'রবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তারা নিষ্কাম কর্ম্ম করবার চেষ্টা করবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গবে। বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কর্ম্ম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে, এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। ১ এরই নাম মনে ত্যাগ। তোমরা মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ দুইই করবে।

[ব্রাহ্ম ভক্ত ও ভোগান্ত। বিদ্যারূপিণী স্ত্রীর লক্ষণ। বৈরাগ্য কখন হয়।]

ব্রাহ্ম ভক্ত। ভোগান্ত কিরূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামিনীকাঞ্চন ভোগ। যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারী রোগী থাকলে মুস্কিল। টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম, দেহ-সুখ এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে,—ভোগান্ত না হলে—সকলের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না।

ব্রাহ্ম ভক্ত। স্ত্রী জাতি খারাপ না আমরা খারাপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়।

"তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া দুইই আছে। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিদ্যা মায়া—পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

ব্রাহ্ম ভক্ত। অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান করে, তবে তিনি অবিদ্যা করেছেন কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর লীলা; অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দ'জ্ঞান থাকলে তবে 'ভাল' জ্ঞান হয়।

"আবার আছে, খোসাটী আছে বলে তবে আমটী বাড়ে ও পাকে। আমটী তয়ের হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া আমের খোসার ন্যায়; দুইই দরকার।

ব্রাহ্ম ভক্ত। আচ্ছা, সাকার পূজা, মাটীতে গড়া ঠাকুর পূজা, এসব কি ভাল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা সাকার মান না, তা বেশ; তোমাদের পক্ষে মূর্ত্তি নয়, ভাব। তোমরা টানটুকু নেবে যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান; ভালবাসা। সাকার বাদীরা যেমন মা কালী মা দুর্গার পূজা করে' মা মা বলে কত ডাকে, কত ভালবাসে, সেই ভাবটী তোমরা লবে, মূর্ত্তি নাইবা মানলে। ২

ব্রাহ্ম ভক্ত। বৈরাগ্য কি করে হয় ? আর, সকলের হয় না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভোগের শান্তি না হলে, বৈরাগ্য হয় না। ছোট ছেলেকে খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলান যায়। কিন্তু যখন খাওয়া হয়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হয়ে গেল, তখন 'মা যাব' বলে। মার কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুড়ে ফেলে দেয়, আর চীৎকার করে কাঁদে।

---

১ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি কুরুষ্ব মদর্পণম্। গীতা।

২। "If the ancient Vedic Aryan is gratefully honored today for having taught us the deep truth of the NIRAKAR or the bodiless (formless) Spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us religious feelings in all their breadth and depth.

"In the days of the Vedas and the Vedanta India was all Communion (JOGA). In the days of the PURANS India was all emotion (BHAKTI). The highest and best feelings of religion have been cultivated under the guardianship of specific divinities."—Town Hall Lecture by Keshab Chandra Sen, 'Our Faith and Experiences.'

সচ্চিদানন্দই গুরু। ঈশ্বরলাভের পর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ।

ব্রাহ্ম ভক্তেরা গুরুবাদের বিরোধী। তাই ব্রাহ্ম ভক্তটী এ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত। মহাশয়, গুরু না হলে কি জ্ঞান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দই গুরু; যদি মানুষ গুরু-রূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান দর্শন হলে আর গুরু শিষ্য বোধ থাকে না। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই!' তাই জনক শুকদেবকে বল্লেন, 'যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও'। কেন না ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর গুরু শিষ্য ভেদ বুদ্ধি থাকবে না। যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, ততদিনই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্ম ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আপনার বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, সে রকম নয়। ও সব প্রথম প্রথম এক একবার করে নিতে হয়। তারপর আর কোশা কুশি বা নিয়মাদি দরকার হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য্য শ্রীবেচারাম, বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে।

সন্ধ্যার পর আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিলেন। মাঝে মাঝে ব্রহ্ম সঙ্গীত ও উপনিষদ্ হইতে পাঠ হইতে লাগিল।

উপাসনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বসিয়া আচার্য্য অনেক আলাপ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, নিরাকারও সত্য আর সাকারও সত্য, আপনি কি বল?

[সাকার নিরাকার চিন্ময় রূপ ও ভক্ত]

আচার্য্য। আজ্ঞা, নিরাকার যেমন Electric Current (তাড়িৎ প্রবাহ) চক্ষে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, দুই সত্য। সাকার নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রসুন চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে,—তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেইরূপ সাকার বাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—নানা ভাবে।

"কি জান, অমৃত কুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হ'ক, অথবা কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল। দুই জনেই অমর হবে। ৩

"ব্রাহ্মদের পক্ষে জল বরফ উপমা ঠিক। সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত জলরাশি। মহা সাগরের জল, ঠাণ্ডা দেশে, স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তি হিমে সেই সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর, 'ভাগবতীতনু' দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।

"আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসো গোচর। জ্ঞান সূর্য্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়; ব্রহ্ম জ্ঞানের পর, নির্ব্বিকল্প সমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্য মনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে। পাখী যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে। আপনি কি বল?

আচার্য্য। আজ্ঞা হাঁ। বেদান্তে ঐরূপ কথাই আছে।

৩। অমৃত কুণ্ড:—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। ব্রহ্মৈব ইদম্ অমৃতম পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চ উত্তরেণ সর্ব্বশ্চ উর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতম ব্রহ্ম। মুণ্ডক উপনিষৎ ২২।

[নির্গুণ ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। ত্রিগুণাতীতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লবণপুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলো, ফিরে এসে আর খবর দিলে না। এক মতে আছে, শুকদেবাদি দর্শন স্পর্শন করেছিল, ডুব দেয় নাই।

"আমি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম, সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। ৪ অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে বল্লেই জিনিসটা এঁটো হয়। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, শুনে ভারি খুসি।

"কেদারের ওদিকে শুনেছি বরফে ঢাকা পাহাড় আছে। বেশী উচ্চে উঠলে আর ফিরতে হয় না। যারা যারা বেশী উচ্চেতে কি আছে, গেলে কিরূপ অবস্থা হয়, এই সব জানতে গিয়েছে, তারা ফিরে এসে আর খপর দেয় নাই।

"তাঁকে দর্শন হ'লে মানুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ হয়ে যায়। খপর কে দেবে? বুঝাবে কে?

"সাত দেউড়ীর পর রাজা। প্রত্যেক দেউড়ীতে এক একজন মহা ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেক দেউড়িতেই শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে এই কি রাজা! গুরুও বলছেন, না; নেতি, নেতি। সপ্তম দেউড়িতে গিয়ে, যা দেখলে, একেবারে অবাক! ৫ আনন্দে বিহ্বল। আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হল না, 'এই কি রাজা?' দেখেই সব সংশয় চলে গেল।

আচার্য্য। আজ্ঞা হাঁ, বেদান্তে এইরূপই সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্য মনের অতীত, বলা যায়; **পরব্রহ্ম**।

"মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্ব স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত, সর্ব্বস্ব হরণ করে; স্ব-স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তম তিন গুণ এদের মধ্যে সত্ত্ব গুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্ব গুণও নিয়ে যেতে পারে না।

"একজন ধনী, বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তিন জন ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ফেল্লে ও তাঁর সর্ব্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বল্লে, 'আর একে রেখে কি হবে? একে মেরে ফেল;' এই বলে তাকে কাটতে এ'ল। দ্বিতীয় ডাকাত বল্লে, মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে এই খানেই ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তাহলে পুলিসকে খপর দিতে পারবে না।' এই বলে ওকে বেঁধে রেখে ডাকাতরা চলে গেল।

"খানিকক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটী ফিরে এল। এসে বল্লে, 'আহা তোমার বড় লেগেছে, না? আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি।' বন্ধন খোলবার পর লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারি রাস্তার কাছে এসে বল্লে, এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়ীতে যেতে পারবে। লোকটী বল্লে, সে কি মহাশয়, আপনিও চলুন, আপনি আমার কত উপকার কল্লেন! আমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব। ডাকাতটী বল্লে, না আমার ওখানে যাবার যো নাই; পুলিসে ধ'রবে। এই বলে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"প্রথম ডাকাতটী তমোগুণ, যে বলেছিল, 'একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল।' তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ডাকাতটী রজোগুণ, রজোগুণে মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়, নানা কাজে জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, এ সব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। মানুষের

৪। উচ্ছিষ্ট হয় নাই—অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম অদ্বৈতম। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ।

৫। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ: তৈত্তীরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী।

সংশয়ঃ বিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয় তস্মিন দৃষ্টে পারাবারে।

স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

আচার্য্য। বেশ সব কথা হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ভক্তের স্বভাব কি জান? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি। তোমরা আচার্য্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমরা জাহাজ, আমরা জেলেডিঙ্গি (সকলের হাস্য)।

শ্রীম।

উপোসী

(১)

সেদিন, আস্‌তেছিলাম আলের পথে, কেউ ছিলনা সাথে।
হঠাৎ, হারিয়ে গেলাম, হারিয়ে গেলাম জ্যোছ্‌না-উজল রাতে।
চাঁদের আলো হাত বুলালো গায়,
মুগ্ধ হলাম স্বপন্-সুষমায়!
তখন আমার মন যেন কি চায়।
গগন ভুবন লাগ্‌লো মিঠে, তুচ্ছ হলো দামী!
সুখে, হাল্‌কা হাওয়ায় উড়ে বেড়াই, রূপের অনুগামী।

(২)

তখন, রাতের পাখী থেকে থেকে ডাক্‌তেছিল দূরে।
আমায়, ডাকতেছিল কে যেন সেই পাগল-করা সুরে।
যেই দিকে চাই, যেই দিকে যাই, এ কি।
হাত ছানি দে' ডাক্‌ছে আমায় দেখি।
সুধুই আমার আপন হলা সে কি?
দেখাই যদি না দেবে সে আমায় কেন ডাকে?
তোমরা, দাওনা ব'লে কোন্ বিজনে লুকিয়ে সে মোর থাকে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

অমৃতের অভিসন্ধি

কঠ উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র হইতেছে এই—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্
পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত
চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

ইহার অর্থ হইতেছে—স্বয়ম্ভূ বিধাতা আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখ রূপে (পরাক্) বিহিত করিয়াছেন।[১] সেই জন্য আমরা বাহিরের বিষয়কেই দেখিতেছি অন্তরাত্মাকে দেখিতেছি না। কিন্তু কোনও ধীর ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিকে ব্যাবৃত্ত করিয়া, অমৃতত্বকে পাইতে ইচ্ছুক, হইয়া, অন্তর্মুখে স্থিত (প্রত্যক্) আত্মাকেও দেখিতেছেন।

এই মন্ত্রের মর্ম্মই অদ্য আমাদের আলোচ্য।

(১) দুইটি পথ।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই এ যুগের তত্ত্ব অন্বেষণের দুইটি প্রশস্ত পথ পড়িয়া আছে। তাহার মধ্যে যে পথটি বৈজ্ঞানিকদের চিহ্নিত পথ তাহা হইতেছে ঐ বহির্মুখীন্ পন্থা, সে পথের পান্থগণ বাহিরের এই জগৎ রূপকেই ধ্রুব ও সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইয়া, বিশ্ব-রহস্যের গূঢ় হইতে নিগূঢ়তর অভ্যন্তর প্রদেশে

১। শঙ্করাচার্য্য "ব্যতৃণৎ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "হিংসিতবান্।"

প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এবং সেই নিগূঢ় রহস্যের গর্ত্ত হইতে যে সকল মণি-মাণিক্য আহরণ করিয়া আনেন তাহাতে আমাদের ভোগের ভরা একেবারে কাণায় কাণায় ছাপাইয়া উঠে।

কিন্তু তত্ত্বান্বেষণের পক্ষে এক দ্বিতীয় পন্থাও বিদ্যমান আছে। সে পথের পান্থ, অমৃতকামী ঋষির ন্যায়, বাহিরের বিশ্ব-রাজ্য হইতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে ঘুরাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মার রাজ্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন,—এবং সেখানেও এক অপার ও অসীম রহস্যের সংবাদ পাইয়া থাকেন। কিন্তু সে সংবাদের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আমাদের ভোগের ভরা খুব কমই পূর্ণ হয়। তবে ঋষি যে অমৃতত্বের কথা বলিয়াছেন, সেই অমৃতত্বের আভাস, সেই সংবাদের মধ্যে দিয়া আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিতে পারে।

এই দুই বিভিন্ন পন্থার তত্ত্ব-জ্ঞান, অবশেষে কোনও এক মিলনের চতুষ্পথে আসিয়া মিলিয়া গিয়াছে কি না,—এই হইতেছে বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীলগণের এক মহা মাথা-ধরা সমস্যা। অর্থাৎ বহিঃরাজ্যের গূঢ় প্রবিষ্ট বৈজ্ঞানিক কোন সুড়ঙ্গ কাটিয়া আমাদের মনোরাজ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন কি না, এবং অন্তর-রাজ্যে বিলীন দার্শনিক বহিঃরাজ্যের ও অন্তর-রাজ্যের মধ্যে কোনও 'থিওরীর' সেতু বানাইয়া দুই রাজ্যকে এক করিয়া দিতে পারেন কি না,—এই হইতেছে বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা।

এই মাথা ব্যথায়, বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক চিকিৎসকের অবশ্যই অভাব নাই। কিন্তু চিকিৎসকের অভাব না থাকিলেও রোগ যে 'নির্য্যাস্' সারিয়াছে তাহা ত বোধ হয় না। উভয় পক্ষই ইহার মীমাংসা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেও, মীমাংসা যে সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে সকলের মনঃপুত হইতেছে এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিক চাহিতেছেন আমাদের মনো-জগৎকে বহির্জগতে বিলীন করিতে ; এবং দার্শনিক চাহিতেছেন বহির্জগৎকে তাঁহার মনো-জগতে বিলীন করিতে। ইহাতে সর্ব্বত্রই দলাদলি ও তর্কাতর্কি চলিয়াছে। এবং বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সে "Practical instinct" আছে তাহা দুই মতেই সন্তোষ লাভ করিতেছে না। বস্তু-পন্থী অবাধে বস্তু-জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া যখন অন্তর্জগতের পিচ্ছিল মাটীতে আছাড় খাইতেছেন—তখন তিনি বলিতেছেন—"Ah! what am I?—I am one of the manifestations of Nature force. I myself with what I call mine am a link in the chain of stern Necessity and Nature"। ২ অর্থাৎ, 'অহং বা আমি কোন বস্তু?—আমি হইতেছি এই বিশ্বশক্তির এক বিকাশরূপ মাত্র। আমি ও আমাগত সমস্তই হইতেছে নির্দ্দয় বিশ্ব প্রকৃতির অপরিহার্য্য শৃঙ্খলের এক এক সংযোজক পর্ব্ব মাত্র।'—ইহা শুনিয়া অবশ্যই আমাদের অন্তরাত্মার কোনই সন্তোষ নাই।

আবার বিপরীত দিক্ হইতে অন্তর-রাজ্যের পরিশ্রান্ত পথিক, যখন বহির্জগতের চৌকাঠ বাধিয়া 'পপাত বসুধা তলে"—তখন তিনি নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিতেছেন—"Ah! what are the houses, mountains and rivers? They exist not, except in my ideas and sensations"।৩—অর্থাৎ এই যে ঘর বাড়ী, পাহাড় পর্ব্বত ও নদী নালা ইহারা কি?—ইহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই, এবং ইহাদের যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা আমার মনের অনুভূতি ও মনের চিন্তার মধ্যেই আছে।—ইহা শুনিয়াও আমাদের অন্তরাত্মার তৃপ্তি হয় না।

পাশ্চাত্য খণ্ডের এই দুই বিভিন্ন পন্থার মল্লগণের 'বাহু-আস্ফোটন' শব্দ ভারতবর্ষীয় জীর্ণারণ্যে কখনই যে শ্রুত হয় নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। কারণ, আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিজ্ঞান বাদী, কিম্বা বৌদ্ধ যুগের শূন্য-বাদী যখন বলিয়াছিলেন

২। G. Fichte's Vocation of Man.

৩। Berkeley's Dialogues, p. 12.

বহির্জগৎ শূন্যময়, এবং আমাদের 'বিজ্ঞান' বা বিশেষ জ্ঞানই জগদাকারে প্রতীত হইতেছে, তখন তাঁহারা Berkeley সাহেবের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃ-ভাবেরই আশংসা করিয়াছিলেন। আবার মান্ধাতা রাজার আমলে বার্হস্পত্য দার্শনিকগণ যখন গাহিয়াছিলেন—

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে"

—শরীরস্থ পৃথিব্যাদি চতুর্ভূত হইতেই চৈতন্য উপজাত হইতেছে,—তখন তাঁহাদের ঐ মত অনাগত যুগের Heckel কিম্বা Ostwaldকেই প্রত্যাশা করিয়াছিল।

(২) অমৃত-পন্থীর তৃতীয় পন্থা।

এই দুই বিভিন্ন পন্থীর বিরোধের একটা কোন মীমাংসা উপনিষদুক্ত "অমৃতম্ ইচ্ছন্" দর্শনবিৎকে অবশ্যই দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই মীমাংসা দান করাই তাঁহার পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, এবং বোধ হয় কোন গৌণ উদ্দেশ্যের সাধ্যও ছিল না। কারণ, তাহা কখনই কোনই তর্ক-জয়ী মতবাদ প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করিতে চাহে নাই। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও গৌরব ছিল—ঐ অমৃতত্বকে লাভ করা। তাহা কোনই pure reasoningএর মর্য্যাদাকে লাভ করিতে চাহে নাই, তাহা সংকীর্ণ practical reasoningএর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহিয়াছিল।

আধুনিক বিবেচনায় ইহা হয়ত দর্শন-বিদ্যার এক ন্যূনতা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কিন্তু সেই ন্যূনতার জন্যও আমরা প্রাচীনগণের উপর খুসী থাকিতে পারি। কেননা তাঁহারা অন্ততঃ আমাদের পায়ের তলাকার মাটীটুকুও সত্য বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, এবং উদ্দাম দার্শনিক কোদালে তাহা কাটিয়াও 'ওয়ার' করিয়া দেন নাই। অথবা সন্দিগ্ধ বাষ্প-রাশির পৃষ্ঠে চড়াইয়া আমাদিগকে একেবারেই স্বর্গরাজ্যে 'উধাও' করিয়া লইয়া যান নাই। অন্ততঃ এইটুকু উপকারের জন্যও আমরা পুরাতনের কাছে কৃতজ্ঞ হইতে পারি। কিন্তু কথাটি খুলিয়া না বলিলে অনেকে হয়ত বুঝিবেন না। সেই জন্য প্রথমে ও-দেশের দর্শনের ইঙ্গিত ও ভঙ্গির সঙ্গে এ-দেশের দর্শনের ভঙ্গি তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

বিগত শতাব্দীর বিদেশী তত্ত্ব-চিন্তার প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই আমরা কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই এক বিপুল, বৃহৎ ও বহুকাল-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সন্দেহ, দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই পুঞ্জীভূত সন্দেহকে ঠেলিয়া কাহারও ভিতরে যাইবার পথ নাই। সে সন্দেহ হইতেছে এই,—বিশ্বরূপের প্রকৃত রূপ আমাদের বোধ-অনুগত রূপ, না বোধাতীত রূপ? অর্থাৎ সন্দেহ হইতেছে, জগতের সত্যরূপ আমাদের বোধ্য না অবোধ্য?

আমরা সকলেই জানি এই সন্দেহের উপর এক বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই সৃষ্টি-কার্য্যে মহামতি ক্যাণ্টই হইতেছেন প্রধান বিশ্বকর্ম্মা। কিন্তু ক্যাণ্ট এতৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত দান করিয়াছেন, তাহা আজও সর্ব্ববাদি সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও যে হইতে পারে এমন আশাও কমই আছে। ক্যাণ্ট বলিয়াছেন,—বস্তুর রূপ রসাদির অস্থির ধর্ম্মই হউক, কিংবা তাহার আকার, স্থিতি, সমবায়, গতি প্রভৃতির স্থিরতর ধর্ম্ম হউক, উহা সবই আমাদের মনগড়া প্রত্যয়, এবং অবস্থা বিশেষে সে প্রত্যয়েরও ব্যভিচার হইতে পারে। অতএব প্রকৃত ও অব্যভিচারী জগদ্রূপ কখনই ব্যভিচারী প্রত্যয়-রূপ হইতে পারে না, এবং সেইজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জগদ্রূপ হইতেছে এক অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য রূপ—তাহা এক চির-অজানা 'Thing-in itself'। এবং তাহাকে কোনই ইদৃক্তা বা ইয়ত্তা দিয়া ধরিবার উপায় নাই।

ইহা হইতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় ক্যাণ্টের উদ্দাম 'pure reasoning' আমাদের দাঁড়াইবার মাটিটুকু পর্য্যন্তকে 'রেয়াৎ' করে নাই। তাঁহার অকুণ্ঠিত তর্কের ক্ষুরধারে প্রত্যয় জগতের কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার অচিন্ত্য রাহুর অট্টহাসে চন্দ্র সূর্য্যও ডুবিয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্যই grand (চমৎকার)! কিন্তু ক্যাণ্ট-তন্ত্রের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান কম লোকেই পাইয়াছেন, এবং তাঁহার বিচার তরঙ্গে

প্রতিহত হইয়া ইউরোপীয় চিন্তা শনৈঃ শনৈঃ যে এক অভিনব বিচার পন্থায় গড়াইয়া আসিয়া পড়িতেছে, তাহার কথা পরে বলিতেছি।

কিন্তু আমাদের দর্শনের সাহিত্যে সন্দেহের যে অসদ্ভাব আছে তাহা নহে। আমাদের দর্শনের বিনিদ্র প্রহরী সদাই সতর্ক, পাছে তাঁহার রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মিয়া যায়। কিন্তু সন্দেহের উপর বনিয়াদ কাটিয়া তিনি কোনই ঘরবাড়ী তুলিতে চাহেন নাই। যেমন ধরুন,—বিজ্ঞানবাদী অবশ্যই সন্দেহ করিয়াছিলেন বটে বিশ্ব জগৎ শুধুই আমাদের 'বিশেষ জ্ঞান' মাত্র, তথাপি তিনি সেই সন্দেহের উপর কোনই অর্দ্ধ সত্য ও অর্দ্ধ মিথ্যার হরগৌরী জগৎ-প্রতিমা খাড়া করিতে চাহেন নাই—তিনি সাফ বলিয়াছিলেন বহির্জগৎ বলিয়া কিছুই নাই। আবার দেখুন, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ, উপনিষদের অভ্রান্ত আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন বটে যে এই "নাম রূপের" বিচিত্র জগৎ মিথ্যা, মায়া ও অবিদ্যা মাত্র,—এবং ইহাও বলিয়াছিলেন বটে যে এই অবিদ্যা হইতেছে অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় রূপা—কিন্তু তাঁহার সত্য যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে কোনই সন্দেহের ছায়া স্পর্শ করে নাই, তিনি তাঁহার অবধারিত, নিত্য নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, বুদ্ধ স্বরূপেই মায়াবাদে অবস্থিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যাহা মিথ্যা তাহাই অনির্ব্বচনীয় রূপা হইয়াছে, যাহা সত্য তাহা হয় নাই। ইহার পরে আবার আমরা দেখিতে পাই সেই পুরাকালের কুশাগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাংখ্য গোড়া হইতেই অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়ের উপর একেবারে খড়্গহস্ত। তিনি অবিকল Hegelএর ধারায় তর্ক করিয়াছিলেন—যাহা অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তাহা সৎ নহে, অসৎ, বা "nothing"। তাহা নাস্তিরই নামান্তর মাত্র। কেননা,—"ন সতঃ বাধদর্শনাৎ" যাহা সৎ বস্তু তাহার সম্বন্ধে কোনই প্রত্যয়াত্মক বাধা দৃষ্ট হয় না। যাহা নৃশৃঙ্গ বা মানুষের শিংএর ন্যায় অসৎ বস্তু তাহার সম্বন্ধেই প্রত্যয়াত্মক বাধা হইয়া থাকে।

ইহা হইতে আশা করি সকলেই এইটুকু বুঝিবেন যে আমাদের অমৃত পন্থীর তত্ত্ব আলোচনা কোনই উদ্দাম নিরুদ্দেশের তত্ত্ব আলোচনা নহে, তাহা কোনই অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া নহে, তাহা কোনই অচিন্ত্যকে চিন্তার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিবার পণ্ডশ্রম নহে। তাহার পন্থা সংকীর্ণ হইলেও তাহা অত্যন্ত practical পন্থা, তাহা তাহার লক্ষিত ও গন্তব্যকে ছাড়িয়া একপদও বিপথে চলিতে রাজি নহে, এবং এই জন্যই অমৃত পন্থের ষড়দর্শন, একবাক্যে মোক্ষ, অপবর্গ, নিঃশ্রেয়ঃ ও অমৃতত্বকেই তাঁহাদের বিচরণার পরম লক্ষিত ও গন্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন।

পাঠক হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে আমাদের প্রয়োজন-সংযত তত্ত্ব-বিচার, প্রয়োজনকে শুধুই তাহার বিচার-পথের পাথেয় করে নাই, কিন্তু প্রয়োজন ও অভিসন্ধির চাবি দিয়াই এই বিশ্ব-রহস্যকে উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ রহস্যের তথ্য অবগত হইবার পূর্ব্বে "অমৃতত্ব" বস্তুটি কি তাহার পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ধার্ম্মিকগণের 'স্বর্গরাজ্য' যে অমৃতত্ব নহে ইহা বলাই বাহুল্য, কেননা আমরা দেখিতে পাই অমৃতত্ব, অপবর্গ, মোক্ষ, নিঃশ্রেয়ঃ প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে স্বর্গ-ভোগের প্রতিকূল অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার অমৃত-প্রাপ্ত আত্মার স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক বেদান্তবাদীদের মধ্যেই দেখা যায়—"ব্রাহ্মেণ-জৈমিনিঃ" (বেঃ দঃ ৪।৫।৪)—জৈমিনি বলেন মুক্ত আত্মা ব্রহ্মৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকেন। "চিতি-তন্মাত্রেন ঔডুলোমিঃ," ঔডুলোমি মুনির মতে তাহা নহে,—মুক্ত আত্মা চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থান করেন। "অবিরোধং বাদরায়ণঃ"—বাদরায়ণ ইহার মীমাংসা করিয়া বলেন মুক্ত আত্মা চিন্মাত্র স্বরূপ হইলেও ব্রহ্মৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইতে বাধা হয় না। সাংখ্য মোক্ষের স্বরূপ বলিয়াছেন, জীবের অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি। গৌতমও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন,—জীব যখন সুখ দুঃখের অতীত হয় তখনই সে মুক্ত। আবার নাস্তিক পণ্ডিতরা—যাঁহাদের মতে "খাও-দাও-নেচে-বেড়াও," এই হইতেছে পরম পুরুষার্থ—তাঁহারা এতদুপলক্ষে

গোতমকে ভারি ঠাট্টা করিয়াছিলেন যে গোতম নামেও যেমন কাজেও তেম্‌নি,—"গো-তম" বা মস্ত গরু। কারণ এই সব চর্ম্মস্পর্শী সমালোচকের মতে (এমন সমালোচকের এ যুগেও অসম্ভব নাই) সুখ দুঃখের অতীত হওয়া ও যা, আর শিলাত্ব প্রাপ্ত হওয়া ও তা।

মুক্তয়ে য শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবত্যেব যথা বিদ্ম তথৈব সঃ॥

—যে মহামুনি শিলাত্ব প্রাপ্ত হওয়াই মুক্তি ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছিলেন তাঁহার নাম গোতম বলিয়াই জানা যায়। তোমরা তাঁহাকে যে নামে জান সেই নামেই তাঁহাকে বুঝিও।

এইরূপে পাঠক দেখিবেন শুধুই পণ্ডিতে পণ্ডিতে নহে, পণ্ডিতে অপণ্ডিতেও মোক্ষের স্বরূপ, স্বভাব, প্রভৃতির খুটী নাটি লইয়া বিবাদ ও বিদ্রূপ চলিয়াছিল, এবং এমন একটি সর্ব্বাতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া তাহা যদি না হইত, তবে সেটা খুবই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হইত।

কিন্তু মুক্তি কি শুধুই শাস্ত্রের বচন, কিংবা মুনিজনের মতিভ্রম, কিংবা রসিকের উপহাস মাত্র?—তা' যদি হইত তবে এযুগে কেন, কোন যুগেই কাহারই সে জন্য অত মাথা ব্যথা হইত না। মোক্ষ কোনই পৌরাণিক তত্ত্ব নহে, কিংবা অর্ক-ফলার আন্দোলন নহে। পণ্ডিত ও পুরাণ যদি যুগপৎ এ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত, তথাপি মুক্তির প্রশ্ন জগতে সমানভাবে বজায় থাকিত। কারণ আমাদের পক্ষে ঐ প্রশ্ন কোনই অবান্তর প্রশ্ন নহে,—উহা জীবের সহজাত প্রশ্ন, এবং সে প্রশ্ন হইতে কেহই কোন কালে নিস্তার পান নাই, এবং ভবিষ্যতেও পাইবেন না, এবং এই প্রশ্নের যদি কোন মীমাংসা থাকে তবে তাহাও কোন অবান্তর মীমাংসা নহে। তাহাই হইতেছে এই চির-চঞ্চল, অতিষ্ঠ-প্রহেলিকা স্বরূপ জীবন যাত্রার শেষ মীমাংসা ও সমাধান, আমাদের এই বিহিত জীবন-যন্ত্রের তাহাই চরম কৌশল, তাহাই আমাদের এই জীবন-সঙ্গীতের শেষ লয় ও তান। ইহা শুধু কবিজনোচিত অনুভবের মধ্যে, কিংবা উপমা ও অলঙ্কারের ভাষা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় না, ইহা দর্শন-বিদের সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারাও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের সমগ্র অন্তর্জীবনের (inner life) প্রতি যদি কেহ তাঁহার আন্তর্দৃষ্টিকে সংযত ও নিয়মিত করেন তবে তিনি কি দেখিতে পাইবেন? তিনি দেখিতে পাইবেন আমাদের এ জীবন এক ধারাবাহিক স্রোতের ন্যায় চলিয়াছে, ও চলিতেছে। এবং তাহার সেই চঞ্চল ও চলমান গতিতে, রূপ রূপান্তরকে খুঁজিতেছে, রস রসান্তরে পরিণাম লাভ করিতে চাহিতেছে, চিন্তায় চিন্তা বাড়িয়া যাইতেছে। সেখানে যেন স্থিতি ও স্থায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সেখানে সবই দ্রুত, সবই পলায়িত, সবই এই ছিল এই নাই, বাহিরের ন্যায় ভিতরের সকল জিনিষকেও, কাল তাড়া করিয়া চলিয়াছে। আবার আমাদের ভিতরে যে এক জ্ঞাতা ও বোধয়িতা অন্তর পুরুষ বাস করিতেছেন তাঁহার জ্ঞান ও বোধের চক্ষে এই অন্তঃপ্রবাহ যে রূপে দেখাইয়া থাকে তাহাও আমরা জানিতে পাই। তাঁহার দৃষ্টিতে, আমাদের অন্তর্গত বিশ্বরূপের কোন রূপই পূর্ণ নহে। সেই জন্য কিছুতেই তাঁহার পূর্ণ সন্তোষ নাই। তিনি একবার যাহা দেখেন, দ্বিতীয়বারে তাহা আর দেখিতে চাহেন না; একবার যাহার আস্বাদ লয়েন দ্বিতীয় বার তাহা বিস্বাদ হইয়া যায়। তাঁহার কাছে কোন রূপই পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত রূপ নহে, প্রত্যেক সুখ দুঃখের অনুভবই অপূর্ণ অনুভব, প্রত্যেক ইচ্ছা দ্বেষই অপূর্ণ ইচ্ছা দ্বেষ। এক ক্ষণের অধিক তাঁহার কোন কিছুতেই আস্থা নাই। এই জন্যই এই সমস্ত অপূর্ণকে, স্মৃতি-সোণার জলে ধৌত করিয়া তাঁহার চির-অতৃপ্ত চক্ষের সমক্ষে আবার আনিতেছে, মোহভ্রান্ত বাসনা ও কামনা। বড় আশা করিয়া সেই অপূর্ণকেই আবার চাহিতেছে, এবং ক্ষণমাত্র পরেই আবার তাহা ফেরৎ হইতেছে। এই রূপেই অন্তরাত্মার অন্তঃসংসার চলিতেছে।

এখানে আমরা বহিঃসংসারের কোন কথাই বলিতেছি না, কারণ কোনও স্বয়ং স্বাধীন বহিঃসংসার আমাদের পক্ষে নাই। যাহাকে আমরা বহিঃসংসার বলি তাহা

স্বরূপতঃ আমাদের অন্তর্গত সংসার। ইহা বলার অর্থ ইহা নহে যে বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছুই নাই; ইহা বলার তাৎপর্য্য হইতেছে যে বাহ্য জগৎ আমাদের মনের মধ্যে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়া মানস আকারেই প্রতীত হয়। এবং সেই প্রতীতির মধ্যে রজ্জুতে সর্পভ্রমের যথেষ্ট অবসর ও সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহাকে আগাগোড়াই রজ্জুতে সর্পভ্রম, ন্যায় অনুসারে বলা যাইতে পারে না। কারণ আমাদের জ্ঞান-বিধিতে রজ্জু যে রজ্জুই এবং তাহা সর্প নহে ইহা জানিবারও ব্যবস্থা আছে এবং তাহা যদি না থাকিত তবে রজ্জুজ্ঞান ও সর্পভ্রম দুই-ই তুল্য মূল্য হইয়া যাইত। অতএব বিশ্বরূপ নাই কিংবা তাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত, ইহা আমাদের উপযাচিত সন্দেহ (begging disbelief) নহে। কিন্তু অন্যদিকে ইহাও আমরা কখনই বিস্মৃত হই নাই যে, বিশ্বরূপ অস্তি বলিয়া যে প্রতীত হইয়া থাকে সে প্রতীতি আমাদের মন হইতে কোনই নিরপেক্ষ প্রতীতি নহে। সে অস্তিত্ব সর্ব্বথাই আমাদের মনের মধ্যে,—মন ও ইন্দ্রিয়াকারে প্রতীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বিধির অবধারিত কৌশল এই যে, বিশ্বরূপ এক জ্ঞাতা অন্তরাত্মার জ্ঞেয় মানস রূপেই প্রতীত হইবে, এবং তাহা অন্য কোন রূপেই প্রতীত হইবে না। অতএব অমৃত-ইচ্ছুক তত্ত্বদর্শী যখন অন্তরাত্মার দিকে অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাবৃত্ত করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তরাত্মার মধ্যেই অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব সমবেত হইয়াছে। কারণ তাঁহারা বিশ্বরূপ বলিতে কোনই পরাক্‌দর্শীর ন্যায় অন্তর-নিরপেক্ষ কল্পিত বাহ্যরূপ মাত্র বুঝেন নাই, তাঁদাদের প্রত্যক্‌ দর্শনে বিশ্বরূপের যে যথার্থ রূপ, ন্যায়তঃ বিচারতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছিল, সেই মনোময় বিশ্বরূপকেই তাঁহারা মহৎ-তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ বলিয়াছিলেন।

এবং অবিকল সেই কারণে তাঁহারা বাহিরের ইট্ কাঠকেই বস্তু ও পদার্থ বলিয়া, মনের নিজস্ব ভাব সকল, যথা ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতিকে, অবস্তু মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। কারণ তাঁহাদের তত্ত্ব দৃষ্টিতে রূপ রসের অস্তিত্ব ও মনের ভাব সকলের অস্তিত্ব, একই সমান মাটীর উপর দাঁড়াইয়া, অন্তরস্থ জ্ঞাতা পুরুষের কাছে তাহাদের দ্বিবিধ অস্তিত্বকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। এবং সেই জন্য একটিকে অবিশ্বাস করিয়া অন্যটিকে বিশ্বাস করিবার কোনই যুক্তিযুক্ত হেতু ছিল না। এবং ইহা যদি কোন আধুনিক ধারণার বিরোধী হয়, তত্রাচ মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বরূপ বলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মনোগত বিশ্বরূপ এবং মনের ভাব সকলই বুঝাইয়াছিল। সাংখ্যের আদিম তত্ত্বদর্শী অবিকল এই অর্থেই বলিয়াছিলেন সৃষ্টি হইতেছে দ্বিবিধ, —ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল বা "ভূতসৃষ্টি," এবং মনের ভাব সকল বা "প্রত্যয় সৃষ্টি"।

এই যে সৃষ্টি ও সংসার, ইহার মধ্যেই, শাস্ত্র ও পণ্ডিত ব্যতিরেকেও, আমরা কি কোনও মুক্তির অভ্রান্ত সংবাদ প্রাপ্ত হই না? এই যে আমাদের অন্তর রাজ্যের অফুরন্ত ও অতৃপ্ত আক্ষেপ ও বিক্ষেপ, রূপ হইতে রূপান্তরের ও রস হইতে রসান্তরের প্রবৃত্তি, এই যে চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে অবগাহন, ইহার বিচঞ্চল ভয় ও বিদ্রূত ভাবনা, ইহার অপূর্ণ উল্লাস ও অতৃপ্ত অবসাদ, ইহার "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ," ইহা কি আমাদের চিত্ত জগতের শুধুই ক্ষণস্থায়ী লীলা-বিভ্রম মাত্র, যাহার কোনই উদ্দেশ্য নাই, অভিসন্ধি নাই ও সঙ্গতি নাই? তাহা যদি হইত, তবে এ জীবন, দানবের অট্টহাস্য, প্রেতের আর্ত্তনাদ, ও উন্মাদের প্রলাপের ন্যায় এক অব্যবস্থিত অর্থহীন কিম্ভূত কিমাশ্চর্য্য জীবন হইত। এবং তাহার ভাব-পরম্পরার মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য থাকিত না, তাহার প্রত্যেক বিষয়টি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া কোনও এক অজ্ঞাত বিপথে হারাইয়া যাইত।

কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবক্রমে, এ জীবন তাহা নহে। ইহা কোনই উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অনভিসন্ধিত ও অস্বাভাবিক জীবন নহে। ইহা হইতেছে এক বিহিত, ব্যবস্থিত ও সঙ্গত জীবন যাত্রা। ইহার ধারাবাহিক স্রোত সর্ব্বথাই সংযত, নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট। ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এক বিহিত অভিসন্ধির ছাপ লাগিয়া আছে।

সেই অভিসন্ধি কি, তাহার বিবরণ লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক লাগিতে পারে, মুনিগণের মতিভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে অবশ্যই কোন-না-কোন অভিসন্ধি, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। কেন না যাহা কোনই অবধারিত অভিসন্ধি দ্বারা স্পৃষ্ট নহে, যাহার কোনই চরম অর্থ নাই, তাহা কোনই ব্যবস্থিত (ordered) বিষয় হইতে পারে না। তাহা কোনই ন্যায় ও বিধি-সঙ্গত সত্তা হইতে পারে না। সেই জন্য, অবশ্যই কোন না কোন অভিসন্ধির দ্বারা নিয়মিত ও সংযত হইয়া, এই জীবন, জীবন হইতে পারিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

কোনও অভিসন্ধিকে বিচারের আমলে না আনিয়া, বিগত শতাব্দীর উদ্দাম তত্ত্ব চিন্তার ফলে আমরা যে ভারে ভার দার্শনিক আকাশকুসুমের ফসল পাইয়াছিলাম, আমরা জানি তাহাতে বিংশ শতাব্দীর বুভুক্ষিত জঠর পরিতৃপ্ত হয় নাই। এবং সেই জন্যই এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই দার্শনিক অনুসন্ধান আবার গড়াইয়া আসিয়া প্রাচীন অভিসন্ধি-বাদের (Teleology) খানাতেই পড়িয়াছে। এই শতাব্দীর নব্যতম দর্শনবাদের নাম হইতেছে Pragmatism। এবং আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি এই অভিনব তত্ত্ব বিচারের তরণী, অলক্ষিতে ভারতবর্ষের প্রাচীন উপকূলের দিকেই ভাসিয়া আসিতেছে।

এই নব্যতম দর্শন-সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ দিবার স্থান ইহা নহে। তবুও সংক্ষেপে এক কথার মধ্যে বলা যাইতে পারে যে, Pragmatist বা Practical philosopher কোনই উদ্দাম কল্পনা অবলম্বনে তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তাঁহার তত্ত্ব বিচারের 'ধারা' হইতেছে,—আদি ও মধ্যকে অন্তের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া দেখা, পুষ্প ও কোরককে ফলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা, সঞ্চিত কল কব্জাকে তাহার অভিসন্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করা। এবং বিচারের এই অভিনব 'ধারা' অবলম্বনে অন্তর্জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইঁহারা এখন দেখিতেছেন—"The purposive character of our mental life must influence and pervade our most remotely congnitive activities." ৪ অর্থাৎ আমাদের মানসিক জীবনের অভিসন্ধিত ব্যবস্থা হইতেই আমাদের অসন্নিকৃষ্ট দূরতম অনুভবাত্মক প্রযত্ন সকল ব্যবস্থিত ও আকারিত হইতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় তত্ত্ব-বিচারের ইহা মন্বন্তর-প্রাচীন পুরাতন কথা। অভিসন্ধির অবধারণাই হইতেছে আমাদের তত্ত্ব-চিন্তার মূল মন্ত্র। এবং এই মন্ত্রের সাহায্যেই সৃষ্টি স্থিতির অপার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, এবং মুক্তিই তাহার চরম অভিসন্ধি বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। যে কয়টি অভিসন্ধির অবতরণিকা পার হইয়া অবশেষে আমরা অমৃত মোক্ষধামে উপনীত হইয়াছিলাম, সংক্ষেপের মধ্যে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে এই সৃষ্টি ও বিশ্বরূপ কোনই স্বয়ং স্বাধীন সৃষ্টি ও বিশ্বরূপ বলিয়া আমাদের কাছে প্রতীত হইতেছে না। ইহা আমাদের জ্ঞান-বিধির অভিসন্ধি অনুসারে, এক ইন্দ্রিয়গত ও মনোগত সৃষ্টি রূপেই প্রতীত হইতেছে। এবং সেই অভিসন্ধির অবধারিত কৌশলে শুধুই আমরা বিশ্বের সত্যরূপকে দেখিতেছি না, সেই সত্যরূপ ক্বচিৎ ভোগরূপে পরিণত হইয়াও প্রতীত হইতেছে। ইহা বুঝিবার জন্য একটি মাত্র উদাহরণের আবশ্যক হয়। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ চন্দ্র-সূর্য্যের রূপ কি বাস্তবিক ও সত্য রূপ? আমরা বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের দ্বারা যে বিপুল ও বিরাট সত্য চন্দ্র-সূর্য্যের বিবরণ জ্ঞাত হই, তাহাই কি আমাদের প্রত্যক্ষ চন্দ্র-সূর্য্য? তাহা অবশ্যই নহে। কেন নহে? কারণ ইন্দ্রিয়ের অভিসন্ধি ও কৌশল হইতেছে শুধুই সত্যরূপ দেখান নহে, সে কৌশলের মুখ্য অভিসন্ধি হইতেছে এই বিশ্বকে ভোগ্যরূপে পরিণত করিয়া এক

৪। Schiller's Humanism, p. 8

জ্ঞাতা ও ভোক্তাকে দেখান। তাই ইন্দ্রিয়, সত্য চন্দ্র সূর্য্যকে নহে, চন্দ্র-সূর্য্যের একটি উপভোগ্য কাব্যরূপকেই, প্রত্যক্ষ-ক্রমে তাহার জ্ঞাতৃপুরুষকে নিবেদন করিতেছে।

আবার শুধুই ভোগ নহে, ভোগ হইতেও উচ্চতর ও অন্যতর কিছু দ্বারাও জীবের কোন এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সত্য, অমৃতত্ব ও মোক্ষ। এবং সত্যকাম ঋষি সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পুষণ্ণপাবৃণ্ সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

—সুবর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পূষণ, সেই পাত্রকে উন্মোচন কর, আমি সত্য ধর্ম্মকে দেখিব।—এবং এই সত্য ধর্ম্ম দেখানও হইতেছে জীব-সৃষ্টির এক অবধারিত অভিসন্ধি,—তাহার অমৃত অভিসন্ধি।

শুধুই চন্দ্র-সূর্য্য নহে, এই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই ভোগের হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা অপিহিত হইয়া অন্তরাত্মার নিকট প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তথাপি সে অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। তাহা রূপ-রসের ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণ-চিত্রে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইতে অক্ষম। তাহা চাহে রূপ-রসের অতীত অন্য কিছু,—তাহার গন্তব্য হইতেছে এক রূপ-রসের অতীত প্রদেশ—যেখানে "ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ," প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না। তাহাই হইতেছে তাহার পরমা গতি, তাহাই তাহার চরমের মুক্তি, তাহাই অমৃত, নিঃশ্রেয়ঃ, অপবর্গ ও অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি। সেইখানেই তাহার অভিসন্ধিত সৃষ্টির অনভিসন্ধিত মহাপ্রলয়,—তাহার সংসার-ধারার শেষ সাগর সঙ্গম।

এবং সেই চরম সঙ্গমের বারতাকে বহন করিয়াই আমাদের জীবনের মুক্ত-ধারা ছুটিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ইহা শুধুই কবির কল্পনা নহে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য বিষয়। আমাদের জীবনের জাগ্রত নির্ঝরিণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাগরের মহা-আহ্বান প্রকম্পিত হইতেছে, এবং বাস্তবিকই তাহা শুনিতেছে—"ঐ যেন, ঐ যেন, সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।" এই জন্যই জীব, রূপের মধ্যে অরূপের গান, শব্দের মধ্যে স্তব্ধতার আকাঙ্ক্ষা এবং সংসৃতির মধ্যে বিরতির আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। অমোঘ ও দুর্নিবার ন্যায়ের বিধান অনুসারে আমাদের সর্ব্ববিধ গতির লয়, স্থিতির মধ্যেই নিহিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের এই অভিসন্ধিত ভোগ-যাত্রার অনভিসন্ধিত মুক্তি ছাড়া অন্য কিছুই, বিহিত ও ব্যবস্থিত পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। এবং এই জন্য প্রাচ্য মনীষিবর্গ, এই চঞ্চল, বিদ্রুত সংসারের চরম সফলতাকে, এক প্রিয় ও অপ্রিয়ের অতীত, রূপ-রসের দ্বারা অপরাহত অমৃতের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যেখানে,—

"ন তথায় দিন ভায়, ন নশীথতারা।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

শান্তি-নিকেতনে ব্রতী বালক সম্মিলন

(কলিকাতায় বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কর্ম্মিসংঘে পঠিত)

'ব্রতী বালক' অথবা Boy scouts কথাটা আমাদের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ পরিচিত না হইলেও অজ্ঞাত নহে। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অগ্ন্যুৎপাতে আমাদের যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এ দেশে এই ব্রতী-বালকের কায বহুদিন যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। দামোদরের ভীষণ প্লাবনে অথবা উত্তরবঙ্গের বন্যায় বাঙ্গালী যুবকের সেবার

কথা এ দেশে সকলেই জানেন। বাঙ্গালী যুবক নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া বন্যাপীড়িতের জন্য অন্ন ও বস্ত্র জোগাইয়াছেন এ দৃশ্য আমরা প্রত্যেক আকস্মিক বিপৎপাতের সময়ই দেখিয়াছি। Boy scout অথবা ব্রতী বালকের কায সেবা করা। ব্রতী বালক এই সেবাকেই ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। "ব্রতী বালক" কথাটী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট। Boy scout কথাটী যেন হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে না, ব্রতী-বালক কথাটীতে চোখের সম্মুখে সেবা-পরায়ণ কর্ম্মীর চেহারা ভাসিয়া উঠে।

লাট বেলাটের সম্বর্দ্ধনার সময় খাকির কোট পরা ফিতা বাঁধা বালকদলকে আমরা মাঝে মাঝে দেখিয়া থাকি। অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে Boy scoutsএর এই বুঝি কায। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, ইহাদের দ্বিতীয় কায ছুটাতে ছুটাতে দল বাঁধিয়া স্থানান্তরে গিয়া হল্লা করা। এরূপ ধারণা জন্মিবার প্রথম কারণ, এখনও এই আন্দোলনটীর শৈশব অবস্থা, দ্বিতীয় কারণ বালকেরা এখনও সম্বর্দ্ধনাদি ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকের কায ভিন্ন স্থায়ী বেশী কিছু করিতে পায় নাই। অনেকের ধারণা Boy scoutsএর পোষাক আসবাবের ব্যয়টাও এই গরীব দেশের উপযোগী নহে; এ সাজ-সজ্জা আমাদের সাধ্যাতীত।

আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার প্রসিদ্ধি আছে। কবিতায় ও ছন্দে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় এ দেশ পাইয়াছে। কবিতার ক্ষেত্র হইতে এই মৌলিকতা তিনি দৈনন্দিন ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তি-নিকেতনের শিক্ষা-পদ্ধতি এবং ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন-যাত্রা প্রণালী অভিনব। নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনে তিনি পল্লী-সংগঠনের যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও নূতন।

সম্প্রতি শান্তি-নিকেতনে ব্রতী-বালক সম্মিলনেও তাঁর মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। ব্রতী-বালক-সম্মিলনে বীরভূমের নানা বিদ্যালয় হইতে প্রায় দুই শত Scouts আসিয়াছিল। তাহাদের চোখে-মুখে আনন্দের ও কার্য্য-কলাপে যে শৃঙ্খলার পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে আশা হয় কবির কথা সত্য যে, Youngmen are the trustees of the nation. রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু
> সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

এই ব্রতী-বালক দলের মধ্যে বিস্তৃত বক্ষ-পট ও আনন্দ দেখিয়াছি। আশা হয় "দিন আগত ঐ।" শান্তি-নিকেতনের Scoutsদের মধ্যে বিশেষ করিয়া এই নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কর্ম্মে উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছি। আশা হয় বাংলার সমস্ত জেলা শান্তি-নিকেতনের এই আদর্শে যুবক-সঙ্ঘ গঠিত করিলে, পল্লী-সংগঠন সহজ সাধ্য হইবে।

ব্রতী-বালকের প্রধান কার্য্য নিজের দেহটী গঠন করা। আমাদের দেশের যুবক ও বালকদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংসৃষ্ট ছাত্র-মঙ্গল সমিতির (Students' Welfare Committee) রিপোর্টে প্রকাশ যে, প্রতি ৩টী ছাত্রের মধ্যে ২টি ছাত্র এমন ভাবে পীড়িত যে তাহাদের আশু চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেকেই অবগত আছেন যে আমাদের গড় পরমায়ুর হারও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য সকল দেশেই গড় পরমায়ুর হার ৪০ বৎসরের বেশী; আমাদের এই দেশে ২২ বৎসর মাত্র। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর অভিভাবকেরা রাখেন না, ছেলে এগজামিন পাশ করিলেই অভিভাবক খুসী। ফলে কুব্জদেহ ন্যুব্জ পৃষ্ঠ এক-দল অর্দ্ধমৃতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কদের মধ্যেই যক্ষ্মা রোগ প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। ইহার সামাজিক অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যায়াম-চর্চ্চার ও দেহ গঠনের প্রতি তাচ্ছিল্যও যে একটি প্রধান কারণ এ কথা ধ্রুব সত্য। ব্রতী বালককে প্রথমতঃ নিজের শরীর-চর্চ্চা করিতে হয়। বাঙ্গালী যুবকের অস্বাস্থ্যতার কথা সর্ব্বজন বিদিত। শারীরিক যোগ্যতার যেখানে আবশ্যক, সেই সব ক্ষেত্রেই

বাঙ্গালী হঠিয়া যাইতেছে। ফলে দেশে চাকরীরও অভাব ঘটিতেছে। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, হাওড়া, শিয়ালদা ষ্টেশনে অথবা গোয়ালন্দের ঘাটে বাঙ্গালী মজুর পাওয়া যায় না। শারীরিক যোগ্যতার অভাব ও কর্ম্মে অনুৎসাহ যেন বাঙ্গালী জাতির মজ্জাগত হইয়া পড়িতেছে।

ব্রতী বালকগণ নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা শরীর গঠন করিবে। শরীর ও মন গঠন প্রথম চাই।

নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আজ্ঞাপালনে ঐকান্তিকতা (discipline) আমাদের মধ্যে বড় কম দেখা যায়। ইহার ফলে এই হয় যে, আমরা মিলিয়া মিশিয়া কোন বৃহৎ কায করিতে পারি না। আমাদের রাজ-নীতি-ক্ষেত্রেও যেমন কর্ম্মী (follower) অপেক্ষা নেতার সংখ্যা অধিক, যুবকদের ও বালকদের মধ্যেও তেমনি দেখা যায় যে, দলাদলি বড় প্রবল। ইহাতে জাতির অকল্যাণ হয়। ছেলেবেলা হইতে পরস্পরকে ভালবাসার প্রবৃত্তি এবং নির্দ্দিষ্ট চালকের আজ্ঞাপালনে আসক্তি না জন্মিলে উত্তর কালে ঐ সব গুণের বিকাশের অবকাশ হয় না। ব্রতী-বালককে শৃঙ্খলাবর্ত্তী হইতে হইবে। ব্রতী দলনায়কের আদেশ অবনতশিরে বহন করিতে হইবে—"They are not to reason why, They are but to fight and die."—নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি তাহাদের এমনই একনিষ্ঠতা চাই। বাল্যকাল হইতেই আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যিনি হুকুম তামিল করিতে পারেন, তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর। নেতা হওয়া বড় সহজ? লিডারি করা বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। ঈর্ষা স্বার্থপরতা আদপে থাকবে না তবে লিডার।" ব্রতী বালককে এমন ভাবে দৈনন্দিন জীবনে দলনায়কের আজ্ঞানুবর্ত্তন অভ্যাস করিতে হইবে যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত দোষ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া তাহাকে সমাজ সেবার উপযুক্ত করে। ব্রতী বালককে ড্রিলের মধ্য দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্ব স্ব প্রাধান্যের যুগে এই শিক্ষা জাতি গঠনের দিক দিয়া অত্যাবশ্যক। দেহ ও মনের এই শিক্ষা—harmonious development of mind and body. ইহাই জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান দোষ ইহাতে দেহ ও মনের একসঙ্গে বিকাশ হয় না। অমৃতবাজার পত্রিকা বর্ত্তমান শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"What really is necessary is the sort of education that promotes a sound mind in a sound body, A person with such equipment is better fitted than the one who has got a more liberal or a mere technical education, for he has all avenues of work open to him, having the power of initiative, the dash and the courage." ব্রতী বালককে প্রথমতঃ দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যায়াম, drilling ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কায শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি স্কুল কলেজে এই অভিনব শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্রতী বালকের দেহ ও মন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে ভালবাসিতেও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ছেলেবেলা হইতে আমরা যে শিক্ষা পাই তাহাতে দেশের প্রতি আমাদের বিদ্রোহের ভাব জন্মে।" সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদন নাই। রামা কি খায় কি ভাবে—নন্দের ফটিকচাঁদ তাহার খোঁজ খবর রাখেন না।" Classes ও Massএর সহিত প্রাণের যোগই নাই একথা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিতের ভয় ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রধান কারণ শিক্ষিতেরা দেশবাসী অশিক্ষিত জনসাধারণের সুখ দুঃখের খোঁজ খবর রাখেন না। স্বামীজি বলিয়াছেন, "ভুলিওনা নীচ জাতি, মুর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী

ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই।" যতদিন না শিক্ষিতেরা সেবার মধ্যে দিয়া জনসাধারণের প্রীতি ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন ততদিন দেশে স্থায়ী একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। জন সাধারণের মধ্যে বন্যা ও দুর্ভিক্ষে কায করিয়া আমরা দেখিয়াছি তাহারা এখনও শিক্ষিতের সাহচার্য্য চায়। ব্রতী বালকগণ শান্তি নিকেতনের চতুষ্পার্শে এই সেবা কার্য্য গ্রহণ করিয়া কি ভাবে দেশবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া অমৃত বাজার বলিয়াছেন,—"These Boy scouts were looked upon with suspicion by the village elders when they were first organised and began their operations. They now not only look upon the Boyscout as their friend but have been inspired by his example to act in co-operation among themselves for common good."

কি উপায়ে বীরভূম জেলায় এই সেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাহারা কতটা কাম করিয়াছে তাহার একটা বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শান্তি নিকেতনের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমানে ২৩টী কেন্দ্রে ৬০৮ টী ব্রতী বালক কায করিতেছেন। কি করিয়া এক বৎসর মধ্যে এই কর্ম্মীদল গঠিত হইল সে ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ ও অনুকরণীয়। গত বৎসর শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে কয়েকটী শিক্ষককে scouting, প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid), বয়ন (weaving), রঞ্জন (dyeing), কৃষি, পল্লীস্বাস্থ্য ও সংগঠন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষিত কর্ম্মীগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ে ব্রতীবালক দল গ ন করিয়াছেন। প্রত্যেকটী বিদ্যালয়কে এইরূপে সেবা সমিতির ক্ষেত্র করিয়া তোলা হইয়াছে। বীরভূমের অস্বাস্থ্য প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়াকে "প্রবাসী" সম্পাদক ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বলিয়াছেন—বীরভূমের দ্বিতীয় স্থান। ম্যালেরিয়া দূরীকরণার্থে এই ব্রতী বালকেরা ২০৯টী বদ্ধ ডোবা পরিষ্কার করিয়াছেন ও উহাতে কেরোসিন ঢালিয়া ম্যালেরিয়ার সমূল বিনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কুইনাইন বিতরণ, রাস্তা প্রস্তুত করণ, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ও অধ্যাপনা করিয়া যুবকেরা দেশের আপামর সাধারণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। মেলাতে মেলাতে সেবা কার্য্য করিয়া আলোক চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যনীতির ও পল্লী সংগঠনের উপায় প্রচার করিয়া এই ব্রতীদল জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছেন।

ব্রতীদল গঠনের বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, বড় বড় রাজপুরুষেরা আসিলে বালকদিগকে এই ভাবে সর্ব্বদা সম্বর্দ্ধনায় ব্যবহার করা অশোভন। শান্তি নিকেতনের ব্রতীদলকে এরূপ কোন বাধ্যকর কায করান হয় না। ইহা ছাড়া দেশের অবস্থার দিকে তাকাইয়া কর্ম্মকর্ত্তারা বালকদিগকে একটা বিশেষ uniform পরার জন্যও চাপ দেন না। বিরুদ্ধবাদীরা আরও বলেন যে, ইহাতে ছাত্রদের পাঠের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শান্তি নিকেতনের কর্ম্মকর্ত্তারা অভিজ্ঞতার ফলে বলিতেছেন যে ব্রতী বালকেরা খেলা ও পাঠ দুইয়েতেই বেশ উন্নতি দেখাইতেছেন। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে All work and no play made Jack a dull boy—কথাটী সত্য।

এই আন্দোলনটীকে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে—

(১) প্রথমতঃ একটী জেলা কেন্দ্রের প্রয়োজন। ঐ কেন্দ্রে অভিজ্ঞেরা ও বিশেষজ্ঞেরা কর্ম্মীদের শিক্ষা দিবেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক হাই ইংলিশ স্কুল হইতে এক একজন শিক্ষককে ঐ কেন্দ্র সমিতিতে শিক্ষা দেওয়াইতে হইবে।

(৩) শিক্ষক নিজ নিজ স্কুলের বালকদের মধ্যে উহার প্রবর্ত্তন করিবেন। প্রতি হাই স্কুল এই ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী মধ্য ইংরাজী স্কুলগুলিতে এবং মধ্য ইংরাজী

স্কুলগুলি পাঠশালাতে এই ব্রতীদল গঠন করিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই একদল কর্ম্মী গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৪) ব্রতী বালক দিগকে scouting, weaving, agriculture, village sanitation প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্র নিজ নিজ ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে পল্লী সংগঠন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইয়াছে। বাংলার সহর ও গ্রামের সংখ্যা ৮৯ হাজার। এগুলিকে অর্থব্যয় করিয়া সংগঠন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। Scouting এর মধ্য দিয়া এই সংগঠন কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজে ও অল্প ব্যয়ে হইবে। ব্রতী বালক এইরূপে দেশসেবকে পরিণত হইবে। আজ দেশে স্বাস্থ্যহীনতা প্রবল, সংঘবদ্ধতার বড় অভাব, পল্লীগ্রামে চুরি ডাকাতি ও গুণ্ডামি অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ব্রতী বালকেরা এই সমস্তকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবেন। আজ মানুষ চাই, কর্ম্মী চাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশী সমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য—মনুষ্যত্ব, ক্ষত্র বীর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে, ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন প্রদান করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে। ধীরে অথচ নিস্তব্ধ ভাবে কায করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

ব্রতী বালকদল দেশের এই কর্ম্মী ও খাঁটি মানুষের অভাব দূর করিবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী।

বেদান্ত দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ—তর্কপাদ।

(৫)

আমরা এতক্ষণ সাংখ্য-মতের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। দেখিয়াছি, কেন আমরা সাংখ্যদিগের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ গ্রহণ করিতে পারি না। সম্প্রতি আমরা ন্যায়-বৈশেষিকদিগের পরিকল্পিত পরমাণুবাদ সম্বন্ধে আমাদের কি কি বলিবার আছে, তাহা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাঁরা প্রধানতঃ চারি জাতীয় পরমাণুর কল্পনা করিয়া থাকেন। স্থূল কোন বস্তুকে মনে মনে বিভাগ করিতে করিতে, যেখানে যাইয়া বিভাগের শেষ হয়, আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না;—সেই অতিসূক্ষ্ম বিন্দুকে ইহাঁরা পরমাণু বলেন। আর বিভাগ হইতে পারে না বলিয়া পরমাণু—নিরবয়ব; পরমাণুর কোন অংশ নাই। উহার দেশ, ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি নাই। উহা কাযেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। চারি জাতীয় অসংখ্য পরমাণুর রূপ রসাদি গুণ বা ধর্ম্ম স্বীকৃত হইয়া থাকে। কেননা, উহারা বলেন যে, কারণে যে ধর্ম্ম থাকে, কার্য্যদ্রব্যেও সেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। স্থূল পদার্থ মাত্রই যখন রূপ রসাদির উত্তেজক, তখন উহারা যে পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেও রূপ রসাদি ধর্ম্ম নিশ্চয়ই আছে।

এই অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর, ইহাঁরা একপ্রকার 'পরিমাণ' স্বীকার করিয়া থাকেন। উহাকে উহাঁরা 'পরিমণ্ডল'

নামক পরিমাণ বলেন। ইহা একরূপ মণ্ডলাকার (spherical) পরিমাণ; কিন্তু ইহার দেশ-ব্যাপ্তি নাই।১ এইরূপ দুইটী পরমাণুর মিলনে 'দ্ব্যণুকের' উৎপত্তি হয়। এই দ্ব্যণুকেরও একরূপ পরিমাণ আছে। এই পরিমাণকে ইঁহারা অণুত্ব (minute) ও হ্রস্বত্ব (short) নামে অভিহিত করেন।২ দ্ব্যণুকও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। যখন দুইটী পরমাণুর মিলনে দ্ব্যণুক জন্মে, তখন, এই যে দুই পরমাণুর মিলন, এই মিলন সর্ব্বতো-ভাবে মিলন নহে। পরমাণুদ্বয় মিলিত হইলেও, উহাদের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকিয়াই যায়। নতুবা উহাতে অগ্নি প্রবেশ করিতে পারিত না; ক্রমে ক্রমে স্থূলতাও উৎপন্ন হইতে পারিত না। এই জন্যই উপস্কার-টীকায় "দ্বিত্বস্য ...অপেক্ষাবুদ্ধিজন্যস্য" বলা হইয়াছে।

ন্যায় বৈশেষিকগণ মনে করেন যে, এই দ্বিত্ব সংখ্যার ফলেই দ্ব্যণুকে অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ উৎপন্ন হয়; উহারা পরমাণুগত পরিমণ্ডল নামক পরিমাণের ফল নহে। দুইটী পরমাণু একত্র মিলিত (ফাঁক রাখিয়া) হইয়াছে বলিয়াই ত, দ্ব্যণুক জন্মিয়াছে; সুতরাং এইরূপ মিলনের ফলেই, উহাতে 'অণু' ও 'হ্রস্ব' নামক পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ তিনটী দ্ব্যণুক মিলিলে, তবে একটী 'ত্র্যণুক' উৎপন্ন হয়। এই ত্র্যণুকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে; সুতরাং উহার দেশ ব্যাপ্তি আছে। এই ত্র্যণুক হইতেই বস্তু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং; এই ত্র্যণুকের 'মহৎ' (bigness) ও 'দীর্ঘ' (length) নামে পরিমাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। এ স্থলেও, দ্ব্যণুক-গত সংখ্যা হইতেই ত্র্যণুকে এই দুই পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ—উৎপন্ন হয়; ইহারা দ্ব্যণুক-গত অণু ও হ্রস্ব নামক পরিমাণ হইতে জন্মে না।৩ কিন্তু পরমাণুগত রূপ রসাদি হইতে কার্য্যদ্রব্যে রূপরসাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ন্যায় বৈশেষিকদিগের ইহাই প্রক্রিয়া।

এখন, আমাদিগের উপরে ন্যায় বৈশেষিকগণ যে দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা দেখিব। আমরা বলিয়াছিলাম যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে, অচেতন জগৎ উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কেন না, কার্য্য দ্রব্যে কারণ দ্রব্য হইতে কিছু বৈলক্ষণ্য, কিছু ভেদ থাকিবেই। নতুবা প্রকৃতি ও উহার বিকারে কোনই ভেদ থাকে না; দুই-ই—এক বস্তু হইয়া উঠে। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে উহার কিছু না কিছু ভেদ থাকিবেই। উভয়ের মধ্যে যেমন একত্ব থাকে, তদ্রূপ উহাদের মধ্যে ভেদও থাকে। আমরা এই কথাটা বলিয়াছিলাম। নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছিলেন যে, কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে উৎপন্ন হওয়াই যখন নিয়ম; তখন চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগৎ কিরূপে হইবে? জগৎ যখন অচেতন, জড়; তখন উহার কারণটিও অচেতন, জড়ই ত হওয়া উচিত। উহার কারণটী চেতন, ব্রহ্ম—ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? অচেতন, জড় পরমাণুকেই, অচেতন জড় জগতের কারণ বলিয়া স্থির করাই উচিত।

কিন্তু আমাদিগের উপরে, নৈয়ায়িকগণের এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিবার কোনই অধিকার নাই।

১। ইহাকে জ্যামিতি শাস্ত্রের 'বিন্দু' বলায় হানি কি? ইহা শক্তি বা ক্রিয়ার 'কেন্দ্র'স্বরূপ। ইহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন দেশব্যাপ্তি বা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ নাই। ইহা কল্পিত বস্তুবিশেষ হইলেও, ইহার এক প্রকার অবস্থিতি আছে।

২। এই দ্ব্যণুককে জ্যামিতিক 'রেখা' (line) বলায় দোষ কি? দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরত্বকে 'রেখা' বলা যায়। সুতরাং, দ্ব্যণুকের মধ্যেও যখন দূরত্ব আছে, তখন উহা রেখা ভিন্ন আর কি হইবে? কিন্তু দ্ব্যণুকেরও দেশব্যাপ্তি নাই, উহাও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। কল্পিত হইলেও উহার একরূপ দৈর্ঘ্য আছে।

৩। এই জন্য ইহা স্বীকৃত হয় না যে, কারণ দ্রব্য হইতে কার্য্যদ্রব্য স্থূলতর বা মহত্তর বলিয়াই দৃষ্ট হয়। যেমন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর; মহৎ হইতে মহত্তর। এই নিয়মানুসারে, অণু হইতে যাহা জন্মিবে তাহা তদপেক্ষা অণুতর; হ্রস্ব হইতে যাহা জন্মিবে তাহা হ্রস্বতর হইবারই কথা। কিন্তু অণুতর ও হ্রস্বতর হইতে হইলে, 'ত্র্যণুকে' মহত্ত্ব পরিমাণ বা দীর্ঘত্ব পরিমাণ আসিতে পারিত না। উহা দ্ব্যণুক হইতেও অণুতর হইত। এই জন্যই দ্ব্যণুক-গত তিন সংখ্যা হইতেই, ত্র্যণুকের মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ জন্মে বলা হইয়াছে।

কেন না, তাঁহাদিগের নিজের প্রক্রিয়াতেও এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা এই মাত্র দেখিয়া আসিলাম, ত্র্যণুকে যে মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব নামক পরিমাণ আসিয়াছে, তাহার কারণ দ্ব্যণুক-গত পরিমাণ নহে। আবার দ্ব্যণুকে যে অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব নামক পরিমাণ আইসে, তাহারও কারণ, পরমাণুগত পরিমাণ নহে। তাহা হইলেই, কারণগত ধর্ম্ম যে কার্য্য দ্রব্যে সেই ধর্ম্মই উৎপন্ন করে, এই নিয়মটা থাকিল কোথায়? সুতরাং কার্য্য-জগতে কারণ দ্রব্যের বিলক্ষণ ধর্ম্ম যে উৎপন্ন হইতেই পারে না, এ কথা ত টিকিতেছে না। আর যদি এ কথা ঠিকই হয়, তাহা হইলে ত্র্যণুকের পরিমাণ, দ্ব্যণুক হইতে ভিন্ন হইল কেন? কেন ত্র্যণুকে দ্ব্যণুক-গত অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব আসিল না? কেন উহাতে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পরিমাণ দেখা দিল? সুতরাং, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইবে, ইহাতে ন্যায় মতে বাধা কোথায়?

ন্যায়-বৈশেষিক যদি এই আপত্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন যে—দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকাদি দ্রব্যগুলি আপন আপন কারণের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ 'পরিমাণ' দ্বারা আক্রান্ত থাকায়, কারণগত পরিমাণ উহাতে উৎপন্ন হইতে পারে না; কিন্তু, ব্রহ্ম বিরোধী কোন ধর্ম্ম দ্বারা ত জগৎ আক্রান্ত থাকে না যে, উহাতে ব্রহ্মের ধর্ম্ম চৈতন্য আপনাকে উৎপন্ন করিতে পারিবে না! কেন না, জড়ত্ব ত চৈতন্যের বিরুদ্ধ কোন ধর্ম্ম নহে; উহা চৈতন্যের অভাব (Negation) মাত্র।—কিন্তু, ন্যায়-বৈশেষিকের একথাটী যুক্তিযুক্ত নহে। দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ত কোন বিরুদ্ধধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত থাকে না: উৎপন্ন হইবার পরক্ষণেই উহাতে কারণ অপেক্ষা ভিন্ন পরিমাণ দৃষ্ট হয়। কেন না, তাঁহাদের মতে, কার্য্য দ্রব্যটী উৎপন্ন হইবার মুহূর্ত্তে, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম বর্জ্জিত থাকিয়াই মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করে। আবার পরমাণুগত 'পরিমণ্ডল' পরিমাণটী আপন কার্য্য দ্রব্যে, ভিন্ন একটা পরিমাণ জন্মাইবার জন্য ব্যগ্র বা ক্রিয়াশীল থাকে বলিয়াই, দ্ব্যণুকাদি কার্য্য দ্রব্যে আপন ধর্ম্মকে উৎপন্ন করে না,—একথাও নৈয়ায়িকগণ বলিতে পারিবেন না; কেন না, তাঁহারা ত দ্বিত্ব সংখ্যাকেই দ্ব্যণুক-গত পরিমাণের কারণ বলিয়া থাকেন; 'পরিমণ্ডল'কে ত উহার কারণ বলেন না। সুতরাং, পরিমণ্ডলটাই যে অপর একটা পরিমাণে জন্মাইতে ব্যগ্র থাকে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারিবেন না।৪ কিংবা দ্ব্যণুক-গত অণুত্ব পরিমাণ যে ত্র্যণুকে অপর পরিমাণ জন্মাইতে ব্যগ্র থাকে তাহাও বলিতে পারা যাইবে না। আবার কার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ থাকাকেও কারণ বলা যায় না। কেন না কার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে কারণগত বহুত্ব সংখ্যারও যে প্রকার সম্বন্ধ, কারণ গত পরিমণ্ডল বা অণুত্ব প্রভৃতি পরিমাণেরও ত তদ্রূপ সম্বন্ধ। সুতরাং বহুত্ব সংখ্যাটাই কার্য্যদ্রব্যে আপন ধর্ম্ম উৎপন্ন করিবে, আর পরিমণ্ডলাদি পরিমাণ আপন পরিমাণকে কার্য্যদ্রব্যে উৎপন্ন করিবে না—ইহার হেতু কি হইবে? তবেই দেখা যাইতেছে যে, কারণগত ধর্ম্ম, কেন যে কার্য্যে, আপন ধর্ম্ম উৎপন্ন করে না, ইহার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণের

৪। **শঙ্করাচার্য্য এইস্থলে এই কথার প্রমাণার্থে কয়েকটী বৈশেষিক সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম সূত্রের অর্থ এই যে দুই পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যা হইতেই দ্ব্যণুকে অণুত্ব (Minute) পরিমাণ উৎপন্ন হয়। ত্র্যণুকে যে মহত্ত্ব পরিমাণ (big) দৃষ্ট হয়, দ্ব্যণুক গত বহুত্ব সংখ্যাই উহার কারণ, কেন না তিনটী দ্ব্যণুক না হইলে একটী স্থূল ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না। তিনটী রেখা মিলিয়াই (পরস্পর ফাঁক রাখিয়া) ত বস্তু উৎপন্ন হয়। তাহার ক্রমে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট দ্রব্য (solid) ইন্দ্রিয় গোচরে আইসে না। কারণগত বহুত্বের ন্যায় কারণগত মহত্ত্ব এবং কারণগত 'প্রচয়' নামক শিথিল সংযোগ হইতেও কার্য্যদ্রব্যে মহত্ত্ব পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্ব্যণুকে যে অণুত্ব পরিমাণ আছে, তাহা হইতে ত্র্যণুকে মহত্ত্ব পরিমাণ আসিতে পারে না, কেননা অণুত্ব পরিমাণটী মহত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিমাণ। মহত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দেশ-ব্যাপ্ত বিশিষ্ট; কিন্তু—অণুত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং উহার দেশ-ব্যাপ্তি নাই। সুতরাং পরিমণ্ডলই বল, আর অণুত্বই বল ইহারা কেহই আপন আপন কার্য্যগত পরিমাণ জন্মাইতে ব্যগ্র থাকিতে পারে না, কেন না উহারা ত এই পরিমাণগুলির কারণই নহে।**

স্বভাবই এইরূপ যে, উহা জগতে আপন ধর্ম্ম চৈতন্যকে উৎপন্ন না করিয়া, অচেতন জড়কেই উৎপন্ন করিয়া থাকে। এ কথার উপরে নৈয়ায়িকদিগের বলিবার কিছুই নাই।

কথা হইতেছিল, চেতন বস্তু হইতে অচেতন জড় জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে কিনা। 'পরিমাণ' ত দ্রব্য নহে; উহা একটা গুণ। তুমি সেই কথার উদাহরণে, এক পরিমাণ হইতে অপর পরিমাণ উৎপন্ন হয় বলিয়া 'গুণের' কথা উত্থাপন করিয়াছ। ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।—নৈয়ায়িকগণ আমাদিগকে এরূপ দোষ দিতে পারেন। কিন্তু মহর্ষি কণাদ নিজেই দ্রব্যের কথা বলিতে গিয়া গুণের উদাহরণ দিয়াছেন।—ইহাতে যদি দোষ না হয়, তাহা হইলে আমাদের দোষই বা কোথায়? প্রাণি-দেহ পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত কিনা, এই বিষয়টীর আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, পঞ্চভূতের মধ্যে কতকগুলি ভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যেখানে এই উভয় প্রকার বস্তুর সংযোগ হয়, সেখানে তাহার ফলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণি-দেহ ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। সুতরাং প্রাণি-দেহ পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত নহে, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। কেন না পঞ্চভূতের সংযোগে যদি প্রাণিদেহ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারিত না। কেন না, পঞ্চভূতের মধ্যে কোন কোন ভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কণাদ নিজেই এইরূপে দ্রব্যের কথায় গুণের উদাহরণ দিয়াছেন। কেন না প্রাণিদেহ ত একটা দ্রব্য; সংযোগ ত একটা গুণ।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতে পারিতেছি যে,—কারণ হইতে উহার কার্য্যে যে স্বজাতীয় ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এমন কিছু নিয়ম নাই; বিজাতীয় ধর্ম্মও উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চেতন ব্রহ্মবস্তু হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হওয়ায় কোন বাধা নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

শ্রীপঞ্চমীর পঞ্চম

প্রথম

কিরণময় কল্পলোকে, রাজহংস সমাকুলিত, শ্বেত-শতদল শোভিত, সুধাময় 'সত্য' সরোবর তীরে, বিশ্বারণ্যের অভ্যন্তরে সুবাসিত সাহিত্য-কানন সমীপে, প্রশান্তি কুটীরে মহাদেবী সরস্বতী সুন্দরী সহচরীগণের সহিত বিরাজ করেন। সে স্থান জনাকীর্ণ হইলেও সতত নীরব, নিরুপদ্রব; বিশ্বারণ্যের উদ্যানপালেরা নীরবে জলসেচন, বৃক্ষ রোপণ করে, পূজার্থিনীরা নীরবে পুষ্প চয়ন, দুর্ব্বা আহরণ করেন; কেবল সঙ্গীত সমাজের রাগ রাগিণীগণ মহাদেবীর মনোরঞ্জনার্থে, সুমধুর সুর তান লয় সমন্বিত সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি করিয়া সে প্রদেশের নীরবতা কদাচিৎ কখনও ভঙ্গ করেন।

শ্রীপঞ্চমী সমাগতা, অদ্য চতুর্থী তিথি; সপ্তলোক-বাসীরা মহা সমারোহে সরস্বতী পূজার আয়োজন করিতে-ছেন। দশদিক হইতে দিক্‌পালগণ নিমন্ত্রণ পত্র বহন করিয়া মহা- দেবীর চরণ সমীপে সমাগত হইতেছেন।

দেবী বীণাপাণি এবার কোন্ লোকে, কাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন, জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গিনীগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন; এমন কি, সত্য সরোবরের রাজহংসকুলও আকুল হইয়া, ঘন ঘন বিশাল পক্ষ বিস্তার ও গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে লাগিল, দেবী ভারতী কখন বিশ্বারণ্য হইতে বহির্গতা হইবেন; তিনি যে তাহাদের মধ্যে কাহার পৃষ্ঠ অলঙ্কৃতা করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করিবেন, জানিবার জন্য তাহারাও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

দিবা অবসান হইয়া আসিল; তখনও মহাদেবী সরস্বতী, সাহিত্য কাননের অদূরবর্ত্তী মনঃশিলাতলে উপবেশন করিয়া, সহাস্য বদনে আগন্তুকদিগকে অভিবাদন করিতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত 'স্নুতার' নামক অপূর্ব্ব বীণা যন্ত্রটি অযতনে এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে দাঁড়াইয়া বাণীর পালিতা কন্যা 'দুষ্ট সরস্বতী' এক একবার সেইদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; মনের অভিপ্রায়, এই স্নুযোগে মাতার বীণাটি হাতে তুলিয়া লইয়া একটিবার বাজাইয়া দেখেন। কিন্তু যদি তাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, বীণাপাণির বড় সাধের বীণা যদি তাঁহার হাতে বেস্নুর বাজে, এই ভয়ে বীণাটি ধরিতে সাহস পাইতেছেন না।

দিক্‌পাল ও দেবর্ষিদিগের অনেক অনুরোধেও মহাদেবী তাঁহাদের আবাসে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন না। ব্রহ্মলোক হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার দূত আসিলে তিনি তাঁহাকেও বলিয়া দিলেন, 'জগদ্‌গুরুকে বলিও, এবার আমি যাইতে পারিব না; আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গায়ত্রী দেবী যাইবেন।"

অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত, পারিজাত পুষ্প শোভিত, দেবরাজের নিমন্ত্রণ পত্রখানি পবন দেব মহাদেবীর পাদ-পদ্মে প্রদান করিয়াই চঞ্চল চরণে চলিয়া গেলেন; তিনি কি বলেন, শুনিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিলেন না।

বিষ্ণুলোক হইতে দেবর্ষি নারদ বীণাধ্বনি করিতে করিতে কল্পলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভারতী দেখিলেন, সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর স্বহস্ত-লিখিত নিমন্ত্রণ পত্রখানি তাঁহার হস্তে শোভা পাইতেছে; ইহা দেখিবামাত্র মহাদেবীর মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল, বিশাল নয়ন যুগল বিস্ফারিত করিয়া অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি নারদ মুনিকে কহিলেন, "এই পত্রখানা তুমি ফিরাইয়া লইয়া লও; তাঁহাকে বলিও আমি আর সেখানে যাইব না! তিনি যখন লক্ষ্মী দেবীকে লাভ করিতেই সমধিক যত্নবান তখন মনে প্রাণে তাঁহারই অর্চ্চনা করুন! আমি মৌখিক কিছুই গ্রহণ করি না।"

বীণাপাণির এইরূপ বাণী শুনিয়া, সহর্ষ হৃদয়ে দেবর্ষি নারদ ঢেঁকী বাহনে বৈকুণ্ঠ অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। হর্ষের কারণ, লক্ষ্মী দেবীর সমক্ষে এই কথা গুলি বিষ্ণুর চরণে নিবেদন করিতে পারিলে তাঁহার একটি অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সকলে চলিয়া গেলে সর্ব্বশেষে দেবগুরু বৃহস্পতি আসিয়া করযোড়ে কহিলেন, "মা! এই দীনের আবাসে একবার আপনাকে পদার্পণ করিতে হইবে।"

কিছুকাল নীরবে অবস্থান করিয়া বীণাপাণি কহিলেন, "দেবগুরু, এবার আমার কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না; কল্পনা দেবীকে বলিব—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া দেব-পুরোহিত পুনরায় কহিলেন, "এ কথা তো আমি শুনিব না মা! আমি যে সারা বৎসর এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।"

এই আকুল আহ্বান বিফল হইল না; জননী স্বয়ং যাইয়া দেব-পুরোহিতের পূজা গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বৃহস্পতি স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বিতীয়

কল্পনা দেবী তখন মহাদেবী সরস্বতীর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "মা! এবারেও কি আপনি নরলোকে যাইবেন না? দেবী বস্নুমতী প্রতি বৎসর আপনার আগমন প্রতীক্ষা করেন।"

ব্যথিত স্বরে বীণাপাণি বলিলেন, "বিষ্ণুর স্বষ্ট জীবেরা সকলেই লক্ষ্মী দেবীর ভক্ত, বস্নুমতীর সন্তানেরা লক্ষ্মী লাভের উপায় স্বরূপেই আমার আরাধনা করে; সেখানে আমি কি করিতে যাইব?"

"সেখানে আপনার ভক্তও তো অনেক আছে মা! এদিকে একবার চাহিয়া দেখুন, ভারতবর্ষের এই প্রান্তে, বঙ্গ সন্তানগণ আপনি আসিবেন ভাবিয়া কত আনন্দ করিতেছে; বিশেষ কবি-কাননে আপনি না গেলে

কবিদিগের মনে বড়ই কষ্ট হইবে। সে স্থানের সেবিকারা কত যত্নে পূজার আয়োজন করিয়া কত আগ্রহে আপনাকে আহ্বান করিতেছে! কোন্ অপরাধে ইহাদিগকে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবেন মা?"

ভগবতী ভারতী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কল্পনা দেবি! বঙ্গকবিগণের পূজা গ্রহণ করিতে, আমার হইয়া তুমিই তবে সেখানে যাও। আমার এখন কিছুই ভাল লাগিতেছে না; আমি শুধু দেবগুরু বৃহস্পতির পূজা গ্রহণ করিব; সেখান হইতে ফিরিবার সময় নন্দন কাননে দেবেন্দ্রাণী শচীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি, আর কোথাও যাইব না।"

বালিকা 'দুষ্ট সরস্বতী' ছুটিয়া আসিয়া মাতার হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, আপনি তো দেবলোকে গিয়া কত নাচ গান দেখিয়া শুনিয়া আসিবেন; আমি বুঝি কিছু দেখিব না? আমাকে কল্পনা দেবীর সহিত বঙ্গভূমিতে যাইতে অনুমতি দিন, আমি বায়োস্কোপ দেখিতে খুব ভালবাসি।"

মহাদেবী গম্ভীর মুখে কহিলেন, "না; তুমি সেবারে সেখানে গিয়া বড় অনিষ্ট করিয়াছ, সাহিত্যিকগণের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়াছে; সাহিত্যক্ষেত্রে কৃষাণরা সেই হইতে বীজ না বুনিয়া, আগাছা ও কাঁটা গাছ রোপণ করিতেছে; ফলে সেই সাহিত্যক্ষেত্র এখন এমন হইয়াছে যে, সেখানে আমি আর যাইতে পারি না। যে সাহিত্য কানন পূর্ব্বে পুষ্প পাদপে পূর্ণ ছিল, তুমি তাহা কণ্টকারণ্যে পরিণত করিয়াছ!"

মাতার কথা শুনিয়া কন্যার মুখ মলিন হইল, চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; বালিকা দুষ্ট সরস্বতী কাতর স্বরে কহিলেন, "আমি তো কিছুই করি নাই মা, কাহারও সহিত কথাও বলি নাই; তবে কেন এ রকম হইল? মা, আমাকে সেখানে যাইতে দিন! কল্পনা দেবী তো শুধু কবিকাননে যাইবেন; আমি আর সকলের পূজা গ্রহণ করিয়া, বায়োস্কোপ দেখিয়া চলিয়া আসিব, কোন অনিষ্ট করিব না। কেহ জানিতেও পারিবে না যে এবার আপনার পরিবর্ত্তে আমি আসিয়াছিলাম।

সহসা আকাশপথ আলোকময় হইয়া গেল। পক্ষিরাজ গরুড়ের ভীষণ পক্ষ সঞ্চালন শব্দ সকলের কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। সেই শব্দে চমকিত হইয়া, আকাশে চক্ষু তুলিয়াই মহাদেবীর সহচরীরা হাসিয়া বলিলেন, "এ কি! ভগবান বিষ্ণু যে আপনার নিকটে নিজেই আসিতেছেন, মা দেখুন!"

নীল আকাশের নিম্নভাগে, নীলাঞ্জনয়ন নীল দ্যুতিময় মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া দেবী সরস্বতীর মধুর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি ঈষৎ হাসিয়া কল্পনা দেবীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভগবান বিষ্ণু যখন আসিতেছেন, আমাকে দেখিতেছি বিষ্ণুলোকেও যাইতে হইবে। তবে তুমিই দুষ্ট সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া মর্ত্ত্যলোকে যাইও; দেখিও, সে যেন সেখানে কোনও দুষ্টামী করিতে না পারে—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, দুষ্ট সরস্বতী বেণী দুলাইয়া আনন্দিত মনে কল্পনার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। সর্ব্বদেবেশ্বর ত্রিলোকপতি বিষ্ণু পক্ষিরাজের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবামাত্র, মহাদেবী হাসি মুখে উঠিয়া পূজাপাদ অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা সকলেই সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেলেন। পক্ষিরাজ গরুড়ও পথশ্রম-জনিত ক্লান্তি ও ক্ষুধা অপনোদনের উদ্দেশ্যে, যেখানে শিখীকুল, মেঘমল্লারের আলাপ শুনিয়া কলাপ তুলিয়া নৃত্য করিতেছিল, সর্পগণের অন্বেষণের নিমিত্তে সেখানে গমন করিলেন।

ভগবান বিষ্ণুর সহিত ভগবতীর কি কি কথা হইয়াছিল, সেস্থানে কল্পনা দেবী উপস্থিত না থাকাতে কেহই তাহা অবগত হইতে পারিল না; তবে সকলেই কিয়ৎকাল পরে দেখিতে পাইল, তাঁহারা উভয়ে সহাস্য বদনে গরুড়াসনে উপবেশন করিয়া বিষ্ণুলোক অভিমুখে গমন করিতেছেন; তদ্দর্শনে বিদ্যারণ্যের বিদ্যাদায়িনী ও বিদ্যার্থিনীরা সকলেই প্রশান্তি কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, ভূলোক, দ্যুলোক, ভুবলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয়

হিরণ্ময় হংস-রথে আরোহণ করিয়া, নর নয়নের অগোচরে কল্পনা দেবী দুষ্ট সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গময়ী বঙ্গ রাজধানী কলিকাতার কবিকাননে আগমন করিতেছেন। বঙ্গ কবিদিগকে কল্পনা দেবী বিশেষ অনুগ্রহ করেন; নহিলে তিনি তাঁহাদের জন্য অত্যুজ্জ্বল কিরণময় কল্পলোক ছাড়িয়া, সত্য লোক, পুণ্যলোক প্রভৃতি পবিত্র লোকে না গিয়া, আলো বায়ুহীন কুলিশ কঠিন কলিকাতার কবিকাননে আসিতে চাহিবেন কেন? এই কবিকানন সামান্য হইলেও তাঁহার অতি প্রিয় স্থান, ইহা মুনিজনের তপোবনের ন্যায় মনোরম। ভারতের তপোবনে পূর্ব্বে সকল দেবতাই আসিতেন, এ স্থানে আসিতে তাঁহারা ভালবাসিতেন। কল্পনা দেবীও ভাল বাসিয়াই আসিতেছেন। বালিকা দুষ্ট সরস্বতীও এখানে আসিবার জন্য মাতার নিকট কত আবদার করিয়াছেন।

দুষ্ট সরস্বতী মাতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি এবারে সেখানে গিয়া কোনও অনিষ্ট করিব না, কেহ জানিতেও পারিবে না যে—" ইত্যাদি। তাঁহার এই কথা যে কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, দেখা যাউক।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত এক অন্ধকার, দুর্গন্ধময় দরিদ্র পল্লী। সেখানে সূর্য্য দেব, পবন দেব প্রভৃতি উদারচিত্ত দেবতারাও গমন করিতে ইচ্ছা করেন না!

চতুর্থীর প্রভাত; শ্যামপুকুরের একটি জীর্ণ খোলার বাড়ীর একটি ঘরে, উড়িষ্যাবাসী, অধুনা কলিকাতা প্রবাসী ও উপবাসী নটবর পাণ্ডা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

কখন্ সকাল হইয়াছে; খোলার ঘরের মৃত্তিকালিপ্ত বেড়ার ফাঁক দিয়াও এখন একটু একটু সূর্য্যের কিরণ দেখা যাইতেছিল। অর্থ চিন্তা নটবরকে এত পীড়িত করিয়াছে যে, সে আর সেই সুমলিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছে না।

বেচারা আজ তিন চারি মাস বেকার বসিয়া রহিয়াছে; এবার দেশ হইতে আসিয়া সে কোথাও কায পায় নাই। কলিকাতার মত সহরে, যেখানে নারীগণ রন্ধন গৃহে যাইতে হইলেই বিপদ জ্ঞান করেন, অগ্নির উত্তাপ তাঁহাদের মনে জুজুর ভয় উৎপাদন করে—'দুই গণ্ডা তঙ্কা' খরচ করিয়া এমন স্থানে আসিয়াও নটবর যে একটা সামান্য রান্নার কাযও যুটাইতে পারিল না, ইহা তাহার নিকট নিতান্ত দুর্দ্দৈব বলিয়া বোধ হইতেছিল। হাতে আর কিছুই নাই, ঘরের ভাড়া দিতে পারিতেছে না, আহার বন্ধ হইবারও উপক্রম হইয়াছে; তঙ্কার লোভে দেশ ছাড়িয়া, বিশেষ জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়া আসিয়া বড় মুস্কিলেই সে পড়িয়াছে।

ঘরের এক কোণে পর্য্যুসিত অন্ন চাপা দেওয়া রহিয়াছে; সেদিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে হইল, কাল শ্রীপঞ্চমী; সর্দ্দার ঠাকুরের কাছে গেলে হয় ত একটা ঠিকা রান্নার কায মিলিতেও পারে, কাল তো অনেক বাড়ীতেই পূজা হইবে। এই ভাবিয়া নটবর উঠিয়া বসিল; তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াই অন্য ঘর হইতে সে একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কার ধ্বনি শুনিতে পাইল—

"বলি পাণ্ডা ঠাকুর, এত বেলায় তোমার ঘুম ভাঙল? অবাক করলে মা! এদিকে যে দু'মাসের ঘর ভাড়া বাকী পড়েছে, সে ভাবনা বুঝি একটুও হয় না? না বাপু, এমন করলে এখানে তুমি কি ক'রে থাকবে? ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঘর দেখে তাহলে উঠেই যাও—"

অসাবধানে পতিত, ভগ্ন কাংস্য খণ্ডের মত অন্য ঘরে হইতে আর একটি কণ্ঠ ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, 'হাঁ গা মাসি! এই সকাল বেলায় অমন ক'রে তুমি বকচ কাকে? ঐ উড়েটাকে বুঝি? তোমার যেমন মাসী, খেয়ে দেয়ে কায নেই, উড়ে এনে বাড়ীর ভেতরে জায়গা দিলে? বল্লুম তখন কত কোরে, আর দিন কত সবুর কর, আমি বেলফুলকে এনে ঐ ঘরে বসাব। তখন যেমন শুনলে না, তেমনি এখন ভুগতে থাক; একটি পয়সা ভাড়া আদায় করতে পেরেছ কখনো ওর কাছ থেকে?"

অনুতপ্তা বাড়ীওয়ালী বলিল, "বামুনের ছেলে মা, ছুটো হাতে পৈতে জড়িয়ে এসে ধরলে; ঘরটাও খালি পড়ে

ছিল, অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না, ভাড়া দিয়ে দিলুম। তখন কি আর ওকে অমন জন্মকুড়ে বলে জানি ? একটুও নড়তে চায় না, ঘরে বসে কখনো কায পাওয়া যায় ? শুনচ গা, অ ঠাকুর ! এখানে তোমার থাকা পোষাবে না, আজ পষ্ট করেই বলে দিচ্চি ; ভাড়াটা দিয়ে ঘর দেখে শীগ্‌গির করে উঠে যাও দিকিন !"

তখন অন্য সব ঘর হইতেও, "মাগো, উড়েকে আবার কেউ বাড়ীতে থাকতে দেয় ! যেমন বিশ্রী, তেমনি নোংরা, ঘরখানার দশা করেছে দেখ না !" এই সব গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে নটবর ঠাকুর মহা অপরাধীর মত কলতলার কায সারিল। সে ভাবিয়াছিল, পান্তা ভাত কয়টা মুখে দিয়া একেবারে কাযের চেষ্টা করিতে যাইবে ; কিন্তু মন এত খারাপ যে, জগন্নাথকে স্মরণ করিয়া তখনই সে বাহির হইয়া পড়িল।

লোকে বলে, ভগবান ব্রাহ্মণের কষ্ট সহিতে পারেন না ; বিশেষ নটবর পূর্ব্বে পুরীতে জগন্নাথের পাণ্ডা ছিল, নীলমণির পরামর্শ না শুনিলে এখনও তাহাই থাকিত ; সুতরাং জগন্নাথ দেবের দয়া সে সহজেই লাভ করিল।

শ্যামপুকুর ছাড়িয়া গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়াই নটবর দেখিল, একখানা বড় মোটর ভোঁ ভোঁ করিয়া যাইতে-যাইতে তাহাকে দেখিয়াই থামিয়া পড়িল ; একটি যুবক মোটর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যস্ত ভাবে ডাকিল, "ঠাকুর, ঠাকুর, শোন ! তুমি বেশ ভাল রাঁধবার বামুন টামুন দিতে পার ?"

"মোরা তো বাবু ঐ কাযই করছি।" বলিয়া নটবর মোটরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল ; বাবুটি তাড়াতাড়ি তাহার হাতে একখানা কার্ড দিয়া বলিল, "তবে এই কার্ড খানা রাখ, এই ঠিকানায় কাল সকাল বেলা আট জন বামুন নিয়ে যেও ; পূজো বাড়ী, অনেক রান্না করতে হবে, আমি এই নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি। আমাদের বাড়ী ভবানীপুরের এদিকে, সাহেব পাড়ায়, ৩৫ নং এলেন রোড, মনে থাকবে ? সে সাহেব বাড়ীর মতই দেখতে, রায় বাহাদুর ফণী মিত্তিরের বাড়ী বল্লেই সেখানকার সবাই দেখিয়ে দেবে। অনেক লোক খাবে সেখানে, রান্না পরিবেষণ সব তোমাদেরই করতে হ'বে। শীগ্‌গির ক'রে যেও, বুঝলে ?"

"হ বাবু! ভোর ভোর উঠিকিরি মোরা ভবানীপুর রওনা হউ যাব, আর কিছু কহিতে হ'ব না।" বলিতে বলিতে নটবর কার্ডখানা যত্ন করিয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে লাগিল। আনন্দের আতিশয্যে সে রোজের 'তঙ্কা' ঠিক করিতেও ভুলিয়া গেল। তাহার আগ্রহ দেখিয়া বাবুটিও নিশ্চিন্ত চিত্তে চলিয়া গেল।

নটবর তখন আড্ডায় গিয়া, তাহার মতই বেকার আর সাত জন উড়িয়াকে এই কাযের জন্য ঠিক করিয়া ফেলিল ; ভবানীপুর—অত দূরে যাইতে তাহারা প্রথমে একটু অমত করিয়াছিল, কিন্তু 'সাহিব বাড়ীর' কায শুনিয়াই এখানে 'অধিক তঙ্কা মিলিব' বুঝিতে পারিল ; তখন আর দূরে যাইতে তাহাদের আপত্তি রহিল না।

নটবর বাসায় আসিতেই বাড়ীওয়ালী বলিল, 'কি গো ঠাকুর, এখনি যে ফিরে এলে, কাজ টায কিছু পাওনি বুঝি ?'

"হ, পাউছি, পাউছি" বলিতে বলিতে নটবর ঘরের কোণে গিয়া পান্তা ভাতের নিকটে বসিল ; মনের আনন্দে সে অন্ন তাহার নিকটে অমৃতের মত, 'জগন্নাথের প্রসাদের মত, খাইতে মধুর লাগিয়াছিল।

চতুর্থ

পঞ্চমীর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া নটবর হাতা, খুন্তি, ছাঁকনা, ইত্যাদি রাঁধিবার জিনিস লইয়া, সদল বলে 'সাহিব বাড়ীর' উদ্দেশে যাত্রা করিল।

বালিকা দুষ্ট সরস্বতীকে লইয়া কল্পনা দেবী তখন আকাশ পথে আসিতেছেন ; কলিকাতার নিকটে আসিয়া কবিকাননের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে বোধ হয় ভাবাবেশ হইতেছিল, বিশাল নয়ন যুগল আকাশে স্থির করিয়া তিনি কি সেখানে তারই প্রতিরূপ দেখিতেছিলেন ?

এসব কথা ঠিক করিয়া বলা সুকঠিন; মানুষের মনের ভাবই বুঝিতে পারা যায় না, কল্পনা দেবীর মনের কথা কে বলিতে পারিবে? দুষ্ট সরস্বতীর মনে কখনও এরূপ কোনও ভাবের উদয় হয় না; তিনি চঞ্চল নয়নে চারিদিক দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন, পৃথিবীর প্রভাতের শোভা তাঁহার মনকে বিমোহিত করিতেছিল।

কলিকাতার মধ্য ভাগে, সুবিশাল বিদ্যামন্দিরের সম্মুখে রথ হইতে অবতরণ করিয়াই তিনি একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। কয়েক জন টিকিধারী কুৎসিত লোক, কতক গুলি কালো কি সব জিনিস হাতে লইয়া, ত্বরিত পদে পথ বহিয়া চলিয়াছে; তাহাদের মধ্যে এক জন আবার এক খানা কার্ড অতি যত্নে উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে! তাঁহার মনে কাহারও অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা ছিল না; বালিকা-স্বভাব বশতঃ অদম্য কৌতূহলের বশীভূতা হইয়া তিনি কার্ড খানা অদৃশ্য হস্তে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহাতে মাত্র একটি নাম ও ঠিকানা ইংরাজী অক্ষরে লিখিত দেখিয়া, উহা অপ্রয়োজনীয় বোধে পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

কিছু দূরে গিয়াই নটবর দেখিল, তাহার হাতের সেই কার্ড খানা নাই! এদিক ওদিক চাহিয়া যখন কোথাও সেখান দেখিতে পাইল না, তখন সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; তাহার শুধু মনে আছে ভবানীপুরের সামনে সাহেব বাড়ী, বাবুটির আর সব কথাই সে ভুলিয়া গিয়াছে; ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছে শুনিলে সহচরগণ তাহাকে তিরস্কার করিয়া এখনই বাসার দিকে ফিরিয়া চলিবে এই ভয়ে সে তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিল না; বিপদ-বারণ জগন্নাথের নাম স্মরণ করিয়া চারিদিক চাহিতে চাহিতে ট্রাম রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল।

হাইকোর্টের নিকটে আসিতেই ফরসা হইয়া গেল; শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে, সূর্য্যদেব সেদিন আরও উজ্জ্বল রূপে উদিত হইলেন। নটবরের দল দ্রুত গতিতে এত পথ হাঁটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কোন্ বাড়ীতে তাহাদিগকে কায করিতে হইবে ঠিক করিতে না পারিয়া, সকল বাড়ী সম্মুখে আসিয়াই উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ তাহাদিগকে ডাকে কি না। সঙ্গীরা যখন জানিতে পারিল যে ঠিকানা লেখা কাগজ খানা এই একটু আগে পথে আসিতে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তখন তাহারা নটবরকে তীব্র তীরস্কার করিতে লাগিল। নটবর বুঝিতে পারিল না সে কি দোষ করিয়াছে; সে তো আর কাগজ খানা ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তবে কেন অত কথা শুনিতে যাইবে? উড়িয়াদিগের কলহ শুনিতে ক্রমে সেখানে অনেক লোক জড় হইল। এক জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উড়িয়ারা 'সাহিব বাড়ী' যাইতে চাহে শুনিয়া, উঁহাদিগকে দত্ত সাহেবের প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখাইয়া দিয়া গন্তব্য পথে গমন করিল।

দত্ত গৃহিণী তখন সবে মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন; দাস দাসীরাও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলে, বেলা না হইলে কাহারও ঘুম ভাঙ্গে না; কেবল একজন ঝি একটু আগে উঠিয়া ষ্টোভ ধরাইয়া গরম জল চাপাইয়াছে। গৃহিণী বাথরুমে গিয়া দেখিলেন, তখনও গরম জল, সাবান ইত্যাদি মুখ ধুইবার সব জিনিস ঠিক করিয়া রাখা হয় নাই। বিরক্ত চিত্তে বারান্দায় আসিয়া তিনি ভৃত্যবর্গকে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার জন্য উপদেশ দিতে দিতে দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন উড়িয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়া ঝিকে কি জিজ্ঞাসা করিল; ঝি তখন ফুটন্ত গরম জলের কেটলী লইয়া তাড়াতাড়ি বাথরুমে রাখিতে যাইতেছিল, কথার উত্তর দিল না; উড়িষ্যাবাসীরা ব্যাকুল ভাবে আরও সব কি বলিতে বলিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিতে লাগিল। তাহাদের এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া দত্ত গৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "একি লা ক্ষেন্তি! জানা নেই, শোনা নেই, কতকগুলো উড়েকে ওপরে নিয়ে আসচিস কেন? দূর করে তাড়িয়ে দে ওদের! রাম

ভরোসকে ডাক্ না হয়, ঘাড় ধরে ধরে সব বার করে দিক্ !"

তখন সন্তোথিত রামভরোস আসিয়া, "বাহার যাও, জলদি বাহার যাও! কোন্ তুম্ লোক্‌কো ভিতরমে ঘুসনে দিয়া, এইও উল্লুক!" ইত্যাদি মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে করিতে উহাদিগকে পথে বাহির করিয়া দিল; নটবর মিনতি করিয়া যাহা বলিতে চাহিল, তাহা শ্রবণ করাও সে প্রয়োজন বোধ করিল না।

এই ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া অপর উড়িয়াগণ এখন বাসাতে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত বোধ করিল, কিন্তু নটবরের মন তাহাতে সায় দিল না; এতদূর আসিয়া, লাঞ্ছিত হইয়া শুধু হাতে সে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না, সেই 'সাহেব বাড়ীটি' খুঁজিয়া বাহির করাই স্থির করিল। এখন ফিরিয়া গেলে এই কাযটি তো হাতছাড়া হইবেই, আজ আর অন্য কোথাও কায পাইতে পারিবে না। এই সব ভাবিতে ভাবিতে নটবর আরও খানিক দূর যাইয়া, সুন্দর গেটওয়ালা একটী বড় বাড়ী দেখিয়া সঙ্গীদের সহিত সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহিরে কাহাকেও না দেখিয়া সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

এবার তাহারা সত্যই সাহেব বাড়ীতে আসিয়াছে। মিঃ জেম্‌স্ মার্টিন সাহেব এই বাড়ীতে বাস করেন; প্রাতরাশ সমাপন করিয়া, তখন তিনি টেবিলের উপরে পা তুলিয়া দিয়া সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মন কিছুতেই সেদিকে যাইতে চাহিতেছে না। পূর্ব্ব দিনের বিলাতী মেলে মিসেস্ মার্টিনের পত্র পাইয়া অবধি তাঁহার মন বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতেছে।

তাঁহার কারবারের অবস্থা এখন আর তেমন ভাল নাই; এ দেশের দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা নন্ কো-অপারেশন করিয়া বিলাতী জিনিসের বিক্রয় কমাইয়া দিয়াছে, বাজার মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। এরকম অবস্থাতেও তিনি যে লরাকে অত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লরা কিন্তু তাহাতে একটুও খুসী হন নাই, তিনি আরও অনেক বেশী টাকা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। কি অন্যায়! এমন জানিলে কি তিনি কখনও বিবাহ করিতেন? বিশেষ লরাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না, মিস্ রুবিকেই তিনি হৃদয়াসনে স্থান দিয়াছিলেন। কেমন করিয়া যে কি হইল, কোথা হইতে লরা আসিয়া মিস রুবিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল—সে সব কথা মনে পড়িলে এখন তাঁহার অনুতাপ ভিন্ন আর কি করিবার আছে?

যে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার সংশোধন তো সহজে আর হইবে না! অনেক দিন হইয়া গিয়াছে; এখন শুধু মিস রুবির কথা ভাবিলে মনে যে আনন্দ হয়, সেইটুকুই তাঁর লাভ; আজও মিঃ মার্টিন একাগ্রচিত্তে সেই চিন্তাই করিতেছিলেন, কি রকম একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, কয়েকজন অতি অসভ্য, অর্দ্ধনগ্ন নিগার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দারোয়ান কোথায় গেল? এই 'বেগার'দের দেখিবামাত্র ক্রোধে সাহেবের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি হুঙ্কার দিয়া ডাকিলেন, "এই ডরওয়ান!" আর বলিতে হইল না; সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া শশব্যস্ত শশকের মতই উড়িয়ারা সভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইল; দারোয়ান বেহারারাও ছুটিয়া আসিয়া উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে গেটের বাহির করিয়া দিল।

'সাহেব বাড়ীতে' প্রবেশ করিবার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়া ভীত, ক্ষুব্ধ নটবর সঙ্গীদের সহিত ভবানীপুরের পথে আসিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল। ইহার উপরে সঙ্গীরা আবার তাহাকে 'শড়া' প্রভৃতি বলিয়া অপমান করিল, বাসাতে গিয়া মারিকিড়ি পকাইয়া দিবারও ভয় দেখাইতে লাগিল; উহার কথা শুনিয়াই ত ভবানীপুরে আসিয়া তাহাদের এই দুর্গতি!

নটবর নীরবে সব শুনিল। সে বোধ হয় তখন বাক্‌-শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছিল; নহিলে উড়িয়া কখনো কলহের এমন সুযোগ ছাড়িতে পারে?

পঞ্চম

জগন্নাথদেব অবশেষে ভক্তের প্রতি কৃপা করিলেন। নটবর দেখিতে পাইল, ঐ যে, সেই মোটর খানাই না

আসিতেছে! বাবুটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া মোটর হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া বলিল, "ও ঠাকুর তোমরা এখানে এসে বসে আছ? আমি এদিকে যে—যাক্। এখন চল তো আর একটুও দেরী করো না।"

মোটর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল; উড়িয়ারা তাহার সহিত ছুটিতে ছুটিতে এলেন রোডে, মিত্র মহাশয়ের বৃহৎ বাড়ীর ভিতরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গৃহিণী এতক্ষণ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছিলেন, বাবুটিকে দেখিয়াই হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তখনই তাঁকে বলেছিলুম, অতুল সরকারকে এ সকল কাযের ভার দিও না; সে কি সে সব কিছু বোঝে? কেবল মোটর নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাবুগিরি করে বেড়াতে পারে। বেলা আটটা বেজে গেছে, এখন তুমি যজ্ঞি রাঁধবার বামুন নিয়ে এলে! কখন কি হ'বে বল দেখি? আমি তবু বাড়ীর ঠাকুরদের ডাল টাল গুলো চড়িয়ে দিতে বলেছি। যাও ঠাকুররা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, রান্নাঘরে যাও, আরো দুটো উনুনে আগুন দিয়ে শীগ্‌গির করে রান্না চড়িয়ে দাও। আজ খাওয়া দাওয়া হ'তে একেবারে বেলা গড়িয়ে যাবে দেখছি; 'ঝক্কি' তো আর কাউকে পোয়াতে হয় না, তাই যার যা খুসী তাই করে। হাড় জ্বলে যায় শুধু আমারই!"

একথা গুলি শুনিতে অতুল সরকারের ভাল না লাগিলেও, নটবর একেবারে হাতে আকাশ পাইল; সে তখন সেদিনের সকল লাঞ্ছনা ভুলিয়া, রান্নাঘরে গিয়া, দেশের ভাষায় বক্তৃতা করিতে করিতে হাতা নাড়িতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। "আপনি কিছু ভাববেন না, আমি এখুনি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" বলিতে বলিতে অতুলও একদিকে সরিয়া পড়িল।

কল্পনা দেবী কবি কাননে বসিয়া কাব্যালোচনা করিতেছেন, দুষ্ট সরস্বতী ঘুরিয়া ফিরিয়া পূজা দেখিয়া বেড়াইতেছেন; এ বাড়ীর পূজার বিশেষ আয়োজন দেখিয়া এখানেও একবার পদার্পণ করিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহারা যখন সরস্বতী পূজার এত আয়োজন করিয়াছে, ভক্তিও সেইরূপ করিবে, ইহাদিগের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারিবেন। কিন্তু সে সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বাড়ীর সকলেই আহারের আয়োজন ও নিমন্ত্রিত দিগের অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত; বালক বালিকাদিগেরও সেই ভাব দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন।

গৃহিণীর কনিষ্ঠা কন্যা নিভা জানালার পরদা সরাইয়া বার বার পথের দিকে চাহিতেছে, আর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "দিদি কখন আসবে মা? পূজো আরম্ভ হয়ে গেল, কৈ দিদি তো এখনো এল না।"

মাতা বলিতেছেন, "আসবে, বিভা এখুনি আসবে; তোর দাদা যখন আনতে গেছে, তারা তখন পাঠাবেই।"

রাস্তায় মোটর থামিবার শব্দ শুনিয়াই নিভা নীচে নামিয়া গেল, বালক বালিকারা সকলেই তাহার অনুসরণ করিল। 'দিদি ভাই, এসেছিস?' বলিয়া নিভা দিদির হাত ধরিয়া উপরে লইয়া আসিল; তাহার পর কত কথা, কত গল্প আরম্ভ হইয়া গেল, সরস্বতী পূজার কথা তাহাদের আর মনে রহিল না।

পৃথিবী ও কল্পলোকের প্রভেদ চিন্তা করিতে করিতে দুষ্ট সরস্বতী বিমর্ষ চিত্তে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

পূজা হইয়া গেল; বালক বালিকারা অঞ্জলি ভরিয়া সচন্দন পুষ্প পত্র সরস্বতী প্রতিমার পদে অর্পণ করিল; পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণা লইয়া চলিয়া গেলেন। পরমানন্দে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া নিভা প্রতিমার সম্মুখেই দিদির সহিত তাস খেলিতে বসিল; আজ তাহাদের পড়িতে হইবে না, বড় আনন্দ! তাহার উপরে অনেক দিন পরে দিদি আসিয়াছে, এত আনন্দ তাহারা আর মনের ভিতরে রাখিতে পারিতেছে না।

দুষ্ট সরস্বতীর বিরক্তির ফল এইবার ফলিতে লাগিল; দুই ভগিনীর এক ঘণ্টা পূর্ব্বের অত প্রণয় ভীষণ কলহে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! তাস খেলার তুচ্ছ হার জিৎ লইয়া ভগিনীদ্বয়ের বিবাদ ক্রমে ক্রমে চরমে উঠিতেছে দেখিয়া জননী আসিয়া অতি

কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। ক্রন্দন ও কথা কাটাকাটি করিয়া মনটা হালকা হইলে, পরে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, নিশ্চয় এখানে এবার দুষ্ট সরস্বতী আসিয়াছিলেন, নহিলে তাহাদের এমন মতি গতি হইবে কেন ?

এস্থান হইতে যাইয়াই দুষ্ট সরস্বতী সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ; তাহার ফল সাহিত্যিকগণ কিছু দিন পরে বুঝিতে পারিবেন।

কল্পনা দেবী তখনও কবি কাননে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কাব্যরসের আস্বাদন করিতেছিলেন, তিনি এসব ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা বেলা দুষ্ট সরস্বতী প্রধান প্রধান বিদ্যা-মন্দিরে বায়োস্কোপ দেখিতে যাইয়া সে সব স্থানের ছাত্রগণের প্রতিও কিঞ্চিৎ কৃপা-দৃষ্টিপাত করিলেন ; সারা দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া আর কবিকাননে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন না ; সেখানেই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, কল্পনা দেবী আসিলে কল্পলোকে চলিয়া যাইবেন।

শ্রীহেমমালা বসু।

বাদল দোলা

আজ আষাঢ়ের লাগ্‌লো দোলা শালের পাতায় পাতায়,
আম্‌লকী বন মাতায়।
উদাস বায়ের পরশ মাখি কুঁড়িতে কে মেল্‌লো আঁখি
শ্যামল তরু গাথায়।
মাঠের ছায়ায় নাচন লাগে মস্‌নে শীষের বোলে,—
নীলিম রেখার কোলে।
আদিম কালের রূপ-কুমারী জাগালো সব হিসাব করি
মনের জমা খাতায়।

শুক্‌নো পাতার ভিড় জমেচে তরুণ জীবন মূলে
চায় সে নয়ন তুলে।
দূরের গায়ে ওই যে নীলা বুঝি গো তার সহজ লীলা
বিজ্‌লী-কনক-চুলে।
নয়ন ধারার পিচ্‌কারী তার লাগ্‌লো যূথির শাখে,
কদম কুঁড়ির ফাঁকে।
চল্‌চে বাতাস হিমের চুমায় তৃণের বুকে পুলক ছোঁয়ায়
উতল নদীর কূলে।

বাদলে আজ কোন্ বিরহী করচে অতীত স্মরণ ?
চপল কাহার চরণ
দাগ রেখেচে মহোৎসবে তরুণ হিয়ায় কোন্ সে কবে
রক্ত লোহিত বরণ।
আলিঙ্গনে পায়নি কভু পথ চেয়ে তার অধীর—
ঢাল্‌তো হরষ মদির।
আস্‌বে কি সে এমন দিনে তাহারি সেই কুটীর চিনে,
করবে ব্যথা হরণ ?

পল্লবনে বাজ্‌লো কাঁকণ তরুণ প্রিয়ার হাসি
ঝর্‌ণা বাজায় বাঁশী,
গোলাপ-রাঙা গুল্ পরাগে ওই যে তাহার মুখটি জাগে
গান খানি যায় ভাসি।
দোল্ দিয়ে আজ বাদল দোলা মনের মণি-কোঠায়
কি ভাষ্ তাহার ফোটায় !
স্বপ্নপুরীর কোন্ সে মায়া বুকের কোণে আঁক্‌লো ছায়া
দূর সে পরবাসী।

বন্দে আলী।

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

রামরতন বলিতে লাগিল, "কিছু একটা করতে গেলেই তোমরা ভয় পাও—এটা পাপ, ওটা পাপ, সেটা পাপ। এটা—ওটা—সেটা যে সত্যই পাপ সে কথা তোমায় বল্লে কে? তুমি যাকে বলছ পুণ্য, সেটাই যে মহাপাপ নয়, তা কেমন করে জানলে? একসময় আমাদের দেশে কালীমন্দিরে নরবলি দিয়ে লোকে ভাবতো খুব পুণ্য হলো। এখন আবার তারাই ভাব্ছে ওটা মহাপাপ। চক্ষের উপর প্রতিদিন দেখ্ছ, জীবন একটা সংগ্রাম—বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের কত চেষ্টা! শুধু মানুষের কেন—জীব জগতেরই তাই। ঐ যে উদ্ভিদ দেখছ, ওদের মধ্যেও সেই নিয়ম। বাঘ হরিণ খায়; তুমি আমি মাছ মাংস খাই; পরগাছা আসল গাছকে খায়; এ সব কি তবে পাপ? যদি কিছু পুণ্য কর্ম্ম থাকে তবে সেটা বেঁচে থাকার এই চেষ্টা। লোকে মানে শুধু সুখসম্ভোগ, সোহাগ—আর ভয় করে ব্যাধিকে —যাকে সে স্পষ্ট দেখে। মুখে বলে—সুখসম্ভোগ ছাড়, ও সব কিছুই নয়, শুধু ভগবানকে ডাক—এই যে মিথ্যার অভিনয় দিনের পর দিন চল্ছে, এ কি পাপ? যদি পাপ হতো, বিশ্ব, এতদিন সে পাপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু চেয়ে দেখ—সূর্য্য আজও তেমনি উজ্জ্বল, চন্দ্রকর তেমনি শীতল, ফুল তেমনি সুন্দর। চেয়ে দেখ, মানুষ সুখের সন্ধানে তেমনি ছুটছে, দু'হাজার বছর আগেও সে যেমন ছুটত। ধর্ম্ম যদি কিছু থাকে সে এইখানে —সে এইখানে!"

গোবিন্দলালের মনের ধাঁধাঁ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সংশয়াকুলিত চিত্তে সে কহিল, "কি জানি, বলতে পারি না।"

"তা' যদি বলতে না পার, তবে একথা কেন ভাব্ছ যে ঘাটোয়াল তার শোণিত প্রতিহিংসার জন্যে তোমার পিছনে ছুটে বেড়াবে, এবং তোমার জীবন কালে ত তোমায় ছাড়বেই না—মৃত্যুর পরও আরাজ হাতে ভগবানের বিচার মণ্ডপে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের জন্যে বাঘকে হরিণ ধরতে হয়। সে যদি পাপ হয়, তবে ভগবানের বিচার কালে বাঘও অনায়াসেই বলতে পারে—"হে ভগবান্, তুমি হরিণকে আমার খাদ্য করলে কেন? মাংস না খেয়ে যাতে আমি শুধু ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারি—তুমি আমাকে তেমন করলে না কেন? যখন আমাকে তৃণভোজী না করে মাংসাশী করেছ—তখন হরিণ ধরেছি বলে আমার আবার বিচার কিসের? দণ্ডই বা কিসের?"—মনে কর জীবনান্তে ভগবান্ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন, "গোবিন্দলাল, কেন তুমি নিরপরাধ ঘাটোয়ালকে হত্যা করলে?"—তুমিও তখন অনায়াসেই বলতে পারবে, "প্রভু, কেন তুমি আমায় পথের কাঙ্গাল করেছিলে? কেন রাজপুত্র করে' পৃথিবীতে পাঠাও নি? আমার যদি টাকার প্রয়োজন না দিতে তা' হ'লে ত আমি ঘাটোয়ালের কেশও স্পর্শ করতাম না। আমি দেখলাম তোমার জগৎ যুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক হাসছে, খেলছে—সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে। ধন, সম্পদ, প্রেম, সম্ভোগ, মান সম্ভ্রম—কিছুরই তাদের অভাব নেই। রম্য হর্ম্ম্য, প্রস্ফুটিত কুঞ্জকানন, সুন্দরী নারী, সুধাসম পেয়, মনোহর ভোজ্য, নয়নাভিরাম বেশ—যা কিছু কাম্য সবই তাদের প্রচুর আছে দেখলাম। আমায় কেন তবে শুশুনিয়ার পাথর কাটতে পাঠিয়েছিলে—কেন তবে সরযূ লাভের পথে বিরাট বাধা এনে দিয়েছিলে? কেন তবে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও আমি চারিটি দানা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নি—বরং লাঞ্ছিত তাড়িত উপেক্ষিত হয়ে শেষে দামোদরে আত্মবিসর্জ্জন করতে গিয়েছিলাম। আজ যদি তুমি আমার বিচারই কর দয়াময়, তবে কেন আমার অমন দশা করছিলে—তাই আগে বল। আমার হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দিয়েছিলে—অথচ সেই পাত্র পূর্ণ করে

দেয় এমন মন নিয়ে আমার কাছে কাউকে আসতে দাওনি। কিন্তু দয়াময়, আমার হৃদয়েও সাগর তুল্য অপার প্রেম দিয়েছিলে, অনন্ত সাধ দিয়েছিলে,—সুখ সম্ভোগের জ্বলন্ত কামনা দিয়েছিলে, আবার ভালকে ভাল বাসতে শিখিয়েছিলে। তুমি দারুণ তৃষ্ণা দিয়েছিলে, জল দাওনি। আবার চারিদিকে নানাছন্দে গানের সুর বাজিয়েছিলে, কিন্তু আমায় কাণ দাওনি। চারিদিকে এত রূপ দিয়েছিলে, নয়ন দাওনি। আমি যদি নিজের বাহুবলে সুখ, সম্ভোগ সন্তোষ লাভ করে থাকি—পরের নির্ঝর কেড়ে নিয়ে নিজের তৃষ্ণা মিটিয়ে থাকি—তাতে আমার কোন্ অপরাধ হয়েছে ঠাকুর? আমার যতটুকু আবশ্যক, আমি শুধু সেইটুকু নিয়েছি বৈত নয়। এতে আমার পাপ কোথায়? আজ জীবনান্তে তুমি বলছ, আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছ; আমার নরক বাসের আদেশ দিচ্ছ! কিন্তু বল দেখি কেন তুমি আমায় এমন করে গড়েছিলে যে আমি তোমার মনের মত হতে পারিনি? সে কি আমার দোষ? তুমি ত সর্ব্বদর্শী। যখন আমায় সৃষ্টি করেছিলে—তখনই ত জানতে ঘাটোয়ালকে আমি হত্যা করব। জেনে শুনে আমায় সৃষ্টি করাই বা কেন, আর এখন দণ্ড দেওয়াই বা কেন?"

উত্তেজিত কণ্ঠ কোমল করিয়া রামরতন বলিল—"কেমন বন্ধু, আবশ্যক হলে এসব কথা ভগবান্‌কে বলা চলে কি না?"

নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে গোবিন্দলাল বলিল—"বোধ হয় চলে।"

হৃষ্টচিত্তে রামরতন বলিল, "চলে যদি, তবে আজ থেকে নিশ্চিন্ত হও। পাগলামিতে আর মন দিও না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরি সামন্ত যেদিন ক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্দলালকে নিজ গৃহ হইতে বিদায় দেয়, সে দিন এবং তাহার পরও কিছু-কাল উত্তেজনার বশে বুঝিতে পারে নাই যে, যাহা সে করিল তাহা ভাল কি মন্দ! একজন দীনহীন ভৃত্য—তা হউক না সে মুহুরী—তবুও ত ভৃত্য; হউক না সে বংশ গৌরবে হরি সামন্তের সমতুল্য—সে যে সরযূর স্বামী হইবার দুরাশা পোষণ করিতে পারে, এ কথা মনে হইলেই হরি সামন্ত অগ্নিস্পৃষ্ট দাহ্য পদার্থের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। অথচ একটি কথা সে ভুলিতেও পারে নাই। বিজয়া দশমীর সেই শ্রান্ত সন্ধ্যায় অভুক্ত গোবিন্দলাল যখন তাহার গৃহত্যাগ করিল, তখন হরি সামন্ত দেখিয়াছিল, গোবিন্দলালের বদনে নয়নে চিন্তা, ভয় বা রোষের কোন চিহ্নই ছিল না, বরং সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি একটা দৃঢ়তাই সূচিত করিয়াছিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে তাড়িত হইলেও সেই জন্য হরি সামন্তের হৃদয় হইতে তাড়িত হইল না। সহসা গোবিন্দলালের কথা মনে হইলেই একতেশ্বরে ভূমিকম্পের কথা মনে পড়িয়া যাইত, অমনি হরি সামন্তের হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে খচ্ করিয়া একটি কাঁটা ফুটিয়া উঠিত; হরি সামন্ত সেই কাঁটাটি দেখিতে পাইত না বটে; কিন্তু তাহার বেদনা নিত্য অনুভব করিত। কিন্তু সে কথা সে আকারে ইঙ্গিতে কোন দিনই প্রকাশ করে নাই।

সেই বিজয়া দশমীর পর পাঁচমাস চলিয়া গেল। হরি সামন্তের সম্মুখে গোবিন্দলালের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত কেহই উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। গোবিন্দলালের বিদায়ে হরি সামন্তের অন্যান্য ভৃত্যগণ আনন্দিতই হইয়াছিল। চারি ববৎসর ধরিয়া তাহারা দেখিয়া আসিতেছিল যে গোবিন্দলাল তাহাদের মত আর একটি ভৃত্যমাত্র নহে! তাহার বাক্য, কার্য্য, ব্যবহার সকলের মধ্যেই একটু বিশেষত্ব ছিল, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা ঈর্ষার সহিত দেখিতেছিল যে, গোবিন্দলাল হরি সামন্তের মনের উপর অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে! এক ভৃত্য কি অপর ভৃত্যের এই সৌভাগ্য সহ্য করিতে পারে? তাহারা তাই দল বাঁধিয়া গোপ ন গোবিন্দলালের পথে নানা বিঘ্ন আনিয়া স্থাপন করিত, এবং তাহাকে অযোগ্য অক্ষম অশক্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। ছোট হউক বড় হউক ভৃত্য মাত্রেরই ইহা স্বভাব! যে ছোট সে লোহার

কাটারী বসায়, আর যে বড় সে মিছরির ছুরি হানে।

গোবিন্দলাল যে এসকল গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিত না তাহা নহে। বুদ্ধিমান্ ভৃত্যেরা বুঝিত যে, গোবিন্দলালকে তুষ্ট করিতে পারিলেই হরি সামন্তকে তুষ্ট করা হইবে। তাহারা নিজেরাই যড়যন্ত্র করিত—এবং পরক্ষণেই কেহ কেহ আসিয়া গোপনে গোবিন্দলালকে সকল কথা জানাইয়া যাইত। ইহাও ভৃত্য মাত্রেরই স্বভাব। যাহা হউক গোবিন্দলাল সেজন্য কোনদিন কাহাকেও কিছু বলে নাই। এসকল কথা সে হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। গোবিন্দলালের এই ভাব, অপর ভৃত্যদিগের নিকট একটা অপরাধরূপে গণ্য হইল! তাহারা যেমন নিজেদের মধ্যে সামান্য বিষয় লইয়া কলহ করে পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয় এবং সুযোগ পাইলেই সকলে একত্র হইয়া হরি সামন্তের নিন্দা করে—তেমনি আবার হরি সামন্ত কবে কাহাকে একটা মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়াছে, কাহার সহিত কথা কহিতে একটু অধিক সস্নেহ হাস্য বর্ষণ করিয়াছেন—প্রতিযোগিতার ভাবে নিজেদের মধ্যে সেই কথা আলোচনা করিয়াও গর্ব্ব অনুভব করে। গোবিন্দলাল কেন যে সে সকল কিছুই করিত না, হরিসামন্তের ভৃত্যবর্গ তাহার কোনই কারণ বুঝিতে পারিত না।

ভৃত্যদিগের মনে যাহাই থাকুক, হরি সামন্তের কৃপা পাইবার জন্য অনেক সময়েই তাহাদিগকে গোবিন্দলালের শরণাপন্ন হইতে হইত। ইহাতে তাহারা মনে করিত যে তাহাদের মথা কাটা গেল! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তবুও তাহা করিতে হইত। তাহারা নিজেদের মধ্যে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিত—কেবল এই বিষয়টীর নহে! কেশব মনে করিত—আমি গোবিন্দলালকে কি বলিতেছি কিরূপে তুষ্ট করিতেছি—তাহা গোপাল বা যদু জানিল না। গোপাল এবং যদুও আবার ঠিক ঐরূপই ভাবিত যে, কেশব কিছু জানিল না। অথচ কে কি করিতেছে তাহা কোন না কোন প্রকারে সকলেরই জানা হইয়া যাইত. কিন্তু একজন মুখ ফুটিয়া আর একজনকে কিছু বলিত না। ইহাও দাসত্বের অন্যতম অলিখিত বিধি!

ভৃত্যেরা যে দিন শুনিল যে গোবিন্দলাল সরযূকে ভালবাসে এবং তাহাকেই বিবাহ করিতে চায় বলিয়া বিতাড়িত হইয়াছে, সে দিন তাহারা এ উহার গা টিপিয়া এবং নয়নে নয়নে অনেক কথা বলিল। দুই একজন পুরাতন দুঃসাহসিক ভৃত্য বলিল, "এমন যে হবে সেটা জানাই ছিল।" ক্রমে কথা পল্লবিত হইয়া গ্রামে এবং গ্রামের বাহিরেও রাষ্ট্র হইয়া গেল। এবং তাহার ফলে গ্রামের হরিসভার গৃহে ঘন ঘন বৈঠক বসিতে লাগিল। দুই মাস পরে সরযূর মাসীর যে দিন কাল হইল—সেদিন হরি সামন্ত দেখিল, মৃতদেহ শ্মশানভূমে লইয়া যাইবার লোক নাই। সে অগ্নিগর্ভ শৈলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু শির নত করিল না। গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিল, নিজের পুষ্করিণীর তীরে চিতা রচনা করিয়া হরিসামন্ত একাকীই মৃতের সৎকার করিতেছে।

এই ঘটনার পর আরও কিছুকাল অতীত হইল। এতদিনও হরিসামন্ত গ্রামের সহিত যেটুকু সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিল, দিদির মৃত্যুর পর হইতে তাহা রক্ষা করাও তাহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। যে দুই একজন হরি সামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঙ্গিতে প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করিল, তাহারা যে প্রহৃত না হইয়া গৃহে ফিরিতে পারিয়াছিল এই জন্য নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল!

মাতৃহারা সরযূ এখন সত্য সত্যই মাতৃহারা হইয়াছিল। তাহার জন্য যে এত কাণ্ড ঘটিতেছে ইহা বুঝিয়া সে দিন দিন মলিন ও কৃশ হইতে লাগিল। মাসীর অভাব যাহাতে সরযূ বোধ করিতে না পারে, সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া হরি সামন্ত সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার ছয় মাস পরে একদিন হরিসামন্ত কেশবকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি মেঝিয়া গ্রাম জান?"

"আজ্ঞা, হ্যাঁ।"

"এই টাকা কয়'টি নিয়ে গোবিন্দলালের বাড়ী যাও। তাকে দিয়ে আসবে।"

কেশব অবাক্ হইয়া হরিসামন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—ভাবিতে লাগিল, এখনও গোবিন্দলাল!

রূঢ় কণ্ঠে হরিসামন্ত বলিল, "হাঁ করে' চেয়ে রইলে যে?"

কেশব ব্যস্ত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে, যদি গোবিন্দকে না পাই?"

"শুনেছি, তার মাসী আছে—যদি না পাও—তার মাসীর হাতে দিয়ে আসবে। এখনি যাও, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরতে পারবে।" কেশব নিতান্ত বিরক্ত হইল বটে, কিন্তু বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ মেঝিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। গোবিন্দলালের প্রতি এখনও হরি সামন্তের যে কত অনুরাগ—যাইবার পথে যাহাকে পাইল—কেশব নানাভাবে তাহাকেই সেইকথা বলিতে বলিতে গেল! নীচ যে, সে এই রূপেই প্রতিহিংসা সাধন করে।

প্রতিদিন হরিসামন্ত সরযূকে লইয়া পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিত। সে দিনও বসিয়াছিল। সরযূ দেখিল তাহার পিতা আজ অন্যমনস্ক। কথোপকথন করিতে করিতে সে বারংবার কেশবের সন্ধান করিতে লাগিল। যদু যখন আসিয়া কহিল, "কেশব এখনও ফিরে নাই" তখন হরিসামন্ত ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "এত রাত্রি হল, এখনো আসেনি?"

"কি হয়েছে বাবা? কেশবকে কোথায় পাঠিয়েছ?"

"মেঝিয়ায়।"

"মেঝিয়ায়?"—সরযূ এমন সুরে কহিল, "মেঝিয়ায়" যে হরিসামন্ত চমকিয়া উঠিল! তাহার এক একবার মনে হইতে লাগিল, গোবিন্দলালকে গৃহতাড়িত করিয়া সে বোধ হয় ভাল করে নাই। প্রকাশ্যে বলিল "গোবিন্দ তার আটটী টাকা ফেলে গেছে—তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। তার নিজের উপার্জ্জনের টাকা, আমি রাখবো কেন? কেশব এখনো আসছে না কেন্ বুঝতে পারছি না। দেখি এসেছে কিনা—"

কেশবের সংবাদ লইবার জন্য ঘাট হইতে উঠিবামাত্রই কেশব আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিসামন্ত কহিল, "এত দেরী হল যে? দিয়ে এলে টাকা?"

"আজ্ঞে না।"

অত্যন্ত ব্যগ্রকণ্ঠে হরিসামন্ত কহিল, "সে কি নিলে না?"

"তার দেখাই পাইনি।"

হরিসামন্ত বলিল, "গোবিন্দলাল কোথায় গেছে? গ্রামে নাই?"

"না।"

"কোথায় গেল?"

"লোকে বলে সে পাগল হয়েছে!"

তীব্র স্বরে হরি সামন্ত বলিল, "কি বল্লে?"

"লোকে বলে গোবিন্দলাল পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে!"

হরিসামন্ত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তার মাসীকে জিজ্ঞাসা করেছ?"

"সেও নেই।"

"নেই? কোথায় সে?"

"জগবন্ধু দর্শন করতে গিয়ে পথে মারা গেছে।"

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন কেশব দেখিল, হরিসামন্ত আর কথা কহিতেছে না, তখন সে শাণের উপর টাকা কয়েকটা রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

সেই নির্জ্জন বাপীতট তখন ঝিল্লীরবে মুখরিত হইতেছিল। তাহার পার্শ্বেই হরিসামন্তের নারিকেল বৃক্ষের সারি। তাহার পর পথ। একখানা গো শকট নানা রূপ ধ্বনি করিতে করিতে সেই পথে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল। হরিসামন্ত অনেক্ষণ অন্য মনে সেই একঘেয়ে শব্দ শুনিতে লাগিল। যখন তাহাও আর শুনা গেল না, তখন সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিল, "পাগল হয়েছে!"

হরিসামন্ত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এবং সরযূকে ডাকিয়া কহিল, "চল মা, ঘরে যাই, রাত হয়েছে।"

কন্যার কোন উত্তর না পাইয়া হরিসামন্ত অনুচ্চে কহিল, "শাণের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সরযূ! সরযূ!"

কিন্তু সে সরযূর সাড়া পাইল না। নিকটে আসিয়া দেখিল, সরযূ শাণের উপরে মূর্চ্ছিতা—চন্দ্রকর তাহার ম্লান মুখের উপর ক্রীড়া করিতেছে। হরিসামন্ত ক্ষিপ্রপদে জল আনিয়া সরযূর মুখে এবং চোখে দিতে দিতে লাগিল। অল্পক্ষণ শুশ্রূষার পর সরযূ যখন চৈতন্য লাভ করিল তখন হরিসামন্ত কন্যার ব্যথিত মস্তকটী নিজ বক্ষে তুলিয়া লইয়া অতিশয় কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "সরযূ! সরযূ—মা আমার!"

সরযূ কোন কথা কহিল না, কেবল পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল!

* * *

ইহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে, সরযূর কাছে সে যেন অনেক বৎসর। হরিসামন্তের নিকট কেহ আর গোবিন্দলালের নামটী পর্য্যন্ত করে না। গোবিন্দ লাল নামে কোনদিন কোন লোক যে হরিসামন্তের বাড়ী ছিল, কথায় বার্ত্তায় ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত কেহ সে কথা প্রকাশ করে না। দিনের পর দিন, হরি সামন্তের সকল কার্য্যই পূর্ব্ববৎ চলিয়া যাইতে লাগিল।

পৃথিবীতে কাহারও অভাবে কোন কায বন্ধ থাকে না। আজ মনে হইতে পারে, একের অভাবে সংসার অচল, কিন্তু দুইদিন পরেই সেই অচল সংসার আবার সচল হইয়া পড়ে। অভাব দাগ রাখিয়া যায় মনে। ঘষিলে মাজিলে সে দাগ কিছু অস্ফুট হইতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না। বীণার ঠিক তারে আঘাত পড়িলেই নিদ্রিত সুর আবার মূর্ত্তি লইয়া জাগ্রত হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আজ মহা নবমী। ছাতনার জমীদারের পূজা বাটীতে মহিষের রুধিরে মহিষমর্দ্দিনীর পূজা হইয়া গিয়াছে। নবমীর চন্দ্রকর শেফালিকার গন্ধে সিক্ত হইয়া বৃক্ষের পত্রে পত্রে ঝরিয়া পড়িতেছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল প্রভৃতির ঘোর রোল জগন্মাতার সন্ধ্যারতি ঘোষণা করিতেছে। এমন সময় সরযূ একাকিনী তাহাদের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিল। মনে হইল, যেন সঞ্চারিণী বিষাদ-প্রতিমা ধীরপদে বাপীতটে আসিল।

অর্থশালী পিতার অপার স্নেহে লালিত ও বর্দ্ধিত সরযূ দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না। তাহার রূপ যৌবনের অভাব ছিল না, বসন ভূষণের অভাব ছিল না, স্নেহ যত্নের অভাব ছিল না। সে যখন যাহা বলিত তখনই তাহা করিবার জন্য দাস দাসী হইতে হরিসামন্ত পর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্ত হইত। সরযূ পিতৃ-গৃহে রাজরাণী ছিল।

শৈশবে সরযূ মাতৃহারা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাসী তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও সে অভাব বুঝিতে দেয় নাই! সরযূ যখন প্রতিদিন চন্দ্রকলার ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, হরিসামন্ত এবং মাসী তখন সরযূকে নিত্য নূতন নূতন বসন ভূষণেই সাজাইয়া রাখিত—এক-খানা ভাঙ্গিয়া দুইখানা করিবার কাযও দেয় নাই। তাহারা মনে করিত যে বয়স হইলেই সরযূ আপনা হইতে সকল শিখিয়া লইবে।

ক্রমে সরযূর বয়স হইল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী সাজিবার ইচ্ছাই তাহার বলবতী হইয়া পড়িল। প্রতি-বেশী দরিদ্রগণের কন্যা হইতে সে ক্রমেই নিজেকে এতদূরে লইয়া গেল যে, সহচরী বলিতে তাহার আর কেহ থাকিল না।

কৈশোর বয়সে সরযূ যখন গোবিন্দলালের নিকট কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেছিল, তখন সে বুঝিতে পারে নাই যে বিদ্যালাভের দক্ষিণা দিতে বসিয়া সে নিজেকে একেবারেই কাঙ্গালিনী করিয়াছে। গোবিন্দ-লাল যে দিন তাহাদের গৃহ হইতে তাড়িত হইল, সেই দিন সরযূ প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল তাহার নিকট কেশব, যদু ও গোপালের মত একজন

পিতৃভক্তি মাত্র নহে! তাহার পর যে দিন সে শুনিল, গোবিন্দলাল পাগল হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে দিন তাহার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না, গোবিন্দলালের সঙ্গে সঙ্গে তাহারি নয়নের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে। উঃ সে সত্য কি ভীষণভাবে সেই দিন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল! সরযূ দেখিল, তাহার বুভুক্ষিত তৃষিত বেদনাক্লিষ্ট হৃদয় লইয়া এই জন কোলাহল মুখরিত পৃথিবীতে সে একেবারে একা। পুষ্করিণী ঘাটে বসিয়া মাসীর শেষ শয্যার দিকে চাহিতে চাহিতে সরযূ সেদিন কত রোদন করিল! এ সংসারে যে একা তাহার মত দুঃখী কে?

আজ মহানবমী। আর একটী দিন! গোবিন্দলালের সংবাদ কেহ জানিত না—কেহ লইত না। বর্ষ শেষ হইতে আর একটী দিন বাকী! সত্যই কি সে উন্মাদ হইয়াছে? সত্যই কি আর গৃহে ফিরে নাই? উন্মাদ কি কখনো আর ভাল হয় না? আজ মহানবমী—কালই যে বর্ষশেষ হইবে! সে কি আসিবে না? ক্ষীণ আশার একটী সূক্ষ্ম সূত্রকে অবলম্বন করিয়া সরযূ এতদিন জীবন বহন করিতেছিল। আর একটী দিন! সেই দিনের পরই যদি আশার সেই সূক্ষ্ম সূত্রটী ছিন্ন হইয়া যায়? তাহার পর? সরযূ আজ তাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল।

রজনী প্রভাতেই বিজয়া দশমীর বার্ষিক উৎসব। সে কি উৎসব? সে যে এবার সরযূর শ্মশান-শয়নের শোভাযাত্রা! সরযূর নয়নে জল দেখা দিল। গত বৎসর এই দিনেই সরযূ প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিল, নারী-হৃদয় শুধু পিতৃস্নেহ লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার আরও চাই—আরও চাই। যাহা পাইলে নারীজন্ম সার্থক হয় তাহা যে সে পাইয়াছিল, এবং পাইয়াই হারাইয়া , তাহা সে সেই দিনই বুঝিয়াছিল। সেই দিনই সে প্রথমে শিখিয়াছিল—ধন রত্ন বেশ ভূষা কিছুই নহে—প্রেমই সর্ব্বজয়ী। যাহার নিকট প্রাণের কথাটা খুলিতে পারে এমন একজন সহচরী পাইবার জন্য আজ সরযূ কাঁদিয়া আকুল হইল!

একাকিনী ঘরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল কক্ষের প্রাচীরগুলি যেন তাহাকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়া ধরিবার জন্য চারিদিক হইতে সরিয়া আসিতেছে। মুক্ত বায়ুর আশায় সরযূ তাই পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল, গত বৎসর এই মহা-নবমীর দিন গোবিন্দলালের অবসর মাত্র ছিল না। আজ তাহার পিতা সে সকল কার্য্য করিবার জন্য অতি প্রভাতেই সোণামুখীর হাটে গিয়াছেন। কখন যে ফিরিয়া আসিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই—গত বৎসর গোবিন্দ-লালই সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সোণামুখী গিয়াছিল।

অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা সরযূ চমকিয়া উঠিল। এ যে সেই একান্ত বাঞ্ছিত হারানো কণ্ঠের সুর! সরযূর দেহ রোমাঞ্চিত হইল।

আবার! ঐ আবার!

এ কি তবে সত্য? না স্বপ্ন?

গোবিন্দলাল বিস্মিত কণ্ঠে ডাকিল—"সরযূ!"

সরযূ উত্তর দিতে চাহিল, পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তৃষিত হৃদয়ের শত আহ্বান এক সঙ্গে মিলিয়া তখন সরযূর কণ্ঠের দ্বার দিয়া আকুলি বিকুলি করিয়া বাহির চেষ্টা করিতেছিল।

গোবিন্দলাল আবার ডাকিল—"সরযূ!"

সরযূ বসিয়া ছিল, মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাড়াইল। বাষ্প-নিরুদ্ধ কণ্ঠে অতি কষ্টে কহিল—"তুমি এসেছ?"

একখানি গ্রন্থ রচনা করিলে যত কথা প্রকাশ করিতে না পারা যায়, এই ক্ষুদ্র দুইটি কথায় তাহার অনেক অধিক প্রকাশিত হইল।

গোবিন্দলাল কহিল, "হাঁ সরযূ, তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।"

ভয়ে ভয়ে আশা ও নিরাশায় মথিত হৃদয়ে সরযূ বলিল—"কাল বিজয়া দশমীর উৎসব।"

"সে জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছি।"

অতিশয় আবেগ পূর্ণ পুলকিত কণ্ঠে সরযূ বলিল—"হয়েছ ?"

গোবিন্দলাল তখন আত্মকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সরযূ প্রথমে উৎফুল্ল হইল—তাহার পর একেবারে মলিন হইয়া গেল ! তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—দেহে স্বেদ ঝরিল। সে অতিশয় ভীত ও ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—"হত্যা !"

"হাঁ সরযূ, হত্যা ! তাই অকপটে সে কথা তোমার কাছে বল্‌তে এসেছি। আমি বড়ই অপরাধী। যদি মার্জ্জনা করতে পার, তবেই তোমার পিতার কাছে মুখ দেখাব—বিবাহের প্রার্থনা জানাব। আর যদি মনে কর, নরহন্তাকে স্পর্শ করতে পারবে না—তবে আমায় বিস্মৃত হও, তাতেও আমার আর দুঃখ থাকবে না।' বল সরযূ, আমায় কি ক্ষমা করবে ?"

সরযূর মুখে কথা সরিল না। পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, সে দুই করে মুখ চাপিয়া শানের উপর বসিয়া পড়িল।

গোবিন্দলাল শুনিতে পাইল, সরযূ কাঁদিতেছে। পাপী যেমন দেবীর সম্মুখে কাঁপে, গোবিন্দলালও তেমনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "সরযূ ! ভেবো না যে দুঃখে ও অনুশোচনায় আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে না। যখন কিছুতেই টাকার সংস্থান হল না, যখন বুঝলাম যে তোমাকে আর পাব না, তখন দামোদরে ডুবে মরতে গিয়েছিলাম। যদি মরতাম, তবে কি তুমি সুখী হতে ?"

সরযূ তখনও নীরব। গোবিন্দলাল বৃশ্চিক দংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। কহিল, "আমি নর-ঘাতক বলে' যদি আমায় আর ভালবাসতে না পার তবে বল—একটীবার বল। ঐ পুকুরের স্থির জলে তোমারই সাক্ষাতে তোমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে আমি প্রাণত্যাগ করি।"

সরযূ মুখ তুলিয়া সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে গোবিন্দলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিতে লাগিল, "বলেছি ত সরযূ! ফাঁড়িদারকে ফাঁকি দিয়েছি—পৃথিবীর সকল লোককে ফাঁকি দিয়েছি। এই হত্যাকাণ্ডের কথা তোমায় না বল্লেও চলতো। তুমি এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পেতে না। কিন্তু তা নয় সরযূ! তোমার কাছে বলতেই হবে বলে' আজ এসেছি। জেনেই এসেছি যে তোমায় বল্লে হয়ত চির-দিনের মত তোমায় হারাব। কিন্তু তোমায় ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে সেও আমার শ্লাঘ্য। যদি দয়া করে ক্ষমা কর, তবে তোমারই পুণ্যে আমি পবিত্র হব, যতদিন বাঁচি দু'জনে কাতর কণ্ঠে ভগবানের কাছে মার্জ্জনা চাইব। অপরাধীকে ক্ষমা কর সরযূ! তাকে হাত ধরে তোল। তুমি ক্ষমা না করলে ভগবান্ আমাকে ক্ষমা করবেন না। আর যদি মনে কর এ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত করলে জীবনান্তে তোমায় পাব, তাহলে বল, বাঁকুড়ায় গিয়ে ফাঁসি কাঠকে আলিঙ্গন করি। তবে একটি ভিক্ষা এই যে, আমার চরম সময়ে একটিবার আমার সমুখে এসে দাঁড়িও—আমি তোমায় দেখতে দেখতে ফাঁসির দড়ী গলায় তুলব।"

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সরযূ কথা কহিল। এ কি সরযূর কণ্ঠস্বর ? সরযূ অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কাল তবে এস, আজ ত বাবা বাড়ী নেই।"

সরযূ আর মুহূর্ত্তও সেস্থানে দাঁড়াইল না—আপন শয়ন কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, এবং উপাধানে মুখ লুকাইয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল। মাতৃহীনার মাতৃ বিয়োগ-বেদনা বহুদিন পর আজ প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সরযূ বুঝিল যে, তাহার আকাশের পূর্ণচন্দ্র আজ সহসা নিবিয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান

বঙ্গ-সাহিত্য-ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের পুরোহিত-শ্রেণীকে ধুতুরা ফলের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি বক্তৃতায় উন্মাদনা আনিতে চাও তাহা হইলে তোমার বক্তৃতার সহিত একটু ধুতুরা ফলের বীজ মিশাইয়া দিও।—অর্থাৎ বক্তৃতা বা যুক্তি হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তোমার কথা যদি লোকে শুনিতে না চায়, তোমার যুক্তি যদি লোকে বুঝিতে না পারে তাহা হইলে দু'একটী সংস্কৃত বচন ঝাড়িতে পারিলেই লোকে না বুঝিয়াও বক্তৃতার সারবত্তা স্বীকার করিবে। আজকাল সংস্কৃতের স্থান অধিকার করিয়াছে ইংরাজী ভাষা। কোনও অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিবার সময়ে দু' একটা ইংরাজী কথার বুকনী দিলেই শ্রোতার মন গলিয়া যায়। রেলে যাতায়াত করিবার সময় বাঙ্গালী বা মাদ্রাজী রেল-কর্ম্মচারীর সহিত ইংরাজী ভাষায় কথা বলিলে যে অমোঘ ফল ফলে একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। হিন্দী ভাষার দেশে গিয়াও শিক্ষিত সমাজে হিন্দী অপেক্ষা ইংরাজীরই কদর দেখা যায়। এককালে ভারতবর্ষে পার্সী ভাষারও এই প্রকার সমাদর ছিল। ইংরাজী ভাষার প্রতি এই প্রকার পক্ষপাতিত্বের মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে, ইংরাজী ভাষার সহিত পরিচয় আভিজাত্য ও সুশিক্ষার লক্ষণ বলিয়া সাধারণের বিবেচনা। যেহেতু ইংরাজেরা সভ্যতা ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবে আমাদের অপেক্ষা বড়, সেই হেতু তাহাদের ভাষার সহিত পরিচয় যাহার আছে সেও সাধারণ লোক অপেক্ষা শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচি বলিয়া বিবেচিত হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে যখন সংস্কৃতের জ্ঞান আভিজাত্য ও সুশিক্ষার পরিচায়ক ছিল, তখনও অভিন্ন কারণে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি সাধারণ লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিত। আবার কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপের ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর যে শ্রদ্ধা ছিল, এখন কলিকাতার ভাষা সেই সমাদর পাইতেছে। ইহারও মূলীভূত কারণ সভ্যতা। ভাষা সভ্যতার একটী উপাদান, এবং সভ্যতার তারতম্য অনুসারে ভাষা বিশেষের প্রতি সমাদরের তারতম্য হইয়া থাকে। কলিকাতায় উড়িষ্যা দেশবাসী লোকে সাধারণতঃ হীনকর্ম্ম করে বলিয়া তাহাদের ভাষার আবৃত্তি কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীর নিকট হাসির ফোয়ারা উঠাইতে পারে। অথচ ইংরাজী ভাষা বহুদূর হইতে আসিয়াও সমাদর পায়। তাই অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী "বাঙ্গালা জানি না," "সংস্কৃত জানি না" বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। ইহার মূলে সেই এক কথা, সভ্যতাই ভাষার আভিজাত্যের নিদর্শন এবং ভাষাই সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম উপাদান। মানবের সভ্যতার সহিত যেমন ভাষার বিকাশ হয়, সেইরূপ ভাষার বিকাশের সহিত সভ্যতারও বিকাশ হয়। আবার মানব সভ্যতার বিকাশের ক্রম যেমন অতি জটিল, ভাষার বিকাশের ধারাও সেইরূপ অতি জটিল। প্রত্যেক বস্তুর বিকাশই যেমন সময় সাপেক্ষ, মনুষ্য সভ্যতা ও ভাষার বিকাশও সেই প্রকার সময়-সাপেক্ষ। সুতরাং সভ্যতার ন্যায় ভাষার বিকাশেরও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের সন্ধানই ভাষা বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু কথাটা এত সহজ নহে। কতকগুলি তারিখের সহিত কতকগুলি ঘটনাকে শৃঙ্খলিত করিলেই ইতিহাস হয় না। কি কি কারণে, কি কি উপায়ে কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে না পারিলে ইতিহাস হয় না। ঘটনাসমূহের কার্য্য কারণ সম্পর্ক স্থাপনই ঐতিহাসিকের প্রধান কার্য্য। তাই যিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক তিনি বর্ত্তমানের ঘটনা-পরম্পরার গতি লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের বিষয়ে একটা অনুমান করিতে পারেন। এই জন্যই রাষ্ট্র-নৈতিক ব্যাপারে ঐতিহাসিকের এত সমাদর। কারণ ইতিহাস না বুঝিলে রাষ্ট্র-নৈতিক ভবিষ্যতের অনুমান করা যায় না। আর

পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিতে না পারিলে অনিবার্য্য বিপৎপাত হইতে রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় না। সুতরাং ইতিহাস বলিলে কেবলমাত্র ঘটনা পরম্পরা বুঝায় না। ঘটনা পরম্পরার মধ্যে যে কার্য্য কারণ সম্পর্ক অনিবার্য্যভাবে সেই ঘটনা পরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ই ইতিহাস। নতুবা ইতিহাস ও রূপকথায় কোন প্রভেদ থাকে না।*

ভাষার ইতিহাস বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ভাষা জিনিসটাকে বুঝিতে হইবে। ভাষার উপাদান বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এবং সেই সকল উপাদানে পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রকৃতি জানিতে হইবে। তাই আমরা প্রথমেই ভাষার উপাদান সমূহের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব। একটী সুপরিচিত উদাহরণ হইতে এই বিষয়টি ফুটাইবার চেষ্টা করিব।

জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানব শিশু কথা বলিতে পারে না, কিন্তু হাসিতে ও কাঁদিতে পারে। কথা বলিবার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিয়া যে প্রণালীতে ভাষা শিখিতে হয়, সে প্রণালীতে হাসি কান্না তাহাকে শিখিতে হয় না। এই দুইটী কাজ কোনও কিছুর প্রতিক্রিয়া বা reflex action। ফুটবলটী মাটিতে পড়িলেই যেমন লাফাইয়া উঠে, মনের মধ্যে হাসি-কান্নার ভাব আবির্ভূত হইলেই সেইরূপ হাসিকান্নার প্রকাশক পেশী সমূহের সঞ্চালন ও অশ্রুনির্গলনাদি ব্যাপার প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা-আপনি সংঘটিত হয়। ইহার প্রবর্ত্তক হেতু মানসিক আনন্দ বা কষ্ট ভিন্ন কোনওরূপ ইচ্ছাকৃত চেষ্টা নহে। সুতরাং শিশুর মনের সরল ভাবের বাহ্য অভিব্যক্তি হয় এই প্রাকৃতিক নিয়মে। মনোভাব প্রকাশক উপায়কেই যদি ভাষা বলা যায় তবে এই হাসিকান্নাই শিশুর ভাষা স্থানীয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এরূপ ভাষাকে ভাষা বলা হয় না।

শিশুর দিকে তাকাইয়া কেহ হাসিলে শিশু যখন হাসে, তখন তাহার মনে আনন্দের ভাব না থাকিতেও পারে। কিন্তু এই হাসিই শিশুর চেষ্টা-সাপেক্ষ, এবং ইহাই তাহার ভাষাশিক্ষার প্রথম উদ্যম। এই হাসি দ্বারা সে ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রথম হাসির জবাব দেয়, এবং তাহার চিন্তা ও অনুকরণ শক্তির প্রথম পরিচয় দেয়। আবার যখন রোদন কালে সে মাতা, মাতামহী বা পিতামহীকে দেখিয়া রোদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করে তখনও সে চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দেয়। (১) শিশু চিন্তা করিতে পারে ও (২) নিজের ইচ্ছা অনুসারে হাসিকান্নার পেশী সমূহ সঞ্চালন করিতে পারে।

শিশুর সহিত খেলা করিতে করিতে যখন তাহার মাতা বা দিদি বলিতে থাক—

"হাত ঘুরুলে নাড়ু দেবো। নয় ত নাড়ু কোথায় পাব?" তখন শিশু কাণ দিয়া সেই কথাগুলি শুনে এবং মাতা বা দিদির মত হাত ঘুরাইবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম হাত ঘুরাইতে পারে না বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অনেক চেষ্টার ফলে সে হাত ঘুরাইতে শিখিয়া অনুকরণ-শক্তির পরিচয় দেয়।—আবার শিশু হাত ঘুরাইতে শিখিলে পরে যখন বলা যায় "হাত ঘুরুলে নাড়ু দোবো" তখন হাত-ঘুরান না দেখিয়াও কেবল-মাত্র ঐ শব্দটা শুনিয়াই সে হাত ঘুরাইতে থাকে। এইকালে আমরা বুঝি যে শিশু "হাত ঘুরালে" প্রভৃতি কথার একটা সঙ্গত অর্থ বুঝিয়াছে; এবং কথাটা বারে বারে কাণে শুনিয়া মনে রাখিয়াছে। কথাটা সে নিজে উচ্চারণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু শুনিলে বুঝিতে পারে। অন্য কথায় বলিতে গেলে (৩) শ্রুতি শক্তি ও (৪) স্মৃতি শক্তির পরিচয় সে দেয়, কিন্তু বাগ্‌যন্ত্রের পেশীসমূহের সঞ্চালনাদি করিতে সে পারে না। তাই "হাত ঘুরুলে" কথাটী বলিবার চেষ্টা করিলেও সে এমন একটা কিছু উচ্চারণ করে

* 'ইতিহাস' কথাটার একটা কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে। এটা একটা শব্দ নহে। "ইতি-হ আস" অর্থাৎ "ইহাই ছিল" এই সংস্কৃত বাক্যটী কালক্রমে আপনার ইতিহাস হারাইয়া শব্দে পরিণত হইয়াছে। যাহা মূলতঃ ছিল তাহাই ইতিহাস।

যে তাহা হইতেই তাহার ব্যর্থ অনুকরণ-চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চারণটা তাহার পক্ষে নিতান্ত জটিল বলিয়া সে আয়ত্ত করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। সে সর্ব্বদাই বাগ্-যন্ত্র চালনা করিয়া না-স্বর না-ব্যঞ্জন না-অনুনাসিক কি-একটা শব্দ করে।

আর একটী ছড়া শিশু এই কালে শুনিতে পায়—"তাই তাই তাই—ভুধি ভাতি খাই॥" এই ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার মাতা বা আত্মীয়াকে করতালি দিতে দেখে বলিয়া অনুকরণ শক্তি প্রভাবে ছোট ছোট হাত দুটি নাড়িয়া করতালি দেয় এবং কয়েক দিন ব্যর্থ চেষ্টার পরে সে বলিতে আরম্ভ করে "তাই তাই।" এইটী তাহার (৫) বাগ্‌যন্ত্র সঞ্চালন কার্য্য আয়ত্ত করিবার প্রথম সোপান। এইরূপ নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া সে "মা—ম্মা," "বা—ব্বা" "দা—দ্দা" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া আপনার বাগ্‌যন্ত্রটা আয়ত্তাধীন করিতে থাকে। কিন্তু এই বাগ্-যন্ত্র আয়ত্তাধীন করিতে তাহার বহুকাল কাটিয়া যায়, এবং শেষে শিক্ষা কালে লিপির সাহায্যে বর্ণমালার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের উচ্চারণের প্রভেদ বুঝিতে আরম্ভ করে।

যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে শিশুর ভাষা শিক্ষা কালে তিনটী শক্তি কার্য্যকরী হয়—(১) মন, (২) শরীর ও (৩) পারিপার্শ্বিক প্রভাব।

এই তিনটী শক্তির মধ্যে মনই যে প্রধান তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। মনের শক্তি অর্থাৎ মনন শক্তি বা চিন্তাশক্তি না থাকিলে একদিকে যেমন কোনও সভ্যতাই হইতে পারে না, অন্যদিকে সেইরূপ ভাষাশিক্ষা বা ভাষা সৃষ্টিও হইতে পারে না। ভাষাশিক্ষার প্রথম চেষ্টাই হইল মনের সহিত শরীরের মৈত্রীস্থাপন। বাষ্পের শক্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে রেল চলে বটে, কিন্তু ড্রাইভারের ইচ্ছা অনুসারে যদি এই চলচ্ছক্তি সংযত না হইত তাহা হইলে রেলের দ্বারা মানুষের কোনও উপকারই হইত না। বাইসিকেল যদি চালকের ইচ্ছাধীন না হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোনও লাভ হয় না। সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট বাইসিকেল যে কেবল ইচ্ছাধীন, তাহা নহে; বিপৎপাতের সম্ভাবনায় প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি উদ্রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই ব্রেক্ থামিয়া যায়, অথবা গতি, সময় ও প্রয়োজনের অনুবর্ত্তী হয়। তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ বাইসিকেল শিক্ষা ঠিক হইয়াছে বলা যায় না। ভাষার বিষয়েও সেই একই কথা। তোমার ইচ্ছা অনুসারে যদি তোমার বাগ্‌যন্ত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্য না করে তবে সেরূপ ইন্দ্রিয় লইয়া তোমার কোনও কার্য্যই হয় না। তাই মূক-বধিরের পক্ষে ভাষার অস্তিত্বই নাই।

তাহা হইলেই দেখা গেল যে ভাষা আয়ত্ত করিবার প্রথমেই চাই মনের শক্তি। তার পর মনের শক্তির অনুযায়ী শারীরিক ক্রিয়া আয়ত্ত করিবার জন্য ভাষা-শিক্ষার্থী পারিপার্শ্বিক শক্তির প্রভাবের অধীন হয়। ভাষাশিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগণ যে-ভাবে বাগ্‌যন্ত্রের চালনা করিয়া কথা বলে, শিক্ষার্থী তাহার অনুকরণ করিয়া আপনার বাগ্‌যন্ত্রকে বশীভূত করে এবং যেরূপ উচ্চারণের সহিত যেরূপ মনোভাবের সম্পর্ক তাহাদের মনে সংঘটিত হইয়াছে তাহার মনেও সেই সেই উচ্চারণের সহিত সেই সেই মনোভাবের সমবায় সম্পর্ক হয়।

কিন্তু আর একটা কথা। এইরূপ সমবায়-সম্পর্ক যতদিন সংঘটিত না হয় ততদিন তাহার মন নিষ্ক্রিয় থাকে না। মন তাহার আত্মশক্তির প্রভাবে নানারূপে ভাব সৃষ্টি করিয়া নানা স্বাভাবিক কৌশলে তাহার অভিব্যক্তি করিতে থাকে। তা সে সৃষ্টি ও সে অভিব্যক্তি পারিপার্শ্বিক সংস্থার অনুকূল হউক আর নাই হউক। ক্রমে আত্মাভিব্যক্তির চেষ্টা যতই বিফল হয় ততই সে পারিপার্শ্বিক উপাদান গ্রহণ করে। বহুবারের অকৃতকার্য্যতার ফলে সে ভাষাশিক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে।

ভাষার কার্য্য যদি ভাব-প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইহার কৌশল এমন একটা কিছু হইবে যাহা বক্তা ও শ্রোতার

মনের সম্পর্ক ঘটাইতে পারে। তোমার মনের সহিত আমার মনের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি হয়ত তোমাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছি আর তুমি হয়ত আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় আছ। অথচ তোমার চিন্তা বুঝিবার শক্তি আমার নাই—"পর-চিত্ত অন্ধকার"। যদি তাহা না হইত তবে ভাষার আবশ্যকতা থাকিত না। তোমার মনে যাহা আছে তাহা জানিতে হইলে একটী বাহ্যবস্তুর মধ্যস্থতা চাই। কুকুরকে লাঠি দেখাইলেই তোমার মনের ভাব তাহার অন্তরে প্রবেশ করে। কেবলমাত্র ক্রোধ ব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দ্বারাই বিনা বাক্যব্যয়ে বালককে তিরস্কার করা যায়। হাসি ও কান্না এ বিষয়ে অতি প্রাথমিক ও সার্ব্বজনীন উপাদান। কর প্রসারণ দ্বারা আহ্বানও এই শ্রেণীর বাহ্য বস্তু। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট কৌশল ভাষা।

এক ব্যক্তির মনের সহিত অন্য ব্যক্তির মনের সম্পর্ক স্থাপনের বাহ্য উপাদান দ্বিবিধ—(১) শিক্ষানিরপেক্ষ বা Direct (সহজ সরল, ঋজু অবক্র) এবং (২) শিক্ষা-সাপেক্ষ বা Indirect (বক্র হাসি-কান্না, আর্ত্তনাদ ও নানাবিধ সম্পর্ক-জাত স্বাভাবিক সঙ্কেত) প্রথম শ্রেণীর ; ও শব্দের সহিত ভাবের মানসিক সম্পর্কজাত 'ভাষা' দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদান। অর্থাৎ নানাবিধ আর্ত্তনাদ ও স্বাভাবিক সঙ্কেত বিনা শিক্ষাতেই সকলে বুঝিতে পারে, কিন্তু বিনা শিক্ষায় কেহ 'ভাষা' বুঝিতে পারে না। পারি-পার্শ্বিক সমাজ হইতে শিক্ষাদ্বারা গৃহীত ভাষা বাহ্য বস্তু। ইহা মনোজগতের উপাদান নহে। মনোজগতের একমাত্র উপাদান ভাব। ভাষারূপ বাহ্য বস্তুর সাহায্যে মনঃস্থিত ভাববিশেষ উদ্রিক্ত হয় মাত্র। ভাষার দ্বারা ভাব সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক মনকেই আপন আপন ভাবের সমষ্টি গড়িয়া লইতে হয় এবং সেই ভাবসমষ্টি সাধারণ অবস্থায় মনোমধ্যে সুপ্ত ভাবে থাকে। ভাষা রূপ বাহ্য বস্তুর উত্তেজনা শক্তিতে সেই সুপ্ত ভাব-সমষ্টির মধ্য হইতে ঐ ভাষা-প্রকাশ্য কয়েকটী ভাব জাগরিত হইয়া সেই জাগরিত ভাবসমূহের মধ্যে একটা সম্পর্ক সংস্থাপন করে। উদাহরণ দিয়া বলিতে গেলে টাইপ্‌রাইটার মেশিন কতকটা এইরূপ কায করিয়া থাকে। এক একটী অক্ষরে ঘা পড়িলেই ক্রমান্বয়ে যেমন কাগজের উপর সেই সকল অক্ষরের যথাবিন্যস্ত দাগ পড়িয়া ঐ অক্ষর সমূহের একটা অভিনব সম্পর্ক ঘটাইয়া দেয়, আমাদের মনের মধ্যেও বাহ্য বস্তু ভাষার সাহায্যে এক একটী কথার অনুরূপ এক একটী ভাব জাগরূক হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ক্রমিক সম্পর্ক ঘটিয়া যায়। ভাব সমূহের এই ক্রমিক সম্পর্কই হইল পরের মনে ভাষার দাগ। ভাষা ইহার বেশী কিছুই করে না।

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে ভাষার সাহায্যে দুইটী মনের সম্পর্ক করিতে হইলে মন দুইটীরও কিয়ৎ পরিমাণে এক ভাবের শিক্ষা চাই। ভাষা বিষয়ক শিক্ষার মিল না থাকিলে ভাষার সাহায্যে দুই মনের সম্পর্ক অসম্ভব। একজন চীন দেশীয় লোক বা মাদ্রাজের লোকের সহিত ভাষার সাহায্যে মনোভাবের আদান প্রদান বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ ভাষা জিনিসটা বাহ্য বস্তু এবং কৃত্রিম শিক্ষা সাপেক্ষ। আবার সমাজের বিভিন্নতা অনুসারে চিন্তা প্রণালীরও বিভিন্নতা হয়। এবং সেই চিন্তা প্রণালীর বিভিন্নতারও প্রধান কারণ ভাষা। চিন্তা প্রণালীর ধারা অনুসারে যেমন ভাষা আকার প্রাপ্ত হয়, ভাষার আকার অনুসারে আবার সেইরূপ চিন্তা প্রণালীরও ধারা নিরূপিত হয়। এ যেন জলে নামিয়া সাঁতার শিক্ষা এবং সাঁতার দিবার শক্তি লইয়া জলে নামা। সে যাহাই হউক দুই ব্যক্তির মানসিক অভিজ্ঞতার মিল যতই বেশী থাকিবে, ভাষাও তাহাদের নিকট ততই কার্য্যকরী হইবে, আর মানসিক অভিজ্ঞতা যতই বিসদৃশ হইবে ভাব প্রকাশও ততই কঠিন বা অসম্ভব হইবে। ফলে ভাষার বৈসাদৃশ্য বশতঃ বাইবেল-প্রসিদ্ধ বেবিলনের উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে। সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী শিক্ষার ফলে কেহ কাহারও ভাষা বুঝিবে না।

সুতরাং এই সকল কারণে আমরা অনুমান করিতে

পারি যে, অতি প্রাচীন কালে মানবগণের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সহজ উপাদান অর্থাৎ সঙ্কেতাদির দ্বারাই হইত; শিক্ষা সম্পর্ক-লব্ধ উচ্চারিত ভাষার সাহায্যে হইত না। কারণ এই শিক্ষাও কাল-সাপেক্ষ; কিন্তু পক্ষান্তরে একথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার ফলে ভাষাও মানবগণের ভাব প্রকাশের সহজ উপাদানে পরিণত হয়। প্রথম প্রথম ভাষার সাহায্যে ভাবের উদ্রেক যেরূপ পরোক্ষভাবে হয়, কালক্রমে সে ভাব তিরোহিত হইয়া ভাষা মানবের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। তখন নিজে কথা বলিতে বা অন্যের কথা বুঝিতে কোনও চেষ্টার আবশ্যক হয় না। সাপ দেখিলেই পা যেমন পিছাইয়া আসে (রজ্জুতে সর্পভ্রম এই কারণেই হইয়া থাকে) কথা শুনিবামাত্র সেইরূপ মনোমধ্যে ভাবের উদ্রেক হয়; অর্থাৎ শ্রবণ ক্রিয়া ও মনন ক্রিয়ার মধ্যে কোনও ব্যবধানের উপলব্ধি হয় না। আবার আরও কিছুকাল পরে অর্থাৎ ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত হইলে ইচ্ছামাত্রই ভাষা বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হয়। অবশ্য শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ধীশক্তির তারতম্য অনুসারে এই শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। কবি কালিদাসের নিকট ভাষা যেরূপ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, সাধারণের ভাগ্যে কি আর সে সৌভাগ্য ঘটে? তবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, সাধারণ ভাব প্রকাশের জন্য আমরা যেরূপ স্বাধীনতার সহিত ভাষার ব্যবহার করি তাহাতে ভাষাকে আমাদের মনের বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ ভাষাটাকে যেন মনন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। এবং যখন আমরা চিন্তা করি তখনও মনে মনে ভাষার ব্যবহার করি।

বাইসিকেল চড়া শিখিবার সময় যতদিন শিক্ষার্থী বাইসিকেলে চড়িয়া বসিতে না পারে ততদিন একান্ত অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা করে। কিন্তু চড়িয়া বসিবার শক্তি পাইলেই যে অমনোযোগী হইয়া পড়ে এবং তখন হইতেই তাহার ঘন ঘন পতন আরম্ভ হয়। ভাষা শিক্ষার্থীও সেই প্রকার প্রথম শিক্ষাকালে নানাবিধ চেষ্টা সহকারে পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিবর্গের অনুকরণে বাগ্‌যন্ত্র বশ করে, কিন্তু বাগ্‌যন্ত্র বশীভূত হইবার পর হইতেই সে স্বাধীনভাবে ভাষা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। সময় ও পরিশ্রমের সংক্ষেপ সকলেরই অভিপ্রেত। বিশেষতঃ যখন মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অধিক হইয়া পড়ে এবং তাহার জন্য পারিপার্শ্বিক সমাজের অনুমোদিত ভাষার জ্ঞান না থাকে, তখন শিক্ষার্থী তাহার স্বপরিচিত উপাদান লইয়া ভাষা সৃষ্টি করে। এইকালে ভাষা সৃষ্টিতে বালক যে কৌশল অবলম্বন করে তাহাই ভাষার মুখ্য কৌশল। ২, ৪, ৬, ৮, প্রভৃতি সংখ্যা মনে রাখা সহজ, কেননা ইহাদের মধ্যে একটা অনুপাত আছে। এই অনুপাত, যুক্তির সাহায্যে স্মৃতিমধ্যে গাঁথিয়া যায়। কিন্তু ৭, ৩, ৫, ২, ১, ৪ প্রভৃতি সংখ্যার মধ্যে সেরূপ কোনও অনুপাত না থাকায় ইহাদিগকে মনে রাখা কঠিন হয়। ভাষার গঠন প্রণালীতেও আমরা সেই প্রকার একটা অনুপাতের উপলব্ধি করি। এই অনুপাত যুক্তি-গ্রাহ্য বলিয়া আমাদের স্মৃতি শক্তির সহায়তা করে। তাই ভাষা বিশেষের সহিত সামান্য পরিচয় লইয়াই আমরা সে ভাষায় রচনা করিতে পারি। 'এ, 'যে, 'সে' প্রভৃতি সর্ব্বনামের গৌরব বাচকরূপ 'ইনি, 'যিনি, 'তিনি' প্রভৃতিতে সর্ব্বত্রই একটা 'নি' দেখা যায়। এই 'নি' কার ও গৌরব বাচকতা অর্থের সহিত একটা সমবায় সম্পর্ক মনের মধ্যে সজ্ঘটিত হয়, এবং সেই সম্পর্কের প্রভাবে এই শব্দগুলি মনে রাখা সহজ হয়। আবার যখন এই সম্পর্কটী স্মৃতির মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তখন একটী শব্দ ভুলিয়া গেলে অনুপাতের সাহায্যে সেইটি গড়িয়া লইবার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ যে ভাষা অধিগত হয় নাই তাহা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হয়। ফলে সময়ে সময়ে তাহা পারিপার্শ্বিকগণের পদ্ধতির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। মনে করুন শিশু 'তিনি' শব্দটী ভুলিয়া গিয়াছে। সে অনুপাত কষিয়া বলিবে যে: যিনি :: সে: সিনি। আবার এইরূপে আরও সৃষ্টি করিবে যে: যিনি :: কে কিনি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বহুকাল পর্য্যন্ত 'এখন' শব্দের অনুকরণে

'সেখন' বলিত। পারিপার্শ্বিক-প্রভাব হইতে নিরপেক্ষ-ভাবে এই প্রকারের সৃষ্টি ভাষায় হুবহু চলে। ইংরাজশিশু অভিন্ন কারণে 'mans,' 'foots' প্রভৃতি বহুবচনের পদ রচনা করে। কিন্তু এইখানে তাহার অন্য-নিরপেক্ষা মানসিক শক্তি পারিপার্শ্বিক শক্তির নিকট উপহসিত হয়। পারিপার্শ্বিক সমাজ যে তাহার এই নব সৃষ্ট পদের অর্থ বুঝে না তাহা নহে। কিন্তু অর্থ বুঝিলেও সাধারণতঃ তাহার এই পদ সমূহ ভাষায় গৃহীত হয় না। সুতরাং তাহার মানসিক শক্তিতে পারিপার্শ্বিক শক্তির অনুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। অবশ্য এই অনুরূপতা বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে নূতন পরিশ্রম করিতে হয়, কারণ যুক্তি বা অনুপাতের সূত্রে সেগুলিকে গাঁথা যায় না।

আর একটা কথা। মনের সহিত পারিপার্শ্বিক শক্তিরই যে সময়ে সময়ে বিরোধ ঘটে তাহা নহে; শারীরিক শক্তিও সময়ে সময়ে মানসিক শক্তিকে পরাস্ত করে। শ্রুতিশক্তি বা বাগ্‌যন্ত্র চালনা শক্তির খর্ব্বতার জন্যও মানসিক চিত্র অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমার মধ্যম পুত্র 'মোটর কার' কথাটি 'মোটর কাঠ' শুনে। ইংরাজী aeroplane শব্দটা কাহারও কাহারও কাণে 'উড়ো-পেলেন হইয়া যায়। শিশু যখন 'জল'কে 'দল' বলে, তখন বোধ হয় তাহার শ্রুতিশক্তি ও বাক্‌শক্তি উভয়ে মিলিয়া তাহার মানসিক চিত্র অস্পষ্ট করিয়া দেয়। আবার যখন 'so' বলিতে সে 'show' বলে, তখন বাক্‌ শক্তির খর্ব্বতার জন্যই সে হায়রান্ হয়। 'হৃদয়,' 'প্রত্যাশা' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণেও বাঙ্গালী শিশুর বাগ্‌যন্ত্র বিদ্রোহী হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভাষা সৃষ্টির তিনটি শক্তি (মন দেহ ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব) সকল সময়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে না। ইহাদের কার্য্য-প্রণালী অতি বিচিত্র এবং অতি জটিল। এই জটিল শক্তিত্রয়ের একতা, বিভিন্নমুখিতা ও নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে কার্য্য সম্পাদিত হয় বা যে বস্তু সৃষ্ট হয়, তাহার প্রকৃতিও অতি জটিল হইবে সন্দেহ নাই। এই বিভিন্নমুখী শক্তিনিচয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যাহা অবিচল ও অবশ্যম্ভাবী, সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমূহের আবিষ্কারই হইল ভাষা বিজ্ঞানের সমস্যা এবং তাহাই ভাষার প্রকৃত ইতিহাস। সুতরাং ভাষা-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা হইবে, না, ইতিহাস বলা হইবে, একথা পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

ভাষা বিজ্ঞানবিৎ পাউল (Herman Paul) বলেন বিজ্ঞান দ্বিবিধ (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (২) ঐতিহাসিক তত্ত্ব-বিজ্ঞান। ইঁহার মতে **প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের** কার্য্য হইল বিশ্লেষিত উপাদান সমূহের পরস্পর-নিরপেক্ষ কার্য্য সমূহের পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সদৃশের সহিত সদৃশের সংযোজন দ্বারা কোনও একটি সমগ্র বস্তুর সৃষ্টি। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কার্য্য হইল বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্নমুখী শক্তি-নিচয়ের অবিরত পরিবর্ত্তনশীল ক্রিয়া-সমূহের পরস্পর সম্মিলনে কোনও একটী স্থির নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রণালী নির্দ্ধারণ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করা হয়, আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিজ্ঞানে পৃথক্ পৃথক্ উপাদান সমূহের সম্মিলিত শক্তির কার্য্য প্রণালীর পারস্পরিকতা নির্দ্ধারণ করা হয়। সুতরাং তত্ত্ব-বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত পৃথক্ পৃথক্ শক্তির অন্য নিরপেক্ষ কার্য্য-প্রণালীর জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত সমূহ একত্র করিলেই তত্ত্ববিজ্ঞান হয় না। মনোবিজ্ঞানের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত সমূহের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই এই বিজ্ঞানের কার্য্যারম্ভ হয় বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে সকল বিষয়ের চিন্তা আদৌ স্থান পায় না সেই সকল বিষয়ের আলোচনাই তত্ত্ববিজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপেক্ষা একটা উচ্চতর স্বাধীন স্থান তত্ত্ববিজ্ঞান অধিকার করে। ভাষা শাস্ত্র এই প্রকারের ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিজ্ঞান।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান যুগের মথুরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫। ভূতেশ্বর ও পাতাল দেবী—কাটরা হইতে দক্ষিণ দিকে অল্প দূরেই পাঁচ সাত হাত উচ্চ ভূমির উপর ইঁহার মন্দির স্থাপিত আছে। প্রায় দুই হাত উচ্চ একটি গোলাকার পাষাণ রচিত স্তম্ভের গাত্রে মুখ ও চক্ষু ইত্যাদি অঙ্কিত ভূতেশ্বর মূর্ত্তি। ইনি মথুরা সহরের ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক।[১] যাত্রীরা বিশ্রান্তি ঘাটে স্নান করিয়া প্রথমে ইঁহাকে দর্শন করে, তাহার পর অপরাপর দেব দর্শন বা বনযাত্রা করিতে বাহির হয়। ইঁহার নাম বরাহ পুরাণে আছে। মথুরার মধ্যে ভূতেশ্বরের বিশেষ সম্মান। লোকে, বজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত চারিটি শিব লিঙ্গের মধ্যে ইঁহাকে গণনা করিয়া থাকে। ইঁহার প্রাঙ্গণের পার্শ্ব দিয়া ২০।২৫ ধাপ সোপান নামিয়া একটি থিলান করা ছোট অন্ধকার ঘরে যাওয়া যায়। তথায় দণ্ডায়মানা অষ্টভূজা পাষাণ-রচিতা 'পাতাল দেবী' আছেন। এই গৃহের সহিত একটি সুরঙ্গ পথ যোজিত ছিল। তাহা এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এ গৃহটি হয়ত প্রাচীন কালে বৌদ্ধদিগের শরীর ধাতু (Relic) রক্ষার গৃহ ছিল। পাতাল দেবীর নাম বরাহ পুরাণে পাই নাই। যোগী সন্ন্যাসীরাই এখান-কার পূজারী; কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, যাত্রীদের অর্থে সেবা চলে।

ভূতেশ্বরের মন্দির

৬। মহাবিদ্যেশ্বরী টিলা—ইঁহার মন্দিরটী মশানী ষ্টেশনের নিকট, প্রায় ৫০।৬০ ফুট উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত। এ টিলাটীকে লোকে অম্বিকা টিলাও বলে; বরাহ পুরাণে মহাবিদ্যার নাম আছে। তিন দিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি; উপরে একটী কূপও আছে। পুরাতন মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া গেলে চৌবেরা চাঁদা তুলিয়া নূতন মন্দির করিয়া দিয়াছেন। মন্দির মধ্যে কালো পাথরে নির্ম্মিত

১। উত্তরে গোকর্ণেশ্বর, পূর্ব্বে পিপ্পলেশ্বর, দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর, ও পশ্চিমে ভূতেশ্বর, মথুরার চারিদিকে চারিটি ক্ষেত্রপাল বা নগর রক্ষক। তীর্থযাত্রীরা যমুনায় স্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে মথুরায় ভূতেশ্বর ও বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিয়া তবে অন্যান্য দেবদর্শনে বা বনযাত্রায় বাহির হন। শিবলিঙ্গের প্রাচীনতাই বোধ হয় এই গৌরবের কারণ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশান সম্রাট কদ্‌ফিস্ ২য় ও প্রথম বাসুদেব শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রাগুলির একদিকে সম্রাট দণ্ডায়মান, অপর দিকে দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি ও বৃষ অঙ্কিত। পাঠকগণ স্মরণ করিবেন, রামায়ণের মধুদৈত্য ও লবণাসুর শিবভক্ত ছিলেন।

তিনটি নারী মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। মধ্যবর্ত্তিনী মূর্ত্তিটীর নাম মহাবিদ্যা বা একানংশা দেবী। ইনি যশোদার গর্ভজাতা কন্যা যোগমায়া। কংস ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি হস্তচ্যুত হইয়া আকাশে অন্তর্হিতা হন। ইঁহার উভয় পার্শ্বে যশোদা ও দৈবকী। তিনটী মূর্ত্তিরই, মুখ ভিন্ন অপর অঙ্গ সকল বস্ত্রাচ্ছাদিত। সেই জন্য হস্ত পদাদির সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে বলে প্রতিমাটী খণ্ডিত বলিয়া এইরূপে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। প্রবাদ এই টিলার উপর শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে সর্পগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। যাত্রী প্রদত্ত অর্থে চৌবেরা ইঁহার সেবা চালান। টিলার নীচে পাষাণে বাঁধান অম্বিকা কুণ্ড (ছোট পুষ্করিণী) ও ফুল ফলে শোভিত অম্বিকা কানন।

৭। চামুণ্ডা টিলা—বৃন্দাবন দরওয়াজার বাহিরে, জয়সিংহপুরার নিকট একটা অত্যুচ্চ ঢিপির উপর স্থাপিত ৭।৮টী ঘর আছে। তাহার একটী ঘরের ভিতর সিন্দূর লিপ্ত একটী লাল পাথরের গায়ে একটী চক্ষু মাত্র অঙ্কিত চামুণ্ডা মূর্ত্তি; অন্য কোন অঙ্গ নাই। লোকে ইঁহাকে চামুণ্ডা বা ছিন্ন মুণ্ডাও বলিয়া থাকে। কিন্তু এদেশের লোকেরা শীতলা দেবী রূপে ইঁহাকে পূজা করে। চৌবেরা যাত্রীদত্ত অর্থে ইঁহার সেবা চালান।

৮। সরস্বতী টিলা বা আশ্রম—একটী অত্যুচ্চ টিলার উপর ছোট মন্দিরের ভিতর বিষ্ণু, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি কয়েকটী মূর্ত্তি আছে। বৈষ্ণব সাধু ও সন্ন্যাসীরা যাত্রীদত্ত অর্থে ইঁহার সেবা করেন। টিলার পার্শ্বস্থ সরস্বতী কুণ্ড হইতে একটী শুষ্ক খাল যমুনায় মিশিয়াছে।

৯। ধ্রুব টিলা—সহরের দক্ষিণে যমুনা তীরে অবস্থিত। উচ্চে প্রায় ৫০ ফুট হইবে। টিলাটী ২।৩ থাকে উঠিয়াছে। উপরের থাকে ছোট মন্দিরের ভিতর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত যোড়করে দণ্ডায়মান পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের মূর্ত্তিটী দেখিতে বেশ সুন্দর। গাত্রে হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ, মাথায় টুপি। ইঁহার নীচের থাকে

শিঙ্গার বেশে ভূতেশ্বর মহাদেব

বরাহ ও মহাবীর, তৎসঙ্গে পদ্মপলাশলোচন নামে নব নির্ম্মিত একটী রাধাহীন কৃষ্ণমূর্ত্তিও আছে। এই টিলার উপর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মঠ আছে, এ সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভাবে পূজা করেন। কোনও নির্দ্দিষ্ট আয় নাই।

১০। কংস টিলা—হোলি দরজার নিকট, উচ্চে প্রায় ২৫ ফুট, দুই থাকে উঠিয়াছে। মন্দিরের ভিতর মৃন্ময় কৃষ্ণ ও বলরাম, কংসাসুরের পাটের কেশ আকর্ষণ করিতেছেন। যাত্রী প্রদত্ত অর্থে ইঁহার সেবা চলে, নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। কার্ত্তিকী শুক্লা দশমী তিথিতে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই টিলার পার্শ্ব দিয়া কংস খেড়া নামে একটী ক্ষুদ্র খাল বা নালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। চৌবেরা বলেন, কংসের মৃত দেহটা টানিয়া যমুনায় ফেলিবার সময় গাত্র ঘর্ষণে এই খাল উৎপন্ন হইয়াছে।
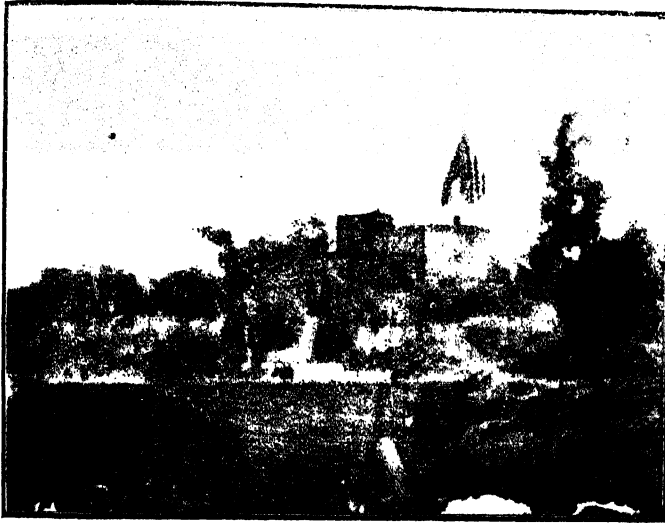
মহাবিদ্যা টিলা, উপরে তাঁহার মন্দির

১১। কুব্জা টিলা—কংস টিলার নিকট; এটী ১৫।২০ ফুট উচ্চ। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর পিতল নির্ম্মিত কৃষ্ণ ও কুব্জার নিতান্ত আধুনিক মূর্ত্তি। অল্পদিন হইল এ দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে।

১২। অম্বরীশ টিলা—অবস্থান বৃন্দাবন দরওজার নিকট। উচ্চে প্রায় ২০।২৫ ফুট হইবে, ছোট মন্দিরের ভিতর অক্ষমালা হস্তে রাজা অম্বরীশের পাষাণময় ছোট মূর্ত্তি। পৌরাণিক আখ্যানে এই সূর্য্যবংশীয় রাজা নাভাসের পুত্র রাজা অম্বরীশের ভক্তিতে প্রীত হইয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্রকে ইঁহার রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা বর্ষব্যাপী বিষ্ণু যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়া যখন পারণা করিতে যাইতেছিলেন তখন কোপন স্বভাব দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া ছলে ইঁহার ব্রত ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন, ও নিজ জটা হইতে একটী উগ্র দৈত্য মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া রাজার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হন। বিষ্ণুচক্র দানবকে বধ করিয়া, দুর্ব্বাসার প্রতি ধাবিত হইল। তখন নিরুপায় ঋষি রাজার শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এ মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, যাত্রী দত্ত অর্থে সেবা চলে।

১৩। হনুমান টিলা—২৫।৩০ ফুট উচ্চ টিলাটি বৃন্দাবনে যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। ছোট মন্দিরের ভিতর, এক হস্তে মুদ্গর, অপর হস্তে পর্ব্বত লইয়া মহাবীর দণ্ডায়মান আছেন। রামানন্দী সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজারী। শুনিলাম সেবার্থ দেবোত্তর গ্রাম আছে।

১৪। গণেশ বা বিনায়ক টিলা—২৫।৩০ ফুট উচ্চ টিলা। বৃন্দাবন যাইবার পথে জয়সিংহপুরায় অবস্থিত। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর প্রায় দুই হস্ত উচ্চ গণেশের মূর্ত্তি। শুনিলাম সেবার জন্য মহারাষ্ট্র পেশওয়ারা ১০০০৲ হাজার টাকা আয়ের একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। সেই আয় হইতে চৌবেরা ইঁহার সেবা চালান। গণেশ চতুর্থীতে এখানে মেলা বসে। এটি গাণপত্য সম্প্রদায়ের দেবালয়।

১৫। সপ্তর্ষি টিলা—৩০।৩২ ফুট উচ্চ, যমুনা তীরে ধ্রুব টিলার নিকট। ছোট মন্দিরের ভিতর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সাত জন ঋষি যজ্ঞকুণ্ড বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই সাতটী নামে সাতটী নক্ষত্রও আছে। চৌবেরা পূজা করেন, নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। এই টিলা খনন করিলে স্থানে স্থানে ভস্ম বাহির হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে এ টিলাটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। মামুদ গিজনী মথুরা ভস্মসাৎ করিবার পরে কালবশে উপরে কাদামাটি জমিয়াছে এবং ভিতরে ভস্ম রহিয়া গিয়াছে।

১৬। ধনুস্ টিলা—অনুমান ৩০।৩৫ ফুট উচ্চ। গবর্ণমেণ্টের স্কুল ও রঙ্গভূমির নিকট। ছোট মন্দিরের

বলদেবের শেষ বা সর্প মূর্ত্তি

২৫। দ্বাদশাদিত্য ও সূর্য্যমূর্ত্তি। সূর্য্যঘাটে ছোট মন্দিরের ভিতর একখানা পাথরের গায়ে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটী সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত। যোগী সন্ন্যাসীরা পূজারী। ধ্রুবঘাটে প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত সাত ঘোড়ার রথে সূর্য্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহার পদতলে অরুণ সারথি। এ দুইটি সৌরদিগের দেবতা।

২৬। বলি টিলা—যমুনাতীরে, ধ্রুবটিলার দক্ষিণে, প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর বলিরাজ বামন দেব ও শুক্রাচার্য্যের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এ টিলার গাত্র খনন করিলে ভস্ম বাহির হয়। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা যাত্রী প্রদত্ত অর্থে সেবা চালান। আখ্যান, বলিরাজা পাতাল পুরীতে কুটুম্ব ভরণে অক্ষম হইয়া এই টিলায় আসিয়া সূর্য্য দেবের উপাসনা করেন এবং তাঁহার নিকট চিন্তামণি নামক মণি লাভ করেন।

২৭। পদ্মনাভ—হাতী গলিতে, সমতল ভূমিতে, ছোট মন্দিরের ভিতর এই নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ব্রহ্ম-পুরাণে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। শ্রীসম্প্রদায়ের লোকেরা পূজারী। কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই।

২৮। নারদ টিলা।—বিনায়ক টিলার নিকট ১৮।২০ ফুট উচ্চ। মন্দিরের ভিতর হনুমানমূর্ত্তি। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা যাত্রীদত্ত অর্থে সেবা চালান।

২৯। কলিযুগ টিলা।—শিবতাল নামক পুষ্করিণীর নিকট। ১৫।২০ ফুট উচ্চ। ছোট গৃহমধ্যে শিবলিঙ্গ, যাত্রীদত্ত অর্থে সাধু সন্ন্যাসীরা পূজা করেন।

৩০। নৃসিংহ টিলা—বলভদ্র কুণ্ডের নিকট অনুচ্চ ভূমির উপর ছোট মন্দিরের ভিতর নৃসিংহ মূর্ত্তি, পার্শ্বে প্রহ্লাদ। যাত্রীদত্ত অর্থে বৈষ্ণবেরা সেবা চালান।

৩১। নাগ টিলা—ধ্রুব টিলার নিকট ৩০।৩৫ ফুট উচ্চ, উপরে কুণ্ডলাকৃতি সর্প দেহের উপর বহু ফণা বিশিষ্ট নাগ-

মানসিংহের পিতামহীর চিতারোহণের স্মৃতিচিহ্ন সতীবুরুজ
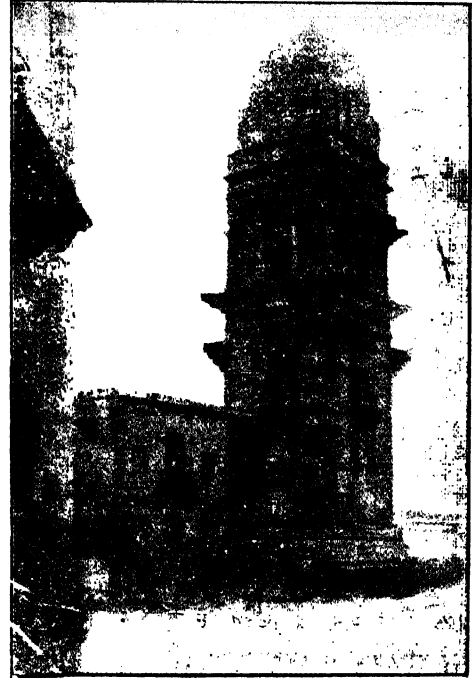
রাজের মূর্ত্তি। নাগাষ্টমীর দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। চৌবেরা পূজারী।

এই প্রসঙ্গে আমরা মথুরা প্রদেশে নাগ বা সর্প পূজার বিষয় বলিব। আমাদের পুরাণ মধ্যে বলদেবকে অনন্তদেব বা নাগ রাজের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রভাসতীর্থে লীলা সম্বরণকালে তাঁহার মুখ বিবর হইতে একটী সহস্র ফণা বিশিষ্ট সর্প নির্গত হইয়া পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল বলিয়া আখ্যান আছে। মথুরার যাদুঘরে শিরোপরি সপ্ত ফণা শোভিত আটটী নাগরাজ মূর্ত্তি সংগ্রহীত হইয়াছে। সেই গুলির যাদুঘরের নম্বর সি ১৩ হইতে সি ২১। সি ১৩ নম্বর মূর্ত্তিটী উচ্চে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি, ইঁহার দক্ষিণ হস্তটি যেন প্রহারোদ্যতভাবে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, বাম হস্ত ভগ্ন, যেন একটা পান পাত্র বক্ষে ধরিয়া আছেন বলিয়া অনুমান হয়, ধুতিখানা কটি দেশে ফের দিয়া বাঁধা, গলে রত্নহার, গায়ে জামা, মাথার উপর সাতটী সর্প ফণা রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটিকে পণ্ডিত রাধাকিশণ রায় বাহাদুর ১৯০৮ সালে মথুরার ৫ মাইল দক্ষিণে ছারগ্রাম হইতে আনিয়াছেন। ইহার পশ্চাৎ দিকে ছয় ছত্রে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে —"মহারাজ রাজাতিরাজ হবিষ্কের চল্লিশ সম্বৎসরে হেমন্তের দ্বিতীয় মাসে তেইশ দিবসে পিণ্ডপ্রিয় পুত্র সেনহস্তী ও বীরবৃদ্ধির পুত্র ভনক দুই বন্ধুতে মিলিয়া নিজ পুষ্করিণীর সকাশে এই নাগ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। নাগরাজ প্রীত হউন।" অপর সাতটী মূর্ত্তির আকারও অনেকটা এইরূপ, তবে উচ্চে কিছু কম। সেগুলির গাত্রেও কুশান রাজগণের সময়ের দুই একটী খণ্ডিত লিপি আছে। এই সকল শিলালেখ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কুশান রাজগণের সময়ে এইরূপ মূর্ত্তিগুলিকে লোকে নাগরাজ মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিত। যমুনার পূর্ব্বতীরে মহাবনের নিকট ক্ষীর সাগর নামক পুষ্করিণী তীরে এইরূপ আকারের একটী বলদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতর বলদেব মূর্ত্তির সহিত একটী বৌদ্ধযুগের নারীমূর্ত্তিকে পূজারীরা রেবতী নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। আমরা তাহারই চিত্র দিলাম। এই মূর্ত্তিটিকে কেহ দাউজী, কেহ শেষ নাগমূর্ত্তিও বলিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের দক্ষিণে পরিক্রমা পথের পার্শ্বে ছোট মন্দিরের ভিতর এইরূপ আকারে দাউজীরা শেষ নাগের সপ্ত ফণা শোভিত মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। তাহার পশ্চাতে সর্পদেহটী ইংরাজী এস (S) অক্ষরের ন্যায় পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমাদের পুরাণে যেমন,—বসুদেব মথুরার কারাগার হইতে সদ্য প্রসূত শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে লইয়া যাইবার পথে সর্পরাজ বাসুকী আসিয়া ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেবের জন্মকালেও তেমনি নন্দ ও উপানন্দ নামে দুইটি সর্পরাজ আসিয়া সদ্যোজাত বুদ্ধদেবকে করযোড়ে স্তব করিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থে আখ্যাত আছে। মথুরায় এইরূপ
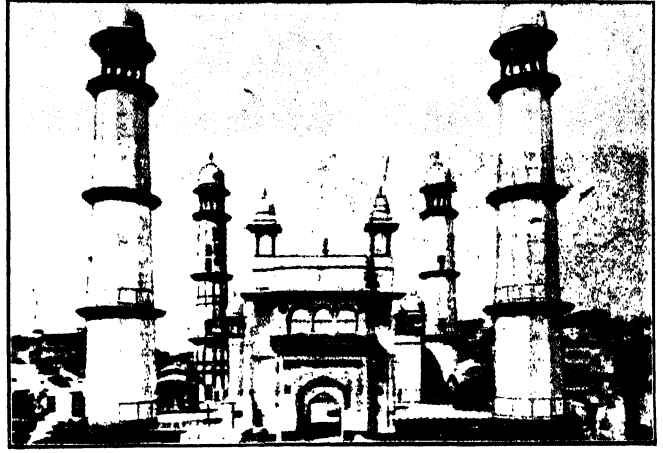
নবী সাহেবের মসজিদ

যমুনা বক্ষ হইতে মথুরার কেল্লা

সর্পাঙ্কিত ২১১ খানা পাষাণ ফলক পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু পুরাণোক্ত গোপরাজ নন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা উপানন্দের নাম কিরূপে বৌদ্ধগ্রন্থে সর্পরাজ হইল তাহা বলিতে পারি না। তদ্‌ভিন্ন একটা বিশালকায় সর্প, ফণা বিস্তার করিয়া তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধ দেবকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতেছে, এরূপ দুই চারিটা মূর্ত্তিও ভারতের স্থানে স্থানে মিলিতেছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, সর্প ঘটিত আখ্যান কেবল আমাদের পুরাণে নহে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও আছে। আরও একটি কথা এই যে, নাগরাজ মূর্ত্তিগুলির বাম হস্তেপান পাত্র আছে। বলদেবের ধ্যানেও তাঁহাকে "হালালোলং" বা "কাদম্বরী মদ বিঘূর্ণিত লোচন" বলা হয়। এই হালা ও কাদম্বরী দুই প্রকার মদ্য। এতদ্‌ভিন্ন আরও কয়েকটি পান পাত্র হস্তে অজ্ঞাত নামা দেবমূর্ত্তি মথুরার যাদুঘরে রহিয়াছে।

৩২। রামজী দুওয়ারা—হোলি দরওয়াজার নিকট সরু গলিতে একটী ছোট মন্দিরের ভিতর এই অষ্টভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার আটহাতে শঙ্খ চক্রাদি ভিন্ন ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রও আছে। চোবেরা তাঁহাকে অষ্টবক্র গোপাল বলিয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ—হিন্দী রামায়ণ প্রণেতা তুলসীদাস যখন মথুরা দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন এখানে শঙ্খ-চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। তিনি ব্যাকুল চিত্তে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তিকে প্রণাম করিব না।" ভক্তবৎসল এই দেব মূর্ত্তিটী অন্যান্য অস্ত্র সমেত ধনুর্ব্বাণাদি যুক্ত আর চারিটী হাত বাহির করিলেন। তুলসীদাসও তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপ অষ্টভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তির কথা পুরাণে আছে। ২

৩৩। গড়ুর গোবিন্দ—ইঁহার মন্দির সহরের বাহিরে ছটিঘরা নামক স্থানে অবস্থিত। ইনি গরুড়ারূঢ়। অষ্ট হস্ত, দক্ষিণ হস্ত চতুষ্টয়ে চক্র, খড়্গ মুষল ও অঙ্কুশ। বাম চতুষ্টয়ে শঙ্খ, শার্ঙ্গধনু, গদা ও পাশ। সঙ্গিনী পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাহস্তা সরস্বতী। অগ্নি পুরাণে এইরূপ গরুড়ারূঢ় অষ্টভুজ মূর্ত্তি গুলিকে 'ত্রৈলোক্য মোহন' নাম দেওয়া হইয়াছে। বরাহ পুরাণে (১৯৬ অ ২৭।২৮) এই গরুড় গোবিন্দের এইরূপ আখ্যান আছে—একদা গরুড় মথুরাবাসী লোকদিগকে বিষ্ণুর সহিত একরূপ আকার দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে প্রীত হইয়া বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। তাহাই স্মরণ জন্য গরুড় গোবিন্দ মূর্ত্তি হইয়াছে। বরাহ পুরাণে কেবল গোবিন্দ বলিয়া নাম আছে, পাছে কেহ বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেবকে এই পুরাণ লিখিত গোবিন্দ বলিয়া ভ্রমে পড়েন সেই জন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ৮১ শ্লোকে লিখিত আছে—"এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥" চোবেরা কিন্তু যাত্রিগণকে এই মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিয়া থাকেন যে, একদা ক্রীড়া কালে সখা শ্রীদাম গরুড়-

২। ছাত্তা বাজারে ধনুর্ব্বাণ হস্তে একটী শত্রুঘ্নের নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পার্শ্বে হনুমানজী দণ্ডায়মান।

মূর্ত্তি ধারণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিষ্ণু মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩৪। দ্বারকাধীশ—এই মন্দিরটী ২০ ফুট উচ্চ টিলার উপর। শেঠদিগের আদিপুরুষ গোকুল দাস পাবকজী ১৮১৫ খৃঃ ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকে এটিকে শেঠেদের ঠাকুর-বাড়ী বলে। ইহার কারুকার্য্য বেশ সুন্দর। মন্দির তলে মার্ব্বেল পাথর বিছান। স্তম্ভগুলিও শিল্প-কলা শোভিত। মধ্যবর্ত্তী গৃহে দ্বারকাধীশ নামে বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত। দক্ষিণ দিকের গৃহে, মুরলীমোহন নামে কৃষ্ণমূর্ত্তি, বামদিগের গৃহে লক্ষ্মী প্রতিমা। বল্লভাচার্য্য বংশীয় লোকেরা এখানকার পূজারী। এখানে সোণা, রূপা, হীরা জহরতের আসবাব বিস্তর। ধনী শেঠদিগের প্রদত্ত বাৎসরিক ৪০০০০৲ টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে মহা সমারোহে এখানকার সেবা চলে। শুনলাম মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে সেই মহার্ঘ প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩৫। সতী বুরুজ—জয়পুরের রাজা বিহারী মল্লের পত্নী, রাজা ভগবান দাসের মাতা, মহারাজ মান-সিংহের পিতামহী, যমুনা তীরে বিশ্রান্তি ঘাটের নিকট স্বামীর শব দেহের সহিত চিতারোহণ করিয়াছিলেন। স্মৃতি রক্ষার জন্য রাজা ভগবান দাস ১৫৭০ খৃঃ এই চতুষ্কোণ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এটী উচ্চে ৫৫ ফুট এবং চারি তলে বিভক্ত। নীচের তল বা বেদী ভরাট গাঁথা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের ভিতর দিয়া সোপান গিয়াছে। চতুষ্কোণ গবাক্ষ দিয়া ভিতরে আলো প্রবেশ করে। বাহিরটী লাল পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত। চতুর্থ তলায় গম্বুজ বিদ্য-মান। তাহার পাথরগুলা খসিয়া গিয়াছে। অনভিজ্ঞ চৌবে ঠাকুরেরা এই সতী বুরুজ দেখাইয়া যাত্রিগণকে বলিয়া থাকেন যে, কংস রাজার মহিষী এই স্থানে সতী হইয়াছিলেন !!!

এই বুরুজটী ও চৌবেজীকা বুরুজ নামে অপর একটী চারি কোণ মঞ্চ, মথুরার মধ্যে আকবরের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া জানা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত বাটী গুলি তৎপরবর্ত্তীকালের, অধিকাংশ ইংরাজ আমলে নির্ম্মিত। এখন আমরা ইংরাজ আমলে নির্ম্মিত আর কয়েকটী নূতন মন্দিরের কথা বলিব।

৩৬। স্বামী ঘাটের নিকট অনন্তরাম শেঠ নামে একজন চুড়িওয়ালা ১৮৫৯ সালে ২০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া মদনমোহনজীর একটী সুন্দর মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

৩৭। কুশল চাঁদ শেঠ নামক বরোদারাজের একজন কামদার ১৮৩০ সালে গোবর্দ্ধন নাথের মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

৩৮। ছক্কিলাল ও কানাইয়া লাল নামে দুইজন মহাজন ১৮৫০ সালে ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে বিহারী-জীর একটী মন্দির করিয়া দিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিতে এটী বেশ সুন্দর।

৩৯। গৌরসহায় ঘনশ্যামদাস ১৮৪৮ খৃঃ একটি গোবিন্দ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

৪০। ১৮৬৬ খৃঃ স্বামীঘাটে গুলরাজ ও জগন্নাথ নামে দুইজন চুড়ীওয়ালা গোপীনাথজীর মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

৪১। হোলি দরওজায় রাইবাই নামে একজন বণিক-পত্নী ৫০০০০৲ টাকায় বলদেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৪২। সাতঘরা মহল্লায় রূপা বোরা নামে একজন চৌবে, মোহনজী নামে ঠাকুরের মন্দির করিয়াছেন।

৪৩। নবী মসজিদ। মথুরায় বাজারের মধ্যে, চারিটি মিনার শোভিত, আবদন্ নবী নির্ম্মিত যে প্রসিদ্ধ মস্‌জীদ আছে, সেটী দেখিতে বেশ সুন্দর। এখানকার প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিলাম যে, সেকেন্দর লোদী এই স্থানে একটী টিলার উপর পূর্ব্বে যে হিন্দু মন্দির ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া কসাইদিগকে দোকান করিতে দিয়াছিলেন। পরে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি বা ফৌজদার আবদন নবী প্রভুর আজ্ঞানু-সারে কসাইদিগের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া

১৬৬২ খৃঃ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ইহার খিলানাদি ফাটিয়া গিয়াছিল। এখন মেরামত হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে আজিও কসাইদিগের দোকান আছে। মথুরা সহরে কেশবজীর টিলার উপর আওরঙ্গজেব নির্ম্মিত জুম্মা মসজিদ ও নবী মসজিদ এই দুইটী মাত্র মসজিদই দর্শনযোগ্য। আরও চারি পাঁচটা যে ছোট ছোট মসজিদ্ আছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে।

৪৪। এখানকার প্রসিদ্ধ ধনী লছমিচাঁদ শেঠের লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত প্রাসাদটি ও তৎন্নিকটে ভরতপুরের রাজাদের নির্ম্মিত পিত্তলময় ফটক দেওয়া প্রাসাদ—এই দুইটীও দেখিবার উপযোগী।

৪৫। কঙ্কালী টিলা—মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, কাটরা হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে, আগ্রা ও গোবর্দ্ধন যাইবার পথের মোড়ে, এই টিলাটী অবস্থিত। এ টিলাটী চারিকোণা, ৫০০ × ৩৫০ ফুট। ইহার এক পার্শ্বে একটী ছোট প্রাচীর ঘেরা দেবস্থানের মধ্যে একটা সিন্দুরলিপ্ত স্তম্ভ গাত্রে অঙ্কিত নারী মূর্ত্তিকে লোকে কঙ্কালী দেবী বলিয়া থাকে। এই দেবালয়টী খুব পুরাতন নহে। পূর্ব্বে এই টিলাটী ১০।১২ ফুট উচ্চ ছিল। ইহার উপর কোনরূপ দেবমন্দিরাদি না থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনের সাধে খনন ও অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধিবাসীরা এস্থান হইতে ইট ও পাষাণ খণ্ড সকল অবাধে লইয়া গিয়া আপনাদের বাটী নির্ম্মাণ করিতেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৭১ খৃঃ, গ্রাউস সাহেব ১৮৭৫ খৃঃ, ডাঃ বর্জ্জেস ও ডাঃ ফুররার সাহেব ১৮৮৭—১৮৯৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কয়েক বার খনন করিয়া বৌদ্ধ ও জৈন যুগের অনেক ধ্বংসাবশেষ বাহির করিয়াছেন। তন্মধ্যে কনিষ্ক হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি কুশানরাজগণের ও শক সত্রপ সোডাসের নামাঙ্কিত কয়েক খানা শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপের পূর্ব্ব দিকে শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ সকল, ও পশ্চিম দিকে দিগম্বর সম্প্রদায়ের নিদর্শন সকল পাওয়া গিয়াছে। তৎসঙ্গে দুইচারিটা ভগ্ন হিন্দু দেবমূর্ত্তি যথা দশভূজা, গণেশ প্রভৃতিও মিলিয়াছে। ডাঃ ফুররার সাহেব বলেন, এই কঙ্কালী স্তূপে কেবল জৈনগণের নহে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদিগের পর্য্যন্ত মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে বীরসিংহ নির্ম্মিত কেশবজী মন্দিরের তোরণের একখানা কপালী (lintel) মিলিয়াছে। সেখানিতে একটী কারুকার্য্য শোভিত গোলাকার চক্রের ভিতর কমলদ্বয় হস্তে সূর্য্যদেব বসিয়া আছেন। এখান হইতে অনেক ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্ণৌয়ের যাদুঘরে চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ জানিতে চাহেন তাহারা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত "The Jain stupas and other antiquities of Mathura" পুস্তক দেখিবেন। সে পুস্তকে এখনকার অনেক গুলি ধ্বংসাবশেষের চিত্র দেওয়া আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে "লেখমালানুক্রমণী" নামে একখানা পুস্তক বাহির হইয়াছে, সে পুস্তকে মথুরায় প্রাপ্ত ১১১ খানি শিলালেখের পরিচয় আছে। তাহার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর শিলালেখ এই কঙ্কালী টিলা হইতে প্রাপ্ত। তৎকালে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীও যে মথুরায় দেবালয় ও মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন তাহা শিলালেখ হইতে জানা যায়। এবং এই মথুরার শিল্পকলা হইতে আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাৎকালীন বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিল্পকলা লইয়া কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রভেদ বা বিরোধ ছিল না। তাঁহারা সকলেই একই ধরণের স্তূপ, দেবমূর্ত্তি বা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহাদের বৃক্ষ, রেলীং, চক্র, স্বস্তিক, শিলাপট, আয়সপট প্রভৃতিতে একইরূপ নক্সা করিতেন। এই সকল শিল্প কলার মধ্যে কয়েকটা গ্রীক, ব্যাবিলন, শক ও কুশানদিগের আদর্শ আছে। শিলালেখগুলির অক্ষর, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে গুপ্তরাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত। ভাষাও কতকগুলার পালি, কতকগুলার অশুদ্ধ সংস্কৃত। এই কঙ্কালী টিলা হইতে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের নামাঙ্কিত একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহা লেখা আছে, তাহার

অর্থ,—"বিখ্যাত যশোগুণান্বিত ব্যক্তিগণের অগ্রণী ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক এই প্রতিকৃতি সভক্তি······বিহারে প্রতিমা প্রতিস্থাপিত হইল। ইহাতে যে পুণ্য হইবে তাহা মাতা পিতা ও ভ্রাতৃগণের হউক।" অধ্যাপক ডাউসন সাহেব বলেন, এই শিলালিপি একটি বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠে অঙ্কিত ছিল। সেখানার অবস্থান এখন অজ্ঞাত। ইহার অক্ষর ১ম বা ২য় শতাব্দীর। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর অশোকের পালি ভাষায় লিখিত লেখমালার সহিত ইহার ঐক্য হয় না। হয়ত মথুরায় অশোক স্থাপিত বৃদ্ধ মূর্ত্তির প্রবাদ শুনিয়া পরবর্ত্তীকালে কেহ ইহা খোদিত করিয়া থাকিবেন। শিলালেখানুক্রমণী স্তম্ভকের ১১৬ সংখ্যা দেখুন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আজিও ভারতের কোথাও অশোক স্থাপিত বুদ্ধ মূর্ত্তি পান নাই। তৎকালে একটি বৃক্ষের উভয় পার্শ্বে মৃগ প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া সঙ্কেতে বুদ্ধদেবের পূজা করা হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে কুশান সম্রাটগণের সময় হইতেই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

অরণ্য-তটিনী

হে অরণ্য-প্রবাহিণি! শুধু কি মধুর
নৃত্য-গীতে নিত্য তুমি আছ ভরপুর?
তা'ত নয়, কাননের জননী-হৃদয়
করুণায় গলে' গিয়ে নদী হ'য়ে বয়।
তোমারে ঘিরিয়া তাই, হেরি সারা বেলা,
পশু-পক্ষী তরু-লতা করে নানা খেলা,
তৃষ্ণার্ত্ত সন্তান সম স্তন্যসুধা আশে
শিকড়ে আঁকড়ি' তরু নামে দুই পাশে,
অবোধ অবাধ্য শিশু পশু-পক্ষী সব
ঝাঁপায়ে পড়িয়া কোলে করে উপদ্রব;
এই কাছে, এই দূরে ডাকে কত পাখী
ঘুরে ঘুরে ছেলে যেন মাকে দেয় ফাঁকি।
হাসি মুখে সহি' মা গো এ দুরন্তপনা
সবারে বাঁটিয়া দাও তব স্নেহ কণা।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাদুলি মহিমা

(গল্প)

কি কারণে জানি না—জমিদার শ্যামলাল বাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রী সুমতি দেবীর আজ বছর তিন হইতে মুখ দেখাদেখি নাই। নিঃসন্তানা সুমতি দেবী অন্তঃপুরে একাই থাকেন—একাই শয়ন করেন—একাই বিরলে বসিয়া মনের দুঃখে অশ্রুপাত করেন। বিমুখ স্বামীর চিত্তকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় বারংবার বিফল মনোরথ হইয়া এখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আজ তিন বৎসর শ্যামলালবাবু অন্দর মহলে প্রবেশ করেন নাই এবং পত্নী সুমতি দেবীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা দূরে থাক—যদি কখনো ঘটনাক্রমে স্ত্রীর চোখের সামনে পড়িয়া যাইতেন—তখন মহাবিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেন। পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় সুমতি দেবীর হৃদয়ে যেরূপ আঘাত লাগিত এখন ক্রমেই তাহা সহনীয় হইয়া আসিতেছে।

তথাপি সুমতি দেবী একেবারেই যে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। স্বামী বশীভূত করিবার যত প্রকার ঔষধ এবং তন্ত্রমন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই একে একে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস ক্রমে নষ্ট হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছেন—দৈব তাহার প্রতিকূল, সুতরাং দেবতার দ্বারে হত্যা দেওয়া বা তন্ত্রমন্ত্রে কোনো সুফল ফলিবে না। তবে এখনো নূতন কোনো দৈবজ্ঞ ঠাকুরের শুভাগমন হইলে, তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া হাত না দেখাইয়া ছাড়েন না।

২

একজন নূতন গ্রহাচার্য্য আসিয়াছেন। তিনি সুমতি দেবীর একবার বাম করতল এবং একবার চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "মা, তোমার গ্রহবৈগুণ্য এইবার কাটিয়া আসিয়াছে—এইবার তোমার স্বামীর মন ফিরিবে।"

উদ্বেগচঞ্চলকণ্ঠে সুমতি দেবী কহিলেন, "ফিরিবে তো বাবা! ফিরিবে তো—"

গ্রহাচার্য্য কহিলেন, "অবশ্যই ফিরিবে। কিন্তু তোমাকে এক কায করিতে হইবে—"

সুমতি। কি বলুন! আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিতে রাজী।

গ্রহাচার্য্য মহাশয় তখন ঝোলা হইতে একটি তামার মাদুলি অতি সাবধানে বাহির করিয়া, সুমতিকে দেখাইয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে দেবী ভগবতীর বীজমন্ত্র শিখাইয়া দিব; মনে মনে একশো আটবার সেই মন্ত্র জপ করিয়া, এই যোগসিদ্ধ মাদুলিটি পবিত্র গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া, তোমাকে বাম বাহুতে লাল সুতায় ধারণ করিতে হইবে। আর একটি গুহ্যকথা, সেই মাদুলি-ধোয়া গঙ্গাজল একটি শিশিতে পূরিয়া, ঔষধের মতো বারটি দাগ কাটিয়া রাখিয়া দিবে। যখন তোমার স্বামী আহার করিতে আসিবেন, তখনি যে কোনো উপায়ে হোক—জলের সঙ্গে হোক বা দুধের সঙ্গে হোক—ইহা তাহার উদরস্থ হওয়া চাই-ই। মনে থাকে যেন—প্রত্যহ একদাগ। ঠিক বারদিন পরে তিনি যেখানেই থাকুন, ছুটিয়া তোমার কাছে আসিতেই হইবে।"

সুমতি কহিলেন, "বাবা, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যদি যথাযথ পালন করি—তাহা হইলে আপনার কথা সত্য হইবে তো? তিনি আবার আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন তো? আমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে তো?"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে গ্রহাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, পাগলী—আমার ভবিষ্যদ্বাণী কখনই বিফল হয় না। এখন মা ভগবতীর প্রসন্নতা কামনার জন্য যে পূজাদি জপতপ করিতে হইবে—তাহার খরচটা—"

"এই নিন্" বলিয়া সুমতি দেবী আচার্য্য মহাশয়ের পদতলে একখানি একশত টাকার নোট রাখিয়া, গলায় আঁচল দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

"অদৃষ্ট তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হোক"—বলিয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, আচার্য্য মহাশয় প্রসন্নচিত্তে বিদায় হইলেন।

৩

সেই দিন সন্ধ্যা বেলায় একমাত্র বিশ্বস্ত পরিচারিকা বামা ঝিকে বিরলে ডাকিয়া সুমতি কহিলেন, "বামা, তোকে আমার একটা কথা রাখিতে হইবে।"

বামা কহিল, "কি বল! জানই তো—তোমার বামা অসাধ্য সাধন করিতে পারে—"

সুমতি কহিলেন, "তা জানি বলিয়াই তো তোকে

এত স্নেহ করি। আমার যে কি দুঃখ তাহা তো তুই সকলি জানিস।"—বলিয়া ছল ছল নেত্রে তিনি চুপ করিলেন।

সহানুভূতিতে বামার দুটি চোখ আর্দ্র হইয়া আসিল। সে কহিল, "আহা বৌমা, স্বামী যে কি পদার্থ তা তুমি ভারতে জন্মিয়া কিছুই জানিলে না! সেই বাবু যে এমন হইবেন তাহা কে জানিত? এখনো মাঝে মাঝে কি ইচ্ছা হয় জান—সেই ডাইনী বৈষ্ণবী মাগীকে গিয়ে গুণে গুণে একশো আট ঝাঁটার বাড়ী মারিয়া আসি।" বলিয়া ডান হাতটা উঁচাইয়া ঝাঁটা মারিবার ভঙ্গী করিল।

বামার কাণ্ড দেখিয়া অতি দুঃখের সময়ও সুমতি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "না! তাহাকে মারিবার দরকার নাই। কৌশলে যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহাই করিতে হইবে।"

বামা কহিল, "হাঁ, হাঁ, বুঝিয়াছি, যাহাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে। তা বল, আমি তোমার জন্য সবই করিতে প্রস্তুত আছি।"

সুমতি তখন কাপড়ের ভিতর হইতে জলপূর্ণ একটি শিশি বাহির করিয়া বারটি দাগ দেখাইয়া, শিশিটি বামার হাতে দিয়া কহিলেন, "এই যে বারটি দাগ কাটা আছে দেখিতেছ, ইহার এক একটি দাগ বারো দিনে বাবুকে খাওয়াইতে হইবে। জলের সঙ্গে হোক বা দুধের সঙ্গে হোক—ইহা তাঁহার উদরস্থ হওয়া চাই-ই। ইহা যদি পারিস বামা, তাহা হইলে তোর ঋণ কখনই শোধ করিতে পারিব না।"

"অবশ্যই পারিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" বলিয়া বামা, বামুন ঠাকুরের সন্ধানে চলিয়া গেল।

এইখানে উল্লেখ থাকা ভাল, বামুন ঠাকুর বামাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখিয়া থাকেন, তাহার কোন কথাই তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

বামা চলিয়া যাওয়ার পর সুমতি ভাবিতে লাগিলেন, নিজের স্বামীর মন ফিরাইবার জন্য একজন সামান্য দাসী বাঁদীর সহিত এই যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলাম, ইহার চেয়ে অপমানের বিষয় আর কি আছে? ইহার বেদনা সুমতিকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল।

৪

মাদুলি ধারণের কিন্তু আশ্চর্য্য ফল ফলিতে লাগিল। শ্যামলালবাবু দিন দিন তিল তিল করিয়া সুমতির প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যখন তখন সুমতির মুখের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়া, নিজ পত্নীর সৌন্দর্য্যসুধা তৃষার্ত্ত চকোরের মত পান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি পত্নীর প্রতি এতই আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, এখন আর মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারেন না। সম্পূর্ণরূপে স্বামীকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া, সুমতি দেবী ক্রমে সেই মাদুলীর কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। যে মাদুলীর আশ্চর্য্য ক্ষমতায় তাঁহার অপহৃত সুখশান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, যে মাদুলির অপূর্ব্ব মহিমায় বিপথগামী স্বামীর চিত্ত সুপথে—ধর্ম্মপথে—আসিয়াছিল, সেই সর্ব্বসুখপ্রদ মাদুলীর কথা তাঁহার মনেও রহিল না। তথাপি মাদুলীটি তাঁহার বাহুতে ছিল বলিয়া মাদুলী আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেছিল।

এমনি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আট দশমাস গত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বামা ঝি উপর তলায় বাবুর শয়ন কক্ষটি ঝাঁট দিতে দিতে দেখিল, খাটের নীচে ময়লা লাল সূতায় বাঁধা কি একটা দ্রব্য পড়িয়া আছে—হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিল, সোণার পাতে মোড়া একটা তাম্র মাদুলী, ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় সোণার ভিতর দিয়া ভিতরকার তামা নজর হইতেছে।

বলাবাহুল্য, আর উচ্চবাচ্য না করিয়া বামা মাদুলীটি কোমরের ঘুনসীতে বাঁধিল।

৫

পরদিন হইতে দেখা গেল, শ্যামলাল বাবুর সুমতির

প্রতি টান কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। সদাই অন্যমনস্ক, সদাই চিন্তান্বিত চিত্তে একলা বসিয়া বসিয়া কি ভাবেন। স্নান আহারের কথা মনেই থাকে না। অকস্মাৎ স্বামীর এই পরিবর্ত্তনে সুমতি ভীত হইলেন।

কিন্তু একটা সুবিধা এই দেখা গেল যে, তিনি আর গৃহ ছাড়িয়া কোথা যান না, এবং বামা ঝিকেও কোথাও একলা নড়িতে দেন না। হঠাৎ বামার প্রতি শ্যামলাল বাবুর এরূপ প্রবল আসক্তির লক্ষণ দেখিয়া বাড়ীর অন্যান্য ঝি চাকরেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসে। এমন সুন্দরী স্বাধ্বী পত্নীর সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া কুশ্রী, কুদর্শনা, বিগতযৌবনা বামার প্রতি বাবুর এই অদ্ভুত ঝোঁক দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া ভাবিত—সকলি বামার কারসাজি ! বামার পেটে পেটে এত বিদ্যা ইহা তাহারা আগে একদিনও টের পায় নাই।

তাঁহার প্রতি বাবুর এই প্রবল অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া বামা কিন্তু লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। শেষে এমন হইল, বামা কাছে না বসিলে শ্যামলালের আহার হয় না, বামা পায়ের তলায় হাত বুলাইয়া না দিলে তাঁহার সুনিদ্রা হয় না।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া সুমতি আবার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, বিরলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায় ! মাদুলীর কথা তাঁহার আদৌ মনে হইল না !

৬

কিছুদিন এমত অবস্থায় কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে একদিন গ্রামের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নানান্তে শাণ বাঁধানো ঘাটে বসিয়া পূজা আহ্নিক করিতেছিলেন। মন্ত্র শেষ হইলে উঠিবার সময় তাঁহার নজরে পড়িল—জলতলে কি একটা জিনিস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আস্তে আস্তে সেটিকে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, সোণার পাতে মোড়া একটা তাম্রমাদুলী। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বামার ঘুনসী ছিঁড়িয়া মাদুলীটি এইখানে জলগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাদুলিটি সযত্নে ট্যাঁকে গুঁজিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মাদুলিটি দক্ষিণ বাহুর রুদ্রাক্ষের মালার পাশে বাঁধিয়া রাখিলেন।

ইহার পর জমিদার শ্যামলাল বাবুর আর বামার প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি রহিল না। এইবার গৃহবাস তাঁহার যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি গৃহের বাহিরে এখানে ওখানে উন্মাদের মত ফিরিতে লাগিলেন।

সকলেই অবাক হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "তাইতো, এ আবার কি হইল ! এ যে দেখি আজগুবি পরিবর্ত্তন।"

বৈকালে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে একাকী পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত শ্যামলাল বাবুর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। শ্যামলাল বাবু গড় হইয়া প্রণাম করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিলেন, "আপনাকে আমার গুরু হইতে হইবে। আমি আপনার মন্ত্রশিষ্য হইব। বিষয় কর্ম্মে আর আমার কিছুমাত্র আসক্তি নাই। এইবার ধর্ম্মচিন্তা করিব। উপযুক্ত গুরু নহিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সুতরাং আপনাকে আমার কর্ণধার হইতেই হইবে। আমি আপনাকে ছাড়িব না।"

ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া জমিদারের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন এবং বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

অল্পদিন মধ্যেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে দীক্ষা লইয়া। শ্যামলাল অষ্টপ্রহর গুরুজীর কাছে সাধন ভজন পূজা আহ্নিক জপ তপ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। একমুহূর্ত্তও তাঁহাকে ছাড়েন না।

দেখিতে দেখিতে দরিদ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। জমিদার শিষ্য তাঁহার কাণ ধরা হইল, তাঁর গন্ধে আর মাটিতে পা পড়ে না। অকস্মাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বৃহস্পতির দশায় পাড়া-প্রতিবেশীরা ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল—নিশ্চয়ই ভট্‌চাজ ব্যাটা কিছু তুকতাক্ করিয়াছে।

মাস ছয় পরের কথা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া নাতিনী সেই মাদুলিটি দেখিতে পাইয়া কহিল, "দাদু এই সোণার কবচটি আমাকে দাও।"

তামাক টানিতে টানিতে অর্দ্ধ নীমিলিত নয়নে ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "ইহা তুই লইবি? আচ্ছা বেশ! আয় তোর হাতে বাঁধিয়া দিই।"

নিজের হাত হইতে মাদুলিটি খুলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাতিনীর হাতে বাঁধিয়া দিলেন।

এই ঘটনার পরে জমিদার মহাশয় ক্রমেই গুরুজীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। গুরুজীর সিধা দক্ষিণা মোটা পাওনা অত্যন্ত কমিয়া গেল। শাস্ত্রালোচনা, সাধন ভজন, পূজা আহ্নিক ইত্যাদিও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া গেল।

দুই চারিদিন পরেই শ্যামলাল বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিলেন, "দেখুন, এই স্ত্রী হইতে যখন বংশ রক্ষা হইল না, এবং ভবিষ্যতেও যে তাঁহার সন্তানাদি হইবে সে ভরসাও দেখি না, আর যখন শাস্ত্রেই আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজন্", তখন আবার আমাকে বিবাহ করিতে হইল।"

বিস্ফারিত লোচনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত শ্যামলাল বাবুর মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভীর বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, শ্যামলাল যাহা কহিতেছেন তাহা উপহাস না সত্য?

ভট্টাচার্য্যকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া শ্যামলাল কহিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন, আমি আবার বিবাহ করিব এ সঙ্কল্প আমি স্থির করিয়া ফেলিয়াছি।" খামখেয়ালি শিষ্যের মুখের পানে চাহিয়া ভীত হইয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, উন্মাদ হইয়া যায় নাই তো! কহিলেন, "একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছ—পাত্রীটি কে?"

নির্ব্বিকার চিত্তে শ্যামলাল কহিলেন, "আপনার নাতিনী কুমুদিনী। তার রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার দৃঢ় ধারণা কুমুদিনী হইতে আমার বংশরক্ষা হইবে। তাহাকে পরিণীতা পত্নী করিয়া বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাহার নামে লেখাপড়া করিয়া দিব।"

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন শ্যামলাল যেরূপ স্থিরসঙ্কল্প, তাহাকে এমত অবস্থায় বিরুদ্ধ কোন কথা বলা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "বাড়ীতে গিয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা মতামত কল্য জানাইব।"

শ্যামলাল কহিলেন, "ইহার জন্য যদি আমাকে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার তথাপি, কুমুদিনীর পাণিগ্রহণ আমি করিবই করিব।"

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, দাঁও মারিবার এও একটা মহা সুযোগ বটে! এ পাত্র হাতছাড়া করা হইবে না।

তাহার দুইদিন পরে প্রৌঢ় শ্যামলাল বাবুর সহিত কুমুদিনীর শুভপরিণয় হইয়া গেল।

এই বিবাহে কুমুদিনী কি সুখী হইল? সে কথার উত্তর করা কঠিন।

তাহার মনস্তুষ্টির জন্য শ্যামলাল বাবু যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে তাহার গর্ব্ব বাড়িয়া গেল। শ্যামলাল বাবুর অসাময়িক রূপোন্মত্ততা দেখিয়া কুমুদিনীর ভারি আমোদ বোধ হইত। এখন শ্যামলাল বাবু কুমুদিনীর হাতের ক্রীড়নক।

নূতনের মোহে এখন পুরাতন দূরে সরিয়া গেছে— সুমতি দেবীর কথা আর তাঁহার মনেও উদয় হয় না।

৭

একদিন কুমুদিনী কহিল, "দাদামহাশয় এবং দিদিমা দশহরা উপলক্ষ্যে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন—আমি তাঁহাদের সহিত যাইব।"

শ্যামলাল কহিলেন, "তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ— তোমার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাইব'।"

মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে কুমুদিনী কহিল, "সে কি হয়! তুমি গেলে জমিদারী দেখিবে কে?

শ্যামলাল, কহিলেন, "চুলোয় যাক্ জমিদারী—তোমার

চেয়ে কি জমিদারী বেশী? সে হইবে না আমিও যাইব!"

৮

কুমুদিনীর সহিত শ্যামলাল বাবু ত্রিবেণী চলিলেন। দৈবত্রুর্ঘটনায়—গঙ্গাগর্ভে স্নান করিবার সময় কুমুদিনীর হাত হইতে সেই মন্ত্রঃপূত মাদুলিটি জাহ্নবীর সলিল-গর্ভে সূতা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। অনেক খুঁজিলেন—আর পাইলেন না।

ইহার পরেই জমিদারের আশ্চর্য্য মত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কুমুদিনীর প্রতি আর কিছুমাত্র আসক্তি রহিল না। শ্যামলাল বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিলেন, "কুমুদিনীকে লইয়া আপনারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুণ। আমি এই গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। গৃহবাসে আর আমার ইচ্ছা নাই।"

ভট্টাচার্য্য এবং ভট্টাচার্য্য গৃহিণী অনেক বুঝাইলেন। কুমুদিনী স্বামীর হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক কাঁদা-কাটা করিলেন; অকারণ অনেক চোখের জল ফেলিলেন—কিন্তু কিছুতেই শ্যামলাল বাবুর মতের পরিবর্ত্তন হইল না।

শেষে ভট্টাচার্য্য গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা! তুমি যদি নিতান্তই ফিরিয়া না যাইবে, তবে কুমুদিনী তোমার কাছে থাকুক।"

শ্যামলাল কহিলেন, "না না, উহার থাকিবার কিছু-মাত্র প্রয়োজন নাই। ও থাকিলে আমার ধর্ম্মচর্চার ব্যাঘাত হইবে।"

* * * *

একদিন জাহ্নবী গর্ভে অবগাহন করিতে করিতে শ্যামলাল বাবুর কেমন ঝোঁক চাপিয়া গেল, কেবলি ডুব দেন আর উঠেন—তাহার আর বিরাম রহিল না। শেষে একেবারেই জাহ্নবী গর্ভে তলাইয়া গেলেন—আর উঠিলেন না। *

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* কোনও বিদেশী প্রবাদের ভিত্তির উপর এই গল্পটি রচিত।

বৈষ্ণব কবিগণ—জয়দেব

[আলোচনা]

(১)

স্থানান্তরে "বিশ্ব-মানসে বৈষ্ণব কাব্য" প্রবন্ধে বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের সার্ব্বভৌমিক ধারা-প্রবাহের বিষয় আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণব কাব্যের শ্রীরাধিকা বিশ্বসাহিত্যের বরেণ্যা নায়িকা মণ্ডলীর মধ্যেও এক অপূর্ব্ব-সৃষ্টি!

এই শ্রীরাধিকার প্রেমগাথা বাংলা সাহিত্যে সর্ব্ব প্রথম গাহিয়াছেন জয়দেব। তার পর বৈষ্ণব কাব্যের সর্ব্বোচ্চ অভ্যুত্থান-নির্দ্দেশক চণ্ডীদাসের যুগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, এবং তাঁহাদের সমসাময়িক বা প্রায় সম-সাময়িক কবিগণ শ্রীরাধিকার প্রেম কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মধুস্দনের "ব্রজাঙ্গনা" ও রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহ" বৈষ্ণব-কাব্যের ধারা বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আনিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব কম নহে।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস,—মূলতঃ প্রায় এই তিনজনকে লইয়াই আমাদের বৈষ্ণব কাব্য, চণ্ডীদাসের

সমসাময়িক বৈষ্ণব কাব্যে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের পরবর্ত্তী পাঁচালী সাহিত্য তাঁহাদেরই মহিমা-প্রভার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব প্রভায় মহিমান্বিত।

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়,—জয়দেব ভোগের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, আর চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। (১) এই প্রশ্ন অতি বৃহৎ,—এবং এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ কোন কবির প্রতিই সুবিচার-জ্ঞাপক বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কেবল মাত্র জয়দেবের কথাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

২

জয়দেব সর্ব্ব প্রথম বৈষ্ণব কাব্যের ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করেন,—সুন্দর, মধুর, সহজ সংস্কৃতে লিখিত হইলেও তাঁহার বাক্যের ঝঙ্কার সাধারণ বাঙালীকেও জাগাইয়া দেয়। তাই তাঁহাকেও বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের রচয়িতা বলিতে পারা যায়। তাঁহার গীতিধ্বনি বাংলা গীতিকাব্যের চিরন্তন সুর-তান-নির্দ্দেশক।

জয়দেবের "রতিসুখসারে গতমভিসারে" প্রভৃতি পদগুলিকে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব যুগের "বঙ্গীয় ত্রিপদী"র (২) আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে,—তাঁহার "ললিত গীতগোবিন্দের ভাব প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।" (৩) তাঁহার গীতি-কাব্যে সংস্কৃত ভাষা সহজ ভাবেই যেন আসিয়া বাংলা ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

প্রধানতঃ বাহ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনাতেই জয়দেব চিত্তহারী,—সেই শোভা-সম্ভারের মধ্যে মানবকে বসাইয়া তিনি লীলারসের অবতারণায় সুনিপুণ; অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়া মানব হৃদয়ের যে নিগূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটন-স্পৃহা, তাহাকে বোধ হয় তিনি তাঁহার কাব্য কলায় উচ্চস্থান দেন নাই। ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল মলয়-সমীরের মধ্যে জয়দেবের শ্রীরাধিকা প্রতিষ্ঠিতা থাকিলেও,—ইহা হয়ত স্বীকার করিতে হইবে যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির যে অপূর্ব্ব সমাবেশ (৪) তাহা যেন তাঁহাতে পাওয়া যায় না। এক মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা" হইতেই দেখা যায় যে ভবিষ্যৎ কাব্য-কলার এই দিকটি,—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যুগ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর,—কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল।

"ব্রজাঙ্গনার" রাধিকা বলিতেছেন,—

"তরুশাখা উপরে শিখিনি!
কেন লো বসিয়া তুই বিরস-বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে?
তুইও কি দুখিনি?"

আবার বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া পৃথিবীর প্রতি,—

১। আবার পূজনীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকেও দুঃখের কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "জয়দেব সুখ,—বিদ্যাপতি দুঃখ।" বিবিধ প্রবন্ধ, "বিদ্যাপতি ও জয়দেব।"

"সম্ভবতঃ জয়দেবের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কিন্তু জয়দেবের পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশের চলিত ভাষা যে বাংলা ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জয়দেবের সংস্কৃত অনেক স্থলে বাংলার মত হইয়াছে,—'রাধিকা তব বিরহে কেশব' প্রভৃতি চরণ গুলি উভয় ভাষাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।" কাব্যবিশারদ—"বিদ্যাপতি"র ভূমিকা।

২। বাংলা ত্রিপদীছন্দের আভাস জয়দেবের নিম্নোদ্ধৃত পদ প্রভৃতিতে দেখা যাইবে,—

"ইহ রস-ভণনে কৃত-হরি-গুণনে
মধু-রিপু-পদ-সেবকে
কলি-যুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং
কবি-নৃপ-জয়দেবকে।"

এই চরণগুলির প্রত্যেক স্তবকেই বাংলা ত্রিপদীর ন্যায় 'মিল'। ইহা অপেক্ষা অল্প 'মিল'-বিশিষ্ট ত্রিপদীর [illegible] জয়দেবের নিম্নলিখিত পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—

"বিগলিত-লজ্জিত জগদবলোকন
তরুণ-করুণ-কৃত-হাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন কুন্ত মুখাকৃতি
কেতক-দন্তুরিতাশে॥"

৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," ৩য় ও ৪র্থ অঃ।

৪। "কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়।" বঙ্কিমচন্দ্র—"বিবিধ-প্রবন্ধ।"

"কি লজ্জা, হা ধিক তারে,
ছয় ঋতু বরে যারে
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে রমণি !"

[মধুসূদন] (৫)

৩

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানবের অন্তঃপ্রকৃতির আধ্যাত্ম কল্পনের প্রাধান্য বিশেষরূপে দেখাইলেও, জয়দেব কবি যখন কেবল 'মানব-হৃদয়' লইয়া বসিয়াছেন, তখন তাহার স্পন্দন ও আলোড়ন তিনি অসামান্য ক্ষমতার সহিতই দেখাইয়াছেন,—মানবের দীর্ঘশ্বাস, মানবের ক্রন্দনধ্বনি, মানবের আকাঙ্ক্ষা প্রয়াসে তাঁহার ভাষা যেন আজও সজীব হইয়া রহিয়াছে ! কয়েকটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মামহহবিধুরয়তি মধুরমিহ যামিনী।"

* * * *

"অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্"।

* * * *

উন্মদ-মদন-মনোরথ পথিক-বধূজন-জনিত বিলাপে।"

জয়দেব রাজকবি ছিলেন ; তাঁহার সময়ে পাণ্ডিত্য কবিত্বের পরিমাপক ছিল,—জয়দেবের সমসাময়িক অপর প্রধান কবি ছিলেন একজন,—তাঁহার নাম 'ধোয়ী'। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন,—তাঁহার অন্তঃপুরেও পাণ্ডিত্য-প্রভাব কম ছিল না (৬) জয়দেব ও ধোয়ী তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। (৭)

জয়দেব একদিকে যেমন পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় উজ্জ্বল, তেমনি আবার কাব্যের রসে,—লীলা-রস-তরঙ্গে ঢল-ঢল। তাই বর্ণনায়, রঙ্গে-ভঙ্গে, নানা বিচিত্র প্রভায় তাঁহার কাব্যের গগন চিত্রিত ; তাঁহার ভাষা রসের তরঙ্গে কল্লোলিত। তিনি লীলারস তরঙ্গের কবি, তাঁহাকে ভোগের কবি না বলিয়া বোধ হয় বিশেষভাবে লীলা-রসের কবি বলিতে পারা যায়।

৪

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যে অভ্যুত্থান-বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই সাহিত্যই শ্রীচৈতন্য-দেবের ভবিষ্যৎ আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস। (৮) তেমনি

৫। পণ্ডিত ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বলেন—"বস্তুতঃ ব্রজাঙ্গনার অদ্বিতীয় প্রেমকর্ত্তা ভিন্ন বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় ঈদৃশ 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' প্রয়োগে কোন কবিই সমর্থ হয়েন নাই।"—"বিদ্যাপতি"র ভূমিকা।

৬। কথিত আছে মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বকালে লক্ষ্মণ সেন যখন যুবরাজ, তখন কোন সময় লক্ষ্মণ সেন বিদেশে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী (তন্দ্রা দেবী) রাজান্তঃপুরে ছিলেন। তখন বর্ষাকাল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যুবরাজপত্নী মুগ্ধা হইয়া বিরহকাতর-চিত্তে দুই পংক্তি কবিতা লেখেন,—তাঁহার শ্বশুর বল্লালসেন হঠাৎ তাহাই দেখিতে পাইয়া, অবিলম্বে পুত্রকে ফিরাইয়া আনেন। অন্তঃপুর বধূর লিখিত পংক্তি দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে এ দুইটী ছত্রে বাহ্য প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি কেমন সুন্দর ভাবে সাজানো হইয়াছে :—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তোঽথবা ক্লেশশান্তিং করোতু মে॥"

৭। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের অন্যান্য কবিগণের মধ্যেও জয়দেবের উল্লেখ আছে :—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

ধোয়ী কবির উপাধি "কবিরাজ" ছিল এরূপ জানা যায়।

৮। "যেমন যীশু অবতারের পূর্ব্বেই হীব্রু ঋষিগণ আপন হৃদয়ে তাঁহার পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই যেন তাঁহার রসমধুর গৌর মূর্ত্তি ভাবোন্মত্ত চণ্ডীদাসের মনোনেত্রে প্রাগ্‌ভাসিত হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, 'বঙ্গবাণী," ২৬ পৃঃ।

"যেমন ভাবী ঘটনা সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরমসুন্দর চৈতন্য দেবও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে মৈথিক কবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।"—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।" ১ম অঃ।

"মরিয়া হইব শ্রীনন্দ নন্দন তোমারে করিব রাধা," শ্রীরাধিকার উক্তি [চণ্ডীদাস]।

আবার "আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এতো কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিলো॥

* * *

কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥ [চণ্ডীদাস]

[দীনেশচন্দ্র, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," ১ম অঃ]

জয়দেব সম্বন্ধে বলা যায় যে এই কবি-হৃদয়ে বিকশিত রস-মাধুরীতেই যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব-সাহিত্যের,—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত অপূর্ব্ব কাব্য-সাহিত্যের, পূর্ব্বাভাস।

যথাকালে জয়দেব কবি এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনায় আকৃষ্ট না হইলে বাংলায় কোনো দিন বৈষ্ণব কাব্যের অভ্যুত্থান হইত কিনা কে জানে!

তাই বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের "কুঞ্জ-কুটীরে" জয়দেবই "কোকিল-কূজন" লইয়া অবতীর্ণ প্রথম "গায়ক"। বাংলার লতা-বিটপী বিতানের মধ্যে বসন্তের মৃদুল হিল্লোল, জাগরণ ও শিহরণের সংবাদ লইয়া সমাগত প্রথম "বার্ত্তাবহ" জয়দেব। জয়দেব বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের গগনে উদিত "প্রভাত নক্ষত্র"—ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের চসার [Chaucer] যেখানে, বাংলার বৈষ্ণবকাব্যে জয়দেব সেইখানে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

প্রজা মনিব

(গল্প)

স্বরূপ চাষার ছেলে। তাহার পিতার আমলের যা কিছু জমী জমা ছিল, শারীরিক পরিশ্রমে তারই উপস্বত্ব হইতে কোনো রকমে কায়ক্লেশে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল। সংসারও খুবই ছোট, স্ত্রী আর সে। কিন্তু ছোট হইলেও ক্রমে এই সংসারটী অভাবে পড়িয়া অচল হইবার মত হইল। দুই বৎসর উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিয়াছে। চাষা মহলে দুঃখের আর অবধি নাই। গৃহ সামগ্রী যার যাহা ছিল, এই দুর্ভিক্ষে সমস্তই গিয়াছে। স্বরূপের সম্বলের মধ্যে ছিল এক যোড়া বলদ। যখন প্রাণের দায়ে নাম মাত্র মূল্যে তাহার এই অমূল্য সম্পত্তিটী বিক্রয় করিতে হইল, তখন সত্য সত্যই সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তবে শুনা যাইতে লাগিল বৎসরটা কোনও ক্রমে কাটিয়া গেলে, সাম্‌নের বৎসরে নাকি মানুষের খুবই সুখ সুবিধা হইবে। অন্ততঃ পাড়ার বৃদ্ধ আচার্য্য ঠাকুর এইরূপই বলেন। স্বরূপ এই আশ্বাস বাক্যেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু হইলেই বা উপায় কি? চাষার প্রধান সম্পত্তিই হাল ও গরু। গরু নাই, হাল খানাও কবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সকালবেলা স্বরূপ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ অবধি কি চিন্তা করিল। পরে গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িতেই স্ত্রী সৌরভী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চল্‌লে আবার এত বেলায়?"

"এই এক্ষুণি আস্‌চি।" বলিয়াই স্বরূপ চলিয়া গেল।

বাড়ী হইতে কিছুদূরে হেমন্ত বেওয়ার বাড়ী। তার পুঁজির মধ্যে দুইটী নাবালক ছেলে, কিছু জমি জমা, আর এক যোড়া বলদ। স্বরূপ গিয়া এই হেমন্তর সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। কহিল, "বউ! তুমি তোমার বলদ যোড়া দাও, আর আমি গায়ের মেহনৎ আর লাঙ্গলের খাটুনি দিই, বখ্‌রায় কায করি; তোমারও জমিজমা চাষ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও যাবে। একথায় কি বল বউ?"

হেমন্ত এ প্রস্তাবে উত্তর করিল, "তা বেশ ত! কিন্তু নাঙলের কি হবে? আমার নিজের ত নেই, তোমার আছে কি?"

স্বরূপ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে কহিল, "নাঙলের জন্যেই ত মুস্কিল! হালের সকল গুলো সরঞ্জাম জুৎ জাত মতন করতে গেলে নিদেনপক্ষে সেও ৪।৫ টাকার দরকার।"

হেমন্ত কহিল, "আমার নিজের কোনো উপায় থাকলে কথাই ছিল না। কোনো রকমে তোমার মনিবের হাতে পায়ে ধরে যদি অন্ততঃ গোটা

দশেক টাকাও নিতে পার ত, অনেকটা উপায় হয়। শীগ্‌গির করে ঠাকুরপো! এর পরে কিন্তু গাঁয়ের ছুতোরেরা সব বিদেশে বেরিয়ে পড়বে।"

স্বরূপ কহিল, "একথা মন্দ বলনি বউ। যাই ত দেখি একবার মনিবের কাছে।" বলিয়াই সে আর দ্বিরুক্তি মাত্র করিল না, সেই পায়েই মনিব বাড়ী রওনা হইল।

মনিব জাতিতে ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত বলিয়াও পাড়াগাঁয়ে তাঁর একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু আচরণে কসাইয়েরও অধম। স্বরূপকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কিরে স্বোরপো যে! কি মনে করে?"

স্বরূপ যতটা উৎসাহ লইয়া মনিব বাড়ী আসিয়াছিল, মনিবের চেহারা দেখিয়া ও প্রশ্ন শুনিয়া তার সে উৎসাহ অনেকটা জল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটীতে কি ছাই ভস্ম আঁচড় পাড়িল। পরে হেমন্তর শেখানো কথাগুলি কোন রকমে বলিয়া ফেলিয়া, যেন একটা আসন্ন বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

যাজনিক ব্যবসা ও তেজারতী কারবারেই রামগোপালের যত কিছু সাংসারিক উন্নতি। স্বরূপকে দেখিয়াই তার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত ব্যাপারটা শুনিয়া অলক্ষ্যে একটুখানি হাসিয়া মুখে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এমন অসময়ে কি হাতে টাকা থাকে রে স্বরূপ? যা কিছু ছিল, একেবারে ঝুলি ছাড়া করে কোনও মতে জমীদারের নিলামটা রদ করেছি। তোরা ত আমার ভিতরকার খবর কিছুই জানিস্‌নে! বাইরে থেকে মনে করিস্ পণ্ডিত মশায়ের অত টাকা, তত টাকা।"

স্বরূপ ভাবিল, পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটী করিলে মনিবের হৃদয় যতই কঠিন হোকনা, তাহাতে একটুখানি দয়ার সঞ্চার হইবেই। হাজার হোক্, ব্রাহ্মণ ত! এই ভাবিয়া স্বরূপ একেবারে মনিবের পায়ের সাম্‌নে উপুড় হইয়া পড়িল। ঠাকুর মহাশয় সংযত কণ্ঠে কহিলেন, "স্বার্থ্! তোকে টাকা দিতে হলে আমাকে আবার জগা পোদ্দারের কাছে টাকা ধার করতে হবে। তো-বেটাদের জ্বালায় ত আর ঘরে টিকে থাকবারও উপায় নেই! তোর জন্যে আমাকে আবার গিয়ে সেই চামারের হদ্দ শুঁড়ী বেটার কাছে হাত পাততে হবে!"

মনিব মশাইয়ের এই আশ্বাস বাক্যে এবং শেষোক্ত মন্তব্যে স্বরূপ একটু ভরসা পাইল। কহিল "তা কি করবেন দেবতা! বাঁচিয়ে রেখেছেন ত আপনিই। সময় হোক্, অসময় হোক্, দায়ে ঠেকলেই দৌড়ে আসি আপনারই কাছে।"

"তাতো আসিস্! আর আমিই কখনো তোদের নিরাশ করে থাকি, বলতে পারিস?" বলিয়াই গর্ব্বের ভরে স্বরূপের মুখের পানে তাকাইলেন।

স্বরূপ অমনি জিভে কামড় খাইয়া বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! এমন কথাও কখনো হতে পারে যে আপনি উপকার করেন না? এখনো যে আকাশে চন্দর সূর্য্যি উঠছেন, দেবতা! এখনও যে দিন রাত চল্‌ছে!"

"সে কথা ত হল রে স্বরূপ! টাকায় দু আনা সুদ না দিলেও ত জগা বেটা ছাড়বে বলে মনে হয় না। দেখি ত, কি করে উঠতে পারি। কিন্তু সাবধান! কাকেও বলিসনে যেন যে আমি শুঁড়ীর দোরে গেছি টাকা ধার করতে!" বলিয়া স্বরূপকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা স্বরূপের পুনরাগমনের সাড়া পাইয়াই পণ্ডিত মশায় একটুখানি বাড়ীর ভিতর গা-ঢাকা দিলেন। পরে ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া, যেন কিছুই জানেন না, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে! কখন এলি? আমিও এই ধুলো পায়ে সেই শুঁড়ী বেটার বাড়ী থেকে ফিরচি। রাম রাম! এমন অপকর্ম্মটাও করালি আমাকে দিয়ে স্বোরপে!—যাক্, তোর কাযটা ত হল, সেই আমার লাভ!" বলিয়াই আটটী টাকা কোমর হইতে খুলিয়া তাহার হাতের মধ্যে দিয়া বলিলেন, "নে, এখন টাকা ত পেলি?"

স্বরূপ উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ তা পেয়েছি বই কি।"

"আচ্ছা একটুখানি সবুর কর দেখি"—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ একখানা লেখা কাগজ, আর একটা কালির ন্যাতা আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন, "দেখি তোর বাঁ-হাতখানা একবার।"

স্বরূপ কলের পুতুলের মতন হাত বাড়াইয়া দিল। পণ্ডিত মশায় তখন সেই কালির ন্যাতার উপর তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী লইয়া যেন রীতিমত মল্ল যুদ্ধ করিতে লাগিয়া গেলেন। বেচারার আঙ্গুলটীকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া টিপিয়া টিপিয়া অবশেষে কাগজে টিপ মারা সমাধা হইল। "বেটার যে হাত, যেন হাতুড়ি পিটেও নোয়ানো যায় না। সুদ কিন্তু মাসে টাকায় দু আনা মনে রাখিস্!—শীগ্‌গির শীগ্‌গির টাকা দিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করিস্, নইলে মারা যাবি শেষটায় তাও বলে দিচ্ছি।" স্বরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত আবার পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে বিদায় হইল।

পরদিনই সে ছুতার ডাকিয়া হালের সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত করিয়া লইল।

২

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল। যে আশায় বুক বাঁধিয়া স্বরূপ চাষ সুরু করিয়াছিল, সে আশা পণ্ড হইয়া গেল। অসময়ে বন্যার জল আসিয়া অনেকেরই শুধু পাকা ধান ডুবাইয়া ছাড়িল না, পাটেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিল। অনেকেরই ঘরে হাহাকার উঠিল।

এই জন্য এবার পাটের দরও খুব চড়া। পণ্ডিত মশায় এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। এখন প্রত্যহই স্বরূপকে এমনভাবে টাকার তাগাদা করিতে লাগিলেন, যে একদিন সে তাড়ার চোটে অস্থির হইয়া বলিতে বাধ্য হইল, "কি কোরবো দেবতা? আছে মণ দুয়েক পাট ঘরে, তাই বিক্রী করে আপনারও সুদের গণ্ডা কিছু দেবো, নিজেদেরও দু চারটে দিন পেটের খোরাক কোনও মতে চালিয়ে নেবো।" পাটের উল্লেখ শুনিয়াই পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! ঘরে পাট থাক্‌তে আমাকে মিছে ভোগাচ্ছিস্? দেখি দেখি ক'মণ আছে?" বলিতেই ঘরের দাওয়ার একপাশে একটু বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট পাটের গাদিটা যেখানে ছিল, হঠাৎ তাহার উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হইল। ব্রাহ্মণ দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িলেন। গাদিটার কাছে গিয়া নিজে মনে মনে পরিমাণের একটা অনুমান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে স্বোরপো! ঠিক ক'মণ হবে, বল দেখি সত্যি করে?"

স্বরূপ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "আজ্ঞে তা প্রায় ৩।৪ মণ হবে খনি।"

"তবে না বলেছিলি দু'মণ?" স্বরূপ অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।

"এই ত বেটা হাতে দই পাতে দই, তবু বলছিস্ কই কই? এতটা জিনিষ ঘরে থাক্‌তে বেমালুম মহাজনকে ফাঁকি!—ও সব চালাকি আর খাট্‌ছে না! দু'মণ নিজ মুখে বলেছিস্, ঐ দু'মণই সই। আর এতে জল আছে ক'মণ? যাক্ সুদের দশ মাসের ১০৲ টাকা এতেই উশুল হয়ে যাবে এখন।" বলিয়াই নিজের হাতে পাটের গোছাগুলি এক একটী করিয়া উঠানে আনিয়া জমা করিতে লাগিলেন।

স্বরূপ নিতান্ত অসহায়ের মত ছলছল নেত্রে মনিবের পানে তাকাইয়া তাঁহার এই দস্যুবৃত্তি দেখিতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার কথাটী কহিবার সাহস পর্য্যন্ত হইল না। অবশেষে তিনি যখন [illegible] সহকারে লুণ্ঠন সমাধা করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তখন সে একবার পণ্ডিত মশায়ের পা দুইখানা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু বিজয়োল্লাস দৃপ্ত পণ্ডিত মশাই তাহাকে সজোরে এমন ভাবে ধাক্কা মারিয়া চলিয়া গেলেন, যে বেচারী আপনাকে সামাল দিতে না পারিয়া সেইখানেই মাটীতে পড়িয়া গেল। রোষে,ক্ষোভে, ধিক্কারে তাহার বুকের ভিতর একটা প্রবল উষ্ণ রক্ত স্রোত বহিয়া গেল। চোখ দুটী দিয়া যেন জলন্ত অনল কণা ঠিক্‌রিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনিই হস্তদ্বয়ও একটীবার মুষ্টিবদ্ধ হইল। কিন্তু

পরমুহূর্ত্তেই বদ্ধ মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। নিতান্তই অসহায় অপরাধীর মত বিবশ বিকল দেহে সেখানে বসিয়া বসিয়া বেচারা কেবল ভাবী অদৃষ্ট পরীক্ষারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর পণ্ডিত মশায় কাসিতে কাসিতে আবার আসিয়া সশরীরে উপস্থিত। নিতান্ত ভাল মানুষের মতন স্বরূপের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই নে,মাসে এক টাকা হিসেবে দশ মাসে দশ টকা সুদ হয়েছিল, তারি রসিদ। আমি বাপু কস্মিন কালেও ছল চাতুরীর ধার দিয়েও যাইনে! যে টাকা দিয়েছিস্, তার রসিদ পেলি ত? ব্যস্!—"

স্বরূপ একটুখানি মাথা তুলিয়া পণ্ডিত মশায়ের মুখের পানে তাকাইল। তার পর দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি মুখ্যু চাষা, আমার কাগজ পত্তরের দরকার কি? ও আপনি নিয়ে যান। আপনার ঠেঁয়েই রেখে দিন গে।

"তা যদি আমাকে বিশ্বাসই করিস্, আমার কাছেই থাকুক।" বলিয়াই হাসিতে হাসিতে কাগজখানা কোমরে গুঁজিয়া পণ্ডিত মশায় বাড়ী রওনা হইলেন।

৩

পরদিন স্বরূপকে আর এ গ্রামে দেখা গেল না। তার বাড়ীতে দুইখানি মাত্র খড়ের ঘর। দেখা গেল দুইখানি ঘরেই দরজা বাঁধা। কোথায় যে গিয়াছে, কেহই বলিতে পারিল না। অচিরেই এই দুঃসংবাদ বিস্তারত্ন মশায়ের শ্রুতিগোচর হইল। আহ্নিকে বসিয়া ছিলেন, টান মারিয়া কোশাকোশী ফেলিয়া দিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। তারপর এক দৌড়ে মুক্ত কচ্ছাবস্থায়, স্বরূপের সাত পুরুষের জল পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতে করিতে, তার বাড়ীর উপর গিয়া উপস্থিত হইলেন। টাকা শোধ না দিয়া, খাতক পলাতক। "হারামজাদা পাজি নচ্ছার নরকে যাবেন, তারই ব্যবস্থা হচ্ছে!" বলিতে বলিতে তাহার জনশূন্য বাড়ী ঘরের দিকে তাকাইয়া তিনি একরূপ কাঁদিয়াই ফেলিলেন। পরে হেমন্তর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিতে লাগিলেন, "স্বোর্‌পোটার এত বড় সাহস কখনো হ'ত না! তাকে কুযুক্তি দিয়ে নষ্ট করেছে ঐ হারামজাদী নষ্টা মাগী।" বলিতে বলিতে মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই পিছন হইতে হারামজাদী মাগীর গলার কাঁসার আওয়াজ খন খন করিয়া বাজিয়া উঠিল। "কি বল্‌লে ঠাকুর মশাই? মানের ভয় থাকে ত মুখ সামলে করে কথা বোলো!—মুখে দাও তুমি জগা পোদ্দারের দোহাই, কাযের বেলায় নিজেই যে তুমি জগাপোদ্দারেরও অধম সে কথা কি মিথ্যে? গরীব বেচারার পাঁচমণ পাটের দাম কি এই চড়া বাজারে দশটাকা? আমরা পাট বিক্রী করিনি এবার? কম সম ৫ টাকা করে মণ হলেও ২৫টে টাকা হয়। তা থেকে তোমার পাওনা গণ্ডা হিসেব করে নিয়ে বাকীটে তাকে ফিরিয়ে দিলে ত আর বেচারী অমন করে ভিটে ছাড়া হয়ে যেত না!"

ঠাকুর মশাই হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন 'চুপ কর হারামজাদী বেটী!"

"কেন, তোমার ভয়ে? উচিত কথায়—বামুনের বড্ড গায়ে লেগেছে না?" বলিতে বলিতে হেমন্ত যেমনি বেগে হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি বেগেই ঘরমুখো চলিয়া গেল।

পণ্ডিত ম'শায়ও নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে হেমন্তর শিশু পুত্রসহ শ্বশুরকুলের সদ্গতির ব্যবস্থা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৪

পাশের গ্রামেই স্বরূপের শ্বশুর বাড়ী। কিন্তু শ্বশুর জামাতায় সদ্ভাব ছিল না বলিলেই হয়। যতদূর জানা যায়, স্বরূপের পিতা, পুত্রের বিবাহে এক শত টাকা পণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিয়াছিল মাত্র ৭৫৲। অবশিষ্ট ২৫৲ টাকার জন্য বেয়াইয়ে বেয়াইয়ে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল। ঋণকর্ত্তা ত ঋণ দায় হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই জীবন-মুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু কলহ মিটিল না। ইহার জের গিয়া পৌঁছিল জামাতায়।

শ্বশুর রামধন অতি দুর্ম্মুখ লোক। সাক্ষাতে অসাক্ষাতে যখন তখন স্বরূপের পিতার নিন্দা না করিয়া ছাড়িত না। এই উপলক্ষ্যে কন্যা সৌরভীকেও সে খোঁটা দিতে কসুর করিত না। সে হয়ত কখন কখন পিতার উপর বিরক্ত হইয়া বলিয়া বসিত "তাঁর ত ছেলেই রয়েছে টাকাটা আদায় করলেই হয়।" সে কথায় বৃদ্ধ হয় ত এমন একটা উক্তি করিয়া ফেলিত, যাহা কোনো অবস্থাতে ঐ সম্পর্কীয় লোকের সম্বন্ধে বলা চলে না। স্ত্রীলোক স্বামীর নিন্দা কোনো কালেই সহ্য করিতে পারে না। তাই সৌরভী পিত্রালয়ের নামও কখনো মুখে আনিত না। কিন্তু উপায় কি? সেদিন যখন গভীর রাত্রে মনিবের উৎপীড়নের কথা আলোচনা করিতে করিতে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়াই স্বামী স্ত্রীতে গৃহত্যাগের সংকল্প করিয়াছিল, সেদিন কোথায় যে যাইবে এমন কথা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে নিজেদের যা কিছু জিনিষ পত্র ছিল, বাঁধা ছাদা করিয়া উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

পথে বাহির হইয়া স্বরূপ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাওয়া যাবে?" সৌরভী উত্তর দিল, "যে দিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে।"

স্বরূপ কহিল, "সে হত যদি আমি একা হতাম। সঙ্গে যে তুমি রয়েছ। চল তোমার বাপের বাড়ীই যাওয়া যাক্!"

বাপের বাড়ীর কথা শুনিয়াই সৌরভীর সর্ব্বাঙ্গ একবার শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "আবার সেখানে?··· আর সেখানে ছাড়া যাবই বা কোথায়! চল সেখানেই!" বলিয়াই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

গৃহ-জামাতার সুখ বোধ হয় স্বর্গেও নাই!··· স্বরূপ এক বৎসর শ্বশুরালয়ের সুখের আস্বাদ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করিয়া, একদিন রোগশীর্ণদেহে স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পণ্ডিত মহাশয় তখন কোন এক যজমানকে পাতি দিতে বসিয়াছেন। এমন সময় বাহিরের দিক হইতে যেন কাহার কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া দেখেন, তাঁহারই পলাতক খাতক স্বরূপ। কহিলেন, "তাইত বলি, ছোট লোকের ছেলে হ'লে কি হবে? স্বরূপের আমার যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান আছে। তা, ভাল ছিলি ত? নে, একটু তামাক খেয়ে জিরিয়ে নে!" বলিয়াই একবার গলা বাড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। দেখিতে পাইলেন একটী স্ত্রীলোক ঘোমটা দেওয়া, নত মুখে দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটী কে রে স্বরূপ? তোর বউ বুঝি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তা ওকে একটুখানি ছায়ায় দাঁড়াতে বল না। তুইও ত আচ্ছা মানুষ যা হোক!" বলিয়াই তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা দিতে এসেছিস্ ত?"

স্বরূপ চুপ করিয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন সে টাকা দিতেই আসিয়াছে। অমনি আনন্দে গদ গদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "টাকা দিবি ত, বের কর্‌তে দেরী কচ্ছিস কেন রে বাপু? টাকাটা দিয়েই ফ্যাল না আগে, তারপর তামাক খেয়ে জিরিয়ে ধীরে সুস্থে বাড়ী যাস্ এখন।"

স্বরূপের মুখ হইতে একটী মাত্র কথাও বাহির হইল না। হেঁট মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া কেবল মাটীতে আঁচড় কাটিতে লাগিল। তাহার এই অযথা বিলম্ব দেখিয়া, পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ন্যাখ্ আর ন্যাকামো ভাল লাগে নারে স্বোর্‌পো! এনেছিস্‌ই যখন, তখন দিয়ে থুয়ে তোর কাগজ খানা খালাস করে নিয়ে চলে যা না কেন? ল্যাটা চুকে যাক্। দেনাও মানুষে এমন করে কখনো পুষে রাখে! মুখ্যু কিনা, তাই সৎপরামর্শে গ্রাহ্যিই নেই!"

স্বরূপ একটীবার বেড়ার আড়ালে গিয়া স্ত্রীর সহিত কি পরামর্শ করিল। তারপর যখন ফিরিল, তখন তার কাঁধে লাঙ্গল, হাতে একটা পোঁটলা। পণ্ডিত মহাশয় ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এসব আবার কিরে স্বোরপো!"

স্বরূপ কোমর হইতে একছড়া রূপার গোট ও দুই গাছি পৈঁচা বাহির করিয়া মনিবের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দিয়া বলিল, "দেবতা! এই নিয়ে আমাকে খালাস দেন।"

ঠাকুর মহাশয় চোখের চশমাখানা দুই তিন বার কোঁচার খুঁটে মুছিয়া পরিস্কার করিয়া নাকের উপর বসাইলেন। পরে ঘাড়টাকে এদিক্ ওদিক্ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া গহনা কয়খানাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই বুঝি তোর রূপো রে হারামজাদা! আমরা যেন কোনও দিন রূপোও দেখিনি আর সীসে রাঙ্গও দেখিনি! পাজি নচ্ছার জোচ্চোর! সেই কত করে' কেড়ে পাট ক গাছি এনেছিলাম,—তাও জলে ভেজা। যা হোক্, কতকটা সুদ তাতে উঠেছিল। তার পর প্রায় দেড়টা বৎসর হ'তে চল্ল; একটী কাণা কড়িও দেবার নামটী নেই! শেষে আর কি করি? তোর নামে নালিশ করে ৩০৲ টাকার এক ডিক্রী করে রেখেছি। এই টাকা যদি নগদ হাতের ওপর দিতে পারিস্, ত তোর দলিল ফিরিয়ে পাবি। কথা বলিস্নে যে?"

নালিশের কথা শুনিয়াই স্বরূপের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রাগের ভরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "নালিশ করলেই হ'ল ম'শাই? রাজার আদালতে কি ন্যায় অন্যায় নেই? হাকিম আমলারা কি সকলেই আপনার মতন?"

ঠাকুর হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথা বল্লে ত আর দায় কাটছে না! টাকা দিবি কিনা বল্! নইলে মিছেমিছি সোমত্ত মাগ সঙ্গে করে এসে ন্যাকাপানা করলে ত আর মহাজনের দেনা শোধ হয় না।"

স্বরূপ এতক্ষণ সাবধান হইয়াই কথা কহিতেছিল। এবারে এই অশ্রাব্য উক্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "সাবধান ঠাকুর! একে ব্রাহ্মণ, তায় মনিব—নইলে স্বরূপ মণ্ডল ম'রেও এখনো মরে নি।"

স্বরূপের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় দুই পা পিছনে হটিয়া আসিয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি রে মারবি নাকি?"

স্বরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "স্বরূপ, চাষীর ছেলে হলেও, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা জানে। তবে এটাও মনে রাখবেন ঠাকুর মশাই, আজকে আপনি আমাকে বাড়ীর ওপর পেয়ে যাই কেন বলে যান না, আপনার এমন শক্তি এখনও নাই যে ইচ্ছা মত যা খুসী করতে পারেন! এই আমি চল্লাম। বেঁচে থাকতে, আপনার এ ব্যবহার কখনো ভুলব না ঠাকুর মশাই! একদিন বাড়ীর ওপরে থেকে জুলুম করে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছিলেন, আজ আপনার বাড়ীর ওপর থেকেই আমার পুঁজি পাটা নিয়ে চলে যাচ্ছি। পারেন, আমাকে আটক করুন।" বলিয়াই লাঙ্গল খানাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইল। পরে গহনা দুখানাকে কোমরে গুঁজিয়া পোঁটলাটা হাতে তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে কহিল—"দেনা শোধ ত হ'ল, এখন চল্ যাই, যে দিকে দু চোখ যায়!" স্বরূপ যে মূর্ত্তিতে স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া মনিবের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া কোনও কথা কহিতে পণ্ডিত মহাশয়ের সাহসে কুলাইল না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার দেবশর্ম্মা।

জয়-পরাজয়
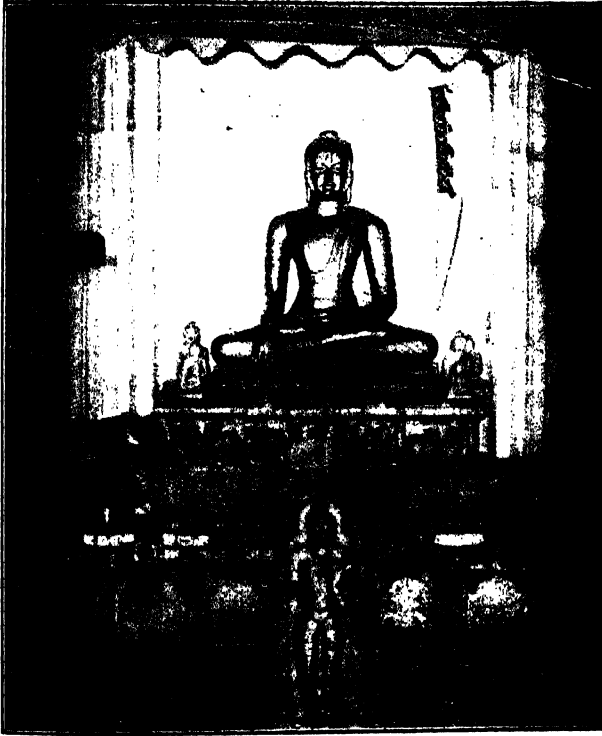
মহাবোধি মন্দিরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি

বোধন শেষ হইয়া মহা-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। গোধূলি লগ্নে সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে বজ্রাসনে শ্যামল তৃণ বিছাইয়া মহাযোগে ব্রতী হইলেন। গৌতম প্রদীপ্ত জ্ঞানরূপ কঠিন বজ্রে অবিদ্যাকে ছেদন করিয়া অমৃত লাভে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কাম-রাজ্যের অধিপতি, চিত্রায়ুধ মার এ দৃশ্যে বিচলিত হইল। তাহার উদ্বেগের সীমা রহিল না। যদি সিদ্ধার্থ জয়লাভ করেন, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করেন, তবে তাহার গৌরব, প্রতিষ্ঠা সবই ত চিরকালের জন্য যাইবে। উপায় কি?

মারকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া তাহার তিন প্রিয় পুত্র, বিলাস, হর্ষ, দর্প এবং তিন প্রিয় কন্যা রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা পিতৃ-সকাশে উপনীত হইয়া তাহার ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মার পুত্র-কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শাক্যবংশের সিদ্ধার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূপ ধনু, সত্ত্বরূপ আয়ুধ এবং বুদ্ধিরূপ বাণ ধারণ করিয়া আমার সমগ্র রাজ্য জয় করিবার অভিলাষে বোধিবৃক্ষতলে আসীন হইয়াছে। যদি সে জয়লাভ করে তবে আর আমার স্থান থাকিবে না।" পিতার এই কথা শুনিয়া পুত্র-কন্যাগণ তাহাকে আশ্বস্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়া সত্বর বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ বহু সৈন্য সহ মারও তথায় উপনীত হইল। ইন্দুবদনা রতি সাংসারিক সুখের প্রলোভনে সিদ্ধার্থকে বিমোহিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। তৃষ্ণা ও প্রীতিও নিশ্চেষ্ট রহিল না। কিন্তু ভয়, প্রলোভন কিছুতেই কিছু হইল না। সিদ্ধার্থ স্থির করিলেন যে, তিন সহস্র মেদিনী মার পূর্ণ হইলেও, প্রত্যেক মারের হস্তের খড়্গ পর্ব্বতবর মেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড হইলেও, তিনি বিচলিত হইবেন না।

সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নানা ভাবে মার সিদ্ধার্থকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইল। কখনও সে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কখনও বা প্রলয়রূপে সম্মুখে দেখা দিল; শিলাবৃষ্টি, অস্ত্রবৃষ্টি, উল্কাবৃষ্টি কোন

প্রলোভন

প্রকারেই সে নিশ্চেষ্ট রহিল না। রহিবেই বা কি প্রকারে? আজ পরাজয় হইলে তাহার ত আর রক্ষা নাই! সিদ্ধার্থ দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিলে সে যে চিরদিনের জন্য রাজ্যচ্যুত হইবে—চিরকালের জন্য জগতের জীব অমৃত আস্বাদন করিবে। সে কি উহা সহ্য করিতে পারে? তাই কখনও সে নিজে বিকট আকারে শতমুণ্ড সহ এবং সেই শতমুণ্ড হইতে লক্‌লক্‌ জিহ্বা ও সহস্র সহস্র অগ্নিময়, প্রজ্বলিত চক্ষুসহ তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। কখনও তাহার কন্যাত্রয় সুবেশা হইয়া হাব-ভাব তান-লয় সহ প্রাণোন্মাদকারী মধুর সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কখনও তাহারা গোপার আকারে তাঁহার হৃদয়ে পত্নী-প্রেম জাগাইতে প্রয়াস পাইল। আবার পরক্ষণেই মায়া দেবীর ন্যায় তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে মাতৃ-ভক্তি জাগরিত করিয়া প্ররোচিত করিতে লাগিল। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মার বজ্রনির্ঘোষে তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিল। পরক্ষণেই আবার সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্র-বর্ত্তিত্ব প্রদানের প্রতিজ্ঞায় সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা পাইল। সবই বিফল হইতে লাগিল। সিদ্ধার্থ বলিলেন,—

"জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে ছিল এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ?
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর।
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংসার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দেবগণ, কে জয়লাভ করেন, কে পরাজিত হয় দেখিবার উৎকণ্ঠায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। মার ক্রমেই পরাভূত হইতে লাগিল। রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্ত্বের দিব্য-চক্ষু উৎপন্ন হইল—তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ
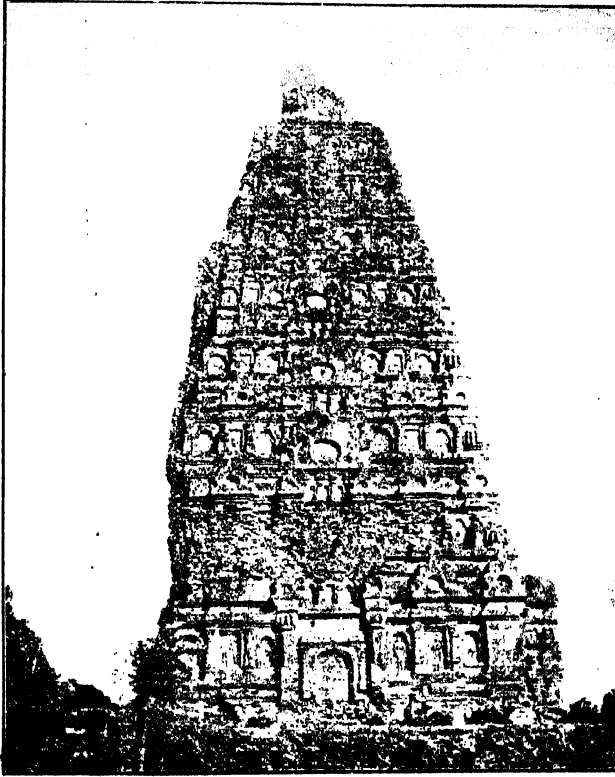
সংস্কারের পূর্ব্বে মন্দির

পাইলেন। মধ্যম যামে তিনি তাঁহার সকল পূর্ব্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিলেন। শেষ যামে তিনি দুঃখের কারণ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্থ সত্য আবিষ্কার করিলেন এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি জগতের দুঃখ সমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। মারের পুত্র, কন্যা, শিষ্যা, শিষ্য, সৈন্য সব পলায়ন করিল। সে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তাহার ত কেহ প্রমাণ রহিল না। ভগবান অঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে স্বয়ং ভগবতী বসুন্ধরাই তাঁহার সাক্ষী—অন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। মার পলায়ন করিল।

সত্যের জয়লাভ হইল—অসত্যের পরাজয় হইল। জগতে শান্তি-বায়ু প্রবাহিত হইল। বুদ্ধ জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন :—

"মৈত্রীবলে জয়লাভ করিয়া আমি অমৃতরস পান করিতেছি, করুণাবলে জয়লাভ করিয়া আমি অমৃতরস পান করিতেছি, মুদিতাবলে জয়লাভ করিয়া আমি অমৃত রস পান করিতেছি। প্রদীপ্ত জ্ঞানরূপ বজ্রে আমি অবিদ্যাকে ছেদন করিয়াছি।"

যাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সার-বিশিষ্ট এবং যিনি লোক-

বর্ত্তমান মন্দির

সমাজের কেতু সদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধিশালী, মনোহর, শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার সুগতকে প্রণাম করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পারিপার্শ্বিক প্রভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী বহুদিন হইতেই বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সৎ সাহিত্য প্রচারের একটি প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ প্রভৃতি সাহিত্য মহারথীদিগের মৌলিক গবেষণা প্রসূত

রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার প্রচারে সহায়তা করিয়া জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যেরূপ অপূর্ব্ব গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্ব্বে আর কোনও সাময়িক পত্রের ভাগ্যে সেরূপ গৌরবলাভ ঘটে নাই। মহর্ষি স্বয়ং বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও অকপট সেবক ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ এই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং কি তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায়, কি কাব্য চর্চ্চায়, কি নাটক প্রণয়নে, কি সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনায়—সকল দিকেই তাঁহাদের প্রতিভা আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ সাহিত্যিক আবেষ্টনের মধ্যে লালিত হইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথও যে অল্প বয়সেই মাতৃভাষানুরাগী এবং সাহিত্য সেবায় উন্মুখ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

এই স্থানে তাঁহার বাল্যবন্ধু এবং সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান সহযোগী ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষিদেবের বাটীর পূজার দালানে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,—"এই পাঠশালায় বাহিরের চারি পাঁচজন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের অ্যাটর্ণি, 'ভারতী'র সাহিত্য-সমালোচক, সুলেখক, সুকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন।"

রবীন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম্, এ। সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। বায়রণ এবং শেক্‌স্‌পীয়রের রসে তিনি আগাগোড়া রসিয়া উঠিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবাবু, নিধুবাবু, শ্রীধর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যৌবনে)

কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাতে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ড কাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি

যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। 'উদাসিনী' নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

আচার্য্য লালবিহারী দে

"সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ। অক্ষয় বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল "কিঞ্চিৎ জলযোগ।" ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ —'কিঞ্চিৎ জলযোগ!' নামক প্রহসন প্রকাশিত হয়। উহাতে কিন্তু নবীন গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। তখন

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল

কেশব চন্দ্র সেন 'অগ্রসর' ব্রাহ্মদিগকে লইয়া নূতন সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন,—'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং পূর্ণমাত্রায় স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রহসনে নব্যপন্থীদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত আছে। গ্রন্থের আখ্যানভাগ এই :—

ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র নব্যদলের ব্রাহ্ম তাঁহার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। বিধুমুখী একাকী 'মিরজাপুরে স্যানের গির্জ্জেয়' যান, প্রচারক প্রেমনাথ বাবুর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করেন, পূর্ণচন্দ্র প্রত্যক্ষে বিধুমুখীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিলেও মনে তাঁহার বিলক্ষণ ঈর্ষা জন্মে। পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং নিষ্কলঙ্কচরিত্র সাধু নহেন। তিনি মদ্য পান করেন। বিবাহের পূর্ব্বে কামিনী নাম্নী এক রমণীর প্রতি তিনি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন এবং বিবাহের পরেও রোগী-চিকিৎসার ব্যপদেশে তিনি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে যান।

একদিন পেরুরাম নামক জনৈক বেকার লোক পাওনা-দারের ভয়ে পলাইয়া অবশেষে মিরজাপুরে 'স্যানের গির্জ্জে'র সম্মুখে একখানি পাল্কী দেখিয়া তাহার ভিতর আশ্রয় গ্রহ

রে। পাল্কীখানি বিধুমুখীর। বেহারারা কর্ত্রীঠাকুরাণী তে উঠিয়াছেন ভাবিয়া পেরুরামকে পূর্ণচন্দ্রের বাটীতে ইয়া আসে। পেরুরাম গৃহে প্রবেশ করিয়া কিংকর্ত্তব্য র করিতে না করিতে, একদিক দিয়া পূর্ণচন্দ্র ও অপর দিক ও বিধুমুখী বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পেরুরাম আর কটি ঘরে আশ্রয় লইল। বিধুমুখী স্বামীর নিকট উড়ে রাদের নামে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, "তোমার উড়ে রাদের তুমি তো ছাড়াবে না। আজকের মন্দিরের স হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠ্‌তে যাই দেখি পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। কার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের চারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবু আমাকে এই রকম স্থায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্লেন যে, এস, আমি তোমাকে তে পৌঁছে দেব। আ! আমি তখন বাঁচলেম, তখন মনে হল যেন প্রভু যীশুখৃষ্ট স্বয়ং এসে আমাকে বিপদ-সাগর হতে উদ্ধার কল্লেন; তারপর 'স্বর্গরাজ্য কট' বলে আমার নিকট হতে বিদায় লইলেন, আমিও ভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম করে বাটীর মধ্যে লেম।"

"অন্ধকার রাত্রি", "হস্ত ধারণ করে" ইত্যাদি শুনিয়া চন্দ্রের ঈর্ষা উদ্রিক্ত হইল, কিন্তু সেই রাত্রে কামিনীর সাক্ষাত করিবার কথা ছিল বলিয়া পূর্ণচন্দ্র অন্য ছাড়িয়া রোগী চিকিৎসার জন্য বাহিরে যাইবার উদ্যোগ লেন। বিধুমুখী তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন বলিলেন 'আমাকে বিয়ে না করে যদি তাকে বিয়ে তাহলে তোমার পক্ষেও ভাল হত।' পূর্ণচন্দ্র যে তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন তাহা র করিলেন এবং বলিলেন "সন্দেহটা কি ভয়ানক। * * আমার মনে কোন কু-সন্দেহ প্রায়ই হয় না। সে দিন নাচ দেখতে গিয়েছি—আমি কাছে আছি, তা দেখতে পায় নি—একজন লোক একজন লোকের কাছে বল্‌চে যে, প্রেমবাবু সমস্ত রাতটা বিধুমুখীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে * * * কে যে রকম প্রেমনাথ বাবুর বর্ণনা করে—দেখতে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণী

সুশ্রী—বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা শুনলে হঠাৎ ভয় হতে পারে বটে,—কিন্তু ঐ কথা যখন আমার কাণে এল, তখন তো আমার কিছুই মনে হল না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বিধুমুখী কক্ষান্তরে হঠাৎ পেরুরামকে দেখিয়া প্রথমে চোর মনে করিয়া ভীত ও চমৎকৃত হইলেন কিন্তু পরে কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে, সে একটা নির্ব্বোধ লোক, ভুল করিয়া তাহাকে তাঁহার পাল্কি-বেহারারা লইয়া আসিয়াছে। বিধুমুখীর মাথায় একটা ফন্দী আসিল। তাঁহার স্বামী যে কথায় কথায় বলেন তাঁহার কোন কু-সন্দেহ হয় না—তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। তিনি বেকার পেরুরামকে বাটীর সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন পেরুরাম নামটা বিশ্রী, উহার পরিবর্ত্তে তোমার নাম প্রেমনাথ রাখিলাম। প্রেমনাথকে

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

নিকটে বসাইয়া পুরাতন ভৃত্য ভোলাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন প্রেমনাথ বাবুর জন্য জলখাবার লইয়া আয়। ইহার পর স্বয়ং জলখাবারের তত্ত্বাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে পূর্ণচন্দ্র (যিনি গোপনে প্রেমনাথ বাবুর সহিত স্ত্রীকে আলাপ করিতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিলেন) আসিয়া পেরুরামের সহিত মহা কলহ বাধাইয়া দিলেন। ভৃত্য কর্ত্তৃক আনীত জলখাবার ফেরত দিয়া পেরুরামকে তরবারি লইয়া আক্রমণ করিলেন। বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন "আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে? * * কালই আমি বাপের বাড়ি যাব—আর সেখানে যদি বাপ-মায়ে না স্থায়, তা হলে আমাদের ভারতাশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস করব।" পেরুরাম মনে করিয়াছিল পূর্ণচন্দ্র বিধুমুখীর পুরাতন সরকার এবং তাহাকে ছাড়াইয়া পেরুকে নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রতি পূর্ণচন্দ্রের এই আক্রোশ। হঠাৎ পূর্ণবাবুর নাম শুনিয়া সে চমৎকৃত হইল, কারণ সে পূর্ণবাবুর এক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে সুপারিস-পত্র লইয়া তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। বিধুমুখী স্বামীর ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিবার জন্য তাহাকে প্রেমবাবু বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, ইহা পরে প্রকাশ পাইল। বিধুমুখী যথার্থই পতিপরায়ণা। পূর্ণচন্দ্র গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার কখনও সন্দেহ হয় না, সেই গর্ব্ব কৌশলে চূর্ণ করিলেন। পূর্ণচন্দ্রও ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য গোপনে পেরুরামকে বাগানে লইয়া গিয়া, সে যেন তরবারি লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে এইরূপ অভিনয় করিতে বলিলেন। পতিপ্রাণা বিধুমুখী তাঁহার স্বামীকে নিহত করিতেছে মনে করিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। পরে পূর্ণচন্দ্র ও পেরু উভয়ে আসিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলে বিধুমুখী সন্তুষ্ট চিত্তে পুরাতন ভৃত্য ভোলাকে পেরুর জন্য জলখাবার আনিতে বলিলেন। কিন্তু জলখাবার আসিবার পূর্ব্বে আর একটি ঘটনা ঘটিল। পেরুরাম কামিনীর প্রণয়াভিলাষী, কামিনীর বাটীতে সে একটি পত্র পায়, তাহাতে লিখিত ছিল—"প্রেয়সী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে—প।" এই

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

পত্রখানি ঘটনাচক্রে বিধুমুখীর হাতে পড়িয়া গেল, স্বাক্ষর চিনিতে বিধুমুখীর কষ্ট হইল না, "প—সংক্ষেপ বটে ; কিন্তু অর্থ-পূর্ণ।" তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন,ভৃত্য জলখাবার আনিলে তাহা ফেরত দিলেন এবং 'ভারতাশ্রমে' চলিয়া যাইবেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্কি আনিতে আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে পেরু সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। সে বুদ্ধি খাটাইয়া তখন বলিল, "আপনি পূর্ণবাবুর সমক্ষে মিথ্যা অভিনয় করিয়া তাঁহাকে যেরূপ পরীক্ষা করিতেছিলেন, পূর্ণবাবুও সেইরূপ স্বামীর প্রতি আপনার বিশ্বাস পরীক্ষার করিবার জন্য আমার হস্তে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই পত্রখানি দিয়া কৌশলে আপনাকে দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই কথায় বিধুমুখীর সন্দেহ দূরীভূত হইল, পূর্ণবাবু পেরুরামের বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তৃতীয় বার পুরাতন ভৃত্যের প্রতি জলখাবার আনিবার আদেশ হইল। সকলেই আনন্দ সহকারে জলযোগে যোগদান করিলেন।"

এই প্রহসনের মধ্যে স্থানে স্থানে তাৎকালিক নব্যপন্থী ব্রাহ্মদিগের কোনও কোন আচরণের প্রতি রহস্য-পূর্ণ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। মদ্যপানে এবং তৎপরে বিধুমুখীর 'পরমগুরু, পরম পুজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন' সেন্ মহাশয়কে ন্যান্‌জা বলিয়া সম্বোধন কয়ায় পূর্ণচন্দ্র 'পাপের উপর পাপ' করিয়াছিলেন। পাপক্ষালনের জন্য বিধুমুখী বলিলেন "আমার কাছে ঘাট মান্‌লে কি হবে? * * একবার অনুতাপ কর, তা হলেই পাপ ক্ষয় হবে।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, সে সময়ে এইরূপ যখন তখন সময়ে অসময়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোনও পাপ কার্য্যের জন্য অনুতাপ করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি বলেন, যখন নব্য-পন্থী যুবকদল স্থির করেন যে ২৫ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ করিব না এবং ১৬ বৎসর বয়সের চেয়ে কম বয়সের পাত্রীকে বিবাহ করিব না তখন তাঁহার এক ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ বন্ধু এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর প্রেমে পড়েন। সকলে তাঁহাকে সেই কিশোরীর পাণি-গ্রহণে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইলে তিনি বলেন "ভাই, এখন ত বিবাহ করি, পরে অনুতাপ করিয়া পাপক্ষালন করিব।" এইরূপ হাস্যকর পরিণতি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার প্রহসনের স্থানে স্থানে অনাবশ্যক স্থলে প্রার্থনা ও অনুতাপের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। একস্থানে যত্র তত্র গীত একটী প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত—

"হৃদয়ে থাক হে নাথ নয়ন ভরিয়া দেখি।
জুড়াব তাপিত প্রাণ তোমারে হৃদয়ে রাখি॥"

ভাঙ্গিয়া তিনি টপ্পায় পরিণত করিয়াছেন :—

"প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি।
অকৃতি সন্তান বলে আমারে দিওনা ফাঁকি।"

বলা বাহুল্য, নব্য ব্রাহ্মগণের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে এই প্রহসন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানিকে 'মিরর' অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থখানির প্রশংসাপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, অনেকে মনে করেন ক্ষুদ্র নাটক হইলেই প্রহসন হয় ; কিঞ্চিৎ জলযোগ ক্ষুদ্র নাটক নহে—যথার্থ প্রহসন এবং এইরূপ প্রহসন বাঙ্গলায় অতি অল্পই আছে। কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' বলিয়াছিলেন, "Its tendency is far from immoral." নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশান্যাল থিয়েটারে প্রহসনখানি গুণগ্রাহী দর্শকগণের সমক্ষে মহা-সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন না। যদিও তিনি উহার কুফলের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন,তথাপি তিনি ব্যক্তিগত ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে তিনি শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা কাদম্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহ-সজ্জার প্রতি কাদম্বরী দেবীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি সকল দ্রব্য অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

উদ্যানরচনায় তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং শিকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও বীরাঙ্গনা করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহণে অভ্যস্তা করাইয়া ছিলেন। সেকালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন দুইটী আরব ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন, তখন লোকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না বা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেন না।

জমিদারী কার্য্য পরিচালনা। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহাকে জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, একবার মহর্ষি জমিদারী পরিদর্শনার্থ একস্থানে গমন করিলে প্রজারা তাঁহার নৌকার অগ্রভাগ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেয়। ইহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিরূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরু বিক্রম-নাটক। নবগোপাল মিত্র প্রবর্ত্তিত 'হিন্দুমেলা'র অনুষ্ঠানের পর হইতে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের মনে জনসাধারণের মধ্যে দেশ-হিতৈষণা উদ্বোধিত করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে বীর রসাত্মক নাটক দ্বারা ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী কীর্ত্তন করিলে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত হইতে পারে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ গুণেন্দ্রনাথের সহিত কটকে জমিদারী পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁহার প্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন। গুণেন্দ্রনাথের উৎসাহে গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, কিন্তু এবারেও গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেন।

'পুরুবিক্রম' বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থখানির পরিচয় দিব।

"নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দর সা (Alexander,) পুরু (Porus) তক্ষশীল, (Taxilus) এফোষ্টিয়ান (Hephostion) ইঁহারাই প্রধান ; মহিলাগণের মধ্যে প্রধান ঐলবিলা—কল্লুপর্ব্বতের রাণী, এবং অম্বালিকা—তক্ষশীলের ভগিনী।

"মহাবীর সেকেন্দর সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারত-বিজয়ে অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাণী ঐলবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থে কৃতসংকল্প। তিনি অবিবাহিতা, রূপ-গুণবতী। প্রচার করিয়াছেন যে, যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। মনে মনে পুরুরাজের শৌর্য্যে বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরুরাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। পুরুরাজ এদিকে যথার্থ ই বীরপুরুষ ও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দরকে প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক। এদিকে অম্বালিকাও সেই অসদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অম্বালিকাকে সেকেন্দর পূর্ব্বে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ; অম্বালিকা এক্ষণে সেকেন্দরের প্রতি অনুরক্তা। ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিল, যে, উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে। কিন্তু ঐলবিলা তক্ষশীলকে ঘৃণা করেন এবং পুরুরাজে একান্ত অনুরাগিণী, সুতরাং ঐলবিলা ও পুরুরাজ মধ্যে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ভ্রাতা ও ভগিনী ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া আসিলেন।

পুরুরাজে ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। একজন যবন সেনা অন্যায় আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে আহত করিল। পুরুরাজ বন্দী ও শায়িত। ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা কতক সিদ্ধ হইল। পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মোচন করিলেন, অম্বালিকাকে গ্রহণ করিলেন না; অম্বালিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহ ভঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের মিলন করিয়া দিলেন।

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। * * লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস-প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্য বিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। * * * যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।"

আচার্য্য লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন' দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে বলিয়া ছিলেন "The story is well told; the descriptions are lively; some of the characters are well drawn, and the language is simple and idiomatic."

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রেও গ্রন্থের সুখ্যাতিপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরুবিক্রমের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বীররসাত্মক উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন উঃ। বীর রসের খতিয়ান। তাহাই বটে! আমাদের মনে পড়ে কৈশোরে আমরা কতবার অপূর্ব্ব আগ্রহের সহিত এই নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম এবং সৈন্যগণের প্রতি পুরুরাজের সেই ওজস্বিনী বাণী তৎকালে আমাদের তরুণ হৃদয়ে কিরূপ উদ্দীপনার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়া দিত :—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার,
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত ভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন?
"বীর যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে একথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম॥

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দীনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

পিতৃ পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্র পাতি, দে'খ যেন যশোভাতি,
না হয় মলিন,—থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে, শতধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব আঁধারে।

স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।
এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ়পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়-যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই—বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের তখন এমনই দুর্দ্দশা। এই সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশ হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। যদিও তখন স্বত্ব-সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে আমরা কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি প্রদান করিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে পুরুবিক্রমের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, এবং রঙ্গালয়ের দর্শকগণ এই সুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। ইহার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও পুরুবিক্রম অভিনীত হয়। সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের) দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ পুরু সাজিতেন এবং একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট আরব জাতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন।

পুরুবিক্রম নাটক পরে গুজ্‌রাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সিলভ্যান লেভি মহোদয় গুজরাটী সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সমালোচন কালে অবগত ছিলেন না যে গ্রন্থখানি মৌলিক নহে—উহা বঙ্গ সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদ মাত্র।

'সরোজিনী।' কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ 'সরোজিনী নাটক' প্রকাশিত করেন। 'সরোজিনী'ও 'পুরুবিক্রমে'র ন্যায় বীররসাত্মক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক। উৎসর্গ পত্রে গ্রন্থখানি "উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে" সাদরে অর্পিত হয়। নাটকের আখ্যান ভাগ সংক্ষেপে এই:—

যে সময়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করেন সেই সময়ে মহম্মদ আলি নামক এক মুসলমান ভৈরবাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে এবং মেওয়ারের রাণাকে দেবীর প্রত্যাদেশ শুনান:—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।—
রূপসী ললনা কোন আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম সম; যদি দিস্ পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোরপুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজ-ছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বশে আর।

অর্থাৎ দেবীর প্রীত্যর্থে রাণার বারোটি পুত্রকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে ও প্রাণাধিক প্রিয়া কুমারী কন্যা সরোজিনীকে দেবীর সমক্ষে বলি দিতে হইবে। রণক্ষেত্রে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের চির আকাঙ্ক্ষিত, সুতরাং রাণা পুত্রগণের জন্য চিন্তিত হইলেন না, কন্যাটিকে কিরূপে বলি দিবেন? কিন্তু রাণা লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ রণবীর সিংহ এবং অন্যান্য অনেকেই দেবীর প্রত্যাদেশের কথা অবগত হইয়া নিরপরাধিনী সরোজিনীকে বলি দিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য

রাণাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একদিকে বাৎসল্য ও মমতা, আর একদিকে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য, রাণার হৃদয়ে দ্বিবিধ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিল। হৃদয়ের এই ঘাত প্রতিঘাত গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। অবশেষে স্বদেশের জন্য রাণা কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন কন্যাকে বলি দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে তখন সরোজিনীর ভাবী স্বামী বাদলাধিপতি বিজয় সিং তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এই মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় সিংহের এবং মেওয়ার-সেনাপতির মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া উভয় পক্ষকে দুর্ব্বল এবং গৃহবিবাদে উন্মত্ত করিয়া চিতোর আক্রমণ করাই মুসলমানগণের উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আলাউদ্দীন চিতোরে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজপুত বীরগণ রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং সাধ্বী রাজপুতরমণীগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। এই নাটকের শেষ ভাগে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" শীর্ষক যে ওজস্বিনী কবিতা আছে তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মুখস্থ আছে। যখন প্রবল পরাক্রান্ত আততায়ীর দ্বারা আচরিত কোনও অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব মনে হয়, তখন এই কবিতার কিয়দংশ আমাদের স্মৃতিপথে ভাসিয়া আসে এবং আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া অনন্যোপায় হইয়া শত্রুকে ভগবানের ন্যায়দণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া বলি,—

"যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"

এই কবিতাটী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে ঐস্থানে একটি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু পুস্তক মুদ্রণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঐ স্থলে একটি কবিতা দিলেই ভাল হয়, এবং রবীন্দ্রনাথই প্রাগুল্লিখিত কবিতাটি অত্যল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দেন।

'পুরুবিক্রমে'র ন্যায় 'সরোজিনী'রও অনেকস্থলে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপনী উক্তি আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিজয়-সিংহের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্যদ্বারা কোন মহৎ কার্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তারপর যা হ'বার তা হ'বে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কর্ত্তে গেলে, আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'র্ত্তে বলচেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্‌বে,—চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

গ্রন্থের শেষভাগে প্রদত্ত দেশভক্ত রামদাসের মর্ম্ম-স্পর্শিনী আক্ষেপোক্তিটিও উদ্ধার যোগ্য :—

গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব্ব চরাচর;
চিতাধূম ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর-নগর।

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধতমসায়;
জয়লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য্য-নাম,
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দীশালা হায়!

স্বাধীনতা-রত্ন হারা, অসহায়া, অভাগা জননি।
ধন-মান-যত, পর-হস্ত-গত,
খর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষ-বদ্ধ নিস্তেজ কৃপাণ;
শর তূণাশ্রিত রণ-বাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান।

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ ?

আর কি চিতোর, তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,
শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,
স্পরধিবে বীর-দর্পে জগৎ সংসার ?

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ;
হয়ে পদানত, দাসব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন।

জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন প্রাণ ;
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার,
চিতানলে চিন্তানল করি অবসান !

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত গগন ;
একি রে আবার, একি দশা তার,
স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন !

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা পড়ে যাক্ জীবনে আমার ॥

'সরোজিনী'ও মহাসমারোহে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে উপর্য্যুপরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল। অমৃতলাল বিজয় সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় চাতুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি 'রূপ ও রঙ্গে' প্রকাশিত "আমার অভিনেত্রী জীবন" শীর্ষক অতীব কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী বিনোদিনী সাধারণ নাট্যশালায় 'সরোজিনী'র অভিনয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধার যোগ্য :—

"সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জম্‌ত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হয়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে রাজা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণজিৎসিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণবেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্‌লেন, 'সব মিথো, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর,' অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! জন দুই দর্শক এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হল ; তাঁদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হল।"

আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—

"সরোজিনী নাটকের একটা দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধু ধু করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হত। লাল রঙের সাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই

জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।

জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
দেখ রে যবন দেখ রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে—তবুও কারু ভ্রুক্ষেপ নেই, তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

গ্রন্থকার নাম গোপন রাখিলেও তাঁহার নাম অপ্রকাশিত রহিল না। বাঙ্গালার নাট্য সাহিত্যে সুরুচি-পূর্ণ, দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলীর সৃষ্টি করিয়া জ্যোতি-রিন্দ্রনাথই এক নূতন আদর্শের অবতারণা করিলেন। তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এমন কি পল্লীগ্রামে যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। 'সরোজিনী'র গান সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল। কলিকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ৺অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় 'সরোজিনী'র শেষ দৃশ্যের একখানি চিত্র পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা আর্টস্কুল হইতে প্রকাশিত হিন্দুর পৌরাণিক দেব দেবীর চিত্রের সহিত বিক্রীত এবং গৃহে গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

'পুরু বিক্রম' ও 'সরোজিনী' উপর্য্যুপরি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন। উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধ।

২৩শে নভেম্বর মধ্য রাত্রে সমগ্র ডিভিজনটি স্বাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আহতদের আ-মারায় পাঠাইবার জন্য ষ্টীমারগুলিতে উঠাইতে আরম্ভ করা হয়।

২৬শে নভেম্বরের কার্য্যেও বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্সের লোকেরা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক ষ্টীমারে আহত ও রোগীদের স্থানান্তর কার্য্য তাহাদের তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। প্রতিদিন আমাদের দলস্থ প্রাইভেটরাও অন্য অ্যাম্বুলান্সের ডুলি বেহারাদের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। কাপ্তান পুরি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাইভেট সৌরীন্দ্র মিত্র ও ললিতমোহনকেও চাহিয়া লইয়াছিলেন তাহাদের নাম ডেসপ্যাচে উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি নিক্সন ও মেডিকাল বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হ্যাথাওয়ে উভয়েই আমাদের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন ও চম্পটীকে আহ্বান করিয়া আমাদের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

টেসিফোন হইতে চলিয়া আসিবার সময় সেকেণ্ড লাইন, আহতদের স্থান সঙ্কুলনের জন্য বহু সংখ্যক ট্রান্সপোর্ট কার্ট হইতে জিনিষ পত্রাদি ফেলিয়া দিয়াছিল এবং আমাদের প্রিয় কিট্ ব্যাগগুলি ও রন্ধনের তৈজস আদিও সেই সঙ্গে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্বাজে পৌঁছিয়া আমরা একটি কেরোসিন তৈলের টিন সংগ্রহ

করিয়া লই ও তাহাতেই চাল ও ডাল একত্র সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। আর একটি কেরোসিন টিন কাটিয়া ও তাহার টিনগুলি একত্র পিটাইয়া আমরা রুটি সেঁকিবার তাওয়া প্রস্তুত করিয়া লই। চায়ের জন্য একটি বৃহৎ জ্যামের টিনও সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম।

২৬শে নভেম্বর বৈকাল হইতেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া মধ্য রাত্রে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা কম্বল গুটাইয়া হাঁসপাতালের তাঁবু গুলিতে প্রবেশ করিলাম। হাবিলদার রামলাল উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল এই জন্যই সিপাহীর এত ইনাম,—"ধুপমে জ্বলনা পানি মে ভিঙনা" ইত্যাদি। তাহার এই দার্শনিক মন্তব্য সে সময় বেশ চিত্তগ্রাহী বোধ হইতেছিল।

২৭শে নভেম্বরও সমস্ত সকালটি আহতদের ষ্টীমারে উত্তোলন করা হইল। আমরা আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় প্রায় বেলা তিনটায় হঠাৎ 'ফল্ ইন' করিবার আদেশ পাইলাম। একখানি এয়ারোপ্লেন আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল যে তুর্কিরা টেসিফোন ত্যাগ না করিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের লইয়া ষ্টীমার গুলি অবিলম্বে লঙ্গর তুলিয়া যাত্রা করিল এবং তাহাদের রক্ষার জন্য অধিকাংশ মানোয়ারি জাহাজও তাহাদের সহিত চলিয়া গেল। আমরা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। জেনারেল টাউনসেণ্ডের আদেশে যে তাঁবুগুলি খাটান হইয়াছিল সেগুলিকে সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া আমরা বেলা পাঁচটার সময় রিট্রিট আরম্ভ করিলাম।

ক্যাম্প পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই এক অভিনব দৃশ্য দেখিলাম। আমরা সরিয়া যাইতেছি এ সংবাদ ধূর্ত্ত বেদুইনেরা জানিতে পরিয়াছিল; নদীর অপর পার দেখিতে দেখিতে বহু সংখ্যক বেদুইনে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা উচ্চস্বরে চিৎকার করিতেছিল এবং কেহ কেহ দীর্ঘ তরবারি লইয়া মাথার উপর ঘুরাইতেছিল। কাহারও কাহারও হাতে রাইফেল ছিল কিন্তু নিজেদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া বোধ হয় তাহারা সেগুলি ব্যবহার করে নাই। বৃটিশ বন্দুকের পাল্লা ও তোপখানার ক্ষমতা তাহারা বেশ জানিত। ইহারা সকলেই আমাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের জন্য সমবেত হইয়াছিল এবং আমরা স্থানটি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একখানি ষ্টীম লঞ্চ হইতে 'মেসিন গান' চলিবার পর পলায়ন করিল।

সহসা রিট্রিট আরম্ভ করিবার জন্য আমাদের বহু দ্রব্যাদি ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল। গুড়ের বস্তা, ময়দার থলি, পনির (cheese) পরিপূর্ণ টিনের পেটিকা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তুর্কি ফৌজ সেগুলি হস্তগত করিবার পূর্ব্বে বেদুইনেরা তাহার অধিকাংশ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিলে আমরা দেখিলাম যে আমাদের পরিত্যক্ত তাঁবুগুলির উপর তুর্কি শেল ফাটিতেছে। তাঁবু দেখিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল বোধ হয় তখনও আমরা সেই স্থানেই আছি। টেসিফোনের যুদ্ধের পর ৬ষ্ঠ সংখ্যক পুণা বাহিনীর (6th Poona Division) বিখ্যাত প্রত্যাবর্ত্তন এইরূপে আরম্ভ হয়।

আমরা স্বাজ্ পরিত্যাগ করিয়া অনবরত চলিতে লাগিলাম। সে রাত্রে মেঘের জন্য আকাশে একটিও তারকা দেখা গেল না। ঘোরতর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইয়া উঠিল। আমরা কখনও কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া কখনও বা অসমান নদীর তীর ধরিয়া চলিতে-ছিলাম। শর্ট বা হাফ্‌প্যাণ্ট পরিধানের জন্য আমাদের অনাবৃত হাঁটু কাঁটা জঙ্গলে ছড়িয়া গেল ও রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সে গভীর অন্ধকারে আমরা সম্মুখের কোনও বস্তু দেখিতে পাইতেছিলাম না। প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা প্রথম হল্ট্ করিবার আদেশ পাইলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাত তিনটার সময় আমাদের পুরাতন ছাউনি এল্-কুটুনিয়া অতিক্রম করিলাম। তখন মেঘ সরিয়া গিয়াছে এবং চারিদিক তারকার মৃদু আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় একপক্ষ কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়া

সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। ভোর পাঁচটার সময় এক মার্চে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আজিজিয়া পৌছিলাম।

আজিজিয়ার সে পুরাতন সমৃদ্ধ ভাব আর নাই। সামান্য পরিমাণ ভূভাগ কাঁটার তারের বেড়ায় ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার ভিতর একটী ক্ষুদ্র সিপাহীর দল রক্ষীর কার্য্য করিতেছিল।

আজিজিয়ায় আসিয়া আর একটি আহত সিপাহীর দলকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দেওয়া হইল। বসরা, মেজিদিয়া প্রভৃতি বৃহদাকার ষ্টীমারগুলিকে হাঁসপাতাল জাহাজে পরিণত করা হইয়াছিল এবং সেগুলির উভয় ডেকে আহত ও রুগ্ন সিপাহীদের ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা হইয়াছিল। এ কয়েক দিনের অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য আমাদের দলস্থ কয়েকজনও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারাও একটি ছোট ফ্ল্যাটে স্থান লইল। ইহাদের নাম যতীন্দ্র মুখার্জ্জি, মনীন্দ্র দেব, শচীন্দ্র বোস ও শৈলেন্দ্র বোস। এই ফ্ল্যাটটিকে সয়তান নামক 'গান্ বোটের' সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

বৈকালে হাঁসপাতাল জাহাজগুলি আজিজিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ২৯শে নভেম্বর সংবাদ পাওয়া গেল যে, তুর্কিরা পুনরায় অগ্রসর হইতেছে। তখনই ক্যাম্প ভঙ্গ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং আমরা বেলা দশটার সময় কুচ্ আরম্ভ করিলাম। বেলা ১টার সময় মাত্র ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উম্মাল্-তাবুল নামক স্থানে হল্ট্ করিলাম। রোমান ক্যাথলিক পাদরী ফাদার মালান্ আসিয়া বলিলেন যে, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তুর্কিরা থামিয়াছে, তাহারা অধিকতর অগ্রসর হইবে না এবং আমরা এই স্থানেই ট্রেঞ্চ খনন করিয়া বসরা হইতে যে সৈন্যেরা আমাদের সহায়তার জন্য আসিতেছে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। এই সময় বেতার টেলিগ্রাফে সংবাদ আসে যে, সেনাপতি নিক্‌সন্ বসরা অভিমুখে যাত্রা কালীন একদল তুর্কি অশ্বারোহী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য মেলিস্ ৩০ সংখ্যক ব্রিগেড লইয়া কুট্-এল-আমারা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

এস্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম লাভ করিতে পারিব এই আশায় আমরা আহ্লাদিত হইয়া উঠিলাম। নদীর জলে নামিয়া অবগাহন স্নান করিয়া লইলাম। জল দিবা ভাগেও বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। মেসোপটেমিয়ায় নভেম্বর মাসে আমাদের দেশের পৌষ মাস অপেক্ষাও বেশী শীত। আমরা যে স্থানে 'বিভোয়াক্' করিয়াছিলাম, তাহার নিকটেই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত 'ফায়ার ফ্লাই' নামক মনিটার খানি নঙ্গর করিয়াছিল এবং আমাদের অতি নিকটেই একটী তোপের ব্যাটারি আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। একখানি কামানের গাড়ীকে খাড়া ভাবে দাঁড় করাইয়া তাহার উপর হইতে দূরবীণ হস্তে একজন গোলন্দাজ পাহারা দিতেছিল।

সূর্য্যাস্তের কিছু পরে আমরা কেরোসিন তৈলের টিনে সিদ্ধ চাউল ও ডাইলের সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজের সহিত তুরকি শেল আসিয়া ক্যাম্পে পড়িতে লাগিল। যে বিশাল ভূভাগ ব্যাপিয়া আমাদের ক্যাম্প ফায়ার জ্বলিতেছিল তাহা দুই সেকেণ্ডের মধ্যে নিভাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কবে এবং কোথায় আহার জুটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই বুঝিয়া আমরা শুইয়া শুইয়া আহার সমাধা করিয়া লইলাম। প্রায় মিনিট দশেক তোপ্ দাগিয়া তুর্কিরা থামিয়া গেল। আমাদের তরফ হইতে মাত্র ফায়ার ফ্লাই দুইটি শেল্ নিক্ষেপ করিয়াছিল। হেড্ কোয়ার্টার্সের আদেশ মত আমাদের তোপখানা গুলি নীরব রহিল।

জেনারেল টাউনসেণ্ড যখন বুঝিলেন যে, একটি বৃহৎ তুর্কিদল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন তিনি ৩০শ ব্রিগেড্‌কে ফিরাইয়া আনিতে মনস্থ করিলেন এবং ৭নং হারিয়ানা ল্যান্সার্সের দুইজন যুবককে

সেই রাত্রেই মেলিসের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা দুই জনেই কর্ম্মচারী পদস্থ ছিলেন ; একজন ভারতীয় ও একজন ইংরাজ। মেলিস্ শেষ রাত্রে সংবাদ পাইয়া তখনই তাঁহার রেজিমেণ্ট গুলিকে ফিরিতে আদেশ দেন এবং বেলা ৯টার সময় টাউনসেণ্ডের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

৩০শে নভেম্বর সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই উষার মৃদু আলোকে ৬ সংখ্যক পুনা ডিভিজনের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, একটি বিশাল তুর্কি ক্যাম্প মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে। শত্রু-পক্ষের নিকটে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করা সামরিক রীতি ও নীতির বহির্ভূত। বোধ হয় তুরকিরা মনে করিয়াছিল যে আমাদের প্রধান দলটি চলিয়া গিয়াছে ও তথায় মাত্র একটি ছোট পশ্চাৎ-রক্ষীদল অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক, এই ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইবা মাত্র আমাদের তোপখানাগুলি গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং যদৃচ্ছা (পয়েণ্ট্ ব্ল্যাঙ্ক্ রেঞ্জে) তুর্কি ক্যাম্পের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। দূরত্ব অনুসারে গোলা বিদারণ করিবার জন্য প্রতি শেলের মুখের নিকট সেকেণ্ড অঙ্কিত একটি ফিউজ্ বা অগ্নি সংযোগের নল থাকে। যখন অতি নিকটে লক্ষ্য বস্তু থাকে তখন ফিউজ শূন্যের (zero) ঘরে রাখিয়া তোপ দাগা হয়, যাহাতে গোলাটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফাটিয়া স্র্যাপনেল গুলি কার্য্য করিতে পারে। আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে আমাদের গোলা বর্ষণে তুর্কিরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের তাম্বুগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং মানুষ, ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতি বিশৃঙ্খল ভাবে মিশ্রিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সমর-নীতির প্রতি অমনোযোগিতার জন্য তুর্কিদের সেদিন অসম্ভাবিত ভাবে লোকক্ষয় হইয়াছিল এবং পরে তুর্কি সেনাপতি খলিল পাশা বলিয়াছিলেন যে টাউনসেণ্ড যদি রিট্রিট্ না করিয়া পাল্টা আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র তুর্কি-বাহিনী বন্দী হইত। যাহা হউক, ইহার পর তুর্কিরা এরূপ অবিমৃষ্যকারিতা আর করে নাই এবং আমাদের ডিভিজনের লোকেরাও তাহাদের লুপ্ত শৌর্য্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পরেই তুর্কিরা গ্যালপ্ করিয়া তাহাদের একটী তোপখানা আমাদের সম্মুখবর্ত্তী নদীর বাঁকে লইয়া গেল এবং গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের নদীগামী ষ্টীমারগুলিকে ধ্বংস করা তাহা বেশ বুঝা গেল। আমরা নদীর অতি নিকটেই ছিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে নদীর জলে শিলা-বৃষ্টির ন্যায় শেল আসিয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট জলস্তম্ভের সৃষ্টি হইতেছে, বোধ হইতেছিল যেন নদীতে একটি জলময় বৃক্ষের জঙ্গল হইয়াছে।

ট্রান্সপোর্ট গুলিকে নিরাপদে অপসারিত করিবার জন্য টাউনসেণ্ড এই সময় তাঁহার দুইটি ব্রিগেড্ লইয়া তুর্কিদের পাল্টা আক্রমণ করিলেন ও তুর্কিরা হঠিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে ষ্টীমার গুলি নঙ্গর তুলিয়া কুট অভিমুখে যাত্রা করিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের মানোয়ারি জাহাজ বহরের অদৃষ্ট সেদিন সুপ্রসন্ন ছিলনা। মালবাহী ও হাঁসপাতাল জাহাজগুলি নিরাপদে চলিয়া গেল, কিন্তু নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে হইতেছিল বলিয়া অধিকাংশ রণতরী শত্রুর গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল। আমরা যখন নদীর তীর বাহিয়া আত্মগোপন করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম তখন দেখিলাম একটি তুর্কি শেল আসিয়া নিকটবর্ত্তী ফায়ার ফ্লাইকে আঘাত করিল এবং তাহার বয়লার বিদীর্ণ হইয়া শ্বেতবর্ণ ষ্টীম্ ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ফায়ার ফ্লাইকে রক্ষা করিতে গিয়া সয়তানও গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া যায়। পরে নৌ বহরের অধ্যক্ষ কাপ্তান নান (Nunn) গোলাবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়াও সুমানা নামক জাহাজে পূর্ব্বোক্ত দুইটি রণতরীর নাবিকদিগকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ইনি সাহসিকতার জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রশ্ পদক পাইয়াছিলেন।

সয়তান যুদ্ধজাহাজ ভগ্ন হওয়াতে বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোরের এক অভাবনীয় দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল। আমাদের

দলের অসুস্থ যে ছয় জনকে একটি ফ্ল্যাটে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা সয়তান টানিতেছিল। ফায়ার ফ্লাইয়ের দুরবস্থা দেখিয়া ফ্ল্যাটের দড়ি কাটিয়া দিয়া সয়তান তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং ফ্ল্যাট খানি ভাসিতে ভাসিতে একটি চড়ায় আট্‌কাইয়া যায়। ইহার পর সুমানা তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করে এবং অপারগ হইয়া প্রস্থান করে। তখন নদীর বামতীরে তুর্কিরা আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ফ্ল্যাটখানির উপর শেল্ ও মেসিন্ গান্ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটি গুলি যতীন্দ্র মুখার্জ্জির ললাটে বিদ্ধ হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া যায় এবং যতীন্দ্র তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনীন্দ্রনাথ দেবের উরুতে ও বাহুতে সর্ব্ব সমেত পাঁচটি মেসিন গানের গুলি লাগে ও সে অচেতন হইয়া পড়ে। অন্য চারিজন, অমূল্য ব্যানার্জ্জি, শৈলেন বোস, সুশীল লাহা ও শচীন্দ্র বোসও অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অমূল্য ব্যানার্জ্জি, শৈলেন বোস ও সুশীল লাহা পরে বন্দী অবস্থায় বাগ্‌দাদে প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের রক্তপাতের জন্য নিম্ন মেসোপটিমিয়ার উম্মাল্ তাবুলের যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গালীর পক্ষে তীর্থ স্থান হইয়াছে। অস্থি কোন্ স্থানে সমাহিত আছে আমরা পরে বন্দী অবস্থায় বহু অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই।

ট্রান্সপোর্ট গুলি নিরাপদে চলিয়া যাইলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৬, তাহার পর ১৭ এবং সর্ব্বশেষে ১৮ ব্রিগেড, রিয়ার গার্ডের কার্য্য করিবার আদেশ পায়। আক্রমণকারী শত্রুকে বাধা দিতে দিতে ক্রমে পশ্চাৎপদ হওয়ার নামই রিয়ার গার্ড অ্যাক্‌সন এবং ইহাই সমর কৌশলের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য। ইহার জন্য পদাতিকদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য দুইটি তোপ্ বিভাগ থাকে। যখন একশ্রেণী পদাতিক ও একটি তোপ বিভাগে শত্রুর দিকে মুখ ফিরাইয়া গুলি ও গোলা চালাইতে থাকে অন্য পদাতিক শ্রেণী ও তোপবিভাগটি গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রায় ৫০০ গজ চলিবার পর মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় এবং গুলি চালাইতে আরম্ভ করে এবং প্রথম শ্রেণী তাহার তোপ লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে চাহিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ৫০০ গজ অন্তরে থাকিয়া পুনরায় মুখ ফিরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই যোদ্ধাদের আবরণে বাহিনীর অন্যান্য দল কলম্ অফ্ রুটে চলিয়া যায়। এই সময় অশ্বারোহী ব্রিগেড আমাদের বাম ভাগ রক্ষা করিতেছিল এবং দক্ষিণে নদীগামী রণতরীর বহর ছিল।

সর্ব্বপ্রথমে ১৬ ব্রিগেডের রিয়ার গার্ডের কার্য করিবার পালা হওয়ায় আমরাও ষ্ট্রেচার হাতে নিজেদের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। উম্মাল তাবুলের আক্রমণের সময় কাপ্তেন হেনেসি ও মেজর ল্যাম্বার্ট দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; আমরা সম্পূর্ণ ভাবে হাবিলদার চম্পটীর অধীনে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। এক সময় আমাদের দলটি শেষ পদাতিক শ্রেণী ও শত্রুদলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে কার্য্য করিতেছিল, কিন্তু কাপ্তেন হেয়ার তাহাদিগকে সে স্থান হইতে অবিলম্বে চলিয়া আসিতে বলেন।

বেলা ৯টার সময় জেনারেল্ মেলিস আমাদের সহিত মিলিত হন এবং তখনই তুর্কি ফৌজের বামভাগ আক্রমণ করেন। দ্বিপ্রহরের পর হইতেই তুর্কিদের আক্রমণ মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং তাহারা দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকিল। ১২টার পর ১৭ ব্রিগেড আসিয়া ১৬ ব্রিগেডকে ছুটি দিল এবং আমরা কলম অফ্ রুট্ বা চারিজন করিয়া সারি বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর আমাদের বন্ধু লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী সান্যাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি রসদ বিভাগের প্রবীণ কর্ম্মচারী। ইনিও আমাদের দলস্থ পূর্ব্বোক্ত ছয় জনের সহিত সেই ফ্ল্যাটটিতে ছিলেন এবং তাহা আটকাইয়া যাইবার পরই লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার বহু সৌভাগ্যের বিষয় যে ইনি তাঁহার বিশাল দেহ লইয়াও তুর্কি গুলি অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সময় তাঁহার হাঁটিবার ক্ষমতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আমরা তাঁহাকে একখানি ট্রান্সপোর্ট গাড়ীতে উঠাইয়া দিলাম।

আমরা ধীর গতিতে চলিতে লাগিলাম এবং কখনও নদীর ধারে যাইয়া জলপান করিতে লাগিলাম। বৈকাল ৫টার সময় গুলি ও গোলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল। কেবল নদীর অপর পার হইতে বেডুইনেরা মধ্যে মধ্যে আমাদের উপর গুলি চালাইতেছিল। একটি বেডুইন পল্লীর নিকট দিয়া আমাদের হাঁসপাতাল জাহাজগুলি যাইবার সময় গ্রামস্থ বেডুইনেরা তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের পশ্চাতে যে একটি যুদ্ধ জাহাজ আসিতেছিল তাহারা তাহা জানিত না। যুদ্ধ জাহাজটি উপস্থিত হইলে ইহারা গ্রামের ভিতর পলাইয়া যায় কিন্তু এই দস্যুজনোচিত ব্যবহারের শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধ জাহাজ গতি মন্দ করিয়া গ্রামটির উপর তোপ্ দাগিতে আরম্ভ করে এবং মিনিট কয়েক লিডাইটের বিস্ফোরণের পর গ্রামটি ভূমিসাৎ হইলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে।

ভোর ছয়টা হইতে মার্চ্চ আরম্ভ করিয়া রাত্রি দুইটার সময় আমরা হল্ট্ করিলাম! অন্ধকারে ও শৃঙ্খলতার অভাবে আমরা একরূপ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে স্থানটিতে আমরা হল্ট করিয়াছিলাম তাহা আমাদের নিকট মংকি ভিলেজ নামে পরিচিত ছিল, ইহার আরবী নাম এখন মনে পড়িতেছে না। ক্যাম্পে পৌছিয়াই কার্ণেল হেনেসির দেখা পাইলাম। তিনি কয়েকজনকে তখনই ষ্ট্রেচার লইয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। আমরা কায শেষ করিয়া দলস্থ অন্যান্য সকলের অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মেজিদিয়া জাহাজের বেতার বার্ত্তা প্রেরকের সহিত দেখা হইল। লোকটি একজন শিক্ষিত ইংরাজ যুবক। আমাদের অবস্থা দেখিয়া তখনই এক কেট্‌লি গরম কোকো আনিয়া উপস্থিত করিল; তাহা পান করিয়া আমরা অনেকটা সুস্থবোধ করিতে লাগিলাম। আমরা কয়েক খানি কম্বল সংগ্রহ করিয়া শুইয়া পড়িলাম এবং ক্লান্তির জন্য অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যুষে ডিভিজন পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা সকলে ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম এবং বেলা দশটার কুট্-এল্-আমারায় পৌছিলাম। তিন মাস পূর্ব্বে আমরা এই স্থানেই ৬ষ্ঠ ডিভিজনের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম ও ছয় সপ্তাহের জন্য আজিজিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

কুট এল আমারায় পৌছিবার পরই মাত্র এক স্কোয়াড্রণ (প্রায় ১৫০) অশ্বারোহী রাখিয়া বাকি অশ্বারোহী ব্রিগেড সেনাপতি রবার্টসের অধীনে কুট পরিত্যাগ করিয়া সেখ সায়াদ অভিমুখে প্রস্থান করে এবং দুই দিনের মধ্যেই সমুদায় ষ্টীমারগুলি আহত বোঝাই হইয়া আমারায় চলিয়া যায়। ইহাদের সহিত আমাদের দলস্থ কয়জনও আমারায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাদের নাম রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি, ললিত ব্যানার্জ্জি, জিতেন্দ্র মিত্র, ভূপেন মুখার্জ্জি, অনাদি চাটার্জ্জি ও সৌরীন্দ্র মিত্র। এইরূপে আমাদের ৩৬ জনের মধ্যে কুট-এল আমারায় আমরা মাত্র ১৮ জন অবশিষ্ট থাকিলাম। আজিজিয়া হইতে ছয় জন অক্টোবর মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে, উম্মাল তাবুলের যুদ্ধে একজন হত ও পাঁচজন বন্দী হয় এবং সর্ব্বশেষে কুট্ হইতে পূর্ব্বোক্ত ছয় জন দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

কুটে পৌছিয়া আমরা সহরের পশ্চিমে একটি খেজুর বাগানে আসিয়া ২নং ফীল্ড্ আম্বুলান্সের সহিত মিলিত হই এবং একটি বড় ডাগ্ আউট্ খনন করিয়া তাহার চারিপাশে শুষ্ক খড়ের গাইঠ সারি করিয়া রাখিয়া সেটিকে বাসের উপযোগী করিয়া লই।

৩রা ডিসেম্বর বৈকালে দূরে তোপধ্বনির সহিত কয়েকটি শেল্ আসিয়া কুটের নিকটে পতিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি যে তুর্কিরা আমাদের স্থানচ্যুত করিবার জন্য কুটে উপস্থিত হইয়াছে। কুট-এল-আমারায় অবরোধ আরম্ভ হইল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

ইতিহাস

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

বুদ্ধগয়া—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা একটী সরল সুলিখিত প্রবন্ধ। ইহাতে লেখক বলিয়াছেন যে, বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠতীর্থ, হিন্দুদেরও অন্যতম তীর্থ।" "বুদ্ধগয়া যে হিন্দুর তীর্থ একথা হিন্দুরা অনেকেই জানেন না।" ইহার কারণ তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান এখন সময়াভাবে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া একদিনে বা তিনদিনে গয়াকৃত্য করিতে শিখিয়াছে।' হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান যে কারণেই হউক অনেকটা যে সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর সম্বন্ধে উক্তিটি পুরাপারি মানিয়া লইতে পারা যায় না। কেননা, রঘুনন্দন-কৃত 'শ্রাদ্ধতত্ত্বে' গয়াকৃত্য সম্বন্ধে কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না। গয়াকৃত্য সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ তিনি তাঁহার "তীর্থপ্রয়োগতত্ত্ব' নামক নিবন্ধে করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়, তীর্থকামী ব্যক্তি গয়ায় উপস্থিত হইয়া পঞ্চ দিনব্যাপী কৃত্য সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। এই সকল কৃত্যের মধ্যে ফল্গু, প্রেতশিলা, রামতীর্থ নামক প্রভাসহ্রদ, উত্তরমানস, দক্ষিণমানসাদি পঞ্চ-তীর্থ, গদাধর-পাদপদ্ম ও অক্ষয়বট প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার মাত্র এক স্থলে "ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং মহাবোধিঞ্চ যথাক্রমং স্বর্গকামো নমেৎ" এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এছাড়া উক্ত নিবন্ধে হিন্দুদের পক্ষে বুদ্ধগয়ার পিণ্ডদানের বিধি তো দূরের কথা, মহাবোধি বা মহাবোধ নাম পর্য্যন্তও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং রঘুনন্দনের সময়েও যে বুদ্ধগয়া বাঙ্গালী হিন্দুদের অন্যতম তীর্থরূপে পরিণত হয় নাই, ইহা ঠিক; কেননা, হইলে তিনি তাঁহার নিবন্ধে উল্লেখ না করিয়া পারিতেন না।

লেখক বুদ্ধজীবনের কয়েকটী ঘটনা চিত্র ও তাহাদের পরিচয় দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গান্ধারের চারিটী ক্ষোদিত ফলক সাহায্যে অনশনক্লিষ্ট গৌতম, অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বোধিসত্ত্বের আগমন, মার-সেনার আক্রমণ ও গৌতমের সম্যক্ সম্বোধি বুঝাইয়াছেন। অপর ছয়টী চিত্রে বুদ্ধের জীবনের সমস্ত ঘটনা সম্বলিত শিববাটীর বুদ্ধমূর্ত্তি, বুদ্ধজীবনের প্রধান ঘটনা-সম্বলিত নালন্দার শিলাফলক, শিববাটীর বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ বিহার নগরের বুদ্ধমূর্ত্তি, বন্ধুগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত সারনাথে আবিষ্কৃত বজ্রাসন বুদ্ধভট্টারক, গয়া জিলার অন্তর্গত কুরকিহারে প্রাপ্ত বজ্রাসন বুদ্ধ ভট্টারক ও বুদ্ধ-জীবনের ৮টী প্রধান ঘটনা-সম্বলিত নালন্দায় বুদ্ধমূর্ত্তি ব্যাখ্যা সহ যথাসম্ভব বর্ণনা করিয়াছেন। এই উপাদেয় প্রবন্ধের স্থানে স্থানে সুপণ্ডিত লেখকের পাণ্ডিত্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কোথাও কোথাও তিনি কিছু অসাবধানও হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের নিকট এরূপ অসাবধানতা আমরা আশা করি না বলিয়া কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি। লেখক অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের উল্লেখ করিয়া মারের তিন পুত্রের নাম দিয়াছেন—বিলাস, দর্প ও হর্ষ। কন্যার নাম দিয়াছেন রতি, আরতি ও তৃষ্ণা। কিন্তু বুদ্ধচরিতে (১৩শ অধ্যায়, ৩য় শ্লোকে) আছে—বিভ্রম, হর্ষ ও দর্প মারের তিন পুত্রের নাম। আর তিন কন্যার নাম রতি, প্রীতি ও তৃষা ("তস্যাত্মজা বিভ্রমহর্ষদর্পাস্তিস্রো রতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ।"); মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 'পণ্ডিতগণ তাহাকেই কাম-রাজ্যের অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন' (পৃঃ ২২)। বুদ্ধ-চরিতের মূলে আছে—"কামপ্রচারাধিপতিং তমেব মোক্ষ-দ্বিষং মারমুদাহরন্তি।" কামপ্রচারাধিপতি - কাম রাজ্যের অধিপতি নয়, কামপ্রবৃত্তির বিকাশ যাহা হইতে হয় তাহার অধিপতি। ললিতবিস্তর হইতে লেখক মারপুত্রগণের নাম দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"গৌতমের প্রতি প্রসন্ন মারপুত্রগণের নাম সার্থ-বাহু, মধুরনির্ঘোষ ও সুবুদ্ধি। গৌতমের প্রতি বিমুখ মারপুত্রগণের নাম দুর্ম্মতি, শতবাহু, উগ্রতেজা। মারের সৈন্যগণের মধ্যেও দুই চারি জন গৌতমের পক্ষপাতী ছিল, তাহাদের নাম প্রসাদপ্রতিলব্ধ। গৌতমের প্রতি বিমুখ সৈন্যদের নাম ভয়ঙ্কর, অবতারদ্বেষী, অনুপশান্ত, বৃত্তিলোল, বাতজব, ব্রহ্মমতি, সর্ব্বচণ্ডাল ইত্যাদি।"

ললিতবিস্তরের একবিংশ অধ্যায়ে মারপুত্রগণের নাম আছে। তাহাতে গৌতমের প্রতি প্রসন্ন পুত্রগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী নাম আছে—সার্থবাহ, মধুর-নির্ঘোষ, সুবুদ্ধি, সুনেত্র- প্রসাদ-প্রতিলব্ধ, একাগ্রমতি, পুণ্যালঙ্কৃত, ধর্ম্মকাম, সিদ্ধার্থ, ধর্ম্মরতি, অচলমতি, সিংহমতি, সিংহনাদী, সুচিন্তিতার্থ, মারপ্রমর্দক। গৌতমের প্রতি বিমুখ পুত্রগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী নাম —দীর্ঘবাহু, ভয়ঙ্কর, অবতারপ্রেক্ষী, অনিবর্ত্তী, অনুপশান্ত, রতিলোল, বাতজব, ব্রহ্মমতি, সর্ব্বচণ্ডাল ও দুশ্চিন্তিত-চিন্ত্য। সেনাপতির নাম—ভদ্রসেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক লিখিয়াছেন—"নৈরঞ্জনা শব্দ মাগধি প্রাকৃতে 'নীলাজন' আকার ধারণ করিয়াছে।" কিন্তু 'নৈরঞ্জনা'র মাগধীরূপ 'নেরঞ্জরা' ('বিপরক্কম্ম ঝায়ন্তং নদিং নেরঞ্জরং পতি"—পধানসুত্ত)। 'নীলাজন' 'নৈরঞ্জনা'র অপভ্রংশ, কিন্তু মাগধী প্রাকৃত নয়। তিনি লিখিয়াছেন—"এই নৈরঞ্জনা নদীতীরে—উরুবিল্ব গ্রামের—"। উরুবিল্ব শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতে নাই—"উরুবিল্বা" হইবে; আর ইহারই পালি 'উরুবেলা'। তিনি লিখিয়াছেন, গৌতম সিদ্ধার্থ রুদ্রক নামক এক আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রুদ্রক' নামটী ভুল। এই আচার্য্যের নাম "উদ্রক" বা 'উদ্রক রামপুত্র' (পালি-উদ্দক রামপুত্ত)। বুদ্ধচরিতের ১৩শ অধ্যায়ে ৮৩ শ্লোকে আছে—"সংজ্ঞাসংজ্ঞিত্বয়োর্দোষং জ্ঞাত্বা হি মুনিরুদ্রকঃ।" মুনিঃ + উদ্রকঃ = সন্ধিতে মুনিরুদ্রকঃ। Sir Monier Williams (Buddhism —পৃঃ ২৯) প্রভৃতি দুই একজন ঐতিহাসিক নামটী রুদ্রক লেখায় উদ্রকের অদৃষ্টে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। বুদ্ধ-চরিতের উক্ত অধ্যায়ের ৮৬ শ্লোকে স্পষ্টই আছে—"প্রেপ্সুস্তস্মাদুদ্রকমত্যাজৎ"। মজ্ঝিমনিকায়, ললিতবিস্তর, মহাব্যুৎপত্তি প্রভৃতিতে উদ্রক (উদ্দক) নামই আছে। লেখক প্রবন্ধের প্রায় সকল স্থলেই 'গৌতম সিদ্ধার্থ' এই নামটী ব্যবহার করিয়াছেন। এটী সুষ্ঠু প্রয়োগ বলিয়া মনে হয় না। গৌতম এই গোত্র নামের সহিত সিদ্ধার্থ নামের প্রয়োগ কোথাও কি তিনি পাইয়াছেন? 'সিদ্ধার্থকুমার' 'সিদ্ধার্থ' দুই চার জায়গায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই নামও বড় একটা ব্যবহৃত হয় না।

লেখক প্রবন্ধের শেষাংশে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার-রূপে পূজার কথায় লিখিয়াছেন, "বুদ্ধের মৃত্যুর হাজার বৎসর পরে হিন্দুরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।" একথার প্রমাণ তিনি উদ্ধার করেন নাই। কোথা হইতে একথা তিনি পাইলেন তাহা জানিবার অবসর তিনি আমাদিগকে দেন নাই; কাজেই আমরা তাঁহার কথা যাচাই করিতে পারিলাম না। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আমাদের পুরাণ-কারেরা সেই সময় হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, গয়ার নিকটে ব্রাহ্মণকুলে বিষ্ণু নবম অবতারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এ কথারও প্রমাণ তিনি দেন নাই। বিষ্ণুর বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা হইতে দেখিতে পাই মৎস্যপুরাণে (৪৭ অধ্যায়, ২৩৪-২৫৪ শ্লোকে নবম অবতাররূপে) ভাগবতে (১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়ে ২১শ অবতাররূপে), বরাহ পুরাণে (৪র্থ অধ্যায় ২য় শ্লোকে নবম অবতাররূপে) বর্ণনা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের উল্লেখ নাই।

ভারতবর্ষ – বৈশাখ।

ব্যাণ্ডেল—কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় ভারতবর্ষের ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আলোচনাটীকে সরস করিবার জন্য ১৫ খানি চিত্র ও একখানি হুগলীর ম্যাপ সংযোজিত করিয়াছে। হুগলী জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধের অভাব নাই। A brief History of the Hughli District by Lt. Col. D. G. Crawford; Hughli Past and Present by S. C. Dey, Bengal District Gazetteers. Hughli by L. S. S. O'Malley, Steuart's History of Bengal, Danvers' Portiguese in India. Campos' Portuguese in Bengal. প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ইংরেজি ও বাঙ্গালায় লিখিত প্রবন্ধে হুগলী সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা আছে। হুগলীর ইতিহাসের বিপুল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যখন লেখক মহাশয় ব্যাণ্ডেল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ইহাতে অনেক নূতন নূতন কথা থাকিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা কতকটা হতাশ হইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবন্ধটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় নূতন কথা বড় নাই, এমন কি পুরাতন উপকরণ গুলিও বেশ গুছাইয়া বলা হয় নাই। অধিকন্তু কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে লেখক মহাশয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন দুই এক স্থান ব্যতীত কোথাও বড় একটা উল্লেখ নাই। Crawford প্রণীত গ্রন্থ ও Gazetteer প্রভৃতির

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই প্রবন্ধের অনেক স্থলই ঐ সকল গ্রন্থের লিখিত বিবরণের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। অথচ ঐ গ্রন্থগুলির একেবারেই উল্লেখ নাই।

দু একটা উদাহরণ তুলিয়া কথটা স্পষ্ট করিয়া বলি। ৬১২ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ—'১৪৫৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী কালিকট সহরে প্রথম পদার্পণ করেন' ক্রফর্ড সাহেবের ৩য় পৃষ্ঠার বর্ণনার অনুরূপ অনুবাদ। (২) ৬৯০ পৃষ্ঠা আক্‌বর নামার হস্তলিপিতে সংস্থাপন করে'।' গেজেটিয়ার ৪৯ পৃষ্ঠার অনুরূপ।

(৩) ৬৯৮ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ 'সম্রাটের বিরাগ উৎপাদনের আশঙ্কায় ইত্যাদি' ক্রফোর্ড সাহেবের ৫ম পৃষ্ঠায় বর্ণনার অনুরূপ।

(৪) ৬০২ পৃষ্ঠার বিজিত পর্ত্তুগীজ গণের সহিত পাদরী ফ্রান্সে ক্রুজ—৭০৩ পৃষ্ঠায় ক্ষমতা প্রদান করেন পর্য্যন্ত—গেজেটিয়ার ৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণনার সহিত এক।

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার চিহ্নিত সেবক'—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু। প্রাচীন সাহিত্যিক দেবেন্দ্রবাবু ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেব ও রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বাবুর চরিত্র অতি অল্প পরিসরের ভিতর সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভক্ত না হইলে কেহ এরূপভাবে ভগবানের চরিত্র ফুটাইতে পারেন না।

'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা'—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এবার প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা হতাশ হইলাম। বহু আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই এই প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঠ করিয়া মনে হইল সময়ের সম্পূর্ণ অপব্যবহার হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমাদের পূর্ব্ব আবেদন অরণ্য-রোদনে পরিণত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই দুরূহ বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ছিল। পাণ্ডিত্যের অভাবের জন্য তিনি যে আলোচ্য বিষয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই তাহা বলিতেছি না—বলিতেছি তাঁহার সময়ের অভাব বলিয়া—দেশের ও দশের কার্য্যের জন্য যিনি মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়া দেশ-মাতৃকার সেবা করিতেছেন, জাতীয় মঙ্গলের জন্য—দীন-দুঃখীর অভাব মোচনের উপায় নির্দ্ধারণে দিবা-রাত্র যিনি পরিশ্রম করিতেছেন, সাহিত্যের পুরান পুঁথি ও পুস্তকের ভিতর দিয়া গবেষণা করিবার সময় তাঁহার নাই। একথা জানিতাম বলিয়াই আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া, তাঁহার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের পরিণতির প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম, নূতন আলোকপাতে রাসায়নিক-প্রবর আমাদিগের গদ্য-সাহিত্যের ধারাকে উজ্জ্বলভাবে দেখাইবেন—সেই ধারার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবেন—গঙ্গোত্রীর পথ হইতে সেই ধারা বাহির হইয়া কিরূপে নূতন খাতে প্রবাহিত হইল দেখাইয়া দিবেন। আমাদের সে আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না। যৌবনের অধীত পুস্তকসমূহ ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কৃত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"কে সম্বল করিয়া তিনি এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি, যদি তিনি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (অধুনা রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট্) মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম ভাগ"—প্রথম সংস্করণ ৩৯৫ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, 'যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর—"আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে "কামিনী-কুমার"-রচক কালীকৃষ্ণ দাস গদ্য-ছন্দের যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে "আলালী ভাষা" তাঁহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।" এই স্থানে দীনেশ বাবু 'কামিনী-কুমার' হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গদ্য-সাহিত্যে গবেষণামূলক যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া তিনি আরও সুন্দরভাবে এই প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। আর একটা প্রশ্ন তাঁহার নিকট করিতে চাই, গদ্য-সাহিত্যের ধারা ইদানীন্তন কালে অর্থাৎ বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কি একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যে তাহার উল্লেখ করা তিনি নিষ্প্রোজন মনে করিয়াছেন? আধুনিক গদ্য-লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নাম প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কৈ তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য কি তিনি দেখাইতে পারিতেন না? আমাদের মনে হয় বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা না থাকিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—তাহাই বলি কেন—সম্পূর্ণ হইতে পারে না?

এইবার আমরা তাঁহার প্রবন্ধের দু একটি বিষয় আলোচনা করিব। প্রথমেই শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,

—'প্রায় শতাধিক বৎসর হইল বাঙ্গালার কথকতা প্রচলন হইয়াছে। উহার প্রবর্ত্তক গদাধর ও রামধন শিরোমণি ইত্যাদি।' এ কথার প্রমাণ তিনি দেন নাই। কোথা হইতে এই অযৌক্তিক কথা তিনি পাইলেন তাহা বলিতে পারি না। বহু প্রাচীন কাল হইতে কথকতা এদেশে প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে কথকতার প্রচলন ছিল, তাহা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" তৃতীয় সংস্করণ ৭২ পৃষ্ঠা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।—"এতদ্ভিন্ন মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন সময়ে হনুমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যু-শয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজ-নীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুবন্ধ, ভূমিলিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের অগ্রজত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাস লিখিত ভূরি ভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী; এই সকল স্থলে কৃত্তিবাস পুরাণান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা কথকতায় আরোপিত আখ্যানে নির্ভর করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।" কৃত্তিবাস ১৪২০ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। অবশ্য এ প্রমাণের উপর আমরা নির্ভর করিয়া কথাটা বলি নাই। আমাদের জনৈক বন্ধু কথকতার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের জনৈক কথকের জীবন-চরিত শুনিয়াছি। আমাদের বন্ধু স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় "শ্রী"নামে ১৩১২ সালের ফাল্গুন মাসে 'বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বর্ত্তমান সময়ের কথকতার উপযোগিতা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'আমরা কথকতার ইতিবৃত্ত সংগ্রহের জন্য পাবনার প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কথক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই; তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ দ্বিভাষী পরলোকগত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কোন সময়ে তাঁহার বাড়ীতে কথকতা হইতেছিল। একদিন তাঁহার জনৈক প্রসিদ্ধ পাদরী বন্ধু (অবশ্য নেটীভ নহে) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তখন কথকতা হইতেছিল। শ্যামাচরণ বাবুও তখন কথকতা শুনিতেছিলেন এবং পাদরী বন্ধুকেও সেই আসরে সাদরে বসাইলেন" ইত্যাদি। বন্ধুবর একথা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালা "ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" ৬৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এ ঘটনাও প্রায় ১০০ বৎসরের হইতে চলিল। এ সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচনা না হইলে কোন কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না।

লেখক মহাশয় প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন —"বাঙ্গালার কথকদিগের নিকট বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য যতটুকু ঋণী, বাঙ্গালার ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের নিকটও তদপেক্ষা কম ঋণী নহে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মনীষীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, ও ব্যাখ্যা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রী-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে।" বেশ কথা! কিন্তু আচার্য্য-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদের দ্বারাই কি বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে? হিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারকের একজনের নামও ত তিনি উল্লেখ করেন নাই; অবশ্য এস্থানে বলিয়া রাখি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন, তখন তিনি ব্রাহ্ম-প্রচারক ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্য যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা কি তাঁহার মত পণ্ডিতকে বলিয়া দিতে হইবে? অন্ততঃ এই তিন জনের নাম তাঁহার উল্লেখ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। এই সকল কীর্ত্তিমান পুরুষদিগকে 'প্রভৃতি'র মধ্যে পড়িতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। এস্থলে আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে কি দান করিয়াছেন আমরা তাহা জানি-না, অবশ্য তাঁর নাম বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে একথা স্বীকার্য্য; তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবার বৃথা চেষ্টা কেন? পরিশেষে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, 'আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কত দীন।' এই দীনতা তিনি শব্দের অপ্রাচুর্য্যে ও ভাবের অভাবের দিক্ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। আবার তাঁহাকে বলি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সাহিত্যের সম্বন্ধে একথা বলিলে চলিত; এখন একথা বলা চলে না। পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য; কিন্তু সকল ভাবই এখন আমরা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি। সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন—'নবীন বাঙ্গলা সাহিত্য শুধু শব্দের কাঙ্গাল নহে, ভাবেরও কাঙ্গাল'—কথাটা নূতন। বাঙ্গলা দেশ ভাবের কাঙ্গাল নয়—বাঙ্গালী চিরকালই ভাব-সর্ব্বস্ব। ভাবের ঘরে সে কখনও চুরী করে নাই! ভারতের অন্যান্য দেশকে বঙ্গালাদেশ চির কালই নূতন ভাবের সন্ধান দিয়াছে।

নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তিনি যদি সম্যক্‌ভাবে পরিচিত থাকিতেন, তাহা হইলে এ কথাটা তাঁহার লেখনী মুখে বাহির হইত না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচিত এবং অর্ব্বাচীন কালের সাহিত্যের সহিত অপরিচিত আচার্য্য মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—'আমাদের গদ্য সাহিত্যে আবেদনপত্র, বড় জোর দুই একটী সামাজিক বা পারিবারিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ খুব উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বেকন, (Bacon) মেকলে, (Mecaulay) এমার্সন্ (Emerson) প্রভৃতি মনীষিগণের গভীর ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' আচার্য্য মহাশয়ের ইহাও এক নূতন আবিষ্কার! স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষোক্ত মনীষার নিকট হইতে অনেক ভাব গ্রহণ করিয়া ঐ গুলিকে তাঁহার অসাধারণ শক্তির দ্বারা নিজস্ব করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালাভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, একথা অবশ্য তিনি জানেন। 'মৃগ কী সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত' কথাটা দেখিতেছি সাহিত্যক্ষেত্রেও সুপ্রযোজ্য; তিনি তাঁহার নিজের লেখার ভিতর চিন্তাশীলতার পরিচয় না পাইতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছে—তিনি না জানিতে পারেন যে, একলব্যের মত তাঁর কত শিষ্য তাঁর লেখা পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব। মনীষী জগদীশচন্দ্রের, অক্ষয়চন্দ্রের, অক্ষয়কুমারের কালীপ্রসন্নের, রবীন্দ্রনাথের, রামেন্দ্রসুন্দরের, হীরেন্দ্রনাথের ভাষা গভীর ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী, বেকন, মেকলে বা এমারসনের অপেক্ষা ইঁহাদের কেহই চিন্তাশীলতায় ন্যূন নন। অবশ্য ভূদেব বা বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিলাম না; কেন না তাঁহারা লেখক মহাশয়ের মতে 'দু একটী সামাজিক বা পারিবারিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় খুব উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন' এর মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারেন। নব্য লেখকদিগের নাম করিলাম না। মাসিক পত্রিকায় তাঁহাদের সুচিন্তিত মৌলিক প্রবন্ধ সকল আচার্য্য মহাশয়কে পড়িতে অনুরোধ করি। আর একটা কথা বলিয়া এই অপ্রিয় আলোচনা শেষ করিব—আচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন 'জগতের নিকট আজ বাঙ্গালা সাহিত্য মেয়েলী সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত।' সকল দেশের সাহিত্যেই প্রেমের কবিতা—প্রেমের গল্পের ছড়াছড়ি আছে; নবীন সাহিত্যিকদের তরুণ হৃদয়ের ভাব, তরল কবিতা ও গল্পের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যে কি বাহির হইতেছে না? আর বাঙ্গালার প্রবন্ধরাজি ভারতের অন্যান্য দেশের ভাষায় ভাষান্তরিত হইতেছেই বা কেন? যদি আমাদের সাহিত্য মেয়েলী সাহিত্য বলিয়াই পরিগণিত হয়, তবে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বুধমণ্ডলী রামেন্দ্রসুন্দরের 'যজ্ঞ' কেন ভাষান্তরিত করিয়াছেন? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী জগতে বহু ভাষায় ভাষান্তরিত হইল কেন? গিরীশচন্দ্রের ও দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকখানি নাটক ঐরূপ ভাষান্তরিত হইল কেন? সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাশ্চাত্য বুধ মনীষীরা পাইয়াছেন তাই অনুবাদ করিতেছেন। আমরা আচার্য্যমহাশয়ের ভক্ত তাঁহার নিকট অযৌক্তিক কোন কথা শুনিলে প্রাণে আঘাত পাই, তাই এত কথা বলিলাম।

'প্রতীচ্যের তরুণ সম্প্রদায়'—মার্কিন দেশের তরুণ সম্প্রদায়দিগের অবনতির অনেকগুলি কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি কারণ লেখক মহাশয় উল্লেখযোগ্য বলিয়াছেন। (১) সংসারের জঘন্য অবস্থা। (২) সংসারের দারিদ্র্য হেতু জননীকে উদরান্ন-সংস্থানের জন্য বাহিরে চাকুরী করিতে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয়; এজন্য ছেলে মেয়েদের উপর মায়ের নজর রাখিবার সময় হইয়া ওঠে না, মায়ের নিকট শিক্ষাই ছেলেমেয়ের বাল্য-জীবন গঠন করে। (৩) পূর্ব্বকালের শাসনের কড়াকড়ির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বর্ত্তমানে একটা বিশৃঙ্খলা। (৪) অবাধে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা। (৫) জীবন-যাত্রার ব্যয়ের হারবৃদ্ধি (৬) অসংযত বিলাস-বাসনা। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলির ভিতর কয়েকটী কারণ আমাদের দেশের পক্ষে প্রযোজ্য না হইলেও, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষী পাশ্চাত্যদেশবাসী তরুণদিগের বাতাস, আমাদের তরুণদিগের গায়ে লাগিয়া ক্ষতি করিতে পারে, এই কারণে লেখক মহাশয় দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিতে চান।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—কথামৃত'—শ্রীম-লিখিত। এই সুধা-মাখা কথাগুলি যিনি শুনিবেন তিনিই ধন্য হইবেন। সকলকেই ইহা আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুনয় করি। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া ধর্ম্মের কথা বলা বড় সহজ নয়।

বঙ্গবাণী—জ্যৈষ্ঠ।

'সমালোচনা'—শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। মনীষী লেখক মহাশয় বলিতে চান,—'রস-সৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র কাজ। রসমাত্রের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়

স্রষ্টা ও ভোক্তার সজ্ঘাতে, এককে ছাড়িয়া অন্যে রসের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করিতে পারেন না। তাই সাহিত্য চায় রসজ্ঞ পাঠক, তাই সাহিত্যের আসরে সমালোচকের মান এত বেশী। কেননা সমালোচক রসিক। * * উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত বা কলা উপভোগ করিতে হইলে তার উপযোগী একটা শিক্ষা চাই। উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যও তেমনি সবাই ইচ্ছা করিলেই পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারে না। তাই সমালোচকের প্রয়োজন। * * * সমালোচকের কাজ এক হিসাবে রসস্রষ্টার চেয়েও বড়। * * তিনি রসের বিশেষজ্ঞ। * কবির আহরিত কণা কণা রূপ কুড়াইয়া তিনি তোড়া বাঁধিয়া জগৎকে দেখান, কতরূপ কবি আহরণ করিয়াছে, কত আনন্দের লুকান মণি সে কবির সৃষ্টির ভিতর আছে। তাই সমালোচক কেবল রসের ভোক্তা নন, তিনি এক হিসাবে রসের স্রষ্টা। * * রস সমালোচকের পণ্য, তিনি রস চেনেন। তিনি রসের পসারী, রস আহরণ ও বিতরণ তাঁর কাজ। * * সমালোচকের মুখ্যতঃ হওয়া দরকার—রসিক দরদী। সমালোচনার প্রথম ও শেষ সূত্র রসের আস্বাদ। সমালোচকের মনের ভিতর রস-প্রবণতা না থাকিলে তার পক্ষে সমালোচনার চেষ্টা বিড়ম্বনা। যার অন্তরে রস আছে সে ছাড়া অন্য কারও সমালোচনার অধিকার নই। তার অন্তরের এই রসেন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া সকল সাহিত্যকে পরখ করিতে হইবে—কবির ভাবে তার ভাবিত হইতে হইবে।' প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। লেখক মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে এ সম্বন্ধে আমরা অধিক জানিতে পারিব আশা করিয়াছিলাম। সমালোচক যে রস-স্রষ্টা তাহা খুব খাঁটি কথা; কিন্তু কথাটা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। অল্প পরিসরের মধ্যে প্রবন্ধটী শেষ করিতে হইয়াছে বলিয়া, বোধ হয় তিনি ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। লেখক মহাশয়ের বক্তব্যগুলি সম্যক্ আলোচনা বা সমালোচনা অপেক্ষা রস-ব্যাখ্যান বা রাগানুভূতি (appreciation) সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য। তথাকথিত সমালোচকদের সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা খুব সত্য। তাঁহারা পরের মুখে ঝাল খাইয়া বিচার করেন,—রসের যাচাই করেন Aristotle বা Taine, বা কাব্যাদর্শ বা সাহিত্যদর্পণের রসের লক্ষণ দেখিয়া; কিন্তু এরূপ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে সমালোচনা হয় না। 'যাঁর অন্তরের রসগ্রাহিতার অভ্রান্ত নিকষমণিতে সোনার দাগ না কাটিয়া যায়' তিনি প্রকৃত সমালোচকই নন।

'জাপানের সামাজিক প্রথা—শিক্ষা'—অধ্যাপক ডাঃ আর কিমুরা। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় প্রথমে জাপানের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির একটু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'প্রাচীন কালে জাপানেও প্রায় ভারতেরই মত জাতিভেদ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ ছিল। 'সামুরাই' (ক্ষত্রিয়), 'নোকা' (কৃষক), 'দাইক্' (সূত্রধর) ও 'সোনিন' কতকটা এদেশী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও দ্বিধাবিভক্ত শূদ্র। ইহাদের মধ্যে 'সামুরাই' ছিল ঠিক ভারতীয় ব্রাহ্মণের মত বর্ণগুরু এবং বাকি তিনটি ইহার তুলনায় অনেক হীন। এইজন্য প্রাচীনকালে শিক্ষার সর্ব্ববিধ আয়োজন ও অনুষ্ঠান কেবল এই শ্রেণীর মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল। বাকী তিনবর্ণের পক্ষে শিক্ষালাভের তেমন কোন সুবিধা ছিল না। তখন কেবল 'কাঙ্গাকু' অর্থাৎ চীন দেশীয় পণ্ডিতদিগের লিখিত শাস্ত্রের পঠন-পাঠন মাত্র 'জিক' পাঠশালায় চলিত।' * * তারপর ক্রমশঃ অন্য বর্ণের মধ্যেও ধীরে ধীরে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। জিকগুলিতে তাহাদের স্থান হইত না। সাধারণতঃ ছোট ছোট বৌদ্ধ-মন্দিরের পুরোহিতেরা মন্দিরে বসিয়া তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে ও হিসাব করিতে শিখাইতেন। এই শ্রেণীর পাঠশালাকে জাপানী ভাষায় 'টেরা কয়া' বলে। 'টেরা' অর্থে মন্দির; আর 'কয়া' বলিতে শিক্ষার স্থান বুঝায়। এসকল স্থানে নিয়মিত বেতনের প্রথা ছিল না, কেবলমাত্র বৎসরের প্রথমে বা শেষ ভাগে কিছু গুরু দক্ষিণা দিতে হইত। তারপর প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ ও ডাচেরা আসিয়া জাপানীদিগকে সভ্যতার 'হাতে খড়ি' দেন। জাপানবাসী বুঝিল, শিক্ষার অবাধ প্রসার না হইলে দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর নয়। এই শিক্ষা বিস্তারের ফলে প্রাচীন বহু কুসংস্কার জাপান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধটীতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।—"রামগোপাল ঘোষ" ও "আশুতোষ-জীবনচরিত" পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।—'আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা গঠনের দোষ গুণ' শ্রীরমণীকুমার বসু। লেখক মহাশয় বলেন, 'নবজাত বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবর্ত্তন ধীরে ও ক্রমে হয় নাই। মানুষের ক্রমবর্দ্ধিত চিন্তাশক্তি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য অবিরত দুঃসহ যুদ্ধ করিয়া জাতির অজ্ঞাতসারেই একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয় নাই। বিদেশের চিন্তা ও সাহিত্য একদিনে আসিয়া

আমাদের উপর চাপিয়া পড়ে।' লেখক মহাশয় যদি একটু ধীরভাবে শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, 'ভাব-সম্পদ-চিন্তা, প্রকাশ-ভঙ্গী ও পদ-বিন্যাস' প্রাচীন ধারার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র। বিদেশের সাহিত্য ও চিন্তা হইতে বাঙ্গলা-সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু অবিকৃত ভাবে করে নাই, নিজস্ব করিয়া (assimilate) গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের সুধীদের ক্রমবর্দ্ধিত চিন্তাশক্তি, পরিবর্ত্তিত ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষার গঠন সম্বন্ধে তিনি নূতন কিছুই বলেন নাই। তিনি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রচনা-প্রণালীর অনুসরণ, লেখ্য ও কথিত ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ ও রাঢ়ে প্রচলিত ক্রিয়াগুলিকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিত কি না এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। এই প্রবন্ধের নামটী পড়িয়া মনে হইয়াছিল এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা দেখিতে পাইব; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। জনকত লেখকের ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা ভাষায় স্থায়ী হইবে কি না তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে না।

—'রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ও সঙ্গীত'—(কথোপকথন) শ্রীযুক্ত ডাঃ দিলীপকুমার রায়। কবিবরের সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দিলীপকুমারের বক্তব্য, 'বাঙ্গালা গান হিন্দুস্থানী গানের সুরের তানে গীত হইতে পারে।' তিনি 'রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে একটা অনড়রূপ বজায় রাখার বিরোধী।' তিনি চান, 'গায়ককে সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে রাজী নন; তিনি বলেন,—হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা গানের বৈশিষ্ট্য—তাদের প্রকৃতিভেদ—বিস্তর। বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কি, তার দৃষ্টান্ত কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়, তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত। কীর্ত্তনে, সুর অবশ্য কম নয়; তার মধ্যে কারু নিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীর্ত্তনের মুখ্য আবেদনটী হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায়মাত্র। এ কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্ত্তনের প্রাণ অর্থাৎ আখর কি বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা কথার তান। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই; সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য, তানালাপে কেমন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে সেইটাই উপভোগ করি। কিন্তু কীর্ত্তনে আমরা পদাবলীর মর্ম্মগত ভাব রসটাকেই নানা আখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। * * কীর্ত্তনে, সুরে বাক্যে অর্দ্ধনারীশ্বর যোগে আছে। বাঙ্গলা পদ গান যৌগিক সৃষ্টি, তা দুয়ে মিলে অখণ্ড; আর হিন্দুস্থানী গান স্ফটিক, তা একাই বিশুদ্ধ।" এই স্থলে দিলীপকুমার প্রশ্ন করেন, "তা হ'লে আপনি কি বল্‌তে চান ওদের গান শেখা আমাদের পণ্ডশ্রম মাত্র?" উত্তরে জোরের সহিত কবিবর বলেন, 'কখনই না, আমরা কি ইংরাজী শিখি না?—কেন শিখি?—ইংরাজী সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। তার রসপানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় স্বকীয় শক্তিকেই নূতন উদ্যমে ফলবান্ করে তোলবার জন্যে।* * হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাল করে শিখ্‌লে তা থেকে আমরা লাভ না করেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনই, যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জ্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রস সৃষ্টি হয় না; সাহিত্যেও না সঙ্গীতেও না।' তারপর তিনি নিজের গান সম্বন্ধে গায়ককে স্বাধীনতা দিবার কেন যে বিরোধী তাহা তাঁহার কথাতেই বলি,—'আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুক্ত পুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে সরিক বলে মান্‌তে সে যে নারাজ! বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল-মিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপোষ করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক।' কবিবর তারপর বলেন,—'গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষ গুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। ছবি ও কাব্যকে এই দুর্গতি থেকে বাঁচান সহজ। ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট্-পালট্ করতে পারে বলে তার উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্ম্ম-বুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়, নিজেদের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।'

উত্তরে দিলীপকুমার বলেন, 'আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের Caricature নিবারণ কর্ত্তে পারবেন না। পার্বেন কেবল সত্য শিল্পীকে তার সৃষ্টি কার্য্যে বাধা দিতে। সত্যকার শিল্পী আপনার গানের মূল কাঠামটা বজায় রেখে তাদের ইচ্ছামত স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আপনার গানকে একটা নূতন সৌন্দর্য্যে গরীয়ান্ করে তুলতে পারত। কিন্তু আপনার সুর 'হুবহু বজায় রাখতে হবে'—আপনার এই ইচ্ছা বা আদেশের দরুণ তাদের নিজেদের অনুভূতির রঙ্ ফলিয়ে আপনার গান গাওয়া তাদের কাছে একটা সঙ্কোচের কারণ না হয়ে পারবে না।' উত্তরে কবিবর একটু ভেবে বলেন,—'অবশ্য যারা সত্যকার গুণী, তাদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে, এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম। তবে একটা কথা;—না দিলেই বা মানছে কে?" এ সম্পর্কে তিনি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বাঙ্গালা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবে কি না? উত্তরে দিলীপকুমার বলেন, অবশ্য একশ্রেণীর বাঙ্গালা গানে এ স্বাধীনতা আমি চাই না—আর এক শ্রেণীর গানে হিন্দুস্থানী গানের সৌন্দর্য্য বাঙ্গালা গানে আমদানি করা যেতে পারে। সম্প্রতি অতুল প্রসাদের কতকগুলি গান শুনে আমার ধারণা হয়েছে এরূপ করা শুধু সম্ভবপর নয়—এটা হবেই।' উত্তরে কবিবর বলেন, 'বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কেমন করে নূতন সৌন্দর্য্যে বাঙ্গলা সংগীত ফুটানো যেতে পারে, এটা একটা সমস্যা। তবে চেষ্টা করলে এ সমস্যার সমাধানও না মিলেই পারে না। একথা স্মরণ রেখে যদি তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত assimilate করে বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন কর্ত্তে পার, তা হলে তুমি সগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে পারবে; নইলে সুরের জলপ্লাবনই হ'বে কিন্তু তাতে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটিবে না।' কথাগুলি খুব খাঁটি। অবান্তর ভাবে দিলীপকুমার কবিবরকে আর একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, একদল লোকে অনবরত বলে' থাকেন খাঁটি বাঙ্গালী হও, খাঁটি বাঙ্গালী হও; কিন্তু এরূপ চিৎকার কি সাহিত্যিক chauvinism নয়? উত্তরে কবিবর বলেন, 'তাত বটেই। দুর্গম গিরি শিখরে উৎস থেকে যে আদি নির্ঝরটী ক্ষীণধারায় বইচে তাকেই বিশুদ্ধ গঙ্গা বলে মানব, আর যে ভাগীরথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে তার সঙ্গে পথে বহু উপনদীর মিশ্রণ ঘটেছে বলে তাকেই অশুদ্ধ ও অপবিত্র বলব এমন কথা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয়। যদি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার করেছে তা হলে আমি ত অন্ততঃ তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ এই-ই জীবনের লক্ষ্য।' তারপর তিনি বলেছেন, 'যদি একান্ত অবিমিশ্রতাকেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়, তা হ'লে বনমানুষের গৌরব মানুষের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, মানুষের মধ্যেই মিশাল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশাল নাই।

'বর্ত্তমান বাঙ্গালার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়'—পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। এরূপ লেখা প্রকাশ করিবার সার্থকতা যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।—মৃত্যুঞ্জয় মহাশয় 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ" করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সকলের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন,—'আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলি এদেশে তৈয়ারী হয় এবং সেজন্য বিদেশীর উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার কতকগুলি এদেশে তৈয়ার হইতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে লোপ পাইতেছে, বা শীঘ্রই পাইবে। আর কতকগুলি তৈয়ার করিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই—চেষ্টা হইলেও বিদেশী প্রতিযোগিতায় টিকিবে কি না সন্দেহ।' এ অবস্থায় লেখক মহাশয়ের মতে, 'এ দেশের প্রত্যেক লোকের প্রধান কর্ত্তব্য এ দেশের টাকায় স্থাপিত এদেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত, কারখানায় দেশীয় উপদানে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করা।' এরূপ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে দেশের ধনাগম হইবে ও একদিক্ দিয়া অন্ন সমস্যার পথও পরিষ্কৃত হইবে।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

'অভিভাষণ'—বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর বাহাদুর পাটনা কলেজের 'চাণক্য-সমিতির' বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হইয়া যে ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাই অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় 'মূল্যবান অভিভাষণ' বলিয়া ইহাকে প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি—যে ইহাতে জানিবার বা, শিখিবার বিষয় খুব অল্পই আছে। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হয় নাই।—'প্রাচীন কথা —সাহিত্য'—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলা চরণ লাহা, এম-এ,

বি-এল, পি-এইচ-ডি। পালি-সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে সুপণ্ডিত লেখক মহাশয় এবার 'ধর্ম্ম লব্ধ' 'কোশলরাজ' ও 'শান্তিবাদির' কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। বলিবার ভঙ্গী সহজ; ভাষাও বেশ সরল।

'চন্দন নগরের পাদ্রী জোতির্ব্বিদ্ গেরেণের শত বর্ষের গ্রহণ গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক—শ্রীহরিহর শেঠ। এই গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি ও লেখক মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। 'আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার না সংহার'—কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত। এখনও চলিতেছে। মান্দ্রাজের বন্দরে' —শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু বি-এ মহাশয়ের সচিত্র চলনসই ভ্রমণ-কাহিনী। যে কোন Guide book এ এসকল কথা আছে। 'আশুতোষ'—শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জীবন চরিত তাঁহার ভগিনী বিবৃত করিতেছেন।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'—কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। এবার প্রথমে আমরা তাঁহার নিকট হইতে আর্টের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার কথায় আমরা উহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম:—'কবি বলো, চিত্রী বলো, আপনার রচনার মধ্যে সে কি চায়? সে বিশেষকে চায়। * * মানুষের সৃষ্টি চেষ্টা অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট বিশেষকে জানাবার চেষ্টায় আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হ'য়ে ওঠে, তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হ'ল বলেই যে আনন্দ তা নয়, তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হ'ল বলেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ। মানুষের যে-কোন রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েছে তাকে আর্ট —সৃষ্টিরূপে দেখি, সেই একান্ত দেখাতেই আনন্দ। সৃষ্টিকর্ত্তার বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে সৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে। * * আর্টে আমরা গুণবান্‌কে চাইনে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বুঝতে সুন্দরকে বল্‌চিনে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ, সেই রূপবান্। * * চল্‌তি ভাষাই যাকে সুন্দর বলে তাকে নিয়ে কবি কিম্বা রূপকার আপনাদের রচনায় খুব ব্যবহার করে থাকেন। তার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য্য হচ্চে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, "চেয়ে দেখ।" প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিষকে যা না বলি, তাকে তাই বলি; বলি "তুমি আছ।" এটেই হ'ল আসল কথা। সে যে নিশ্চিত আছে, এই বার্ত্তাটাই তার সৌন্দর্য্য আমার কাছে উপস্থিত করলে। সে যে সৎ, এটেই একান্ত উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লুম বলেই সে এত আনন্দ দিলে। * * সৌন্দর্য্য-ভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম্ম; তা না করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে, তখন সে আপনার জাত খোয়ায়, তখন সে হ'য়ে যায় নীচ। তা উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। বিশেষকে দেখ্‌বার আর একটা কৌশল আছে, সে হচ্ছে নূতনত্ব। যে খানটা সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখ্‌তে পাই না, সেই খানে দেখ্‌বার জিনিষকে দেখানো হচ্ছে আর্টিষ্টের কাজ। সেই জন্যই ত বড় বড় আর্টিষ্ট-এর রচনার বিষয় চিরকালের জিনিষ। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখ্‌তে চায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে।'

তৎপরে কবিবর প্রশ্ন করিয়াছেন, 'আর্টের সাধনা কি?' উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, 'আমি বলি "দেখ," তবেই দেখ্‌তে পার্‌বে। সত্তার প্রবাহিণী ঝরে পড়্‌চে; তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক; ছোট বড় সুন্দর অসুন্দর সব নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশ ধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ কর্‌লে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে।" অবশ্য এরূপ ভাবের কথা পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়াছেন; কিন্তু বর্ণন-ভঙ্গীর গুণে কবিবরের প্রচারিত সত্য বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। যে সকল নব্যপন্থী লেখক আর্টের দোহাই দিয়া সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদিগকে কবিবরের অন্ততঃ একটা ছত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে ও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি—"যে সৌন্দর্য্য ভোগ মনকে না জাগিয়ে, ভোলাতে বসে, সে তখন জাত হারিয়ে নীচ হয়ে পড়ে। উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়।" তৎপরে রবীন্দ্র নাথ 'মুক্তির' স্বরূপ আমাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন,—'সৃষ্টিতেই আনন্দ হওয়াটাই চরম কথা। অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দ গৌরবে পূর্ণ।

বিশ্ব-রচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হ'তে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; গৌণ কথাটা হচ্ছে সৌন্দর্য্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে, তখন সে গৌণের সম্পদই সে খোঁজে। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ, বোখারা পণ কর্‌তে বসে, তখন সে "প্রজনার্থ মহাভাগা"র কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবী সৃষ্টিতে বে-হিসাবী আনন্দরূপকেই সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য বলে জানে। আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটা দেখ্‌তে পায়। সেই অপরিণত মানুষটার মধ্যে একটি পূর্ণতার ছবি দেখতে পাই। আর দেখতে পাই মুক্তির সহজ ছবি। মুক্তি বল্‌তে কি বোঝায়? প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঋষি একটা চরম কথা বলেছেন:—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি? স্বে মহিম্নে।' সেই ভগবান কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত? তার উত্তর, নিজের মহিমাতে। অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ। শিশুরও সেই কথা।' তারপর তিনি বলিতেছেন, আর্ট মুক্তির আস্বাদন না পেলে তার আর্টত্বই হারিয়ে বসে। তাঁর কথায় বলি,—'যথার্থ আর্ট তখন হার মানে যখন তার স্বাধীনতা চলে যায়। যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে ব'লেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে; কিন্তু যে হেতু তার-নৈপুণ্যটা অলঙ্কার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম্ম নাই, তাই তাকে প্রবল হ'তে দিলেই আভরণ হয়ে ওঠে শৃঙ্খল, তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ ক'রে দেয়, তার গতি রোধ করে। মোট কথা সত্যের রস-রূপটা সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে কলা বিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সব চেয়ে শত্রু।' তা হ'লে কি অবান্তর-বর্জ্জনেই শুধু আর্টের পরিত্রাণ?—না আত্ম-প্রকাশের সত্যতায় মুক্তি।' 'আত্ম-স্তম্ভিতায় বন্ধন, আত্ম-প্রকাশেই মুক্তি' এই সত্য বাণী প্রচার করিয়া কবিবর আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সাহিত্যে আমরা সহজ সরল সত্যের আত্ম-প্রকাশ দেখিতে চাই; কিন্তু সেই প্রকাশ-ভঙ্গীতে মন যেন অধঃপতনের দিকে—কবির ভাষায় বলি 'নীচের দিকে' না যায়। তোল কবি—তোল সাহিত্যিক—তোল শিল্পী তোমার সুন্দর কাব্যে কথায় গানে চিত্রে ও শিল্পে আমাদিগকে ঊর্দ্ধে নীচতার উর্দ্ধে তোল—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের সাক্ষাৎকারের সহায়তা কর। তৎপরে কবিবর মুক্তির তীর্থক্ষেত্রের যে সন্ধান দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথায় বলি, 'তাই সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হ'ল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থ-ক্ষেত্রে মর্‌তে পারি,—শেষ মুহূর্ত্তে যেন বল্‌তে পারি সকল দেশই আমার একদেশ, সর্ব্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানব-প্রাণের পবিত্র জাহ্নবী ধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্য-কাল প্রবাহিত।' ইহা বিশ্বকবির উপযুক্ত বাণী।—'বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র'—শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভৌমিক। লেখক মহাশয় বলেন,—'বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ; কিন্তু বর্ত্তমান কালের বিদ্যালয় গুলিতে গণতন্ত্রের পরিচয় কিছুমাত্র পাওয়া যায় না। এগুলিতে শিক্ষকদের স্বেচ্ছাতন্ত্র চলিয়া থাকে। এখানে ছাত্রদের মতামতের কোনও মূল্য নাই। অনেক স্থলে মত প্রকাশের ফলে তাহাদের ভাগ্যে উপরি লাভ শাস্তি হয়। ছাত্রদের রীতি নীতি এবং শৃঙ্খলা বিধান-বিষয়ে শিক্ষকতন্ত্রের মাত্রা কমাইয়া ছাত্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ছাত্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিক্ষক গণের ক্ষমতার হ্রাস বিশেষ ভাবে হইবে না। তাঁহাদের অধিকার ও ক্ষমতা সমানই রহিবে; তাঁহারা কেবল তাঁহাদের কার্য্যের কিয়দংশ ছাত্রগণের উপর ন্যস্ত করিবেন। ইহাতে ফল হইবে এই যে, বালকগণ নিজেদের বয়স্ক মনে করিয়া আনন্দ ও তুষ্টিলাভ করিবে; অধিকাংশের মতে কার্য্য করিবারও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখিয়া উত্তর কালে যথেষ্ট উপকার পাইবে—স্বাধীনতার সুব্যবহার করিতেও শিখিবে।' শান্তিনিকেতনে লেখক মহাশয়-বর্ণিত মত কার্য্য করিয়া ছাত্রগণ অধিকতর সৎ ও নিয়মানুযায়ী হইয়াছে এবং তিনি আশা করেন অন্যান্য বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলেও সুফল পাওয়া যাইবে। অবশ্য এ মত তাঁহার নিজস্ব মত নয়—এ মতের উদ্ভাবক আমেরিকার উইলসন গিল নামক জনৈক ভদ্রলোক।

"বজ্রকূট মন্দির বা শ্বেতনাগ মন্দির"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এম-এ। সাংঘাই হইতে ১১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হাং চাউ নগর। হাংচাউএর নীচেই প্রসিদ্ধ পশ্চিম হ্রদ। হ্রদের দুই দিকে দুইটী দ্রষ্টব্য স্থানNeedle Pagoda বা রাজা "সু-এর" সূচী মন্দির ও বজ্রকূট মন্দির। হ্রদের মধ্যে এই ছোট পাহাড়ে দ্বীপে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গঠন ভারতীয়। ঠিক্ যেন ভুবনেশ্বর বা বিক্রমপুরের রাজাবাড়ীর বা বীরভূমের ইছাই ঘোষের মন্দিরের নমুনায় তৈয়ারী। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জানিবার কথা বিশেষ কিছুই নাই। তবে লেখক মহাশয় আশা দিয়াছেন ভবিষ্যতে এই তীর্থ বিষয়ে তিনি কিছু বল্‌বেন।

বাস্তবিক যদি ভারতবাসী কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক দিগের নিকট আমরা এ বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ জানিতে চাই। ৺জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমার দেবী। আশুতোষ—কলেজের বাংলা-সাহিত্য-সম্মিলনীর উদ্যোগে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে ৺জোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি সভায় পঠিত প্রবন্ধ।

'শিক্ষকের আক্ষেপ'—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ। জেমশেদপুর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ। লেখক মহাশয় স্বয়ং একজন কৃতী শিক্ষক। তাঁহার কথায় ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। ছাত্রদের ভিতর সত্য মানুষটীকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য যে সকল উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষাব্রতে ব্রতী শিক্ষক মহাশয় দিগকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

বিজ্ঞান

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

"রয়েল সোসাইটী"—নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা মহাশয় উক্ত সোসাইটীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ইংলণ্ডের জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভার একটী ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যেরূপ যত্ন সহকারে এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যোগেন্দ্রবাবু বলেন ১৬৬২ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুলাই এই সমিতির প্রকৃত জন্মদিন; কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্য কেহই স্বীকার করিবেন না বলিয়া মনে হয়। কারণ, বাস্তবিক পক্ষে সকলেই বলিয়া থাকেন যে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির অনেক স্থলে ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, কার্য্য সৌকার্য্যার্থে এই সমিতির কতকগুলি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে যে ভাবে শাখা সমিতি গঠিত হইত তাহা লেখক বিবৃত করিয়াছেন, এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত গঠন প্রণালীর [illegible] কিন্তু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ [illegible]। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর আর কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ও বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত শাখা সমিতি গঠনের নিয়মাবলীতে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্থপতিবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, এই সমস্ত শাখা সমিতির সভ্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। লেখক মহাশয় এই সমিতির সভাপতিদের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার বাঙ্গালাও দুই একস্থলে বুঝিতে পারা যায় না। যথা ১৬৬২ খৃঃ ১৫ই জুলাই তারিখে সমিতির অঙ্গীভূত (incorporated ?) হইবার সনন্দ রাজকীয় প্রধান শিলমোহর (Great Seal ?) অঙ্কিত হয় লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে সাহিত্য-পরিষদের যে স্থান, বিজ্ঞান জগতে রয়েল সোসাইটীর স্থানও অনেকটা অনুরূপ। তাঁহার এই প্রকার তুলনাতে মনে হয় যে, হয় তিনি রয়েল সোসাইটী সম্বন্ধে সম্যক্ খবর রাখেন না, বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কিভাবে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহা কিছুই জানেন না, অথবা এই দুই সমিতির কোনটীর কার্য্য প্রণালীর সহিতই পরিচিত নহেন। কারণ তাহা হইলে তিনি এইরূপ হাস্যোদ্দীপক কথা বলিতেন না।

অভিভাষণ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী; মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সম্মিলনে ইহা পঠিত হইয়াছিল। কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষা বিজ্ঞানের ভাষা হইতে পারে, দেশে বিজ্ঞান-আলোচনা সত্বেও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না কেন, এবং কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী মত কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইলে দেশের ধনাগম বৃদ্ধি হইতে পারে—প্রধানতঃ এই কয়েকটী বিষয় এই অভিভাষণে বিবৃত হইয়াছে। অধ্যাপক নিয়োগীর মতে বাঙ্গালা ভাষাকে বিজ্ঞানের ভাষা করিতে হইলে আমাদিগকে তিনটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গুলিকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিজ্ঞানের পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা করিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ সাধারণ পাঠকের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রণয়নের জন্য পরিভাষা সঙ্কলন

করিতে হইবে।—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে মাতৃভাষাতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সম্মিলন অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। সাহিত্য সম্মিলনের শাখাবিশেষের সভাপতির অভিভাষণে সে সমস্ত চেষ্টার উল্লেখ না থাকা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। মাতৃভাষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে পঞ্চানন বাবু বলিয়াছেন যে স্যাডলার কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে কোন স্থির মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ কমিশনের মতে দেখা যায় যে, ইংরাজী ও অঙ্কশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর পঠন পাঠন মাতৃভাষার সাহায্যেই সম্পাদিত হইতে পারে। অধ্যাপক নিয়োগী সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের জন্য পরিভাষা সঙ্কলন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের চিত্তগ্রাহী করিতে হইলে ইহাকে যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জ্জিত করিতে হইবে। দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা আছে কিন্তু বিজ্ঞান-আলোচনা দ্বারা অন্যান্য দেশে যে ভাবে আর্থিক উন্নতি হইতেছে আমাদের দেশে তাহা কেন হয় নাই এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চানন বাবু দেশে ফলিত বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থার অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কিজন্য দেশে ফলিত বিজ্ঞান অধীত হইতেছে না, ও কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে আজ না হয় অচিরে ফলিত বিজ্ঞানের আলোচনা হইতে পারে—এই সমস্ত প্রশ্নের সম্যক্ কোনও আলোচনা এই অভিভাষণে দেখিতে পাইলাম না। কৃষিবিভাগের কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় ভদ্রসন্তানকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার জন্য নিজের যে চেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই অনুকরণীয় এবং এই ভাবে কার্য্য করিলেই ভদ্রসন্তান চাষী হইবে ও দেশে dignity of labour এর ভাব জাগিয়া উঠিবে!

"বলিভিয়া" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব উক্ত দেশের একটী সুপাঠ্য ও চিত্র-বহুল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

"ময়ূরভঞ্জের আল্পনা" প্রবন্ধে অধ্যা— শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জের প্রচলিত আল্পনা বা "ঝুঁটী"র বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আল্পনার কতকগুলি সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রচলিত আল্পনার তথ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শিল্প সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে, যথা শ্রমশিল্প (industry) ও চারুশিল্প (fine art)। আল্পনা সাধারণতঃ অলঙ্কার প্রতীক স্বরূপ চিত্রিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত চিত্রের তুলনামূলক অনুসন্ধান দ্বারা আমরা নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। ফণীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা করেন নাই। আশা করি ভবিষ্যতে তাহা করিবেন। তাঁহার প্রবন্ধে দেখা যায় যে, ময়ূরভঞ্জে প্রচলিত "ঝুঁটী"গুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি ঝুঁটী কেবলমাত্র বাড়ী সাজাইবার জন্য ও অপর কতকগুলি ব্রত বা বিবাহাদি উৎসবে ব্যবহৃত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত ডাক্তার Annandale চিল্কা হ্রদস্থিত একটী গ্রামের আল্পনার সুবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে ময়ূরভঞ্জে যেরূপ রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ বাড়ীতে আল্পনা অঙ্কিত হয়, চিল্কা হ্রদস্থিত গ্রামেও ঠিক সেই ভাবে আল্পনা দেওয়া হইয়া থাকে। আশা করি ভবিষ্যতে অধ্যাপক বসু মহাশয় আল্পনার সম্বন্ধে আরও গবেষণা করিয়া অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবেন এবং তাহা হইতে কি ভাবে আমাদের দেশে চারুশিল্পের ক্রমোন্নতি হইয়াছে তাহা এবং ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে অতীতকালে ভাবের কোনও আদান প্রদান ছিল কিনা তাহাও জানা যাইবে।

"মৌমাছির ভাষা" প্রবন্ধে শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিতের লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদটী বেশ সুন্দর ও সহজ হইয়াছে।

"সাঁওতাল জীবন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত মহাশয় সাঁওতালদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কোন্ বিশেষ স্থানের সাঁওতালদের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এই প্রবন্ধে সাঁওতালদের গৃহস্থালীর বিবরণ, বিচারকার্য্যের প্রণালী, আহার্য্য বস্তু, সন্তানের জন্মোৎসব ও নামকরণ, উদ্বাহক্রিয়া, পূজা পার্ব্বণ, মৃতের সৎকার এবং ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে সাঁওতালদের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে প্র— বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুই এক স্থলে গরমিল আছে। —ভূতিবাবুর মতে শিশুর পিতামাতা

বর্ত্তমান থাকিলে পুত্র জন্মিলে তাহাকে পিতার নাম দেওয়া হয়, এবং কন্যা জন্মিলে তাহাকে তার মাতার নাম দেওয়া হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে Mr. Manএর লিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় :—Should it happen to be a son and an heir, he takes the name of his grandfather. Shonld he be the second son born, he takes that of this maternal grandfather. ...The same routine is followed for the girls; the feminine relations being taken in the same order from the female side." লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, সাঁওতালদের মধ্যে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ আছে এবং এই সমস্ত জাতির পরস্পরের মধ্যে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু বর ও কন্যা একজাতি হইলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। আমাদের মনে হয় যে লেখক মহাশয় জাতি শব্দ গোষ্ঠী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, সাঁওতালদের মধ্যে বহির্ব্বিবাহ (exogamy) প্রচলিত আছে; কিন্তু অন্তর্ব্বিবাহের (endogamy) রীতি নাই। কোন কোন বিষয়ে সাঁওতালগণ হিন্দুদের অনুকরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার সীমন্তে সিন্দুর ধারণ সম্বন্ধে যে বাধা আছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'বাঁদরের বুদ্ধি' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অ—মহাশয় "The mentality of apes" নামক পুস্তকের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে পুস্তক-লেখকের মতে বানরের বুদ্ধি, পরিমাণে মানুষের অপেক্ষা কম হইলেও, মানুষ ও বানরের বুদ্ধির মধ্যে জাতিগত বৈষম্য কিছুই নাই।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

"ব্যবসায়ী উদ্ভিদ-প্রজনন"—এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় উদ্ভিদ্ প্রজননের মূল প্রণালীর এক সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া মার্কিণ, ইংলণ্ড, মধ্য য়ুরোপ ও ফরাসী দেশে কি ভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখকের মতে ভারতের ন্যায় এত প্রকার কৃষি ও উদ্যানজাত উদ্ভিদ আর কোন দেশে নাই। লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে ২৪২ প্রকার ফসলের চাষ হয়। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈজ্ঞানিক মতে উদ্ভিদ্ প্রজননের প্রণালী অবলম্বন করিলে, ভারতবর্ষের ফসল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর ভাবে উৎপন্ন হইতে পারিবে এবং ফলে কৃষকের ও দেশের আর্থিক অবস্থা সেই [illegible] উন্নত হইবে। এই প্রবন্ধ প্রত্যেকেরই মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আর একটী কথা বক্তব্য আছে। প্রবন্ধ লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে Mutation ও জাতি পরিবর্ত্তন একই অর্থবাচক; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে Mutation আর জাতি পারবর্ত্তন ঠিক একই জিনিষ নহে।

"মার্কিণ ফুলের সাজি"—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় মার্কিণ দেশস্থ কতকগুলি ফুলের বিবরণ ও চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিশেষ কোন সার্থকতা বুঝিতে পারা গেল না। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ধরিতে গেলে, চিত্রগুলিও খুব ভাল হয় নাই। লেখকের বর্ণিত কতকগুলি ফুলের সহিত ভারতবর্ষীয় পুষ্পের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যদি লেখক মহাশয় সেই সমস্ত ফুলের সহিত মার্কিণ দেশীয় ফুলের তুলনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই প্রবন্ধের মূল্য থাকিত।

প্রকৃতি—বসন্ত-সংখ্যা, ১৩৩১।

"মৃত্তিকাতত্ত্ব," লেখকের নাম "বৈকুণ্ঠ"। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় সুদৃঢ় প্রস্তর ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে মৃত্তিকাতে পরিণত হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ভাষা সহজ হইয়াছে; কিন্তু দুই এক স্থলে লেখক মহাশয় তাঁহার রচনাতে কিঞ্চিৎ অসাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে পণ্ডিতগণের মতে "অতি পূর্ব্বে পৃথিবী একটি প্রখর উত্তপ্ত পদার্থ ছিল।" এই প্রসঙ্গে গ্রন্থানুবাদের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। লেখক মহাশয় অপর স্থলে বলিয়াছেন যে জলের ক্রিয়া :—(১) বাহ্যিক ও (২) আভ্যন্তরিক বা রাসায়নিক। ইহা পড়িয়া যদি কেহ মনে করে যে কোন প্রস্তরের বহির্দ্দেশে জলের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে পারে না, তবে অন্যায় হইবে না। কিন্তু প্রস্তরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যদি লেখক

বলিতেন যে জলের ক্রিয়া ভৌতিক ও রাসায়নিক এই দুই প্রকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্য বিষয় অধিকতর সুস্পষ্ট হইত। লেখক অপর স্থানে বলিয়াছেন যে পাহাড়ের গায়ে এক প্রকার "ছাতা" জন্মিয়া থাকে। ছাতা শব্দ সাধারণতঃ Fungus অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন লেখক মহাশয় এই স্থলে ছাতা শব্দ দ্বারা lichen বুঝাইতে চাহিতেছেন।

"ঝটিকা-সঙ্কেত," লেখক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন। এই সংখ্যাতে বিপিন বাবুর প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে। প্রবন্ধটী অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ।

"পিপীলিকা," লেখক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধে পিপীলিকার স্বভাব, ব্যবহার প্রভৃতির এক অতি সুন্দর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রবন্ধ যত অধিক এই পত্রিকাতে বাহির হইবে, দেশে বিজ্ঞান-চর্চা তত অধিক সহজ হইবে, কিন্তু এই প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। Family formicide ও ordea Hymenoptera ইত্যাদির উল্লেখ এই প্রবন্ধে না থাকিলেই ভাল হইত। এই প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত হয় নাই। যাহাতে সাধারণ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া পিপীলিকার জীবন ও আচরণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবন্ধ যতদূর সম্ভব পরিভাষা বর্জ্জিত হওয়া উচিত। লেখক মহাশয় flagellum শব্দের পরিবর্ত্তে 'শেষাংশ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—এই প্রতিশব্দ যে ঠিক হয় নাই—তাহা বোধ হয় দুর্গাবাবু নিজেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত প্রবন্ধে বন্ধনীর মধ্যে or শব্দের ও unfertilised egg এর প্রতিশব্দরূপে ডিম্ব শব্দের প্রয়োগ অসাবধানতার পরিচয়।

"ভারতবর্ষের মানচিত্র"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত। এটী একটী প্রত্ন-ভৌগোলিক (palaeo-geographical) প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। প্রথমতঃ বক্তব্য বিষয় হিসাবে প্রবন্ধের কলেবর ক্ষুদ্র ও দ্বিতীয়তঃ লেখক যে যুক্তির বলে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা নির্ভুল নহে। তিনি বলিয়াছেন—"ধারওয়ার যুগে যে সকল স্তর পড়িল তাহা ধারওয়ার যুগ নির্দ্দেশ করিল। ভারতবর্ষের ভূ-ত্বকে যে যে স্থানে ধারওয়ার যুগের স্তরাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানে ধারওয়ার যুগের সমুদ্র বর্ত্তমান ছিল। এই সমগ্র স্তর রাশির যেখানে সীমা তাহাই ঐ ধারওয়ার সমুদ্রের উপকূল। উপকূল ছাড়াইয়া ধারওয়ার মহাদেশ।" এই উদ্ধৃতাংশে লেখক মহাশয় যাহা প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছেন তাহা যে ঠিক নহে তাহা বোধ হয় তিনিই নিজেই স্বীকার করিবেন। কোনও সময়ের স্তর তাহার পরবর্ত্তী সময়ের গঠিত স্তর দ্বারা আবৃত থাকিতে পারে বা নৈসর্গিক উপায়ে কোন সময়ের স্তর একেবারে লোপ পাইতে পারে—লেখক মহাশয়ের উক্তিতে ইহার কোনও আভাস পাওয়া গেল না। তিনি 'গণ্ডোয়ানা হ্রদ' প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গণ্ডোয়ানা স্তরগুলি সাধারণতঃ নদীজ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে—কিন্তু যদি লেখক এগুলি হ্রদজ বলেন তবে প্রমাণের আবশ্যক। লেখক মহাশয়ের মানচিত্রে কাশ্মীর প্রদেশে বা দার্জ্জিলিঙ্গে প্রাপ্ত গণ্ডোয়ানা স্তরের কোনও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া গেল না। একস্থলে বলিয়াছেন, "হিমালয়ের শেষ উত্থান হয় প্লায়োসিন যুগে" ও অপর স্থলে লিখিয়াছেন "মোট কথা এই, হিমালয় এখনও উঠিতেছে।"—এই দুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা গেল না। Pelœozoic প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ তৈয়ারি হইয়াছে—কিন্তু দেখা যাইতেছে যে লেখক মহাশয় এই সমস্ত প্রতিশব্দের সহিত পরিচিত নহেন। মোটের উপর এই প্রবন্ধ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। যেরূপ সতর্কতার সহিত ইহা লেখা উচিত ছিল তাহা হয় নাই। ইহাতে সাধারণের মধ্যে ভুল সংবাদ প্রচারের সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয়।

"কলায়খঞ্জ" নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ব্যাধির এক সহজ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে য়ুরোপীয়গণ এই ব্যাধিকে তাঁহাদের আবিষ্কারের ফল বলিয়া মনে করেন; কিন্তু প্রায় তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সুশ্রুতের গ্রন্থে এই রোগের উল্লেখ আছে। লেখক মহাশয় এই ব্যাধির সুশ্রুত প্রদত্ত নামের সহিত য়ুরোপীয় চিকিৎসকদের গৃহীত নামের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

"মানবের শত্রু" নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ পাল মহাশয় কতকগুলি ব্যাধি-বাহী পতঙ্গের কার্য্য-প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধে একাধিক বৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি দেখা গেল। ম্যালেরিয়া-বাহী মশক anopheles speciesএর অন্তর্গত বলিয়া লেখা

হইয়াছে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই শ্রেণীর মশকের বৈজ্ঞানিক নাম—anopheles rossii সুতরাং এই মশক rossii জাতির (species) অন্তর্গত। Anopheles নামক কোনও জাতি বিদ্যমান নাই। মশকের mandible অস্থিপদ বাচ্য হইতে পারে না, কিন্তু লিখিত হইয়াছে "(১) এক জোড়া চোয়ালের অস্থির উপরে (mandible)"। লেখক মহাশয় অন্য একস্থলে লিখিয়াছেন, "ত্বক্ ক্ষেপণ করে।" (moults or casts its skin)" ইংরেজী পুস্তকের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-বহিতে এইরূপ লেখা শোভা পাইতে পারে, কিন্তু মাসিক বা দ্বৈমাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে ইহা চলিতে পারে না।

কবিতা

প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ।

'প্রাণ-গঙ্গা'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হরিদ্বারে সতীঘাটে দাঁড়াইলে গোমুখী হইতে গঙ্গাতরঙ্গ প্রপাতের যে গম্ভীর ঝর্ঝর প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, আলোচ্য কবিতাটী পড়িয়া আমাদের প্রাণ-গঙ্গার সেই সঙ্গীত গতি রাগে রসে ছন্দে তেমনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। কবি মুক্ত গগন তলে মুক্ত পবনে যে মুক্তির আনন্দের ধ্যান করিয়াছেন, কবিতাটীতে তাহা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'তৃতীয়া'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির তিন বৎসর বয়স্কা নাতিনী 'প্রেয়সী'র আব্দার—এই কবিতাটীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সুস্থ সরল সংযত—সুন্দর স্নেহের অমৃত বাণী আমাদিগকে স্বপ্নাবিষ্ট করিয়াছে।

'বিশ্বদুঃখ'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির মুক্তির ইচ্ছা কল্পনার দোলায় চড়িয়া নীল আকাশের নীল সাগরে ঐ নীল অসীমে অহোরাত্রের তালে তালে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রবাস-যাত্রা পথে ক্ষুদ্র ক্যাবিনের 'দুঃখ-গবাক্ষ' ভেদিয়া বিশ্বধরার বক্ষ হইতে বিপুল দুঃখের প্রবল বন্যাধারা (world-woe) গানের রাগিণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের ডমরু-ধ্বনি কবি কণ্ঠের অমর আহ্বানে ধরা দিয়াছে। শেষ কয়ছত্র আমরা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

রোগশয্যা মম
হ'ল উদার কৈলাসেরি শৈল-শিখর সম।
আমার মন প্রাণ
উঠ্‌ল গেয়ে রুদ্রেরি জয় গান॥

'মৃত্যুর আহ্বান'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাহা মানব মনকে বিরাট্ মনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়—

"যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অন্তরের মন্দির সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাহি কোনখানে।
দুয়ার বাহিরে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র পর্ব্বত
কেহ ডাকিবেনা কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথ রাত্রি বাহিরে নির্ব্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক॥

'কাঁটা-গোলাপ'—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় চৌধুরী। এই কবিতাটীতে কাঁটার বাহুল্য আছে—গোলাপের সৌরভ নাই।

'চরকার গান'—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়। Mande Ralstion Sherman—লিখিত 'চরকা' কবিতার অনুবাদ। মূল কবিতা আমাদের ভাল লাগে নাই, কবি ঐ কবিতার কি যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন—তাহা বলিতে পারিনা ; বোধ হয় মূল লেখক ভারতীয় কাহারও অনুরোধে উপরোধে যন্ত্র-বিশেষকে গলাধঃ-করণ করিয়াছেন। এরূপ প্রাণহীন কবিতার অনুবাদ না করিলেই ভাল হইত। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল লিখিত অনবদ্য সুন্দর চরকার গানের পর এ-গান আর কাণে লাগে না।

মাসিক বসুমতী— বৈশাখ।

আজকাল মাসিক পত্রিকায় পাদপূরণের জন্য পৃষ্ঠার শেষে, যেখানে একটু ফাঁক থাকে, সেইখানেই দুই ছত্র চারি ছত্র কবিতা দিয়া চৈবেতুহির মত পাদপূরণ করিয়া সম্পাদক মহাশয়েরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। এরূপ কবিতায় সাহিত্যের আবর্জ্জনা বাড়িয়াই উঠে। অল্প পরিসরের মধ্যে একটী ভাবকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা বড় সহজ ব্যাপার নয়, শক্তিশালী লেখক ভিন্ন এ প্রণালীতে কবিতা লিখিয়া কেহ সফলকাম হইতে পারেন না। এবারকার এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতাতে মাধুর্য্য আদৌ নাই।

'জীবন সন্ধ্যার অতিথি'—শ্রীকালীদাস রায়। এই কবিতায় কবির স্বভাবসিদ্ধ শব্দ-ঝঙ্কার ও ছন্দের অবাধ গতি আছে। কিন্তু ভাবের বিশেষত্বের কোনরূপ চিহ্ন ইহাতে পাইলাম না। কবিরা নূতন ভাবের সন্ধান দিয়া

আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন,—তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ একঘেয়ে মামুলি ভাবের কবিতা প্রত্যাশা করি না। কবি পুরাতনকে নূতন করিয়া বলিতে পারেন নাই,—বাগ্‌ভঙ্গীর মনোহারিত্বের অভাবও এই কবিতায় পরিদৃষ্ট হয়।

'এসো আবার'—শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কুশারী। কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস ভাষার বন্ধনে বাঁধা থাকিতে চায় না। আমাদের হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া তাহার ভাব-লহরী আঘাত দেয়—কিন্তু সে আঘাতের আরও একটু তীব্রতা থাকিলে ভাল হইত। কবি সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিবেন—তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তাঁহার ভাষার তারল্য এখনও দূর হয় নাই। অবশ্য তিনি যদি কেবলমাত্র আপনার মনের ব্যথা বিবৃত করিতেন তাহা হইলে ইহা সমালোচনার বহির্ভূত হইত। কিন্তু ইহা সাধারণের উপযোগী করিয়া সাহিত্যের আসরে তিনি স্থান দিয়াছেন, তাই এ সম্বন্ধে আমরা দু'এক কথা বলিলাম।

"পুঁজি'—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। কবির ভাব ভাষা বর্ণনভঙ্গীর পুঁজি কিছুই নাই, অথচ তাঁহাকে কবিতা লিখিতেই হইবে।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

'কাঁচের আর্জ্জি'—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। সাহিত্যের দরবারে কবি এ আর্জ্জি পেশ না করিলেই ভাল করিতেন। তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ভাষার নৈপুণ্য ও ঝঙ্কারের অপব্যবহার হইতে দেখিলে আমরা মর্ম্মাহত হই।

'কুলি-মজুরের গান'—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইংরাজ কবি হুড্ লিখিত—"The Song the Shirt" কবিতার অবলম্বিত পথ ধরিয় কবি তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিয়াছেন। কিন্তু এই কথাগুলি গদ্যে বলিলে তাঁহার চিন্তাশীলতার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইত—ঠিক সেরূপ পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় নাই। কবিতাটী সহানুভূতিতে পূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব-রস ইহাতে বড় নাই। গদ্যের বিষয়কে পদ্যে প্রকাশ করা বড় সহজ নয়—স্কচ্ কবি বার্ণস লিখিত 'Honest Poverty' বিষয়ক কবিতা গদ্যের বিষয়ীভূত হইলেও কবিত্ব-রসে পূর্ণ। এই শ্রেণীর কবিতা সেইরূপ ভাবে লিখিত হইলে কাব্যের আসরে স্থায়ী স্থান পাইতে পারে।

"ব্রজের বাঁশরী"—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক। ব্রজের বাঁশরীর সুর, বেসুরে ও বেতালে বাজিয়াছে।

"মন দিয়ে মন জানা যায়" ও "ব'সে আছি তোমারি আশায়"—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর দুইটীই উৎকৃষ্ট কবিতা। এই দুইটীতে কাব্য-রস সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"অপরাধ-ভঞ্জন"—শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কবিতাটী এই বারের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ছন্দে ভাষায় রসে উচ্ছ্বাসে—কবির মানসী-কল্পনা মূর্ত্তি-মতী হইয়াছে। এরূপ কবিতা সাধারণতঃ আজ-কাল মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাই না। ইহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তির আনন্দ পাইয়াছি। কবির লেখনী জয়-যুক্ত হউক্।

বঙ্গবাণী—জ্যৈষ্ঠ।

'পদধ্বনি'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে, কবি বলিতেছেন সহসা, ঘনবনে আশঙ্কার পরশনে হরিণীর হৃৎপিণ্ড যেমন থর থর কম্পিত হয় সেইরূপ তাঁহার শয্যা ক্ষণতরে 'অকারণ' কাঁপিয়া উঠিল। হরিণীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিবার যথেষ্ট কারণ কবি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, "আশঙ্কার পরশনে" কিন্তু তাঁহার শয্যা 'অকারণ' কাঁপিল। পরেই বলিতেছেন—

"পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি?"

গভীর নিশীথে কবিবর কোন্ এক অজানা যাত্রীর সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন। তাহার পদধ্বনি শুনিয়া তাহার অনুসরণ করা স্থির করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ও মায়ার বাঁধনগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া প্রলয়ের ভাসান খেলায় যোগ দিতে চলিয়াছেন। এ পদধ্বনি তাঁর অন্তরের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার দুয়ারে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং ইহা সেই পদধ্বনি যাহা চিরদিন বারবার শুনিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা সত্যকার মিলনের অনুরাগ ধ্বনি বলিয়া তাহার মনে জাগিয়াছে—তাই কবি বলিয়াছেন

"পদ ধ্বনি, কার পদধ্বনি
দিন শেষে,
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কি শব্দে ডাকিছে কোন অজানা রজনী?"

'বসন্তে ও বরিষায়'—শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। কবি একটা নূতন রসের ও ভাবের সৃষ্টি করিবার আশায় এক সঙ্গে বসন্ত ও বর্ষা দুইটি ঋতুকে বাঁধিয়াছেন।

একটী কৃষক বালিকার অন্তরে ও কাণে কাণে বসন্তের দূতিগণ আসিয়া বলিয়া গেল—

"— — — ভালোবাসি,
বড় ভালোবাসি সখি!
সেই সুরে উঠিল নাচিয়া।"

ইহা শুনিয়া কৃষক বালিকার শরীরের প্রত্যেক রক্ত-কণা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল এবং মনে হইল বিশ্বের সর্ব্বত্র এক প্রেমিক লক্ষ যুগ, লক্ষ বর্ষ ধরিয়া তাহার অব্যক্ত মধুর 'প্রেম-নিবেদন' করিবার জন্য মাথা খুঁড়িয়া ফিরিতেছে। একথা জানিবা মাত্র বালিকার—

"তনুলতা শিহরিল পুলক কম্পনে—
সে কী হর্ষ বেদনায়।"

এ ত গেল বসন্তে—এখন বাকী আছে বর্ষায়।

"জানায় অন্তর ব্যথা ; ভালবাসা তার সর্ব্বগ্রাসী
হা হা করে কয়ে উঠে—"ভালবাসি আজো ভালবাসি"
তৃপ্তিহীন প্রেতাত্মারমত!

'অনুরাগের পথে'—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

এই কবিতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। সেজন্য সমস্ত কবিতা, একটী সুরের ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। প্রথম ও তৃতীয় ভাগ বেশ সুন্দর হইয়াছে। শেষ অংশটির যে কোন প্রয়োজন ছিল তাহা মনে হয় না। কুমুদরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে আমরা এরূপ কবিতা চাই না। তিনি ইচ্ছা করিলে ভাল কবিতা লিখিতে পারেন।

'দুকুল হারা'—শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী। ইহাতে নূতন কিছুই নাই। রচনা খুব কাঁচা।

'উদান বাণী'—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। সিদ্ধি লাভ করিবার উপায় কি তাহা কবি এই কবিতায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন

"সিদ্ধি যদি চাসরে তবে ডাক্‌রে বশী বশিষ্ঠে।
ধায় সুরভি বেজায় দূরে ; চেঁচায় যদি অশিষ্টে।"

ইহার ছন্দ ও ভাষা সুন্দর।

কথা সাহিত্য

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

ধারাবাহিক ছাড়া ভারতবর্ষের নিজের গল্প সাড়ে তিনটি, কেননা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর "আত্মসমর্পণ"-টাকে গল্প না প্রবন্ধ না খেয়াল না অপসৃষ্টি কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছি না। কিন্তু যখন গল্পের ধাঁচটা আছে তখন ইহাকে অর্দ্ধগল্প বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। এ গল্পের লেখক একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই কথাটা একটা গল্পের মত কিছু রচিয়া তার ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। আবিষ্কারটি এই যে মেয়েরা স্বাধীনতা, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার, প্রভৃতি যতই যা' চাক, তাদের মনের কথা এই যে তারা পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে চায়। এই পরম তৃপ্তি-দায়ক সিদ্ধান্ত তিনি গল্পের আকারে গাঁথিয়াছেন কিন্তু তা গল্পও হয় নাই, তার আকারও বিশেষ কিছু নাই। আর গাঁথুনি গোড়া হইতেই ধসিয়া পড়িতেছে।—শ্রীমতী রেবা দেবীর "কনে পছন্দ" লেখাটির ভিতর বেশ স্বচ্ছন্দতা ও কারিগরি আছে। গল্পের কোনওখানেও আড়ষ্টতা নাই, ভাষাও বেশ ঝর-ঝরে। কিন্তু গল্পের প্লটটা জমে নাই। শেষ ফলটার মধ্যে যে বিস্ময়ের উদ্রেকে এ গল্পে রস জমিত, সে বিস্ময় জম্মে না। পরিণতি অত্যন্ত মামুলী হইয়া পড়িয়াছে। তারপর, এ গল্পের শেষ হওয়া উচিত উচিত ছিল যখন সুকুমার হঠাৎ দেখিল যে কনে স্বয়ং ললিতা। সেইখানে যব-নিকাপাতে তবু একটু রস জমিত। তারপর সুকুমার ও ললিতার প্রেমালাপ গল্পের সৌকুমার্য্যের হানি করিয়াছে।—শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ীর "চাঁদের কলঙ্ক" গল্পে, ভাল গল্পের উপাদান আছে। লেখকেরও শক্তি আছে। কিন্তু গল্পে রস জমান বিষয়ে অবহিত চেষ্টার অভাবে ইহা সরস হইতে পারে নাই। ছোট গল্পের মধ্যে বাহুল্য বর্জ্জন ও সংযম একটা অপরিহার্য্য উপাদান। অপরিসর পটের উপর ছবির রস ফুটাইয়া তুলিতে হইলে রসজ্ঞ চিত্রকর বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র রসের যাহা অনুকূল তাহাই চয়ন করিবার জন্য যত্নবান, তাই ছোট গল্পে বর্ণিত বিষয় ও ভাষা উভয়ই বাহুল্য-বর্জ্জিত এবং রস ও অর্থভূয়িষ্ঠ হওয়া দরকার। এ গল্পের লেখক সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এত কথা ইহার ভিতর আনিয়াছেন যাহা গল্পের বস্তুর পক্ষে রসের স্ফুরণ হিসাবে নিষ্প্রয়োজন। অথচ নিতাই ও তার স্ত্রীর পক্ষে কুড়ানো শিশুটির উপর স্নেহ ও শত্রুর হাতে নির্য্যাতন যাহা এ প্লটের পক্ষে আসল জিনিষ, তাহা ভাল ফুটিয়া ওঠে নাই। আর, যে করুণ রস লেখক উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া না জমিবার আর একটা হেতু, গল্পের অসম্ভাব্যতা। ভাজা বেচিয়া খায় যে নিতাই সে পথের ধারে কুড়ানো ছেলে মানুষ করিতেছে বলিয়া যে হঠাৎ গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া তার উপর নির্য্যাতন করিতে

আরম্ভ করিল, এ কথাটা এতই অসম্ভব যে ইহাতে রসোদ্বোধনে বাধা হয়। তাদের শত্রুতার কোনও গূঢ়তর সম্ভব হেতু আবিষ্কার করা অসম্ভব হইত না। এই পথে কুড়ানো শিশুর মৃত্যুতে শশী সরকারের বিশেষ স্বার্থকল্পনা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু লেখক তেমন কোন যথেষ্ট কারণ না দেওয়ায় গল্পের রসভঙ্গ হইয়াছে। —শ্রীমতী রাধারাণী দত্তের "দাবীহারা", গল্প ও কাব্যের মাঝামাঝি—কিন্তু অপসর্গ নয়। এ চিত্রে রসের প্রাচুর্য্য আছে—নারী হৃদয়ের অপরূপ মাধুরী ইহাতে ক্ষরিত হইয়াছে। লেখিকার ভাষায় জোর আছে।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

"প্রবাসী"তে দুটি ছোট গল্প আছে, দুটিই সুন্দর ও উপভোগ্য। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "বিয়ের ফুল" গল্পের বিষয় বস্তুটির ভিতর বিশেষ নূতনত্ব নাই—এই ধরণের গল্প অনেক আছে। কিন্তু গল্পটি বেশ লঘু হস্তে লেখা, আর জমিয়াছেও ভাল। সে কালে শ্রীমতীর রাগোদ্রেক হইয়াছিল নাম শুনিয়া, পরে বাঁশী শুনিয়া। এ গল্পের নায়কের রাগ জন্মাইল, কন্যা ম্যাট্রিক পাশ শুনিয়া। এ পূর্ব্বরাগ আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয় মোঃপিষ্ট বাঙ্গলা দেশে বিরল নহে। নায়কের বাসনা আছে সাহস নাই—চক্ষুলজ্জার বাধা বড় বাধা—তাই তিনি ছল করিয়া মেয়ের বাপের বাড়ীতে গিয়া বৃষ্টির ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা ও ততোধিক উদ্বেগের পর তাঁকে মুক্তিদান করিল এক অপরিচিত যুবক আসিয়া—সে তাঁকে তার আকাঙ্ক্ষিতের বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু—পরিচয় পাইলে নায়ক জানিল যে তার এই দেবদূত সদৃশ ত্রাণকর্ত্তা আর কেউ নয় তার আকাঙ্ক্ষিতারই নববিবাহিত স্বামী! লেখক গল্পটী বলিয়াছেন বেশ কৌশলের সহিত, আদ্যোপান্ত বেশ কৌতুহল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আর সমাপ্তিটিও সুন্দর হইয়াছে।—শ্রীযুক্ত সুশীল মিত্রের "ভোলা" গল্পটি উপভোগ্য, সুকৌশলের সহিত গল্পটি বলা হইয়াছে! ভাষা ও ভাব বেশ ঝরঝরে, তাজা। কিন্তু কোলোর সঙ্গে হীরুর সৌহার্দ্দ্যের চিত্র সুন্দর হইলেও গল্পের ভিতর খাপছাড়া হইয়াছে। ইহাকে গল্পের সঙ্গে মানাইতে হইলে ইহার একটা ধারা শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইলে ভাল হইত। হীরুর চরিত্র চিত্রণে এ অংশের সার্থকতা আছে, কিন্তু ছোট গল্পের ভিতর চরিত্রকে বিশদভাবে ফুটাইবার অবসর নাই—গল্পের উপজীব্য যে সংক্ষিপ্ত ঘটনা বা বিষয় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যতদূর চরিত্র বিকাশ সম্ভব তাহারই ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতে পারে।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

"ভোলাদা'র ঘটকালি" লেখকের নাম-শূন্য ছোট চুটকী, বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে লেখা। গল্পের ভিতর কিছু বিশেষত্ব নাই কিন্তু বলিবার ভঙ্গী ভাল। মোটের উপর উপভোগ্য। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "বাঙ্গালীর বিবাহের" ভিতর বোধহয় কোনও গভীর সঙ্গীত শাস্ত্রের তত্ত্ব নিহিত আছে—সে তত্ত্ব কথাটা বোধ হয় লেখকের একটি রূপক দিয়া ফুটাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ ইচ্ছার ফল যে বস্তুটি হইয়াছে তাহা গল্প তো নয়ই, তার ভিতর সাহিত্য বা সঙ্গীত বা কোনও দেশের কোনও রসের গন্ধ মাত্রও নাই। এবারকার বসুমতীর শোভা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্রের "সাধের কাজল।" সম্পন্ন ডোমের একটি মেয়ের একটা গরীব মাতালের সঙ্গে সাঙা করিয়া ঘর করার কাহিনী। গল্পটি সরল, আড়ম্বর শূন্য, গরীবের জীবনের একটি সত্য সুন্দর ছবি—অথচ প্রচুর পরিমাণে গল্প-রসে ভরা। শেষটা আর একটু সংহত ও সংক্ষিপ্ত হইলে রসটা জমিত ভাল। আহ্লী যদি বক্তৃতা না করিয়া কেবল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুঝাইয়া দিত যে তার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, আর তিনু ও তিনুর মা দূর হইতে মুখ বিকৃত করিয়া চলিয়া যাইত, তবে লেখকের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে সফল ও সৌষ্ঠবযুক্ত হইত। কিন্তু নারায়ণ বাবু হয় তো সাধারণ বাঙ্গালী পাঠককে বেশী চেনেন। তারা যে ইসারা ইঙ্গিতের ধার ধারে না! সূক্ষ্ম ধারার রস তাদের অন্তরে বড় একটা পৌছায় না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বোধ হয় লেখক মহাশয় "চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার" চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালী গরীবের বৈচিত্র্যহীন অলঙ্কার শূন্য জীবনে যে রসের খনি আছে নারায়ণ বাবু তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। আশা করি তিনি আরও নিবিড় ভাবে এ রসে ডুবিতে পারিবেন।

বঙ্গবাণী—জ্যৈষ্ঠ।

এমাসে "বঙ্গবাণীর" নিজস্ব গল্প দুইটি—অবশ্য ধারাবাহিক বাদে। শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের "নিয়তি" অত্যন্ত অবহেলার সহিত লিখিত—লেখকের যে শক্তি

আছে তাহা আর একটু অবহিত হইয়া প্রয়োগ করিলে গল্পটি পরম রমণীয় হইতে পারিত। গল্পের পরিসমাপ্তিতে শ্রেষ্ঠ রসের উপাদান আছে, কিন্তু আখ্যানভাগে সে সমাপ্তির যে যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জোর বাঁধে নাই। লেখকের ভাষা সুন্দর সহজ এবং রসবহুল, কিন্তু ঘটনার বিন্যাসে মনোযোগের অভাবে সমগ্র গল্পটি সরল হইতে পারে নাই। সমাপ্তির ভিতর যে তীব্র করুণ রস আছে তার সূক্ষ্ম ধারও বর্ণনার বাহুল্য দোষে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে; আর পরিশেষে তিনি যে উপদেশটুকু জোড়া দিয়াছেন তাহাতে anti-climax এর চূড়ান্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল দাসগুপ্তের "জাতিরক্ষা" গল্পটি দুই এক স্থানে সম্ভাব্যতা অতিক্রম করিলেও, মোটের উপর জমিয়াছে ভাল। গল্পটিতে লেখক একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এ বড় দুঃসাহসের কাজ। কেননা আমাদের দেশে যে সাহিত্যিক এ অসম-সাহস করেন তাঁর লেখার রসভাগটার দিকে লোকে একদম অন্ধ হইয়া তার সামাজিক তত্ত্ব লইয়া মারামারি লাগাইয়া দেয়—ফলে লেখকের রসোদ্বোধনের চেষ্টা প্রায়ই মাঠে মারা যায়। চাষার ঘরের বিধবা মেয়ে, যে কোনও দিন স্বামী চেনে নাই, আর কোনও দিনই ব্রহ্মচর্য্য জিনিষটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, তার মনের যে চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। কার্ত্তিকের সঙ্গে তার প্রেমে পড়াটা একটু হঠাৎ হইয়া পড়িয়াছে, আর কার্ত্তিকের বিবাহের প্রস্তাবটাও একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু ইহা লইয়া তার যে লাঞ্ছনা তাহা খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। কালীর শোকাবহ পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে,—এই অংশের আর একটু বিস্তার হইলে ভাল হইত। শেষে তার কার্ত্তিকের সঙ্গে দেখা ও কথাবার্ত্তা অস্বাভাবিক। এখানে চাষার মেয়ে হঠাৎ ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা মহিলা হইয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া এই শেষ সাক্ষাতের ভিতর একটা খুব নিবিড় রসের সম্ভাবনা ছিল, লেখক সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কার্ত্তিকের শেষ প্রতিজ্ঞাটা নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে লেখক, সমাজের সঙ্গে আপোষের একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ ইহাতে রসভঙ্গ হইয়াছে। এই কথাটা আর একটা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া সেখানে বেশ সঙ্গতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দেওয়া যাইত। হঠাৎ এত সংক্ষেপে কথাটা এইখানেই সারিয়া দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না, বরং এটুকু বর্জ্জন করিলে কোনও হানি হইত না।

চিত্র

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

"বনের পাখী"—শিল্পী শ্রীমতী গৌরী বসু। তিন বর্ণের প্রাচ্যকলাসম্মত আনুষ্ঠানিক (decorative) ছবি। কাঁচা হাত। বর্ণের বৈচিত্র্য নাই; রেখার সমন্বয় অল্পই আছে। গাছের ডালে যে পাখীটি বসিয়া আছে, দুই হাতে আহার্য্য লইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বালিকার সন্তর্পণে গমনের ভাবটি সুন্দর। এই শিল্পী যদি এই প্রকার চিত্র-কলার মূল কথাটা উপলব্ধি করিয়া অঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন তবে সাফল্য লাভ করিবেন।

"ময়ূর-ভঞ্জের আলপনা"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ বসু। প্রবন্ধের সহিত আলপনার যে ছবি দিয়াছেন তাহা উপভোগ্য এবং অনুকরণীয়। অধ্যাপক মহাশয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "এই যে শিল্পের নমুনা পাচ্ছি, এটি হচ্ছে জন-সাধারণের সম্পত্তি।" কথাটা সত্য। এই প্রকার শিল্প রচনা প্রত্যেক গৃহস্থের সাধ্যায়ত্ত। দুখের বিষয় এই যে আজ-কাল আমরা শিল্প বলিতেই নিষ্কর্ম্মা মানুষ এবং টাকার থলির কথাই মনে করি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ও দুটো বাদেও শিল্প বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে; এমন কি প্যালিওলিথিক যুগের (প্রায় ৫০০০০ বৎসর পূর্ব্বের) বর্ব্বর মানুষ এমন রঙ্গীন ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে যাহা দেখিয়া আজ আমরা চমৎকৃত হইতেছি।

"সুতা কাটা ও গুণ টানা"—শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল। রেখা চিত্র। রেখা-ভঙ্গী ও ভাব আছে। উপভোগ্য।

"সাঁঝের গঙ্গা"—শিল্পী শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কোলে। তিন বর্ণের বাস্তব ছবি। বিশেষত্ব বিহীন। রচনার compositionএর অভাব। ধারণ (asmosphere) সামান্য চেষ্টা করিলে থাকিতে পারিত। শিল্পীকে কিছুকাল ধরিয়া landscape নিরীক্ষণ করিতে এবং পরে রং লইয়া কসরত করিতে অনুরোধ করি।

"প্রণতি"—শিল্পী শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র। রেখা চিত্র। অ্যানাটমি ও টেক্‌নিকের বিশেষ অভাব। রেখা চিত্রের টেক্‌নিকের মূল কথাটা এই যে, রেখায় ক্ষীণতা এবং স্থূলতার ভাব ও perspective উভয়ই বিকশিত

হয়। দুঃখের বিষয় এই শিল্পী এই টুকুও উপলব্ধি করেন নাই। কিছুকাল ধরিয়া বাস্তব পদার্থের স্বরূপ প্রতিকৃতি তিনি যদি রেখায় অঙ্কন করেন তবে সমধিক সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

"পূর্ণিমা"—শিল্পী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র। তিন বর্ণের ছবি। প্রাচ্যকলা এবং বাস্তবের সংমিশ্রণ। অ্যানাটমি এবং বর্ণ সমন্বয়ের অভাব থাকিলেও ভাব আছে, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ্য। ছবির নামের সার্থকতা রক্ষা হইয়াছে কি না সন্দেহ। যুবতী যুবকের স্কন্ধে মাথা রাখায় যুবতীর মুখের উপরের অংশ ঢাকা পড়িয়াছে। আমাদের মতে ইহার উল্টা হওয়া উচিত ছিল।

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—বন মাঝে কি মন-মাঝে" —শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল। প্রাচ্য-কলা সম্মত। রেখায়, বর্ণে, ভাবে উপভোগ্য।

"অন্তঃপুরিকা"—শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির। কালি কলমের (pen and ink) ছবি। অনেক অভাব। এই প্রকার ছবি আঁকিবার একটা বিশেষ টেক্‌নিক্ আছে। শিল্পীকে একবার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এবিষয়ে আলাপ করিতে এবং Harry Furnis প্রণীত Pen and Ink Drawing পুস্তকদ্বয় পড়িতে অনুরোধ করিব।

"বৌ দেখা"—শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিন-বর্ণের ছবি। বাস্তব। রেখা, বর্ণ, perspective, অ্যানাটমি ও ভাবের অভাব। যৎকিঞ্চিৎ ভাব বুড়ার হাসিতে ও বৌয়ের সলজ্জ মুখে মাত্র আছে। শিল্পীকে মডেলের সাহায্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

[উপরে আমরা অনেকবার অ্যানাটমির কথা বলিয়াছি। যে সকল শিল্পী অথবা শিল্প রচনার্থীর পক্ষে শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে, তাঁহাদিগকে Sir Alfred Fripp and Ralpr Thompson প্রণীত Human Anatomy for Art Students নামক পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রকাশক— Seely, Service and Co. Ld., মূল্য ১৫ শিলিং।]

"বসন্তের রাণী"—শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ। তিন বর্ণের ছবি। প্রাচ্যকলা ও বস্তবের খিচুড়ি। Anatomy, composition, perspective, expression প্রভৃতির অভাব। তারপর সখীগণ সকলেই নিতান্ত হাল ফ্যাসানের ফেরতা দিয়া শাড়ী পরা—অত্যন্ত আধুনিক বাঙ্গালা দেশের, অর্থাৎ আঁচল বাম কাঁধের উপর দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। কিন্তু বসন্তের রাণী পশ্চিমাঞ্চলের মহিলা। তিনি ডান কাঁধের উপর দিয়া আঁচল ঘুরাইয়াছেন! এই রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অষ্টাবক্র ঋষিকেও হার মানাইয়াছে।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

"ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব," শিল্পীর নাম নাই। তিন বর্ণের ছবি। ফটোগ্রাফ হইতে অঙ্কিত। শিল্পীর perspective জ্ঞান নাই তাহা বসিবার আসনখানি হইবে উপলব্ধি হইবে। বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য নাই।

"ভক্তি অর্ঘ্য"—শিল্পী শ্রীযুক্ত এস্, জি, ঠাকুর সিং। তিন বর্ণের ছবি। ফটোগ্রাফ রং করা। ইহাতে কোন সার্থকতাই নাই।

"শ্রীচৈতন্য ও দিগ্বিজয়ীর বিচার।" শিল্পীর নাম নাই। তিন বর্ণের ছবি, বাস্তব। ছবিখানি কিছুই হয় নাই, সব ভুল। আকাশের গ্রহটি যদি চাঁদ হয় তবে বর্ণ-বিন্যাস ও আলোক বিস্তারে ভুল আছে। যদি সূর্য্য হয় তবে আরও ভুল। Perspective আদৌ নাই। Figureএর anatomy, expression, composition কিছুই নাই। Landscapeএর সম্বন্ধে শিল্পীর কোন ধারণাই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল শিল্পী চিত্রশিল্প রচনার কোন পদ্ধতিই শিক্ষা করেন না। ইচ্ছা থাকিলেই সিদ্ধিলাভ ঘটে না, সাধনার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে।

বঙ্গবাণী—জ্যৈষ্ঠ।

"চিত্রাবলী," শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির। চারখানি কালি কলমের (pen and ink) ছবি। ড্রয়িং এবং টেকনিকের জ্ঞান নাই। ইঁহাকে যথেষ্ঠ শ্রম স্বীকার করিয়া সাধনা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্ববারেও বলিয়াছি এবং এবারেও বলিতেছি যে, শিল্পের সিদ্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শিল্পীগণ যদি বদ্ধপরিকর না হ'ন, তবে অনেক আবর্জ্জনায় আমাদের অঙিনা ভরিয়া যাইবে, এবং মাসিকপত্রের সম্পাদকগণও সে জন্য দায়ী হইবেন।

মুদ্রা পরীক্ষা।

(The Doubtful Coin-by J. F. Lewis R. A.)

ENGRAVED AND PRINTED BY

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৭শ বর্ষ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৩২ | ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রাজ-নীতি

রাজাসনে উপবিষ্ট যে সকল অদ্ভুত জীব কর্ত্তৃক ধরণী-দেবী সময়ে সময়ে ভারাক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ ছাড়িয়াছেন, দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন খিলিজি তাহাদের অন্যতম। যাঁহারা বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নীরস ইতিবৃত্ত ভুলিয়া যাইতে সচেষ্ট, কবি রঙ্গলালের এবং বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অনুগ্রহে তাঁহারাও আলাউদ্দিনকে ভুলিতে পারেন নাই।

এই অদ্ভুত জীব সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের একজন দেশীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন, আলাউদ্দিনের রাজচর্চ্চায় দুইটি কার্য্য এমত ছিল যে তদ্দ্বারাই তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

এই দুইটি কার্য্য কি? পিতার অধিক ভক্তিভাজন পিতৃব্যের শোণিতে যাঁহার রাজদণ্ড কলঙ্কিত, জ্ঞাতি ও আত্মীয়ের অপশমিত প্রাণ বায়ুর উপর যাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি যাঁহার রাজ্যলিপ্সার অন্যতম কারণ, সেই নিরক্ষর, দাম্ভিক নৃপতি এমন কি মহৎ কার্য্য দ্বারা দেশের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, যে তজ্জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার স্বর্ণাক্ষর প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে?

ঐতিহাসিক বলেন—প্রথম কার্য্য মদ্যপান নিবারণ; দ্বিতীয়—শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ। তারিখ-ই-ফিরোজসাহী হইতে জানা যায়, আলাউদ্দিন কেবল মদ্যপান নিষেধ করেন নাই, প্রকৃতই নিবারণ করিয়াছিলেন; কঠোর দণ্ড দ্বারা মদ্য বিক্রেতা ও মদ্যপায়ীদিগকে রাজ শাসনে আনা হইয়াছিল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে দ্যূত ক্রীড়াও নিবারিত হইয়াছিল, মত্ততাজনক ঔষধের পর্য্যন্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদ হইতে বহুমূল্য মদিরা পূর্ণ মহার্ঘ সুরাপাত্র রাস্তায় আনীত ও চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, গুপ্তচরের সহায়তায় আমীর ওমরাহগণের মদ্যপ্রিয়তা সম্যকরূপে নিরাকৃত হইয়াছিল; শস্য, রাজার নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রীত হইত, কোনও বিক্রেতা সেই দর অতিক্রম করিলে তাহার কঠোর রাজদণ্ড ঘটিত। সম্রাট্ তাঁহার নিজ জমিদারী হইতে করস্বরূপ শস্য গ্রহণ করিতেন, এবং বৃহ

শস্যশালা স্থাপন করতঃ আবশ্যক মত প্রজার নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয় করাইতেন। রাজ-শাসনে নাকি দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কোন মহাজনেরই অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখার অধিকার ছিল না। দাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কৃষকগণ রাজনির্দ্দিষ্ট মূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিবে, বণিক্‌গণ রাজ নির্দ্দিষ্ট দরে তাহা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিবে, এইরূপ বিধান প্রচারিত হইয়াছিল। শস্যের বিদেশে প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল। পরিদর্শক ও চরের সাহায্যে এই বিভাগের কার্য্য নিরূপিত হইত।

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সমাজে, যথেচ্ছাচারিতার মন্ত্রে দীক্ষিত আলাউদ্দিনের এই স্তুতিবাদ শুনিয়া, এত কালের পাশ্চাত্য অর্থনীতির ফল সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক।

প্রচলিত ইতিহাসে কিন্তু দেখিতে পাই আলাউদ্দিনের এই দুইটি কার্য্যই স্বার্থপ্রণোদিত। নরহত্যা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারা সিংহাসন লাভ করিয়া আলাউদ্দিন চারিদিকেই ষড়যন্ত্র দেখিতে পাইতেন। মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, পদস্থ ব্যক্তিগণের একত্র আমোদ প্রমোদই এইরূপ ষড়যন্ত্রের সহায় এবং সুরাই এইরূপ আনন্দোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—অতএব সুরা পান বন্ধ করিতে হইবে। ক্রমে পদস্থ ব্যক্তির ইচ্ছামত বন্ধু বান্ধবকে সম্বর্দ্ধনা করার অধিকারও লুপ্ত হইল। রাজা বা উজিরের অনুমতি ব্যতীত গৃহে নিমন্ত্রণ ব্যাপার পর্য্যন্ত চলিত না। সৈন্যগণের বেতন হ্রাসই শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণের কারণ। খাদ্যদ্রব্য সুলভ করিতে না পারিলে অল্প ব্যয়ে সামরিক বলের প্রতিষ্ঠা করা যায় কিরূপে? সুতরাং শস্যের, গবাদি জন্তুর ও অন্য বিবিধ দ্রব্যের দর রাজশাসনে নির্দ্দিষ্ট হইল, দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করা হইল, মহাজন কর্ত্তৃক অধিক পরিমাণ দ্রব্য সংগ্রহ নিষিদ্ধ হইল, দোকান বন্ধ করিবার ও খুলিবার সময় নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইল, গুপ্তচর ঘুরিতে লাগিল ইত্যাদি। ইতিহাসে পাই, ইহার ফলে দেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় মূর্খ নৃপতিকেও মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে শাসন দণ্ড শিথিল করিতে হইয়াছিল।

এই বৃত্তান্ত ঘটিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। যদি স্বীকার করা যায় যে, আলাউদ্দিনের উভয় কার্য্যই সদিচ্ছা-প্রসূত, তাহা হইলেও ইহাতে তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য স্বর্ণাক্ষর অনুসন্ধান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। ইহার পদে পদে প্রজার স্বাধীনতার প্রতি অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অর্থনীতির সহিত বর্ব্বরোচিত বিরোধ। যে দেশে সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা ও গুরুপত্নী গমনের সহিত এক বন্ধনীতে মহাপাতক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, সে দেশেও রাজশাসন দ্বারা ইহার নিবারণ রাজনীতি-সঙ্গত নহে। হিন্দু আমলেও এই মহাপাতক রাজশাসনে নিবারিত হয় নাই। মদ্যপান সকল অবস্থাতেই এবং সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই পরিহার্য্য কিনা সে বিষয়েও মতভেদ আছে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ মদ্যপায়ীর ওকালতী গ্রহণ না করিয়াও ইহাকে বৈধ উপভোগ (Legitimate indulgence) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে সুরাদেবীর সেবক বলিতে বোধ হয় কেহই সাহসী হইবেন না। তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সেবক, তাই রাজশাসনে সুরাপান নিবারণের পক্ষপাতী হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান কালে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ রাজশাসনে সুরাপান নিবারণের প্রয়াসী হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রক্রিয়া অন্যরূপ, এবং ফলাফলও এখন পর্য্যন্ত অনিশ্চিত।

সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ আরও গুরুতর অপরাধ। দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক নিয়মাবলী দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিলে যে বিভ্রাট জন্মে তাহা কৃষক, বণিক ও ক্রেতা সকলের পক্ষেই অপকার জনক। যে মূল্যে কৃষকের শস্য বিক্রয় করিবার অধিকার আছে, তাহার কম মূল্যে তাহার দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিলে সে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে যত্নশীল হইবে কেন? উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া গেলে রাজা বলপূর্ব্বক সেই মূল্য কম করিয়া দিলে অভাব বৃদ্ধি না পাইয়া কখনও কম হইতে পারে না। বণিক্ যদি জানে, তাহার লাভালাভ অব্যবস্থিত-চিত্ত রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, নিজের চেষ্টা বা

দূরদর্শিতার উপর নহে, তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদানই বা সুশৃঙ্খল ভাবে চলিবে কেন? কৃষক ও বণিকের অবস্থা যেখানে সন্দেহে দোলায়মান সেখানে ক্রেতারই বা ইচ্ছামত দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা কি? যে দেশে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, সেখানে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কম রাখিবার চেষ্টা প্রজার পক্ষে হিতজনক কি অহিতজনক তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজা যতই দুর্দ্ধর্ষ ও শক্তিশালী হউন না, বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রোধ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল করিতে গেলে বিস্তৃত রাজ্যে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য। আলাউদ্দিনের এই উচ্ছৃঙ্খলতা যে কত ধনী ও দরিদ্রের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল, তাঁহার প্রকাশ্য পরিদর্শক ও গুপ্তচর যে কত প্রকাশ্য ও গুপ্ত অত্যাচার দ্বারা প্রজার রক্ত শোষণ করিয়াছিল তাহা অনুমানের বিষয়।

প্রত্যক্ষ ফলাফল ছাড়িয়া দিলেও রাজার এইরূপ যথেচ্ছাচারিতায় যে দেশের কতদূর সামাজিক ও নৈতিক অবনতি হয় তাহা ইতিহাস পাঠকের ভাবিবার বিষয়। প্রজার রক্ষা ও উন্নতির জন্যই রাজা। এবিষয়ে প্রাচী প্রতীচীর লক্ষ্য একদিকে হইলেও, পন্থা বিভিন্ন। প্রাচ্যরাজার প্রধান কর্ত্তব্য প্রকৃতিরঞ্জন হইলেও, সাধারণতঃ তিনি আপনার ও অপরের প্রভু; তাঁহার দেশেই উপন্যাসকারের লেখনী, নিত্য নব পরিণীতা পত্নীর প্রাণবধ লিপিবদ্ধ করিবার অধিকারী। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের শাসন তাঁহাকে অনেকটা নিয়মিত রাখিয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র প্রাচীন যুগে সাধারণতঃ তাঁহার ইচ্ছা অপ্রতিহত, আইন তাঁহার মুখের বাক্য। তিনি ইচ্ছা করিলে অনেক উপকার সাধন করিতে পারিতেন, সদবুদ্ধি-প্রণোদিত হইলে প্রজাকে অনেকটা যথেচ্ছ আহার বিহারের অধিকার দিতে পারিতেন; কিন্তু আত্মম্ভরী ও যথেচ্ছাচার-প্রিয় হইলে তাঁহার সদিচ্ছাও সুক্রিয়ার মধ্যে অনেক দুষ্ক্রিয়া আনয়ন করিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি অন্যরূপ। গ্রীস্ হইতে যে সভ্যতার উৎপত্তি, সে সভ্যতা রাজাকে প্রজারঞ্জক হইতে কেবল বলে না, বাধ্য করে। পাশ্চাত্য জগতে যে রাজনীতির বিকাশ তাহার মূলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এরিষ্টাইডিস্ ও পেরিক্লিস্, আলফ্রেড্, এলিজাবেথ ও গ্লাড্‌ষ্টোন্, ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম্ লিঙ্কন,—আর নাম করিতে চাহিনা, এই রাজনীতির ফল। পাশ্চাত্য নীতি মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে—আলাউদ্দিনের অনুসৃত নীতি তাহাকে দাসে পরিণত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। প্রাচ্য রাজার বিধি ব্যবস্থা সমালোচনা করিতে গেলে প্রধানতঃ দেখা উচিত তিনি প্রজাকে মানুষ করিতে কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়া তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে কতদূর যত্নবান্ হইয়াছেন; তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া শরীরের মধ্যে বলপূর্ব্বক কি ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাহা দেখা ততদূর আবশ্যক নহে। আলাউদ্দিনের যে দুই ব্যবস্থা প্রশংসিত হইয়াছে, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাহা প্রচারিত হইলে হয়ত প্রথম চার্লসের ব্যাপার অভিনীত হইত। ইতিহাসে রাজার ব্যবস্থার সমালোচনা করিতে গিয়াও তাঁহার পন্থার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিতে পারিনা কেন?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নগবালা

(উপন্যাস)

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পুনর্যাত্রা।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালী ষ্টেশনে যাইয়া এক্সপ্রেস গাড়ী থামিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ আপনার দ্রব্যাদি লইয়া সেই স্থানেই অবতরণ করিল; দিল্লী যাইল না। বালীতে অবতরণ করিবার জন্যই সে টিকিট কিনিয়াছিল; দিল্লী যাইবার টিকিট ক্রয় করে নাই। বালী পর্য্যন্ত যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল; এরূপ উদ্দেশ্যের আমরা দুইটি কারণ বুঝিতে পারি। স্নেহময় পিতাকে প্রবঞ্চিত করা এবং তাহার পাপের বোঝা আরও ভারি করা তাহার বালী অবতরণের কারণ ছিল।

পরে, কিছুক্ষণ পরে বালী ষ্টেশনে হাওড়া অভিমুখী অন্য গাড়ী আসিলে সে হাওড়ার টিকিট কিনিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া বেলা ১১টার পূর্ব্বেই পুনরায় হাওড়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল এবং এবং একখানি ট্যাক্সী ভাড়া করিয়া মনোরথ গতিতে জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে পৌছিল।

কিন্তু এবারও সে প্রিয়তমার দর্শন সুখে বঞ্চিত হইল। মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে গভীর দিবানিদ্রায় বিভোর দেখিয়া, শুভ সুযোগ বুঝিয়া প্রেমময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দ্বিপ্রাহরিক প্রেমানুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। দিল্লী খোট্টার দেশ, সেই শুষ্কদেশে কি নদনদী-সঙ্কুলা শস্যশ্যামলা নানাবিধ সুরভি কুসুম কোমলা বাঙ্গালার মত প্রেম এমন সহজ লভ্য? জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে, বোধ হয়, সেইরূপ একটা সন্দেহের উদয় হইয়া থাকিবে; তাই বহুদিনের জন্য দিল্লী প্রবাসের পূর্ব্বে সে বাঙ্গলার শেষ প্রেমবিন্দুটুকুর আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। সে জানিত না যে, জ্যোতিঃপ্রকাশ এই ভাদ্রের তপ্তরৌদ্রে, সম্মুখে রাত্রি জাগরণের আশঙ্কা রাখিয়া আপন নিভৃত বাটীতে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে না,—তাহারই পশ্চাতে তাহাদেরই বাটীতে ছুটিয়া আসিবে। জানিলেও সে জ্যোতিঃপ্রকাশকে একটুও ভয় করিত না। কি? দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বামিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া, তাহার স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর, তাহার স্বাধীন মনুষ্যত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিবার তাহার কি অধিকার আছে?—সে অধিকার ত সে তাহাকে দেয় নাই। যদি বিবাহের সুকঠিন নিগড়ে বন্ধন করিয়া স্বামী তাহার প্রেম-লীলায় বাধা দিবে, তবে ভগবান কোমলা স্ত্রীজাতিকে কেন অসীম প্রেমময়ী করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন? যদি নব্যাগণ অবাধে প্রেমলীলা করিতে না পারিবে, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য মানব-সমাজ স্ত্রীজাতির উপর এই অস্বাভাবিক ও এই নারকীয় অত্যাচার নিরাকরণ করিবার জন্য কেন তবে তীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিয়া পৃথিবীমাঝে বিচরণ করিতেছেন? পতিভক্তি বড় বটে, কিন্তু প্রেম তাহা অপেক্ষাও অনেক বড়। যেখানে পতিভক্তি নির্ম্মল প্রেমের অন্তরায়, সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ী সুশিক্ষিতা হইয়া কেন হীনতরা পতিভক্তিকে প্রশ্রয় দিবে?

সুতরাং পত্নীপ্রেমলোলুপ জ্যোতিঃপ্রকাশ দাসী মুখে প্রিয়তমা জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তর্দ্ধানের বিষয় অবগত হইয়া, আপনাকে সুশিক্ষিত জানিয়া এবং স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত পোষক ও সুসভ্য বুঝিয়া, বিনা বাক্যে প্রেমময়ীর এই অনুপস্থিতি-সংবাদ সহ্য করিতে বাধ্য হইল। সে সেই প্রিয়তমা-বিহীন নীরস বাটীতে বসিয়া থাকিতেও বাধ্য হইল। দিল্লী গমন এবং কলিকাতায় অবস্থান, এই দুইটার মধ্যে এমন অসম্ভব অসঙ্গতি ছিল যে, সে বাহিরে যাইয়া বন্ধুকুল ও পিতৃকুলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসী হইল না।

দুর্ব্বিষহ ও দীর্ঘ বেলার অবসান হইলে—অর্থাৎ নিদ্রাতুরা মাতাঠাকুরাণীর দিবানিদ্রা ভঙ্গ হইবার কিছু পূর্ব্বে, জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বাটী ফিরিয়া আসিল। বাটীতে আসিবার তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তাহার সমস্ত মুখে তখন আনন্দের আলোক মাখান ছিল, কিন্তু বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহার সেই বিশেষ কার্য্যের বাধাস্বরূপ অযাচিত স্বামীকে দেখিবামাত্র তাহার মুখমণ্ডলের সেই আনন্দালোক নিভিয়া গেল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে রঞ্জিত অধরে প্রেমমধু সঞ্চিত ছিল, তাহা এক্ষণে বিষম বিরক্তিতে শ্মশান ভস্মের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল; সেই রঞ্জিত কপোলের আলোকোচ্ছ্বাস যেন সহসা বিরক্তির অন্ধকারে পরিণত হইল। সেই বিশুষ্ক অধর লইয়া এবং সেই অন্ধকারপূর্ণ মুখ লইয়া সে স্বামী জ্যোতিঃপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি এখনি ষ্টেসনে যেতে হবে? তুমি এত আগে এলে কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রিয়তমা পত্নীর মধুর বাক্যসুধা পানে, নিঃসঙ্গভাবে দীর্ঘ দিবাযাপনের ক্ষোভ নিবারিত করিয়া এবং তাহার বালী যাত্রার অভিনয় গোপন রাখিয়া কহিল, "আমি বারটার আগেই তোমার সঙ্গে গল্প স্বল্প কর্‌বার জন্যে এখানে এসেছিলাম; সেই পর্য্যন্ত তোমাকে না পেয়ে এইখানেই বসে আছি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বামীর প্রচ্ছন্ন তিরস্কারকে কিছু মাত্র ভয় করিল না; স্বামী ত ভয় করিবার জিনিস নয়। তাহাকে কেবল মাত্র, সে, তাহার যৌবন উদ্যানের একটি নূতন ভ্রমণকারী মাত্র মনে করিত। কিন্তু অর্থদাত্রী এবং অর্থাধিকারিণী মাতার তিরস্কারকে সে স্বামীর তিরস্কারের ন্যায় অবহেলা করিতে পারিত না। সেই মাতার দিবানিদ্রার সময়, বাটী হইতে তাহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কথা, পাছে গল্পচ্ছলে জ্যোতিঃপ্রকাশ মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে, এজন্য সে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করিল। অতএব সে তাহার মনোমোহন মুখে মনোমোহিনী হাসি আনিয়া, স্বামীর গাত্র স্পর্শ করিয়া স্বামীর নিকট উপবেশন করিল; এবং মধুর কণ্ঠ প্রেমমধুতে সিঞ্চিত করিয়া অতি কোমল স্বরে কহিল, "উঃ, তুমি সেই পর্য্যন্ত একলাটি বসে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছ? তুমি যদি আমায় একটু বলে রাখ্‌তে তা হলে আমি কোথাও যেতাম না, তোমারও একলাটি কষ্ট পেতে হত না। আমার কোন দরকারী কায ছিল না; কেবল একলাটি চুপ করে বসে থাক্‌তে হবে বলে একটু বেরিয়েছিলাম।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ নব্যা পত্নীর মরালনিন্দিত গ্রীবাটি বাহুর বেষ্টনে বদ্ধ করিয়া একবার মনে করিল যে, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করে তাহার গমনস্থান কোথায়; কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিল, এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত বর্ব্বরোচিত হইবে, এবং ইহাতে হয়ত প্রিয়তমার মনে ব্যথা দেওয়া হইবে;—কারণ এরূপ প্রশ্নে একটা কুৎসিত অবিশ্বাসের ছায়া স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। অতএব সে সেইরূপ কোন প্রশ্ন করিল না; কেবল প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "আমি—আমি তোমায় কত ভালবাসি তা তুমি জান না। আমি তোমার জন্যে চার ঘণ্টা অল্প কথা, জন্মজন্ম অপেক্ষা কর্‌তে পারি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বামীর মাংসল কোমল বক্ষে মুখ রাখিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ইস্, তা আর পারতে হয় না! সে আমরা পারি। এই যে আমি বিভাময়ীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেখানে যতক্ষণ ছিলাম কেবল তোমারই কথা হচ্ছিল।"

এই কাল্পনিকী সখী বিভাময়ীর কথা আমরা পূর্ব্বে একবার বিবৃত করিয়াছিলাম, তোমাদের বোধ হয়, তাহা স্মরণ আছে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রিয়তমার গ্রীবা-বেষ্টন আরও দৃঢ় করিয়া, পত্নীর প্রেম সাগরে ভাসিতে ভাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা,—আমার কথা, তোমার বিভাময়ী সখী আর তুমি কি বল্‌ছিলে?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্য তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ মনে করিল যেন প্রেমসাগরে তরঙ্গ উঠিয়াছে। হাস্যময়ী সরল মুখে বলিল,

"আমি ত তোমার সুখ্যাত করবই ; কিন্তু বিভা যে তোমার কত সুখ্যাতি করে তা বল্‌বার নয় ; সে দিন সে মার কাছে তোমার রূপগুণের এত সুখ্যাতি কর্‌লে যে, মা মনে করলেন সেও বুঝি তোমাকে আমারই মত ভালবাসে। পাছে তুমি ওর ভালবাসা পেলে আমার ভালবাসা ভুলে যাও, আমার দিকে তোমার মন না থাকে, এই ভয়ে মা আমাকে তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌তে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তোমার সুখ্যাতি শুন্‌তে আমি এত ভালবাসি যে, আজ আবার মাকে লুকিয়ে, ওর কাছে তোমার সুখ্যাতি শুন্‌তে গিয়েছিলাম। মার বারণ শুনিনি বলে, মা হয়ত ঘুম থেকে উঠে আমায় কত বক্‌বে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ উপরিউক্ত প্রেমবাক্যের তাপে গলিয়া একেবারে তরল হইয়া গেল। সে প্রিয়তমার কাল্পনিক সখীর কাল্পনিক মুখের সুখকল্পনা করিতে করিতে সুকবির ন্যায় স্তিমিত নেত্রে কহিল, "এতে তোমার মা বক্‌বেন কেন? আর তিনি ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জান্‌তে পার্‌বেন না যে তুমি বাইরে গিয়েছিলে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বুঝিল যে স্বামীর এই বিগলিত অবস্থায়, তাহাকে ইচ্ছামত গঠিত করা যাইতে পারে। বুঝিয়া বলিল, "তুমি যদি কথাটা মার কাছে প্রকাশ করে' না ফেল তা হ'লে মা ঘুম থেকে উঠে কোন মতে জান্‌তে পারবেন না যে আমি তাঁর বারণ না শুনে, আবার বিভার কাছে, তোমার সুখ্যাতি শুন্‌তে গিয়েছিলাম।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার সুখ্যাতিপ্রিয়া প্রাণ-প্রিয়ার মুখখানি আপন বক্ষে নিপীড়িত করিয়া প্রেমভরে বলিল, "আমি তোমার এই মুখ বুকে রেখে প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, বিভাময়ীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা আমার দ্বারা কারও কাছে কখনও প্রকাশ হবে না।"

এইরূপে কার্য্য-সিদ্ধির পরেই জ্যোতির্ম্ময়ী স্বামীর বক্ষ হইতে আপন মস্তক তুলিয়া লইল এবং তাহার বাহু-বন্ধন হইতে আপন গ্রীবা মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "তুমি এই খানে একটু বস ; আমি মুখ হাত ধুয়ে আবার এখনি আসছি।" এই বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী চপলালোকের ন্যায় ত্বরিত গতিতে ত্রিতলে আপন কক্ষে চলিয়া গেল ; এবং তৎকালে আর ফিরিল না। যাইবার পথে সে নিদ্রোত্থিতা মাতাকে বলিয়া গেল, "মা, তোমার জামাই দুপুর থেকে বস্‌বার ঘরে বসে আছে। আমি এতক্ষণ তারই কাছে বসে ছিলাম ; এখন মুখ হাত ধুতে যাচ্ছি। তুমি একটু তার কাছে বসে গল্প করগে। আর বোধ হয় সে জলখাবার খাবে ; দোকান থেকে রসগোল্লা আনিয়ে রেখ।

স্বামীর জন্য দোকানের রসগোল্লার সুব্যবস্থা করিয়া রসবতী কি সরস কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল, এস, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।

তোমরা জান যে, পূজ্যা শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী কন্যার যৌতুক-বিহীন প্রেম-বিবাহে জ্যোতিঃপ্রকাশকে বার শত টাকা উপহার দিয়াছিলেন ; এবং জ্যোতিঃপ্রকাশ ঐ অর্থ প্রিয়তমা পত্নীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। পরে আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং টিকিট ক্রয় জন্য উহা হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে এই গচ্ছিত টাকার প্রায় আট শত টাকা জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট অবশিষ্ট ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী আপন কক্ষে যাইয়া অতি সত্বর আপন প্রসাধন কার্য্য সমাধা করিয়া, যে বাক্সে এই টাকা ছিল তাহা খুলিল ; এবং তাহা হইতে পাঁচখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া লইল। বস্ত্রাভ্যন্তরে ঐ নোটগুলি গোপন করিয়া সে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে এবং অন্যের অলক্ষ্যে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত সরু অন্ধকার গলিমুখে কৃষ্ণকমল উদগ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অভিলষিত অভিসারিকাকে সমাগতা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "মাই ডিয়ার, এত দেরী করলে কেন? আমি একেবারে ডিস্পেয়ার হয়ে গিয়েছিলাম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আপন ভ্রাম্যমান নয়নের দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া অগ্রে দেখিয়া লইল যে গলিটি সম্পূর্ণ জনশূন্য বটে। পরে কহিল, "তুমি আমায় যখন নিয়ে

গিয়েছিলে, সেই সময় আপদটা কোত্থেকে এসে আমার জন্যে আমাদের বাড়ীতে বসে ছিল। তাকে ঠাণ্ডা করে আস্‌তে হ'ল ; তাই একটু দেরী হয়ে গেল।”

কৃষ্ণকমল ক্রোধব্যঞ্জক এমন একটা ইংরাজি বাক্য বলিল যাহার আদি অক্ষরে “R” আছে। পরে স্পষ্ট বাঙ্গলায় বলিল, “টাকাটা আন্‌তে পেরেছ ত ?”

জ্যোতির্ম্ময়ী নোটগুলি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া বলিল, “তা আর আন্‌বো না ? এই নাও।”

চিল যেমন ছোঁ মারিয়া পরহস্তগত খাদ্য কাড়িয়া লয়, তেমনি কৃষ্ণকমল নোটগুলি জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্তে দেখিবা মাত্র তাহা অতি সত্বর আপন হস্তে গ্রহণ করিল ; এবং উহা আপনার চিরশূন্য পকেট মধ্যে রাখিয়া কহিল, “Thank you my, dear” এবং অর্থদাত্রীকে আরও কিছু পুরস্কৃত করিল ; এবং অবিলম্বে গলির গোলক-ধাঁধার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

জ্যোতির্ম্ময়ী এইরূপে আপন প্রণয়পাত্রকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অর্থদানে পরিতুষ্ট করিয়া ও পরিবর্ত্তে আপনি পুরস্কৃতা হইয়া পুনরায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাটীতে প্রবেশ করিল ; এবং যে কক্ষে মাতা বসিয়া, জ্যোতিঃ-প্রকাশের সহিত বাক্য বিনিময় করিতেছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত ভালমানুষটির মত প্রবেশ করিল। এইরূপে সে আপনার দিবাভিসারের কথা স্বামীর ও মাতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে পারিয়াছিল।

তাহাকে সমাগতা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, “পাঁচটা বেজে গেছে ; আর মোটে দু'ঘণ্টা সময় তোমরা বাড়ীতে আছ ; এর মধ্যেই তোমাদের খেয়েদেয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। তোমরা তোমাদের হাতব্যাগ, হাত-বাক্স, বিছানা, ইত্যাদি গুছিয়ে নাও ; আমি তোমাদের খাবারটা ঠিক কর্ত্তে দিয়ে আসি।”

কিন্তু মাতাঠাকুরাণী এই কথা মত খাবার ঠিক করিতে গেলেন না ; অতঃপর আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সংসার-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং স্বামী-ভক্তি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেওয়া হইল তাহাতে প্রায় একঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। তারপর আহার হইল, বিদায়ের ক্রন্দন হইল এবং ট্যাক্সি আরোহণ করা হইল। তাহাতে নবদম্পতি প্রেম-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে মধুর আবেগে দুলিতে দুলিতে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল।

সেখানে কত যাত্রী জ্যোতির্ম্ময়ীর রঞ্জিত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বচ্ছটাতে মুগ্ধ হইয়া গেল। তদ্‌বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনা থাকিয়া, সচলা গোলাপ স্রকের ন্যায়, সৌরভ উদ্গীরণ করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিঃপ্রকাশকে নিগড়-নিবদ্ধ প্রিয় সারমেয়ের ন্যায় পার্শ্বে কখন বা পশ্চাতে রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পাঞ্জাব মেল দাঁড়াইয়া ছিল ; জ্যোতিঃপ্রকাশ ও জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরে ধীরে তাহাতে আরোহণ করিল। গাড়ীতে বিদ্যুৎ পাখা ছিল ; জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার সুইচ্ খুলিয়া দিল ; গাড়ীর মধ্যে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল।

যথা সময়ে পাঞ্জাব মেল ছাড়িয়া দিল। গাড়ী চলিল ; ক্রমে ছুটিল ; যেন আলোকের একটা বৃহৎ মালা বিদ্যুদ্‌বেগে নিশীথের অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছে।

গাড়ী একেবারে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া থামিল ; সেখানে দশ মিনিট কাল অপেক্ষা করিবে। প্রিয়তমা পত্নীর জন্য সীতাভোগ এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহার্থ জ্যোতিঃপ্রকাশ সত্বর গাড়ী হইতে অবতরণ করিল ; জ্যোতির্ম্ময়ী নির্জ্জন গাড়ীর মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে একাকী বসিয়া কৃষ্ণকমলের বিরহ অনুভব করিতে লাগিল। সেই সময় এমন একটা আকস্মিক ব্যাপার ঘটিল যে তাহাতে তাহার বক্ষের রক্তস্রোত প্রায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু সেই ঘটনাটা বুঝাইতে হইলে, আমাদের আর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করিতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্যারীলাল খান্না।

জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত আলাপ হইবার প্রায় চারিমাস পূর্ব্বে, প্যারীলাল খান্না নামক এক ধনী জহরৎ ব্যবসায়ীর সহিত কৃষ্ণকমলের আলাপ ঘটে। প্যারীলালের পৈতৃক বাটী দিল্লী সহরে চক বাজারে ; কিন্তু ব্যবসার

জন্য সে মধ্যে মধ্যে কলিকাতাতে অবস্থান করা সুবিধা-জনক মনে করিত। বর্দ্ধমানেও তাহার আত্মীয় জন বাস করিত; সেখানেও কখন কখন যাইয়া কিছু কিছু কেনা বেচা করিত।

একদিন কৃষ্ণকমলের অর্থের অত্যন্ত অসদ্ভাব হইয়াছিল। অর্থের অভাব তাহার প্রায়ই হইত; কিন্তু এবারের অভাবটা অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার সমস্ত চতুরতা লইয়া নিজের নিকট হইতে বা মাতার নিকট হইতে এই অভাব নিবারণ করিতে পারিল না। তখন কৃষ্ণকমলের প্যারীলালকে মনে পড়িল। একদিন প্যারীলাল ইডেন উদ্যানে জ্যোতির্ম্ময়ীকে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে দেখিয়া, তাহার দীপ্ত রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং কৃষ্ণকমলকে বলিয়াছিল যে, যদি জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতে পারে এবং একটা গান শুনাইতে পারে, তাহা হইলে সে তাহাকে নগদ একশত টাকা দিবে। এক্ষণে এই অভাবের সময় সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে অনুরোধ করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রথম কৃষ্ণকমলের এই লজ্জাকর প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই; কিন্তু অবশেষে তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া এবং ইহাতে কোন প্রকার দোষ বা অন্যায় আচরণ করা হইবে না, এইরূপ তাহাকে বুঝাইয়া বলায় সে তাহার প্রাণাধিক প্রণয়াস্পদকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এবং অর্থের অসহ্য দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, সুন্দর বলিষ্ঠকায় পূর্ব্বদৃষ্ট প্যারীলালের সহিত পরিচয় করিতে এবং তাহাকে তাহার মধুর কণ্ঠের একটা গান শুনাইতে সম্মতা হইয়াছিল। এই পরিচয়ের ও সঙ্গীতালোচনার স্থান হইয়াছিল, প্যারীলালের বাসার একটি সুসজ্জিত কক্ষ।

জ্যোতির্ম্ময়ী কৃষ্ণকমলের সহিত একদিন সেই সুসজ্জিত ও সুগন্ধামোদিত কক্ষে যাইয়া, হাসি মুখে প্যারীলালের সহিত পরিচয় করিল এবং তাহাকে মধুর সঙ্গীতালাপে পরিতুষ্ট করিল এবং বুঝিয়া আসিল যে, শ্রীযুক্ত প্যারীলাল খান্না অর্দ্ধ উর্দ্দূ মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিলেও, একজন প্রেমিক পুরুষ এবং যথেষ্ট হীরা মুক্তার অধিকারী।

ইহার পর আরও দুই একদিন জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত ইডেন উদ্যানে প্যারীলালের শুভ সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল ও কিঞ্চিৎ হাস্য বিনিময়ও হইয়াছিল।

কিন্তু আজ তাহাকে আপন গাড়ীতে সমাগত দেখিয়া মহাতঙ্কে জ্যোতির্ম্ময়ীর ধমনী মধ্যে শোণিত-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল; বুঝি হৃৎপিণ্ডের ঘাতপ্রতিঘাতও থামিয়া আসিল।

পাঞ্জাব মেল যখন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দশ মিনিট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এবং জ্যোতিঃপ্রকাশ যখন পত্নীকে নির্জ্জন গাড়ীতে রাখিয়া প্লাটফরমে নামিয়া দ্রব্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল এবং জ্যোতির্ম্ময়ী যখন অনন্যমনা হইয়া কৃষ্ণকমলের অগাধ প্রেমের বিষয় চিন্তা করিতেছিল, তখন প্যারীলাল দুইটা কুলির মাথায় দুইটা বড় বড় ট্রাঙ্ক লইয়া সহসা গাড়ীর মধ্যে আবির্ভূত হইল; এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচিত মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে চিনিয়া, একটা ভবিষ্যৎ আনন্দলাভের আশায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বলিল, "সেলাম বিবি সাহেব, কোথা যাওয়া হোবে?"

পূর্ব্বে যেমন প্যারীলালের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখমণ্ডলে শারদ জোৎস্না রাশির মত হাস্যরাসি উছলিয়া পড়িত, তাহার সহিত গাড়ীতে সেই অপ্রত্যাশিত দর্শনে সেরূপ কিছু হইল না; বরং ধুপ ধাপ পদধ্বনি তুলিয়া একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা তাহার হৃদয় মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহার কোমল হৃৎপিণ্ডের উপর নৃত্য করিতে লাগিল।

হায়, শিক্ষিতা ও সভ্যা বরনারীর এইরূপ আশঙ্কিতা হইবার কারণ কি? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্যোতির্ম্ময়ী আপনার সুশিক্ষিত ও নব্য স্বামীকে কিছু মাত্র ভয় করিত না। তবে কি কারণে সে এমন সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিল? সে প্যারীলালের কক্ষে যাইয়া গীত গাইয়া যখন তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিল, তখন তাহার প্রেমপাত্র কৃষ্ণকমল তাহার নিকটে বসিয়া থাকিলেও, সে নিতান্ত সাধু নয়নে প্যারীলালকে নিরীক্ষণ করে নাই; প্রেম কল্পনা তাহার কটাক্ষ তলে লুক্কায়িত ছিল। এই গুপ্ত পাপই তাহাকে আশঙ্কিত করিয়াছিল।—পাপ চিরকালই প্রকাশিত হইবার ভয় করে।

কতক্ষণ পরে সে কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "নমস্কার খান্নাজী ; আমি আমার স্বামীর সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছি।"

স্বামীর কথায়, অধিকন্তু তাহার সঙ্গে-থাকিবার কথায়, প্যারীলালের হর্ষ অনেক পরিমাণ খর্ব্ব হইয়া গেল ; তথাপি একটু বিদ্রূপের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া, উও কৃষ্ণাকোমল বাবুকো ছোড় দিয়া ? আব সাদী কর্‌কে উস্‌কো সাথ দিল্লী যাচ্ছে ? চলিয়ে ; হামি ভি দিল্লী যাচ্ছে ; উহাঁই হামারা মকান্ হায়।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আপন সুকণ্ঠে সাধ্যমত মিনতি করিয়া কহিল, "দেখুন, খান্নাজী, আমার স্বামী বড় লাট সাহেবের আপিসে বড় কায পেয়ে দিল্লী যাচ্ছেন।"

প্যারীলাল বাধা দিয়া বলিল, "উও হাম জানে। বাঙ্গালী নোক্‌রী ছোড়্‌কে দুস্‌রা কামমে হামারা মুলুক মে নেহি যাতা হায়।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার স্বামীর সঙ্গে আজ আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। বল্‌বো, আপনি আমার মার কাছে অনেকবার জহরৎ বিক্রী কর্ত্তে গিয়েছেন ; তাই আপনার সঙ্গে আমাদের অনেক দিন থেকে আলাপ আছে।"

প্যারীলাল একটু হাসিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, সমঝ্ লিয়া। হাম সব ঠিক কর লেগা। কুছ ভয় নেহি তুমারা বিবি সাহেব। লেকেন হামারা উপর ভি থোড়া মেহেরবাণী রাখিয়েগা !"

জ্যোতির্ম্ময়ী এত সহজে হৃদয়াতঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার আহ্লাদিত হইয়া উঠিল ; আবার হাসিল ; আবার হাস্য প্রদীপ্ত সম্মোহন কটাক্ষে প্যারীলালকে অবলোকন করিল।

সেই ললিত হাস্য ও হাস্যময় কটাক্ষ দেখিয়া প্যারীলাল মনে মনে ধন্য হইল ; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে এই কটাক্ষশালিনী খাপ্‌সুরত্ ঔরতের যাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট না হয় সে সেই মত কার্য্যই করিবে। সুন্দরীর সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সে অন্য বেঞ্চে উপবেশন করিল, এবং অন্যদিকে চাহিয়া গুণ গুণ শব্দে গান ধরিল, "কোন গলিমে গিয়া মেরা শ্যাম।"

কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তির এই মৃদু সঙ্গীত ধ্বনি থামিয়া গেল যখন জ্যোতিঃপ্রকাশ ইংরাজি পোষাকাবৃত নশ্বর বঙ্গীয় দেহ লইয়া, দ্রব্য সংগ্রহান্তর গাড়ীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। সে তাড়াতাড়িতে প্রথমে প্যারীলালকে লক্ষ্য করে নাই ; একেবারে জ্যোতির্ম্ময়ীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী কিছু সঙ্কুচিত হইল, সেই সময় সে প্যারীলালকে অপর বেঞ্চে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইল; তাহার বৃহৎ ট্রাঙ্ক দুটিও দেখিল। রাত্রে অন্যারোহী-বর্জ্জিত নির্জ্জন গাড়ীতে প্রিয়তমার সহিত একত্র থাকিবার আশাও তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল।

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বামীর মুখমণ্ডলে এই বিরক্তির বিকৃতি চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, শীঘ্র উহা অপনয়ন করিবার জন্য কহিল, "তোমার ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ নেই, দিল্লীতে এঁর হীরা মুক্তার কারবার আছে। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন—প্রায়ই ইনি জহরৎ বেচতে আমার মার কাছে আস্‌তেন। এজন্য ছেলেবেলা থেকে আমরা ওঁকে খুব চিনি। উনিও দিল্লী যাচ্চেন। দেখ আমাদের দিল্লীতে একটিও পরিচিত লোক ছিল না ; ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে ; ওঁর দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ সত্বর প্যারীলালের নিকটে যাইয়া কহিল, "আজ আপনার মত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমার বড়ই আহ্লাদ হ'ল, অজানা বিদেশে একজন সহায় পেয়ে আমাদের বড় উপকার হবে।"

বাস্তবিক অপরিচিত দিল্লীতে দিল্লীবাসী প্যারীলাল খান্না নবীন দম্পতীর বড় কাযে লাগিয়াছিল। চক-বাজারে তাহার একটা ত্রিতল বাড়ী ছিল। এই বাড়ীর নিম্নতলে তাহার জহরতের দোকান ও বহির্ব্বাটী ; দ্বিতলে সে আপনি পরিবারগণ সহিত বাস করিত ;

এবং ত্রিতলে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন কক্ষ সে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া দিত। এই ত্রিতলের মহল তৎকালে খালি ছিল; সুতরাং সে সহজেই উহা নবীন দম্পতীর বাসের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারিল। দিল্লীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, এইরূপ একটি সুবিধা-জনক বাটী অপেক্ষাকৃত অল্প মাসিক ভাড়ায় প্রাপ্ত হইয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ আপনাকে বিশেষ উপকৃত মনে করিয়াছিল। অপরিচিত সুদূর বিদেশে এইরূপ ধনী ও সদাশয় ব্যক্তির সহায়তা লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ দিল্লীতে অতি সহজে বাসস্থান পাইয়া, বৃদ্ধ পিতাকে দয়া করিয়া জানাইল যে, সে নিরাপদে দিল্লী পৌঁছিয়াছে; এবং বাসের জন্য অল্প ভাড়ার একটি সুবিধা-জনক বাটী পাইয়াছে। দিল্লী হইতে পিতাকে তাহার এই প্রথম ও শেষ পত্র। ইহার পর মহাপাপী আর কখনও পিতাকে পত্র লেখে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাবণ-সন্ধ্যায়

আজি পাবন শ্রাবণ-সন্ধ্যায়
প্রভু, তোমা পানে শুধু মন ধায়;
বাধা-ব্যবধান টুটিয়া
যেতে চায় হিয়া ছুটিয়া,
আজ চির-বিরহীর চিত্ত অধীর
তব চরণে পড়িতে লুটিয়া।
হেরি এই অভিসার-পন্থায়
বাড়ে ভিতরের আলো, বাহিরের কালো
গাঢ় যত মেঘে-ঝঞ্ঝায়,
পাবন শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।

মনে হয়, প্রভু, আজি গো,
সংসার ছায়াবাজী গো।
মিছা কাযে শুধু খাটিয়া
দিন গেল বৃথা কাটিয়া
তাই এ সাঁঝের বেলা আমি যে একেলা—
বক্ষ যে যায় ফাটিয়া,
হায় তুলি কণ্টকরাজি গো
ভরেছি এ তব দুর্লভ দান
হৃদয়ের ফুলসাজি গো;
ভাঙ্গিল সে ভুল আজি গো!

তব সুন্দর ভবনে
এই ভুবনে, গগনে, পবনে,
তুমি সকলই দিয়াছ রাখিয়া
তব প্রেমের আলোক মাখিয়া
শুধু করমের দোষে সে আলো অমল
কালো মেঘে যায় ঢাকিয়া;
আহা ভক্ত জনের শ্রবণে
শ্রাবণ-গগনে বাজে মৃদঙ্গ
গুরু গুরু মেঘ-স্বননে,
—কীর্ত্তন ওঠে পবনে।

হেরি জলধর ভরা আকাশে
তব শ্যামল মূরতি আঁকা সে,
প্রভু আজি কি দাসেরে স্মরিয়া
অহেতুকী কৃপা করিয়া
হৃদয়-সরসী শ্রীপদে পরশি'
কোকনদে দিলে ভরিয়া?
তাই হয় আজি কত আশা যে!
হেরি বিজলী-ঝলক, পুলকে ভাবি গো
গোলোক-আলোক আভা সে,
টুটে বন্ধন বিনা আয়াসে।

আজি প্রেম-ধারা স্নান প্রয়োজন,
তাই শ্রাবণের এই আয়োজন,
সেই ধুলা-মলা-মাখা ধরণী—
হ'ল শ্যামলে মানস-হরণী,—
ঘোর শ্মশান সমান জ্বালাময় প্রাণ
হবে ধরাসনে শ্যাম-বরণী ;
আজি ভরসায় ভরা হয় মন
মোর নীরস জীবন সরসী এখন
হবে বরষার আগমন,
তব কৃপা-ধারা হবে বরিষণ।

এই ধারা-শ্রাবণের সন্ধ্যায়
মন যেন হারাধন পায়,
মম যৌবন-মদ-বারিধি-
তলে ডুবে গিয়েছিল যে নিধি
সেই হারাণো মণিরে পেয়েছি ফিরিয়া,
উজলি উঠিছে এ হৃদি ;
আর মরিব না লাজে শঙ্কায়,
এই জীবনের সাঁঝে হৃদয়ের সাজি
ভরিব রজনীগন্ধায়,
বুঝিনু শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজগৃহ

তিন বৎসরের পর আবার রাজগৃহে! ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম রাজগৃহ দর্শন হয়। সে বড় অল্প সময়ের জন্য,—মাত্র একদিন, দূর হইতে একবার মাত্র গিরি-শৃঙ্গগুলি অবলোকন, কুণ্ডে স্নান এবং তাহার পরই প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। তখন ই, আই, রেলওয়ের ধর্ম্মঘট (Strike) হওয়ার কথা শুনা যাইতেছিল, সুতরাং বিলম্বে বিড়ম্বনা আশঙ্কা করিয়া সত্বর ফিরিতে হইয়াছিল। হউক অল্প সময়, তবু সেই একদিনের স্মৃতি, পূর্ণ তিন বৎসরের কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও ভুলিতে পারি নাই।

রাজগৃহ পাটনা জিলার বিহার মহকুমার অধীন একটি পরগণা; বিহার সদর হইতে মাত্র ১৩॥০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম; মার্টিন কোম্পানীর বক্তিয়ারপুর—বিহার লাইট্ রেলের এইটি শেষ ষ্টেশন। রাজগৃহ পরগণা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইক্‌বাল্ আলি খাঁর বিদ্রোহের পর হুসেনাবাদের নবাবদিগের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে।

রাজ-গৃহে কি দেখিলাম তাহা বলা কঠিন। কত যুগ যুগান্তর হইতে কত সাধু সন্ন্যাসী, সাধক পরিব্রাজক য স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আমার ন্যায় সামান্য লোকের পক্ষে তাহার বর্ণনা করা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। এ যে জরাসন্ধের রাজধানী, জরা রাক্ষসীর দেশ; ইহার যে এখন কিছুই নাই, কালের কঠোর নিষ্পেষণে সকলই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, তথাপি যুগান্তের পারে বসিয়া আজও লোকে ইহার কথা ভুলিতে পারিতেছে না।

রাজগৃহের প্রাচীন ইতিহাস লইয়াই মগধের ইতিহাসের আরম্ভ এবং ইহাই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ভারতেতিহাসের প্রাচীনতম বৃত্তান্ত। ইউরোপীয়েরা যাহাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলেন, মগধের রাজা জরাসন্ধ সেই যুগেরও বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভারতের মতে জরাসন্ধ বৃহদ্রথের পুত্র। ইহাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত কৌতুক-প্রদ। দুই অর্দ্ধাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত হইলে জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহাঁর জরাসন্ধ নাম। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মাতুল কংসের বধ এবং রুক্মিণী হরণ সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাণ্ডবগণের সহিত ইহাঁর বিরোধ উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে রাজগৃহে ভীম কর্ত্তৃক মল্লযুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হন।

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর মগধে পর্য্যায়ক্রমে অষ্টাবিংশ নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল রাজার নাম ব্যতীত ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। খ্রীষ্ট জন্মের আনুমানিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে শিশুনাগ বংশের উদ্ভব হয়। এই শাখার পঞ্চম রাজা বিম্বিসার একজন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের একটি বিশেষ ঘটনা, জরাসন্ধের রাজধানীর ভগ্নাবশেষের উপর রাজগৃহ নগর নির্ম্মাণ।

বর্ত্তমানে রাজগৃহ একটি জৈন তীর্থ। ইহারই সন্নিকটে, বিহার হইতে প্রায় আট মাইল দূরে, "পাওয়া" বা অপাপপুরী গ্রামে জৈন-ধর্ম্ম সংস্কারক বর্দ্ধমান মহাবীরের তিরোভাব হইয়াছিল। এখানে একটি সুবৃহৎ হ্রদের তীরে মহাবীর সমাধিলাভ করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পাওয়া গ্রামে ভারতের নানা দেশ হইতে এত জৈন ভক্তের সমাগম হইয়াছিল যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে একবিন্দু করিয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করায় উক্ত হ্রদের সৃষ্টি হয়। জৈন তীর্থ বলিয়া রাজগৃহ গ্রামে যাত্রীদিগের বাসের নিমিত্ত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকটি প্রশস্ত ধর্ম্মশালা আছে। এই সকল ধর্ম্মশালার অবস্থা ভাল এবং ইহাতে সাধারণ যাত্রী ব্যতীত ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরও আগমন হইয়া থাকে। কয়েকটি নূতন জৈন মন্দির এবং বিশ্রাম ভবনও নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মশালা, পাহাড়ের নিকট একটি সরকারী ডাকবাংলা এবং পাহাড়ের গায়ে আমাওয়াঁ রাজের একটি বাড়ী ভিন্ন বাসের উপযুক্ত আর কোন গৃহাদি দৃষ্ট হয় না। রাজগৃহ গ্রামটি খুবই ছোট; কতকগুলি প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত পুরাতন বাটী, দরিদ্র গৃহস্থের কুটীর, গোয়ালা পাড়া, কয়েকখানি দোকান, একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস্, বিদ্যালয় এবং ডাক্তারখানা গ্রামের বর্ত্তমান সম্পদ। গ্রামের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি আদৌ রক্ষিত হয় বলিয়া মনে হইল না। তবে শুনা গেল, এখানকার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য খুবই ভাল।

যাত্রীদিগের নিকট রাজগৃহ জৈন অথবা হিন্দু তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহার প্রধান আকর্ষণের বিষয় এই যে, ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি স্থল। বিম্বিসারের রাজত্বকালে গৌতম বুদ্ধ রাজগৃহ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিতেন। এই স্থানেই তিনি অলর এবং উদ্দক নামক ব্রাহ্মণদ্বয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি ইহারই নির্জ্জন গিরিগুহা এবং গিরি-শৃঙ্গে সত্য চিন্তায় বহুদিবস অতিবাহিত করেন। গৃধ্রকূট শৃঙ্গ, বৈভার গিরি, করণ্ড-ভেলুবন প্রভৃতি স্থান তাঁহার প্রিয় আশ্রম ছিল। এই স্থানেই জৈন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক তিনি বিষাক্ত অন্ন ভোজনে আহূত হইয়াছিলেন, এই স্থানেই দেবদত্ত তাঁহার প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ স্বয়ং বৌদ্ধ নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।[১] এই স্থানেই বুদ্ধের তিরোধানের পর "সত্তপন্নি" গুহার অভ্যন্তরে প্রথম বৌদ্ধসংঙ্ঘের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, এবং উক্ত সভায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার মর্ম্মগুলি সূত্রনিবদ্ধ হইয়া দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

বিম্বিসার প্রতিষ্ঠিত রাজগৃহের ধ্বংসের পর তদীয় পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক পুরাতন সহরের উত্তরাংশে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন সহরও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে রাজা উদয় কর্ত্তৃক পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হইলে, উক্ত নগর গঙ্গা তীরবর্ত্তী এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুবিধা-জনক বলিয়া, রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজগৃহে আসিয়া দেখিতে পান যে, পুরাতন রাজগৃহ তৎকালে জনশূন্য হইয়াছে এবং নূতন সহরের অবস্থাও ভাল নয়। শেষোক্ত সহরে তখন মাত্র দুইটী বৌদ্ধ মঠ এবং বুদ্ধের ভস্মাংশের উপর অজাতশত্রু নির্ম্মিত একটী স্তূপ অবশিষ্ট ছিল। ইহারই

১। "Here, too, a Jaina ascetic made a pit of fire and poisoned the rice which Buddha was asked to eat; and it was here that Devadatta attempted to take his life, a crime for which he was punished in the Buddhist hell."—District Gazetteer, Patna, p 226.

প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ্ক সং উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, নূতন সহরও পুরাতনের অনুসরণ করিয়াছে। নগরের পশ্চাৎ-দিকস্থ প্রাচীর তখনও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বহির্ভাগের প্রাচীর তখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং তথায় মাত্র এক সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেছেন। সহরের অবস্থা শোচনীয় হইলেও তৎকালে পার্ব্বত্য-ঝরণা গুলির আশেপাশে অনেকগুলি স্তূপ লক্ষিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল স্থানে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইত।

পুরাতন রাজগৃহের বৈভব চিহ্নের মধ্যে পাহাড়ের উপরে প্রাচীন দুর্গের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাকারের ভগ্নাবশেষ সমূহই প্রধান। বৃহৎ, অসমান এবং অখণ্ড প্রস্তর রাশি একটির পর একটি করিয়া পরস্পরের বন্ধন রাখিয়া সাজান হইয়াছিল। মধ্যস্থলে সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা, চতুষ্পার্শ্বে উন্নতশীর্ষ গিরিশ্রেণী এবং তাহারই শীর্ষদেশ মনুষ্য-হস্ত নির্ম্মিত বিশাল প্রাচীর এবং মধ্যে মধ্যে দূরস্থিত শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত গম্বুজের ভগ্নাংশ গুলি আজিও দর্শকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া থাকে। গড়ের প্রাচীর স্থলবিশেষে সাড়ে সত্তর ফিট্ প্রশস্ত। যে সমান্তরাল গিরিশ্রেণী-দ্বয়ের উপত্যকাভাগে পুরাতন নগর অর্থাৎ জরাসন্ধ এবং বিম্বিসারের রাজধানী ছিল, তাহা উত্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম ভাবে লম্বিত। ইহার পূর্ব্ব ভাগের নাম গিরিয়াক পাহাড় (Giriak Range) এবং পশ্চিম ভাগের নাম রাজগির। রাজগিরের ন্যায় গিরিয়াক পাহাড়ও বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের চরণস্পর্শে পূত হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে আজিও কয়েকটি বৌদ্ধ নিদর্শন বিদ্যমান। গিরিয়াক গ্রামের ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যে পাহাড়টি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, পণ্ডিতগণের মতে তাহাই চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান্ এবং হিয়াঙ্ক সং কথিত ইন্দ্রশিলা গিরি এবং ইহারই গুহায় বুদ্ধদেব দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত বিয়াল্লিশটি প্রশ্নের সমাধান করিয়াছিলেন। গিরিয়াক গ্রামের উপকণ্ঠবাহিনী পঞ্চানা নদীর পশ্চিম তীরে উত্তরদিকস্থ গিরিশ্রেণীর উপরিভাগে একটি পুরাতন স্তূপের ভগ্নাবশেষ এবং তাহার আরও ঊর্দ্ধে কতকগুলি গৃহভিত্তি সমেত একটি চত্বর দৃষ্ট হয়। এই সকল গৃহের মধ্যে যেটি সর্ব্বপ্রধান, তাহাকে একটি বৌদ্ধ মঠ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। উহারই নিকটে প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত একটি পার্ব্বত্য পথ ক্রমশঃ পাহাড়ের ধার দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া আর একটি ভগ্ন স্তূপের সহিত মিলিয়াছে। এই স্তূপটিও উত্তর গিরিশ্রেণীর পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত এবং ইহা জরাসন্ধ রাজার আসন বা বৈঠক বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে এই স্তূপের নাম হংস সঙ্ঘারাম।২ কথিত আছে যেস্থানে এই স্তূপটি বিদ্যমান, সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধ মঠ ছিল। মঠের অধিবাসী ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন সন্ন্যাসীর মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে। ইঁহাদের একজন মস্তকোপরি উড্ডীয়মান এক ঝাঁক হংসকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "হে প্রিয়দর্শন হংসরাজ! আজ আমাদের সঙ্ঘে খাদ্যাভাব হইয়াছে। তোমরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।" এই বাক্য উচ্চারণ মাত্র একটি হংস উক্ত সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় ভিক্ষুগণ অনুতপ্ত হইয়া মৃত হংস দেহের উপরে স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, উক্ত হংস স্তূপ এবং মঠ জরাসন্ধ রাজার উদ্যান বাটিকা ছিল। ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষলতার অন্তরাল হইতে আজিও হংস সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণ প্রাচীরের অংশ সমূহ দূর হইতে নয়নগোচর হয়। হিউয়েন্থ সং বর্ণিত হংস-স্তূপ এবং বিহারের সহিত উক্ত প্রাঙ্গণের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অর্থাৎ রাজ-গৃহাভিমুখে, "গিদ্ধদ্বারী গুহা" অব-

২। "This structure is a solid cylindrical brick tower, 28 feet in diameter and 21 feet in height which originally stood about 55 feet high when surmounted by a dome; it was erected probably about 500 A. D.'—District Gazetteer, Patna; p. 211.

স্থিত। হিউয়েন্থ সং-এর বৃত্তান্তে ইহারও উল্লেখ আছে। এই খানেই পূর্ব্ব কথিত ইন্দ্র কর্ত্তৃক বুদ্ধদেব প্রশ্ন পূরণে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।৩ গিদ্ধদ্বারী গুহা একটি স্বাভাবিক ফাটল বিশেষ, ইহাতে মনুষ্যহস্ত নির্ম্মাণের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ইহাকে সাধারণতঃ জরাসন্ধ রাজার বৈঠকের সহিত সংলগ্ন সুরঙ্গ পথ বলা হয়। গিরিয়াকের নিকটবর্ত্তী বামন-গঙ্গা এবং পঞ্চানার সঙ্গম-স্থলে আর একটি প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ভগ্নস্তূপের মধ্যস্থলে মৃন্ময় গড়ের ভগ্নাবশেষ এবং নদী-গর্ভ হইতে উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কয়েকটি সোপান-শ্রেণী রহিয়াছে। ইহারই কিঞ্চিদ্দূরে উত্তর গিরি-শ্রেণীর উপকণ্ঠে, অসুর বাঁধ নামে একটি বাঁধ দেখা যায়। বাঁধ সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, উহার নিকটে জরাসন্ধের উদ্যান ছিল। এক সময়ে গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ উদ্যানের বৃক্ষলতা নষ্ট হইতে থাকায় রাজা আদেশ দেন যে, কেহ যদি এক রাত্রের মধ্যে বামন-গঙ্গার জল আবদ্ধ করিয়া উদ্যান রক্ষা করিতে পারে, তবে তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন এবং তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দান করিবেন। ঘোষণা সত্ত্বেও যখন অপর কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল না, তখন কাহার সর্দ্দার চন্দ্রাবত সদলবলে বাঁধ দিতে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই বাঁধ শেষ হইবে মনে করিয়া জরাসন্ধ চিন্তিত হইলেন; কেন না, কাহারের হস্তে কন্যাদান করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এই সময়ে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া কুক্কুটরূপ ধারণ করিল এবং রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই ডাকিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুটের ডাকে কাহারগণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, বাঁধ তখনও শেষ হয় নাই, অতএব জরাসন্ধের আদেশে শিরশ্ছেদ হইবে, মনে করিয়া মোকামা অভিমুখে পলায়ন করে। তাহাদের নিমিত্ত আটা ও ময়দার তালগুলি আজিও প্রস্তরে পরিণত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।৪

রাজগির পাহাড়ের যে স্থলে জরাসন্ধের গড় এবং বিম্বিসারের রাজধানী ছিল, তাহা একটি অসমান পঞ্চ-ভুজাকৃতি প্রশস্ত উপত্যকা; ইহার পাঁচ দিকে পাঁচটি বিভিন্ন পাহাড়, প্রধান দুইটি গিরি-শ্রেণীর অন্তর্গত। পঞ্চ পাহাড়ের নাম, যথাক্রমে (১) বিপুল গিরি, (২) রত্নগিরি, (৩) উদয় গিরি, (৪) সোনা গিরি এবং (৫) বৈভার গিরি। গিরি-পরিবেষ্টিত বলিয়া মহাভারতে রাজগৃহ গিরিব্রজপুর নামে উক্ত হইয়াছে। রাজগৃহ নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সম্ভবতঃ বিম্বিসারের রাজধানী স্থাপনের পরে প্রদত্ত হইয়াছিল। উপরিউক্ত পঞ্চগিরি ব্যতীত ছাতাগিরি নামে আর একটি শৃঙ্গ হিউয়েন্থ সং কর্ত্তৃক গৃধ্রকূট পর্ব্বত নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নিকটে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত পথ আজিও বিম্বিসারের রাস্তা নামে পরিচিত। এই রাস্তার উপরে দুইটি স্তূপ বা বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নূতন রাজগৃহ পুরাতন নগরের উত্তর দিকে প্রায় এক মাইল ব্যবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরও চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান রাজগৃহ গ্রাম ও ধর্ম্মশালা হইতে পুরাতন রাজগৃহে যাইবার পথে এই নগরের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করিতে হয়। নগরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীর কাটিয়া প্রবেশ-পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ আজিও পরিষ্কার দেখা যায়। মুসলমানগণ এবং ব্রাহ্মণগণ পর্য্যায়ক্রমে বহুদিন যাবৎ এই নগরে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত গৃহরাজির উচ্ছেদকল্পে যত্নবান্ ছিলেন।

৩। "Descending from this point on the southern face of the ridge towards the valley which separates the two ranges of the Rajgir hills, one reaches the small cave known as Gidhadwari, the position and appearance of which corresponds exactly to the cave which we find mentioned in Hiuen Tsiang's account as the scene of Indra's interrogations to Buddha." Ibid, p. 211.

৪। "The kahars, thinking it was morning and fearing the king wou'd take vengeance on them for presuming to seek the hand ot his daughter fled as far as Mokameh." Ibid, p. 212.

ঐ সকল গৃহের মাল-মসলা তাঁহাদের দ্বারা অন্যত্র নীত এবং মসজিদ ও মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে, নূতন রাজগৃহের ভূমির উপরিভাগে কোন ঐতিহাসিক চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।

রাজগৃহের গিরিগুম্ফা গুলির মধ্যে বৈভারের দক্ষিণ প্রত্যন্তে শোণ-ভাণ্ডার গুহাই প্রসিদ্ধ এবং অনায়াসগম্য। ইহার গঠন প্রণালী দেখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে বরাবর পাহাড়ের গুহা সমূহের অনুকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার উৎপত্তি কালও খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী ধরা হয়। ইহার পূর্ব্বধারে আর একটি গুহা ছিল, তাহা সম্প্রতি বিলুপ্ত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরে একটি সমতল ছোট দুর্গের ভিত্তি এবং তাহার পশ্চাতে একটি গুহা আছে। কানিংহাম্ সাহেব এই প্রস্তর দুর্গকে পিপ্পল-বাটিকা এবং গুহাকে অসুর গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধদেব উক্ত পিপ্পল-বাটিকায় বাস করিতেন। ইহার প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র কোটর লক্ষিত হয়।

কানিংহাম্ সাহেবের মতে 'সত্তপন্নি' বা সপ্তপাণি গুহা এবং শোণ ভাণ্ডার একই, কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। খুব সম্ভব শোণ ভাণ্ডার কোন জৈন সাধু কর্ত্তৃক স্ব-সম্প্রদায়ের লোকের বাসের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল।৫ এই গুহা সম্বন্ধে বেগ্‌লার, ষ্টাইন্, মার্শল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন।

উপরিউক্ত পঞ্চগিরির উপরিভাগে অনেকগুলি দেব-মন্দির বিদ্যমান। এক বৈভার-শৃঙ্গেই পাঁচটি জৈন এবং একটি শিব মন্দির দেখা যায়। জৈন মন্দিরগুলি অল্প দিনের এবং সুসংস্কৃত। ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে কোন না কোন প্রসিদ্ধ তীর্থঙ্করের পদচিহ্ন প্রস্তর খোদিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রধান চরণ যুগলের চতুষ্পার্শ্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে আরও অনেকগুলি যুগল চরণ স্থাপিত। শিব-মন্দিরটি অতি পুরাতন।

উষ্ণপ্রস্রবণ গুলির জন্য রাজগৃহ হিন্দুদিগেরও তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। বৈভার গিরি ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী বিপুলগিরির পাদদেশে সর্ব্বসমেত তেরটি প্রস্রবণ আছে। তন্মধ্যে বৈভার গিরির সাতটি প্রস্রবণের নাম, যথাক্রমে (১) গঙ্গা-যমুনা, (২) অনন্ত ঋষি, (৩) সপ্ত-ঋষি, (৪) ব্যাস কুণ্ড, (৫) মার্কণ্ড-কুণ্ড, (৬) ব্রহ্ম কুণ্ড এবং (৭) লঙ্গত কুণ্ড। বিপুলগিরির ছয়টি কুণ্ড যথাক্রমে (১) সীতাকুণ্ড, (২) সূরয কুণ্ড, (৩) গণেশ কুণ্ড, (৪) চন্দ্র কুণ্ড, (৫) রাম কুণ্ড এবং (৬) শৃঙ্গি ঋষি কুণ্ড নামে অভিহিত। শেষোক্ত কুণ্ডটি কিঞ্চিদ্দূরে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত, এবং মুসলমান দিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়া মকদুম্ কুণ্ড নাম ধারণ করিয়াছে। মকদুম শা সেখ শরীফুদ্দীন আহম্মদ উক্ত কুণ্ডের সন্নিকটে একটি প্রকোষ্ঠে একক্রমে চল্লিশ দিন যাবৎ উপবাসে কাটাইয়াছিলেন। মকদুম শা সম্বন্ধে এতদঞ্চলে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে মকদুম শাহের নামে বনের ব্যাঘ্র হিংসা ত্যাগ করে। মকদুম কুণ্ড স্থানটি অতি মনোরম। তিন বৎসর অন্তর এই স্থানে একটি বড় মেলা বসিয়া থাকে। কুণ্ডটির নামের সহিত কোন পৌরাণিক তথ্য সংস্পৃষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রস্রবণ গুলির জল উষ্ণ, তবে সকল প্রস্রবণের উষ্ণতা সমান নয়। ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে একস্থানে পাহাড়ের ভিতর দিয়া সাতটি ধারায় সর্ব্বক্ষণ অত্যুষ্ণ জলরাশি নির্গত হইতেছে। পূর্ব্বে এই সকল ধারায় স্নান করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন স্নানের ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য যে বিধি-নিষেধগুলি স্থানীয় পাণ্ডাদিগের দ্বারাই প্রযুক্ত হয়। অপরাপর তীর্থের ন্যায় এই তীর্থেও যাত্রীদিগের সহিত পাণ্ডাদিগের দক্ষিণা লইয়া বাগ্-বিতণ্ডা হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের অবগাহন স্নান অতি আরামদায়ক। উষ্ণতা প্রযুক্ত উহা বাত রোগ এবং চর্ম্মরোগের পক্ষে সুফলপ্রদ। প্রস্রবণের জলপানে অজীর্ণ রোগেরও উপশম হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

৫। "An inscription on the outside of the cave says that Muni Vairodeva made two caves for ascetics desiring to attain nirvan and that these caves are renowned on account of the Arhats."—District Gazetteer, Patna, p. 229.

পরীক্ষা দ্বারা রাজগৃহের প্রস্রবণের জলে একলক্ষ ভাগের মাত্র ৬৮ ভাগ ময়লা পাওয়া গিয়াছে। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে যখন জল অধিক নির্গত হইতে থাকে, তখন উহার উত্তাপ ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে।

তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে রাজগৃহে দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই। ইহার প্রত্যেক মৃত্তিকা স্তূপ, প্রত্যেক ভগ্ন-প্রাচীর, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেক গুহা, প্রত্যেক মন্দির তাঁহাদের মনে নব নব ভাবের সঞ্চার করিবে। যাত্রীগণ শোণ-ভাণ্ডার দেখিয়া অনেকেই জরাসন্ধের আখড়া বা মল্লভূমি দেখিতে যান। মল্ল-ভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। আমরা সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে উক্ত ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলাম। এই স্থানও পূর্ব্বোক্ত উপত্যকার একটি অংশ। ইহার চতুর্দ্দিকেই উন্নতশীর্ষ গিরিরাজি। বৈভার-গিরির শীর্ষদেশ এই স্থানে এত উচ্চ যে, উপরের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ইহার পাদদেশ দিয়া তিন চারিটি নির্ঝরিণী মন্থর গতিতে কুলকুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এক দিকে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্ত-রাগে গিরি-শৃঙ্গগুলি রঞ্জিত হইয়াছে, অপর দিকে সন্ধ্যার শ্যামল ছায়ায় বন-ভূমি, প্রান্তর এবং দূরস্থিত শৈলরাজি ধীরে ধীরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতেছে। আলো-আঁধারের এই অপূর্ব্ব সমাবেশ, এই নির্জ্জন বিহঙ্গ-কূজিত পার্ব্বত্য প্রদেশে যে স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার করে, তাহা অনুভবেরই যোগ্য, বলিয়া বুঝাইবার নয়। সিদ্ধার্থ যে কেন রাজগৃহের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন, তাহা এই সকল স্থান দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

ঔরঙ্গজীবের ফার্ম্মাণ

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব ভারত ইতিহাসে নৃশংস, অত্যাচারী ও হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৬১৫ খৃঃ অঃ পিতা শাজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজ ভ্রাতা দারাসেকো, সা সুজা ও মুরাদবক্সকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ছলে, বলে ও কৌশলে অতি নির্দ্দয় ভাবে তাহাদের বধ সাধন করেন। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমানসেকো ও মুরাদের পুত্র ইজিদ্ রফীকও ঔরঙ্গজীবের নিষ্ঠুর কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। ঔরঙ্গজীব উহাদিগকে ধৃত করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করেন এবং বিষ প্রয়োগে তথায় তাহাদিগকে হত্যা করেন।

ঔরঙ্গজীবের হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষও যথেষ্ট ছিল। ধারমতের (বর্ত্তমান ফতেহাবাদ) যুদ্ধে যখন সম্রাটের সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে রণভূমি পরিত্যাগ করেন তখন বিজেতা ঔরঙ্গজীব নিজ সৈন্যদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, মুসলমান সৈন্যদিগকে কোনরূপ অপমানিত বা হত্যা করিবে না, বা তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে না, কিন্তু হিন্দু দেখিলে তাহাদিগকে হত্যা বা তাহাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন তাঁহার হিন্দু বিদ্বেষের অপর উদাহরণ। এতদ্ব্যতীত তিনি হিন্দুদের পুণ্যধাম বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানে কতশত মন্দির ধ্বংস ও দেববিগ্রহ নষ্ট করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আকবরের সম্মতি লইয়া অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ বহু অর্থ ব্যয়ে বৃন্দাবনে প্রস্তর দ্বারা গোবিন্দ-জীর যে বৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ঔরঙ্গজীব ভগ্ন করিয়া দেন। সম্রাট

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে বুন্দেলখণ্ডের রাজা বীর সিংহ দেব মথুরায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বারকাধীশের যে আশ্চর্য্য ও মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং ৬।৭ ক্রোশ দূর হইতে যে, মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইত, ঔরঙ্গজীবের আদেশে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া তথায় এক প্রকাণ্ড মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশীতে জ্ঞানবাপীর নিকট বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও পঞ্চগঙ্গা ঘাটে চেতী মাধবের মন্দির ভগ্ন করিয়া সেই সেই স্থানে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াও হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস বহু শতাব্দী যাবৎ ঔরঙ্গজীবের এই সকল অত্যাচার-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে।

ইতিহাসের এই সমস্ত কাহিনী যে সত্য বা অতিরঞ্জিত নহে ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে ঐতিহাসিকগণ স্বকপোলকল্পিত অনেক কথা এবং নিজ প্রভু বা অনুগত লোকের মনোরঞ্জনার্থ অনেক মিথ্যা বিবরণ ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত সংমিশ্রিত করিয়া থাকেন। বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র অঙ্কনই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐতিহাসিকগণ সিরাজউদ্দৌলাকে নির্দ্দয়, উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এক শতাব্দী পরে শ্রদ্ধেয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বহু গবেষণার পর এবং মুর্শিদাবাদ ও ইংরাজ সরকারের অনেক কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং অন্ধকূপহত্যা, (যাহার জন্য ইংরাজগণ সিরাজউদ্দৌলার উপর খড়্গহস্ত) সম্পূর্ণ অলীক এবং অন্ধকূপহত্যা আদৌ সংঘটিত হয় নাই প্রমাণ করিয়াছেন। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, যদি প্রকৃত অনুসন্ধানে হয় তাহা হইলে হয়ত ঔরঙ্গজীবও হিন্দু বিদ্বেষের কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। আমাদের এইরূপ অনুমানের কারণও আছে।

কাশীর এক মহল্লার নাম মঙ্গলা গৌরী। উক্ত মহল্লায় গোপাল উপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ছিল না, কেবল মাত্র এক কন্যা। গোপাল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র মঙ্গল পাণ্ডে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি অন্যান্য সম্পত্তির সহিত কতকগুলি দলিলপত্র প্রাপ্ত হন। ঐ দলিলগুলির মধ্যে ঔরঙ্গজীব প্রদত্ত একখানি ফার্ম্মাণও ছিল। ঐ ফার্ম্মাণখানি সর্ব্ব প্রথমে বেনারসের তদানীন্তন পুলিশ ইনেস্পেক্টর খান বাহাদুর সেখ মহম্মদ তৈব মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। মঙ্গল পাণ্ডে একজন "ঘাটিয়া পুজারী"। তাঁহার ব্যবসা গঙ্গার ঘাটে প্রকাণ্ড বংশ ছত্রের নিম্নে উপবেশন করিয়া শ্রাদ্ধার্থীদিগকে মন্ত্র পাঠ করাইয়া দেওয়া। কোন সময়ে এই ঘাট ও পূজা সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে খান বাহাদুর ঐ বিষয় তদন্ত জন্য গমন করেন এবং মঙ্গল পাণ্ডের দলিল পত্রের মধ্যে উক্ত ফার্ম্মাণখানি দেখিতে পান। পরে ১৩১১ সনে চট্টগ্রামের উকিল রজনীরঞ্জন সেন মহাশয় যখন তাঁহার পুস্তকের (Holy City—Benares) উপকরণ সংগ্রহ জন্য কাশীতে আগমন করেন, সেই সময়ে উক্ত ইনেস্পেক্টর সাহেবের সৌজন্যে তিনি ঐ ফার্ম্মাণ খানি দেখিতে পান এবং এবং তাঁহার পুস্তকে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ফার্ম্মাণ খানির আয়তন ২ ফুট ১০॥ ইঞ্চ × ১ ফুট ৫। ইঞ্চ। প্রথম পৃষ্ঠা সমস্ত উজ্জ্বল কালো কালীতে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত, কেবল উপরের ৩॥ × ২॥ স্থান লাল কালীতে লেখা এবং তাহার ডাইন দিকে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের মোহর। অপর পৃষ্ঠা সূক্ষ্ম বস্ত্রে মণ্ডিত, কেবল উপরের ৪॥ × ৪॥ স্থানে শাহজাদা সুলতান মহম্মদের মোহর এবং তাহার হস্তের আদেশ লিপি। ঐ ফার্ম্মাণ কাশীতে আবুল হোসেন নামক জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উহাতে কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ আছে "পুরাতন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা না হয়, কিন্তু নূতন কোন মন্দির আর প্রস্তুত করিতে দিবে না; আর দিল্লী দরবারে এ সংবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে, কোন কোন মুসলমান ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বশতঃ কাশী ও তাহার

নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের হিন্দু অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করিতেছে এবং তাহাদিগকে মন্দির হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে ; তজ্জন্য এই ফার্ম্মাণ দ্বারা তোমাকে জরুরী আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি অতঃপর সকল মুসলমানকে সতর্ক করিয়া দিবে যে, কেহ হিন্দুদের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে এবং তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা না দেয়। সকলে যেন আপন আপন ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ঈশ্বরের নিকট এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করে।"

সকল ইতিহাস লেখক সমস্বরে ঔরঙ্গজীবকে হিন্দু-ধর্ম্ম বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই ফার্ম্মাণ খানি পাঠ করিলে সে ধারণা মন হইতে বিদূরিত হয়। বেহার গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বহু প্রাচীন হস্তলিপি ও দুষ্প্রাপ্য কাগজাদি দেখিয়া ঔরঙ্গজীবের ইতিহাস লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। তিনি উক্ত ফার্ম্মাণখানি দেখিয়া এবং সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার গবেষণার ফল সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে ; হয়ত সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় ঔরঙ্গজীবও হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষ কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ঐ ফার্ম্মাণের অবিকল ইংরাজ অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত রজনী বাবু ১৯১২ খৃঃ অঃ এই ফার্ম্মাণের প্রথম উল্লেখ করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেই জন্য যাহাতে এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হয় তজ্জন্য এই ফার্ম্মাণের পুনরুল্লেখ করিলাম।

Firman—

(Rendered into English by Dr. D. C. Phollot.)

Let Abul Hossain worthy of our favour and countenance trust to our Royal bounty and let him know that since in accordance with our innate kindness of disposition and natural benevolence the whole of our untiring energy and all our upright intentions are engaged in promoting the public welfare and bettering the condition of all classes, high and low, therefore in accordance with our holy law we have decided that the ancient temples shall not be overthrown but that new ones shall not be built. In these days of our justice, information has reached our noble and holy Court that certain persons actuated by rancour and spite have harassed the Hindus resident in the town of Benares and a few other places in that neighbourhood and also certain Brahmin keepers of the temples in whose charge these ancient temples are ; and that they further desire to remove these Brahmins from their ancient office and the intention of theirs causes distress to that community Therefore our Royal command is that after the arrival of our illustrious order you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere or disturb the Brahmins and the other Hindus resident in those places ; that they may as before, remain in their occupation and continue with peace of mind to offer up prayers for the continuance of our God-given Empire that is destined to last to all times. Consider this as an urgent matter. Dated the 15th of Jumada us-sani, A. H. 1064 = (1653 or 54 A. D.)

শ্রীহরিচরণ বসু।

বেদান্ত দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ—তর্কপাদ।

৬

পরমাণু-বাদের সম্বন্ধে, আমাদের আরো অনেক কথা বলিবার আছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ন্যায়-বৈশেষিক-গণ চারিজাতীয় পরমাণুর কল্পনা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ যে সকল বস্তু আমাদের চক্ষে পড়ে, সমস্তই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি বলিয়াই দৃষ্ট হয়। একখানা বস্ত্রের কথাই ভাবুন্। কতকগুলি সূত্রের সমষ্টি ব্যতীত বস্ত্র আর কিছুই নহে। সূত্রগুলিই বস্ত্রের উপাদান কারণ। সুতরাং সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের 'সমবায়' সম্বন্ধ আছে। কার্য্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধকে ইঁহারা 'সমবায়' সম্বন্ধ বলিয়া থাকেন। আর সূত্রগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া উঠে। সুতরাং, 'সংযোগ' নামক সম্বন্ধটী সূত্রে বর্ত্তমান রহিয়া, বস্ত্র নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া থাকে। এই প্রকারে, পৃথিবীর যাবতীয় স্থূল বস্তু, আপনা অপেক্ষা ন্যূনতর পরিমাণ বহুবিধ অংশের সংযোগে, উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা কিছু সাবয়ব বস্তু তাহাই আপনাপেক্ষা ন্যূনতর অবয়ব বা অংশগুলির সংযোগে উৎপন্ন হয়. এই নিয়মানুসারে বস্তুমাত্রই বিভাজ্য ১ (Divisible) হইয়া পড়ে। বিভাগ করিতে করিতে যেখানে বিভাগ শেষ হইয়া যায়, আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না, আর তাহার অংশ কল্পনা চলে না,—তাহাকেই ইঁহারা পরমাণু বলেন। এখানে, অংশী (whole) ও তাহার অংশ (parts)—এই প্রকারের কল্পনা শেষ হইয়া যায়। গিরি নদী, সাগর সরিৎ, পক্ষী মনুষ্য সমন্বিত এই জগৎ—সাবয়ব; অংশ সকলের মিলনে নির্ম্মিত। সাবয়ব বলিয়াই ইহার আদি আছে, অন্তও আছে; ইহা জন্ম ও নাশের অধীন। কার্য্য মাত্রেরই উপাদান কারণ আছে। সুতরাং পরমাণুই এই জগতের অতি সূক্ষ্ম উপাদান কারণ। ইহাই কণাদের অভিপ্রায়।

আমরা পৃথিবীতে চারি জাতীয় স্থূল মূল পদার্থ—যাহারা সাবয়ব, অংশ-সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত—দেখিতে পাই। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু—এই চতুর্ব্বিধ ভৌতিক বস্তু দেখিয়া, উহাদের উপাদান-কারণ রূপে চারি জাতীয় পরমাণুর কল্পনা করিয়া থাকি। এই সকল পরমাণুর আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না। ইহারা বস্তু-বিভাগের শেষ সীমা। প্রলয়ে তাবৎ স্থূল বস্তু এই চারি জাতীয় পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রলয়াবসানে যখন সৃষ্টি বা পুনরুৎপত্তির কাল উপস্থিত হয় তখন, বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া, একটী পরমাণুকে অন্য একটী পরমাণুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে, 'দ্ব্যণুক' উৎপন্ন হয়; ক্রমে 'ত্র্যণুক', 'চতুরণুক' এবং তাবৎ স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে। এই প্রকারে, পরমাণুতে ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া স্থূল জগৎ নির্ম্মিত হয়। পরমাণু গত রূপ-রসাদি গুণ বা ধর্ম্মও, তাহা হইতে উৎপন্ন স্থূল পদার্থে দেখা দেয়।

এখন কথা হইতেছে এই যে, প্রলয় কালে এই যে পরস্পর বিভক্ত ভাবে চারি জাতীয় নিত্য পরমাণু অবস্থান করে, এই পরমাণুতে ক্রিয়া আসিল কোথা হইতে? পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে জগৎ নির্ম্মাণ করিল, উহাদের এই সংযোগ ঘটাইল কে? ক্রিয়া না হইলে ত উহাদের সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগ ক্রিয়া ত এক প্রকার 'কার্য্য' (Effect); এই কার্য্যের 'কারণ' (Cause) কে? কোন্ নিমিত্ত কারণের বলে ২

১। যেমন বস্ত্র—অবয়বী (whole); সূত্র তাহার অবয়ব (parts)। সূত্র—অবয়বী; অংশু—উহার অবয়ব। আবার অংশু—অবয়বী, তদংশ—উহার অবয়ব।—এই প্রকারে।

২। নিমিত্ত কারণ—operative cause.

পরমাণুর সংযোগ-ক্রিয়া সংঘটিত হইল? আমরা ত দেখিতে পাই যে, প্রাণীর যত্ন দ্বারা দৈহিক চেষ্টা (Entleavour) উপস্থিত হয়। অথবা, বায়ুর আঘাত (Impact) দ্বারা বৃক্ষাদি চালিত হয়। এইরূপে কোন পরিদৃশ্যমান প্রযত্ন বা আঘাত দ্বারাই কি, প্রলয়াবসানে, আদিম পরমাণুতে ক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল? কিন্তু সৃষ্টির আদিতে, তখনও ত কোন প্রাণী সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং প্রাণি-কৃত 'প্রযত্ন' তখন আসিবে কিরূপে? দেহান্তর্ব্বর্ত্তী মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে ত 'প্রযত্ন' উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তখন প্রাণী কোথায়? প্রাণীর দেহই বা কোথায়? এই একই হেতুতে, 'আঘাত' ৩ প্রভৃতিকেও পরমাণুর ক্রিয়ার মূল কারণ বলিতে পারা যায় না। কিরূপে তবে পরমাণুতে আদিম ক্রিয়া উপস্থিত হইল, যে ক্রিয়ার বলে উহারা পর পর সংযুক্ত হইয়া 'দ্ব্যণুক' প্রভৃতিকে জন্মাইবে? যে আদিম কারণের বলে পরমাণুতে ক্রিয় উপস্থিত হইয়া জগৎ রচনা করিল, প্রাণীর প্রযত্নই বল, আর আঘাত বা নোদন—যাহাই বল না কেন,—ইহারা তৎকালে কেহই ক্রিয়ার কারণ রূপে উপস্থিত থাকিতে পারে না। কেন না, ইহারা জগৎসৃষ্টির পরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে, দৃষ্ট কোন কারণ সম্ভব না হওয়ায়, কোন অদৃষ্ট বস্তুকেই যদি ক্রিয়ার কারণ বলিতে চাও, তাহা হইলেও আমরা তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে হইবে। এই যে তুমি অ-দৃষ্ট কিছুকে ক্রিয়ার কারণ বলিতেছে, এই অ-দৃষ্ট বস্তুটী কি? ইহা কি কোন প্রাণীতে সংযুক্ত ছিল, না পরমাণুতে সংযুক্ত ছিল? যাহাতেই থাকুক্ না কেন, এই অ-দৃষ্ট বস্তুটী ত অচেতন, জড়। কোন সজ্ঞান চেতন পুরুষ কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া, জড় কি কখনও আপনা আপনি ক্রিয়া করিতে পারে, না কোন ক্রিয়ার প্রেরক হইতে পারে? আমরা এ কথাটা সাংখ্য-মতের আলোচনার সময়েই ত পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছি। কোন সচেতন প্রাণীকেও এই অদৃষ্ট-বস্তুটীর প্রেরক বলিতে পার না; কেননা সেই প্রলয়াবস্থায়, তখনও ত প্রাণীর চৈতন্য বা বিজ্ঞান সজাগ হইয়া উঠে নাই; প্রাণী মাত্রই ত তখন নিশ্চেষ্ট, সুষুপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। তোমরাই ত বলিয়া থাক যে, মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ না হইলে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয় না! প্রলয়ে মন ত তখনও নিশ্চেষ্ট, অভিভূত। যদি বল যে, আত্মা ত সর্ব্বব্যাপী; ইহার সহিত অ-দৃষ্টের যোগ ত সর্ব্বদাই আছে এবং তাদৃশ আত্মার সহিত পরমাণুর যোগে পরমাণুতে ক্রিয়া উপস্থিত হইতে বাধা কি? কিন্তু একথা বলিতে গেলে এই দোষ হইবে যে, পরমাণুতে তাহা হইলে ক্রিয়ার আর বিশ্রান্তি ঘটবে না; সে ক্রিয়া নিত্যই বর্ত্তমান থাকিবার কথা। কেন না সর্ব্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে, পরমাণুর সম্বন্ধ ত চিরকালই থাকিবার কথা। সুতরাং জগতের প্রলয় অসম্ভব হইয়া উঠিবে; ক্রিয়ার নিবৃত্তিই সম্ভব হইবে না। সুতরাং, আমরা দেখিতেছি যে, পরমাণুতে ক্রিয়া উপস্থিত হইবার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নাই। কারণ না থাকায়, পরমাণুর ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। কাযেই, জগৎ সৃষ্টিই সম্ভব হয় না।

তার পর, আরো কথা আছে। এই যে একটীর সহিত অপর একটীর সংযোগ হইয়া দ্ব্যণুকাদি উৎপত্তি হওয়ার কথা বলিতেছে; আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই সংযোগটা কিরূপ? ইহা কি পরমাণুদ্বয়ের সর্ব্বাংশে (Interpenetration) সংযোগ, না একদেশে সংযোগ? সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে সংযোগ বলিলে, বড় বা স্থূল হইবে কি প্রকারে? সর্ব্বদাই ত তাহা হইলে পরমাণুর আকারে থাকিয়া যাইবারই কথা; বৃদ্ধি হইবার ত কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি মনে কর যে, পরমাণুদ্বয়ের এক দেশেই সংযোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত তুমি আর পরমাণুকে নিরবয়ব

৩। কোন অচল স্থির পদার্থে, কোন বেগবৎ পদার্থের সংযোগকেই 'আঘাত' বলা যায়। কোন সচল পদার্থের সঙ্গে কোন বেগবৎ পদার্থের সংযোগের নাম 'নোদন'। সৃষ্টির পূর্ব্বে আঘাত বা নোদন কোনটীই সম্ভব নহে।

বলিতে পারিবে না! পরমাণুকে সাবয়ব বলিতে হয়! পরমাণুর অংশ আছে স্বীকার করিতে হয়! পরমাণুর অংশ কল্পিত বস্তুমাত্র;—একথাও বলিতে পারা যায় না। কেন না, যাহা কল্পিত বস্তু, মনের কল্পনা মাত্র,—তাহার সহিত আবার সংযোগ হইবে কাহার বা কিরূপে? সংযোগটাও তাহা হইলে কল্পিত বস্তু হইয়া উঠিবে।

সংযোগ যদি কল্পনার সামগ্রী হয়, তাহা হইলে কল্পনা ত পরমাণুদ্বয়ের বাস্তব সংযোগ ঘটাইতে পারে না। সংযোগ যদি না ঘটিল, দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে?

সৃষ্টিকালে, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ঘটাইবার যেমন কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; তদ্রূপ, প্রলয়-কালেও, বস্তুর পরস্পর মিলনকারক অংশগুলি যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, সেই বিভাগ-ক্রিয়ারও ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কে এই বস্তুগুলির অংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া দিবে? কেনই বা দিবে? প্রাণীর অদৃষ্টকে কারণরূপে খাড়া করিতে পারিবে না। কেন না, প্রাণীর অদৃষ্ট, প্রাণীর ভোগের হেতু হইতে পারে; প্রাণীর প্রলয়ের হেতু কেন হইবে? এইরূপে, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বা বিভাগ—ইহার যখন কোন কারণই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না, তখন সৃষ্টি বা প্রলয়—কোনটীই সম্ভব হইতেছে না। ক্রিয়া হইতে না পারিলে, পরমাণু-সংযোগে সৃষ্টিই বা কিরূপে হইবে? অথবা, পরমাণু-বিভাগে প্রলয়ই বা কিরূপে হইবে? অথচ এই ক্রিয়া প্রথমে কিরূপে আসিল, তাহার উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক বিশেষ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না!!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

শিশু

তুই বুঝি হ'বি শিশু স্বরগের সুধা,
পড়েছিস্ একবিন্দু ভুলে ধরাতলে—
মিটাইতে আমাদের বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা!
আমরা পেয়েছি তোরে বহু পুণ্য-ফলে।

তুই বুঝি শিশু, কল্প-কুসুম কোরক
বাতাসে ছিঁড়িয়া তোরে ফেলেছে হেথায়—
যাহা চাই দিস্ তাহা—রে দাতা-তিলক,
কচি দুটি মুঠি ভরি অপূর্ব্ব প্রথায়!

তুই বুঝি স্বরগের শিশু-কামধেনু
এসেছিস্ পলাইয়া—বন্দে তোরে কবি—
উড়াইয়া পায়ে পায়ে পূত স্বর্ণ রেণু—
আত্মত্যাগ মহাযজ্ঞে যোগাইতে হবি।

তুই বুঝি বিধাতার অনুগ্রহ কণা
মূর্ত্তিমান হয়ে মর্ত্তে করিস্ বিহার!
দুঃখে-ক্লেশে আমাদের মহতী সান্ত্বনা—
ভুলে যাই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিখিল সংসার!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বিদুষীর বিপদ

(গল্প)

নন্দলাল বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ণিমার আজ বিবাহ। পূর্ণিমা নিখুঁত সুন্দরী নহে, তবে বাঙ্গালীর ঘরের "সুন্দর মেয়ে" আখ্যাধারিণী বটে। পূর্ণিমা প্রশংসার সহিত বি-এ পাশ হইয়াছে, তাহা ব্যতীত গাহিতে বাজাইতে, শিল্প কাযে, গৃহকর্ম্মে পটীয়সী।

বর আসিয়া আসরে বসিয়াছে, এমন সময় একটা গোল হইল। কন্যা পক্ষের একটী ভদ্রলোক বরপণের তীব্র নিন্দা করিয়া বলিলেন, "এ কসাই গিরি ভদ্রলোকের করা উচিত নয়।"

বরের পিতা (যিনি একটু পরেই নগদে ও গহনায় প্রায় ছয় হাজার মুদ্রা গ্রহণ করিবেন) বলিলেন, "কেন মশায়, হাতে শাঁখা পরিয়ে মেয়ে নিয়ে যাবে কেন? ছেলে ক ফেলনা?"

কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোক বলিলেন, "মেয়েও সন্তান মশাই! এই যে আপনিই ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন, অবশ্য ছেলে এ-ম পাশ, কিন্তু পাত্রীও ত বি-এ পাশ; তা ছাড়া সংসারের কায জানে, দেখতেও সুন্দরী; তবে আপনার ছেলের কিসে অনুপযুক্ত যে আপনি ছ' সাত হাজার টাকাও নেবেন আবার আজন্মের মত একটী কেনা দাসীও নিয়ে যাবেন?"

গোলমাল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। বরকর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুত্রকে বলিলেন, "ওঠে হে, ছোটলোকের বাড়ী আর থাকা নয়।" কতকগুলি হুজুগে বাজে লোক হাতের অস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইল—"ছোট লোক! মার শালাকে।" নন্দবাবু সমূহ বিপদ দেখিয়া বরকর্ত্তাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মন আর ভেজে না মেজাজও নামে না!

জনৈক প্রতিবেশী উচ্চস্বরে বলিলেন, "নন্দলাল, বেয়াইয়ের রাগের মূল্য স্বরূপ হাজার টাকা ঘুস দাও তাহলেই রাগ পড়ে যাবে। চাঁদীর জুতোর মত মিষ্টি কিছু নেই।"

বরকর্ত্তা বিনা বাক্যব্যয়ে সদলবলে আসর ত্যাগ করিলেন।

তখন সকলের চৈতন্য হইল—লগ্ন আগতপ্রায়, উপায় কি?

নন্দলাল বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দন রব শ্রুত হইল। চারিদিকে পাত্রের কথা হইতে লাগিল। একটী উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত ছিল, বিবাহের কথা বলায় সে বলিল, "আমার দারুণ হাঁপানী রোগ আছে, আমি বিবাহ করব না।"

পুরোহিত বলিলেন, "আরও আধঘণ্টা সময় আছে, যা পার এর মধ্যেই কর। এই লগ্নে বিবাহ না হলে মেয়ে বিধবার সামিল হবে এটা মনে রেখ।"

মেয়েকে বি-এ পড়াইবার সময় নন্দবাবু কাহারও কথা কাণে তুলেন নাই, কিন্তু উপস্থিত "দোছাঁদনা" হইবার কথা শুনিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া হতাশ ভাবে বলিলেন, "কোনও উপায় নেই ভটচার্য্যি মশায়, সোণার প্রতিমা আমার জলে ভেসে গেল।"

নন্দবাবুর এক বাল্যবন্ধু প্রতুলবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "নন্দ, যদি তোমাদের অমত না হয়, তাহলে আমার ছেলে অতুল রয়েছে এই লগ্নেই দিতে পার।"

কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "কি বলছ প্রতুল? পূর্ণ আর অতুল যে সমবয়সী।"

"পূর্ণিমার বয়স কত?"

"কুড়ি চলছে।"

"অতুল একুশে পড়েছে; এক বছরের ছোট। বড়

হবে। যদিও আমার তাতে কিছুমাত্র অমত নেই, কারণ আমার মা বাবাতে ছ'মাসের ছোট বড় ছিলেন, তবে তোমাদের ইচ্ছে। মনে কোরনা, প্রতুল টাকার লোভে বলছে। আমি স্বীকার কচ্ছি তোমার মেয়ে বি-এ পাশ, আর অতুল সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে, তোমার মেয়ের একেবারেই অনুপযুক্ত—তবে তুমি ইচ্ছে কল্লে দিতে পার এইটুকুই হচ্ছে কথা। আমি তোমার বন্ধু, আমার কায আমি করলাম, এখন তুমি নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যা ইচ্ছে কর।"

নন্দবাবু মাথায় হাত দিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বর্ণলতা পূর্ণিমাকে এত যত্নে শিক্ষা দিলেন কি এণ্ট্রেন্স পাশ অতুলের জন্য! দুঃখে তাঁহার চোখে জল আসিল।

পুরোহিত বলিলেন, "আর ভাববার সময় নেই, যা করবে শীগ্‌গির করে ফেল।"

নন্দবাবুর ভগিনীপতি বলিলেন, "মন ছোট করোনা হে ভায়া! মেয়ের কপালে সুখ থাকে ঐ ছেলেই রাজা হবে। নইলে যে মেয়ের জীবন নষ্ট, নিজের জাত যায়!"

নন্দবাবু বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "তবে তুমি অতুলকে ডাক ভাই।"

অতুল সেখানে ছিল না। প্রতুল বাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অল্পক্ষণ পরে অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে একখানা মাল কোঁচা করা ধুতি ও গায়ে শুধু একটী গেঞ্জি।

প্রতুল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছিলে?"

অতুল বলিল, "রাত হয়েছে, সকলে বল্লেন, লোক জন খাইয়ে দেওয়া হোক, তাই করছিলাম।"

"আচ্ছা সে থাক; তুমি কাপড় ছেড়ে ফেল। পূর্ণিমাকে তোমাকেই বিয়ে করতে হবে।"

যুবক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আমাকে?"

"হ্যাঁ তোমাকেই, নাও কাপড় ছেড়ে যোড় পর।"

অতুল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার পড়ার যে এখনও অনেক বাকি! এখন থেকে—"

"সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না বাবা, তুমি নাও কাপড় খানা ছেড়ে ফেল।"

"কিন্তু—"

"এর ভেতর কোন কিন্তু নেই অতুল। তোমার ওপর আমার মান ইজ্জৎ নির্ভর করছে—তুমি অসম্মত হলে এত লোকের মাঝে আমি অপদস্থ হব।"

অতুল আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না, বিমর্ষ গম্ভীর মুখে যোড় তুলিয়া লইল।

আবার মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল—স্ত্রী আচার হইয়া গেল, বিবাহ হইয়া গেল।

বাসরে মেয়েরা অতুলকে ঘিরিয়া বসিল, কিন্তু শরীর ভাল নাই বলিয়া সে শয়ন করিল—কিছুতেই উঠিল না।

২

বিবাহের পর পূর্ণিমা শ্বশুরালয়ে আসিল। ফুলশয্যা বৌভাত হইয়া গেল, অতুল কিন্তু স্ত্রীর সহিত কথা কহিল না, লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুন্দরী ও শিক্ষিতা পত্নী পাইয়া সে সুখী হইতে পারিল না—বরং সেটা তাহর পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাহার পর্ব্বাপেক্ষা দারুণ অপমান বোধ হইল যে সে তাহার স্ত্রীর তুলনায় মূর্খ—পূর্ণিমা তাহাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিতা।

পূর্ণিমা বয়স্থা এবং বুদ্ধিমতী, সে সহজেই বুঝিতে পারিল তাহার স্বামীর লজ্জা এবং ব্যথা কোথায়; তাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাতে স্বামীর প্রাণে আঘাত লাগে এমন কায সে জীবনে কখনও করিবে না—স্বামীর সম্মুখে উচ্চ অঙ্গের পুস্তক কখনও হাতে লইবে না। আরও সে বুঝিল, স্বামীর ভালবাসা তাহাকে জোর করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ সে চিরদিনই দূরে রহিয়া যাইবে।

শাশুড়ী পঙ্কজিনী পূর্ণিমাকে বড় ভাল বাসিলেন। তাঁহার দুইটী মাত্র পুত্র—কন্যা নাই, তাই বধুকে নাম ধরিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ণিমা তাঁহার সহিত আপনি বলিয়া কথা কহিলে পঙ্কজিনী তাহার চিবুক

ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমাকে তুমি বলে কথা কোস মা। আমার মেয়ে নেই, মনে করব তুই-ই আমার মেয়ে।"

পূর্ণিমা মৃদুস্বরে বলিল, "তাই বলব মা।"

তিন চারিদিন পরে অতুল একদিন গোপনে মাকে বলিল, "মা, আমি যতদিন বি-এ না পাশ করি, ততদিন ওকে এনো না।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন রে?"

অতুল বলিল, "আমার বড় লজ্জা করে—আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে, আমায় শেষে কাণ ম'লে শেখাতে চাইবে! না মা, তুমি বাবাকে বোল যেন এখন না আনেন।"

"তুই কি পাগল হলি অতুল? একদেশে শ্বশুর বাড়ী বাপের বাড়ী—আর দু আড়াই বছর বাপের বাড়ী পড়ে থাকবে কি রে?" তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "ওরে আমি মানুষ চিনি—ও আমার তেমন মেয়ে নয়।"

অতুল বলিল, "আটদিনের ভেতর কেউই 'তেমন মেয়ে' হয় না; এর পর দিনরাত উঠতে বসতে যখন আমায় খোঁটা দেবে তখন আমি মরব! না মা, তুমি বাবাকে বোল।"—বলিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে অতুল চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে একখানা শালে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া অতুল বই পড়িতেছিল, পঙ্কজিনী পূর্ণিমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অতুল যখন পাঠে অত্যন্ত মন নিবেশ করিল তখন পূর্ণিমা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া না থাকিতে পারিয়া অতুলের জুতাগুলিতে কালী মাখাইতেছিল। অতুল পলায়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুকূলের নিকট তাড়া খাইবার ভয়েই পারে নাই।

সহসা পাশের কক্ষে পিতামাতার কথোপকথন শুনিতে পাইল।

পঙ্কজিনী বলিলেন, "অতুল বলছিল যতদিন না সে বি-এ পাশ করে ততদিন বউকে এনো না।"

পিতা বলিলেন, "কেন?"

"পূর্ণিমা তার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে বলে তার লজ্জা করে।"

পিতা বলিলেন, "গাধাটাকে বোল, বিনে মাইনেয় তার প্রাইভেট মাষ্টার এনে দিয়েছি। তার কাছে পড়ুক এখন। অতুলের অঙ্কে একটু কাঁচা, আর বউমার সেটাই হল ভাল। শিখে নিক না—অমন প্রাণ ঢেলে যত্ন করে কে শেখাবে?"

"ওকি বলছ? স্ত্রীর কাছে শিখবে কি?"

"কেন, তাহলে কি অপমান হবে? বিদ্যা যদি চণ্ডালেরও কাছে থাকে, তাও নিতে হয়। পূর্ণিমা ত স্ত্রী-তার কাছে শিখতে হানি কি?"

"তাই বলে স্ত্রীর কাছে কেউ পড়ে না।"

"এমন অদ্ভুত কাণ্ডও ত কারুর ভাগ্যে হয় না। তবে অশিক্ষিতা স্ত্রীকে যদি তার স্বামী শিক্ষা দিতে পারে, তাহলে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত স্বামীকেও তার স্ত্রী নিশ্চয় শিক্ষা দিতে পারে। উভয়ের প্রতি উভয়ের সমান কর্ত্তব্য! দু আড়াই বছর বউ ফেলে রাখব কি জন্যে? অতুলকে তুমি বুঝিয়ে বোল।"

"সে যে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, আমিই কি আর বলিনি।"

সমস্ত শুনিয়া অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার কথায় সে আরও লজ্জিত হইল; কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় সে আড়চোখে একবার তাহার বিদুষী পত্নীর পানে চাহিল। দেখিল সে কাঠের পুতুলের মত জুতার উপর কালীমাখা হাতখানি রাখিয়া বসিয়া আছে।

অনেক রাত্রে পড়া সমাপ্ত করিয়া সুইচ টিপিয়া অতুল শয়ন করিতে গেল।

সে মনে মনে ভাবিয়াছিল পূর্ণিমা ঘুমাইয়াছে, তাই কতকটা নিশ্চিন্ত মনে অতি সন্তর্পণে লেপখানি গায়ে দিয়া চোরের মত নিঃশব্দে একপাশে শুইয়া পড়িল।

পূর্ণিমা ঘুমায় নাই, পাশ ফিরিয়া বলিল, "আমি সরে শুয়েছি ভাল করে শোওনা। ছোঁয়া না গেলেই ত হল!"

অতুল লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল; কি বিপদ! পূর্ণিমা এত রাত অবধি জাগিয়া আছে? ভাল জ্বালা! মুখে বলিল, "আমি বেশ শুয়েছি সরতে হবে না।"

পূর্ণিমা কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, "তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে বলেছ ?"

অতুলও একটু নীরবে থাকিয়া বলিল, "তাড়াব বলিনি, যা বলেছি মার মুখেই শুনেছ।"

"শুনেছি আমায় দু তিন বছর আনবে না। কিন্তু তা হলে লোকের কাছে আমি কি বলব ?"

"আমার কথা যে থাকবে না তাও ত বাবার কথা থেকে জানতে পেরেছ।"

"বাবার কথা ছেড়ে দাও, তাঁর কায তিনি করেছেন, কিন্তু তুমি কি আমায় আনতে চাইবে না ?"

"সত্যিই তাই; এখন থেকে অত প্রেমের স্বপ্ন দেখলে মা স্বরস্বতীকে জবাব দিতে হ'বে। তা ছাড়া আমি এখন তোমার অনুপযুক্ত; যদি কোনদিন তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত হই, তখন তোমায় স্ত্রী বলতে পারব।"

পূর্ণিমা বিষণ্ণ বদনে বলিল, "আমি ত কিছু বলিনি তবে তুমি এসব কথা কেন বলছ ?"

"এখনও বলনি, তবে কথাগুলো খাঁটি সত্য। যাক্, আমি আর থাকতে পারিনা। ও ঘরে পটলা রয়েছে, ও ঘরে মা বাবা আছেন, শুনতে পাবেন।"—বলিয়া অতুল বালিসের ভিতর মুখ গুঁজিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পূর্ণিমা দন্তে অধর দংশন করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

পরদিন পূর্ণিমাকে লইতে গাড়ী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিল। পূর্ণিমা শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমায় আবার কবে আনবে মা ?"

পঙ্কজিনী বধূর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "কবে আসবে বল মা ?"

"পশু বিকালে মেঝ ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দিও।"

"আচ্ছা তাই দেব মা।"

অনুকূল হাসিয়া বলিল, "মেঝ ঠাকুরপো কেন বউমণি, তন্ত দাদাও ত যেতে পারে।"

অনুকূলের কথাটায় পূর্ণিমার মুখে যে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল তাহা মাতা পুত্রের চক্ষু এড়াইল না। পঙ্কজিনী জানিতেন ছেলে বধূর সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই, অনুকূল তাঁহাপেক্ষা বেশীই জানিত; তাই উভয়েরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

অতুল বাড়ী ছিল না, তাহার সহিত পূর্ণিমার সাক্ষাৎ হইল না। সে চলিয়া গেল।

পূর্ণিমা চলিয়া গেলে অনুকূল জননীকে বলিল, "দাদা কি হয়ে গেল মা ? বৌমণি সাত আট দিন রইল, ওর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইলে না।"

পঙ্কজিনী বলিলেন, "তোকে কে বল্লে? কালই ত আমি অতুলের গলার শব্দ পাচ্ছিলাম।"

অনুকূল বলিল, "অমন কথা কওয়ার চেয়ে না কওয়া ভাল।" বলিয়া দাদার মুখে যেমন শুনিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক জননীকে বলিল।

৩

পূর্ণিমা আবার শ্বশুরালয়ে আসিল। কয়েকদিন কাটিয়া গেল, অতুল কিন্তু পূর্ব্ববৎ তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। তাই ভগ্নহৃদয়া পূর্ণিমা তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত কর্ম্মসাগরে ডুবাইয়া ফেলিতে চাহিল।

সেদিন ভোরে পঙ্কজিনী ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পূর্ণিমা রান্নাঘরে দুটা উনানে আগুন দিয়া তরকারীর ডালা লইয়া বসিয়াছে। পঙ্কাজিনী দালানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এত ভোরে উঠে রান্না চড়িয়েছ কেন মা ?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "এত বড় শীতের সমস্ত রাত ঘুমিয়েও ভোরে উঠব না মা ?"

"তা উঠেছ উঠেছ,—রান্না ঘরে কেন মা ? আমি ত আসছি।"

"না তোমায় আসতে হবে না—আমি রাঁধব।"

"ওমা, তাকি হয় ? এখন আমি রেঁধে খাওয়াই, যখন আমি বুড়ো হব তখন তুমি আমায় রেঁধে খাইও।"

"না মা, একবেলা আমি রাঁধবই।"

"লক্ষ্মী মা আমার ওঠ ; অতুল উঠেছে ?"

"জানিনা ; আমি অনেকক্ষণ উঠেছি।"

"তা হলে যাওত, দেখে এস, কাল অসুখ বলে শুয়েছিল—এখন কেমন আছে !"

"তুমি নিজে যাওনা মা।"

"আমার কাপড় ভাল নয়, তুমি যাও মা।"

পূর্ণিমা হাত ধুইয়া উঠিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অতুল সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছ ?"

অতুল হাত দিয়া সিঁথি ঠিক করিতে করিতে বলিল, "কেন, আমার কি হয়েছে ?"

পূর্ণিমা মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কি করে জানব—তুমিত আমায় কিছু বলনি ; মা জানতে চাইলেন।"

"বলে দাও ভাল আছি।" বলিয়া অতুল খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ণিমা সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল ?"

"ও কিছু নয়" বলিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

পূর্ণিমা ব্যথিত বক্ষ চাপিয়া নামিয়া আসিয়া শাশুড়ীকে জানাইল, তাঁর ছেলে ভাল আছে।

পঙ্কজিনী বলিলেন, "অতুল নিজেই আমায় বলে গেল।" পূর্ণিমা রান্নার কথা লইয়া আবার গোলমাল করিতে লাগিল। শেষে রফা হইল বৈকালের ভার পূর্ণিমা লইবে।

পঙ্কজিনী বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের বাতিক, মা, নইলে একটা বামুন রাখলেই চুকে যাক ; উনি বলেন হেঁসেলে বামন ঠাকুর দেখলে মনে হবে অতুলের মা বুঝি মরে গেছে।"

পূর্ণিমা মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অনুকূল রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া বলিল, "মা, বউমণি উঠেছে ?"

পঙ্কজিনী বলিলেন, "অনেকক্ষণ ; কেন রে ?"

অনুকূল গলা বাড়াইয়া বলিল, "আমায় একটু পড়িয়ে দেবে, বউমণি ?"

পূর্ণিমা বাহিরে আসিয়া বলিল, "ভাই, তোমাকে কি আমি পড়াতে পারব ? সব ভুলে মেরে দিয়েছি যে !"

"আচ্ছা আচ্ছা, মোটে আরবছর পাশ' করেছ, আর এবছর আমাকে পড়াতে পারবে না ? চল।" বলিয়া অনুকূল তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উপরে লইয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে অনুকূল বলিল, "বউমাণ আমি আর দাদা এক ক্লাসেই ত পড়ি—আমি তোমার একটী ছাত্র, দাদাকেও কেন আর একটী করে নাও না !"

পূর্ণিমা ম্লান মুখে বলিল, "ছি, ভাই !"

অনুকূল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "রাগ কল্লে ?"

পূর্ণিমা ব্যথিত স্বরে বলিল, "না রাগ করব কেন ?"

অনুকূল লজ্জিত হইয়া বলিল, "তোমায় কষ্ট দেবার জন্যে বলিনি, যথার্থই বলেছিলেম, দাদা এখনও তোমার কাছে পড়তে পারে। দু' দুবার চোখ উঠে, আর জ্বরে ভুগে বেচারা একজামিন দিতে পারেনি। এ বছর যদি দিতে পারে—তোমার কাছে পড়ুক না হানি কি ?"

"ওকি কথা ঠাকুরপো ? বড় চির দিনই বড় থাকে।" —বলিয়া পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুকূল বলিল, "এটা আমার বড়ই আশ্চর্য্য লাগে বউমণি, দাদা মোটে তোমার চেয়ে এগার মাসের বড় ; তুমি তাকে এত লজ্জা আর সম্মান কর কি করে ?"

পুর্ণিমা বলিল, "মার মুখে শুনেছি, ঠাকুমা ঠাকুর্দ্দার চেয়ে ছমাসের ছোট ছিলেন ; তিনি কি ঠাকুর্দ্দাকে মান্য করতেন না ?"

অনুকূল হাসিয়া বলিল, "বাবা বলেছিলেন তোমার কাছে পড়তে, জান ?"

"বাবা বলুন, ও কথার আলোচনা আর করোনা ভাই।" বলিয়া পূর্ণিমা বাহির হইয়া গেল।

অতুল পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিতেছিল। অনুকূলের

উপর তাহার ভারি রাগ হইল, সে বলে কিনা অতুল পূর্ণিমার নিকট পড়িবে !

ভাইকে ডাকিয়া বলিল, "পটলা, কি ভ্যান ভ্যান কচ্ছিলি ?"

অনুকূল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তুমি কত বড় গাধা তাই মাপছিলেম। এমন স্ত্রীকেও তুমি ভাল বাসনা, ধিক্ তোমায় ।"

৪

সেদিন একটু বেলা হইয়াছিল তাই অতুল একটু তাড়াতাড়ি করিতেছিল। পূর্ণিমা কাপড় জামা গুছাইয়া দিয়া বলিল, "ফেরবার সময় একবার ভবানীপুর যেতে পারবে কি ? অনেক দিন কেউ আসেনি, মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে ।"

অতুল অল্পক্ষণ পূর্ব্বে অনুকূলের নিকট পূর্ণিমা সন্দ্ধেই তীব্র ভর্ৎসিত হইয়া আসিয়াছিল, তাই তাহার ঝাঁজটা পড়িল পূর্ণিমার উপরে ; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, —"না আমি যেতে পারব না। মন এত খারাপ হয়ে থাকে সেখানে গিয়ে থাকলেই ত পার ! আমারও হাড়ে বাতাস লাগে ; দিনরাত কথা শুনতে শুনতে আমার প্রাণ গেল ।" বলিয়া অতুল কক্ষ ত্যাগ করিল।

পূর্ণিমা এ তিরস্কার সহিতে পারিল না, বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পঙ্কজিনী বধুকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখিলেন সে কাঁদিতেছে। পূর্ণিমা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিল। পঙ্কজিনী অনুমানে বুঝিলেন ব্যাপারটা কি ; তাই প্রশ্নাদি দ্বারা তাহাকে অধিক লজ্জিত করিলেন না।

বৈকালে পঙ্কজিনী স্বামীকে বলিলেন, "ঝোঁকের মাথায় বিয়ে দিয়ে তুমি এ কি সর্ব্বনাশ করলে ? এখন যে দেখছি মেয়েটার জীবন মাটী হতে বসলো ।"

প্রতুল বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন ?"

"কেন আবার ; অতুল ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—কথা পর্য্যন্ত কয় না। ওর মনের কষ্ট ওই জানে !"

"কৈ, কোন দিন ত তার মলিন মুখ দেখিনি !"

"আমাদের সামনে অমন হাসিমুখে থাকে—কিন্তু আড়ালে যখন থাকে, তখন যদি দেখ, চোখে জল আসবে। পটলা বলে, মা, আমি এত দাদাকে বোঝাই, —বলি, কিন্তু দাদা কিছুতেই শোনে না ।"

"কি আর বলব বল ? পূর্ণিমার মত বউ আনলাম তবুও যদি অতুল সুখী না হয়, তা হলে কি করব ? সবই ভবিতব্য !"

"তাত বটেই !"

"আচ্ছা এক কায করলে হয় না ? পূর্ণিমাকে কিছুদিন বাপের বাড়ী রাখি। জল কাছে থাকলে মানুষ আদর করে না—কিন্তু তৃষ্ণার সময় খুঁজে নিতে হলে তার মূল্য বোঝে ।"

"আমি বলতে পারব না। মনে করবে মায়ে বেটায় মিলে তাড়াবার ফিকির কচ্ছে। বলতে হয় তুমি বোল। আজই কি জানি অতুল কি বলেছিল, কাঁদছিল দেখলাম ।"—অদূরে পূর্ণিমাকে আসিতে দেখিয়া পঙ্কজিনী চুপ করিলেন।

পূর্ণিমা শ্বশুরের জল খাবার লইয়া ভিতরে আসিলে প্রতুল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতুল এসেছে, মা ?"

পূর্ণিমা ঘাড় নাড়িল।

একথা সে কথার পর প্রতুল বাবু বলিলেন, "পূর্ণিমা মা, তুমি দিন কতক বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবে কি ?"

"আমি আপনাদের কাছে কি দোষ করেছি বাবা, যে সকলে মিলে আমায় তাড়িয়ে দিতে চান ?"—বলিয়া পূর্ণিমা চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। দালানে অতুলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অতুল বলিল, "ভবানীপুরে গিয়েছিলম সকলে ভাল আছেন ।"

"আমার জন্যে অনর্থক কেন কষ্ট করলে ? আমি ত আর তোমায় যেতে বলিনি ।" বলিয়া পূর্ণিমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অতুল কি একটা কথা বলিবার জন্য তাহাকে

ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাকে আসিতে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল।

সমস্ত কায সারিয়া, আহারাদির পর প্রত্যহের মত পূর্ণিমা সে দিনও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

অতুল আজ আর পাঠে মন দিতে পারিতেছিল না। বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই অনুকূল বলিল, "আজ এর মধ্যেই যে উঠলে দাদা ?"

"ঘুম পাচ্ছে" বলিয়া শয়নকক্ষে গিয়া সুইচ টিপিয়া অতুল শয়ন করিল। নিদ্রিতা পত্নীর ললাটে সস্নেহে হাত বুলাইয়া অতুল মৃদু স্বরে বলিল, "আজ তোমায় অনর্থক ব্যথা দিয়ে আমি যে কত ব্যথা পেয়েছি, তা তোমায় কি জানাব! দেবতার দানের মত তুমি আমার কাছে এলেই যদি, তা হলে অত উঁচুতে আসন নিয়ে এলে কেন ?"

৫

অতুল এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলকে যথা-যোগ্য সম্ভাষণ করিল, কেবল পূর্ণিমাকে কিছু বলিল না—তাহার কাছে আসিল না।

সিঁড়ির পাশের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পূর্ণিমা কাপড় কোঁচাইতেছিল, স্বামীকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিল, "শোন।"

অতুল ভীত হইল। না জানি তাহার উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রী কি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে! তাই শুনিয়াও শুনিল না।

তাহাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া পূর্ণিমা হাত বাড়াইয়া তাহার জামার এক প্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "শোনই না, আমায় ছুঁলে জাত যাবে না; ভাসুর ত নও!"

অতুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরিয়া বলিল, "কি ?"

পূর্ণিমা হাসিমুখে বলিল, "পাশ হয়েছ কিন্তু আমায় ত বল্লে না!"

অতুল নতবদনে বলিল, "বলব আর কি, শুনতেই ত পেয়েছ।"

"পেয়েছি; কিন্তু তোমার মুখে কি আমার শুনতে ইচ্ছে করে না।"

"এর আর বলব কি? তোমার চেয়ে উঁচু ত পাশ করতে পারিনি। যদি কোন দিন এম-এ পাশ করতে পারি তখন তোমায় এসে বলব।"

এক মুহূর্ত্তে পূর্ণিমার হাস্যরঞ্জিত মুখখানি মলিন হইয়া গেল। অভিমানাহত কণ্ঠে সে বলিল, "যখন তখন আমায় এই কথা বলে খোঁটা দাও কেন? জানত অজানত কখনো কি আমি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছি? আজ শুধু এইটুকুই আমি তোমার মুখে শুনতে চাই।"

"আমার কাছে তুমি অপরাধ করবে? কেন? আমি ত কোন বিষয়েই তোমার চেয়ে বড় নই। বরং আমি তোমার কাছে অপরাধ করতে পারি।"

পূর্ণিমা ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমারই অন্যায় হয়েছে, তুমি ক্ষমা কর। আর কখনো আমি তোমায় বিরক্ত করব না, যেখানে যাচ্ছিলে যাও। পথের মাঝে আটক করে, এই যে ক'টা অপ্রীতিকর কথা বল্লাম তার জন্যে আমায় ক্ষমা কোর।"

অতুল নামিয়া গেল।

পূর্ণিমা প্রবহমান অশ্রুজল বহুকষ্টে সামলাইয়া লইয়া রেলিংয়ে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"বউমণি" বলিয়া অনুকূল আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল।

বিষণ্নমুখে বৃথা হাসিবার চেষ্টা করিয়া পূর্ণিমা বলিল, "কি ভাই ?"

"মুখ এত শুষ্ক কেন ?"

"কৈ না ত!"

"আমার কাছে লুকোচ্ছ বৌমণি! আমি সব শুনেছি।"

পূর্ণিমা আর পারিল না। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া এই বয়ঃকনিষ্ঠ দেবরটির প্রতি তাহার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। তাহার সস্নেহ প্রশ্নে পূর্ণিমার চোখের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুরপো আমি ভাবি

লেখাপড়া শিখে কি মানুষ তা ভুলতে পারে না? এই লেখাপড়াই আমার কাল হয়েছে। এত সরে থাকি, দশদিন পনের দিন মুখের একটা কথা পর্য্যন্ত শুনতে পাইনে, আমি তাতেও কিছু বলিনি, কিন্তু তবুও—"

অনুকূল বলিল, "আমি সবই জানি। আমিও ভাবি—তোমার মত গুণবতী স্ত্রী পেয়েও দাদা যদি যত্ন না করলে, তাহলে ওর অদৃষ্টে কষ্টই আছে। দাদার মনে একটা ভুল আছে। তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর ও ভাল করে লেখাপড়া শিখুক, তোমার দুঃখ তখনি ঘুচবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি আর কিছুই চাইনে ভাই, কেবল এইটুকুই চাই যে আমি যে কোন রকমে হোক মরি; আমার আর একতিল বাঁচতে ইচ্ছে করে না।"

"বৌমণি, তোমার কাছে একথার প্রত্যাশা করিনি! দাদার মনের ভ্রম আজ না হোক একদিন ভাঙ্গবেই। তুমি এত হতাশ হলে ত চলবে না; তোমাকেই যে ওকে শুধরে নিতে হবে।"

"আমায় নিয়ে উনি জীবনে সুখী হবেন না ঠাকুরপো, আমি তা বেশ বুঝেছি। আমার দ্বারা কিছুই হবে না, আমি মরে গেলে নিজের মনের মত স্ত্রী পেয়ে-উনি সুখী হবেন।"

অনুকূল ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "দাদা তোমায় ভাল বাসুক আর নাই বাসুক, আমরা ত তোমায় ভালবাসি! তুমি একথা আমাদের সামনে বোল না।"

৬

উপরের সমস্ত ঘরে মাকে খুঁজিয়া অতুল রান্না-ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল।

সেখানে মা ছিলেন না; পূর্ণিমা উনানের নিকট বসিয়া ছিল। আগুনের রক্তাভা পূর্ণিমার সুন্দর মুখ খানিতে পড়িয়া অধিক সুন্দর দেখাইতেছিল। অতুল দেখিল পূর্ণিমা কাঁদিতেছে। বিন্দুর পর বিন্দু তাহার পর বিন্দু—নীরবে তাহার শুভ্র গণ্ডে বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

পূর্ণিমার অশ্রু প্লাবিত মুখ দেখিয়া অতুল অন্তরে বড় ব্যথা পাইল। সে বুঝিল, পূর্ণিমা তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত গোপন বেদনা নির্জ্জনে লঘু করিতেছে।

অতুল বহুক্ষণ মুগ্ধ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, পূর্ণিমার নিকটে গিয়া তাহার অশ্রুধারা মুছাইয়া দেয়, কিন্তু তখনই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার পায়ে বাঁধিয়া একটা ঘটি ঠন ঠন শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

পূর্ণিমা চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিল। অতুল এভাবে ধরা পড়িয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, "মা কোথায় আছেন জান?"

পূর্ণিমা উঠিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, "ও বাড়ীতে শশীর বিয়ের ফর্দ্দ করে দিতে তাঁকে ওঁরা ডেকে নিয়ে গেছেন। কেন, মাকে ডাকাই?"

"একটু দরকার ছিল; থাক, মা আসুন।"

"কি দরকার ছিল? ক্ষিদে পেয়েছিল কি?"

পূর্ণিমা এমন স্বরে প্রশ্ন করিল যে, অতুল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি কি কচি ছেলে?"

পূর্ণিমা বলিল, "তবে কেন ডাকছ আমায় বল না! আমার করে দেবার হলে করে দিই।"

"সে তোমার দ্বারা হবে না। আমার বই কেনবার গোটা কুড়ি টাকা চাই—থাক্, মা আসুন।"

"আমার কাছে টাকা আছে, চলনা বের করে দিই।"

"না, তোমার টাকা আমি নেব না।"

"আমার টাকা? আমি কি তোমার জিনিস নই যে আমার জিনিস তোমার জিনিস নয়? কেন একথা তুমি মনে কর? আমার যা কিছু আছে সবই ত তোমার।"

"এখনও নয়। আগে তোমার উপযুক্ত স্বামী হই, তারপর।"

"স্বামী হবার আবার উপযুক্ত হতে হবে? তাহলে এখন তুমি কি আমার স্বামী নও?"

"তোমাতে আমাতে এ সম্বন্ধ নয় যে তুমি দেবে আমি নেব! আমারই উচিত তোমাকে দেওয়া। তা যখন পারি না, তখন তোমার টাকা কেন নেব?"

পূর্ণিমা আর কিছু বলিল না মুখ ফিরাইয়া লইল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে অতুল তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিল; আবার হয়ত কাঁদিবে ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা চল বের করে দাও।"

পূর্ণিমা একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ, করিয়া তাহার সহিত উপরে গেল।

বাক্স খুলিয়া সে টাকা বাহির করিতে লাগিল। তাহার মুখে ব্যস্ততা, দুঃখ, লজ্জা, আনন্দ প্রভৃতি কয়েকটী ভাবের সংমিশ্রণে একটী সুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অতুল মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সহসা পূর্ণিমার চিবুক ধরিয়া তাহার মুখখানি আলোর দিকে ফিরাইয়া অতুল অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে পূর্ণিমার ললাটের উপর হইতে চূর্ণ কুন্তলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "চুলগুলো চোখে পড়ছে যে!"

পূর্ণিমা বিভোর হইয়া ললাটের উপর সেই তিনটী অঙ্গুলির স্পর্শটুকু উপভোগ করিতেছিল।

অতুল কহিল, "এমন সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে!" পরক্ষণেই লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল, পূর্ণিমা হয়ত মনে করিবে, তাহার কুসুমিত যৌবনের চরণে সে মুগ্ধ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে! তাহাকে নিজের সৌন্দর্য্যের উপাসক ভাবিয়া হয়ত ক্রীতদাস ভাবিবে। অতুলের মনে তখনই পূর্ব্বসংস্কার ফিরিয়া আসিল। সে অকারণ একটু কঠিন স্বরে বলিল, "কৈ টাকা পেলে না?"

পূর্ণিমার যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি টাকা বাহির করিয়া অতুলের হাতে দিল।

অতুল সেগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল, "মা আসুন, এখনই তোমার টাকা ফিরে পাবে।" কথাটার তীক্ষ্ণ খোঁচা যে কোথায় কোন্ কোমল বস্তুতে বিদ্ধ হইল, তাহা ফিরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই সে ঘর ছাড়িয়া গেল।

পূর্ণিমা বিবর্ণ মুখে বাক্সের উপর মাথা রাখিয়া আপন মনে মৃদুস্বরে বলিল, "হঠাৎ স্বর্গেই বা তুল্লে কেন? আবারসেখান থেকে ফেলেই বা দিলে কেন?"

৭

অনুকূল আলো নিবাইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "বারোটা বেজেছে, দাদা শোবে না?"

"আমার এখনও হয়নি।" বলিয়া অতুল পড়িতে লাগিল। অনুকূল চলিয়া গেল।

পূর্ণিমা সেদিন ঘুমায় নাই। প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, অতুল উঠিল না দেখিয়া সে আসিয়া বলিল, "অনেক রাত হয়েছে, আজ না হয় থাক, সকালে পড়ে নিও।"

অতুল মুখ না তুলিয়াই বলিল, "না আমায় আজ এটা শেষ করে নিতেই হবে।" পূর্ণিমা চলিয়া গেলে।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল, হটাৎ অতুলের গায়ে কাহার ছায়া পড়িল।

অতুল মুখ তুলিল দেখিয়া পূর্ণিমা বলিল, "রাত দুটো বাজে, আর পোড় না, উঠে এস।"

অতুল পূর্ণিমার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল; কৈ তাহার বিদুষী পত্নীর মুখে ত বিদ্রূপের হাসি মাখান নাই! বরং আছে বিপুল স্নেহ ও একটা আশঙ্কা!

এক মুহূর্ত্তে তাহার এতদিনের সংস্কার কোথায় উড়িয়া গেল। সে কোমল স্বরে বলিল, "আমায় তুমি পড়িয়ে দেবে কি?"

আজ হঠাৎ পূর্ণিমার মুখ ফুটিল; সে কহিল, "বারবার তুমি ওই কথা বল! আমি বি-এ পাশ হই, এম-এ পাশ হই, ডি-লিট হই, আর তুমি যদি থার্ডক্লাশও পাশ হও, তাহলেও তুমি আমার চেয়ে ঢের উঁচুতে—তুমি আমার পূজনীয়। ধর্ম্ম জানেন, পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও—কিম্বা অপমান বোধ কর, সেজন্যে আমি কখনো তোমার সামনে বই হাতে করি নে। কিন্তু তবুও তুমি মনে কর

আমি কেবল তোমায় অপমান করতেই চাই! আমি তোমায় পড়াতে আসিনি—সে অভিপ্রায়ে ডাকিওনি, আমার যে সবদিকে জ্বালা! সারারাত জেগে পড়লে যে অসুখ হবে। তুমি হয়ত বি-এ পাশ স্ত্রী হ'লে হাড়ে বাতাস লাগিয়ে শান্তি পাবে, কিন্তু আমার ত তা নয়! তুমি আমায় দুচক্ষে দেখতে পার না—ভালবাস না—সব জেনেও তবুও আমায় বলতে হয়! কারণ তুমিই যে আমার সর্ব্বস্ব।"

এতগুলা কথার উত্তরে অতুল মোটেই বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল না। গাঢ় কোমল স্বরে বলিল, "এতদিন সত্যিই আমি তোমায় কষ্ট দিয়েছি তুমি কিছু বলনি, কিন্তু আজ যখন আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তা শোধরাতে চাইলাম তখনই কি তুমি বিমুখ হলে? তুমি হ'লে আমি সুখী হব? পূর্ণিমা, তুমি আমার মনের কথা জাননা, আমি তোমায় ভালবাসি—পূর্ণিমা, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমার স্বভাবে যে মাধুর্য্য আছে তাতে বনের পশুও মুগ্ধ হয়, আমি ত মানুষ। তোমায় ব্যথা দেবো বলে পড়াবার কথা বলিনি, সত্যিই বলেছি। এখনও কি তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দেবে?"—বলিয়া আকুল আগ্রহে অতুল পূর্ণিমার হাত দুখানি বুকে চাপিয়া ধরিল।

এতদিন যে বাসনা পর্ব্বত গহ্বরে অবরুদ্ধ উন্মত্ত নির্ঝরণী জলের মত আছড়া-পিছড়ি করিতেছিল একটী মাত্র পথ পাইয়া তাহা যেন প্রবল বেগে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল; পূর্ণিমা স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

অতুলেরও চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। পূর্ণিমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ধরা গলায় বলিল, "তুমিই আমায় ক্ষমা কর পূর্ণিমা! আর আমি সে মানুষ রইলাম না—এখন আমি আর সে অন্ধ নই—আমি তোমার মর্ম্ম বুঝেছি। চুপ কর কেঁদ না।" অতুল কোঁচার কাপড়ে পূর্ণিমার অশ্রুজল মুছাইয়া দিল।

শ্রীমায়া দেবী।

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সান্দিয়াল রামতনকে সঙ্গে লইয়া পরদিন যখন গোবিন্দলাল হরি সামন্তের বাটীতে আসিতেছিল, তখন তাহার হৃদয় অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু। সরযূ যে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়াছে ইহাতেই গোবিন্দলাল মনে করিল যে সে নূতন জীবন ফিরিয়া পাইল। সে ভাবিল যে সরযূর কাতর নিবেদন ভগবান কিছুতেই উপেক্ষা করিবেন না।

কথা প্রসঙ্গে রামরতন তাহাকে বলিল, "বন্ধু, এখন ত তুমি সংসারী হ'তে চলেছ—সর্ব্বদা মনে রেখ হা লকা হ'লে চলবে না। একটু বাতাসেই উড়ে উঠবে, আর এক ফোঁটা বৃষ্টির জল গায়ে লাগলেই নেমে পড়বে—এমন হ'লে সুখী হতে পারবে না। আমি যা' বলি মন দিয়ে শোন—তোমার ভবিষ্যৎকে সেই পথে চালিয়ে নিও।"

গোবিন্দলাল কহিল, "কি করতে হবে বলুন।"

"দেখলে ত, তুমি পথের ভিখারী ছিলে—আমিই টাকার সংস্থান করে দিয়েছি।"

বিনয়ের সঙ্গে গোবিন্দলাল কহিল, "সে কথা একশো বার বলব।"

"মনে রেখ বন্ধু, সংসারে থাকতে হ'লে শুধু এইটেই দেখতে হবে যে কিসে তোমার লাভ হবে—কি করলে ধন, সম্পদ, সুখ আসবে। এটা পাপ, ওটা

পুণ্য—এ কাযটা ভালো, সে কাযটা মন্দ—এসব বাজে তর্ক নিয়ে সময় কাটালে চল্‌বে না! যাতে তোমার ইষ্ট হবে, সেইটেই হলো তোমার ধর্ম্ম। সংসরে পাপ পুণ্য কিছুই নেই! এখানে আহাম্মকির নামই পাপ—বোকামির নামই পাপ—গো-বেচারি হ'য়ে থাক্‌বার নামই পাপ! পৃথিবীতে বোকা যে, জান্‌বে তার মত পাপী আর দু'টী নেই! সংসারে ভাল-মানুষ বলে' যাদের পরিচয়—দেখতেই পাবে তাদের মত কাঙ্গাল তাদের মত বোকা, তাদের মত কৃপার পাত্র আর নেই! যেমন করে' হোক্ ধন সম্পদ বাড়াও। তা হলেই দেখ্‌বে সব পেয়েছ। প্রেম, মান, আর ভক্তি—যা কিছু চাও, দেখ্‌বে সবই তোমার পায়ে গড়িয়ে পড়ছে। কেমন করে যে তোমার সিন্দুক দিনের পরদিন পূর্ণ হয়ে হয়ে উঠ্‌ছে, সেটা যেন কেউ জান্‌তে না পারে। জান্‌লেই তারা ঈর্ষ্যায় জ্বলে' মরবে, আর বল্‌বে গোবিন্দলাল পাপী, গোবিন্দলাল অধার্ম্মিক! যদি তারা কিছুই জানতে জান্‌তে না পায়, তা হ'লে তোমার নিন্দা করা দূরে থাক্, সমালোচনা করতেও তাদের সাহস হবে না। ধন-সম্পদ, ঠিক জেনো করাতের ধার! দু'দিকেই কাটে—নির্ব্বোধের হাতে পড়লে শত্রু বাড়ায়, আর বুদ্ধিমানের হাতে শত্রু তাড়ায়! এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছ তুমি কেমন বুদ্ধিমানের মত এই টাকাটা সংগ্রহ করেছ। জীবন ভরে পাথর কাটলে কি এত টাকা পেতে?"

গোবিন্দলাল কহিল, "হাজার টাকা! সে ত আমার স্বপ্নের অতীত।"

"তাই ত বল্‌ছি বন্ধু, তাই ত বল্‌ছি—কেবল একটু বুদ্ধি, একটু সাহস। মেষপালের মত না চলে'—দুনিয়ার লোকের ভিড় ঠেলে দু'পা এগিয়ে চল! সে ঋষি বড় পণ্ডিত ছিলেন, যিনি বলেছেন—সকল কাযেই মন্ত্রগুপ্তি চাই। তোমার অর্থলাভের কথা দুনিয়ার একটা লোকও জানতে পায় নি। ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র যে কেমন করে হীরার টুকরায় পূর্ণ হয়ে উঠলো, তা শুধু জান তুমি, আর জানি আমি। এর নামই সাংসারিক বুদ্ধি। যদি পার, কথা দু'কাণে লাগাতে পারলে চারি কাণে কখনো দিও না।"

"তবে কি সংসারে কাকেও বিশ্বাস করবো না?"

"না।"

"স্ত্রী, পুত্র—আপনার পরিবার?"

"কাউকে নয়। তোমার অনিষ্ট করবে বলে যে তারা তোমার গোপন কথা প্রকাশ করবে তা নয়। কি বল্‌ছে—সে কথার দায়িত্ব কত, এ বোধটা পরের তেমন থাকে না। নিজেকে বাড়িয়ে তুল্‌তে গিয়ে মানুষ অনেক সময় নিজেই কত কথা প্রকাশ করে—শেষে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে! শুন্‌বে সব—কিন্তু বল্‌বে না কিছু। লোকে তাতে যদি মনে করে তুমি বোকা—করুক না। বরং সেইটে মনে করাই ভালো—তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে তারা অনেক সময়েই অসাবধান থাক্‌বে! সেটা ত তোমার পক্ষে সুযোগ।"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, বন্ধু বটে রামরতন।

রামরতন একটু উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "শুনেছ কথায় বলে পূজা হয় গুণের—তার মত অত বড় একটা মিথ্যা কথা আর নেই!"

"কেন, গুণের কি আদর নেই?"

"আদর থাকলে থাক্‌তে পারে—কিন্তু পূজা পায় টাকা। ধনই হল বিশ্ব-বিধাতৃ জগদ্ধাত্রী। বিশ্ব তারই ধ্যান করছে। তবে যে গুণ গুণ বল—সে শুধু ষষ্ঠী শীতলা—মনসা ঘেঁটু—কেউ একটা বাসি ফুল দেয় ত দিলে—নেই নেই! টাকা না থাকলে গুণীর গুণ ফোটেনা—টাকা থাক্‌লে মূর্খের গুণ বাড়ে! কিন্তু সংযমী হ'তে হবে বন্ধু, সংযমী হতে হবে। যেটুকু জীর্ণ করতে পার, খাবে শুধু সেইটুকু। বেশী খেয়ে কি মরেছ। কোন কাযেই মাত্রা ছাড়ালে চল্‌বে না। পাঁচ—পাঁচ হাজার টাকা ত ছিল ঘাটোয়ালের কাছে—তা ছাড়া অতগুলো দামী দামী নূতন কাপড়! যদি সবই নিতে—এক দিনে ফেঁপে উঠ্‌তে। ধরাও পড়তে সুনিশ্চিত। যে শুন্‌ত; সে-ই বল্‌ত—এ নিশ্চয়

রাহাজানি, গাড়ী উলটে পড়া নয়। কেমন, তাই না ?”

“তা ঠিক। সেই জন্মেই ত কথাতে বলে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।”

“পাপ-ফাঁপ কিছু নয় বন্ধু, পাপ-ফাপ কিছু নেই! লোভ করলেই বদহজম—তা হলেই ধরা পড়তে হয়! ধরা পড়ার নামই পাপ। বন্ধু, মনে রাখতে হবে তুমি যেন একটা প্রকাণ্ড উচ্চ পাহাড়ের গা বয়ে চলেছ। তোমার এক্ পাশে অন্ধকার বিশাল অতল গহ্বর—হাঁ করে চেয়ে আছে। একবার যদি পড়—তবে আর রক্ষা নাই! আর এক পাশে আছে পাথরের প্রাচীর, লঙ্ঘন করার উপায় নাই। ধীরে—অতি সাবধানে সেই খদের গা বয়ে চলতে হবে। অল্প সময়ে দু'পা বেশী এগিয়ে যাবে ভেবে তাড়াতাড়ি করলেই সর্ব্বনাশ ঘটবে।”

গোবিন্দলাল বিস্ফারিত-নেত্রে কহিল, “বাপ রে! সংসারটা এত ভীষণ ?”

হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে রামরতন কহিল, “মোটেই না বন্ধু, মোটেই না। যারা সাদা-সিধে সংসারী —ভাল লোক্—তাঁদের কাছেই সংসার ভীষণ। তারা একে চিন্‌তে পারে না বলেই ভীষণ দেখে। এত বর্ণ—এত গন্ধ—এত মধু—এ সব ত তোমারই জন্মে। তুমি গুছিয়ে নিতে জান্‌লেই হয়। একটা সহজ কথা বলি শোন। নিতান্ত দায়ে না ঠেক্‌লে কখনো লোককে বঞ্চনা কোর: না—পরের ধনে লোভ কোর না। আর সব চেয়ে বড় কথা—সাধ করে কোন লোককে চটিও না। মনে তোমার কি আছে, মুখ যেন জান্‌তে না পায়। যখন ছুরি শাণাবে গলা কাটতে, তখনো মিষ্টি মুখে বোলো—ওগো! গলাটা এগিয়ে দাও দেখি, আমি যে এখন কাটবো। তা বেশ করে ধার দিয়েছি—গলায় লাগবে না বেশী!—যাতে সকলের সঙ্গে অন্ততঃ উপর উপর মিলে মিশে সংসারের স্রোতে গা-ভাসান দিতে পার, তাই করবে। এমন ভাবে চল্‌বে যেন শত্রু কম থাকে—মিত্র না থাকে না-ই থাকুক। যদি মুখ বাঁধতে পার তবেই সেটা সম্ভব হবে। ভিখারীকে একটা পয়সাও দিও না—কিন্তু মুখে একবার বোলো! 'আহা, তোমার ত বড় দুঃখ।' এরই নাম সাংসারিকতা। কিন্তু বন্ধু মনে রেখ, নিজের ধন সম্পদ বাড়াতে, যখনই দরকার হবে, তখনই কিছুতেই আটকাবে না! কোন কায করতে যেন হাত না কাঁপে! দয়া মমতা প্রেম প্রীতি—এ সব মেয়েমানুষের জন্মে। সংসারে যাদের লড়াই নিত্য লেগে রয়েছে—তাদের ও সব নয়! তবে কি জান, সুযোগ বুঝে ও গুলোকে অস্ত্র করে চালাতে হবে! দেখ্‌বে ওদের ধারও কম নয়—খুব কাটে! অনেক সময় কোন প্রকারে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেল্‌তে পারলে যে কায হয়—ধারালো তলোয়ারের তা হয় না। যদি দরকার হয় বঞ্চনা করতে—অনায়াসে করবে। কিন্তু লোকে যেন জান্‌তে না পায়, বুঝতে না পারে। এই যে শুনেছ, সততাই উন্নতির মূল—সে একটা মস্ত ভুল! যত পার ভেজাল চালাও—কিন্তু ধরা পোড় না। যদি চুরি করতে হয় কর—খুন করতে হয়, পশ্চাৎপদ হয়ো না। সাবধান বন্ধু, কেবল সাবধান—ধরা পোড় না! দুর্ব্বল যারা তারাই শুধু ভেবে মরে পাপ! পাপ! পাপ! স্ত্রীলোকের মন নিয়ে পুরুষ যারা, তারাই শুধু ভাবে ভগবান একজন আছেন, তিনি পরলোকে তোমার মাথা কাট্‌বার জন্মে ধারালো তলোয়ারখানা উঁচিয়েই আছেন! ভয় করবে শুধু মানুষের বিচারকে—মানুষের খড়্গকে ব্যস্। যদি তার হাত থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চল্‌তে পার, তাহলে আর তোমায় পায় কে? চারিদিকে চেয়ে দেখ—এমনি করেই কাঙ্গাল হয়েছে রাজা! তারা যদি হয়ে থাকে, তুমি হবে না কেন বল্‌তে পার ?”

দৃঢ়চিত্তে গোবিন্দলাল বলিল—“ঠিক বন্ধু, ঠিক। তা না হলে আমার পিতার অর্থে আজ লম্পট গৌরদাস জমীদার, মেঝিয়ার সমাজের কর্ত্তা—আর আমি বেড়াই পথে পথে কেঁদে।”

সংসারের প্রবেশ পথে এইরূপে দীক্ষা লইয়া গোবিন্দলাল যখন রামরতনের সঙ্গে হরি সামন্তের প্রাঙ্গণে আসিয়া

উপস্থিত হইল, তখন হরিসামন্ত দরিদ্র-নারায়ণের বার্ষিক সেবা পরম যত্নে সম্পন্ন করিয়া বকুল বৃক্ষ তলে চঞ্চল চরণে পদচারণা করিতেছিল।

গোবিন্দলাল কোন কথা না কহিয়া তাহার পদনিম্নে সহস্র মুদ্রার তোড়াটী রাখিয়া প্রণাম করিল।

যাহাকে আর ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, সেইরূপ চমকিয়া উঠিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে হরিসামন্ত কহিল, "কেও? গোবিন্দলাল?"

"আজ্ঞা হাঁ। আজ ত বছর শেষ হল—তাই এসেছি।"

হরিসামন্ত কোন কথা কহিতে পারিল না। গোবিন্দলালের কর ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হো হো—হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। শেষে কহিল "তুমি এত টাকা কোথায় পেলে?"

গোবিন্দলালের প্রফুল্ল মুখ লাল হইয়া গেল। চরণ হইতে তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। পড়িয়া যাইবার ভয়ে সে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল!

সাদিয়াল রামরতন তখন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিল, "কি সামন্ত মশায়, কুশল ত? আমি সাদিয়াল রামরতন—আমায় চিন্‌তে পারছেন না? গোবিন্দলাল বড় ভাল ছেলে—আমি ওকে ছেলেবেলা থেকেই জানি। ওর একাগ্র সাধনা দেখে টাকাটা না দিয়ে আর আমি থাকতে পারলাম না।"

হরিসামন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনি কর্জ্জ দিয়েছেন?"

"আজ্ঞা হাঁ, ও সামান্য টাকা—"

বাধা দিয়া হরিসামন্ত কহিল, "আপনার কাছে সামান্য বটে, কিন্তু ফিরে পাবেন ত?"

হরিসামন্ত পুনঃ পুনঃ রামরতন ও গোবিন্দলালের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। গোবিন্দলালের দৃষ্টি তখন ভূপৃষ্ঠে, তাহার উভয় চরণ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। রামরতন তাহা লক্ষ্য করিল এবং হাসিতে হাসিতে গোবিন্দলালের কর সবলে ধারণ করিয়া কহিল—

"কি বন্ধু, আমার টাকা কি শোধ দেবে না?"

গোবিন্দলাল অর্থশূন্য দৃষ্টিতে হরিসামন্তের ও রামরতনের মুখের দিকে চাহিল। রামরতন তখন হরিসামন্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কায কর্ম্ম আরম্ভ করলে দু'দিনেই শোধ করবে।"

হরিসামন্ত সে কথায় কর্ণপাত করিল কি না বুঝা গেল না। সে তীব্র কণ্ঠে গোবিন্দলালকে বলিল, "তবে তুমি এ টাকা উপার্জ্জন কর নি?"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রামরতন কহিল, "এও উপার্জ্জনই ধরুন।"

"কেমন করে?"

রামরতন তখন তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় গোবিন্দলালের অতীত কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। তাহার দুইখানি কর ধরিয়া দেখাইল, পাথর কাটিতে কাটিতে কিরূপে তাহা ছিন্ন হইয়াছে। তাহার পর, দামোদরে সেই আত্মবিসর্জ্জনের কথা!

এবার পাষাণ গলিল। হরিসামন্তের চক্ষে জল দেখা দিল। সে গোবিন্দলালকে নিজের পার্শ্বে টানিয়া লইয়া সস্নেহে কহিল, "গোবিন্দলাল! ভিখারীও ভালবাসে বটে। আজ থেকে সরযু তোমার।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হস্ত প্রসারণ মাত্রেই যাহা পাওয়া যায়, যাহা পাইতে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না—তাহা পাইলেও মনে হয় না যে কিছু পাইলাম। সে পাওয়ায় তৃপ্তি নাই। কিন্তু যাহা পাইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়-শোণিত অর্ঘ্য দিতে হয়, তাহা পাইলেই মনে হয় জীবন ধন্য হইল। সরযুকে পাইয়া গোবিন্দলাল সেইরূপ ভাবিল। সরযুর লীলা-চঞ্চল সহাস নয়নে, প্রস্ফুটিত নলিনীবৎ প্রফুল্ল বদনে সে বিশ্বকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাইল। গোবিন্দলাল মনে করিল, পৃথিবীর সকল সুখ—সকল তৃপ্তি—বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য তাহার জন্য সেই নয়নে বদনে সঞ্চিত রহিয়াছে। সরযূ যখন নিদ্রা যাইত, তখনো তাই গোবিন্দলাল পলকহীন নেত্রে

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিত। সে ভাবিত, তাহার পৃথিবী একখানি মধুর রাগিণী, অন্তহীন গান—উহা কবিতা, স্বপ্ন, উহা নর্ম্মসহচরীর কলকণ্ঠ মুখরিত বাসন্তী পূর্ণিমা।

একদিন হরিসামন্ত গোবিন্দলালকে ডাকিয়া কহিল, "আমি বুড়ো হয়েছি, আর ক'দিন" আমার কাছে থেকে যতটুকু জানবার তা ত জানলে; এখন নিজে একটা কায কর্ম্মে প্রবেশ করেছ দেখে গেলেই নিশ্চিন্ত হই।"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমিও ক'দিন থেকে সেই কথাই ভাব্‌ছি। মনে করেছি কলিকাতায় যাই।"

"সে ভালই ত। কলকাতা হলো রাজধানী। দেশ বিদেশের লোক সেখানে; অর্থ উপার্জ্জনের স্থানই ত সেই। একলা গিয়ে কি কিছু করতে পারবে?"

সাহসপূর্ণ কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "পারব বৈকি। দু'তিনবার গিয়েওছি। শুশুনিয়ায় যে সাহেবরা পাথর কাটেন, একবার তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে তিন দিন ছিলাম। বড় সাহেব আমার উপর বড় খুসী ছিলেন। বলেছিলেন গদিতে চাকরী দেবেন।"

গম্ভীর হইয়া হরিসামন্ত বলিল, "চাকুরিতে পেট ভরে না গোবিন্দলাল, চাকুরিতে পেট ভরে না। অথচ লাঞ্ছনার সীমা নাই। একটা ছোট খাটো ব্যাপার আরম্ভ কর।"

"কি করতে বলেন?"

মৃদু হাস্য করিয়া হরিসামন্ত বলিল, "যা' কর তাই দেখবে চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। মান সম্ভ্রমও আছে, অর্থও আছে। কলকাতার পথে একটা পাণের দোকান আছে যার, তার যতটুকু মান আছে, একজন বড় চাকুরের অনেক স্থানে তা' নেই! এ অঞ্চলে মহুয়া আর কেওলিনের অভাব নেই। প্রথমে এই দুটো নিয়েই আরম্ভ কর না। আমি ত এখানেই আছি—অনেক মাল সংগ্রহ করে দিতে পারব।"

গোবিন্দলাল যেদিন মহুয়া ক্রয় করিবার জন্য সোণা-মুখীর হাটে যাইবে, সেদিন হাজার টাকার তোড়া বাহির করিয়া হরিসামন্ত তাহার হস্তে দিল। কহিল, "মনে রেখো—এই তোমার মূলধন। এ তোমার ঋণের টাকা—উপার্জ্জন করে শোধ দিতে হবে!"

তোড়া দেখিয়াই গোবিন্দলাল চিনিল, এ সেই ঘাটোয়ালের রুধিরে লিপ্ত টাকা! একবার তাহার হাত কাঁপিল বটে, কিন্তু সে শ্বশুরের হস্ত হইতে উহা লইল।

গোবিন্দলাল জানিত যে সরযূ তাহাকে বলিয়াছে, "ভগবানের দণ্ডের আর ভয় কোর না—তিনি দয়াময়। আমি সমস্ত জীবন তাঁরই পূজায় কাটাব—নিত্য নিত্য ব্রত-নিয়ম করব—তোমার একটু সুবিধা হলেই নানা তীর্থ ভ্রমণ করে আস্‌ব; এতেও কি তিনি প্রীত হবেন না, আমাদের ক্ষমা করবেন না?" গোবিন্দলাল ভাবিল, সরযূর পুণ্যে সেও পবিত্র হইবে। তাহার মনের ভয় তাই অনেকটা দূর হইয়াছিল।

* * * *

সেকালের ধূলি-ধুসরিত পয়ঃনালীর গন্ধে পরিপূর্ণ, মশক ও মক্ষিকাকুলের বিহার-ভূমি কলিকাতা—এ কালের সুরপুরী সদৃশ কলিকাতা ছিল না বটে, কিন্তু একালের ন্যায় সেকালেও উহা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। গোবিন্দলাল কলিকাতায় যাইয়া শ্যামবাজারে বাসা লইল এবং মহুয়ার তৈল ও বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট তামাক বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল।

কমলা কৃপা করিলে ধন আপনিই আসিয়া চরণ-তলে লুটাইয়া পড়ে। গোবিন্দলালেরও তাহাই ঘটিল। কলিকাতা তখন অপরিচ্ছন্ন খোলার কুটীরের সজ্জা ছাড়িয়া, দ্বিতল ত্রিতল চতুস্তল হর্ম্ম্যাবলীতে সুশোভিত হইতেছিল। সেই সকল হর্ম্ম্য শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করিতে কেওলিনের টান পড়িল। মহুয়া বিক্রেতা গোবিন্দলাল তখন মহুয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেওলিনেরও কায আরম্ভ করিল। ক্রমে বিষ্ণুপুর ও রাজঘাট-বীরসিংহের উৎকৃষ্ট তসরের শাড়ী ও ধুতি আসিল, বাঁকুড়ার পিত্তলের বাসনে তাহার নূতন বাজারের নূতন দোকান ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। সে দোকান আর তখন অখ্যাত অপরিচিত দরিদ্রের খোলার ঘর রহিল না—উহা ক্রমে শ্যামবাজারের অন্যতম

দালাল ধনকুবের গোবিন্দলাল রায়ের সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় পরিণত হইল !

গোবিন্দলালের সমব্যবসায়ীরা বলিতে লাগিল—"কি কপাল এই গোবিন্দলালের ! ধূলা ধরলে সোণা হয় ! অথচ ব্যবসায় বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে বেশী—তা'ত নয় ! বরং বোকা। বাজারের হাল-চাল জানে না, কিছু জিজ্ঞাসা করলেই হাঁ করে থাকে। কথায় কথায় আমরা যতটুকু বলি, সেই পর্য্যন্ত তার বিদ্যা। অথচ টাকা দেখ লোকটার। শ্যামবাজারে, ধর্ম্মতলায়, নূতন বাজারে, চৌরঙ্গীতে দোকান চল্‌ছে—তার উপর দালালী ! একেই বলে ভগবানের দয়া !"

গোবিন্দলাল এ সকল মন্তব্য শুনিয়া হাসিত এবং ইচ্ছা করিয়াই আরও বেশী নির্ব্বোধ সাজিত। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদী ঘরের সন্তান বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আলাপে, ব্যবহারে, সৌজন্যে, বিনয়ে, আপ্যায়নে, অসময়ে মানীর মান ও ধনীর ইজ্জৎ রক্ষায় তৎপর গোবিন্দলালের সমকক্ষ লোক দেখিতে পাইতেন না। দুই প্রহর রজনীতে গেলেও গোবিন্দলাল তাঁহাদিগকে গোপনে টাকা কর্জ্জ দিত। পাঁচ হাজারের হ্যাণ্ডনোট দিলে সে তিন হাজার দিত বটে, কিন্তু তেমন অসময়ে, আর সহজে, বিনা দলিলে কোথায় টাকা মিলে বল ? অথচ তেমন অসময়ে কলিকাতার এবং কলিকাতা প্রবাসী মফস্বলের অনেক জমীদারেরই টাকার প্রয়োজন হইয়া থাকে !

গোবিন্দলাল তখন ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা কহিত, বড় বড় হৌসের সংবাদ রাখিত। বিলাতী জাহাজ কবে আসিয়া কলিকাতার কোন্ ঘাটে ভিড়িবে এবং কি পণ্য নামাইবে গোবিন্দলাল তাহা সকলের পূর্ব্বেই জানিতে পাইত।

কলিকাতার কোন্ পান্থ নিবাসে আমেরিকা বা ফ্রান্সের কোন্ বড় সাহেব আসিতেন যাইতেন থাকিতেন, সে তালিকা গোবিন্দলাল সংগ্রহ করিত এবং সাহেবদিগকে সঙ্গে করিয়া নিজের চৌরঙ্গীর ও ভারতীয় কিউরিওর দোকানে লইয়া যাইত। জাহাজী গোরা এবং য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী এইরূপে তথায় আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন এবং চারি আনায় জিনিস অনায়াসে দশ টাকায় ক্রয় করিয়া মনে করিতেন খুব জিতিলাম। এবং নবাগত বন্ধুদিগকে বলিতেন—'ভারতীয় সভ্যতার এমন প্রাচীন নিদর্শন বিলাতের কোন লর্ডের বৈঠকখানাতেও নাই ! কত না বিপুল শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া, পদে পদে নিজের প্রাণ হাতে লইয়া এই গোভিন্ রে' ভারতবর্ষকে য়ুরোপের কাছে পরিচিত করিতেছেন। ইনি একজন 'ট্রু জেণ্ট্'। কোথায় দুর্গম তিব্বৎ ও নেপালের বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মচক্র, আর কোথায় ব্যাঘ্র ভল্লুক ও হায়েনায় পরিবৃত বিপদ সঙ্কুল শুশুনিয়ার বনভূমিতে প্রাপ্ত কুক্কুট শোণিতে সিক্ত শিলা খণ্ড, কোথায় সেই অনাদি কালের বুড়া শিবের সিন্দুর রঞ্জিত শিঙ্গা, আর কোথায় বা ভীষণ দর্শন নাগমুকুটে সুশোভিত চতুর্ভুজা মনসা, কোথায় রাজাধিরাজ দেবপালের বর্ম্ম, মহারাজ বিজয় সেনের অসি, আর কোথায় সম্রাট্ সাজাহানের জুতা, যাহা তিনি বন্দী হইবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিতেন এবং নানা সাহেবের উষ্ণীষ, আজিও যাহার প্রান্তভাগ রুধিরে রঞ্জিত রহিয়াছে, এই অসমসাহসিক প্রত্নতত্ত্বকুশল 'গোভিন্ রে'র নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। আবশ্যক হইলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সকল সংগ্রহও করিয়া দেন !

বন্ধুর কথা শুনিয়া নবাগত সাহেব মনে করিতেন, অসাধারণ কর্ম্মবীর এই গোভিন্ রে ! ইহার নিকট হইতে ভারতবর্ষের 'কিউরিও' ক্রয় করিয়া দেশে লইয়া না গেলে ভারতে আগমনই প্রমাণিত হইবে না। মূল্য যাহাই কেন হউক না, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স এ সকল দেশে ত অর্থের অভাব নাই ! ভারতের দশ টাকা মূল্যের কিউরিও সে সকল দেশের প্রতিযোগিতার বাজারে হাজার টাকায় কাটে !

ক্রমশঃ দেখা গেল গোবিন্দলালের শ্যামবাজারের দ্বিতল বাটী ত্রিতল হইল। দ্বিতলের কুসুমিত লতায় পরিবৃত বারান্দায় ছোট ছোট দুইটী বালক ও একটী বালিকা হাসে, খেলে—দৌড়াইয়া বেড়ায়। তাহারা

গোবিন্দলালেরই পুত্র কন্যা। তাহার দ্বারের সম্মুখে তখন কলিকাতার অনেক ধনাঢ্যের যুড়িগাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করে, সাহেব-সুবার তকমা বাঁধা চাপরাসিরা চিঠি-পত্র লইয়া তাহার গৃহে যাতায়াত করে। গোবিন্দলালের তখন আহার নিদ্রার পর্য্যন্ত সময় নাই—সে সর্ব্বদাই বলে, "পরের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই গেলাম !"

মধ্যে মধ্যে এক একবার দুঃস্বপ্নের মত গোবিন্দলালের মনে হয় যে ভগবান আছেন, তিনি পাপীর দণ্ডদাতা। তখন সে সরযূকে ডাকিয়া বলে, "অর্থ, মান, পদ সবই পেয়েছি সরযূ, কিন্তু সে ভয়টা ত যায় না !

সরযূ বলে, "সে জন্যে ভেব না। আমি ত ব্রত নিয়ম করছিই—গঙ্গাস্নান কোন দিন বাদ দিই না। এবার থেকে বৈশাখের প্রতি মঙ্গলবারে উপবাসীও থাকব। তোমার একটু অবসর হলেই, চল কিছু দিনের জন্যে বেরিয়ে পড়ি—তীর্থ ভ্রমণ করে আসি।"

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গোবিন্দলাল কহে, "ঠিকই বলেছ সরযূ। আর বিলম্ব করা চলে না, এর মধ্যেই একটু সময় করে' নিতে হয় দেখছি। দরিদ্র ভিখারী যারা আসে, তারা দান পাচ্ছে ত? শনি, মঙ্গল বারে কালীঘাটে পূজা পাঠাচ্ছ? আমার ত এখন মরবার পর্য্যন্ত অবসর নাই—তা এসব দেখি কখন্ !"

সরযূ তখন গোবিন্দলালকে ভরসা দিয়া বলে, সবই নিয়ম মত হইতেছে। তাহার শরীর একটু পটু হইলেই সে কৃচ্ছ্র সাধনে মন দিবে—ভগবানের কৃপা পাইতে হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন ত চাই-ই।

এইরূপে দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়। গোবিন্দলালেরও সময় হয় না, সরযূর শরীরও তেমন পটু হয় না।

ভগবানের প্রীতি-কামনায় গোবিন্দলাল আজ যাহা পণ করে, নানা অনিবার্য্য কারণে কাল তাহা রক্ষা করিতে পারে না। কখনো কাযের ঝঞ্ঝাটে প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃতই হয়! যদি বা কোন দিন পণের কথা মনে পড়ে, সেদিন আবার লৌকিক সৌজন্যের জন্য এ বাড়ী-ওবাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়—'দশের ডাকে' সভায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেই পরদিন আবার নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনিতে হয়—নহিলে লোকে বলিবে কি!

যদি বা সরযূ কোন দিন সুস্থ বোধ করে, সেদিন আবার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে কাহারও পেটের পীড়া কি মাথাব্যথা, কি সর্দ্দি—অথবা অমনি আর একটা কিছু হয়ই! এদিকে গুদামে মহাজনের মাল জমিয়া যায়, বিলাতী জাহাজও যখন-তখনই ছাড়ে—গোবিন্দলালের সময় বা অসময়ের অপেক্ষা রাখে না! কাযেই জাহাজের সময়কে মানিয়াই গোবিন্দলালকে চলিতে হয়—নহিলে কথা ঠিক থাকে না—বাজার-দরের হের-ফের হয়—মহাজনের ক্ষতি করিলে আর দালালী চলে না! গোবিন্দলাল দেখে এইরূপ ছোট-বড় উৎপাতের অন্ত নাই—নিত্যই আসে নিত্যই আসে! সেই সকল উৎপাত নিবারণের জন্য দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিয়া গোবিন্দলাল এতই শ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, ঘাটোয়ালের শোণিতের কথা তাহার আর স্মরণ-পথেও উদিত হয় না! সে অন্য সকল কায সারিয়া ভগবানকে ডাকিবার আদৌ সময় পায় না। কাযও শেষ হয় না—ডাকিবার অবসরও ঘটে না! কাযের ত দেরি সয় না—সুতরাং সে কাযই করে।

সরযূর বিশেষ অনুরোধে বৃদ্ধ হরিসামন্ত বৎসরে অন্ততঃ ৭।৮ মাস কাল কন্যার বাড়ীতে আসিয়া বাস করে এবং তাহার সুখ ও সম্পদ দেখিয়া সুখী হয়। উপবাসাদি করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের কথা মুখে আনিলেই হরিসামন্ত স্নেহ-মধুর কণ্ঠে কহে—"তোমার কি মা এখনই সেই বয়স? তুমি পারবে কেন? ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে হবে ত। ও-সবের অনেক সময় পাবে তখন করলেই হবে।"

গোবিন্দলালও ভাবে, এখনই বা তাড়াতাড়ি কি করলেই হবে! দান করছি, গঙ্গাস্নান করছি, দেবালয়ে পূজাও পাঠাচ্ছি, চুপ করে ত বসে নেই!

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

যাত্রা-সাহিত্য

সাহিত্য ক্ষেত্রে যাত্রার পালা বা গীতাভিনয় গুলির কোন বিশেষ স্থান নাই, সাহিত্য সংসারে পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক গীতাভিনয় গুলি উপেক্ষণীয় হইয়া রহিয়াছে। জীবন সমস্যার অপূর্ব্ব ঘাত প্রতিঘাতে ঐ সকল পুস্তকের কাহিনীগুলি উচ্ছ্বাস-ফেনিল নহে এবং উচ্চাঙ্গের কবিত্বও হয়ত উহাতে পাওয়া যায় না,—উহার যাহা কিছু কবিত্ব ও রস তাহা অভিনয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধব্য, 'এজন্য সমালোচকের ও পাঠকের কাছে যাত্রা সাহিত্য আদরণীয় নহে। কিন্তু আমার মনে হয়,—শুধু মনে হওয়া নয় একথা খুবই সত্য যে—অধুনাতন কালে সাহিত্যের বাজারে যে সকল চিন্তাস্রোতের আদান প্রদান বা কারবার চলিয়াছে, যাত্রা সাহিত্য সেই সকল অসংলগ্ন চিন্তাস্রোতের অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময় ইহা প্রলাপোক্তি নহে। রুচিবাগীশদের কথা বলিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা সত্য সত্য সাহিত্যের সমঝদার তাঁহাদের কাছে যাত্রা গান তিক্তস্বাদ নহে, এবং যাত্রা গানের কতক গুলি বিষয় বাদ দিলে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসারই যোগ্য। তবে আমরা নাকি সুসভ্য জাতি এবং সুকুমার-সাহিত্য-রসের বোদ্ধা, তাই আমাদের নিজের দেশের তথাকথিত "নীচ ব্যবসায়ী" যাত্রার দলের পালা লেখকদিগকে সাহিত্যের দরবারে আমল দিতেছি না। যখন দেখি প্রোভাঁসের গ্রাম্য কবি মিস্ত্রালকে নোবেল প্রাইজ প্রদত্ত হইয়াছে, তখন আমাদের একথা বলিতে মুখে বাধে না যে, প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচ্যে গুণবানের আদর আছে। অথচ আমাদেরই কুটীর দুয়ারে কত গুণবান ব্যক্তি অবহেলার বিষাক্ত ধিক্কারে নির্জ্জিত হইয়া উপযুক্ত সমাদর ও উৎসাহাভাবে স্ব স্ব সারস্বতী প্রতিভার পরিপূর্ণ সুপ্রকাশ ঘটাইতে পারিতেছেন না সে দিকে একবার অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করি না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্যিক পরগাছার মত বাঙ্গালার বুকে গজাইয়া উঠিয়াছে এবং যাহা কিছু পুষ্টি ও তুষ্টির মাল মসলা তাহার বেশীর ভাগই বিদেশী সাহিত্য হইতে কর্জ্জ করিয়া কায চলিতেছে। একথা বলি না যে, বিদেশীয় সাহিত্য-রস পরিবর্জ্জনীয়; বরং একথাই বলিতে চাই, দেশ বিদেশের ভাব-ধারার একত্র সম্মিলন না হইলে খাটি এবং বহুভঙ্গিম সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি যদি উদার হয়, তাহা হইলে স্বদেশীয় সাহিত্যকেও যথার্থ ভাবে শ্রদ্ধাপূর্ণ সমাদর প্রদান করিতে আপত্তি থাকা উচিত নহে। অথচ এদেশে এইরূপ আপত্তিই উঠিয়াছে। যে দেশে ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল প্রভৃতিকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মানব বলিয়া ধারণা দাঁড়াইয়া গেছে, যে দেশে উচ্চ শিক্ষার পরিণাম আত্মীয় স্বজনগণকে উপেক্ষা করা, যে দেশের মহাকবি বিদেশ হইতে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপহসিত, সে দেশে গুণগ্রাহিতার প্রচলন কতখানি ইহা আর ওজন করিতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বাল্যে শুনিতাম "লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।" বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম এই প্রবচনটী গাড়ী ঘোড়ার দিক দিয়া যতটা না হউক, অন্য এক দিক দিয়া খুব সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। লেখাপড়ার ফলে গাড়ী ঘোড়া না হইতে পারে, কিন্তু অহঙ্কার খুবই হয়। এবং অহঙ্কারের বলে যাহা কিছু দেশীয় বস্তু, সবই উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই অহঙ্কারের কাচের বাসন বৈদেশিকের চরণাঘাতে বিদীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু দেশীয়দিগের কাছে ইহার বাহ্বাস্ফোটের আরও অন্ত নাই। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এত যে শিক্ষা দীক্ষার বড়াই করিতেছি, কিন্তু জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে এমন কি দিতে পারিলাম, যাহার জন্য

যথার্থই গর্ব্ব করা যায়? যখন আমরা প্রকৃত চিন্তাশীল হইতে পারিব তখন বৈদেশিক চিন্তা ভাণ্ডার হইতে মণিরত্ন সংগ্রহ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশের সাহিত্যকেও গ্রহণ করিতে দ্বিধা থাকিবে না।

আমার বয়স যখন চৌদ্দ পনের, সেই সময় আমার এমন বাতিক ছিল যে, দশ বার ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া যাত্রা শুনিতে যাইতাম। তখন বয়স এবং বুদ্ধি বিদ্যার অপরিণতি জন্য যাত্রাগান যতটা ভাল লাগিত, এখনও ঠিক তেমনি রোচক বলিয়া মনে হয়। যাত্রা শুনিতে যাইয়া আজকাল আসরে প্রথমেই লক্ষ্য করি, শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বেশী আছে না কম আছে। যদিও ২।৪ জন উকীলকে যাত্রার আসরে গান শুনিতে দেখি, কিন্তু হাকিম বা প্রোফেসার দিগের সংখ্যা বিরল বলিয়াই মনে হয়। "ধ্রুবতারা"র গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুকে গোয়াড়ীর বারোয়ারিতে বহুক্ষণ বসিয়া যাত্রা শুনিতে দেখিয়াছি এবং সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ও যাত্রার খুব অনুরাগী; অথচ ইঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধিও আধুনিক মানদণ্ডে কম বলিয়া মনে হয় না। কথায় আছে "কৃষ্ণ কেমন?" না "যার মন যেমন।" যাত্রা সাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের অহেতুক বিরাগ, তাঁহারা যাত্রা জিনিসটীর মূল উদ্দেশ্য এখনও ধরিতে পারেন নাই; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যাত্রার দলকে বলিয়াছিলেন "নীচ ব্যবসায়ী"। হাঁ, যাত্রার দল নীচ ব্যবসায়ী ইহা স্বীকার না হয় করাই গেল, কিন্তু নীচ আর উচ্চ ইহার মাপ-কাঠি ত আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই! যাত্রা নীচ ব্যবসায় হইতে পারে, কিন্তু থিয়েটার খুব উচ্চ ব্যবসায় নাকি? আর্টের উৎকর্ষ অপকর্ষের দিক দিয়া থিয়েটার ও যাত্রার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার চলিতে পারে; এবং তাহার ফলে যাত্রা-সাহিত্য নিম্ন স্তরেই স্থান পাইতে পারে; কিন্তু যাত্রার দল গ্রামে গ্রামে যাইয়া শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে যে ভগবানের মহিমা গান, পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় প্রভৃতির অভিনয় করে, ইহার মূলে আর্ট হয়ত আদৌ নাই, একটা উচ্চ আদর্শ যে আকারেই হউক ইহার মূলে থাকেই! সেই আদর্শটার দিক দিয়াই, অন্যে যাহাই বলুন, আমি অন্ততঃ যাত্রার নিন্দা করি না। থিয়েটার ভাল জিনিস হইতে পারে, যাত্রাই বা কি মন্দ? যাত্রাও ভালই! আমি নিম্নে যাত্রার দলের বিভিন্ন পালার নমুনা স্বরূপ কয়েকটি গান উদ্ধার করিয়া রসিক সমাজে ধরিয়া দিতেছি, তাঁহারাই বলুন, আমি যে যাত্রাকে ভাল জিনিস বলিতেছি সে কথা যথার্থ কিংবা ভুল? নারদ একদিন ভগবানকে আশীর্ব্বাদছলে যে উপদেশটী দিয়াছিলেন, অন্যের কেমন লাগে জানি না, কিন্তু দেশ বিদেশের সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী আমি, আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটীর রচয়িতা ৺অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

"তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করি হে শ্রীহরি।
প'ড়ে অকূল ভব পাথারে, ডাকিলে কাতরে,
ভক্ত প্রাণধন মুক্ত কোর তারে
নিদানে প্রদানে পদ-তরি।

কলুষ কাতর নরে, ডাকে যদি সকাতরে
(পাপীর করুণ স্বরে কোর কর্ণপাত)
কর্ণকুহর হরি নিতান্ত বধির তব,
মম আশীর্ব্বাদে ত্বরায় সে রোগে আরোগ্য লভ,
ভক্তজনের ডাকে ও হৃদি-পাষাণে
যেন বহে প্রেমবারি।"

উদাসী বৈরাগী নারদের পক্ষে ইষ্টদেবের কাছে এ[illegible] শ্রদ্ধাপূর্ণ আশীর্ব্বাদটী বাস্তবিকই উপভোগ্য। গান[illegible] "দণ্ডীপর্ব্ব" গীতাভিনয়ে পাওয়া যায়।

কতদিন অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ম্লানদ্যুতি-মণ্ডিত ন[illegible] তীরের গোষ্ঠ প্রত্যাগত রাখাল বালকগণের মুখে নি[illegible] লিখিত "সুরথ উদ্ধার" পালার অহিভূষণ রচি[illegible] গানটী শুনিয়া সংসার ভুলিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি;—

"দাদা গো,—
কেবা কার পর কে আপন?
কাল শয্যা'পরে, মায়া-তন্দ্রাঘোরে
দেখে পরস্পরে, (অসার) আশার স্বপন।

স্রোতের তৃণের সমান ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে,
(আবার) কাল-স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে
কোথায় চলে যাব—কি আছে নিরূপণ।
এক তৃণ ছাড়ি অন্য তৃণ ধরি,
অনন্ত সাগরে মিশিব,
(এবার) হয়েছি ভাই তব, আবার কার ভাই হব,
(শেষে) এ আত্মা করিবে অনন্তে গমন।

যাত্রা সাহিত্যে অহিভূষণের পরেই ৺হারাধন রায়ের নাম করিতে পারি। ইহাঁর একটী গানের নমুনা দিলাম—

"কামনা যেখানে, শ্রীহরি সেখানে,
থাকে না, থাকিতে পারে না।
রবি আর নিশি, এক সঙ্গে মিশি,
কোন স্থানে কভু আসে না॥
মায়া মরে না, মনও মরে না,
আশা পিপাসা মরে না,
এই দেহ মরে বারম্বার ঘুরে,
হরি প্রেম বিনা তরে না।
মরণের ভয় থাকে যতক্ষণ,
প্রেমিক না হয় কেহ ততক্ষণ,
বিনা হরিপদে প্রাণ সমর্পণ
এ ভব যাতনা যাবে না—
ঘুমায়ে থেক না শিয়রে শমন,
না জাগিলে হরি পাবে না॥"

—এই গানটী "তাম্রধ্বজ" পালা হইতে উদ্ধৃত হইল।

"ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ" পালায় একটী প্রস্তাবনা সঙ্গীত আছে—

"এস হৃদে এস হৃষীকেশ।
অলস ঘুমের ঘোরে, আশার স্বপন ছবি,
বিকসিত কর পরমেশ।
এস মনোজমোহন মুনি সঙ্গ
এস রসিক মানস রস ভৃঙ্গ,
ভাব বিভঙ্গে, এস হে ত্রিভঙ্গে,
(হৃদি) কমলে যুগলে কর সঙ্গ ;
দাও শকতি রচিতে গীতি-হার,
বাসনা করিতে তব মহিমা-প্রচার,
নীরস কঠিন প্রাণ, যেন হে গলিয়া যায়,
শুনি তব মহিমা অশেষ।"

—ইহার রচয়িতা কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাত্রা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ একজন সুলেখক। তাঁহার একটী গান এইরূপ—

"এই বৃন্দাবনে কালিন্দী পুলিনে
তাই আছি আমি তাই,
অধরে বাঁশরী, শিরে চূড়া ধরি
রাই বলে বাঁশী বাজাই।
বাঁশীতে তুলেছি তান, মানিনী ভুলেছে মান,
স্বামী আদরিণী, রূপে গরবিণী,
পাগলিনী শুনে গান ;
রাই বলে আমি বাঁশী ভালবাসি
(তাই) সাধি বাঁশী দিবা নিশি,
যে আমারে ভালবাসে চিরকাল,
তারে আমি প্রেম বিলাই।"

যাত্রা-সাহিত্যের সুলেখগণের নাম উল্লেখ করিতে গেলে শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দত্তের কথা মনে পড়ে। অভয়চরণের গানের কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল। ইহাঁর রচিত "মান্ধাতা" পালায় এই গানটী আছে।

এস নাই কেউ কোন কালে চিরদিন বাঁচিতে ভবে।
সন্ধ্যা হলে জীবন-রবি অস্তাচলে যাবে ডুবে।
দারা পুত্র পরিজন ভেবেছ কি আপন জন
মহাঘুমে হলে মগন চিতায় তোমায় জ্বেলে দেবে ;
পরশে অশুচি বলে অবগাহে গঙ্গাজলে
চিতার সঙ্গে কেউ যাবে না
"আমার" "আমার" করে সবে।
বিষয় বিত্ত পড়ে রবে, ছল বল লয় পাবে
"আমার" "আমার" ঘুচে যাবে
শমন এসে বাঁধবে যবে।

জীবন-তরী মগ্ন হলে কাল-সিন্ধুর অগাধ জলে
সে কি ভাসে কোন কালে ডোবে যদি লক্ষ জীবে।"

"যুগল-বীরকুমার" প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের অন্য কোন গান মনে না থাকায়, নিম্নে উক্ত পালায় জ্ঞানানন্দের মুখ দিয়া তিনি যে গানটী ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

এ্যায়সা প্রেমধন ক্যায়সে মিলে
বল্ রে চণ্ডাল বন্ধু ভাই,
হাম আশী লক্ষ জনম ঘুরলেম,
এমন প্রেম তো পেলাম নাই।
যদি চণ্ডাল হলে এ প্রেম মিলে
বল্‌রে চণ্ডাল দাদা ভাই,
আমি মনে প্রাণে ধ্যানে বসিয়ে বসিয়ে
চণ্ডাল জনম মাগিয়ে যাই।
যদি ভজন ছাড়িয়ে এ প্রেম মিলে
বল্‌রে চণ্ডাল সুধাই ভাই,
আমি জনম ভোর জড় বনিয়ে
হর রোজ পড়িয়ে কীট শুকাই,
যদি চক্ষু মুদলে এ প্রেম মিলে তো
জনম অন্ধ হইয়ে যাই।
নিদ ছোড়িয়ে এ প্রেম মিলে তো
জল-জন্তুর কাছে ধাই,
দে রে চণ্ডাল, দে রে বন্ধু,
একটু প্রেমের বখ্‌রা ভাই,
বুকে বুকটা মিলিয়ে দে রে
জনম জ্বালা সব জুড়াই।

শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ভক্তিপূর্ণ গীতাভিনয় গুলিই যাত্রা সাহিত্যের অলঙ্কার। ইঁহার একটী গানের নমুনা এইরূপ। গানটী কোন্ পালার তাহা জানি না, তবে ইহা যে তাঁহারই রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

"হয়েছি আকুল, হও অনুকুল
কোথা অকুলেরকুল গোকুলবিহারী।
কর জীবনান্ত ওহে রাধাকান্ত,
যেন লয়না কৃতান্ত, ওহে কালান্তকারি।
এ জীবনে, মম কিবা প্রয়োজন,
কোন কার্য্য মোর হল না সাধন,
আসিলাম শুধু করিতে রোদন,
এখন মরণ বিনা রোদন যাবে না হরি।
জলের বিম্ব উঠে জলেতে মিলায়,
এ সংসারের বল কিবা ক্ষতি তায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণ্ প্রায়
কিবা আসে যায় অভাবে আমারি।"

যাত্রা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও প্রতিপত্তি অসাধারণ। তাঁহার নিম্নলিখিত গানটী অতি মনোজ্ঞ। এই গানটি "শ্রীগৌরাঙ্গ" পালায় আছে।

আয়রে নিমাই, আয় খেলি ভাই
বৃন্দাবনের মধুর খেলা।
আমরা রাখাল, মোদের ভুপাল,
তুই হ কানাই নন্দলালা।
আমরা কেউ বা পাত্র কেউ বা কোটাল,
কেউ বা হব ছত্রধারী,
কেউ বা হব প্রজা, তুই হবি রাজা,
ক'রবি আজ্ঞা বংশীধারী,
খেলার শেষে ভেয়ে ভেয়ে,
বন-ভোজন করিব গিয়ে,
ফিরব ঘরে সাঁজের বেলা।"

ভক্তি-ভাবাত্মক গানে শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইঁহার কোন গীতাভিনয় উপস্থিত কাছে নাই, এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহার "দেবব্রত" নামক পালার একটী গান উঠাইয়া দিতেছি।

"হরি, সকল জীবের দেহ রথে
তুমি হে সারথি।
রথ সাজিয়েছি হে,
ছয় চক্র রথ সাজিয়েছি হে,—

(মূলাধার হ'তে সহস্রার এই ছয় চক্র রথ সাজিয়েছি হে)
(হও রথের চালক, ত্রিলোক পালক
তুমিই ত সারথি)
যুগে যুগে যোগী ঋষি,
যোগ সাধি দিবানিশি, ধরি ধরি ধ্যানে তোমা,
(ধরিতে নারে, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম তুমি,
ধারণাতীত সূক্ষ্ম তুমি)
অতি স্থূল রূপে স্বপ্রকাশিত সূক্ষ্ম তুমি ;—
যখন মানব রূপ ধরেছ,
(প্রণব রূপী হরি হয়ে
যখন মানব রূপ ধরেছ)
হও কমলনেত্র ধরি বেত্র সারথিত্বে ব্রতী।
ধর অশ্বরশ্মি প্রণতোহস্মি মাধব শ্রীপতি।"

"শ্রীকৃষ্ণ" নামক গীতাভিনয় প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের নিম্নলিখিত গানটী উক্ত পালা হইতে সংগৃহীত।

"হরিনামে পাষাণ গলে, জগৎ ভোলে,
পাগল ভোলা শ্মশান কোলে
তাল বেতালে নাচে গায়।
হরিনাম সুধা গান গাওয়ার ছলে
সাগর বুকে লহর তুলে,—
আপন মনে উধাও ধায়।
হরির নাম বিভূতি জগৎময়,
এ নাম শব্দে স্পর্শে রূপে রসে
গন্ধে রয় ;—
বল হরের্নাম, হরের্নাম,
হরিনাম বিনে আর নাই উপায়।"

"সগরাভিষেক" গীতাভিনয়ে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক মহাশয় নিম্নলিখিত গানটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিশোরবয়স্ক করুণ মূর্ত্তি সুশ্রী বালকগণের মুখে ইহা যেন সজীব হইয়া উঠে।

"(তাঁর কি) জাননা সন্ধান, করুণা-নিধান,
নিদান-বন্ধু হরি আছেন সর্ব্ব ঘটে।
(তোমায়) কইরে সন্নিধান, কর প্রণিধান,
(তাঁর) গুণের অবদান সুবিধান রটে।
যত্র তত্র তাঁরে ভাবে যায় রে দেখা,
পত্র পুষ্প ফলে নামের তথ্য লেখা,
নেত্র মুদে হের নিত্য প্রেম মাখা,
(তাঁর) মোহন চিত্র হের আপন চিত্ত পটে।
সূর্য্যরূপে তাঁর বীর্য্য বিভাসিত
সুধাকর করে স্নেহ প্রকাশিত,
অনন্ত আকাশে বৃদ্ধি বিকসিত,
লীলার দৃশ্য বিশ্ব নটে ;—
সৃজন স্বরূপে দেখান স্বরূপ,
সুজন সহজে বোঝে তাঁর স্বরূপ,
(তার) সন্দেহ কিরূপ, হরি বিশ্বরূপ,
(তিনি) প্রাণ-বারি রূপী প্রাণীর দেহ-ঘটে।"

বর্ত্তমান যাত্রা সাহিত্যের সব্যসাচী শ্রীযুক্ত ভোলান রায় মহাশয়ের "পৃথিবী" নামক গীতাভিনয় হই একখানি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

জলদ।—নয়ন কলস ভরা প্রেমবারি
এস গুরু চরণ ধুয়াই।
বিজলী।—আমার কি আছে আর অবলা নারী,
গুরুপদ কেশেতে মুছাই।
জলদ।—রবির কিরণে আহা মলিন বদন,
কর পত্র রচিত শিরে ছত্র ধরি,
বিজলী।—চির শীতলিতে ঐ সুকুমার অঙ্গ,
বসন অঞ্চলে আমি ব্যজন করি,—
জলদ।—আমি সর্ব্বসন্তাপ-কারণ হরি,
বিজলী।—আমি শান্তি স্বরূপিণী প্রাণে বিহরি,
উভয়ে।—আজি দুটি দেহ এক করি
এস গুরু পায়ে ধরি
সাধনার বেদনা শুধাই।
জলদ।—সফল জীবন মম, সফল সকল খেলা
সার্থক বেষ ভূষা, এ ভবে এবার,
বিজলী।—মরি কি শুভক্ষণে সমুদ্র মন্থনে,
সমপ্রাণা সঙ্গিনী হ'য়েছি তোমার।

জলদ।—আমি ব্রাহ্মণ পদরজঃ ভালবাসি,
বিজলী।—আমি যে তোমার পদে চিরদাসী
উভয়ে।—আজি দুয়েতে মিশিয়া যাই
দ্বিজ পদ চিহ্নে,
গুরু প্রেম জগতে বুঝাই।"

ছদ্মবেশী লক্ষ্মীনারায়ণের নরদেহধারী গুরুদেব অঙ্গিরা ঋষির প্রতি উপরিউক্ত গান খানি ভক্তি ভাবের সঙ্গে প্রেম রসের অপূর্ব্ব উদ্বাহ তাহাতে সন্দেহ নাই।

"প্রেমতি-মুক্তি বা নিয়তি লীলা" গীতাভিনয়ের লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটীও সুমধুর এবং প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট।

"তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলকরে জগতে রেখেছ সাজায়ে।
রবির কিরণ চাঁদের সুধায় দিয়াছ করুণা মাখায়ে।
তুমি পুণ্য ব্রত যোগী জন চিত্ত সুধাসার,
কাল গর্ব্ব খর্ব্বকারী সর্ব্ব মূলাধার,
তুমি সার অসার সংসারে
তুমি তার' ভব পারাবারে—
অসংখ্য প্রণাম অনন্ত তোমারে—
নাওহে অনন্তে মিশায়ে।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে সকল লেখকের নাম ও গানের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাঁরা সকলেই যাত্রা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক। ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রত্যেকেই—মথুর সাহা, গণেশ অপেরা, সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়, শশী অধিকারী, ভূষণদাস, সাঁতরা কোম্পানি, শশী হাজরা, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী, যামিনী ভাণ্ডারী ও সতীশ মুখার্জ্জী প্রভৃতি বড় বড় যাত্রার দলের পালা লেখক। ইহাঁদের রচনা শ্রবণে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার পণ্ডিত মণ্ডলী এবং অপরাপর রসিক সুজন মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিহ্বল হইয়া ভাবানন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, লেখকের পক্ষে ইহাই পরম এবং চরম পুরস্কার। ৺ধর্ম্মদাস রায়ের রচনা শুনিয়া অনেককে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি, অথচ ইঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

"যাত্রা সম্রাট্" স্বর্গগত মতিলাল রায়ের গান অনেকেই জানেন, তথাপি একটু নমুনা প্রদান করিয়া অদ্যকার ঢাকের বাদ্যটা বন্ধ করিব। উপরিউক্ত কবিতাগুলি গীতি কবিতা হিসাবে না উৎরাইতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভাবের দিক দিয়া হিন্দুরা এ গুলি প্রীতির সহিতই গ্রহণ করেন।

"কোথা সঙ্কটের ঔষধি।
শঙ্করের হৃদি নিধি।
ওহে কৃষ্ণ এ কি কষ্ট,
যাদের রাখলে গৌরবে
(সেই) পাণ্ডবের মান নষ্ট করে দুষ্ট কৌরবে;
নামে কলঙ্ক হবে
ধরা পুরিবে রবে
শ্রীপদ ভেবে বিপদগ্রস্তা
দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদী।
ওহে সুদর্শনধারি হরি দাও দরশন
করে দুঃশাসন তব দাসীর
বসন আকর্ষণ—
আবার যে কটু ভর্ৎসন
যেন ভুজঙ্গ দংশন
কৃষ্ণ বলে' জলে যাব, দেখা
না দাও হে যদি।
সর্ব্বত্র শুনেছি ওহে গোপিকারঞ্জন
তোমার মধুসূদন নামেতে হয় বিপদ ভঞ্জন,
তবে কেন ধন জন
সব দিয়ে বিসর্জ্জন
কাঁদে পঞ্চ জন কৃষ্ণ বলে' নিরবধি?
ও পায় সঁপিতে মতি
কাল্লে হবে না রতি
পাষণ্ডগণ বল্‌বে তোমায়—
ভক্ত-বিরোধী।"

পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ, মতি রায় প্রভৃতির যাত্রার গান-গুলি বাঙ্গলা দেশকে ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিল,—এখনও সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত বাঙ্গলা দেশকে আকুল করিয়া তুলে। যাত্রা সাহিত্য অনাদরণীয় নহে। যাত্রার গানগুলি মিলের দিক দিয়া কিংবা কবিত্বের উচ্চতর দিক দিয়া খুব উৎকর্ষ প্রাপ্ত না হইলেও, উহাতে সারল্য আছে, ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাস আছে, আর আছে বাঙ্গালীর চির পরিচিত বৈরাগ্য ভাবের উদাসী উদাত্ত সকরুণ একটা সুমধুর মূর্চ্ছনা।

শ্রীনারায়ণ ভারতী।

প্রজা-মনিব

(গল্প)

৬

যখন সত্য সত্যই স্বরূপ চলিয়া গেল, মুখ হইতে শিকার ছুটিয়া পলায়ন করিলে ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র পশুর অবস্থা যেরূপ হয়, পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইল। কি করিবেন, সহসা স্থির করিতে না পারিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কিয়ৎ কাল সেখানে পাদচারণা করিলেন। পরে সেখান হইতে গিয়া যজমানকে অল্প খরচায় একটা পাতি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বেলা তখন নিতান্ত কম হয় নাই। তিনি স্নানাহ্নিকের কথাটা একবার চিন্তাও করিলেন না। অনলবর্ষী রৌদ্রের মধ্যে গামছা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। নিজেদের পাড়া, নমঃশূদ্র পাড়া ছাড়াইয়া, সোজা মেঠো পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। যাহাকে সম্মুখে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "ওগো এ পথ দিয়ে একটী পুরুষ আর একটী স্ত্রী-লোককে যেতে দেখেছ?" সকলেই আপন আপন কাযে ব্যস্ত,—কে আর উত্তর দিবে! অগত্যা ঘণ্টা দুই তিন রৌদ্রের মধ্যে পথে পথে ঘোরাঘুরি করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ঘর্ম্মাক্ত দেহে যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইয়াছে। মুহূর্ত্ত মাত্রও বিশ্রাম না করিয়া সেই ঘর্ম্মাক্ত দেহেই স্নান করিতে গেলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। প্রথমতঃ একটুখানি শীত শীত করিতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তে স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

সেই অবস্থায়ই আহ্নিক সমাপন করিয়া আহারে বসিলেন। আহার নামমাত্র। বিশেষতঃ আজিকার ঘটনাটী কেবলই থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। স্বার্থের জন্য ক্রোধের ভরে বেচারীর প্রতি যতই রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারও ত দেহে মানুষেরই প্রাণ! সেই রোগশীর্ণ লোকটীর ক্লিন্ন মুখের পানে তাকাইয়া তাঁহার প্রাণে এতটুকু দয়ারও উদ্রেক হয় নাই; কিন্তু এখন আহারে বসিয়া ক্রমাগত সেই মুখখানাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যে হস্ত আর্ত্ত নিঃসম্বল দয়ার ভিখারীকে এতটুকু অনুগ্রহ হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে, সে হস্তে কিছুতেই অন্নের গ্রাস তাঁহার মুখে উঠিল না। অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণী কহিলেন, "জ্বরে দেখি কাঁপ্‌চ! এ অবস্থায় খেতে না বসলেই ত হত!" রামগোপাল সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিজের মনে মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এই দুপুর বেলায়, বেচারী রোগা শরীরে বউটাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ীর উপর থেকে জলরত্তি মুখে না দিয়ে চলে গেছে। টাকার জন্যে তাকে কত না নির্য্যাতন করেছি! দুর্ব্বল শীর্ণ শরীর দেখেও তার উপরে

আমার এতটুকু মমতা হয়নি !···এমন অসময়ে মানুষের বাড়ী থেকে বেড়াল কুকুরটা পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যায় না। আর সে বেচারী ত মানুষ ! আমার জায়গায় তাদের তিন পুরুষ কেটে গেছে ! কোন্ মুখে ভাতের গ্রাস তুলবো বল ত ?" বলিতে বলিতে গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

দাক্ষায়ণী উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "জ্বর হয়েছে শুয়ে থাকগে। বক্‌লে মাথা আরও গরম হবে।" রামগোপাল সে কথায় কোন উত্তর না করিয়া জ্বর-বিকম্পিত কণ্ঠে এই গানটি গাহিতে গাহিতে শয়ন গৃহাভি মুখে চলিয়া গেলেন।—

অর্থ অর্থ করে রে মন অর্থ যে কি তা চিন্‌লিনে।
নাইরে অর্থ ভবে অন্য চিন্তামণির চরণ বিনে॥
অর্থ তোর ওই তুচ্ছ টাকা, হয় যাতে রে বুদ্ধি বাঁকা,
চিত্ত রয় অজ্ঞানে ঢাকা মোহের ঘোরে রাত্রি দিনে।
জ্ঞানের বাতি জ্বলে এবার দূর করেছে মোহর আঁধার
তোর আপন ঘরে কি আছেরে খুজে তারে দেখনা কেনে!
অর্থ ত অনর্থ কেবল পদে পদে বাড়ায় কুফল
পাপের পথটী বড়ই পিছল সেই পথেতে নে যায় টেনে॥
হৃদয়টী তোর সোণা খাটী হেলায় তারে করলি মাটী
প্রেম নিকষে ত্থাখ্‌না কষে এমন নিধি আর পাবিনে।
থাক্‌তে ঘরে অমূল্য ধন বাইরে মিছে খুঁজিস্ রতন,
এই রতনের মূল্য দিয়ে সেই পরমার্থে নেনা কিনে॥

শয্যায় শয়ন করিয়াও জ্বরের ঘোরে আপন মনে গায়িয়া যাইতে লাগিলেন-'নাইরে অর্থ ভবে অন্য চিন্তামণির চরণ বিনে।' স্বামীর মুখে জ্বরের ঘোরে হঠাৎ এই পারমার্থিক সঙ্গীত শুনিয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণীর বুকটা কেবলি থাকিয়া থাকিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কাছে গিয়া মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, উত্তাপ এত বেশী যে হাত রাখা যায় না। ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এমন জ্বর কি জন্যে হল বল দেখি ?"

পণ্ডিত মহাশয় একটুখানি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বুঝি পারে যাবার তলব এসেছে।"

"বালাই ! অমন অলক্ষুণে কথা বল্‌তে নেই ! যাই দেখি অক্ষয় আচায্যিকে ডেকে নিয়ে আসি।"—বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিলেন, "তার চেয়ে বরং একটা কায কর।"

দাক্ষায়ণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অক্ষয় কবিরাজকে ডাকাইলেন। অক্ষয় আসিয়া নাড়ী টিপিয়াই, সান্নিপাতের যতগুলি লক্ষণ থাকিতে পারে, সবগুলিই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পরে গৃহিণীর নিকট হইতে গোপনে ৫টী টাকা করায়ত্ত করিয়া, চাদরের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে, দুই একবার চোখের রগড়াইয়া সান্ত্বনা-সূচক বাক্যে বলিয়া গেলেন, "ভয় কি ? বাবা বৈদ্যনাথ আছেন খুড়ী ঠাকরুণ ! ও বেলায়ই আমি মহালক্ষ্মী বিলাসটা দিয়ে যাব। খুব সাবধান ! ওঁকে আর জানাবেন না। দরকার হয়ত পুঁটিকে নিয়ে এলেই হল।"

পুঁটি ইহাঁদের একমাত্র সন্তান। বিদেশে স্বামীর বাসায় থাকে। তাহার পিত্রালয়ে আসা বড় ঘটিয়া উঠে না। দাক্ষায়ণী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "কি জানি বাবা কি আছে অদৃষ্টে ! পুঁটিই কি আমার দেশে থাকে, যে ইচ্ছা করলেই অমনি নিয়ে এলাম !" বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অক্ষয় সেদিন কি ভাবিয়া যে বলিয়াছিল 'দরকার হয়ত পুঁটীকে আনাবেন,, এ কথাটা সেদিন দাক্ষায়ণী অতটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেলেও যখন দেখা গেল যে অক্ষয়ের ঔষধে রোগীর আরোগ্য লাভ ত দূরের কথা, উত্তরোত্তর তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গের অভিমুখেই অগ্রসর করিতেছে, তখন তিনি কবিরাজের এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীর কাছে পুঁটিকে আনার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাইলেন, "পুঁটি এসে কি আমার স্বর্গের সিঁড়ি গেঁথে দেবে ?" কথাটা শুনিয়াই ভয়ে চুপ করিয়া গেলেন বটে,

কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সেইদিনই গোপনে অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ অক্ষয়! ওষুধে ত কিছুই হচ্ছে না।" অক্ষয় একটা ঢোক গিলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "সে জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না খুড়ী ঠাকরুণ। মানুষ মাত্রেরই দেহে কিছু পাপ আছে কি না, সেটা না খণ্ডে গেলে স্বয়ং ধন্বন্তরীরও সাধ্য নেই যে পীড়া আরোগ্য করেন। তবে খুড়ো ঠাকুরের জন্যে কিছু ভাবনা নেই। এমন মানুষেরও দেহে কি কখনো পাপ থাকতে পারে? তবুও জানেন কি, সংসারে বাস করতে গেলেই একেবারে নিষ্পাপ থাকা যায় না। কোন্ সূত্রে কখন পুণ্যাত্মাদের দেহেও একটু আধটুক পাপ এসে প্রবেশ করে। যাক্ সেজন্যে কোনই ভয় নেই। সত্বরই উনি রোগমুক্ত হয়ে উঠবেন।" বলিয়া অক্ষয় মনে মনে মা দুর্গার নাম জপ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

দাক্ষায়ণী কিন্তু কবিরাজের এই আশ্বাস বাক্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। ডাক্তার আনার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু রোগী বাধা দিয়া কহিলেন, "আর ডাক্তার কেন? অক্ষয় ত আছে। ত্থাখ, আমাকে আর মিছামিছি জোর করে কতকগুলো ওষুধ গিলিয়ো না। বরং এক কায কর। যদি কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে স্বরূপটার খোঁজ করতে পারত, তার চেষ্টা ত্থাখ। আর একটা কথা বলে যাচ্ছি, রাখ্‌বে ত? তার সঙ্গে আমার দেখা এ জীবনে আর হবে না। কিন্তু যদিই সে ফিরে আসে ত, তাকে আমার হয়ে যা খুসী দিও, তাতে কিছুই অন্যায় হবে না।"

দাক্ষায়ণী নীরবে মাথা হেঁট করিয়া সম্মতি জানাইলেন। পরদিনই তিনি জনৈক প্রতিবেশীকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া স্বরূপের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। ধারণা, স্বরূপকে পাওয়া গেলেই স্বামী আরোগ্য লাভ করিবেন। লোকটা ৪।৫ দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু ইহার দিন দুই পরে অন্য একজন প্রতিবেশী জেলায় কি একটা মামলা উপলক্ষ্যে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই! যার জন্যে এত খোঁজাখুঁজী, সে ত হাজতে। যদ্দূর বুঝ্‌তে পারলাম, পেটের দায়ে চুরি কি ডাকাতি একটা কিছু অপকর্ম্ম করতে গিয়ে মানুষ জখম করে বসেছে। তাই ধর পাকড়, হাজত। জেল ত জেল্,—যে কড়া হাকিম, নিদেন পক্ষে দুটি বছর না ঠুকে ছাড়বে না।"

জেলের কথা শুনিয়াই রামগোপালের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি কেবলি কহিতে লাগিলেন ওগো পার ত, তোমরা কেউ তাকে অন্ততঃ একটিবার আমার কাছে নিয়ে এস। আমার যা বলবার আছে, তাকে বলে কয়ে বিদায় হয়ে যাই। আমার ভিতরে ভিতরে দাউ দাউ করে' কেবল নরকের আগুন জ্বলছে, তার একটুও বিরাম নেই। জ্বলে পুড়ে মলাম গো, জ্বলে পুড়ে মলাম। আমাকে কেউ এ আগুন থেকে রক্ষা করতে পার না? বাপ্‌রে, মহাজনী! টাকায় দু আনা সুদ, তাতেও উসুল ছাঁট! ভ্যালা বিপদ্। ওই যে সব আস্‌ছে টাকার জন্যে, এখন উপায়? টাকা নেই টাকা নেই। সব ফুঁকে দিয়েছি, সব ফুঁকে দিয়েছি। হাঃ হাঃ হাঃ, রোসো সব, নরকে গিয়ে টাকার গাদির ওপরে গুলজার হয়ে বসে, মহাজনী কোরবো, আর তোমাদের দিকে চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌বো। টাকায় দু আনা করে সুদ নিয়েছি, এবার নেবো টাকায় টাকা সুদ, বুঝেছ ত সব?" এই রকম কত কি প্রলাপ বকিতে বকিতে রাত্রি শেষ হয়। দিন আসে, দিনের বেলায় কতকটা ভাল দেখা যায়। তখন বলিতে থাকেন, এ জেল তাকে আমিই দিইয়েছি। তোমরা আমাকে যদি আরাম করে তুলতে পার ত আমি আদালতে হাজির হ'য়ে হাকিমকে বলবো, ধর্ম্মাবতার!' যে শাস্তি হয়, তা আমাকে দিন্। এ বেচারী নিরপরাধ। —তা কি আর সম্ভব? সত্যিই যে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। দেখ, যদিই কখনো তার দেখা পাও ত আমার হয়ে তাকে তোমরা কেউ বোলো যে, তার ঋণ থেকে আমি অনেক আগেই তাকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু সে যে

ঋণজালে আমাকে জড়িয়ে রেখে গেছে, তা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে একমাত্র সেই পারবে।"

দাক্ষায়ণী স্বরূপের মামলার তদ্বিরের জন্য গোপনে টাকা-কড়ি দিয়া যে ব্যক্তিকে জেলায় পাঠাইয়াছিলেন, সে আসিয়া জানাইল যে স্বরূপের এক বৎসরের জেল হইয়াছে। রামগোপালের তাৎকালীন অবস্থা দেখিয়া এ সংবাদটা তাঁহার কাছে গোপন রাখিবার চেষ্টা স্বত্বেও হইয়া উঠিল না। কেন না হেমন্তও এই সংবাদটার জন্য কম উৎকণ্ঠিত ছিল না। সংবাদটা তাহার কর্ণ-গোচর হইবামাত্রই সে বাড়ীর উপর আসিয়া মুমূর্ষু রাম গোপালকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিল, "ঠাকুর! এইবার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। বেচারীকে জেলে পূরে তবে ছেড়েছে।" রামগোপাল তখন বারান্দায় শুইয়া। সে ঝড়ের মতন আসিয়াছিল, উঠানে দাঁড়াইয়া ঝড়েরই মতন কথাগুলি বলিয়া চলিয়া গেল। এই সময় পূর্ণ বিকারের ঘোরে রামগোপাল যাহা কিছু কাণে শুনিতেন, মনে করিতেন স্বরূপ কথা কহিতেছে। অমনি শ্লেষ্মা-জড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "ঐ যে কথা বলে, তবে কি সে এসেছে? এসে থাকে ত, একবারটী কাছে ডাক না!" সমুখে কাহাকেও দেখিলে—বিকারের চক্ষে যেন তাহা কই দেখিতেছেন এমনি মনে করিয়া অমনি বলিতেন, "এলি ত, একা কেন? বউ বেচারীকে কোথায় রেখে এলি? শোন্! তোকে আর টাকা দিতে হবে না! আমি তোর মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছিলাম, এখন তোকে তার চারগুণ দিচ্ছি, দশগুণ দিচ্ছি, নিয়ে সুখী হ'য়ে চলে যা। আমিও দেখে খুসী হই।"

হেমন্ত যখন আসিয়াছিল, দেখিতে পাইয়াছিলেন একটা আব্‌ছায়ার মতন কি আসিতেছে। কিন্তু সে যখন কথাগুলি অমন গড় গড় করিয়া বলিয়া চলিয়া গেল, তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জেল! জেল! ওগো তাকে ছাড়িয়ে এনে, আমাকে জেলে দাও! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে জেলে যাব!" বলিতে বলিতে [illegible] শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। সকালে ধরাধরি করিয়া যখন তাঁহাকে শোওয়াইল, তখন তাঁহার দেহে প্রাণ নাই।

৭

এক বৎসর পরে। এমন অন্ধকার আর পৃথিবীর বুকে কোনো দিন ঢলিয়া পড়ে নাই! সন্ধ্যা সবে মাত্র অতীত হইয়াছে। দুইটী পথশ্রান্ত নর-নারী অন্ধকারে ধীরে ধীরে গ্রাম্যপথ ধরিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইল। পুরুষটি জিজ্ঞাসা করিল, "এই যেন মনে হচ্ছে, না?" স্ত্রীলোকটি সে কথায় উত্তর করিল, "হাঁ এই ত সেই বাড়ী! দেখছ না ঠাকুর-ঘর!"

"হ্যাঁ, তাই ত!" বলিয়াই পুরুষটি ঠাকুর দুয়ারে প্রণাম করিল; স্ত্রীলোকটিও অন্ধকারে গলায় আঁচল জড়াইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাক্ষায়ণী ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেখাইয়া বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে কাহারা কথা কহি-তেছে বুঝিতে পারিলেন না; তাহাদের কথার ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দে কেবল তাঁহার জপেই বাধা পড়িল। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে শুনিলেন, "দেবতা কি বাড়ী আছেন নাকি?"

"অ্যাঁ এ যে স্বরূপের গলার আওয়াজ!" জপের মালা তুলিয়া রাখিয়া ধড়মড় করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। প্রদীপ হাতে করিয়া সামনের দরজায় আসিয়া দেখেন, তাঁহাদেরই স্বরূপ। স্বরূপ মাঠাকরুণের পরনে থান কাপড় দেখিয়া, কাঁদিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকুরুণ! সেই যে আদালতে থাকৃতে খবর পেয়ে-ছিলাম, সেই খবরই বুঝি শেষ খবর?"

দাক্ষায়ণী আসন্ন অশ্রু প্রবাহকে জোর করিয়া থামাইয়া ফেলিয়া সহজ গলায় কহিলেন, "হাঁ বাবা, তোমার জেলের খবর শুনেই ত সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

স্বরূপ আর কথা কহিতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়া সেইখানে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

দাক্ষায়নী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "সে জন্যে আর আক্ষেপ করে কি হবে? তাঁর মৃত্যু ঐ রকমই লেখা ছিল, সে জন্যে ত আর তুমি দায়ী নও বাবা! এসেছ ত বউকে নিয়ে ভেতরে এস!"

স্বরূপ বলিতে লাগিল, "মা ঠাকরুণ! মনিব আমার শুনে গেলেন যে আমি চুরি করে', মানুষ জখম করে' জেল খাটছি। কিন্তু ঘটনা তা নয়। পথে বেরিয়েই কাঁধের বোঝাটাকে ফেলে দি'য়ে, টুক্ টাক্ জিনিষ খান আর গয়না দুখান নিয়ে দুজন পথ চলেছি। বেলা শেষ হয় হয়, এমন সময় এক গাঁয়ের ধারে নদীর পাড়ে বসে ভাব্‌ছি রাত কোথায় কাটাই। এমন সময় একজন পাগড়ী পরা লোক এসে আমাকে বলে কি, যে পরের বউ চুরি করে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি! আমি সে কথায় চটে উঠতেই সে আমার একখানা হাত থপ্ করে', ধরে ফেলে আমাকে বল্‌লে, ১০৲ টাকা যদি দিতে পারিস্ ত তোকে ছেড়ে দিই, নইলে তেকে থানায় নিয়ে যাব। হাতে ছিল লাঠি। ধাঁ করে হাত খানা ছাড়িয়ে নিয়ে মারলাম তার কাঁধে। টাল খেয়ে পড়ে যেতেই কোথায় বা রইল তার আস্ফালন! পালাত কুমড়োর মতন গড়াতে লাগ্‌ল। তার পর বল্লে বিশ্বেস যাবেন না মাঠাকরুণ! বসালাম আর এক ঘা লাঠি তার মাথায়। বুঝুক্ শালা ভোজপুরী একবার চাঁড়ালের লাঠির চোট্! লাঠি মারতেই ত মাথা ফেটে রক্ত গঙ্গা বইতে লাগ্‌ল। লোকজনও কম জড় হ'ল না। কাছেই থানা। আরও পাগড়ীর দল এসে ঝুঁকে পড়ল। এক গুণ মেরে তিন গুণ মার খেতে খেতে থানায় গেলাম। একজন ভদ্রলোক অনেক অনুরোধ করে দারোগা সাহেবকে খুসী করাতে আমার পরিবারকে নিয়ে আর কোনো হাঙ্গাম কল্লে না। তিনিই দয়া করে তার রক্ষা করবার ভার নিলেন। এই ত মাঠাকরুণ ব্যাপার! পুলিশের কল্যাণে আমি হয়ে গেলাম চোর, খুনে!"

দাক্ষায়ণী সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "সে জন্যে দুঃখ করিস্‌নে স্বরূপ! মানুষের কথা ধরিসনে। মনে প্রাণে নিজে যখন খাঁটী আছিস্, তখন আর ভয় কি? সকলের আড়ালে থেকে একজন ত দেখ্‌চেন বাবা, কে কেমন। নে, বৌকে আর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখিস্ নে। আমাদের যা কিছু আছে, তার অর্দ্ধেক আজ হ'তে তোর!"

স্বরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মা ঠাকুরাণীর মুখের পানে তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে, যাঁর সম্পত্তি, তিনিই দিয়ে গেছেন।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সস্ত্রীক স্বরূপ মনিব ঠাকুরাণীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সমাপ্ত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার দেবশর্ম্মা।

ভাষা ও ভাষা-বিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বা Botany প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং কৃষিবিদ্যা ঐতিহাসিক তত্ত্ববিজ্ঞান। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কার্য্য হইল উদ্ভিদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহার অন্য-নিরপেক্ষ ক্রিয়া ও বিকাশের পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সেই-সকল বিশ্লিষ্ট জ্ঞানের সমষ্টির অবধারণ। কিন্তু কৃষিবিদ্যা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র। উদ্ভিদের বিকাশ সময়-সাপেক্ষ হইলেও তাহা অত্যল্প সময়েই পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ইহার বিনাশের পর আর কিছুই থাকে না। কিন্তু কৃষিবিদ্যা শাশ্বত কালের সহিত সম্পৃক্ত। অতি প্রাচীন কালে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিত একালে তাহা চলে না; অনেক উন্নতি হইয়াছে। সে উন্নতি মনুষ্যকৃত হইলেও কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট যুগের মনুষ্যের কার্য্য নহে। এ যুগের মনুষ্য যাহা করিল, পরবর্ত্তী যুগের মনুষ্য সেই খানে আরম্ভ করিবে এবং তাহার যথাসাধ্য উন্নতি করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার ভবিষ্যৎ যুগের হাতে দিয়া যাইবে। এইরূপ রসায়ন বিদ্যা প্রাকৃত বিজ্ঞান, কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা তত্ত্ববিজ্ঞান। আবার ব্যবহারশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার উপাদানভূত যাবতীয় বিজ্ঞানই তত্ত্ববিজ্ঞান।

কিন্তু এই-সকল তত্ত্ববিজ্ঞান হইতে ভাষা-বিজ্ঞানের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে তাহাতে ইহার আলোচনা-প্রণালী অনবদ্য ও সিদ্ধান্ত এত পরিপক্ক হইয়াছে। সভ্যতা মূলক অন্য কোনও তত্ত্ববিজ্ঞানেই সভ্যতার বিকাশ এত সুনিরূপিত নহে। অন্য কোনও তত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোচনাপ্রণালী এত সঠিক হয় নাই, অন্য কোনও তত্ত্ববিজ্ঞানই প্রাচীন সংস্কার এরূপ ভাবে ত্যাগ করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই;—যেরূপ ভাষাবিজ্ঞানে সম্ভব হইয়াছে। একদিকে যেমন দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম চিন্তা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ নানা বিভাগে অভিনব সৃষ্টিকার্য্য চলিয়াছে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে প্রথমে তত্ত্ববিজ্ঞান সমূহের বিষয়ে সাধারণ ভাবে আর একটু আলোচনা আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন সভ্যতা হয় না। তাই সভ্যতা মূলক বিজ্ঞান সমূহের সহিত নর সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর সমাজ ও সভ্যতা কালক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সমাজ বা সভ্যতার সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক। যে মানবের কোনও ইতিহাস (পুঁথিগত বা স্মৃতিগত) নাই, তাহার সভ্যতাও নাই, সমাজও নাই। যে জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছে তাহাদের পূর্ব্বকালের কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে বলিতেই হইবে। হঠাৎ তাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বসবাস করে নাই, পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই তাহাদের ইতিহাস; তা সে ইতিহাস লিখিত থাকুক আর নাই থাকুক। হয়ত পূর্ব্ব ইতিহাসের অধিকাংশই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ইতিহাস নাই বা ছিল না, এ কথা বলা যায় না। সমাজ মাত্রেরই একটা আরম্ভ ও একটা বিকাশ থাকিবে। তার পর আবার সেই সমাজের একটা চির পরিবর্ত্তনীয় বিকাশ অনন্ত কালের প্রবাহে নানা ঘটনা পরম্পরার ঘাত প্রতিঘাতে সংঘটিত হইয়া চলিবে। সুতরাং এই সমাজই মানবের সভ্যতার লক্ষণ। আবার সমাজের লক্ষণ এই যে সমাজবদ্ধ মানব পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবে।

তাহাদের মধ্যে অবশ্য সকলেই সকলের মিত্র থাকিবে না। কেহ মিত্র কেহ বা শত্রু থাকিবে। কিন্তু সকলেই সকলের শত্রুতা করিবে না। অবশ্য এই মিত্রতা ও শত্রুতার মধ্যে থাকিয়াও অন্ততঃ আত্ম-রক্ষার জন্য তাহাদের অধিকাংশ লোকেই একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবে। কর্ম্মবিভাগ করিয়া পাঁচজনে পাঁচ জনের সাহায্য করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পাইবে। এই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত কার্য্য প্রণালী কাল ও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিবে। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম করিবার যতগুলি কৌশল জানিবে, কিছুকালের অভিজ্ঞতার পর তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কৌশল সে আয়ত্ত করিবে। জীবনে যত অসুবিধা ভোগ করিবে ততই নূতন কৌশল সৃষ্টি করিয়া সেই অসুবিধার পরিহার করিবে। এই রূপে সারা জীবন ধরিয়া সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবে তাহা তাহার বংশধরকে দিয়া যাইবে। সুতরাং যে সকল কৌশল শিখিয়া সে নিজে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল তাহার বংশধর তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক কৌশল শিখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারিবে। আবার তাহার নিজের প্রয়োজন ও বুদ্ধি অনুসারে সে তাহার উত্তরাধিকারলব্ধ জ্ঞান বাড়াইয়া মুলধন স্বরূপে উত্তর কালের বংশধরকে দিয়া যাইবে। ব্যষ্টিগতভাবে যে কথা বলা হইল সমষ্টিগত ভাবেও তাহাই হইবে। ইহাই হইল সভ্যতা বা সমাজ সংক্রান্ত ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের প্রভাবেই মানবের বহুদিক্ প্রসারিণী উন্নতি উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ইতরপ্রাণী হইতে মানব জাতির বৈশিষ্ট্যই হইল এই ইতিহাস বা ধারাবাহিকতায়। ইতরপ্রাণীর জীবনের অভিজ্ঞতা সে তাহার বংশধরকে দান করিতে পারে না। তাই মান্ধাতার কালে মধু-মক্ষিকা যে কৌশলে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিত আজিও তাহার সেই কৌশল। মানব ঐরূপ মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে এতকালের অভিজ্ঞতায় আজ দেব-শিল্পী-কেও হারাইয়া দিত।

ঘটনা সমূহের মধ্যে এই পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্ক পর্য্যবেক্ষণই তত্ত্ববিজ্ঞান সমূহের কার্য্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশ্লিষ্ট উপাদান সমূহের অন্যনিরপেক্ষ কার্য্যকরিতা পর্য্যবেক্ষণ করে। ঐতিহাসিক জটিলতা সে শাস্ত্রের চিন্তায় স্থান পায় না।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, যে তিনটী শক্তি-প্রভাবে ভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি হয় তদতিরিক্ত আর একটা বিষয় ভাষা বিজ্ঞানের আলোচ্য—কালক্রমাগত সমগ্র সভ্যতা বা বহুকালের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। আমরা বর্ত্তমান যুগে যে অভিজ্ঞতার ফল ভোগ করিতেছি তাহা অনন্ত কালের আয় ব্যয়ের পরিণতি-লব্ধ মূলধন। কালের ধ্বংস ও আবর্ত্তনের ফলে আমাদের পূর্ব্ব যুগের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার অন্যতম উপাদানই ভাষা। সকলেই জানি যে ভাষা আমরা কেহই সৃষ্টি করি নাই, আমরা অধিকার করিয়াছি। ইহা আমাদের পূর্ব্ব যুগের মানবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত জাতীয় মূলধন; এজ্‌মালি সম্পত্তি।

মানব সভ্যতার যাবতীয় উপাদানই এই প্রকার কালক্রমাগত অভিজ্ঞতার ফল হইলেও ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, মানব সভ্যতার যাবতীয় উপাদানের অন্যতম প্রধান উপাদানই হইল ভাষা। সুতরাং মানব সভ্যতার উপাদান সমূহের সকল গুলিরই প্রভাব ও প্রতিচ্ছায়া এই ভাষারূপ আয়নাতে পড়িয়াছে। আবার আর একটুকু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে একমাত্র ভাষাই সমগ্র মানব সভ্যতার আধার। কারণ এই ভাষাতেই সর্ব্ববস্তুর অভিব্যক্তি, আর এই অভিব্যক্তি বশেই কালপ্রবাহে মানব-সভ্যতা যুগ হইতে যুগান্তরে বহিয়া আসিতেছে। ভাষা না থাকিলে পূর্ব্বযুগের সভ্যতায় আমাদের কোনও অধিকার জন্মিত না। সুতরাং মানব সভ্যতার সর্ব্ববিধ উপাদানের প্রভাব ভাষায় আছে এবং ভাষার প্রভাবও সর্ব্বত্র আছে। সে হিসাবে দেখিতে গেলে ভাষাবিজ্ঞানের সহিত সকল বিজ্ঞানেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আমরা ভাষাবিজ্ঞানের এই বিশ্বগ্রাসী প্রভাব উপেক্ষা

করিয়া দেখিব কোন্ কোন্ বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর ভাষাবিজ্ঞান সৌধ প্রতিষ্ঠিত। যে তিনটী শক্তিতে ভাষার সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিণতি সেই তিন শক্তির বিজ্ঞানই ভাষা-বিজ্ঞানের ভিত্তি হইতে পারে। সুতরাং মনোবিজ্ঞান ও শারীরক বিজ্ঞানই ভাষাবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। মন ছাড়া ভাষার যখন কোনও সত্তাই থাকিতে পারে না, তখন মনোবিজ্ঞান বা Psychology ভাষাবিজ্ঞানের মুখ্য ভিত্তি। আবার শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বুঝিবার জন্য শারীর বিজ্ঞান বা Physiologyর অংশ-বিশেষের জ্ঞান যেমন আবশ্যক, পদার্থবিদ্যা বা Physics এর ধ্বনি বা Sound বিষয়ক জ্ঞানও সেইরূপ আবশ্যক। কিন্তু একটা কথা—পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির প্রভাব কোন্ বিজ্ঞান হইতে পাওয়া যাইবে? এইখানে ভাবিয়া দেখিতে হইবে কি প্রকার পারিপার্শ্বিক শক্তি ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক জনগণের মনই যখন আমাদের মন ও ভাষার উপর প্রভাববান্ হয় তখন মনোবিজ্ঞানই তাহার বিজ্ঞান।

কিন্তু এইখানে একটা বিষম সমস্যা আছে। পণ্ডিত-গণের মধ্যে এইখানে ভয়ঙ্কর মতভেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের কথা-কাটাকাটির একটু আভাস দিতে হয়।

একটা কথা আছে "আপ্ রুচি খানা, পর রুচি পহন্ না।" খাবার বেলা তুমি নিজের রুচির অনুবর্ত্তন করিতে পার (অবশ্য হিন্দু সমাজে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই,) কিন্তু পরিচ্ছদের বেলা তাহা চলিবে না। তখন দশজনের রুচির অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। রঙীন গাউন বা শেমিজ পরিয়া কোনও পুরুষ সভা করিতে যান না। হয় ত ব্যক্তিগত ভাবে তোমার বা আমার কোনও আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের দিক দিয়া সকলেই আপত্তি করিবে। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও আপত্তি নাই, অথচ সমষ্টির দিক দিয়া আপত্তি আছে। বাগান-বাড়ীতে যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ্য ভাবেই অনুমোদিত হয়, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে তাহার নামোল্লেখ দূষণীয়। দশ জনে যেমন ভাবে চলে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারার অনুবর্ত্তী হইয়া তোমাকেও চলিতে হইবে। নতুবা তুমি সমাজে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে না। "দিদি! কোশায় water ঢাল," "বাবা! আমি military মেজাজে আছি" প্রভৃতি ভাষা সমাজে উপহাসার্হ। থিয়েটারে নাটক চালাইতে চাও ত একটা মেদিনীপুরের ঝি, একটা উড়ে চাকর, কিংবা একটা চট্টগ্রামবাসী বক্তৃতাকারীর কল্পনা করিও; তাহা হইলেই হাস্যরস জমিয়া উঠিবে। কিন্তু এই যে সমাজের প্রভাব, যাহাকে আমরা উঠিতে বসিতে মানিয়া চলি, তাহার বাস্তব সত্তা কোথায়? খুঁজিয়া দেখিলে হয়ত বুঝা যাইবে ইহার বাস্তব সত্তা মোটেই নাই; ইহা একটা হাওয়ামাত্র। অথচ ইহার অমোঘ শক্তি, ইহাকে না মানিলে উপায় নাই। পিপাসার সময় একটু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ু মিশাইয়া উদরস্থ করিলে পিপাসার নিবারণ হয় না, অথচ রসায়ন শাস্ত্র বলে জলের কেবলমাত্র দুইটী উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র মিশিয়া আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে না বটে, কিন্তু তাহাদেরই রাসায়নিক সংযোগ হইলে তৃষ্ণা নিবারণের উপযুক্ত বস্তু উৎপন্ন হইবে! তাহা হইলেই বলিতে হয় যত বাহাদুরি এই রাসায়নিক সংযোগ ক্রিয়াটীর। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এস্থলে কার্য্যকর নহে। সমাজ ও সভ্যতার বিষয়েও যেন সেইরূপই একটা কথা বলা যায়। ব্যষ্টিগত ভাবে কাহারও অমত না থাকিলেও সেটা সমষ্টিগত মত হয় না। অথচ ব্যষ্টি নিরপেক্ষ সমষ্টির অস্তিত্বই নাই, সেটা একটা হাওয়ামাত্র।

সভ্যতার উপর সমাজের এইপ্রকার অমোঘ শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লজরস্ (Lazarus) ও ষ্টেইন্থল্ (Steinthal) "সামাজিক মনোবিজ্ঞান" বা "লৌকিক মনোবিজ্ঞান" (Volkerpsychologie) নাম দিয়া জর্ম্মণ ভাষায় এক সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সাময়িক পত্রে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়া-ছিলেন যে ব্যষ্টিগত মনের ন্যায় সমষ্টিগত একটা সামাজিক মন আছে। অর্থাৎ তোমার মনের ইচ্ছানুসারে তুমি যেরূপ কার্য্য কর, আমার মনের আদেশ অনুসারে আমি

যেরূপ কার্য্য করি, সেইরূপ ব্যষ্টি নিরপেক্ষ সামাজিক মনের অধীন হইয়া সমাজ কার্য্য করে। এই সামাজিক মনটী তোমারও নহে, আমারও নহে, আর কাহারও নহে; অথচ ইহার শক্তি আমরা সকলেই অনুভব করি এবং ইহার আদেশ আমরা সকলেই মানিয়া চলি। এই ব্যষ্টি-নিরপেক্ষ ভাবনিষ্কর্ষ-সাপেক্ষ কল্পনামাত্র-স্থিত সামাজিক মনের বিজ্ঞান লিখিবার জন্য এই সাময়িক পত্রের আবির্ভাব।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পাউল (Hermann Paul) ইঁহাদের এই অধ্যবসায়ের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন মন যদি কোথাও থাকে ত সে ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে নহে; আর ব্যষ্টি-নিরপেক্ষ মন থাকিতেই পারে না। সুতরাং সমাজের প্রভাব মনের প্রভাব নহে, ইহা বাহ্য বস্তু। এক মনের সহিত অন্য মনের সম্পর্ক বাহ্য বস্তুর সাহায্যেই হইয়া থাকে। সমাজও সেই প্রকার বাহ্য বস্তু। সামাজিক মনের যখন সত্তা নাই তখন সামাজিক মনোবিজ্ঞান কেমন করিয়া থাকিতে পারে?

আবার মনোবিজ্ঞানবিৎ উণ্ড্ (Undt) বলেন ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চায় লৌকিক মনোবিজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে।

আজকাল পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের (Experimental Psychology) আলোচনাও আরম্ভ হইয়াছে। নানা শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মনের গতি লক্ষ্য করাই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যায় না, ইহাও তত্ত্ব বিজ্ঞান। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিবিধ শক্তির জটিলতার কথা ভাবে না।

এই সকল নানা মতের মাঝখানে আমাদের একটা নিজের মত খাড়া করা কঠিন ব্যাপার। কারণ পাউল যাহা বলিয়াছেন তাহাও সত্য, এবং অন্যপক্ষও অমূলক কথা বলেন নাই। সুতরাং এ স্থলে আমাদের একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করাই নিরাপদ। ব্যষ্টি নিরপেক্ষ সমাজের একটা মন আছে এ কথা স্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যষ্টিগত মনের উপর সমাজের প্রভাব যে প্রবল সে কথাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সমাজের মনের বিশিষ্ট সত্তা স্বীকার না করিলেও আমরা যে একটা প্রভাবের দাস তাহাতে সন্দেহ নাই; তা সেটা কোনও বাস্তব জিনিসই হউক, আর একটা 'হাওয়া' বা একটা কল্পনা মাত্রই হউক। ভাষার উপর এই শক্তির বিশিষ্ট প্রভাবের কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে।

ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ে যেমন কর্ম্মবিভাগ পূর্ব্বক বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন উপায়ে এক উদ্দেশ্যে কার্য্য হয়, ভাষা বিজ্ঞানের বিষয়ে সেরূপ কর্ম্মবিভাগ নাই। পাঁচ জনে পাঁচ রকমের কাজ করিয়া ধন একত্র করা যায়, পাঁচজনে পাঁচ বিভাগে কার্য্য করিয়া রাষ্ট্র রক্ষা বা রাষ্ট্রের উন্নতি হয়। কেহ কারখানা লইয়া থাকিবে অন্য কাজ করিবে না কেহ বাণিজ্য করিবে অন্য কিছু বুঝিবে না, আবার কেহবা কৃষি কর্ম্মাদি করিয়া কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবে। কেহ যুদ্ধ, কেহ পুলিশের কর্ম্ম, কেহ বিচার কর্ম্ম, কেহ বা মন্ত্রিত্ব করিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করিবে। কিন্তু ভাষা অধিকার বা ভাষা রচনা করিবার সময় সেরূপ কোনও কর্ম্ম বিভাগ চলে না। কেহ ক্রিয়াপদ রচনা করিবে, কেহ কর্ত্তৃপদ রচনা করিবে, আবার কেহবা কর্ম্মপদ রচনা করিয়া বাক্য সমাপ্ত করিবে—এরূপ কর্ম্ম বিভাগ ভাষা রচনায় চলে না। অন্ধ ও পঙ্গু উভয়ে মিলিয়া সমবেত চেষ্টায় পথ চলিতে পারে। কিন্তু মূক ও বধিরের সমবেত চেষ্টায় ভাষা রচনা হয় না। অর্থাৎ ভাষা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যষ্টিগত সম্পত্তি! "এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।" কিন্তু এক হিসাবে ভাষার সৃষ্টিতেও কর্ম্ম বিভাগ আছে। ভাষা সৃষ্টির ভিত্তিপত্তন আমরা করি না; পূর্ব্ব যুগের অর্জ্জিত ভাষা আমরা শিক্ষা দ্বারা লাভ করি। হয়ত আমাদের উত্তরাধিকার-লব্ধ মূলধন আমরা সুদে বাড়াই; কিন্তু মূলধন কেহই সৃষ্টি করিয়া লই না।

ভাষা সৃষ্টির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ ভাষা সৃষ্টি করে না। উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে স্রষ্টার

অজ্ঞাত সারেই ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হয়ত তুমি একটা অভিনব সৃষ্টি করিয়া ফেলিলে। তুমি যাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলে তাহা হইয়া যাওয়ার পর আর হয়ত তুমি সে বিষয়ে চিন্তাই করিলে না। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে এবং তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাহার ব্যবহার করিল এবং শেষে ভাব প্রকাশের উপযোগিতা বা অন্য কোনও কারণে তোমার সৃষ্টি ভাষায় টিকিয়া গেল। হয়ত তখন তুমি জানিতেও পারিলে না যে তুমিই ইহার প্রথম স্রষ্টা। এই প্রকারেই অজ্ঞাতসারে ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ হয় এবং এই ভাবেই ইহার পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসও হয়।

কিন্তু এখানেও একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা আছে। মনুষ্যের ইচ্ছানুসারে ভাষার সৃষ্ট ও পুষ্টি হয় না বলিয়া মোক্ষমূলর (Max Muller) প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত একটা বড় রকম ধাঁধায় পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন যে বৃক্ষাদি সজীব পদার্থের ন্যায় ভাষা একটা মনুষ্য-শক্তি-নিরপেক্ষ স্বয়ংপুষ্ট বস্তু (of an organic structure)। তিনি লিখিয়াছেন যে যদিও ভাষায় অবিরত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তথাপি ইহার নিবারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমাদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা বা আমাদের শরীরের উচ্চতা এক ইঞ্চি বৃদ্ধি করা আমাদের যেমন সাধ্যাতীত, ভাষার নিয়মের পরিবর্ত্তন বা ইচ্ছানুসারে নূতন শব্দের সৃষ্টিও আমাদিগের সেইরূপ সাধ্যাতীত। *

ইহার সপক্ষে তিনি দুইটী ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছিলেন এই যে, দুইজন সম্রাট্ অশুদ্ধ লাটিন লিখিয়া সাধারণ লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন' অর্থাৎ সম্রাটের মত ক্ষমতাশালী লোকের লখাও যখন তাঁহার প্রজার তিরস্কার পায়, তখন অন্য লোকের পক্ষে ভাষার পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ?

হ্বুইট্নী (W. D. Whitny) এই মতের নিষ্ঠুর সমালোচনা করিয়া এই যুক্তির বিপরীত সীমায় পৌছিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত এবং সেই কার্য্যে সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমান অধিকার। রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভোটের voteএর) ন্যায় ভাষার সৃষ্টিতেও সকলের ভোট চাই। ইনিও ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছেন। একজন ইংরাজ জ্যোতির্বিৎ একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিয়া রাজভক্তি বশে তাহার নাম দিয়াছিলেন 'ভিক্টোরিয়া' (Victoria)। কিন্তু সকলের অভিমত না হওয়ায় সে নাম তিনিই বদলাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার ইতালিবাসী একজন পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত একটী প্রাকৃতিক শক্তি বিশেষের আবিষ্কার করিয়া নিজের নাম অনুসারে সেই শক্তির নাম রাখিয়াছিলেন 'galvanism'। লোকে আবিষ্কারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই নামটী গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভাষায় তাঁহার এই নামকরণ চলিয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফ—পরিচালিত সংবাদের নাম Telegraph হইবে না Telegram হইবে, এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল বলিয়া নামকরণটী অনিরূপিত রহিয়া গিয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উভয় পক্ষই এস্থলে বিপথগামী হইয়াছেন। লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি অপ্রচলিত ভাষায় (dead languages) ব্যাকরণের নিয়ম পরিবর্ত্তন এযুগে চলিতে পারে না এবং অশুদ্ধ ভাষা সাধারণতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। আবার পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছাকৃতই হইয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি হইলে তাহার সমালোচনাও চলে। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও রাশি রাশি পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার অধিকাংশই অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে। ব্যবহার না হইলে সেগুলি ঐ পরিষৎ পত্রিকার মধ্যে

* [Although there is a continuous change in language, it is not in the power of man either to produee or to prevent it, we might think as well of changing the laws which control the circulation of our blood, or of adding an inch to our height, as of altering the laws of speech or inventing new words etc. to our pleasure.]

কীটদষ্ট হইয়াই লোপ পাইবে। আরও একটা কথা, পারিভাষিক শব্দ শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ লিখিত ভাষাতেই ইহাদের ব্যবহার। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকৃত ভাষা সৃষ্টির প্রণালী পাওয়া যাইবে না। এগুলিকে সাধারণ প্রণালীর ব্যতিক্রম বলিয়াই মানিতে হইবে।

অধ্যাপক পাউল (H. Paul) বলিয়াছেন ভাষা সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ এই যে, পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া কেহ ভাষাসৃষ্টি করে না। অন্ততঃ পক্ষে এইটী ধ্রুব সত্য যে ভাষার একটা স্থায়ী উপাদানের সৃষ্টি করিব এইপ্রকার উদ্দেশ্য করিয়া এবং জানিয়া শুনিয়া কেহ কিছুই সৃষ্টি করে না। অবশ্য স্বাভাবিক উপায়ে ভাষার বিকাশ ও কৃত্রিম চেষ্টায় ভাষা সৃষ্টি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রথমতঃ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর (কৃত্রিম) প্রক্রিয়াটীর কথা বাদ দিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে আমরা ভাষার স্বাভাবিক সরল বিকাশের প্রকৃতি বুঝিতে পারিব না। যতক্ষণ তাহা না বুঝি ততক্ষণ কৃত্রিম সৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা ফল প্রসব করিবে না। আমরা প্রাণিবিদ্যাবিৎ বা উদ্ভিদ্ বিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতদিগের কৃত্রিম সৃষ্টি ও সঙ্কর সৃষ্টির অনর্থক চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইব। কেবল মাত্র নিজের ইচ্ছায় 'কিছু—না' হইতে 'কোনও কিছু'র সৃষ্টি করা পশুপালক ও মালীর পক্ষে যেমন অসম্ভব, কৃত্রিম ভাষা-স্রষ্টার পক্ষেও তেমনি অসম্ভব। তাহারা পারে কেবল প্রাকৃতিক উপাদান লইয়া তাহাদের প্রাকৃতিক বিকাশের গতি ফিরাইয়া দিতে। দুইটী বৃক্ষ জুড়িয়া কলমের গাছ করা, বা আম্র বৃক্ষের মুকুলে বিল্বপুষ্পের রেণু সংস্পর্শ দ্বারা বিল্বগন্ধি আম্র উৎপাদন করা মালীর পক্ষে সম্ভব বটে, কিন্তু প্রকৃতি হইতে কোনও উপাদান না লইয়া বিনা প্রাকৃতিক উপায়ে নূতন কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। আবার যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাকৃতিক বিকা-শের পরিবর্ত্তন অসম্ভব সেখানে মালীর কোনও হাত নাই। ধান গাছের কলম, বা বাঁশ গাছে নারিকেল ধরান মালীর সাধ্যায়ত্ত নহে। জীবজগতে পশুপালক ও এই প্রকারেই সঙ্কর-সৃষ্টি সম্ভব-পর হয় না। ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রাকৃতিক উপাদান লইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে যে সৃষ্টি করা হয়, আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহা ভাষার অঙ্গীভূত হয়।

অজ্ঞাতসারে যে পরিবর্ত্তন ভাষায় প্রবর্ত্তিত হয় তাহার পরিমাণ অতি অল্প হওয়া চাই। ভাষার স্বাভাবিক গতির স্খলন একটী মাত্র স্থানে হইতে পারে, এক সঙ্গে একাধিক পরিবর্ত্তন গৃহীত হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'উভচর' শব্দের দুইটী উপাদানই ভাষায় ছিল, তিনি কেবল সেই উপাদান জুড়িয়া দিয়াছেন। শব্দটীর উপযোগিতা আছে বলিয়া এবং জটিলতা নাই বলিয়া তাহা চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনিও অনুপাত শক্তি-বশে (by force of analogy) অজ্ঞাতসারেই শব্দটীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষার সৃষ্টিতে এই অচিন্তিতপূর্ব্বতা উপাদান আছে বলিয়াই কোনও ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ভাষায় হইতে পারে না, লোকেও বুঝিতে পারে না যে ভাষায় যাহা ছিল না তাহা আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য ভাষার বিকাশের ক্রম অতি সরল। এই পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক ক্রমটীই ভাষাবিজ্ঞানবিৎ দেখিতে পান! অন্যান্য তত্ত্ববিজ্ঞানের তুলনায় ভাষাবিজ্ঞান সেই জন্যই অতি সরল। এবং সেই জন্যই অতি বিভিন্ন প্রকৃতির জন-সমষ্টির মধ্যেও ভাষার বিভিন্নতা এত অল্প হয় যে, তাহাকে বিভিন্নতাই বলা যায় না। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাষার এই মিল আছে বলিয়াই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্কার এত অভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই ভাষাবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় নিখুঁত বিজ্ঞান।

ভাষার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বিকাশের ফলে অতি প্রাচীনকালে ভাষার প্রকৃতি যেরূপ ছিল এখনও প্রায় তাহাই আছে। কোনও ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য তত্ত্ববিজ্ঞানের বিধিসমূহের প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কারণ দশ জনের ব্যষ্টিগত

প্রভাব সেখানে প্রবল ভাবে কার্য্য করিয়াছে। দশ জনের খেয়ালের বশে যে শাস্ত্রের ওলট-পালট হইতে পারে তাহার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা প্রায় থাকে না। তাই আইন, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে এত ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভাষার প্রকৃতি, ভাষার নিয়ম প্রায় একরূপই আছে। ভাষার স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী এবং ভাব প্রকাশের উপযোগী নূতন সৃষ্টি ব্যষ্টির নিকট হইতে ভাষা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ব্যষ্টির খেয়ালে সমষ্টি চলে না। ভাষার এই প্রকৃতির জন্যই ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সকল সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছে। অবিরত পরিবর্ত্তন-শীল নদী-প্রবাহের উপর পুরী রচনা চলে না।

অতঃপর নাম করণের কথা। ইংরাজীতে এই শাস্ত্রের নাম করণে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। Philology (=বাক্-প্রীতি, যেমন philo-sophy জ্ঞানপ্রীতি) কথাটাই এই বিজ্ঞানের নাম করণের পক্ষে নানা কারণে উপাযাগী হইত। কিন্তু Greek philology, Latin philology, English philology প্রভৃতিতে ব্যাকরণ অর্থে ইহার সঙ্কীর্ণ প্রয়োগ আছে বলিয়া সে কথাটার একটা বিশ্লেষণ দিয়া কাজ চালাইবার উপযোগী নামকরণ হইয়াছে Comparative Philology (তুলনা মূলক ভাষা-শাস্ত্র)। এ নামটাও সকলের পছন্দ হয় না। তাই Science of Language, (ভাষার বিজ্ঞান), Language and its study (ভাষা ও তাহার আলোচনা), Principles of Language (ভাষার তত্ত্ব সমূহ), Life and Growth of Language (ভাষার জীবন ও বিকাশ), ইত্যাদি নানারূপ নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু ইহার নামকরণের দুইটা প্রধান উপাদান ধায়াবাহিকতা (বা ইতিহাস) এবং তত্ত্বমূলকতা একত্র করিয়া পাউল ইহার নাম রাখিয়াছেন Principien der Sprachgeschichte (ভাষার ইতিহাসের তথ্য সমূহ)। টকর (T. G. Tucker) Glottology (ভাষালোচনা) নামটী পছন্দ করেন, কেন না Glossology শব্দের অর্থ পারিভাষিক শব্দের বিজ্ঞান। কিন্তু তাঁহার নিজের গ্রন্থের নাম Natural History of Language (ভাষার প্রাকৃতিক ইতিহাস)। বঙ্গ-ভাষায় যখন এ বিজ্ঞানের আলোচনাই হয় নাই, এবং এই শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বা ধারাবাহিকতা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকতারই মূল্য বেশী, তখন আমাদের ভাষায় "ভাষা-বিজ্ঞান" কথাটাই এই শাস্ত্রের নামকরণের উপযোগী। ভাষার ধারাবাহিক আলোচনা বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ের জন্যই, সুতরাং বিজ্ঞান শব্দেই তাহার অন্তর্নিবেশ হইতে পারে। আর 'ভাষা-বিজ্ঞান' কথাটী দুইটী মাত্র উপাদান লইয়া গঠিত এবং এই দুইটী শব্দই সার্থক। 'ভাষা-তত্ত্ব' কথাটার 'তত্ত্ব' শব্দ দর্শন শাস্ত্রের কাছ-ঘেঁষা। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞান দর্শন শাস্ত্র নহে। ইহাতে ভগবদ্ বিষয়ক বা পরমার্থ বিষয়ক কোনও আলোচনা নাই।

অতঃপর ভাষা-বিজ্ঞানের বিষয় বিভাগের কথা। প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন বিষয়-বিভাগ আছে, এবং সেই সকল বিভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে, ভাষা-বিজ্ঞানেরও তাহা আছে। সেই বিভাগের কথা বুঝিতে হইলে ভাষা শব্দটার একটা সংজ্ঞা চাই।

অতি বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে ভাব-প্রকাশের সহায়ক যাহা তাহাই ভাষা। কিন্তু এই সংজ্ঞাতে ভাষা বিশ্বগ্রাসী হইয়া পড়ে। দিবা, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য, পশু, পক্ষী সর্ব্বত্রই ভাষার সত্তা অনুভূত হয়। ইতর প্রাণীর ভাষা নাই একথা আমরা বলি না। কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় উন্নত ভাষা তাহাদের নাই, যদ্দ্বারা তাহারা চিন্তা করিতে পারে। তাহাদের সহিত আমাদের ভাষার প্রভেদ বস্তুর হিসাবে (qualitatively) না থাকিতে পারে, কিন্তু পরিমাণের হিসাবে (quantitatively) আছেই আছে। অতএব ইতর প্রাণীর ভাষা আমরা স্বীকার করিব না। তাহা হইলে যদি বলা যায় কৌশল পূর্ব্বক ভাব প্রকাশের উপায় ভাষা, তাহা হইলে কবিতা বক্তৃতা, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতিই ভাষা-পদ-বাচ্য হয়।

ভাব-প্রকাশের উপায় মাত্রই ভাষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইলেও ভাষা-বিজ্ঞান সে সকল ভাষার আলোচনা করে না। আমেরিকার আদিমনিবাসিগণের সাঙ্কেতিক ভাষার আলোচনায় ভাষা-বিজ্ঞানের অনেক গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে বটে, এবং বিশেষজ্ঞগণ সে সকল বিষয়েরও আলোচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ভাষা-বিজ্ঞানে সঙ্কেতাদিকে ভাষা বলা হয় না। যে ভাষা একজন মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্য ব্যক্তির মনে ভাবোদ্রেক করে তাহাই ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচ্য ভাষা। তাহা হইলে আমাদের ভাষার সংজ্ঞা হইবে :—

মানবের অভ্যাস বশতঃ ভাব-বিশেষের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট বাগিন্দ্রিয়োচ্চারিত শব্দ (অথবা তাহার লিখিত চিত্র) সমূহ-দ্বারা ভাব-প্রকাশই ভাষা।

এই উপায়ে ভাব-প্রকাশের জন্য আমরা বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি। কারণ বাক্যেই ভাব-সমূহের সম্পর্ক প্রকাশ করে। বাক্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র উপাদানকে অতি বিশ্লিষ্ট উপাদান বলিতে হইবে। বাক্যই ভাষার বিশ্লেষণে একক (unit) স্থানীয়। এই বাক্যে চাই (১) উচ্চারিত ধ্বনি সমূহ, (২) তাহাদের মিলনে শব্দাদি-গঠন, (৩) শব্দসমূহের সম্পর্কানুসারে একত্র বিন্যাস এবং (৪) তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ এবং সমবেত অর্থ। সুতরাং ভাষা-বিজ্ঞানেরও চারি বিভাগ—(১) ধ্বনি-বিজ্ঞান ও ধ্বনিব্যত্যয়, (২) গঠন বা রচনা-প্রণালী, (৩) বিন্যাস-প্রণালী এবং (৪) শক্তি-বিকাশ প্রণালী। ধ্বনি-বিজ্ঞানে (Phonology) বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও প্রকৃতি, বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার গ্রহণ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং (খ) ধ্বনির পরিবর্ত্তন প্রণালী নির্ণয় করা হয়। (২) রচনা-প্রণালীতে (Morphology) নানাবিধ শব্দ, উপসর্গ, প্রত্যয় ও বাক্যের গঠন বিষয়ক বিধি নির্ণয় করা হয়। (৩) বিন্যাস প্রণালীতে (syntax) পদ-সমূহের একত্র মিলন দ্বারা অর্থ প্রকাশের উপায় নির্দ্ধারণ করা হয়। (৪) শক্তি-বিকাশ প্রণালীতে (semantics) শব্দ ও বাক্যের সহিত অর্থের সম্পর্ক, বিকাশ, বিভিন্নতা ও পরিণতির ধারা নিরূপণ হয়।

ব্যাকরণ, তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) ও ধারাবাহিক ব্যাকরণের (Historical Grammar) কথা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ব্যাকরণ সাধারণতঃ কোনও একটি ভাষার কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের আকার লক্ষ্য করিয়া সেই ভাষা শিখিবার সুবিধার জন্য আবিষ্কৃত হেতুবাদ-বিহীন বিধি ও ব্যতিরেকের সমষ্টি। ইহাতে ভাষার প্রকৃতি বা বিকাশের মূলীভূত কোনও ধারা নিরূপিত হয় না। ধারাবাহিক ব্যাকরণে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ভাষার বিভিন্ন কালীন আকারের বিবরণ থাকে। তুলনামূলক ব্যাকরণে এক বংশীয় কয়েকটি ভাষার কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট কালের আকার তুলনা করিয়া তাহাদের সব কয়টির সাধারণ বিবরণ প্রদত্ত হয়। ভাষার প্রকৃতি বা বিকাশের ধারা বা তাহার পরিবর্ত্তনের কোনও বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ এই সকল ব্যাকরণে থাকে না। ব্যাকরণ (বিশেষতঃ তুলনামূলক ও ধারাবাহিক ব্যাকরণ) ভাষা-বিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সহায়তা করে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও ধার ধারে না। আবার দেশ বিশেষে (যেমন আমাদের দেশে প্রাচীন কালে) ব্যাকরণ ভাষার শুদ্ধতা বা শিষ্টতা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া ভাষার শুদ্ধতা কতক পরিমাণে রক্ষা করে বটে, কিন্তু ভাষার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যায়। তখন এই ব্যাকরণ যে জিনিস রক্ষা করে তাহা জন-সমাজের বুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে না বলিয়া নূতন ভাষা স্বাভাবিক কারণে গজাইয়া উঠে। বৈয়াকরণের সমাদর-সংরক্ষিত বস্তু শিশির মধ্যে স্পিরিটে ভিজান প্রাণি-দেহের ন্যায় ব্যাকরণ মধ্যে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু প্রাণ থাকে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি-তর্পণ

১। পরলোকে চিত্তরঞ্জন।

"ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার!" গত ১৩৩১ সালের প্রারম্ভেই যখন আমরা বঙ্গের পুরুষসিংহ, প্রতিভার জলন্ত অবতার, অশেষ বিদ্যাজ্ঞান-বিখ্যাত, ধুরন্ধর, নানা গুণালঙ্কৃত মহাপুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হঠাৎ তিরোধানের সংবাদে মুহ্যমান হইয়া শোকদীর্ণ হৃদয়ে প্রাণের বেদনা অশ্রুসিক্ত ক্রন্দনে ব্যক্ত করিতে এই প্রাঙ্গনে সমাগত হইয়াছিলাম, তখন কি আমরা স্বপ্নেও মনে করিতে পারিয়াছিল যে, বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই আবার এই ১৩৩২ সালের প্রারম্ভেই আমাদিগকে বঙ্গের আর এক কৃতী মহাপুরুষের বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে হইবে? কিন্তু হায় দুর্দ্দৈবের পরিহাস! যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি, যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি! ইহাই বিধাতার বিধি! দুর্ভাগিনী বঙ্গমাতার ললাটের ইহাই দৈবী লিপি! তাই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, বুধবার সন্ধ্যাকালে, অকস্মাৎ নির্মেঘ আকাশে অশনি সম্পাতের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে ভীষণ বজ্রপাত হইল, "সি, আর, দাশ নাই! গত ২রা আষাঢ় বৈকালে ৫টার সময় তাঁহার পবিত্র আত্মা ইহলোকের কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে ভগবচ্চরণ ছায়াতে শান্তিলাভ করিয়াছে।" যেমন গত-বৎসর আশুতোষের বিয়োগ সংবাদ শুনিয়া তাহা কেহ সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, এবৎসরও এ মর্ম্মচ্ছেদী সংবাদ বিশ্বাস করিতে প্রাণ অস্বীকার করিয়াছিল। অনেকেই ভাবিয়াছিল, হয় ত বা আর কেহ হইবেন, আমাদের চিত্তরঞ্জন নহেন! কিন্তু হায়, এ নির্ম্মম সত্য মিথ্যা হইল না। যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা ক্রমে স্পষ্টীকৃত হইল, যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা ব্যক্ত হইল। ৫৪ বৎসর যাবৎ যিনি স্বীয় মধুর অমায়িক স্বভাবের গুণে চিত্তরঞ্জন নাম সার্থক করিয়াছেন, আজ তিনি দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র সকলের চিত্ত শোকশেলাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া সাধোনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। বঙ্গের রাজনৈতিক গগনের দীপ্তসূর্য্য খসিয়া পড়িল, বঙ্গ সাহিত্যকুঞ্জ হইতে এক কলকণ্ঠ বিহঙ্গ উড়িয়া গেল, 'সাগরসঙ্গীত' থামিয়া গেল; কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হইতে অক্লান্তকর্ম্মা মেয়রের আসনগৌরব ভ্রষ্ট হইল, সমগ্র ভারত অসাধারণ প্রতিভাবান্ স্বরাজ্যদলের নেতার অমূল্য উপদেশ এবং পরামর্শ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল, পরিচিত মিত্রবর্গ একজন অমায়িক নিরভিমান উদারহৃদয় বন্ধু হারাইল, দীন দরিদ্রগণ তাহাদের দুঃখকাতর মুক্তহস্ত সহায় সম্পদ হীন হইল। তাঁহার আত্মীয় পরিজনবর্গ যে কি অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার কথা নহে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অশেষ সুকৃতি না থাকিলে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় পিতা বা আত্মীয় পাওয়া যায় না, যাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের এ বিয়োগ বেদনা হৃদয় দিয়া অনুভবনীয়।

চিত্তরঞ্জনের নাম দেশবাসীর হৃদয় ফলকে প্রেমের স্নেহের শ্রদ্ধার ভক্তির তুলিকাতে অতি মধুর ভাবে অঙ্কিত আছে। জনগণের মনের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে তাঁহার শক্তি প্রকৃতই অসাধারণ ছিল। কি হৃদয়ের তেজস্বিতায়, কি কুশাগ্রবুদ্ধি প্রাখর্য্যে কি স্বার্থত্যাগ মহিমায়, কি স্বদেশ সেবাব্রতে—তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন! বিদ্যাসাগর বলিতে যেমন সেই দয়ার সাগর দানবীর মহাত্মাকেই বুঝায়, আশুতোষ নাম যেমন সেই বঙ্গের পুরুষ শার্দ্দূলের পুণ্যস্মৃতিই জাগাইয়া দেয়, চিত্তরঞ্জন বা সি, আর, দাশ বলিতেও কেবল লোকে তাঁহাকেই বুঝিত, তাঁহাকেই বুঝে এবং তাঁহাকেই বুঝিবে। এ শুধু বাঙ্গালাতে নহে ভারতের সর্ব্বত্র!

আজ তাঁহার এই অকাল বিয়োগে শুধু বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক পল্লীতে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে—সকলেই ভাবিতেছে যেন তাহাদেরই কোন অতি নিকট প্রেমাস্পদ আত্মীয়ের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সকলেরই মুখে হায় হায় শব্দ! তাঁহার চিরনিদ্রাগত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্ব ভাষার দৈনিক পত্রগুলির স্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে বুঝিবেন, সুউচ্চ হিমালয় শিখর হইতে ভারত মহাসাগরের কূল পর্য্যন্ত, সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি যেন প্রচণ্ড শোক-ভূকম্পনে মুহুর্মুহু প্রচালিত হইতেছে; জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, পদ, বয়স এবং মতামত নির্ব্বিশেষে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান; বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম, মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাব, আসাম, ব্রহ্ম,—সমস্ত নর নারী, আজ অশ্রুসিক্ত নয়নে বেদনা ভরা হৃদয়ে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির তর্পণ করিতেছে, তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেছে! ইহার জন্য কেহ তাহাদিগকে প্ররোচিত করে নাই, অনুরোধ উপরোধ করে নাই, আহ্বানও করে নাই! এই যে শোকাশ্রু, ইহা প্রকৃতই অন্তরের অন্তস্তল হইতে স্বতঃ উৎসারিত ভোগবতী ধারার ন্যায় সুবিমল ভক্তি উৎস! রাজনৈতিক জীবনে যঁহাদের সহিত তাঁহার মতভেদ ছিল, যাঁহাদের সহিত তিনি অমিতবিক্রমে স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী মত স্থাপন প্রসঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও আজ সে সমুদয় বিরোধ ভুলিয়া তাঁহার মহত্বের নিকট শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিতেছেন; তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত প্রতিপক্ষ লাভ করাও ভাগ্যের কথা বলিয়া তাঁহারা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার আদর্শ ত্যাগদীপ্ত পূর্ণ স্বদেশ-প্রেমের গৌরবে মণ্ডিত জীবনের অসাধারণত্ব মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন।

চিত্তরঞ্জনের এই সর্ব্বজনপ্রিয়তার মূলে তাঁহার অকৃত্রিম দেশভক্তি, কর্ম্ম প্রবৃত্তির পূর্ণ আন্তরিকতা এবং অসাধারণ স্বার্থত্যাগ বিদ্যমান। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা প্রতি পদেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

চিত্তরঞ্জনের জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-মধ্যমণি, জগদীশচন্দ্র, মনোমোহন, চন্দ্রমাধব প্রভৃতি মনীষিবর্গের জন্মস্থান—বিক্রমপুর! ইঁহারা বৈদ্য। ইঁহার পিতার নাম ৺ভুবনমোহন দাশ। প্রসিদ্ধ উকিল ৺দুর্গামোহন দাশ এবং ৺কলীমোহন দাশ ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত। ভুবনমোহনও কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্ণি ছিলেন। চিত্তরঞ্জন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পি, আর, দাশ মহাশয় পাটনা হাইকোর্টের জজ।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে স্বীয় চরিত্র প্রভাবে তাঁহারা উচ্চ সম্মান-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন ১৮৯০ খৃঃ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ হইয়া বিলাতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে গমন করেন। ঐ পরীক্ষাতে তিনি উত্তীর্ণও হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। তার পর ব্যারিষ্টারি পাশ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহাকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে অনেক প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইঁহাদের বংশে অর্থের প্রতি আসক্তি কোন দিনই দেখা যায় নাই। ইঁহার পিতা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিলেও ব্যয়েও তেমনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি অনেক টাকা ঋণ রাখিয়া যান। চিত্তরঞ্জনও স্বীয় ব্যবসায়ের প্রারম্ভে অনেক অর্থকৃচ্ছতা সহ্য করিয়াছেন, এমন কি শেষে তাঁকে দেউলিয়া পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছিল। তার পর যখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে, মা কমলার কৃপা দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল, ব্যবসায়ে যখন বিশেষ রূপ অর্থাগম হইতে লাগিল, তখন তিনি স্বীয় বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পিতার এবং নিজের উত্তমর্ণগণের সমুদয় ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া স্বীয় চরিত্র মাধুর্য্য ও মহাপ্রাণতায় দেশবাসিগণের প্রশংসমান বিস্মিত দৃষ্ট আকর্ষণ করিলেন। কারণ আইনতঃ তিনি এই সব ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য ছিলে না। তাই ধর্ম্মের চক্ষে ন্যায়ের চক্ষে তাঁহার এই মহত্বের গৌরব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিল।

সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এইরূপে প্রথমে চিত্তরঞ্জন সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের গুণে সকলের চিত্তরঞ্জন করিলেন ; দেশবাসিগণ তথনই বুঝিল তিনি কি ধাতুতে গঠিত !

প্রসিদ্ধ স্বদেশী বোমার মামলাতে তিনি স্বীয় অসামান্য ব্যবহারশাস্ত্র জ্ঞানের প্রভাবে আসামীদিগকে মুক্ত করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিলেন। যাঁহারা সেই সময় তাঁহার ঐ মোকর্দ্দমা পরিচালনের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিচক্ষণতা,তীব্র বুদ্ধি, বিচার শক্তি, আইন জ্ঞান প্রভৃতির একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। তখন হইতেই ব্যবহারাজীব রূপে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তখন হইতে কুবের যেন স্বীয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া এই উদ্যোগী মহাপুষের পুরুষকারের পুরস্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। বৎসরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা জলস্রোতের ন্যায় তাঁহার ভাণ্ডারঁ পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বাহ্যতঃ রাজসম্পদের অধিকারী হইয়াও, অন্তরে নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসী ছিলেন। অর্থের উপর মমত্ব বুদ্ধি তাঁহার কখনই ছিল না। "উপার্জ্জিতস্য বিত্তস্য ত্যাগ এব হি রক্ষণম্' ইহাই তাঁহার জীবনের মুলমন্ত্র ছিল। তাই যখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেশে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগের প্রচার হইল, তখন তিনি উহার সারবত্তা যেমন মনে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, তখনই মাসিক ২৫৷৩০ হাজার টাকা বা তদধিক আয়ের ব্যবসায় তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিয়া, নিজে পরিবারবর্গ সহ দীন সন্ন্যাস জীবনকেই সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়া স্বীয় সমস্ত মেধা, শক্তি, সামর্থ্য দেশমাতার সেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিলেন ; একটু হেলিলেন না, একটু দুলিলেন না। যেমন সংকল্প, তেমনই কার্য্য !

জগৎ সংসার তাঁহার স্বার্থ ত্যাগের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্মিত হইল! আজকালকার এই ধনতৃষ্ণার যুগে যখন অনেক সন্ন্যাসিবেশধারীও অর্থের লালসা দমন করিতে অক্ষম হইয়া ঐ বেশকেই অর্থাগমের উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করে না, চিত্তরঞ্জন লক্ষ লক্ষ মুদ্রার মোহজাল নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া, রাজবেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন! এটা কি কম স্বার্থত্যাগের কথা? আর ইহা কি মনে করিলেই যে কেহ করিতে পারে?

চিত্তরঞ্জন পৈতৃক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈষ্ণব ভাবের উপাসক হইয়াছিলেন, মধুর কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া থাকিতে বড়ই ভালবাসিতেন। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ দীনতাকে বরণ করিয়া লইতে তাঁহার দ্বিধা হইবে কেন?

যিনি অর্থের মোহমদের উন্মাদনা কখনও বোধ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে দৈন্য বরণ করিয়া লওয়া তত কঠিন নহে। কিন্তু যিনি সে মদের আস্বাদ একবার পাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া কতদূর কঠিন তাহা সকলে বুঝিয়া দেখিবেন। মহাত্মা গান্ধী মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই অসাধরণ ত্যাগ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন! এইখানেই তাহার চরিত্রের অসাধারণত্ব, এইখানেই তাঁহার প্রকৃত মহত্বের প্রকাশ, আবার এইখানেই তাঁহার হৃদয়ের স্থৈর্য্য এবং দৃঢ়তার পরিচয়!

এইরূপে তিনি কাঙ্গাল বেশে মাতৃভূমির সেবায় স্বীয় জীবন এবং স্ত্রী পুত্র পরিজনাদি সকলকে উৎসর্গ করিয়া অক্লান্ত ভাবে দেশের উদ্ধারের জন্য স্বীয় বিশ্বাস ও ধারণা-অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও, যেখানে মহাত্মার মতের সঙ্গে নিজ মতের সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই, সেখানে তিনি স্বমতানুবর্ত্তনই করিয়াছেন, মহাত্মা প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করেন নাই। এরূপ স্বতন্ত্রতা থাকা ব্যক্তিত্বের লক্ষণ, কারণ তাঁহারা গতানুগতিক হইতে পারেন না।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বরাজ্য কামী ছিলেন এবং স্বীয় দলের নেতৃপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যে পথে স্বদেশের প্রকৃত কর্ম্ম এবং মুক্তি সাধন হইবে মনে করিতেন, সেই পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি যে কিরূপ মনে প্রাণে আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিতেন এবং তাহাতে

তিনি কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন। জগতে সকল বিষয়েই মতদ্বৈধ বিদ্যমান। রাজনীতিক্ষেত্রে তো এরূপ দ্বৈধ সর্ব্বদেশে সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। আমি সামান্য শিক্ষা ব্যবসায়ী—আজীবন তাহাতেই লিপ্ত আছি—রাজনীতি চর্চ্চার দিকে কখনও মন দিতে পারি নাই, সুতরাং এই সব মতদ্বৈধের মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অধিকারী নহি। তথাপি ক্ষুদ্র হইলেও এই সব বিষয়ে আমার নিজস্ব একটা যে ধারণা আছে, তাহা সর্ব্বত্র এই ক্ষণজন্মা মহাকর্ম্মী পুরুষের মতের অনুকূল নহে। আরও অনেকে আছেন, তাঁহারাও এইসব বিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেন এবং তাঁহাদের স্বীয় দল গঠন করিয়া তাঁহারাও কার্য্য করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীজিও সর্ব্ববিষয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একমত নহেন। তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের বিষয় আলোচনা করিবার সম্বন্ধে এ স্থান ও কালও যেমন অনুপযোগী, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক-রূপ পাত্রও সেইরূপ বা তদপেক্ষাও অনধিকারী—সুতরাং তাহার বিচার এখানে হইতেই পারে না। তবে আমি দেশমাতাকে প্রাণে মনে ভক্তি করি, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সকল সন্তানেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। আমার কাছে দেশের বেশভূষা দেশের ভাষা, দেশের খাদ্য, পানীয়, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেশের বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জক আচার ব্যবহার সবই প্রিয়! তাই অকৃত্রিম দেশ সেবকরূপে, দেশের মমতায় অসাধারণ ত্যাগ মন্ত্রের উপাসকরূপে, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ সাধকরূপে, দৃঢ়ব্রত অক্লান্ত কর্ম্মীরূপে আমি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। কপটতা তাঁহার মনে ছিল না বলিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে তিনি নির্ভীক ভাবে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতেন এবং তাহা সাফল্য মণ্ডিত করিতে প্রাণপাত করিতেন। ইহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে।

তারপর বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ যে কম ঘনিষ্ঠ নহে তাহা তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত অধুনা বিলুপ্ত 'নারায়ণ' নামক উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের ইতিহাসেই লিখিত আছে। বাস্তবিক "নারায়ণ" পত্রখানি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহার্ঘ রত্ন ছিল। উহার সম্পাদনের কৃতিত্বও সম্পূর্ণ তাঁহারই ছিল। উহার অন্তর্ধান সাহিত্যের একটা বড় রকমের ক্ষতি বলিয়াই সকলে মনে করেন। তারপর তাঁহার 'সাগর সঙ্গীত' ও 'মালঞ্চ' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, তিনি কিরূপ উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং তাঁহার কল্পনা কেমন স্বপ্নময়ী, মাধুরী ভরা, চিত্তহারিণী ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি রসিকগণের চিত্তরঞ্জনই ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বন্ধুভাবে যে কিরূপ চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচয় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। কি যে তাঁর সেই প্রসন্ন মুখে মাখান ছিল, সকলেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুণবদ্ধ হইয়া পড়িতেন। শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "নায়কে সময় সময় চিত্তকে খুব গাল দিয়েছি, ভেবেছি এবার দেখা হলে সে আর কথাই কবে না, কিন্তু ও হরি! দেখা হইলেই সেই স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণব দীনতার সহিত কি মধুর আপ্যায়ন! সেটা মুখের নয়, আন্তরিক। আবার কোন কোনও দিন বলেছে, খুব গাল দিয়েছ হে!" ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও চিত্তরঞ্জনের স্বভাব মাধুর্য্য সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রথম মেম্বর স্বরূপেও তিনি অনেক হিতকর প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ক্রমে তাহা সবই কার্য্যে পরিণত করিয়া কলিকাতাকে স্বাস্থ্যে, সমৃদ্ধিতে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিবারই তাঁহার কল্পনা ছিল। কিন্তু সে সব কোরকেই বিনষ্ট হইল, কালের করাল দংশনে তাহা আর ফুটিবার অবসর পাইল না।

আমাদের এত গুণের আধার, দেশমাতার অকৃত্রিম ভক্ত, সাধক ও সেবক চিত্তরঞ্জন, বাঙ্গালা মাতার অতি প্রিয় পুত্র চিত্তরঞ্জন, ভারতমাতার অতি প্রিয় সেবক দেশব্রত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের সেবায় গত মঙ্গলবার ২রা আষাঢ় দার্জিলিঙে স্বীয় প্রাণ পাত করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে ইউরোপ যাত্রার পরামর্শ দেন, অন্ততঃ কর্ম্মজীবনের কোলাহল ও শ্রান্তি হইতে কিছুদিন বিশ্রাম লইবার উপদেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্দাম দেশভক্তির জলন্ত শিখা তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। তিনি ঠিক যেন এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতেই চলিয়া গিয়াছেন "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।"

যখন তিনি নিজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন যে সেবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িয়াছে, তখনই তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহার স্বাস্থ্যে তাঁহার শক্তি সামর্থ্যে কুলাইবে কিনা, শারীরিক তাৎকালীন অবস্থাতে তাঁহার আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য কিনা এসব বিবেচনার অবসর তাঁহার ছিল না। এ দেহ, এ মন, এ প্রাণ সবই যে দেশমাতার! তাঁরই কার্য্যে যদি ইহা ব্যয়িত হয়, তবে তো তাহা সার্থক! এই তাঁহার মনের ভাব ছিল। তাই আমরা তাঁহাকে অকালে হারাইয়া হাহাকার করিতেছি। আর তাঁহার মধ্যে এই ঐকান্তিকতা ছিল বলিয়াই আজ ভারতেব দিকে দিকে তাঁহার জন্য শোকের উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে। তাই আজ সুদুর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আফ্রিকা প্রভৃতি বিদেশ হইতেও তাঁহার বিয়োগ-বেদনার উচ্ছ্বাস সম বেদনার অশ্রুরূপে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে! এমন বিশ্বব্যাপী বেদনার প্রতিধ্বনি বুঝি অনেকদিন শুনা যায় নাই।

যখন কলিকাতাতে নিতান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে এই নিদারুণ সংবাদ পৌছিল, তখন আপামর সাধারণ সকলেই যেন চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়ের প্রথম স্তব্ধভাব দুর হইলেই অস্থির চিত্তে কলিকাতাবাসী নরনারী আকুল ভাবে চারিদিক ছুটাছুটি করিয়া ইহার তথ্য নির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দারজিলিং ও কলিকাতার মধ্যে তারের খবর আদান প্রদান শত গুণ বৃদ্ধি পাইল, টেলিফোনের কার্য্য কারকগণের শ্রম অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হইল; তাঁহারা অনবরত পরিশ্রম করিয়াও কিছুতে প্রার্থিগণের দাবী মিটাইতে পারিলেন না। কলিকাতা হইতে চিত্তরঞ্জনের পরম বন্ধু কয়েকজন তৎক্ষণাৎ দারজিলিং রওয়ানা হইলেন। শিয়ালদহ ষ্টেসনে যখন চিত্তরঞ্জনের পার্থিব দেহ আসিয়া উপস্থিত হইবার কথা, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ষ্টেশনের আশেপাশে অসম্ভব লোক-সমাগম হইতে লাগিল। আসাম হইতে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া খুলনার পথে বারাকপুরে পৌছিয়া দারজিলিং মেলে চিত্তরঞ্জনের পত্নী পুত্র সহ মিলিত হইয়া কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌছিলেন। দারজিলিং মেল ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র সেই বিরাট জনসংঘ শোকাবেগে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা একবাক্যে বলিয়াছেন এরূপ বিরাট জনতা পূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের স্মরণ হয় না।

চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ গাড়ী হইতে অবতারিত হইয়া উপযুক্ত বাহকগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পথে বাহির হইল; শোকার্ত্ত জনসংঘ পুষ্পমাল্য ভূষিত সে দেহের প্রতি শেষ দৃষ্টিপাত করিবার জন্য বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল—একবার তাহাদের চিত্তরঞ্জনকে তাঁহারা শেষ দেখা দেখিবেন। লক্ষ লক্ষ লোক শবদেহের অনুগম, করিতে লাগিল। এইরূপে মিউনিসিপাল আপিস হইয়া চৌরঙ্গীর পথে রসারোডে চিত্তরঞ্জনের আবাস ভবনের সমীপে তাঁহার দেহে উপস্থাপিত হইল। পথে সর্ব্বত্র এই শোক সংক্ষুব্ধ নর নারীর শোকোচ্ছ্বাস এবং পুষ্পমাল্যাদি বর্ষণ চলিয়াছিল। তথা হইতে কেওড়াতলার প্রসিদ্ধ শ্মশান ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া চিতা রচনা করা হইল; ক্রমে দেশসেবাব্রতী সন্ন্যাসী, সাহিত্য রসিক,

ত্যাগবীর চিত্তরঞ্জনের পাঞ্চভৌতিক দেহ পবিত্র অগ্নিদেবের ক্রোড়ে স্থাপিত হইল; তিনি তাহা পঞ্চভূতে মিশাইয়া দিলেন। সব ফুরাইল—চিত্তরঞ্জনের চিতা তখন তাঁহার বঙ্গবাসী যথা ভারতবাসী ভ্রাতা ভগিনীগণের হৃদয়ে প্রজ্জ্বালিত হইল,—বঙ্গজননীর কোল খালি হইয়া গেল, তাঁহার আশা ভরসা সব মিটিয়া গেল! বঙ্গজননী যে রত্ন হারাইলেন তাহার শূন্য স্থল কি আর কেহ পূরণ করিতে পারিবে?

যে দানবীর চিত্তরঞ্জন স্বোপার্জ্জিত অগাধ অর্থ সম্পত্তি স্বদেশের সেবায় সানন্দে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিজে ফকীর সাজিয়াছিলেন, যাঁহার একনিষ্ঠ স্বদেশ ভক্তি এবং অসাধরণ স্বার্থত্যাগ মহিমায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসী যাঁহাকে 'দেশবন্ধু' নামে অভিহিত করিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রায় সমান আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিল, যাঁহার তিরোধানে শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতানৈক্য বিস্মৃত হইয়া আন্তরিক শোকাবেগ অধীর হইয়া হাহাকার করিতেছেন, হিন্দু মুসলমান ইংরাজ সকলে জাতিগত ধর্ম্মগত এবং মতগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া যাঁহার অশেষ সদ্‌গুণের প্রশংসায় মুক্ত হইয়া বলিতেছেন এমনটি আর হইবে না—স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি পর্য্যন্তও যাঁহার বিয়োগ-বেদনা-বিধুরা সহধর্ম্মিণীকে স্বীয় সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কি বঙ্গ বিহার এলাহাবাদ প্রভৃতি প্রাদেশিক রাজধানীর উকীল ব্যারিষ্টার সংঘ, কি হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জননায়ক ও নাগরিকগণ সকলেরই হৃদয় আজ বিষাদমলিন, শোকদীর্ণ। আমাদের গোরক্ষপুর নগরের জননায়কগণ, অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে এক শোকসভা আহ্বান করিয়া নিজেদের বেদনা প্রকাশ এবং চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের গুণ ব্যাখ্যা এবং তাঁহার অভাবে ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রের অবস্থারও বিচার করিয়াছেন। তথাপি আমরা যে আজ এখানে আমাদের শোক প্রকাশের জন্য পুনরায় সমবেত হইয়াছি, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। আমাদের এ মিলনের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। রাজনৈতিক ক্ষতির বিচার করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীগণ আমাদের বঙ্গমাতার প্রিয় পুত্র, আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন যে আমাদেরই একজন, তাঁহার গৌরবে যে আমরা গৌরবান্বিত, আমাদের জাতি গৌরবান্বিত, আমাদের নিতান্ত আপনার সেই চিত্তরঞ্জন, ত্যাগের প্রভায় ভাস্বর, দানের মহিমায় দীপ্ত, স্বদেশসেবা গৌরবে গরীয়ান্, চরিত্র মাধুর্য্যে মহীয়ান্, বঙ্গমাতার অঙ্গের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার চিত্তরঞ্জনের বিয়োগ যে আমাদের নিজ পরিবারস্থ কোন নিকট আত্মীয়ের বিয়োগের ন্যায়ই দুঃসহ! তাই আমরা সেই পরমাত্মীয়-বিয়োগবিধুর হইয়া আজ সকলে একত্র মিলিয়া সমবেত অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতে আসিয়াছি। আর তাঁহার ন্যায় স্বামী হারাইয়া, তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁহার ন্যায় পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত চিররঞ্জন, তাঁহার কন্যা জামাতা ও আর আর আত্মীয় কুটুম্বগণের এ শোকশেলাঘাত দীর্ণ হৃদয়ে সমবেদনার কিঞ্চিৎ প্রলেপ প্রেরণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষাও আমাদিগকে এ শোক ব্যঞ্জনাতে প্রবুদ্ধ করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে সমাসীন হইয়াছিলেন, জনগণের হৃদয়ে তিনি গৌরবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সম্মান, সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনের সাধনার ব্রত উদ্‌যাপিত করিতে করিতে বীরের ন্যায় তিনি রণক্ষেত্রেই তনু ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুপম ত্যাগ, সংযম, একনিষ্ঠ দেশপ্রীতি দীনজনের প্রতি করুণা, ধর্ম্ম ও নীতিপথের অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা রক্ষা প্রভৃতি অশেষ সদগুণ আমাদের তরুণগণের হৃদয়ে আদর্শের কার্য্য করুক। তাঁহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তে আমাদের মধ্যে ভোগের লালসা অন্তর্হিত হইয়া যদি ত্যাগের মহত্ত্ব দেদীপ্যমান হয়, আমাদের জীবনে যদি আমরা তাঁহার শতাংশের একাংশও কার্য্যতৎপরতা, একনিষ্ঠ আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি, এবং স্বার্থত্যাগ দেখাইতে

পারি, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি আমাদের প্রকৃত প্রেমের, শ্রদ্ধার পরিচয় দেওয়া হইবে। তাহাই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির তর্পণাঞ্জলি হইবে।

পরম মঙ্গলালয় ভগবান্ স্বর্গ হইতে আমাদের বঙ্গ-সন্তানদিগের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, তাহারা যেন স্বীয় চরিত্র প্রভায় তাহাদের গৌরব ক্ষণজন্মা আত্মত্যাগী মহাপুরুষ চিত্তরঞ্জনের স্বদেশবাসী বলিয়া পরিচয় দিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে, স্ব-স্ব কার্য্যে বঙ্গমাতার মুখ স্বদেশে ও বিদেশে উজ্জ্বল করিয়া চিত্তরঞ্জনের জীবনব্যাপী বৈষ্ণব ভাবনাধুর্য্যের অহিংস প্রেমধারা অব্যাহত রাখিয়া তাঁহার স্বর্গগত আত্মার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে। আর তাঁহার চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা যে তিনি চিত্তরঞ্জনের শোকতপ্ত সহধর্ম্মিণী ও পুত্র পরিজনগণের হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুন। তাঁহারা যেন তাঁহাদের এই শোক তাঁহার স্বদেশবাসিগণও তুল্যরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন ইহা বুঝিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন।

নারায়ণ-ভক্ত চিত্তরঞ্জনের পবিত্র আত্মা তাঁহার শ্রীচরণকমল-মকরন্দ আনন্দ চিত্তে নামকীর্ত্তননানন্দে বিভোর থাকিয়া চির শান্তি লাভ করুন।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! (১)

শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

(১) গোরক্ষপুর শোক-সভায় পঠিত।

২। চিত্তরঞ্জন।

বীর তুমি, জাগাইলে বিজলী ঝলকে
প্রবল বজ্রের ধ্বনি মাতৃ আবাহনে
মাতাইলে রুদ্রতেজে চোখের পলকে
পঙ্গু, মূক রুদ্ধ হিয়া ভীরু ভ্রাতৃগণে;
ছিলে তুমি অধর্ম্মের পীড়ন বিপ্লবে
দুর্ব্বার আয়ুধপাণি পার্থ, কৃষ্ণপ্রিয়—
স্বর্গের সঙ্কটকালে অপাপ আহবে
সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, ভৈরব-আত্মীয়।

ঋষি তুমি, আট কোটি হৃদি যজ্ঞভূমে
গেলে জ্বালি অনির্ব্বাণ হোম হুতাশন,
গেলে গাঁথি অকলঙ্ক ত্যাগের কুসুমে
ভক্তির ভাস্বর মালা, মৃত সঞ্জীবন;
স্বদেশের তপোবনে শান্ত শুদ্ধ স্বরে
স্বাধীনতা সাম মন্ত্র ধ্বনিলে, ঋত্বিক,
বিদেশের কুঞ্জতলে প্রসন্ন অন্তরে
জননীর স্তবগান গাহিলে নির্ভীক।

কবি তুমি, গেলে লিখে তাই অনুরাগে
মৃত্যুহীন মহাছন্দে দেশ মাতৃকার
মুক্তির অক্ষয় বাণী ললাটের আগে,
বুকের শোণিত দিয়া; আঁখি তারকার
অচপল জ্যোতি ঢালি তিমির সাগরে
দেখাইলে আশা-পথ; শৃঙ্খল কঠিন
বাজাইয়া অকাতরে মঞ্জীরের স্বরে
বন্ধনেরে করেছিলে আনন্দে বিলীন।

প্রেমী তুমি, শত্রু মিত্রে দিলে নিরন্তর
প্রাণভরা আলিঙ্গন, সৌরভ কোমল
হ'লে বাহু-মালঞ্চের নব মালাকর,
শুনাইলে সাগরের সঙ্গীত তরল;
প্রেমে তুমি হে নৃ-পতি করিলে বরণ
সেবকের ধূলি শয্যা কল্যাণে মোদের,
প্রেমে তব মরণেরে করিয়া হরণ
ব্রত তব করি লব উৎস অভয়ের।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

৩। স্মৃতির তর্পণ।

পোল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক Schienkiewzএর একটি গল্প আছে। বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এক বিরাট হ্রদের ধারে বসিয়া এক মানসী সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন। সহস্র দল হইতে লোকমোহিনী সুন্দরী বিশ্বপিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রূপের প্রভায় দিক আলোকিত হইয়া গেল। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময় পুলকে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কোথায় রাখিবেন—কোথায় তাহার নির্দ্দেশ করিবেন তখনও স্থির করিতে পারেন নাই। বিশ্বের সর্ব্বোচ্চশিখর, মহিমময় অতলস্পর্শ সমুদ্র, নানা শিল্পসম্পদে ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ইলোরার গুহা মন্দির—কিছুই মনঃপূত হইল না। সহসা দূরে বীণার মধুর ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, বিস্ময়ানন্দে প্রকৃতি শিহরিয়া উঠিল, হ্রদের সলিলরাশি আনন্দে হিল্লোলিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "কল্যাণি! তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান এবার পাইয়াছি। যাও, ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তরে প্রবেশ কর।" চীর বসন পরিহিত জটাজূটধারী মহাকবি বাল্মীকি বীণা বাজাইয়া নিকটে আসিলেন। বিশ্বমোহিনী সুন্দরী বিশ্বনাথের ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকবির অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে অপূর্ব্ব রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিয়া নারায়ণের মানসী কন্যা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু এ আমায় কোথায় পাঠাইলেন? এখানে যে অভ্রভেদী হিমাচলের বিরাট শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছি, মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতায় নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি, সহস্র সহস্র ইলোরার গুহামন্দিরের সৌন্দর্য্যভাতি এখানে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে! এ কি মহান্, কি বিরাট, কি সুন্দর পবিত্র ও মধুর স্থান!" বিশ্বনাথের অধরে তৃপ্তির মধুর হাস্য দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওখানেই তোমার উপযুক্ত স্থান। শুভমস্তু।"

এই বিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বসমুদ্রের কূলে বসিয়া বিশ্বনাথ এক বিস্ময়কর আদর্শ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিলেন। ত্রিলোকমোহিনীর রূপের প্রভায় অনন্ত নিখিল স্তব্ধ হইয়া গেল! এমন সৌরভভরা বিরাট সৌন্দর্য্য বিশ্ব কখনও দেখে নাই। এমন রূপের দীপ্তি কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই, এমন পাগল করা প্রেমের বন্যা কাহারও নয়নে আননে কখনও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই!

নারায়ণের মানস নন্দিনীর সে বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহাসমুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, হিমালয়ের তুষার জটা বিদীর্ণ করিয়া পুণ্য প্রবাহধারা কল-নৃত্যে ছুটিয়া আসিল, প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের স্বপ্নরাজ্য ফুটিয়া উঠিল।

"প্রভু, কোথায় আমার স্থান?"

মানস-কন্যার প্রশ্নে নারায়ণের আননে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। সত্যই ত, এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে তিনি কোন্ আধারে স্থাপন করিবেন? যেখানে সেখানে তাঁহার মানস-কন্যার স্থান হইতে পারে না ত।

দূরে—দূরে—দূরে ও কি দেখা যায়?—বিশ্বদেবতার সৃষ্টির সম্মুখে সাধনার যজ্ঞভূমি বিরাট ভারতবর্ষ ফুটিয়া উঠিল। সমুদ্রের কূলে সুজলা সুফলা শ্যামা বঙ্গভূমি! আত্মবিস্মৃত জাতি সেখানে কি করিতেছে?

শ্রীচৈতন্যের মৃদঙ্গ, চণ্ডীদাসের বীণা, বঙ্কিমের তুরী, বিবেকানন্দের ভেরীর ধ্বনিতে মুগ্ধ কে ঐ পুরুষ অন্তর্য্যামীর ধ্যানে নিমগ্ন? তাঁহার আশে পাশে বিলাসের ভোগের তরঙ্গমালা উঠিতেছে, দুলিতেছে, পড়িতেছে।

নারায়ণের মানসী-কন্যা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই প্রিয়দর্শন অপূর্ব্ব সাধকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রভু, কে ইনি? আমার সমগ্র দেহ মন ইঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে কেন?" মৃদুহাস্যে বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "মা, উনিই তোমার যোগ্য আধার। ঐ হৃদয়ে বাস করিয়া তুমি ধন্য হও—বিশ্বকে পবিত্র কর। শুভমস্তু।"
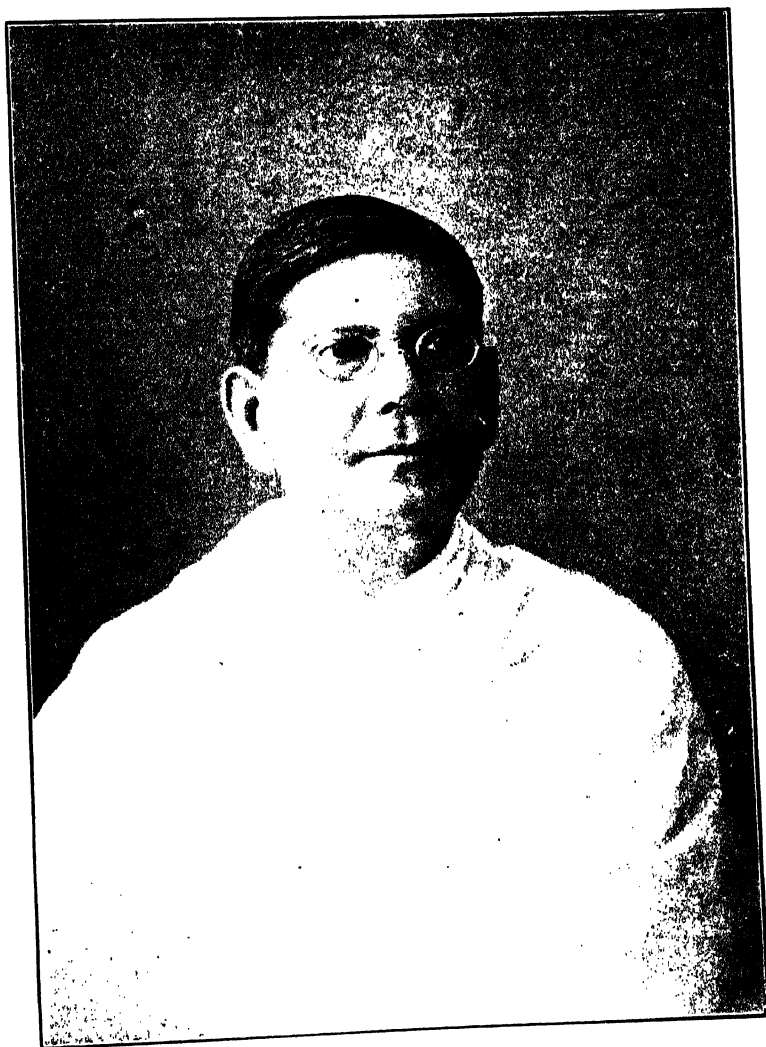
স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

জন্ম ২০শে কার্ত্তিক ১২৭৭ সাল

মৃত্যু ২রা আষাঢ় ১৩৩২ সাল

King Half-tone Press, Calcutta.

অক্সফোর্ডে পাঠদশায় চিত্তরঞ্জন

বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ জুড়িয়া ভৈরবরূপে সঙ্গীত ধ্বনি জাগিয়া উঠিল। বাঙ্গালার পুরুষশ্রেষ্ঠ চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে নরায়ণের মানসী কন্যা "ত্যাগ" আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ত্যাগ কোথায় আসে? প্রেম যেখানে নাই—আপনহারা ভালবাসা যেখানে নাই, ত্যাগ সেখানে আসিতে পারে না। যুগ যুগ ধরিয়া যে সাধক প্রেমের তপস্যা করিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ে ভগবানের মানস কন্যার আসন বিস্তৃত হয়। শ্রীরামচন্দ্র—প্রেমময় শ্রীরামচন্দ্র, তাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন সীতাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই প্রেমসাধনার ফলেই ত্যাগ ধর্ম্মকে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সমুদ্রে ত্যাগের সহস্র ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের হৃদয়েও প্রেমের সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি

অসাধারণ ত্যাগের পরিচয়ে বাঙ্গালী জাতিকে পবিত্র ও মহনীয় করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগীতি-কবিতার মধ্য দিয়া, রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতের মধ্য দিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ কাব্যের মধ্য দিয়া চিত্তরঞ্জনের ভক্তিপূত হৃদয়ে প্রেমের বংশী-ধ্বনি অসহ্য আনন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চিন্তা ও জীবন ধারায় তাই আমরা বাঙ্গালার প্রাণ-ধারায় সন্ধান পাই। বাঙ্গালার জাতীয়তা, বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে পবিত্র করিবার জন্য চিত্তরঞ্জনের আত্মোৎসর্গ—ত্যাগ—জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

সাধক চিত্তরঞ্জন, সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন, কবি ও কর্ম্মী চিত্তরঞ্জনকে নানাদিক দিয়া আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। জাতির জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে, যুগে যুগে এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে—সর্ব্বদা এমন হয় না। বাঙ্গালার ধর্ম্ম সাহিত্য চিন্তা ও কর্ম্ম-ধারার ইতিহাসে সহিত চিত্তরঞ্জনের জীবন ধারার প্রত্যেক অধ্যায়কে মিলাইয়া লইলে আমরা বুঝিতে পারিব, ভগবানের অপার অনুকম্পার ফলেই আমরা সাধক, সর্ব্ব-ত্যাগী চিত্তরঞ্জনকে পাইয়াছিলাম।

চিত্তরঞ্জনকে লোকে দাতা বলিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার দানের পরিমাণ আমরা কতটুকুই বা জানি! অনেক সময় তাঁহার আত্মীয় স্বজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব-গণও জানিতে পারিতেন না। দাতার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত, বাম হস্ত তাহার আভাস পর্য্যন্ত পাইত না। ঋণের দায়ে বাড়ী নিলামে চড়িয়াছে, বন্ধু উন্মত্তের মত চিত্তরঞ্জনের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। সমগ্র দেনার উপযুক্ত পারমাণ চেক লিখিয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন আবার সাহিত্য চর্চ্চায় মগ্ন হইলেন। নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণ বিধবার কন্যাদায়—চিত্তরঞ্জনের ব্যাঙ্ক সেজন্য উন্মুক্ত। আংশিক নহে, সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জন মোকদ্দমার আলো-চনা করিতে লাগিলেন। অর্থহীন, ভিন্নদেশীয় ব্রহ্মচারীর পাথেয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিয়া আসিতে হইবে। যাতায়াতের সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে এমন ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন ধূম-পানে, রহস্যালাপে বন্ধুদিগের সহিত কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে উত্তরকালে বাঙ্গালী কবি গাথা রচনা করিতে পারিবেন।

দানশক্তি মহৎ; কিন্তু সেই শক্তির অন্তরালে যে মহত্তর ত্যাগের আদর্শ ছিল, তাহা ভক্তি ও প্রেম হইতেই উদ্ভূত। অকৃত্রিম প্রেমিক, একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়াই চিত্তরঞ্জন এমন বিরাট ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই চিরভাস্বর সত্য নিত্য সুন্দর ও শাশ্বত মঙ্গলের মহিমায় তাহার জীবন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সমগ্র বাঙ্গালায় তাহার আলোক-প্লাবন রহিয়া গিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ—অবদান বাঙ্গালীজাতিকে শুধু মহনীয় করে নাই, বরণীয় করিয়াছে। বাঙ্গালী শ্রদ্ধানতশিরে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিয়া ধন্য হউক, পবিত্র হউক।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

৪। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধ।

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম ও দেশসেবার মূল উৎসের সন্ধান পাইতে হইলে বাঙ্গালীকে আজ শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে দেশবন্ধুর জীবন আলোচনা করিতে হইত। দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য দধীচির মত ত্যাগ, দেশবাসী জন সাধারণের জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান ও দেশহিতের জন্য জীবন দান স্পৃহা কি করিয়া এই 'ভোগ সর্ব্বস্ব' যুগে দেশবন্ধুর মধ্যে সম্ভব হইল, সেই সত্যানুসন্ধান করিতে হইলে আজ আমাদিগকে বুঝিতে

ও জানিতে হইবে, চিত্তরঞ্জন কি নূতন দৃষ্টিতে দেশমাতাকে দেখিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ বলিয়াছেন—"অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।" অরবিন্দের নিকট দেশমাতৃকা জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতা। দেশবন্ধুর নিকট দেশসেবা ছিল ভগবৎ-সেবারই নামান্তর। "I find in the conception of my country the expression of divinity"—(আমি দেশমাতৃকার মধ্যে দেবীদর্শন লাভ করি) এ কথা দেশবন্ধুর অন্তরের বাণী। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা মায়ের মধ্যে সেই জগন্মাতার রূপ দেখিয়াছিলেন, তাই যে দিন মায়ের ডাক আসিল তিনি সে ডাকের মধ্যে তাঁর জীবন-দেবতার ডাক শুনিলেন। দেশসেবা ছিল তাঁর ধর্ম্ম—লোকে যেমন পূজা অর্চ্চনা, আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেবতার নিকট নিজের অন্তরের সেবা নিবেদন করে, দেশবন্ধু তেমনি দেশসেবার মধ্য দিয়া তাঁর দেবতাকে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতেন। তাই দেশবন্ধুর অমর বাণী আজিও আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি—"With me the work for the country is not initiation of European politics. It is part of my religion. It is part and parcel of all the idealism of my life". (দেশসেবা আমার নিকট য়ুরোপীয় রাজনীতির প্রবর্ত্তন নহে, ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই অঙ্গ, দেশসেবা আমার জীবনের চির-আদর্শের অঙ্গীভূত।) দেশবন্ধু দাশের জীবন্ত ও উজ্জ্বল দেশ-প্রেম বাঙ্গালীর গৌরবের ও অনুভবের বস্তু। এই বাক্‌সর্ব্বস্ব জাতির নিকট দেশবন্ধুর দেশসেবার দৃষ্টান্ত পথ প্রদর্শন করিবে।

চিত্তরঞ্জন দেশমাতৃকাকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিতেন, দেশের জন সাধারণকে নরনারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিতেন। এই মূক নিস্তব্ধ বিরাট জনসংঘকে

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্তরঞ্জন পেন্‌সিল স্কেচ (নবযুগের সৌজন্যে)

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু ও মহাদেব দেশাই দার্জ্জিলিং কার্ট রোড ভ্রমণ করিতেছেন

for service.") দেশসেবা তাঁর এতই প্রিয় এতই আনন্দের বিষয় ছিল। দেশহিতের জন্য তাঁর ত্যাগ দেখিয়া আত্মীয় স্বজনেরা ভাবিত হইতেন—তাঁর দানবত্তার পরিণাম ভাবিয়া লোকে চিন্তিত হইত, কিন্তু তাঁহার সে দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। শ্রদ্ধেয় বিপিন বাবু বলিয়াছেন—"There was an element of almost reckless abandon in Deshabandhu Das's patriotic devotions. Chittaranjan Das spent himself in every way in the pursuit of what he conceived to be the best and the quickest way to the freedom of his people."

দেশবন্ধুর ত্যাগ ছিল অহেতুক। জাতির ত্বরিত মুক্তির জন্য যাহা করণীয় বলিয়া বুঝিতেন তাহা তিনি যে-কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও করিতেন। নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন করিলেন, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দল গঠন করিলেন—আসমুদ্র হিমাচল বাঙ্গালীর এই কার্য্যপটুতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল,—কিন্তু দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—অকালে পূর্ণ যৌবনে, বাঙ্গালা মায়ের ক্রোড় শূন্য করিয়া, দেশবন্ধু দেশকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

যাও বীর, তুমি মরিয়াও অমর। ভারতের ইতিহাসে তোমার দেশভক্তি, আত্মত্যাগ ও কীর্ত্তিগাথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় আমরা বলি, "Deshabandhu Das is dead but long live Deshabandhu." (দেশবন্ধু দাশ মরিয়াছেন—তিনি চিরজীবী হউন) একদিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কালীঘাটের মায়ের নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া যেমন বলিয়াছিলেন—"মা, আবার ব্রাহ্মণ দেহ দিও—কুড়ি বৎসর পরে আবার এ দেশে জন্মিয়া তোমার কার্য্যে আসিব—তোমার মুক্তিব্রত উদ্‌যাপনে আমার দেহ লুটাইব।" দেশবন্ধু দাশও তেমনি সর্ব্বদা বলিতেন—"আমি যদি স্বাধীনতা লাভ এ জন্মে না করিতে পারি, আবার জন্মান্তরেও এই দেশে জন্মিব।

চিরনিদ্রায় চিত্তরঞ্জন (নবযুগের সৌজন্যে)

এই দেশের মুক্তিব্রত উদ্‌যাপনের আশায় আমি জন্ম-জন্ম তপস্যা করিব।" (If I die in this work of winning freedom, I believe I shall be born in this country again and again, live for it, hope for it with all the energy of my life, with all the love of my nature till I see the fulfilment of my hope and the realisation of my ideal.) হে মুক্তিকামী সাধক, নব্য ভারতের ঋষি-কল্প নেতা, তোমার এ সাধনা কখনও বিফল হইবে না—'আসিবে সে দিন আসিবে।'

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী।

৫। শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নয়নের লোরে গলে' যায় ওরে দেশের সোণার ধূলি,
নাহি সে তাপস, ত্যাগের বিভূতি কিরীটে নিল যে তুলি'।
দেশের সেবায় নিঃস্ব—রিক্ত হইল যে রাজ-ভোগী,
নাহি সে দীনের দরদী বন্ধু, নাহি সে কর্ম্ম-যোগী।
দুনিয়ার এই গোলোক-ধাঁধাঁর বাহিরে গেছে সে চলে',
সুপ্তি-মগন সেই যশোধন জাগে না রোদন-রোলে!

নিবে গেছে সেই মণির প্রদীপ আরতি না হ'তে শেষ,
শূন্য হ'ল রে অভিষেক-ঘট, মরমে আহত দেশ!
ধ্যান-রূপে ধরি' ভুবনেশ্বরী মূরতি মোদের মা'র
সঁপিল অর্ঘ্য মানস-পূজায় চরণ-প্রান্তে তাঁর।
নাহি সে মূর্ত্ত দেশাত্মবোধ, দেব-বলে হ'য়ে বলী,
দেশ-দেশ করে' তন্ময় হ'য়ে দিল যে জীবন বলি।

চিত্তরঞ্জনের শবদেহ দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে বাহিত হইতেছে। ম্যালে জনতা।

দেশ-দেশান্তে জয়-তুরী যার বাজে অভয়ের সুরে—
প্রেম-গৌরব-বৈজয়ন্তী উড়িছে রথের চূড়ে।
ঐক্য যাহার ইষ্টমন্ত্র, সত্য যাহার পথ,
হারায়ে যাহারে শিহরিয়া ওঠে জাগ্রত ভূ-ভারত,
নাহি ওরে সেই ভক্তপ্রবর, সে অমর-দ্যুতিমান্,
অহিংসা যার দীপ্ত আয়ুধ, স্বরাজ যাহার প্রাণ।

রহিলে স্মরণে দেদীপ্যমান, উপমা তোমার নাই,
পথ ভুলে গুণী পড়েছিলে এসে এ অভিশপ্ত ঠাঁই।
কবির বাঁশরী মিটাল না তৃষা, মুক্তি-পাগল-বীর
চেয়ে স্বরাজের শুক-তারা পানে, মুছিলে আঁখির নীর।
কে বড় কে ছোট, কিছু না মানিয়া কোল দিলে সবাকারে,—
আশঙ্কা শুধু, শঙ্কিত প্রাণে আসে নি তোমার দ্বারে।

পরাজয় তোমা' করে বরণীয় হে মহা-ভাগ্যধর,
অন্তর-যামী দিয়াছেন তোমা' দুর্লভ-তম বর।
প্রতিধ্বনিয়া উদাত্ত সুর অমৃত-স্বস্ত্যয়নে
ফুলচন্দন সোণার তুলসী নিবেদিলে নারায়ণে।
দুঃখের ধারা সুখ হ'য়ে মেশে যে রসের মোহানায়,
গেলে তুমি সেই ভূমা-আহ্বানে রহস্য-ইসারায়।
কাঙালের হরি, দয়ার ঠাকুর, এ কি দয়া লীলাময়!
বারে বারে কি গো এমনি করিয়া প্রাণে দাগা দিতে হয়!
সকল রাজার রাজেন্দ্র তুমি, কর সুবিচার কর,
দাও গো করুণা চিরসুন্দর, হর গো বেদনা হর।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
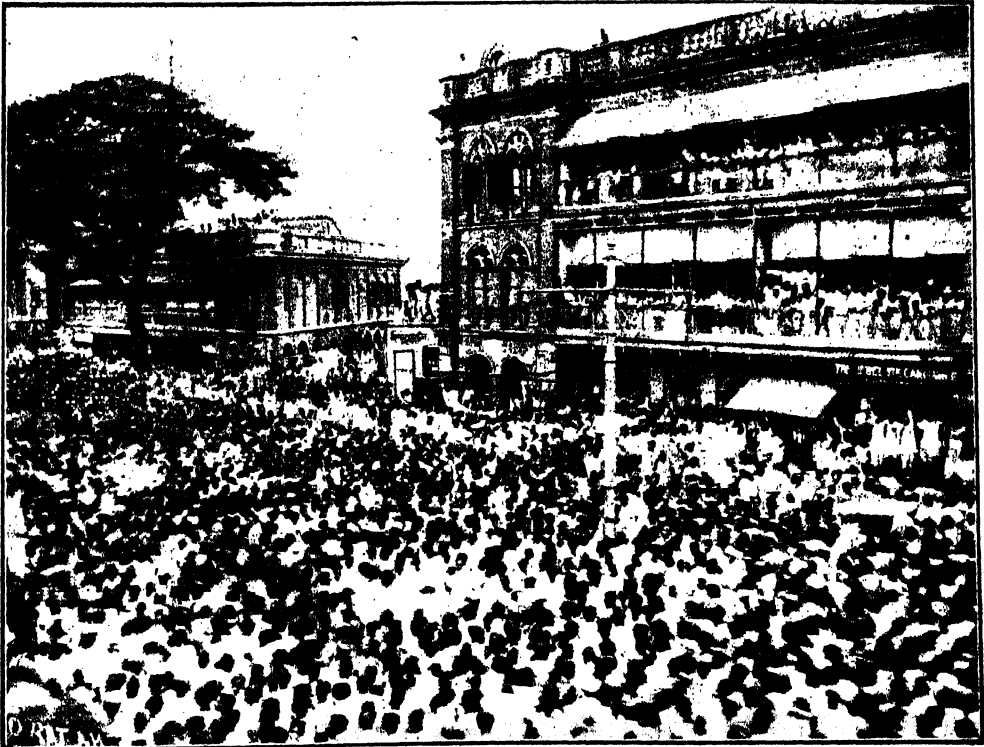
[illegible] ষ্টেশন হইতে শবাধার বাহিত হইতেছে—হ্যারিসন রোডের দৃশ্য

রসা রোড ভবনে—শবাধার পৌঁছিবার পর

৬। চিত্ত-বিয়োগে।

'নীরদ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল নীল নভস্তল হইতে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল,' এই কথা সকল দেশেই চির-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু এতকাল ইহাকে কবি-কল্পনা বলিয়াই জানিতাম, ইহা যে বাস্তব, ইহা যে সত্য, ইহা যে সংসারে ঘটিতে পারে, সে জ্ঞান অন্ততঃ আমার ছিল না। কিন্তু আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পরে টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে, সমগ্র ভারতের চিত্তহরণ, বঙ্গমাতার অঞ্চলের ধন, বঙ্গবাসীর মুকুটমণি চিত্তরঞ্জন অপরাহ্ণ পাঁচটায় হিমবৎপ্রস্থের দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে ভারত মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া, ভারতবাসীকে চির অশ্রুনীরে ভাসাইয়া তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছেন—ইহা যদি বিনা মেঘে বজ্রপাত না হয়, তবে বজ্রপাত কাহাকে বলে তাহা কে বলিয়া দিবে? তাঁহার দেহান্তের পাঁচ দিবস পূর্ব্বেও বন্ধুবর নলিনীরঞ্জনের নিকট সংবাদ পাইলাম যে, দেশবন্ধুর শরীর ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতেছে এবং মহাত্মা গান্ধীর আহূত নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে তিনি তাঁহার শৈলনিবাস হইতে আসিয়া যোগদান করিবেন। হায় রে হতভাগ্য বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, ইতিমধ্যে তোদের কপাল এমন করিয়া পুড়িয়া ভস্মশেষ হইল কেমন করিয়া?

জন্মজীবন, জরামরণ, জীবজগতের চিরন্তন নিয়ম,

জাতকের মৃত্যু, মৃতের পুনর্জ্জন্ম, ভগবদ্ বাক্য—অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ এই শিক্ষাই দিয়াছেন। কিন্তু আমরা কেহই অর্জ্জুন নহি, আমরা জন্মে আনন্দ লাভ করি, মৃত্যুতে কাঁদিয়া আকুল হই; কিন্তু সে সকল জন্ম মৃত্যু অসার প্রাকৃত জনের ;—

"জায়ন্তে চ মৃয়ন্তে চ মদ্বিধা ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥"

একথা কয়জনের জন্য বলা যায়? বর্ত্তমানে আমরা যাহারা জীবিত আছি তাহাদিগকে যদি কাহারও সম্বন্ধে একথা বলিতে হয় তবে সে আমাদের বাঙ্গালার হৃদয়রঞ্জন, বঙ্গবাসীর শিরোমণি, ভারত মাতার বর-পুত্র চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধেই বলা যায়। হায় বাঙ্গাল, হায় বাঙ্গালী, আজ যাহা হারাইয়াছ, তাহার ক্ষয় ক্ষতি ক্ষোভ দিনে দিনে বুঝিবে; আর তাহার জন্য বংশ-পরম্পরা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া নয়নাসারের সাগর সৃজন করিতে হইবে।

৺মধুসূদন কিন্নরের একটি গানের পদ আজ এই দুঃখের দিনে মনে পড়িতেছে—

"সূদন কয় যার ভাঙ্গা কপাল,
ভেঙ্গে যায় সে ধরে যে ডাল।"

দুর্দৈব-পীড়িত হতভাগ্য বাঙ্গালার সেই অবস্থা। আজ এক বৎসর পূর্ণ না হইতে বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে চারিটি রত্ন খসিয়া গিয়াছে;—আশুতোষ চৌধুরীর শবদেহ দাহ করিয়া শ্মশান হইতে ফিরিতে না ফিরিতে অকস্মাৎ অশনি-সম্পাত তুল্য মর্ম্মবিদারী সংবাদ পাটনা হইতে আসিল যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার শিরে বজ্র হানিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন! অকস্মাৎ পক্ষাঘাতে মানুষ যেমন দেহে মনে অকর্ম্মণ্য

কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে;—মহাত্মা গান্ধী বেঞ্চে উপবিষ্ট।

চিতা জ্বলিতেছে

হইয়া পড়ে, নিশীথ রাত্রির নিদ্রামগ্ন জনপদ যেমন বিশাল ভূমিকম্পে এক নিমেষে রসাতলপুরে সমাধিস্থ হইয়া যায়—ভাবিবার, দেখিবার, জানিবার পূর্ব্বে যেমন তাহাদের সমস্তই শেষ হইয়া যায়, পাটনা হইতে সমাগত আশুতোষের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র বাঙ্গালার সেই দশাই হইয়াছিল; তাহার উপর ভূপেন্দ্রনাথের দেহান্তে ভারতের শাসক, শাসিত সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে ব্যথিত করিয়া দিল।

আজ যে বজ্র আমাদের মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এ হেন বজ্র পূর্ব্বে আর কখনও পড়িয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না। স্মৃতিতে নাই, ইতিহাসে আছে কিনা সে বিষয়েও বিষম সন্দেহ। ধূলার ধরণীতে মানুষ জন্মে, মানুষ মরে ইহা বিচিত্র নহে—পৃথিবীর নিত্য ঘটনা। কিন্তু দৈবাৎ যদি কোন দেবোপম ব্যক্তি আসিয়া এই মৃত্তিকার ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে এবং মাংস পিণ্ডাকৃতি নরনামধারী দেশবাসীকে মানুষ করিয়া, দেবতা করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে এবং সে প্রয়াস তাহার সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, সেই লোকোত্তর মহাজন যদি অসময়ে অকস্মাৎ অসমাপ্ত কর্ম্মরাশি পশ্চাতে ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গলোকে চলিয়া যায়, সে দুঃখ রাখিবার স্থান কি কোথাও আছে?

চিত্তরঞ্জন বঙ্গবাসী—ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যে কি একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, আজ তাহার চিরবিয়োগ-ব্যথায় ত্রিংশৎ কোটি নরনারীর অন্তর কি নিদারুণ বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা লিখিয়া বুঝাইবার মত ভাষা অন্য কাহারও আছে কিনা তাহা আমি জানিনা,

আমার নাই একথা একান্তই সত্য কথা। দেশহিত-ব্রতে ব্রতী হয়ত ইহার পূর্ব্বে কেহ ছিলেন, এখনও অনেক হয়ত আছেন এবং ইহার পরে আরও হইবেন, কিন্তু ভারতের কোটি কোটি নরনারী আজ ভাবিতেছে, ভারত মাতার ক্রোড়ে এমন সন্তান আর কি আসিবে? এমন করিয়া সকল মন প্রাণ দিয়া 'মা' বলিয়া আর কি কেহ মাকে ডাকিবে? মায়ের রাতুল চরণে এমন করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ—কলিযুগে এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, দেশহিতের পূত হোমাগ্নিশিখায় এমন করিয়া আত্মাহুতি প্রদান আর কি কেহ করিবে বা করিতে পারিবে? চিত্তের মত শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতে অনেক ছিল, আছে এবং হইবে; ব্যবহারাজীব রূপে তাহার যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাদৃশ জন হয়ত ছিল বা আছে কিংবা অতঃপর হইবে; রাজনীতি ক্ষেত্রের বীরত্ব দেখিয়া তাহাকে দেশবাসী ভালবাসিয়াছে ইহাও আমার মনে হয় না, সে ক্ষেত্রে তাহার ন্যায় নির্ভীক বীর হয়ত বা কখনও জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহার কোন্ বীরত্ব দেখিয়া কেবল মাত্র ভারতবাসী নহে, জগৎবাসী স্তম্ভিত হইয়াছিল? যে শিশু তাহার শৈশবে সম্পদের মধ্যে লালিত, যৌবনের প্রারম্ভে যাহাকে সেই সম্পদশিখর হইতে অস্বচ্ছলতার অতল গহ্বরে পতিত হইয়া দিনপাত করিতে হইয়াছে, দৈনন্দিন উপার্জ্জন দ্বারা যাহাকে বৃদ্ধ পিতামাতা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতাভগিনী গণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, সে যখন স্বীয় পুরুষ-

১লা জুলাই—শ্রাদ্ধ সভা

১লা জুলাই—ময়দানে সভা।
মহাত্মা গান্ধী সভাপতি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বক্তৃতা করিতেছেন।

কারের বলে রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে বিলাস নিমগ্ন, সেদিনে নিমেষার্দ্ধে সেই ঐশ্বর্য্য সম্ভোগকে নিষ্ঠীবনের ন্যায়, জীর্ণ বাসের ন্যায়, কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় যে মহাপুরুষ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার সে বীরত্বের নিকট রাজনীতি ক্ষেত্রের নির্ভীকতা, সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ। আমার মনে হয় চিত্তরঞ্জনের চিত্তজয়, তাহার ভোগ বাসনা পরিত্যাগ, ঐশ্বর্য্যকে লোষ্ট্রজ্ঞান, দেশমাতৃকার চরণে একান্তভাবে আত্ম সমর্পন, দেশবাসীর কল্যাণার্থ সর্ব্বাত্মার কামনা ও কর্ম্মানুষ্ঠান, এই সকল অনন্য-সাধারণ দেবোপম গুণরাশির জন্য দেশবাসী ও জগদ্বাসী তাহাকে এমন করিয়া ভালবাসিয়াছিল। সে ভালবাসা যে কি, তাহা সেইদিন জগৎ দেখিয়াছে, যে দিন তাহার পবিত্র দেহ জাহ্নবী তটে সৎকারার্থ শৈলশিখর হইতে কলিকাতায় সমানীত হয়। আজ জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ মানব, সত্য, অহিংসা ও জীবকল্যাণের যিনি মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই অতিমানব মহাত্মা দেশবন্ধুর শববাহী, আর রেল ষ্টেশন হইতে দক্ষিণে ও বামে অগ্রে পশ্চাতে ও উর্দ্ধে যে দিকে চক্ষু গেল, কেবল দেখা গেল, লক্ষ লক্ষ ভারত-বাসী পদদলিত হইয়া মৃত্যু আশঙ্কাকে তুচ্ছ করিয়া দেশবন্ধু, দশের বন্ধু, ভারতবন্ধু, জগদ্বন্ধু চিত্তরঞ্জনের পার্থিব দেহাবশেষ একবার যদি দেখিতে পায় সেইজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যে সকল রাজপথ দিয়া সেই পবিত্র দেহ সাশ্রুনেত্র শ্মশান-বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তটে নীত হইতেছিল, সেই সকল পথিপার্শ্বস্থ সৌধশিখরে, বৃক্ষোপরে, তাড়িদ্-বার্ত্তাবহ তারের দণ্ড-শীর্ষে কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না—সৌধশিরে নারীবর্গ গলদশ্রুনেত্রে দণ্ডায়-মানা এবং অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু

পর্য্যন্ত পুরুষবর্গ কে কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করে কাহার সাধ্য! শিবাদহ হইতে শবদেহ লইয়া যখন সকলে সুরতরঙ্গিণী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতটস্থ শ্মশান ভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিল, তখন কত লক্ষ লোক যে পুরোভাগে ও পশ্চাতে সাশ্রুনেত্রে চলিয়াছিল তাহা কে গণনা করিবে? চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশে যে এই শেষ প্রণতি, এই শেষ ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান, দেশবাসীর এই ঐকান্তিক প্রীতি যে দেখিয়াছে সেই বুঝিয়াছে যে, কি সুবর্ণসূত্রে তাহার উদার হৃদয়ের সহিত ভারতবাসী জনের হৃদয় কেমন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। যে দেশ বিদেশের সকলকে এমন করিয়া প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়াছিল, যাহার বিয়োগে আজ সমগ্র দেশ সব হারাইয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া আকুল, যে না হইলে আজ দেশের ও দশের কিছুই হইবার উপায় নাই, সে যায় নাই, সে আছে, সে থাকিবে; বাঙ্গালার জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে, বাঙ্গলার ফলে ফুলে ও বায়ুমণ্ডলে, বঙ্গবাসী প্রত্যেক নরনারী বালক বালিকার হৃদয়াসনে সে চিরবিরাজিত হইয়া আছে, সকলের সকল কর্ম্ম সে তাহার জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধলোক হইতে নিয়মিত করিতেছে ও চিরদিন করিবে।

আমার সহিত চিত্তরঞ্জনের আজ ত্রিশ বৎসরের পরিচয়। সে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার

সপরিবার চিত্তরঞ্জন

দণ্ডায়মান—দেশবন্ধু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর রায়।

সোফায়—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, পুত্র চিররঞ্জনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া; অপর পার্শ্বে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর মাতা।

ভূমিতে উপবিষ্টা, জননী-পদপ্রান্তে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী, মাতামহী পদপ্রান্তে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই সময় হইতে আমি তাহার সহিত পরিচিত। সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইতে হইতে আমরা দুই সহোদরের মত হইয়াছিলাম; তাহার মাতাকে মা বলিতাম, তাহার ভগিনীগণ সকলে আমার ভগিনী। আমাদের দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধ পাতান একটা প্রথা আছে তাহা সকলেই জানেন; চিত্তরঞ্জনের মাতা আমার স্ত্রীকে ধর্ম্মকন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল মুখের গ্রহণ নহে, সে কালের প্রাচীনা ভারতনারী ধর্ম্মের নামে যাহা করেন তাহাকে জীবন মরণের সম্বন্ধ বলিয়া মনে করেন। তিনি আমার স্ত্রীকে কন্যা মনে করিতেন, আমার স্ত্রীও তাঁহাকে মাতার ন্যায় নহে—মাতাই মনে করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে সে সম্বন্ধ তেমনই ছিল। চিত্ত আমার স্ত্রীকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায়ই দেখিত, ভ্রাতাভগিনীগণ সেই সম্বন্ধ আজও রাখিয়াছেন, আমার এবং আমার স্ত্রীর জীবমানে সে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যাইবার নহে, যাইবে না।

ত্রিংশৎবর্ষ ব্যাপী এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আমরা চিত্তকে দেখিবার জানিবার, বুঝিবার যে সুযোগ পাইয়াছি, সে সুযোগ হয়ত অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই। দাশপরিবার বহুকাল হইতে বঙ্গে সুপরিচিত; কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন সেকালের শিক্ষিত বঙ্গসমাজের শ্রেষ্ঠ জনগণের মধ্যে অগ্রণী—ধনে জনে বিদ্যায় সে দিনে তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি সমাজে অতি অল্পই ছিল। চঞ্চলা কমলা যখন তাঁহাদের গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিতা, সেই দিনে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। যে দিনে চিত্ত বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগত, সেদিনে তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা পদ্মালয়া ভুবনমোহনের গৃহ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, বহুপরিবার প্রতিপালনের গুরু-ভার চিত্তরঞ্জনের স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। সেদিনে তাহার অম্লান বদনের অক্লান্ত শ্রম আমি দেখিয়াছি। আবার বৃদ্ধ পিতার ঋণ শোধের জন্য অকাতরে শ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয় করিতেও দেখিয়াছি—যে ঋণ শোধ না করিলে আইন তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না, সম্ভবতঃ লোকতঃও বিশেষ গ্লানি না হইবার কথা—এ সেই ঋণ, সে দিনের কষ্টে পরিশোধিত—এ দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কিনা তাহা আমি জানিনা। পিতাকে ঋণমুক্ত করিবার পর তাহার যে আনন্দজ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ হাস্যময় মুখশ্রী আমি দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না—তাহার মুখে যেন স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল যে, পিতৃস্নেহের কথঞ্চিৎ প্রতিদান যে দিতে পারিয়াছে, সে জন্য যেন সে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছে। আজ "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ" এ শিক্ষা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এদিনে চিত্তরঞ্জনের এই অতুলনীয় কার্য্যের স্মৃতি প্রতি পুত্রের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক, হইবে কিনা তাহা তিনিই জানেন যিনি সর্ব্বমানব হৃদয়ে বসিয়া তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম নিয়মিত করিতেছেন। সেই চিত্তরঞ্জনকে আবার লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া বিলাসের সুকোমল শয্যার আনন্দে দিনযাপন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সে আনন্দ নিজের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিয়া নহে, অপরের দৈন্য দারিদ্র্য ঘুচাইয়া, ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দিয়া, নগ্নের দেহ বস্ত্রসমাবৃত করিয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কিংবা বিধবা মাতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়া, সর্ব্বপ্রকার অর্থীকে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিতে দেখিয়াছি।

আবার একদিন আসিল যেদিন বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব, মহাত্মা গান্ধীজীর সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া নাগপুরে চিত্তরঞ্জন যাত্রা করিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায় নহে, রুদ্ধদ্বার গৃহে দুইজন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কি সমর করিলেন কে জানে! যখন সে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ভারতবাসী দেখিল যে, গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের বীরশ্রী আর নাই, সে মুখে বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস যেন শ্যামিকাহীন স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাজৈশ্বর্য্যের রজোগুণ প্রভাব, ভোগবাসনার তম, ক্ষুরধারধী ব্যবহারাজীবের অহমিকা, নিমেষার্দ্ধে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সে আননে কেবল দেশমাতৃকার প্রতি অকপট ভক্তি এবং দেশবাসী ত্রিংশৎ কোটি ভ্রাতার অন্ন বস্ত্রের

দুঃখ মোচনের আকুল আগ্রহ। সেই দিন হইতে চিত্তরঞ্জনের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অর্জ্জনের স্পৃহা কোথায় সূর্য্যকর-তপ্ত কুহেলিকার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল, আমরা দেখিলাম খদ্দর পরিহিত সন্ন্যাসী এবং জগতের কল্যাণ-ব্রত যোগিশ্রেষ্ঠ "দেশবন্ধু"।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত একমত সকলে না হইতে পারেন; এবং হয়ত তাঁহার মতের সহিত অনৈক্য কেবল অন্যদেশবাসী নহে, স্বদেশীর মধ্যেও অনেকে ছিলেন এবং আছেন; আমি রাজনীতি ক্ষেত্রে অধিক কাল আমার ক্ষুদ্রশক্তি এবং অল্পধী লইয়া কর্ম্ম করিবার প্রয়াস করিতে সাহসী হই নাই, সুতরাং সে বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলিবার অধিকার নাই; তাঁহার অভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কি অভাব ঘটিয়াছে সে কথা বলিবার বহুলোক আজ আছেন এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সে কথা লিখিত হইবার পরে পুরুষ পরম্পরা তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইবার ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার লোকের অভাব জগতে হইবে না।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার চিত্তরঞ্জনকে আমি যেমন দেখিয়াছিলাম, সেইটুকু লিখিবারই আমি অধিকারী। আমি এই বিশাল ভারত ভূমির সর্ব্বত্র হইতে যে সকল শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এবং শ্রীমতী বাসন্তী দেবী বধূঠাকুরাণীর ও শ্রীমান্ চিররঞ্জনের নিকট প্রেরিত তাড়িৎবার্ত্তা এবং পত্রাদি হইতে শুনিতে ও জানিতে পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় যে সমগ্র ভারতভূমি রাজাধিরাজ হারাইয়া অরাজক অবস্থায় আকুল অশ্রুনীরে তাহাদের বক্ষ ভাসাইতেছে এবং এ অশ্রু কবে কে আসিয়া মুছাইবে তাহা শ্রীভগবান্ জানেন—এ চক্ষুর জল নিবারণ করিতে হইলে আবার সেই ভারতের হৃদয়রঞ্জন চিত্তরঞ্জনকেই আসিতে হইবে—"নান্যঃ-পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

কেবলমাত্র অপরের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়াই নহে, ভগবৎ প্রেমেও তাঁহার যে অশ্রু আমি তাঁহার বক্ষ ভাসাইতে দেখিয়াছি তাহা পর্ব্বতশীর্ষ-পতিত প্রকাণ্ড জল-প্রপাতের সহিতই তুলনীয়। হরিনাম গানে, মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণে, তাঁহাকে আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উন্মত্ত নর্ত্তন-প্রয়াসী হইতে দেখিয়াছি, কষ্টে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়াছেন।

তাঁহার ভগবদ্ভক্তি কিদৃশী ছিল তাহা আমার ন্যায় "কালাপাহাড়ের" বোধের অগম্য। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শুনিয়াছি যে এক অজ্ঞাত কুলশীল গৈরিকধারী সাধু আসিয়া তাহার স্বহস্তাবচিত সদ্য কুসুমরাশি চিত্তের দেহের উপরে অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া প্রদান করিল এবং প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাঁহার পবিত্র শবদেহের পার্শ্বে মন্ত্র জপ করিয়া দেহের প্রহরী স্বরূপ একাসনে বসিয়া রহিল; একথা বধূঠাকুরাণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নিকট আমার স্ত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি। হিমবৎ-শিখরে, অজ্ঞাত সাধু আসিয়া সমস্ত রাত্রি যাঁহার পবিত্র শবদেহের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাঁহার পূজা করে, তিনি অন্তরে অন্তরে ভগবৎ প্রেমে কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার কথা, বলিবার কথা নহে!

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবণি বহিয়া যায়" একদিন এই মহাজন পদ, চিত্তের গৃহে গীত হইতে-ছিল। আমন্ত্রিত বহুজন-সমাকীর্ণ সে গৃহ, সে গৃহে ব্যারিষ্টার উকিল এবং মনে হয় যেন হাইকোর্টের জজগণ মধ্যেও কেহ কেহ ছিলেন, কলিকাতা সমাজের শিক্ষিতা নারী-সঙ্ঘের মধ্যে সসম্ভ্রমে নামকরণযোগ্যা যাঁহারা, তাঁহাদের কেহই হয়ত বা বাকি ছিলেন না। এই সকল সমাজের সম্মানার্হ গণের মধ্যে চিত্তরঞ্জনকে অবিরল নয়নাশ্রু-ধারে বক্ষ ভাসাইতে আমি দেখিয়াছি এবং সে অশ্রু লোকচক্ষুর জন্য নহে, ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল পাগলের হৃদয়-শোণিত-ধারা ভগবানের চরণ বিধৌত করিবার জন্য অবারিত ভাবে বিসর্জ্জিত।

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী যাহা হারাইয়াছেন সে ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। তবে তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা যে তাঁহার এই বুকভাঙ্গা দুঃখ ভারতের সকল নর-নারী ভাগ করিয়া লইয়াছে। তিনি স্বামী, পতি, দয়িত, বল্লভ

হারাইয়াছেন, কিন্তু ভারতবাসী তাহাদের হৃদয় রাজ্যের একাধীশ্বর রাজাধিরাজ হারাইয়াছে এবং তাহাকে হারাইয়া তাহারা আজ কি কাঙ্গাল, কি রিক্ত, কি সর্ব্বস্বহারা নিঃস্ব হইয়াছে তাহা বলিবার কোন উপায়ই নাই।

হে আমার দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু, হে আমার সোদরাধিক সখা, হে প্রিয়তম—যাও, যেখানে তোমার ইষ্ট তোমারে ডাকিয়াছে সেখানে যাও, সেই জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধলোকে যাও। কিন্তু সেখান হইতে এই কাঙ্গাল তোমার দেশ ও দেশবাসীর দিকে কৃপা-নেত্রে চাহিও, এবং যদি আবার এই দুর্ভাগা দেশের ভাগ্য ফিরাইবার জন্য তোমাকে আসিতে হয়, তবে দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জন হইয়া যেমন আসিয়াছিলে তেমনি করিয়াই আসিও।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

৭। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে

তিমির-সঘন বঙ্গ-গগন আছিল যখন আঁধার মগন
অপসারি সেই তমসা ভীষণ আনিয়া নবীন অরুণ ঊষা,
না ডাকিতে পাখী, না উঠিতে রবি, না ফুটতে এই ধরণীর
ছবি,
না মাখিতে বায়ু প্রভাত-সুরভি, না পরিতে মহী আলোক
ভূষা,
কোথা যাও? করি যজ্ঞারম্ভ, পূর্ণাহুতিতে আছে বিলম্ব,
যজ্ঞনাশীরা করিছে দম্ভ এ হোম-বহ্নি ঘিরিয়া, হের'—
ওহে ঋত্বিক, এস এস ফিরে, লয়ে করে সুধা সঞ্জীবনীরে
রক্ষিতে দেশ, বাঁচাতে জাতিরে ডাকিছে তোমায়, ফের'
গো, ফের'।
তব "মালঞ্চ" শুকাইয়া যায়, সব "সঙ্গীত" লুকাইয়া, হায়,
সব আশা সাথ কাঁদে নিরাশায়, ফুকারিয়া উঠে
গভীর দুখ;
শত আশা দিয়ে হাসায় যে জন সে কি পারে কভু কাঁদাতে
এমন?
মিথ্যা কথা, সে করেছে গমন স্বর্গ মথিয়া আনিতে সুখ।
থাকিতে থাকিতে হিমগিরি-বাসে গিয়েছে সে আজি
শিব-কৈলাসে
পাশুপত খানি আনিবার আশে—সে যে এ জাতির
সব্যসাচী!
কর জয়ধ্বনি জয় জয় জয়—মহামানবের মৃত্যু এ নয়,
অই তাঁর বাণী ভরা বরাভয় কোটি কোটি প্রাণে
ফিরিছে নাচি।

সরস্বতীর স্নেহে ও সোহাগে অন্তর ছিল রাঙা সুরে রাগে
কমলা ও ধরি ঝাঁপি তাঁর আগে রচিয়াছিল যে মহোৎসব,
দিয়াছিলে তুমি পূর্ণতা তায়—বহুদিন-গত বিস্মৃত প্রায়
পিতৃ-ঋণের দেউলিয়া দায় শোধিয়া কড়া ক্রান্তি সব।
কৌঁসুলি মাঝে অগ্রগণ্য, বাগ্মিতায় যে দেশ-বরেণ্য,
অর্জ্জন তব দানের জন্য, বিখ্যাত তব বান্ধবতা—
কুবেরের কোষ করি আহরণ ইন্দ্রের মত আছিলে যখন
সহসা তোমার ব্যথিল শ্রবণ—"গুরুজী"র ডাক—
জাতির ব্যথা!
অমনি হইলে ঘর হ'তে বা'র, স্বয়ংগৃহীত দরিদ্রতার
কৌপীন পরি, সহপরিবার রাজপাট ত্যজি
ফকিরী নিয়া—
শত শত জনে কারা হ'তে আনি, বরিলে কারায়
আপনি, হে মানী,
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বাণী বঙ্গের মুক কণ্ঠে দিয়া!
গান্ধীর সেই মোহন মন্ত্রে অসহযোগের গহন পন্থে
পশিলে যেদিন বিপুলানন্দে খদ্দর গাথা প্রচার তরে—
সেদিন বঙ্গে নরনারী মনে জ্বলিল আগুন ভবনে ভবনে
বিস্ময়ে লোক ধ্বনিল সঘনে—"দেশবন্ধু ও," আবেগভরে!
জাতির "চিত্ত", দেশ-"রঞ্জন"—"দাস" সে যে নর-সেবার
কারণ,
সার্থক নামা সে দীনতারণ এ মর জগতে নাহিরে আজ!
এ মরণ নহে তাঁর একেলার, মৃত্যু যে এই সারা বাঙ্গালার
বাঙ্গালীজাতির আশা ভরসার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল বাজ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৮। পথের ডাক

সার্থক করি' সাধনা তোমার,
সরোজাসীনা
বাণী দিয়াছিল করে তুলি তব
সাধের বীণা।
বিজয় মাল্য গাঁথিয়া স্বর্ণ-
কমলদলে
আপনি লক্ষ্মী দিয়াছিল আনি
পরায়ে গলে।
সংসার পথ সম্মুখে ছিল
কুসুমে ঢাকা,
শ্যামলা ধরণী চির বসন্ত
মাধুরী মাখা।

দুখিনী জননী ছিল চেয়ে তব
মুখের পানে
সহসা একদা আহ্বান তাঁর
পশিল কাণে।
সুখনীড় ছাড়ি আসিলে অমনি
পথের মাঝে
দেহ প্রাণ মন সঁপিলে সকলি
মায়ের কাযে।
বিভব-বিলাস ত্যজিয়া জীর্ণ
বসন সম,
চির-দারিদ্র্য করিলে বরণ,
নরোত্তম!

ত্যাগে ও কর্ম্মে আদর্শ নব
দেখালে তুমি।
গৌরবে তব ধন্যা জননী
জন্মভূমি।
দেবতা আত্মা হিমালয়ে আজি
কাহার বাঁশী
শুনিয়া, আবার যাত্রার পথে
দাঁড়ালে আসি!
খ্যাতি প্রীতি সেবা সম্মান ছিল
ঘিরিয়া যত
ফেলে গেলে চলি নিমেষে, পথের
ধূলির মত।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

৯। দেশবন্ধুর বৈশিষ্ট্য

আজ যে মহাপুরুষের, যে সাধকবরের, যে বীরাগ্রগণ্য অমিততেজ আত্মনির্ভরশীল কর্ম্মী মহামানবের অন্তর্ধানে আসমুদ্র হিমাচল বিচলিত, শোকভারে প্রপীড়িত, তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই ত্যাগবীর দধীচির, এই মুক্তহস্ত দানশীল হরিশ্চন্দ্রের, এই স্বাধীনতার পূজারী স্বদেশ-প্রেমিক বাঙ্গলার রাণাপ্রতাপের প্রাণের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার কবিজন-সুলভ অসাধারণ অনুভূতিতে ও একনিষ্ঠ প্রেমে। তিনি ছিলেন প্রকৃত কবি। মাতৃ-ভাষায় এ কবির দান মুষ্টিভিক্ষা হইলেও, সে মুষ্টি স্বর্ণমুষ্টি। তাঁহার জীবন ছিল কবিত্বময়। তিনি পরের প্রাণের পরতে পরতে সহানুভূতির সাহায্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন, তাই বাঙ্গালীর দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া, ভারত-বাসীর কষ্ট দেখিয়া বিগলিত-হৃদয় চিত্তরঞ্জন দেশের কার্য্যে মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাই দরিদ্র-নারায়ণের, অভাবগ্রস্ত মানবের সেবার জন্য আপনার সকল স্বার্থে বলি দিয়া ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকা-নন্দের মত বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে উন্নত করিতে না পারিলে দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, তাই আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে

পাইয়াছিলাম, "যাহারা কৃষিকার্য্য করে, তাহারাই এ দেশের প্রকৃত লোক, জাতি বলিতে তাহাদিগকেই বুঝায়।" দেশের কৃষক-সম্প্রদায় উন্নত অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতে না পারিলে স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠার কামনা করা বাতুলতামাত্র এ কথাও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি চাহিতেন, 'সমষ্টির কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা।' আপনার কল্যাণ তাই স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন।

বর্জ্জন-নীতি তাঁহার অনুমোদিত ছিল না; গ্রহণ-নীতিরই তিনি অগ্রদূত ছিলেন। প্রেমের মোহন ফাঁসে তিনি সকলকে আবদ্ধ করিতে চাহিতেন। হিংসা তাঁহার নিকট আসিতে পারিত না। কে কাহার হিংসা করিবে? তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন সর্ব্বজীবে ভগবানের সত্তা। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ ছিল তাঁহার জীবনের ধারণা—সত্য অনুভূতি। প্রেমের টানে তিনি অহিংসাবাদী। প্রেমের বলে তিনি একদিন যে ভারত-বাসীকে একতার হেমহারে বাঁধিতে পারিবেন, এ আশা তাঁহার ছিল। ফরিদপুরে তিনি সমগ্র ভারতবাসীর সাহায্য চাহিয়াছিলেন। স্বরাজ-যজ্ঞের হোতার মুখের সে বাণী, আজিও আমাদের কর্ণকুহরে—আকাশে বাতাসে—ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই প্রেমের সামান্য একটু পরিচয় আজি দিব।

প্রথম জীবনে আত্ম-প্রীতি তাঁহার খুবই ছিল। আপনার বিদ্যাবুদ্ধির উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাই প্রথম জীবনে তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী রূপে দেখিতে পাই। জ্ঞানের পরিধির ভিতর যাঁহাকে ধরিতে পারিতেন না, তাঁহার সত্তায় তাঁহার আস্থা ছিল না। যৌবনে 'মালঞ্চে'র কবিরূপে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কম্পিত বক্ষে প্রবেশ করেন। যে অর্ঘ্য লইয়া ভাষা-জননীর দ্বারে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, সে অর্ঘ্য নির্ম্মল, পবিত্র, প্রাণের অনুরাগ-চন্দনে চর্চ্চিত। তখন তিনি তাঁহার প্রাণের কামনা, দয়িতার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা, এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

'কোথা তুমি? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন কানন!'

তখন তাঁহার প্রেম—

'আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা,
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা!'

তখন তাঁহার প্রেমের ভিতর লালসা ছিল,—

'গুঞ্জরে লালসা মোর, লুব্ধ অলি যেন!—

অন্যত্র—

'আমার এ প্রেম সুধু, রক্তের লালসা।'

যৌবনের চিরসত্য প্রেম—ভালবাসাকে দূর করিয়া যৌবনে তিনি যোগী সাজেন নাই। পরিপূর্ণভাবে প্রেমের পূজা তিনি করিয়াছিলেন। দুঃখদৈন্যপূর্ণ বাঙ্গালীর জীবন-মরুতে যৌবনে প্রেমের কুসুম বড় ফুটিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। হৃদয়কে আমরা সে সময় ভোগ করিতে পারি না। পারি না বলিয়া ত্যাগের মহিমাও বুঝিতে পারি না। তখনই ত্যাগের মহিমা বুঝা যায়, যখন সে জিনিষকে আমরা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়া ছাড়িতে পারি। বুদ্ধদেবের ত্যাগ জগতে আদর্শ কেন? তিনি জীবনকে ভোগ করিয়াছিলেন—ভোগ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তারপর যখন সব ত্যাগ করিলেন তখন ত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জনেও ঠিক ভোগের পর ত্যাগ আসিয়াছিল।

'মালা"তে যৌবনের পরিপূর্ণ প্রেমের চিত্রও বেশ সুস্পষ্ট।

'হে মোর প্রভাত পুষ্প, হে অপরিচিতা!
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন অঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা।
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্তরঙ্গিণী!
হে আমার যৌবনের স্বপন সঙ্গিনী!
হে আমার আপনার! হে আমার পর!
হে আমার বাহিরের, হে মোর অন্তর!'

এই স্বার্থপর প্রেম আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার-বর্গকে তাহার অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিল। তারপর তিনি

যখন বুঝিতে পারিলেন আমি কে? আমি ত 'যন্ত্র'—'যন্ত্রী' তিনি; যে সুর তিনি হৃদয়ে থাকিয়া বাজান, সেই সুরই ত বাজিয়া উঠে। তখন তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, বাজাও হৃদয়নাথ এমন করুণ সুরে, যে সুর শুনিয়া সমগ্র বিশ্ববাসী মুগ্ধ হইবে। হৃদয়ের ভিতর হইতে মধুর সুরে বাহির হইল 'সাগর সঙ্গীত।' সিন্ধুতটে দাঁড়াইয়া ভাব-বিহ্বল কবি গাহিলেন :—

'হে আমার আশাতীত, হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক, তোমা ছন্দে গেঁথে লই!
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাথিব,
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!'

বাস্তবিকই কবি বাঁধিয়াছেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

'আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরাণ!
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁজের আঁধারে!'

তিনি বুঝিয়াছিলেন,—

'সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল!
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে, ওগো সিন্ধু! দিবস যামিনী।

এই 'সাগর সঙ্গীতে'র ভিতর প্রথম তিনি অনন্তের প্রেমের মোহন মন্ত্রের সন্ধান পাইলেন। কবির ভাষায় বলি,—

'বাহিরের গীত রবে, বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে—
দিও মোরে ল'য়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে।'

তাই কবি সেই গীত গাহিবার জন্য সিন্ধুকে একবার অনুরোধ করিতেছেন—

'হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটী গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালি দিও অন্তহীন অমৃতের ধার,
চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজ্জ্বল করি অন্তর আমার!'

সেই মধুর গীত—

'সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী'—সিন্ধুর প্রাণ-বিমোহন সে গান তিনি প্রথমে শুনিতে পান নাই। তারপর কাতর কণ্ঠে যুক্তকরে তিনি গাহিলেন,—

'দীক্ষা দাও ওগো গুরু! মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে!'

তখন তিনি সাগরের সেই প্রাণের সঙ্গীত—ভিতরের কথা শুনিতে পাইলেন। আভাসে নয়—ইঙ্গিতে নয়—স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, আর আনন্দে নৃত্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

'হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব।
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধন ভজনে তব।'

তখন কবি অনুভব করিলেন, জগতের সর্ব্বত্র 'মধুর কীর্ত্তনের রোল' উঠিতেছে, জলদজাল গম্ভীর বোল যোজন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে করতাল বাজিতেছে, তৎসঙ্গে তাঁহার হৃদয়েও যেন অশ্রুতপূর্ব্ব গভীর মৃদঙ্গ ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সেই অবস্থার ভিতর কবি গাহিলেন—

'মুক্ত বায় প্রভাতের আনন্দ কীর্ত্তন ভারে,
নাচিছে পাগল হ'য়ে অন্তরের চারিধারে।
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছে ঢেকেছে মরি! কি মধু বিরহ দিয়া।'

সে সঙ্গীতের মাধুর্য্য তিনি আপনি উপভোগ করিলেন, কিন্তু প্রেমিক তিনি সকলকে তাহা না শুনাইয়া থাকিতে পারিলেন না। 'অন্তর্যামীতে' সে প্রাণের কথা সেই চিরন্তন সত্য সকলকে শুনাইলেন। মানবকে ভালবাসেন, তাই সে সত্যের সন্ধান সকলকে দিলেন। প্রেম কেমন করিয়া ক্ষুদ্র পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া

সার্ব্বজনীন প্রেমে উপনীত হইল একবার অনুধাবন করুন। সেই অন্তর্যামীর সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাই সকলের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত।

'সাগর সঙ্গীতে' তিনি যাঁহার আভাস পাইয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর দেখা পাইতে লাগিলেন, আবার মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পাইলেন না। আশা ও নিরাশায় তাঁহার হৃদয় দুলিতে লাগিল, তাই কবি আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিলেন,—

'হে মোর বিজন-বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী!
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি।
আজ কি বঞ্চিত হ'ব, ফেলে যাবে একেবারে
এ মহা বিজন রাত্রে এই ঘোর অন্ধকারে?
হা হা! হা হা! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব।
কোথা তুমি কোথা তুমি, এ যে অন্ধকার সব!
যেখানেই থাক নাথ! আছ তুমি আছ তুমি!
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি।
ভাবনা ছাড়িনু তবে; এই দাঁড়াইনু আমি!
যে পথে লইতে চাও, ল'য়ে যাও অন্তর্যামী!'

কবি তখন অনন্যশরণ হইয়া আপনার যাহা কিছু ছিল—ভাবনা চিন্তা সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া তাহাতেই একান্ত নির্ভরশীল হইলেন। তখন তিনি ধনজন মান সম্ভ্রম কিছুরই কাঙ্গাল নন। তিনি চান তাঁহাকে,—

'যে পথেই ল'য়ে যাও যে পথেই যাই;
মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই!
—বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই!
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই!'

পাগলের মত তিনি ছুটিতে লাগিলেন,—

'আমি মত্ত দিশা হারা,
দীন কাঙ্গালের পারা!—
একটি আশার আশে পথের পাগল!'

দীনাতিদীন ভাবে তিনি প্রাণের আবেগে প্রার্থনা করিলেন,—

'বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগলেরে আর তুমি, ক'র না পাগল!
কাঁটার জ্বালায় জ্বলে মরি, বঁধুহে আবার!
জ্বালার উপর জ্বালা! আজি প্রাণ অন্ধকার!
জীবনের যত সুখ শেষ হয়ে গেছে,
যত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে শুকিয়েছে,—'

তারপর তিনি আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন।

'এস মন-বনবাসে। এস বনমালী—'

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার আসন টলিল, তিনি আসিলেন—স্বয়ং দেখা দিলেন—কবি গায়িলেন—

'এস আমার প্রাণের বঁধু! এস করুণ আঁখি!
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা,তোমায় কোথায় রাখি?
প্রাণের এত কাছাকাছি আছ তুমি চেয়ে,
তোমার ঐ চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে।
একটুখানি দাঁড়াও তবে, কাঁটা তুলি দিব!
তোমার তরে কোমল ক'রে প্রাণ বিছাইব।
এস আমার কোমল প্রাণ! এস করুণ আঁখি!
কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি।'

প্রাণ দয়িতের জন্য আসন পাতিয়া তিনি রাখিলেন। চিত্তরঞ্জনের চিত্ত-কমলাসনে কমলাপতি বিজন-বিহারী নবীন নীপের দেউল হইতে আসিয়া বঁধুর বাসরশয়নে বসিলেন'। সাধক চিত্তরঞ্জন তখন প্রাণের আনন্দে গাইয়া উঠিলেন,—

'থাক আমার প্রাণের প্রাণে থাক অনুক্ষণ!
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন।'

'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন'—কবির ইহা কল্পনা নয় সত্য প্রত্যক্ষানুভূতির ফল।

তারপর তিনি "বাঙ্গালার গীতি কবিতা"-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে

প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্য আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ! বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অসংখ্য-দল পদ্মের কত বাঙ্গলার গীতিকাব্য!

"চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য, বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গালা গীতি কবিতার প্রাণ।"

তারপর তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—'ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও একদিনে এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম;—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শতজন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় মেলিয়া আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্ম তাই।' বাঙ্গলার গীতিকবিতা বৈষ্ণব মহাজনদের অমৃতময় পদাবলীর ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্পকলা স্রষ্টা কবি এইভাব সাগরের লহরীগুলিকে অনন্ত কালের 'অনাহত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা'কে 'লীলা' বলিতে চান। চিত্তরঞ্জনের কথায় বলি,—'আনন্দঘন রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর হিল্লোলেও তিনিই গান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য সেও যে সেই নিত্য সত্য রঙ্গরাজের রংএর খেলা। তাহার ত আদি অন্ত নাই।' সে সঙ্গীত-সুধা পান করিতে হইবে। তিনিই প্রকৃত কবি যিনি অনন্ত কালের অনাহত সঙ্গীতের তানে বিভোর—যাঁহার হৃদয়ের বীণার তারে সে সঙ্গীতের সুর বাহির হয়। যিনি প্রকৃতভাবে সে গান সকলকে শুনাইতে পারেন তিনিই কবি। সাহিত্যের সংজ্ঞা চিত্তরঞ্জন এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। এ বিশ্ব সৃষ্টি তাহারই, এ জীব সৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই, ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। এই অনুভূতির জীবন্ত, অনন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস। কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। কল্পকলা সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিৎ তাহার ভিতর দেখেন সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।'

কলাকুশল চিত্রকর কবি যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারিলেন,—জগৎ মিথ্যা নয়, অনুভূতি সত্য। রসময়ের রসসম্পৃক্ত হইয়া মানবের অনুভূতি সত্য হয়।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পর বাঙ্গলার গীতিকবিতার ভাব-ধারার স্রোত একটু মন্দা পড়িয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রেমের বন্যা বহিল—অহৈতুকী শ্রদ্ধাভক্তির স্রোত চলিল। গীতি-কবিতার স্রোত পুনরায় প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। বৈষ্ণব মহাজন দিগের খাতেই উহা আবার প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বাঙ্গালার গীতি-কবিতার আলোচনা করিবার সময় চিত্তরঞ্জনকে আমরা সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের মত ভাব-বিশ্লেষণ-তৎপর দেখিয়াছি। কিন্তু সাধারণে প্রচারিত চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদ তাঁহার প্রকৃত পদ কি না

সে বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। চণ্ডীদাসের যে সকল পদে সহজিয়া মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রকৃত চণ্ডীদাসের পদ কি না সে সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন নাই।

অবশ্য এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, যে সময় চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব-কবিতা লইয়া প্রথম আলোচনা করিতেছিলেন, তখনই তিনি 'বাঙ্গালার গীতি কবিতা' প্রবন্ধে লেখেন। সে সময় তিনি সকল দিক হইতে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন নাই। সময় ও অবসর তখন তাঁহার বড় ছিল না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস লইয়া তুলনামূলক যে সকল সমালোচনা তিনি করিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বত্র সমীচীন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। চণ্ডীদাসের রসোদ্গারের পদের সহিত বিদ্যাপতির সাধকভাবোচিত পদের তুলনা করা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। উভয় কবির পদে বিষয়-সমতা থাকিলে সমালোচনা চলিতে পারে। যাহা হউক পরে বৈষ্ণব মহাজনের পদ সকল শ্রদ্ধার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিয়া, তিনি প্রকৃত রসগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী আলোচনা তাহার জীবনের ব্রত সকলের মধ্যে যে অন্যতম ব্রত হইয়াছিল, এ কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার সংগৃহীত মহাজন পদাবলীর সংখ্যা অনেক।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদকে 'সঙ্কীর্ত্তনাঙ্গমৃত' নামে একখানি প্রাচীন পুঁথি দান করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইবে।

বৈষ্ণব গীতি-কবিতা কীর্ত্তনে গীত হইয়া থাকে। বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে রসরসিক কীর্ত্তনীয়া সকল আনিয়া বাঙ্গালীকে কীর্ত্তনান্দের রস উপভোগ করিবার সুবিধা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল গায়কেরা প্রসিদ্ধ মহাজনদিগের পদের একরূপ ব্যাখ্যা তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অভিনেতা যেমন নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রকে অভিনয়ের সাহায্যে প্রাণবন্ত করিয়া তুলেন, এই সকল গায়কেরাও 'আখরে'র সাহায্যে, গানের মর্ম্মকথা সাধারণকে সহজভাবে বুঝাইয়া দেন। বাঙ্গালার নিজস্ব কীর্ত্তনগান যাহাতে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতব্য বিষয়ের অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হয় তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বদেশ-সেবার জন্য এ বিষয়ে তিনি অধিক মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

মনীষার প্রতি, চিত্তরঞ্জনের শ্রদ্ধাভক্তি অগাধ ছিল। তাঁহার প্রকাশিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে তিনিই সর্ব্বাগ্রে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "সংখ্যা" প্রকাশ করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও পত্রিকার সমগ্র সংখ্যায় কোন মনীষীর কথা এরূপভাবে আলোচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে বিভিন্ন দিক হইতে যাঁহাদের দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল তাঁহাদের দ্বারা এবং বঙ্কিম-মণ্ডলীর শেষ জ্যোতিষ্ক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অন্যান্য সাহিত্যরথদের দ্বারা প্রবন্ধ লিখাইয়া এই অপূর্ব্ব সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন। মনীষার এরূপভাবে পূজা করিবার তিনিই পথ-প্রদর্শক। মনীষার প্রতি ইহাও তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের অন্যতম নিদর্শন।

পরিশেষে আমরা বাঙ্গলার কথা একটু আলোচনা করিব। বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালীকে তিনি অকপটে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সুখ দুঃখকে আপনার সুখ দুঃখের মত তিনি অনুভব করিতেন তাই বাঙ্গালাদেশ তাহাকে 'দেশবন্ধু' এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিল। প্রকৃতই তিনি দেশের বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালী বলিতে তিনি বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীকেই বুঝিতেন। তিনি বলিয়াছেন—'বাঙ্গালী হিন্দু হউক মুসলমান হউক খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গলার একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ব বিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী

চিরনিদ্রায় চিত্তরঞ্জন
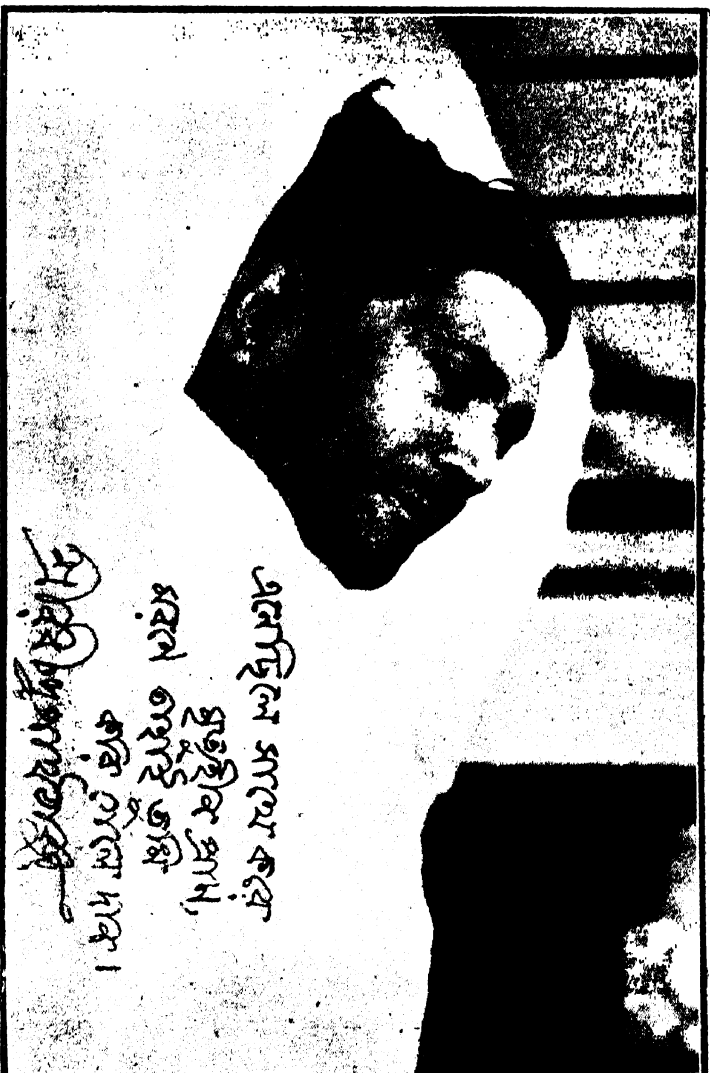
একটী বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ।' দেশ-মাতৃকার প্রতি অকপট ভক্তি না থাকিলে কেহ এরূপ দেশাত্ম-বোধ পাইতে পারে না। মা যে লীলাময়ীর বিশিষ্ট রূপের প্রাণ—সৌন্দর্য্যময়ীর বিশেষ সৌন্দর্য্যের প্রতীক, এ কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিলে মার প্রকৃত সৌন্দর্য্য—প্রকৃত মূর্ত্তি, এরূপভাবে কেহ অঙ্কিত করিতে পারে না। মৃণ্ময়ী মা আমার ভাবৈশ্বর্য্যময়ী, ভগবানের বিভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এ রকমের একটা ধারণা 'স্বদেশী'যুগের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার ছিল। তারপর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত দেশমাতৃকার প্রকৃত স্বরূপ তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই স্বদেশ-প্রেমিক চিত্তরঞ্জন বলিতে পারিয়াছেন—'আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি; যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এ দেশে বাস করিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা বাস করিতেছি। এ দেশের ধূলিকণা আমাদের কাছে অতি পবিত্র।" এই উচ্চ আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া দেশবাসীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশবাসী তাঁহার সহোদর। তাঁহার সহিত সুখদুঃখের সমান অংশী। নিরক্ষর ভারতবাসী ভ্রাতাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেন—আবার পরক্ষণেই আশায় বুক বাঁধিয়া নিরক্ষরকে শিক্ষা দিতে, অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিতে, সকলকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন জন কত শিক্ষিত সহরবাসী ভদ্রলোক উন্নত হইলে দেশ উন্নত হইবে না। পল্লীর ভিতর যে দেশের প্রাণ রহিয়াছে তাহা তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই পল্লী-সংস্কারের দিকে তিনি অবহিত হইয়াছিলেন। পল্লীবাসীর নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে না পারিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে না। শিক্ষায় দীক্ষায় তাহাদিগকে উন্নত করিতে না পারিলে দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জন শেষ জীবনে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দুরন্ত কাল আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে হরণ করিল। তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে দেখিলে স্বর্গ হইতে তাঁহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। যাঁহারা এই কার্য্যে সাহায্য করিয়া সফল হইবেন, তাঁহারা মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইবেন। প্রেমের বলে মরণকে কি করিয়া জয় করিতে পারা যায় চিত্তরঞ্জন তাহা দেখাইয়া গেলেন। তাই আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মরণ-জয়ী হইয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসীকে অভয় বাণী দিয়া যেন বলিতেছেন, পল্লীর সংস্কার কর, ত্রিশকোটী নিরক্ষরকে শিক্ষা দাও, ছুঁৎমার্গ পরিহার করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া ফেল, ভেদবাদ বর্জ্জন কর, সাফল্য তোমাদের করায়ত্ত হইবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিবার আমি অধিকারী নই, কাযেই সে কার্য্য হইতে বিরত রহিলাম। মুক্তিকামী চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ' দেখিয়া যাইবার চিরপোষিত বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমবেত চেষ্টায় কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহা হইলে স্বরাজ অচিরে আসিবেই আসিবে। সেই দিনেই চিত্তরঞ্জনের আত্মা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিলাভ করিবে।

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করিয়া দানকর্ম্ম ও ত্যাগের মূর্ত্ত প্রতীক, বীর চিত্তরঞ্জনের প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

দান। তিনি শুধু দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত হন না, জীব-হৃদয়ে পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনিই এই দুঃখ ভোগ করেন। তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি তখন আনন্দরূপে প্রেমরূপে শান্তির বারি বর্ষণ করে। কথাটা বলিতে যত সহজ, বুঝিতে তত সহজ নহে। এ মীমাংসা আমাদের আবার সেই অদ্বৈতবাদের কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিতে চাহে। দুঃখের নিত্যত্ব স্বীকার করিলেই যে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল তাহা নহে। আবার জীবের দুঃখ ত একপ্রকার নহে। ব্যাধি জরা মৃত্যু ত আছেই; তার উপর মহামারী, জলপ্লাবন, ঝটিকাবর্ত্ত প্রভৃতি নানা আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উপদ্রব নিরন্তর জীব-নিবহের মনে ত্রাস জন্মাইতেছে। এই দুঃখের মরুতে সুখের মরীচিকাই দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দময়ের হ্লাদিনীর পারমার্থিক বিকাশ কোথায়? দুঃখের মরুভূমিতে সুখের ফুল ফুটাইতে পারা কঠিন। সে চেষ্টা বৈষ্ণব ভক্তগণ করিয়াছেন এবং বহু পরিমাণে যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা চলে না। বৈষ্ণবশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সেই অমৃত তর্কভূষণ মহাশয় বিতরণ করুন, ইহাই আমরা ইচ্ছা করি।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

'মনোবিদ্যা'—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম্ এ পি-এচ্ ডি। এই প্রবন্ধে মনোবিদ্যার গোড়ার কথা আলোচিত হইয়াছে। ডাঃ সেনগুপ্ত পরীক্ষা-সংকৃত মনোবিজ্ঞানের (Experimental Psychology) অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে মনোবিদ্যার অনুশীলনের জন্য যে পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাহারই অধ্যক্ষ। সুতরাং পরীক্ষালব্ধ অনেক সত্যই ডাঃ সেনগুপ্তের নিকট হইতে আমরা পাইতে প্রত্যাশা করি। এ প্রবন্ধটি যদি তাহারই মুখবন্ধ হয়, তবে বিশেষ আশার কথা। এ প্রবন্ধে যে দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। মানুষের মন জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নিয়মাধীন, কিংবা তাহার কোনও স্বাধীনতা আছে—ইহাই প্রশ্ন। যদি মনের কোনও স্বাধীনতা থাকে, অর্থাৎ ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার কোনও শক্তি থাকে, তাহা হইলে মনস্তত্ত্ব বলিয়া কোনও বিজ্ঞান থাকিতে পারে না; কারণ বিজ্ঞানের প্রাণ হইতেছে নিয়মানুবর্ত্তিতা। আবার মনের যদি কোনও স্বাধীনতা না থাকে, অর্থাৎ যদি ইহা সর্ব্বত্র নিয়মের বন্ধনে বাঁধা হয়, তাহা হইলে চৈতন্য ও জড়ে কোনও ভেদ থাকে না। এ সংশয়ের শেষ নাই ডাঃ সেনগুপ্ত বৈজ্ঞানিকের মত বলিয়া দিলেন যে মন সর্ব্বথা নিয়মের অধীন। এ 'ফতোয়া' এত সহজে মানিয়া লওয়া চলে না। যাহা হউক, মনোবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার একজন সুযোগ্য ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এ জন্য আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

ইতিহাস

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

'সপ্তগ্রাম'—কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়। বিগত চৈত্র মাস হইতে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে তথ্য ধারাবাহিক ভাবে বসুমতীতে বাহির হইতেছে। প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যাঁহারা সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান তাঁহারা এই প্রবন্ধ হইতে অনেক উপাদান পাইবেন, সন্দেহ নাই। সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন; তারপর মুনীন্দ্রবাবুর আলোচনাই উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক আলোচনায় সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিককে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া কাজ করিতে হয়। নতুবা ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা। লেখক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রয়োগের সময় স্থানে স্থানে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। এ বিষয়ে সতর্ক হইলে প্রবন্ধটী উপাদেয় হইত। প্রবন্ধে অনাবধানতার দৃষ্টান্ত এত অধিক যে তাহার সমালোচনা করিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। স্থানাভাবে আমরা কয়েকটী মাত্র উদাহরণ নিম্নে দিলাম।

লেখক লিখিয়াছেন—"খৃষ্টজন্মের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে 'মহাভাষ্য' ব্যাকরণ রচিত হয়। মহাভাষ্যে, মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, গরুড়পুরাণে ও ভাগবত পুরাণে সুহ্মদেশের পরিচয় (?) দেওয়া আছে।" প্রথমতঃ ঐতিহাসিকের এরূপ আলগা কথা বলা উচিত নয়। কোন কিছু বলিলে তাহার আকরস্থানের উল্লেখ করা দরকার। উক্তির যথার্থতা পরীক্ষা করিতে হইলে পাঠক কি সারা মহাভাষ্য, মহাভারত প্রভৃতি পড়িবেন? লেখক-নির্দ্দিষ্ট কয়খানি গ্রন্থে সুহ্মের পরিচয় (?) আমরা ত

খুঁজিয়া পাইলাম না। কয়েকখানিতে সুহ্মনামের উল্লেখ মাত্র আছে। মহাভাষ্যে (৪,২,৫২) অঙ্গ, বঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত সুহ্মের উল্লেখ আছে, পরিচয় নাই। মহাভারতেও (আদি পঃ—১০৪,৫৩, ৫৫; ১১৩।২৯; সভা পঃ—২৭,২১; ২৯,১০৯৯; ৩০।১৬,২৫; কর্ণপঃ—৮,১৯) মাত্র সুহ্মের উল্লেখ—এখানেও পরিচয় নাই। সভাপর্ব্বে (২৯,১০৯০) প্রসুহ্মের উল্লেখ আছে। আদি পঃ (১১৩, ৪৪-৫৩) সভা পঃ ১৩।৫৮৪, ২৯।১০৯১-৭) বন পঃ—৫১,১৯৮৮; অশ্বমেধ ৮২।৭৪৬৪৫ শ্লোক তুলনায় পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, সুহ্ম পুণ্ড্রদের উত্তরপূর্ব্বে এবং পূর্ব্বে সংস্থিত। এইটুকু মাত্র। বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও ভাগ- বত পুরাণে সুহ্মের পরিচয় কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। বরং হরিবংশ (৩১।৩৪, ৪১,) ভবিষ্যপুরাণ (৪৬।৪৯,) মৎস্যপুরাণ (১১৩।৪৪) কয়বার সুহ্মের নাম করিয়াছেন। তারপর মুনীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"জৈনগণের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ 'আয়রঙ্গসুত্তে' লিখিত আছে যে "সুব্বাভূমি (সুহ্ম) লাড় (রাঢ়) ভূমির পশ্চিমাংশের অন্তর্গত ছিল।" "আয়ুরঙ্গসুত্ত" বলিয়া জৈনদের কোন গ্রন্থ নাই। এ গ্রন্থের নাম "আয়ারঙ্গসুত্ত"। এই গ্রন্থে"সুব্বাভূমি" বা "লাড়"নাই—আছে,—'সুব্‌ভভূমি' ও 'লাঢ়'। মূল গ্রন্থ অথবা বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ দেখিয়া নামগুলি লেখা উচিত ছিল। এইরূপ মহাবংশের 'লাঢ়রট্ট'—'লাঢ়ংঠ্‌ঠ" হইবে। প্রবন্ধের বহুস্থানে এই রকম গোলমাল আছে। তারপর তিনি বিনা প্রমাণে 'গঙ্গারিডে'কে বঙ্গদেশ বলিয়া টলেমীর Gangeকে (লেখকের উচ্চারণে "গাঙ্গে" না হইয়া 'গঙ্গী'তে পরিণত হইয়াছে) সপ্তগ্রাম বলিয়া, প্রিয়ব্রতের সপ্তপুত্রের রাজধানীকে নির্ব্বিচারে সপ্তগ্রামের সাতটী গ্রাম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এসম্বন্ধে যথাযথ প্রমাণ দেওয়া চাই, নতুবা সিদ্ধান্ত মানিতে কেহ প্রস্তুত হইবে না।

প্রবাসী—আষাঢ়।

"প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মের বিকাশ"—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লেখক মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতে প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কথা সুপরিচিত সত্য হইলেও লেখক মহাশয় মহাভারতের যে শ্লোকগুলি একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা উপভোগ্য এবং তাঁহার অধ্যবসায় ও অধ্যয়নশীলতার পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় তিনি ইহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নির্ণয় করিতে যত্নবান হইয়াছেন; কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা আবশ্যক এবং বর্ত্তমানে যে সমুদয় মনীষিগণ এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের লেখার সহিতও পরিচিত হওয়ার দরকার। লেখক মহাশয় ইহার কোনটিরই পরিচয় দিতে পারেন নাই। নারদ মুনির শ্বেতদ্বীপে গমন বৃত্তান্ত হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্বেতদ্বীপ হইতেই নারায়ণের পূজা ভারতে প্রচারিত হয় (১০২ খৃঃ)। এসম্বন্ধে যে কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তিনি সম্ভবতঃ তাহার কোন সংবাদই রাখেন না। আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন, "মহাদেব প্রথমে মাংসাশী ছিলেন। আজকাল নিরামিষাশী। ইহাতেই বুঝা যায়; তিনি অনার্য্য দেবতা ছিলেন।" (৪০২ পৃঃ) আদালতে Summary trial চলে কিন্তু ইতিহাসে তাহার প্রচলন দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। লেখক মহাশয় যে নজিরে এক কথায় মহাদেবকে অনার্য্য দেবতা ঠাহর করিয়াছেন সেই নজিরে অনেক হিন্দুই অনার্য্যের কোঠায় পড়িবে। বৈদিক যুগে মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। যাঁহারা বেদ লিখিয়াছেন তাঁহারাও কি অনার্য্য ছিলেন? নচেৎ মহাদেব বেচারা একা অনার্য্য পংক্তিভুক্ত হইল কি করিয়া? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? লেখক মহাশয় মহাভারত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, অথচ মূল পাঠ করেন নাই, কেবল মাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহাতে কিরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। লেখক মহাশয় আদি পর্ব্বের ৭০ অধ্যায়ের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অনুবাদকারের ভ্রম মাত্র। মূলে 'বৌদ্ধ' নাই, লৌকায়তিক আছে। 'লৌকায়তিক' ও বৌদ্ধ যে এক কথা নহে তাহা বলাই বাহুল্য। উপসংহারে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "অনেকে মনে করেন ভারতে একটি মাত্র ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে ও প্রাচীন কাল হইতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে, এই ধারণা কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।"—লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে জানিতাম না যে কোন সুস্থ ব্যক্তি বাস্তবিকই ঐরূপ মনে করিতে পারেন।

'সম্রাট্ আকবরের কবিতা'—শ্রীঅমৃতলাল শীল। ইহাতে সম্রাট্ আকবরের কয়েকটি কবিতা ও

তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। প্রসঙ্গক্রমে আকবর নিরক্ষর ছিলেন কিনা লেখক মাহাশয় তাহার বিচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে—লেখক মহাশয় কোনও নূতন যুক্তির অবতারণা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আকবর অল্পশিক্ষিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহাকে 'উম্মী' অথবা মূর্খ বলিয়াছেন লেখকের মনে 'এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।' আমাদের কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁহারা বলেন আকবর নিরক্ষর তাঁহারা কেহই আকবর মূর্খ ছিলেন এরূপ মনে করেন না। অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও আকবর অন্যকে দিয়া বই পড়াইয়া এবং পণ্ডিতগণের সাহায্যে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহাদের ধারণা। লেখক মহাশয় কিন্তু অনেকস্থলে নিরক্ষর ও মূর্খ একই অর্থে ধরিয়া লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

'বিক্রমপুর'—অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী। নবাবিষ্কৃত কান্তিদেবের তাম্রশাসন খানি উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কয়েকটি ঐতিহাসিক অনুমান পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কান্তিদেবের রাজধানী বর্দ্ধমানপুরই বর্ত্তমান রামপাল! দ্বিতীয়তঃ তিনি অনুমান করেন যে কান্তিদেবের হাত হইতেই শ্রীচন্দ্র হরিকেল কাড়িয়া নিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে তিনি 'বর্দ্ধমানপুর' ও 'বিক্রমপুর' এই দুইটি নামের উৎপত্তি ও নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তি কবিত্বের পরিচায়ক বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকের উপযুক্ত নহে।

প্রসঙ্গক্রমে ভট্টশালী মহাশয় আরও অনেকগুলি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন—সকল গুলির বিস্তৃত আলেচনা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন বঙ্গের তিনি যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। তিনি লিখিয়াছেন, অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও তাঁহার মতের সমর্থন করিবেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাসের কারণ কি? সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কানিংহামের প্রাচীন ভূগোল গ্রন্থের যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ৭৩০ পৃষ্ঠায় প্রাচীন বঙ্গের যে সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ভট্টশালী মহাশয়ের মতানুযায়ী নহে।

ভট্টশালী মহাশয় কান্তিদেবের তাম্রশাসনের প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "চন্দ্র-বর্ম্ম-সেনদের তাম্রশাসন সব একছাঁচে ঢালা···কান্তিদেবের শাসনে কিন্তু প্রাচীন শাসনাবলির অনুসরণে প্রথমেই রাজধানীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।" ভট্টশালী মহাশয় 'চন্দ্র-বর্ম্ম-সেনদের' তাম্রশাসনের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পালরাজগণের তাম্রশাসনেও সেই সেই লক্ষণ বর্ত্তমান, তবে তিনি পালরাজগণের নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দিলেন কেন? তাঁহার যুক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া কি? কারণ তাহা হইলে তাঁহার যুক্তি অনুসারে কান্তিদেবকে পালদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়। কিন্তু এই সকল বিষয়ে মতের প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে ভট্টশালী মহাশয় কান্তিদেবের আলোচনা আরম্ভ করিয়া তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসকে এখন ইংরাজী গ্রন্থের গণ্ডীর বাহিরে আনিতে হইবে। যাহা কিছু নূতন আবিষ্কৃত হয় তাহারই আলোচনা বাঙ্গালায় হওয়া আবশ্যক। কান্তিদেবের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এতই অল্প যে অনুমানের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ভট্টশালী মহাশয়ের অনুমানগুলি গ্রহণ না করিলেও, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় যদি অধিকতর সুসঙ্গত অনুমান কেহ করিতে পারেন তবে কান্তিদেবের ইতিহাস গঠন সহজসাধ্য হইবে।

প্রবন্ধে দুইটি মারাত্মক ভুল আছে। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বাঙ্গালায় প্রাচীর নাম 'হরিকেল' সর্ব্বত্র 'হরিফেল' বলিয়া ছাপা হইয়াছে। আর প্রবন্ধের দ্বিতীয় লাইনেই মেঘনাদ নদকে বিক্রমপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহা কাহার অনবধানতা বলিতে পারি না।

বঙ্গবাণী—আষাঢ়।

'হিন্দুরাষ্ট্রের সমর বিভাগ'—শ্রীবিনয়কুমার সরকার। এই প্রবন্ধটি বিনয়বাবুর "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন" নামক গ্রন্থের এক অধ্যায় এবং ইহার এক অংশ মাত্র বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সরকার মহাশয়ের মূল বক্তব্য এই—প্রাচীন হিন্দুজাতি স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় যেরূপ তৎপর ছিল সাম্রাজ্য গঠনেও সেইরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। "সাম্রাজ্যের শাসনে অন্যতম—বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান খুঁটা হইতেছে সমর বিভাগ—সমর বিভাগের শাসনে হিন্দুজাতির দক্ষতা যুগে যুগে দেখা গিয়াছে।" হিন্দুরা বহুবার বিদেশীয় জাতিকে (গ্রীক, হুন, মুসলমান

প্রভৃতিকে) যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে। "হিন্দুদার্শনিকেরাও লড়াই ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন।" উপসংহারে সরকার মহাশয় "দুনিয়ায় মাপ কাঠিতে হিন্দু সমর জীবন জরীপ" করিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষের সৈন্য সংখ্যা অন্যান্য জাতির সৈন্য সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে হিন্দু সেনাপতিরা "রোমান পল্টনকে অতি সহজেই পকেটস্থ করিতে অথবা ট্যাঁকে গুজিয়া বেড়াইতে পারিতেন।"

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র করেন না, তিনি স্বাধীন চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার ভাষার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভেদ করিয়া যাঁহারা প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়িতে পারিবেন তাঁহারা অনেক শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় পাইবেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকটা অতিরঞ্জিত হীন ধারণা পোষণ করেন, বিনয় বাবু তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় এই উপলক্ষে তিনিও অনেক সময় উল্টা দিকে অত্যুক্তি করিয়াছেন। ইহা অস্বাভাবিক না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস গড়িতে হইলে দুই প্রকারের অত্যুক্তিই পরিহার করিতে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মুসলমানের দ্বারা পরাজিত হওয়া হিন্দুর পক্ষে তাদৃশ গ্লানিকর নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ইউরোপের মুসলমানদের প্রাধান্য বিবৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন 'খৃষ্টীয়ানরা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মতনই মুসলমান শাসন হজম করিতে বাধ্য হয় নাই কি ?' তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে ফরাসীরা পশ্চিমে ও অষ্ট্রীয়ানরা পূর্ব্বদিকে মুসলমানদের গতিরোধ করিয়াছিল এবং ক্রমে মুসলমানেরা ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া কেবলমাত্র পূর্ব্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিল। অথচ "রোমান পল্টনকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া বেড়াইতে পারিত" এমন বিশাল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও, মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে গোটা ভারতবর্ষটা দখল করিয়া বসিয়াছিল !

ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের কয়েকটি ভুল অমার্জ্জনীয়। "১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গুর্জ্জর প্রতীহারেরা মুসলমানদের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দেয় নাই।" একথা সত্য নহে—কারণ ইহার প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলেই গুর্জ্জর প্রতীহার শক্তি বিধ্বস্ত হয়—১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সে শক্তির কোন অস্তিত্ব ছিল এরূপ প্রমাণ নাই। "বাংলার সেন বংশ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরাজয় স্বীকার করে নাই"—এখানে ভুলক্রমে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের স্থলে ১১০০ লেখা হইয়াছে—কারণ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সেনরাজগণের প্রভুত্বই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের যাদব ও চোল রাজারা কাবু হন।" ইহাও সত্য নহে। যাদবরাজ ১২৯৪ খৃঃ অব্দেই আলাউদ্দিন খিলজীর হস্তে কাবু হইয়াছিলেন এবং ১৩১৬ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই যাদব, চোল প্রভৃতি রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হয়।

'প্রাচ্যে গুপ্তসন্ধি'—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক মহাশয় বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির স্বার্থ ও সুবিধার বিষয় আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চীন, জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে যে একটি গুপ্তসন্ধি হইয়াছে বলিয়া জনরব তাহা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ।

বিজ্ঞান।

বঙ্গবাণী—আষাঢ়।

"উৎপত্তির ইতিহাস"—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। নাম ও বিষয়নির্দ্দেশ দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে বোধ হয় এটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কিন্তু পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যে ইহাকে Scientific না বলিয়া Metaphysical বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই প্রবন্ধের কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। লেখক মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন, "পার্থিব উপাদানেই পৃথিবীর উৎপত্তি, আর সেই উপাদানই এই পৃথিবীর জীবন ও জীবের উৎপত্তি। আমরা পায়ের তলায় মাটি দলাই আর মাটিকে ঘৃণ্য ভাবি; তাই সেই মাটি হইতে জীবনের উৎপত্তি ভাবিতে অনেকের মনে বাধে। কোন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে না যে, জড় গড়িয়াছিল একটা শয়তান্, আর জীবন গড়িয়াছিলেন অন্যে। সসম্মানে ও সবিস্ময়ে যাঁহারা জগতের দিকে চাহিতে পারেন না, তাঁহারাই নাস্তিক ও পরমার্থতত্ত্বের বিরোধী। জড়ের মাহাত্ম্য বুঝিলেই সৃষ্টির ও স্রষ্টার গৌরব বুঝিব।" কল্পনা-হিসাবে এই উক্তি হয়তো মন্দ নহে, কিন্তু ইহাতে কোন biological প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

প্রবাসী—আষাঢ়।

"প্রাচীন ভারতীয় আকাশপোতে পারদ ব্যবহার,"—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায়। লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "প্রাচীন ভারতে আকাশ যান ছিল তাহা প্রমাণ করিয়া পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব কোন কোনো আকাশপোত পারদ-সাহায্যে চালিত হইত।" কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার চেষ্টা কোন ফল প্রসব করিতে পারে নাই। পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থে আকাশ-যানের উল্লেখ আছে সেইগুলি আওড়াইলেই প্রাচীন্ ভারতে 'উড়ো জাহাজের' অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; কিন্তু কি ভাবে এই যানগুলি নির্ম্মিত ও চালিত হইত তাহা যদি কেহ বাহির করিতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিতে পারেন যে এই প্রকার যানের আকাশমার্গে চালনা সম্ভবপর, তাহা হইলেই সমস্ত জগৎ অবনতমস্তকে প্রাচীন হিন্দুদিগকে বিমান যান সম্বন্ধে ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিবে নতুবা নহে। যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে চান তাঁহাদিগকে আচার্য্য-রায়ের প্রণীত History of Hindu Chemistry পড়িতে ও তন্নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

"মেণ্ডেলীফ ও নব্য রসায়ন,"—শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র রায়। এই প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় রাসায়নিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং তৎপ্রণীত পরমাণু বাদের পুনরাবর্ত্তনশীল শ্রেণীবিভাগ (periodic classification) ও কেরোসিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত আলোচিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য রসায়নের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্য রসায়নের উৎপত্তি হইয়াছিল। কোন একজন লেখক রসায়নের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—"The discovery of oxygen by Scheele (1742—86) and Priestley (1733—1804) and the use made of it by Lavoisier (1743—94) to explain the true nature of combustion mark the starting point of the modern science of Chemistry." কেরোসিন অংশে একাধিক ভ্রম দেখিতে পারা যায়। মেণ্ডেলিফ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই রুশীয় ভাষাতে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই প্রবন্ধে সেই বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ।

"ইন্‌সুলীন," শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু। এই প্রবন্ধে ইন্‌সুলীনের ইতিহাস, প্রস্তুত প্রণালী, ক্রিয়া, প্রয়োগের নিয়ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বহুমূত্র রোগে পীড়িত ব্যক্তির অভাব নাই। এই সমস্ত রোগী ইন্‌সুলীনের বিবরণ শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন। ডাক্তার বসু মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন, "ডায়াবিটিস রোগের চিকিৎসায় ইন্‌সুলীন্ চিকিৎসকের হস্তে একটী ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।" রোগ প্রতীকার অপেক্ষা রোগের নিবারণ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কি জন্য আমাদের দেশে বহুমূত্রী লোকের এত প্রাদুর্ভাব সে সম্বন্ধে ডাক্তার বসু মহাশয় মাসিক পত্রিকাতে আলোচনা করিলে সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

"প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়নজ্ঞান চর্চ্চা,"—আচার্য্য রায় মহাশয় ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন প্রবন্ধে সেই বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু। অনুবাদ ভালই হইয়াছে, তবে দু'এক স্থলে কিঞ্চিৎ ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্যের মূল বক্তৃতা Quarterly Journal of the Indian Chemical Societyতে বাহির হইয়াছে। আচার্য্য বলিতেছেন:—Max Muller says somewhere that if India had presented no other gift to Europe than that of the numerals, the debt of the latter to the former would have been unrequitable." প্রফুল্লবাবু নিম্নলিখিত ভাবে এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন:—"মোক্ষমুলর বলেন, যদি ভারতবর্ষ য়ুরোপকে সংখ্যা বিজ্ঞান দান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তবে ভারতবর্ষের নিকট য়ুরোপের ঋণ অপরিশোধনীয় হইত।" এই অনুবাদ যে ঠিক হয় নাই তাহা সহজেই দেখা যাইতেছে। 'Tenacious vitality' আর রক্ষণশীলতাও এক কথা নয়।

"হাঙ্গরের সদ্ব্যবহার,"—শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত। সুলিখিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে নিকুঞ্জবাবু এক আশাপ্রদ ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছেন। অধুনা প্রতি বর্ষে ১৮।২০ লক্ষ টাকার হাঙ্গরের পাখনা রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক বলেন, "শুধু পাখনার জন্য হাঙ্গর মারা কিন্তু নিতান্ত অপচয়ের কাজ। আহার্য্য, তৈল, সার, চামড়া ও অন্যবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিলেই হাঙ্গরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়। হাঙ্গর-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা দরকার।" লেখক মহাশয়ের মতে "বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কোন স্থানে পরীক্ষার জন্য আপাততঃ একটী ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিলে হাঙ্গর-জাত নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসায়ী-সম্ভাবনা দুই চারি বৎসরের মধ্যেই যে জানা যাইতে পারিবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই।" আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

"ব্রেজিল," শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। এই প্রবন্ধে ব্রেজিল দেশের একটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ও বিবরণের সঙ্গে কতকগুলি ছবিও প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণ বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, ছবিগুলিও মন্দ নহে, তবে ছবি ও বিবরণের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কথা-সাহিত্য।

প্রবাসী—আষাঢ়।

এবারকার "প্রবাসীর" একমাত্র নিজস্ব গল্প শ্রীমতী সীতা-দেবীর "পূজার তত্ত্ব"। গল্পটি নূতনত্ব বর্জ্জিত। ইহার মোট কথাটা বেশ লাগসই, এবং পরিসমাপ্তির ভিতর করুণরসের যথেষ্ট আয়োজন আছে, কিন্তু লেখিকা গল্পের রচনায় যথেষ্ট যত্ন বা মনঃসংযোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহা তাঁর পূর্ব্বের রচনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। করুণ রসের উদ্বোধনে আবশ্যকের অতিরিক্ত নির্ম্মমতা, রং ফলাইতে অতিমাত্র চড়া রং এবং করুণ সুরের অধিক তীব্রতায় গল্পের অধিকাংশ অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। তবে শ্রীমতী সীতা দেবীর বর্ণনা চাতুর্য্য ষোল আনা ইহাতে বজায় আছে।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ।

ইহাতে দুইটি মাত্র সম্পূর্ণ গল্প আছে। প্রথম শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্তের "অবসান"। ভাষা ভাল, গল্পের পরিকল্পনায় রসের প্রচুর উপাদান আছে, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। ভিতরে গাঁথনী ভাল, কিন্তু চূড়ায় আসিয়া মন্দির কাণা হইয়া গিয়াছে।

"রাক্ষসী" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা একটি চিত্র। ইহাকে জোর করিয়া গল্প বলা যায়। প্রচারক বা নীতি উপদেষ্টা তাঁর উপদেশের প্রমাণ স্বরূপ যে গল্প বলেন তার ভিতর রসের চেয়ে উপদেশের দিকেই বেশী দৃষ্টি থাকে—এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, উপদেশ সুস্পষ্ট, কিন্তু গল্পটি কিছুই নয়। বাঙ্গালা দেশে বিধবার দুরবস্থার কথা কে না জানে, অনেকের দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, ইহা পরম পরিতাপের বিষয়। কিন্তু সে কথাটা ফুটাইবার জন্য এতটা রঙ চড়াইবার দরকার ছিল কি? রাই-কিশোরীর মৃত্যুর পর তার শ্বাশুড়ীর যে বক্তৃতা দিয়া লেখক গল্প সমাপ্ত করিয়াছেন তাহাতে রসের সমাধি হইয়াছে। নেবু অতিরিক্ত চটকাইলে যে তিক্ত রসের উদ্ভব হয় তাহা যে দীনেন্দ্রবাবুকে এতদিন পরে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় ইহা কম দুঃখের কথা নয়।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রলয়ঙ্করী" প্রথম গল্প। আখ্যান-বস্তুর মধ্যে রসের প্রচুর উপাদান আছে কিন্তু তাহা ফোটে নাই। ভাবিনীর এক হাত দেখান'র ভিতর লেখক বিস্ময় উৎপাদনের কোনও কৌশল অবলম্বন না করায় সমস্ত রসটা পানসে' হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া গল্পে রস-সাঙ্কর্য্যের দোষ ঘটিয়াছে। গল্পের আরম্ভে ও মধ্যে হাস্য রসের প্রচুর উদ্রেকের সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে, কিন্তু সে স্রোতটা অল্পদূর গিয়াই থামিয়া, পরে একটা মিশ্ররস অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিকল্পনায় গল্পটি মন্দ নয় কিন্তু বিন্যাসকলায় হীন।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উড়ো চিঠি" গ্যর্কির আদ্যশ্রাদ্ধ। অনুবাদ করিলে ইহা সুন্দর হইতে পারিত, কিন্তু, গ্যর্কির ছায়া লইয়া যে ছায়ামূর্ত্তি রচিত হইয়াছে তাহা ভয়াবহ। রুষীয় গল্প বাঙ্গালার গায়ে বসাইতে গেলে যে সব অসঙ্গতির নিরাকরণ আবশ্যক সে বিষয়ে লেখকের কোনও চেষ্টা দেখিতে পাইলাম না। আমিনা যে-চিঠি পড়িবে সেটা উর্দ্দূ হওয়া উচিত। সুকুমারের উর্দ্দূ চিঠি লেখা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার স্ত্রীর পক্ষে সে চিঠির অর্থবোধ করা সম্ভব কি?

"রক্তকমল" শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের একটি গল্প। মাণিক বাবু শক্তিমান্ লেখক—কিন্তু এটি তাঁহার

যোগ্য হয় নাই। জোড়াতাড়া দিয়া গল্পের সঙ্গতি রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে। সম্ভাব্যতার দিকে লেখক মোটেই দৃষ্টি দেন নাই। স্থানে স্থানে এক একটি চিত্র বর্ণনাসৌকর্য্যে সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর গল্পটি পদে পদে রসবোধে আঘাত করে। অনসূয়ার সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের মিলনটা নেহাৎ জবরদস্তী করিয়া করা হইয়াছে।

বঙ্গবাণী—আষাঢ়।

শ্রীযুক্ত *গিরীন্দ্রনাথ* গঙ্গোপাধ্যায়ের "চিরন্তন" একটা স্বপ্ন। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষের ভিতর দাঁড়াইয়া কবি স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাঁর প্রাপ্ত একটী প্রস্তর মূর্ত্তির বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথের "কঙ্কালের" কাঠামো লইয়া গল্পটি গাঁথা, ভাষার লালিত্যে ইহা সুখপাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু কাহিনীটির ভিতর বিশেষত্ব নাই। কৌতূহলের উদ্রেক, যাহা গল্পের প্রাণ, এ গল্পটীতে তাহার একান্ত অভাব।

শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দলাদলি"র আরম্ভটা মন্দ নয়, কিন্তু শেষ অত্যন্ত মামুলি। তা ছাড়া গল্পটার আদ্যোপান্ত এই কথাই বারবার মনে হয় যে, লেখক বই পড়িয়া মানব চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্র এই শ্রেণীর যে কয়টী গল্প লিখিয়াছেন তাহাতে দলাদলির যেমন স্বাভাবিক উদ্ভব ও একটা অপ্রত্যাশিত রমণীয় পরিণতি দেখা যায়, তাহা সেই সব লেখকদের মানব চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফল—তাই সেগুলি তাজা জীবন্ত ঝরঝরে। এগল্পে সেই গুণটির অভাবে গল্পটী নির্জ্জীব ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মানব চরিত্রের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা যাঁর আছে তিনি নিছক কল্পনার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ সত্য চিত্র আঁকিতে পারেন, কিন্তু যাঁর সে অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, তাঁর পক্ষে, শিক্ষানবিস শিল্পীর পক্ষে মডেলের মত, বাস্তব জীবনের ঘটনার অনুশীলন বিশেষ উপকারী। লেখকের শক্তি আছে, আমরা তাঁহাকে পাঁজি পুঁথি ফেলিয়া রাখিয়া বাস্তব জীবন অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

কবিতা

প্রবাসী—আষাঢ়।

'ঝরাপাতা'—শ্রীকালিদাস নাগ। রচনা 'একঘেয়ে,' কবিত্ব রসকে মূর্ত্তি দিবার নিমিত্ত ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

'প্রকৃতির প্রতীক্ষা'—শ্রীমণি মজুমদার। প্রকৃতি-সুন্দরীর নানা রূপে কবি মুগ্ধ, তবে তিনি প্রকৃতি রাণীর রূপের পারাবারে একেবারে 'ডুবিয়া' মিশিয়া তন্ময় হইতে পারেন নাই। তাঁহার বাঞ্ছিতা প্রেয়সী তাঁহাকে বরণ-মালা পরাইতে নিতন্তুই নারাজ।

'সমাজ'—শ্রীসজনীকান্ত দাস। রচনা স্থানে স্থানে সুন্দর হইলেও কবিত্বের সোণার কাঠির স্পর্শের অভাবে, কবিতাটী আড়ষ্ট।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

এই মাসের 'ভারতবর্ষে' পাঁচটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। মহাকবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ইহার অধিকাংশ কবিতাই প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত—অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে এই কথা বলিতে হইতেছে।

"বর্ষ-প্রবেশ"—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ। স্কুল পাঠ্য কবিতা সংগ্রহ পুস্তকে স্থান পাইবার যোগ্য।

'কন্যা' ও 'বধূ'—দুইটী কবিতা শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্। রচনায় ভাবপ্রকাশ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আদৌ নাই।

'এসেছে আষাঢ়'- শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ। এরূপ কবিতা লেখিকার যশ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

'বাণী-রাণী'—শ্রীগিরিজাকুমার বসু। কবিতাটী প্রাণ-হীন।

'কান্না-বিলাসী'—শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরূপ সখের কান্নায় খাঁটি কবিত্ব থাকা অসম্ভব।

'নিকুঞ্জ-কানন'—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ বি-এল্। এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী উল্লেখযোগ্য। ভাব মাধুর্য্য উপভোগ্য হইলেও স্থানে স্থানে ভাষায় ঝঙ্কার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বঙ্গবাণী—আষাঢ়।

'মিলনগীতি'—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। নামটি না থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত না যে ইহা সুকবি কালিদাস রায়ের রচিত। বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত সাধারণ কবিতা। দুই এক স্থানের অর্থ জটিল। যথা:—সুষমার রূপের সাথে রঙীন মিলন চোখে রাজে ইত্যাদি।

'মরণের বাঁশী'—শ্রীমতী বেলা গুহ। কবিতার নাম-করণের সহিত অখ্যান-বস্তুর কোন সামঞ্জস্য নাই। ভাবের বৈশিষ্ট্য, গভীরতা, বা ছন্দের সৌন্দর্য্য কিছুই নাই।

'জয় ও পরাজয়'—শ্রীমতী রেণুকা দাসী। সুন্দর কবিতা। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমের ভাব ইহাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"আমার বুকে যেথায় বেদনা বাজে
সেথায় যদি কঠিন আঘাত কর,
বুলিয়ে দিব স্নেহের পরশখানি
যেথায় তোমার আঘাত গভীরতর।"

'তৃণফুল'—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়। এই ক্ষুদ্র কবিতায় কবি শব্দগুলি বেশ সুন্দরভাবে সাজাইয়াছেন; কিন্তু ইহাতে ভাবের সাড়া পাওয়া যায় না।

'স্মৃতিপূজা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ভক্তের স্মৃতির তর্পণ।

চিত্র।

বঙ্গবাণী—আষাঢ়।

"বৃহন্নলা ও উত্তরা" তিন বর্ণের প্রাচ্যকলা সম্মত ছবি—ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Technique, expression প্রভৃতি সুন্দর, কিন্তু বর্ণ বিন্যাসে নিরাশ হইলাম। হয়ত ইহার হেতু এই যে ছাপার কালি ঠিক হয় নাই। ব্লকেরও দোষ আছে। মুদ্রাকরের প্রতি নিবেদন, যেন তিনি মূল ছবিখানি দেখিয়া কালির রং ঠিক করিয়া লন। ব্লক প্রস্তুতকারকও ফিলটারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

"স্বর্গীয় [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর"—৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত পেন্সিলের ছবি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক। কাগজের দোষে ছাপা অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে। যাঁহারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবি দেখিয়াছেন অথবা তাঁহাকে sitting দিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অত্যল্পকালের মধ্যে সামান্য পেন্সিলের রেখায় তিনি প্রতিকৃতি, character এবং idiosyncracy কি অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইয়া তুলিতেন। তাঁহার অভাবে আজ বাঙ্গলা সাহিত্য এবং বাঙ্গালার রেখাচিত্র শিল্প দীন হইয়াছে।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

"অম্বপালী" তিন বর্ণের প্রাচ্যকলা সম্মত ছবি—শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। শিল্পী বাস্তবের ছাপ মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। প্রাচ্যকলানুমোদিত techniqueএর অভাব, expession ও নাই।

"বাতায়নবক্ষে"। তিনবর্ণের বাস্তব ছবি—শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বাগচী। Anatomy, expression, বর্ণ বিন্যাস প্রভৃতির অভাব। ইঁহাকে মডেলের সাহায্য লইয়া প্রথমে monochrome আঁকিতে অনুরোধ করি।

"জীবনটা ত দেখা গেল—মরণটাকে দেখবি চল—"- তিন বর্ণের বাস্তব ছবি, শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। রেখায়, বর্ণে, expressionএ সুন্দর হইয়াছে। এই শিল্পের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্যের বিষয়। ইহাতে বর্ণবাহুল্য এবং মডেলিং-এর প্রাচুর্য্য নাই, স্নিগ্ধতায় অত্যন্ত মনোরম।

"শেষ চিন্তা," তিনবর্ণের—বাস্তব ও প্রাচ্যকলার সংমিশ্রণ। শিল্পী শ্রীমহম্মদ আবদার রহমন চগ্‌তাই। নিরাশ হইলাম। রেখা, বর্ণ, ভাব, techniqueএর অভাব।

প্রবাসী—আষাঢ়।

"বুদ্ধদেব ও সুজাতা," শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী। প্রাচ্যকলা-সম্মত তিন বর্ণের ছবি। রেখা, বর্ণ প্রভৃতির বৈচিত্র্যের অভাব। Expressionএ জ্ঞান গাম্ভীর্য্য নাই। বুদ্ধের মুখ নিতান্ত বালকের মত, কিন্তু তখন তাঁর বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে। Composition খাপছাড়া।

"ভাঙা ঘর" ও "জুতা সেলাই।" শিল্পীর নাম নাই, রেখাচিত্র, বিশেষত্ব ও অ্যানাটমি বর্জ্জিত।

"সরবৎ"—তিন বর্ণের ছবি, প্রাচ্যকলা সম্মত কিনা বলা কঠিন। ভাবভঙ্গী, বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি কিছুই নাই। ডিক্যাণ্টার ও গেলাস নিতান্ত আধুনিক, একটু "কড়া" সরবতের উপযোগী।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ।

"বাঁশীর তানে শ্রীরাধা," শিল্পী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা। তিন বর্ণের বাস্তব ছবি। ছবির নিচে যে আট ছত্র কবিতা লেখা আছে, তাহার সহিত ছবির প্রায় সম্বন্ধ নাই। Anatomy, perspective সকলেরই অভাব। শিল্পী মডেলের সাহায্যে কিছুকাল ধরিয়া ড্রয়িং মক্স করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন আশা করা যায়।

"ফুল্লকমল"—শিল্পী শ্রীচারু সেন গুপ্ত। তিনবর্ণের বাস্তব ছবি। Anatomy, perspective, বর্ণ-বিন্যাস প্রভৃতি কিছুই নাই। অবয়বের কথা ছাড়িয়া দিলেও কাপড় চোপড় (drapery) শরীর সংলগ্ন হইয়া কি ভাবে থাকে থাকে ভাঁজে ভাঁজে পড়ে,

যে কোন মডেল দেখিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেও ত একটা স্কেচ করিয়া লওয়া চলিত। অতি দুঃখের বিষয় এই সকল শিল্পী চোখের সাহায্য গ্রহণ করেন না। চোখে দেখিলেও কি করিতেন বলা যায় না। দেখিয়া আঁকিলেও যখন সাফল্য সুদূরপরাহত তখন কেবলমাত্র স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিলে যে শিব গড়িতে আর কিছু গড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

"শুভদৃষ্টি,"—শিল্পী শ্রীমনীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। তিন বর্ণের প্রাচ্যকলা সম্মত ছবি। শুভদৃষ্টি আমাদের জীবনের এমন একটা অসাধারণ এবং অপরিমেয় আনন্দের ঘটনা যে, পাছে মনে অন্য কোন ভাবের সঞ্চার হয় সেই ভয়ে ছবিগুলিতে নজর পড়িতেই পাতা উল্টাইয়াছি সুতরাং আলোচনা করিতে পারিলাম না।

বঙ্কবিহারী
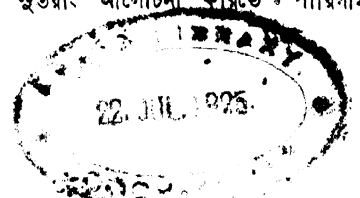
সাধ নাহি মিটে মোর ওরূপ নেহারি,
অনিমেষ নেত্রে তাই চাহি বারবার,
তুমি সৌন্দর্য্যের খনি হে বঙ্কবিহারী,
আনন্দ লহরী তোল হৃদয়ে আমার।
ঈষৎ মধুর হাসি ঝরে সুধাধারা,
করুণা চন্দনে মাখা যুগল নয়ন,
ললিত নৃত্যের রসে হ'য়ে মাতোয়ারা,
পুলক-চঞ্চল যেন উঠিছে চরণ।
কেমন স্বরূপ তব নারি বুঝিবারে,
কতরূপে কতভাবে আছ বিদ্যমান।
তুমি বিরাজিত এক এ বিশ্ব মাঝারে,
সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা পুরুষ প্রধান।
সাগরে যেমন হয় তরঙ্গ উদয়,
বুঝিয়াছি, এই সৃষ্টি তোমা ছাড়া নয়।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

পত্রাঙ্ক সংশোধন—৫৭৭ হইতে ৫৮৪ পৃষ্ঠা ভুলক্রমে ৫৮৩—৫৯০ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

সপ্তদশ বর্ষ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

—*—

গ্রাহকগণের প্রতি

বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত আমাদের এ বর্ষের প্রথম ষণ্মাস পূর্ণ হইল। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে বাকী ৬মাসের মূল্য ২।০ পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহাদের টাকা না আসিবে, ভাদ্র-সংখ্যা ১লা ভাদ্র তারিখে তাঁহাদিগকে ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইব, অনুগ্রহ করিয়া ২৷৷০ দিয়া উহা গ্রহণ করিবেন।

প্রথম ষণ্মাসের সূচীপত্র, ভাদ্র সংখ্যার সহিত যোজিত হইবে।

বিনীত
"মানসী ও মর্ম্মবাণী"—কার্য্যাধ্যক্ষ।

কলিকাতা
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত